# উদ্বোধন

"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত"

উদ্বোধন কার্যালয়, কলিকাতা—৩

৪শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা
াঘ, ১৩৫৮

বার্ষিক মূল্য ৪
প্রতি সংখ্যা ॥·

# সাম্যের দার্শনিক ভিত্তি

সম্পাদক

আধুনিক বিজ্ঞান পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের দূরত্ব নষ্ট করিয়া সকল জাতির সম্মিলনে এক বিশ্ব-মানব-জাতি গড়িয়া তুলিতে যথেষ্ট সাহায্য করিতেছে। রেডিও এরোপ্লেন প্রভৃতির সাহায্যে সংবাদ আদান-প্রদান এবং যাতায়াতের সুবিধার জন্য পৃথিবীর বিভিন্ন জাতির পারস্পরিক সম্বন্ধ ক্রমেই অধিকতর ঘনিষ্ঠ হইতেছে। উন্নত জাতি-সমূহ-কর্তৃক সকল দেশের সহিত কাঁচা মাল ও শিল্প-দ্রব্যাদির বিনিময়ের ফলে সমগ্র মানব-জাতি ক্রমেই একটি অর্থনীতিক সূত্রে আবদ্ধ হইয়া পড়িতেছে। এখন যুদ্ধবিগ্রহ বিপ্লব প্রভৃতি কোন একটি স্থানে সীমাবদ্ধ থাকে না, দেখিতে দেখিতে পৃথিবীর সকল দেশ উহাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়। বর্তমানে সুসভ্য দেশমাত্রেরই জনসাধারণ শোষণ-মূলক ধনতান্ত্রিক অভিজাত শাসন-প্রণালী একেবারে উচ্ছেদ করিয়া গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র এবং সকল বিষয়ে সাম্যমূলক অর্থনীতি প্রবর্তন করিতেছে। দেশে দেশে, জাতিতে জাতিতে, শ্রেণীতে শ্রেণীতে ও মানুষে মানুষে সকল ক্ষেত্রেই অসাম্য সাম্প্রদায়িকতা অধিকার-ভেদ বিরোধ-বিদ্বেষ প্রভৃতির বিরুদ্ধে বিশ্বময় জনমত দিন দিন ক্রমেই অধিকতর প্রবল হইয়া উঠিতেছে। ইহার ফলে অধিকাংশ দেশেরই জনগণ সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া কায়েমী স্বার্থান্বেষী অভিজাত-শ্রেণীর প্রবর্তিত অসাম্যপূর্ণ প্রাচীন সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থা নষ্ট করিয়া জাতীয় জীবনের সকল বিভাগ সাম্যভিত্তির উপর গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করিতেছে। আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত সমাজতন্ত্র-বাদের ব্যাপক প্রচারের ফলে এখন শিক্ষিত-অশিক্ষিত সকলেই বেশ বুঝিতে পারিয়াছেন যে, দেশের জনসাধারণের জীবন-ধারণের জন্য অত্যাবশ্যক খাদ্য ও বস্ত্রাদির উৎপাদন ও বিতরণ-ব্যবস্থা শ্রেণীস্বার্থে পরিচালিত হওয়ায় উহা অসাম্য সৃষ্টি করিয়া রাষ্ট্র সমাজ শিল্প সংস্কৃতি ধর্ম প্রমুখ জাতীয় জীবনের সকল বিভাগ এবং সমাজ ও ব্যক্তিগত জীবনযাত্রা-প্রণালী অসাম্য-পূর্ণ করিয়া তুলিয়াছে। এই বিষয়টি একটু চিন্তা করিলেই ইহার সত্যতা স্বতঃই মনে প্রতিভাত হয়। বর্তমানে সমাজতন্ত্রবাদিগণ সন্তোষজনক ভাবে প্রমাণ করিয়াছেন যে, দেশের জনসাধারণের পক্ষে অপরিহার্য খাদ্য ও বস্ত্রাদির উৎপাদন ও বিতরণ-ব্যবস্থা সাম্য-ভিত্তিতে গঠিত এবং জাতি-ধর্ম-বর্ণ-শ্রেণীনির্বিশেষে সকল নরনারীর সকল বিষয়ে সমান অধিকার-নীতিমূলে পরিচালিত হইলে জাতীয় জীবনের সকল বিভাগে সাম্য প্রতিষ্ঠিত এবং ইহার ফলে সমাজ ও ব্যক্তিগত জীবনও বহুলাংশে সাম্য-মৈত্রীপূর্ণ হইতে পারে।

এই বিজ্ঞানসম্মত অর্থনীতিক সাম্য-প্রতিষ্ঠার উপযোগিতা ও আবশ্যকতা-সম্বন্ধে বিশ্বমানবের মধ্যে সকল বিষয়ে সাম্যপ্রতিষ্ঠাকামী সত্যসন্ধ সুশিক্ষিত ব্যক্তিদের মধ্যে এখন আর কোন মতদ্বৈধ দেখা যায় না বটে, কিন্তু ইহা কার্যে পরিণত করিবার পদ্ধতি এবং সাম্যপ্রতিষ্ঠার পরিমাণ-সম্বন্ধে সমাজতন্ত্রবাদের অন্তর্গত "গোষ্ঠী সমাজতন্ত্রবাদী" "খৃষ্টান সমাজতন্ত্রবাদী" "ফেবিয়ান সমাজতন্ত্রবাদী" "গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রবাদী" "মৌলিক সমাজতন্ত্রবাদী" "বৈপ্লবিক সমাজতন্ত্রবাদী" "বিবর্তনী সমাজতন্ত্রবাদী" "সংশোধনবাদী" "বৈপ্লবিক শ্রমিক অধিকারবাদী" "সাম্যবাদী" প্রমুখ বিভিন্ন রাজনীতিক দল বিভিন্ন মত প্রচার করেন।

বর্তমানে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য অধিকাংশ উন্নত দেশে গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রবাদীদের প্রাধান্য অনেকটা সুপ্রতিষ্ঠিত। এই দল গণতান্ত্রিক উপায়ে অর্থাৎ দেশের অধিকাংশ নরনারীর সম্মতিক্রমে শান্তিপূর্ণ বৈধ ভাবে সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠন করিতে সচেষ্ট। ভারতের প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্রকে শান্তিপূর্ণ বৈধ উপায়ে ক্রমশঃ সকল বিষয়ে সমাজতান্ত্রিক আকার প্রদান ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের আদর্শ বলিয়া প্রচারিত।

কার্ল মার্কসের প্রবর্তিত সাম্যবাদ ( Communism ) সমাজতন্ত্রবাদেরই একটি শাখা। ইহা অত্যুগ্র শ্রমিক বিপ্লববাদ। এই দলের প্রচারিত নিছক জড়বাদ দ্বারা আধুনিক সকল শ্রেণীর সমাজতন্ত্রবাদিগণ কমবেশী প্রভাবিত। সাম্যবাদিগণ সংঘবদ্ধ শ্রমিকবিদ্রোহ-সহায়ে বলপূর্বক ধনিক ও অভিজাত-শ্রেণীকে একেবারে উচ্ছেদ করিয়া সার্বভৌম শ্রমিক রাষ্ট্র ( Dictatorship of Proletariat ) প্রতিষ্ঠা করিতে বদ্ধপরিকর। এই গণতন্ত্রবিরোধী মতবাদিগণ প্রচলিত আইন-শৃংখলা ও ন্যায়নীতি বিরোধী বলিয়া কোন নিয়মতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও শান্তিকামী ব্যক্তি ইঁহাদের কার্য-প্রণালী সমর্থন করিতে পারেন না। এই মতবাদের দার্শনিকতাও একেবারেই যুক্তি-বিচারসহ নহে। সমাজতান্ত্রিকগণ সাধারণতঃ তাঁহাদের মতবাদকে কোন আধ্যাত্মিক বা দার্শনিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে বিশেষ কোন চেষ্টা করেন নাই। তাঁহাদের মধ্যে অনেকে সেই প্রাচীন কালের 'হিতবাদ' (Utilitarianism)—'অধিকাংশ নরনারীর অধিকতম হিতসাধন নীতি' তাঁহাদের মতের দার্শনিকতা বলিয়া প্রচার করেন। কিন্তু সমাজতন্ত্রবাদ প্রধানতঃ ভোগলক্ষ্যে নিয়ন্ত্রিত এবং সকল নরনারীর ভোগের সাম্যসাধনই ইহার প্রধান আদর্শ। এই কারণে বিশ্বময় অধিকাংশ ভোগপন্থী নরনারীর পক্ষে ভোগস্বার্থ সংকোচ বা ত্যাগ করিয়া 'বহুজনহিতায় যথার্থ হিতবাদী' হওয়া সম্ভব নহে। খৃষ্টান সমাজতন্ত্রবাদিগণ খৃষ্টের সাম্যমূলক উপদেশসমূহকে তাঁহাদের মতবাদের দার্শনিক ভিত্তি বলিয়া প্রচার করিলেও এই মতবাদ খৃষ্টানদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ বলিয়া ইহাকে কার্যে পরিণত করা কোন দেশে এ পর্যন্ত সম্ভব হয় নাই। এ জন্য এই মত অন্যান্য সমাজতন্ত্রবাদীদের দৃষ্টিতে কাল্পনিক ( Utopian )! সমাজতন্ত্রবাদিগণের মধ্যে কার্ল মার্কস্ তৎপ্রচারিত সাম্যবাদকে নিছক জড়বাদমূলক এক অদ্ভুত দার্শনিক ভিত্তির উপর দাঁড় করাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। নিম্নে তাঁহার দার্শনিক মতবাদের সারমর্ম অতি সংক্ষেপে প্রদত্ত হইল :

মার্কস্ তাঁহার প্রসিদ্ধ 'ক্যাপিট্যাল্'-গ্রন্থে লিখিয়াছেন, পদার্থ চৈতন্যশক্তি দ্বারা সৃষ্ট নহে, পরন্তু চৈতন্যশক্তি পদার্থের সর্বোচ্চ সৃষ্টি! তাঁহার মতে জীব বা প্রাণীও এক প্রকার জড়পদার্থবিশেষ! জীবন ( life ) জড়পদার্থের নিত্যগতি ( eternal movement of matter ) -সমুদ্রের একটি তরঙ্গমাত্র! দার্শনিক হেগেল

'ডায়ালেক্‌টিক্‌' নীতি প্রবর্তন করিয়া মনের গতিকে ( movement of mind ) ইহার ভিত্তি বলিয়া প্রতিপন্ন করেন। এই মতের অনুসরণ করিয়াও মার্কস্‌ পদার্থের গতিকে তাঁহার বহু-বিজ্ঞাপিত 'ডায়ালেক্‌টিক্‌' নীতির ভিত্তি বলিয়া প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, পদার্থের পরিমাণ (quantitative ) ও গুণগত ( qualitative ) নিয়ত পরিবর্তনের ( constant change ) সঙ্গে সঙ্গে উহার অবিচ্ছিন্নতাও ( continuity ) সর্বদা ভঙ্গ হইতেছে; উহা এক মুহূর্তে যাহা, পরমুহূর্তে তাহা থাকিতেছে না। তাঁহার মতে এই রূপান্তর বা পরিবর্তন ( change ) আকস্মিক ( sudden ) ভাবে সংসাধিত হইতেছে। মার্কস্‌ বলেন, জাতির ইতিহাস সমাজ ধর্ম সংস্কৃতি শিল্প রীতিনীতি প্রভৃতির পরিবর্তন কোন ভাব বা আদর্শ দ্বারা হয় না, পরন্তু ঐ সকল-বিষয়ক পরিবর্তন—এমন কি মানুষের সকল ভাব বা আদর্শ পর্যন্ত আর্থিক অবস্থা বা অর্থনীতির প্রভাবে উদ্ভূত ও নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে। ইহাই জড়বাদী মার্কসের ইতিহাস ও সমাজবিবর্তনের জড়বাদ-মূলক ব্যাখ্যা ( Materialistic interpretation of the evolution of history and society )। তিনি লিখিয়াছেন, ধনিক ( Capitalist ) ও বুদ্ধিমান অভিজাত-সম্প্রদায় ( Bourgeoisie ) অজ্ঞ জনসাধারণকে বশীভূত রাখিয়া তাহাদিগের সর্বস্ব লুণ্ঠন করিবার উদ্দেশ্যে তাহাদের উপর কাল্পনিক ধর্ম ও নীতিজ্ঞান চাপাইয়া দিয়াছেন! অসহায় অজ্ঞ দরিদ্র জনগণ বুর্জুয়াদের সৃষ্ট পুরোহিত-শ্রেণীর উপদেশে ধর্মরূপ আফিম সেবন করিয়া ঝিমাইতেছে! তিনি বলেন, কোন ভাব বা কল্পনা মানুষকে পরিচালন করে না, পরন্তু প্রাকৃতিক পারিপার্শ্বিক ও শারীরিক প্রয়োজন—বিশেষ করিয়া অর্থনীতি মানুষের সকল ভাব বা কল্পনাকে পরিচালন করে। মোটের উপর তাঁহার মতে মানুষমাত্রই অর্থনীতি বা আর্থিক অবস্থাসৃষ্ট একটি জটিল জড়যন্ত্রবিশেষ। সংক্ষেপতঃ ইহাই জড়বাদী মার্কসের দার্শনিক অভিমত।

এই জড়বাদসর্বস্ব দার্শনিক মত আধুনিক বিজ্ঞান যুক্তিবিচার এবং সকল ধর্ম ও নীতি-বিরুদ্ধ। বর্তমানে বৈজ্ঞানিকগণ চৈতন্যশক্তি হইতে সকল পদার্থ সৃষ্ট এবং পদার্থমাত্রই চৈতন্যশক্তির ঘনীভূত রূপ (bottled up energy) বলিয়া সন্দেহাতীত ভাবে প্রমাণ করিয়াছেন। চৈতন্যশক্তি জড়ের ক্রিয়ামাত্র হইলে প্রাণীর বিচারশক্তি, বুদ্ধির বিকাশ, কর্মে স্বাধীনতা, জ্ঞান ইচ্ছা বিবেক কল্পনা স্মৃতি প্রভৃতি সম্ভব হইত না। কারণ, কোন জড়পদার্থে এইগুলির অভিব্যক্তি নাই। তিনি যে জীবনকে জড়পদার্থের নিত্যগতি বলিয়া প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, উহাও একেবারেই অযৌক্তিক। কেন না, পদার্থের উপাদান পরমাণুর রূপ ও গুণ আছে বলিয়া ইহা স্থূল ও অনিত্য; এই জন্য ইহার গতি নিত্য হইতে পারে না। পরমাণু অচেতন ও জড় বিধায় ইহা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া বুদ্ধি-পূর্বক কোন সামঞ্জস্যপূর্ণ কর্ম করিতেও সম্পূর্ণ অসমর্থ। কাজেই পরমাণুর গতির নিয়ামকরূপে কোন বুদ্ধিবিশিষ্ট চৈতন্যশক্তির অস্তিত্ব অবশ্য স্বীকার্য। এই কারণে পদার্থের গতিভিত্তির উপর তিনি যে, 'ডায়ালেক্‌টিক্‌'-নামধেয় এক অদ্ভুত নীতি দাঁড় করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, উহাও সম্পূর্ণ যুক্তিবিরুদ্ধ। মার্কস্‌ সর্বজনস্বীকৃত ক্রমবিকাশ ও ক্রমসংকোচ নীতি একেবারে অস্বীকার করিয়া বিশ্বপ্রকৃতির অন্তর্গত সকল পরিবর্তনকে ( change ) আকস্মিক এবং ইহাতে প্রাণী ও পদার্থ-মাত্রেরই অবিচ্ছিন্নতা ( continuity ) সর্বদা ভঙ্গ হইতেছে, কাজেই উহা

পূর্বক্ষণে যাহা পরক্ষণে তাহা থাকিতেছে না বলিয়া যে প্রমাণ করিতে প্রয়াস করিয়াছেন, উহাও সম্পূর্ণ যুক্তিবিরুদ্ধ। কারণ, পৃথিবীর সকল জীব ও পদার্থেই ক্রমবিকাশ ও ক্রমসংকোচ-নীতির অভিব্যক্তি দেখা যায়। অভাব-পদার্থ হইতে কোন ভাব-পদার্থের উদ্ভব হইতে দেখা যায় না। বেদান্তদর্শন-মতে "নাশঃ কারণ-লয়ঃ"। এই জন্ত নাশ পদার্থের ক্রমসংকোচিত [illegible] বা কারণ-অবস্থা। ইহার ক্রমবিকশিত স্থূলাবস্থাই কার্য। বীজ হইতে বৃক্ষ এবং বৃক্ষ হইতে বীজ জন্মে। অভাব-পদার্থ হইতে ভাব-পদার্থ জন্মে না, অর্থাৎ যাহাতে যে কারণ নাই, তাহাতে সে কার্য হইতে দেখা যায় না। বেদান্ত বলেন, সৃষ্টি অনাদি বলিয়া এই কার্যকারণ-সম্বন্ধও অনাদি। আকস্মিক পরিবর্তন এবং পরিবর্তনে অবিচ্ছিন্নতা-ভঙ্গ স্বীকার করিলে প্রাণী ও পদার্থের কার্যকারণ-সম্বন্ধ থাকে না। ইহাতে পূর্বক্ষণ ( পূর্ববস্তু ) অভাবগ্রস্ত হয়, এজন্ত ইহা উত্তরক্ষণের ( পরবস্তুর ) কারণ হইতে পারে না। কাজেই শূন্ত হইতে বস্তুর উদ্ভব—অভাব-পদার্থ হইতে ভাব-পদার্থের জন্ম স্বীকার করিতে হয়। ইহা একেবারে প্রমাণবিরুদ্ধ। মার্কস্ জল-স্রোতের দৃষ্টান্ত দিয়া পূর্বক্ষণের জলকে পরক্ষণের জল হইতে বিচ্ছিন্ন বলিয়া প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। ইহাও অযৌক্তিক। কারণ, পূর্বপ্রবাহই পরবর্তী প্রবাহ জন্মায়—উভয় প্রবাহের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিলে প্রবাহই থাকিতে পারে না। পক্ষান্তরে প্রবাহের কারণ উহার অবিচ্ছিন্ন উৎস। বিশ্বময় প্রবাহ-আকারে নিত্য জন্ম-বিনাশের স্রোত বহিতেছে। মার্কস্ ইহা দেখিয়াও দেখেন নাই। সকল পরিবর্তনই আকস্মিক বলিয়া প্রমাণ করিবার উদ্দেশ্যে তিনি পাশ্চাত্ত্য ন্যায়শাস্ত্রের ( Logic ) "রাম না-রাম হয় না" এই সর্বজনস্বীকৃত বৈপরীত্য-নীতির ( Law of Contradiction ) বিরুদ্ধে যে যুক্তি দেখাইয়াছেন, উহাও যুক্তি-বিচারসহ নহে। পূর্বক্ষণের 'রাম' যদি পরক্ষণের 'রাম' না হন, তাহা হইলে শিশু মার্কস্ হইতে বৃদ্ধ মার্কসকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র আর এক ব্যক্তি বলিতে হয়। তিনি জন্ম হইতে মৃত্যু পর্যন্ত নিজকে নিশ্চয়ই এক অবিচ্ছিন্ন 'আমি'রূপে অনুভব করিয়াছেন। তথাপি তিনি আকস্মিকবাদ কি করিয়া প্রচার করিয়াছেন—ইহাই আশ্চর্য। আকস্মিকবাদ ক্ষণিকবিজ্ঞানবাদেরই নামান্তর। এই মতবাদ বহুকাল পূর্বে বেদান্তদর্শনের বহু আচার্য অনেক অকাট্য যুক্তিমূলে সন্তোষজনকভাবে খণ্ডন করিয়াছেন। মার্কস্ এবং তাঁহার মতানুসরণ-কারিগণ ইহা জানিলে এই অযৌক্তিক আকস্মিক-বাদ প্রচার করিতেন না।

একমাত্র অর্থনীতি বা আর্থিক অবস্থাদ্বারাই মানুষের মন হইতে আরম্ভ করিয়া রাষ্ট্র সমাজ ইতিহাস ধর্ম প্রভৃতি সকলই পরিচালিত, মার্কসের এই অভিমতও যুক্তি-বিচার এবং প্রত্যক্ষপ্রমাণ-সিদ্ধ নহে। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র অসংখ্য নরনারী অতীতকালেও অভ্যাস সংযম ও সাধনা দ্বারা তাঁহাদের ইন্দ্রিয়সমূহ বশী-ভূত এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থাকে কমবেশী আয়ত্তা-ধীন করিয়া পরিচালন করিয়াছেন এবং একালেও করিতেছেন। প্রাচীন যুগের রাম কৃষ্ণ বুদ্ধ খৃষ্ট শঙ্কর রামানুজ চৈতন্ত এবং আধুনিক যুগের রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ গান্ধী অরবিন্দ প্রমুখ মহাত্মাগণকে প্রকৃতির দাস এবং অর্থনীতির সৃষ্ট জীব বলিয়া প্রমাণ করিবার চেষ্টা কি পণ্ডশ্রম মাত্র নহে? এই মহাপুরুষদের ভাব ও আদর্শ অগণন নরনারীর জীবন পরিচালন করিতেছে। মার্কস্ ধর্মকে অভিজাত ( Bourgeoisie ) ধনিক ( Capitalist ) শ্রেণীর কায়েমী স্বার্থ-সংরক্ষণের জন্ত পুরোহিতকুলের সৃষ্ট এক উপায়-

বিশেষরূপেই দেখিয়াছেন, কিন্তু মানব-স[illegible] প্রভাতকাল হইতে বর্তমানেও ধর্ম যে অসংখ্য নরনারীকে পশুত্ব হইতে দেবত্বে উন্নীত করিতেছে, বিশ্বময় মানুষের সভ্যতা সংস্কৃতি শিল্প শিক্ষা এবং ন্যায়নীতি প্রভৃতিকে সমৃদ্ধ করিতেছে, শত দুঃখ ও অশান্তির মধ্যেও মানুষকে নিত্য সুখ ও শান্তিলাভের উপায় দেখাইতেছে, মানুষে মানুষে বিন্দুমাত্র অসাম্য সমর্থন না করিয়া সকল বিষয়ে চরম সাম্য প্রতিষ্ঠা করিতে সকলকে উপদেশ দিতেছে, ধর্ম যে কেবল সকল মানুষ নয়, পরন্তু সকল ভূতকে আত্মস্বরূপে দেখিয়া সমদর্শী হইবার মাহাত্ম্য প্রচার করিতেছে, সেদিকে তাঁহার দৃষ্টি কিছুমাত্র আকৃষ্ট হয় নাই।

এই সংক্ষিপ্ত আলোচনায় স্পষ্ট যে, মার্কসের সাম্যবাদের জড়বাদমূলক দার্শনিক ব্যাখ্যা একেবারে অযৌক্তিক বলিয়া ইহা সুশিক্ষিত যুক্তিবাদী ব্যক্তিদের গ্রহণীয় হইতে পারে না। কেবল সাম্যবাদ নয়, অধিকন্তু সমাজতান্ত্রিক কোন মতেরই দার্শনিকতা নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তথাপি যে সমাজতান্ত্রিক সাম্য ক্রমেই সকল দেশে অধিকমাত্রায় প্রভাব বিস্তার করিতেছে, ইহার একমাত্র কারণ, ইহা জাতি-ধর্ম-বর্ণ-শ্রেণী-নির্বিশেষে সকল নরনারীর মধ্যে অর্থনীতিক সাম্যপ্রতিষ্ঠার অত্যন্ত অনুকূল। পক্ষান্তরে ইহাও সত্য যে, সকল দেশেরই সাধারণ নরনারী সকল বিষয়েরই দার্শনিকতা-সম্বন্ধে একেবারে অজ্ঞ। দার্শনিক তত্ত্ব বুঝিবার ক্ষমতা তাহাদের নাই। তাহারা খাওয়া-পরা অর্থাৎ অর্থনীতিকেই প্রধান মনে করে এবং এই সমস্যার সমাধানই তাহাদের প্রধান কাম্য। ইহা অস্বীকার করা যায় না যে, আধুনিক সমাজতন্ত্রবাদের দার্শনিক ভিত্তি যুক্তিবিচারসহ এবং দৃঢ় না হইলেও ইহার সাম্যমূলক অর্থনীতি বিজ্ঞান এবং যুক্তি-বিচারসম্মত। এজন্য ইহা অতি সহজেই দরিদ্র জনসাধারণেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং এই কারণেই ইহা ক্রমেই অধিকমাত্রায় সকল দেশে বিস্তার লাভ করিতেছে। আমাদের মতে সমাজতান্ত্রিক মতবাদের বিজ্ঞানসম্মত অর্থনীতিক সাম্য সম্পূর্ণ বজায় রাখিয়া এই মতবাদকে একটি যুক্তিযুক্ত দার্শনিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিলে ইহা সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ এবং যুক্তিবাদী সত্যসন্ধ সুশিক্ষিত ব্যক্তিগণেরও গ্রহণীয় হইবে।

যুগাচার্য স্বামী বিবেকানন্দের মতে একমাত্র বেদান্তদর্শনই সমাজতন্ত্রবাদের দার্শনিক ভিত্তি হইবার যোগ্য। তিনি লিখিয়াছেন, "All the social upheavalists, at least the leaders of them, are trying to find that *all their communistic* and equalising theories must have a spiritual basis and that basis is Vedanta only."—'মানব-সমাজের উন্নতিকামী ব্যক্তিগণ—অন্ততঃ তাঁহাদের পরিচালকগণ বুঝিতে চেষ্টা করিতেছেন যে, তাঁহাদের ধনসাম্য এবং সমানাধিকারমূলক মতবাদসমূহের একটি আধ্যাত্মিক ভিত্তি থাকা অবশ্য সঙ্গত এবং একমাত্র বেদান্তই সেই ভিত্তি হইবার যোগ্য।' তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলিয়াছেন, "আমি সমাজতন্ত্রবাদী।" তাঁহার গ্রন্থাবলী হইতে বহু বাক্য উদ্ধৃত করিয়া স্পষ্ট দেখান যাইতে পারে যে, তিনি যথার্থ সমাজতন্ত্রবাদীর ন্যায় দেশের সকল সম্পদে জাতিধর্মশ্রেণী-নির্বিশেষে সকল নরনারীর সমান-অধিকার এবং সকল বিষয়ে উন্নতিলাভের সমান-সুযোগ অত্যন্ত জোরের সহিত সমর্থন করিয়াছেন। দেশের দরিদ্র জনগণের উপর মুষ্টিমেয় ধনিকের প্রাধান্য, অবনত অনুন্নত নিম্নশ্রেণীর উপর উচ্চশ্রেণীর প্রভুত্ব, সমষ্টির উপর ব্যষ্টির কর্তৃত্ব তিনি একেবারেই সমর্থন করেন

নাই। স্বামীজি পাহাড় পর্বত অরণ্য হাট বাজার ও দরিদ্রের পর্ণকুটীর হইতে ভবিষ্যৎ ভারতের অভ্যুদয় কামনা করিয়াছেন। তাঁহার সময়ে যে সমাজতান্ত্রিক সাম্য প্রচারিত হইয়াছিল, উহাতে তিনি সন্তুষ্ট ছিলেন না, তিনি উহা অপেক্ষাও উন্নত ধরনের সাম্যের পক্ষপাতী ছিলেন। এ সম্বন্ধে একখানা পত্রে তিনি লিখিয়াছেন, "আমি যে একজন সমাজতন্ত্রবাদী ( Socialist ) তার কারণ এ নয় যে, আমি ঐ মত সম্পূর্ণ নির্ভুল বলে মনে করি, কেবল 'নাই মামার চেয়ে কাণা মামা ভাল'—এই হিসেবে।" স্বামীজি সমাজতন্ত্রবাদ এবং সম্ভবতঃ মার্কসের সাম্যবাদের সহিতও পরিচিত ছিলেন। তিনি জানিতেন যে, এই মতবাদসমূহের অর্থনীতিক ভিত্তি বিজ্ঞান-সম্মত হইলেও ইহাদের দার্শনিক ভিত্তি নিছক জড়বাদমূলক এবং যুক্তিবিচারসহ নহে। পক্ষান্তরে সমাজতন্ত্রবাদিগণ কেবল অর্থনীতিক সাম্যের উপরই সমধিক গুরুত্ব প্রদান করেন। তিনি ( স্বামীজী ) কেবল অর্থনীতি নয় পরন্তু মানব-জীবনের সকল বিভাগ—এমন কি ব্যক্তিমাত্রেরই প্রাত্যহিক জীবন পর্যন্ত চরম সাম্যের নির্দেশে পরিচালন করিতে চাহিয়াছিলেন। এই সকল কারণে তিনি তাঁহার সময়ে প্রচলিত সমাজতন্ত্রবাদ সর্বাংশে সমর্থন করিতে পারেন নাই।

দর্শন-শিরোমণি বেদান্তে যে সাম্য পরিস্ফুট উহা অপেক্ষা উন্নত সাম্য মানুষ কল্পনায় স্থান দিতেও যথার্থই অসমর্থ। এই মহান দর্শন বলেন, জগতের সকল নরনারী সকল জ্ঞান ও শক্তির আধার এবং নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বরূপ একই আত্মার বহুরূপ—মানুষ কেবল মানুষের ভাই নয়, অধিকন্তু আত্মার দিক দিয়া সকল জীব সম্পূর্ণ এক ও অভেদ। মানুষে মানুষে বৈষম্য—জীবে জীবে পার্থক্য কেবল আত্মশক্তিপ্রকাশের তারতম্যে। এই বেদান্তবেদ্য চরম সাম্যনীতি সকল ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিবার জন্য তিনি সকলকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, "কি সামাজিক, কি রাজনীতিক, কি আধ্যাত্মিক সকল ক্ষেত্রেই যথার্থ মঙ্গল-স্থাপনের একটিমাত্র সূত্র বিদ্যমান—সে সূত্র হইতেছে এই টুকু জানা যে, 'আমি ও আমার ভাই এক।' সর্ব্বদেশে সর্ব্বজাতির পক্ষে এই সত্য সমভাবে প্রযোজ্য।"

বেদান্তের এই চরম সাম্যে বিশ্বাসী হইলে কোন প্রকারে কাহারও অনিষ্ট করা কখনও সম্ভব হইবে না। ঈশোপনিষৎ বলেন, "যিনি সকল ভূতকে আত্মস্বরূপে দেখেন, তিনি কাহাকেও ঘৃণা করিতে পারেন না।" কারণ, এরূপ ক্ষেত্রে অপরকে ঘৃণা করা বা অপরের অনিষ্ট করা, আর আপনি আপনাকে ঘৃণা করা বা আপনি আপনার অনিষ্ট করা—একই কথা। জড়বাদ-মূলক সমাজতন্ত্রবাদ মানুষকে অর্থনীতির সৃষ্ট চৈতন্যশক্তিবিশিষ্ট এক প্রকার জড়জীববিশেষ-রূপে দেখিতে এবং তাহার সঙ্গে জড়বস্তুর ন্যায় আচরণ করিতে শিক্ষা দেয়। এইজন্য বিশ্বময় সমাজতন্ত্রবাদের ক্রমবর্ধমান প্রসার সত্ত্বেও জাতির প্রতি জাতির ব্যবহারে কোন পরিবর্তন—ব্যক্তির প্রতি ব্যক্তির আচরণে কোন শ্রদ্ধা দেখা যাইতেছে না। এক জড়পদার্থ অপর জড়পদার্থের প্রতি কখনও শ্রদ্ধা দেখায় না—দেখাইতে পারেও না। পক্ষান্তরে বেদান্তের জীবব্রহ্মবাদ মানুষকে মানুষের নিকট যেরূপ সম্মানের উচ্চশিখরে অধিষ্ঠিত করিয়াছে, এরূপ আর কোন মতবাদে দেখা যায় না। এই মহান্ দর্শন-মতে মানুষ কেবল পঞ্চভূতের সমবায়ে সৃষ্ট নশ্বর জীবমাত্র নয়, পরন্তু আত্মার দিক দিয়া নররূপে নারায়ণ—জীবরূপে শিব। সুতরাং মানুষকে সম্মান আর নারায়ণকে সম্মান—অপর মানুষকে সম্মান আর আপনাকে সম্মান—একই কথা। স্বামী

বিবেকানন্দ এই বৈদান্তিক সাম্যকে সমাজতান্ত্রিক সাম্যবাদের যুক্তিপূর্ণ দার্শনিক ভিত্তিস্বরূপে গ্রহণ করিয়া সকল ক্ষেত্রে ইহা প্রয়োগ করিতে উপদেশ দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, "বেদান্তের মহান তত্ত্ব কেবল অরণ্য ও পর্ব্বতগুহায় আবদ্ধ থাকিবে না। বিচারালয়ে, ভজনালয়ে, দরিদ্রের কুটিরে, মৎস্যজীবীর গৃহে, ছাত্রের অধ্যয়নাগারে—সর্ব্বত্র এই তত্ত্ব আলোচিত ও কার্য্যে পরিণত হইবে। প্রত্যেক নরনারী, প্রত্যেক বালিক-বালিকা যে যে-কার্য্যই করুক না কেন, যে যে-অবস্থায়ই থাকুক না কেন, সর্ব্বত্র বেদান্তের প্রভাব বিস্তৃত হওয়া আবশ্যক।" তাঁহার এই নির্দেশ-অনুসারে দেশের অধিকাংশ নরনারীর ভিতর ও বাহির বৈদান্তিক সাম্য দ্বারা প্রভাবিত হইলে সমগ্র জাতি আপনা আপনি সকল বিষয়ে সাম্য-মৈত্রীর দিকে নিশ্চয়ই অগ্রসর হইবে। বেদান্ত বলেন, "সমতা সর্বভূতেষু এতন্মুক্তস্য লক্ষণম্"—'সর্বভূতে সমতা বা সমদর্শনই মুক্তির লক্ষণ।'

ইহা দ্বারা স্পষ্টরূপে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, বেদান্তের ন্যায় সকল বিষয়ে চূড়ান্ত সাম্য আর কোন শাস্ত্র এরূপ উচ্চকণ্ঠে প্রচার করেন না। ইহার তুল্য যুক্তিবিচারসহ ও আধুনিক বিজ্ঞান-সম্মত সম্পূর্ণ অসাম্প্রদায়িক দর্শন আর নাই। এই মহান দর্শন প্রচার করেন, "সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম",—'জগতের সকলই ব্রহ্ম।' অজ্ঞান দূর হইলে এই অদ্বৈতজ্ঞান ফুটিয়া উঠে এবং তখন সাধক সর্বভূতে সমদর্শন বা ব্রহ্মদর্শন করেন। বেদান্তমতে এই অবস্থায় উপনীত হওয়াই মানুষের সর্বোচ্চ আদর্শ। সমাজতন্ত্রবাদ বেদান্তের চরম সাম্য সমত্ব একত্ব ও অভেদত্বের সুদৃঢ় দার্শনিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইলে ইহার যথাযথ অনুসরণে সকল নরনারী যে ঐ অত্যুচ্চ আদর্শের দিকে অগ্রসর হইবার এবং উহাকে দৈনন্দিন কর্মজীবনে প্রয়োগ করিবার কার্যতঃ সুযোগ পাইবে, ইহাতে আর সন্দেহ নাই।

---

# শ্রীশ্রীমা

শ্রীউপেন্দ্র রাহা

যদিও ছিলনা তব কোনও সন্তান,
কোটি সন্তানের তবু তুমি মা-জননী;
তব মাতৃ-হৃদয়ের স্নেহ-প্রস্রবণ
নির্ঝরিত নিত্যকাল, মা সারদামণি!

দেহের সম্বন্ধাতীত সাত্ত্বিক মিলনে
নিত্যলীলা সহচরী শ্রীরামকৃষ্ণের,
স্বামীর প্রভাবপূত সাধনার ধনে
চিরৈশ্বর্য্যময়ী দেবী, পুণ্য ভারতের।

তপঃশুদ্ধ মাতৃমূর্ত্তি ভারত-আত্মার,
আনন্দরূপিণী তুমি ভুবন-বন্দিতা,
মাতৃরূপে লভি পূজা পতি-দেবতার
অখণ্ড মাতৃত্বে হ'লে পূর্ণ-প্রতিষ্ঠিতা।

নহ কন্যা, নহ বধূ, মাতা চিরন্তনী
বিশ্ব-মানবের তুমি, মা সারদামণি!

---

# অদ্বৈত-বেদান্ত ও আধুনিক বিজ্ঞান

শ্রীসুধীরবিজয় সেনগুপ্ত

আত্মদর্শনই ভারতীয় দর্শনের মূল লক্ষ্য। প্রাচীনযুগে ভারতবর্ষে ঋষিগণ আত্মদর্শন করে সত্যদ্রষ্টা হয়েছিলেন। তাঁরা নিজেদের মধ্যে সমস্ত বিশ্বের ছায়া অবলোকন করেছিলেন। সারা ব্রহ্মাণ্ডের নিগূঢ় রহস্য তাঁদের হৃদয়ে ব্যক্ত হয়েছিল। তাঁদের সে উপলব্ধি তাঁরা পরবর্তীদের আত্মোপলব্ধির জন্য বলে গিয়েছেন। সে জ্ঞান (বেদ) তাঁরা শিষ্যদের মুখে মুখে অভ্যাস করিয়েছিলেন বলে এর অপর নাম শ্রুতি। ঋষিরা তাঁদের জ্ঞান নিজেদের ব্যক্তিত্ব দিয়ে গড়ে তুলেন নি। তাঁদের হৃদয়ে প্রকৃত সত্য এমনিই প্রতিভাত হয়েছিল বলে বেদকে অপৌরুষেয় বলা হয়ে থাকে। ভারতীয় দর্শন-সাধনার আদিমতম সংকলন এই বেদ। বেদের চরমভাগই বেদান্ত।

বৈদিক সংহিতায় দেবতাদের স্তুতি করা হয়েছে। ঐ সব স্তুতিতে আমরা দেবতাগণের স্বভাব কার্য্যাদি ও রূপের বর্ণনা দেখি। সেখানে দেবতাদের উদ্দেশে যাগযজ্ঞের বিধানও আছে। এটাকে আমরা জ্ঞানের প্রাথমিক স্তর বলতে পারি। তারপর আরণ্যকে মানসিক উপকরণে দেবতাদের পূজার বিবরণ আমরা দেখতে পাই। এটা জ্ঞানের দ্বিতীয় স্তর। পরে তৃতীয় স্তরে এই চিন্তাধারা উপনিষদে এসে প্রকৃত দার্শনিক রূপ ধরে।[1] কাজেই উপনিষদেরই অপর নাম বেদান্ত।

এ ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি-সম্বন্ধে উপনিষদে আমরা দেখতে পাই যে, "সৃষ্টির পূর্ব্বে এই জগৎ একমাত্র আত্মাই ছিল, অর্থাৎ বিবিধ বৈচিত্র্যবিশিষ্ট এই জগৎসৃষ্টির পূর্ব্বে এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মস্বরূপেই ছিল; তদ্ভিন্ন সক্রিয় অন্য কিছুই ছিল না। তিনি আলোচনা (চিন্তা) করিলেন—আমি অম্ভ প্রভৃতি লোক সৃষ্টি করিব।"[2] সৃষ্টির পূর্ব্বের আত্মা ও আজকের আত্মা বিভিন্ন নন যদিও তাদের অবস্থার মধ্যে সামান্য তফাৎ আছে। সৃষ্টির পূর্ব্বের আত্মা ছিলেন অব্যক্ত আর এখন তিনি ব্যক্ত। সেই অব্যক্ত একাত্মা চিন্তা করলেন—"আমি বহু হব"। এরূপ চিন্তা করে তিনি নিজেকে

১ "উপনিষদে যে চিন্তাধারা পরিপূর্ণরূপে দেখা দিয়াছে ঋগ্বেদ সংহিতা প্রভৃতি প্রাচীন বৈদিক সাহিত্যেই তাহার বীজ নিহিত আছে। বৈদিক সংহিতায় বেদোক্ত দেবতার স্তুতি নিবদ্ধ হইয়াছে। ঐসকল স্তুতিবাদের মধ্যে দেবতাবর্গের স্বরূপ, স্বভাব ও কার্য্যাবলী আলোচিত হইয়াছে। ব্রাহ্মণে ঐ সকল দেবতার উদ্দেশ্যে যাগযজ্ঞের বিধান বর্ণিত হইয়াছে। ইহা কর্ম্মযজ্ঞ। সংহিতার এই কর্ম্মযজ্ঞ আরণ্যকে ভাবনাযজ্ঞে রূপান্তরিত হইয়াছে। সেখানে আমরা দেখিতে পাই যে যজ্ঞীয় দ্রব্য সংগ্রহের কোন আড়ম্বর নাই। আরণ্যক সাধক মানস উপকরণে তাঁহার জ্ঞানযজ্ঞ সম্পাদন করিতেছেন। আরণ্যকের চিন্তা প্রতীক বস্তুতেই নিবদ্ধ রহিয়াছে। প্রতীককে ছাড়িয়া ঐ চিন্তা তখনও উচ্চতম সোপানে আরোহণ করে নাই। উপনিষদে ঐ চিন্তা পূর্ণতাপ্রাপ্ত হইয়াছে। নাম ও রূপের রাজ্য ছাড়িয়া চিন্তার প্রবাহ তখন অরূপের সন্ধানে ছুটিয়া চলিয়াছে এবং নিরাকার নির্ব্বিকার চিৎসমুদ্রে বিলীন হইয়া নিজেকে হারাইয়া ফেলিয়াছে। সংহিতা ও ব্রাহ্মণের কর্ম্ম-বিজ্ঞান আরণ্যক ও উপনিষদে ব্রহ্মবিজ্ঞানে পর্য্যবসিত হইয়াছে।" 'বেদান্তদর্শন—অদ্বৈতবাদ'—ডক্টর শ্রীআশুতোষ শাস্ত্রী

২ আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ।
নান্যৎ কিঞ্চন মিষৎ।
স ঈক্ষত লোকান্ নু সৃজা ইতি ॥ ঐতরেয়োপনিষদ্

বস্তুতে পরিণত করলেন। ঐরূপ চিন্তার পর অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ড-নির্মাণের পর "সেই আত্মা অম্ভঃ (জল), মরীচি, মর ও অপ্ এই চারিটি লোক সৃষ্টি করিলেন। ঐ অম্ভলোকটি দ্যুলোকের উপরে এবং দ্যুলোকে অবস্থিত; এই অন্তরিক্ষ বা আকাশই মরীচি। এই পৃথিবী মরলোক, এই পৃথিবীর নিম্নে যে সমস্ত লোক, সে সমুদয় অপ্‌লোক-নামে অভিহিত।"[৩] "তিনি পুনরায় চিন্তা করিতে লাগিলেন—(পালকের অভাবে এই সমস্ত লোক) বিনষ্ট হইয়া যাইবে; অতএব লোকপাল-সমূহ সৃষ্টি করিব। (ইহার পর) তিনি জলপ্রধান পঞ্চভূত হইতেই পুরুষ উৎপাদন করিয়া অবয়বাদি সংযোজন-পূর্ব্বক তাহার বৃদ্ধিসাধন করিলেন।"[৪] এর পর আমরা দেখি যে, পরমেশ্বর জগৎসৃষ্টি করার পর তাঁর সৃষ্ট জগতে নিজেই প্রবেশ করে তাতে প্রাণসঞ্চার করলেন। "সেই পরমেশ্বর চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, আমার অভাবে অর্থাৎ আমি ইহার (সৃষ্টির) অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট না থাকিলে আমার সৃষ্ট এই দেহেন্দ্রিয়-সমষ্টি কি প্রকারে থাকিবে? তিনি চিন্তা করিলেন যদি বাগিন্দ্রিয়ই শব্দোচ্চারণ করিল, যদি প্রাণ প্রাণন (জীবনকার্য্য-সম্পাদন) করিল, যদি চক্ষুই দর্শন করিল, যদি শ্রবণেন্দ্রিয় শ্রবণকার্য্য করিল, যদি ত্বগিন্দ্রিয় স্পর্শনকার্য্য করিল, মনই যদি ধ্যান করিল, অপান যদি অধোনয়ন করিল এবং শিশ্নই যদি রেতোবিসর্জ্জন করিল, তাহা হইলে আমি কে?"[৫] "এইরূপ চিন্তার পর পরমেশ্বর মূর্দ্ধদেশ-বিদারণপূর্ব্বক সেই পথে দেহে প্রবেশ করিলেন।"[৬]

বাহ্যজগৎকে আমরা দুটি ভাগে বিভক্ত করতে পারি। প্রথমটি চেতন প্রাণ ও দ্বিতীয়টি অচেতন জড়। উপনিষদের মতে চেতন ও অচেতন এ দু'য়েরই সৃষ্টিকর্ত্তা পরমব্রহ্ম এবং এ চেতন-অচেতন জগৎ পরমব্রহ্মেরই দুটি রূপ। পরমব্রহ্ম তাই তাঁর সৃষ্ট চেতন-অচেতন জগতে ওতপ্রোতভাবে মিশে রয়েছেন।

অদ্বৈত-বেদান্তের মতে জগৎ মায়িক, অর্থাৎ পরমব্রহ্ম তাঁর মায়াদ্বারাই এ জগৎ সৃষ্টি করেছেন। কেন না যা সত্য তা অপরিবর্ত্তনীয়। আমরা যে জগতের সঙ্গে পরিচিত তা নিত্যপরিবর্ত্তনশীল, কাজেই মায়িক। ডক্টর শ্রীআশুতোষ শাস্ত্রী তাঁর 'বেদান্তদর্শনে' জগতের মিথ্যাত্ব-সম্বন্ধে আচার্য্য গৌড়পাদদর্শন-প্রসঙ্গে লিখেছেন—"আচার্য্য গৌড়-পাদ আগমপ্রকরণে অদ্বিতীয় আত্মতত্ত্ব-সিদ্ধির অনুকূল জগতের মিথ্যাত্ব-সাধন করিয়াছেন। তাঁহার মতে স্বপ্নদৃশ্য বস্তুগুলি যেমন মিথ্যা, জাগরিত অবস্থায় যে সকল বস্তু দেখিতে পাওয়া যায় তাহাও সেইরূপ মিথ্যা। স্বপ্নে আমরা নানারূপ অদ্ভুত বস্তু প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি। আমার দেহের মধ্যে একটা হাতী প্রবেশ করিল, আমার নিজের মাথাটাই দেহ হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়িয়া গেল। এইরূপ আরও কত কি অদ্ভুত দৃশ্য স্বপ্নাবস্থায় আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়।… …স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেলে ঐ সকল দৃশ্য বস্তুর কোন অস্তিত্বই খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।…… স্বপ্নদৃষ্ট বস্তুসমূহ যে কল্পিত ও মিথ্যা,

৩ স ইমাঁল্লোকানসৃজত।
অম্ভো মরীচীর্ম্মরমাপোঽদোঽম্ভঃ পরেণ
দিবং দ্যৌঃ প্রতিষ্ঠান্তরিক্ষং মরীচয়ঃ।
পৃথিবী মরো যা অধস্তাত্তা আপঃ। ঐতরেয়োপনিষদ্

৪ স ঈক্ষতেমে নু লোকা লোকপালান্নু সৃজা ইতি।
সোঽদ্ভ্য এব পুরুষং সমুদ্ধৃত্যামূর্চ্ছয়ৎ। ঐতরেয়োপনিষদ্

৫ স ঈক্ষত কথং ন্বিদং মদৃতে স্যাদিতি; স ঈক্ষত কতরেণ প্রপদ্যা ইতি। স ঈক্ষত যদি বাচাভিব্যাহৃতং যদি প্রাণেনাভি-প্রাণিতং যদি চক্ষুষা দৃষ্টং যদি শ্রোত্রেণ শ্রুতং যদি ত্বচা স্পৃষ্টং যদি মনসা ধ্যাতং যদ্যপানেনাভ্যপানিতং যদি শিশ্নেন বিসৃষ্টমথ কোঽহমিতি। ঐতরেয়োপনিষদ্

৬ স এতমেব সীমানং বিদার্য্যৈতয়া দ্বারা প্রাপদ্যত।
ঐতরেয়োপনিষদ্

তাহা শ্রুতিও স্পষ্টতঃ আমাদিগকে বুঝাইয়া দিয়াছেন।……স্বপ্নদৃশ্য বস্তুর মিথ্যাত্বশ্রুতিও যুক্তি-সিদ্ধ-বিধায় স্বপ্নদৃশ্য বস্তুকে দৃষ্টান্তরূপে উপন্যাস করিয়া দৃশ্যত্বহেতুমূলে অনুমানপ্রমাণের সাহায্যে জাগরিত অবস্থায় যে সকল বস্তু দেখিতে পাওয়া যায় তাহারও মিথ্যাত্ব-সাধন করা যাইতে পারে। এই মিথ্যাত্বের মূলে দেখা যাইবে যে দৃশ্যমাত্রই মিথ্যা। স্বপ্নের দৃশ্যও দৃশ্য, জাগরিত অবস্থার দৃশ্যও দৃশ্য, উভয়ের মধ্যেই দৃশ্যত্বরূপ সামান্য ধর্ম বিদ্যমান; পার্থক্য এই যে, স্বপ্নদৃশ্য বস্তু স্বপ্নদর্শীর মানসসৃষ্টি বলিয়া তাহার মনোজগতেই ঐ সকল স্বপ্নদৃশ্য বস্তু বিরাজ করে, স্বপ্নদর্শীর মনের বাহিরে ঐ সকল বস্তুর কোনই অস্তিত্ব নাই।…… যাহা কল্পিত তাহাই মিথ্যা, সুতরাং এই হিসাবে স্বপ্নদৃশ্য পদার্থের ন্যায় জাগ্রদদৃশ্য বিশ্বপ্রপঞ্চকেই বা মিথ্যা বলিব না কেন? স্বপ্নসৃষ্টি জীবের নিজ মনের কল্পনা, সুতরাং জীব স্বপ্নসৃষ্টির অসত্যতা বুঝিতে পারে। বিশ্বসৃষ্টি জীবের মানসকল্পনা নহে, পরমেশ্বরের মানসকল্পনা। জীবের জীবত্বের মূলেও ঐ কল্পনাই বিরাজমান, সুতরাং মায়াকল্পিত জীব মায়িক সৃষ্টির অসত্যতা বুঝিবে কিরূপে? বিশ্বসৃষ্টির অসত্যতা বুঝিতে হইলে স্বীয় জীবভাবেরও অসত্যতা প্রত্যক্ষ করিতে হয়। জীবভাব বিদ্যমান থাকিতে জীবভাবের অসত্যতা বুঝা যায় না। সেইরূপ যে পর্য্যন্ত দ্বৈতবুদ্ধি বা ভেদবুদ্ধি বিদ্যমান থাকিবে, সেই পর্য্যন্ত বিশ্ব-প্রপঞ্চের মিথ্যাত্ব বুঝা যাইবে না। এইজন্যে অজ্ঞ জীব বিশ্বকে সত্য বলিয়াই মনে করে। বস্তুর পক্ষে ইহা সত্য নহে মিথ্যা।……স্বপ্ন অবস্থার পান, ভোজন জাগরিত অবস্থায় বাধাপ্রাপ্ত হয়, সুতরাং তাহা যেমন মিথ্যা, সেইরূপ জাগরিত অবস্থার পান, ভোজনও স্বপ্নাবস্থায় বাধিত হয় বলিয়া তাহাকেই বা মিথ্যা বলিতে বাধা কি? মোট কথা যাহা বাধিত হয় তাহাই মিথ্যা। কি স্বপ্নদৃশ্য, কি জাগ্রদদৃশ্য, বস্তুমাত্রই কোন না কোন অবস্থায় বাধিত হয় সুতরাং তাহা মিথ্যাই হইবে। ……আচার্য গৌড়পাদের ভাষায় পরিদৃশ্যমান নিখিল বিশ্বই শুক্তিতে রজত-বিভ্রমের ন্যায়, স্বপ্নদৃষ্ট পদার্থের ন্যায়, শূন্যে নগরকল্পনার ন্যায় অলীক কল্পনামাত্র। জগৎ বস্তুতঃ অলীক হইলেও সত্যস্বরূপ পরমাত্মায় অধিষ্ঠিত, সুতরাং সত্য বলিয়াই মনে হইয়া থাকে।" আচার্য্য শঙ্করও জগতের মিথ্যাত্ব প্রমাণ করেছেন। আচার্য্য শঙ্করেরও ইহাই মত যে, ভেদবুদ্ধির জন্যেই আমরা ব্রহ্মের দ্বৈতরূপ দেখি।

মোট কথা অদ্বৈত-বেদান্তের মতে আমরা জগতের মায়িক রূপ দেখি। তবে এই মায়িক জগতেরই অভ্যন্তরে অপরিবর্তনশীল ব্রহ্ম রয়েছেন। 'আত্মজ্ঞান'-লাভ করলেই আমরা তাঁর সহিত মিশে যেতে পারি।

এখন বিজ্ঞানের ভিত্তিতে বিশ্বরহস্য বুঝতে চেষ্টা করব। বিজ্ঞানের প্রাথমিক দৃষ্টিতে জগতের উপাদানগুলি বিরানব্বইটি ভাগে বিভক্ত। এদের মৌলিক পদার্থ বলা হয়। এই বিরানব্বইটি মৌলিক পদার্থের বিভিন্ন সমবায়ে আমাদের ব্রহ্মাণ্ড গঠিত। বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে জড় ও চেতন বিভিন্ন বস্তু নয়। জড় পদার্থেরই একটি বিশেষ অবস্থার নাম চেতনা। কাজেই বিজ্ঞানের মতে জড়পদার্থের বিশ্লেষণেই আমরা সারা বিশ্বের গঠনতত্ত্ব বুঝতে পারি।

বিজ্ঞানের মৌলিক পদার্থগুলির নাম পরমাণু। পরমাণুগুলির ভেতরে আছে প্রধানতঃ ইলেকট্রন্ বা ঋণবিদ্যুৎকণা, প্রটন বা ধনবিদ্যুৎকণা, বিদ্যুদ্-গুণহীন নিউট্রন্ ও ধনবিদ্যুদ্গুণবিশিষ্ট পজিট্রন্। এর মধ্যে প্রটন্ ও নিউট্রনের সামান্য ওজন আছে, কিন্তু ইলেকট্রন্ ও পজিট্রনের ওজন প্রায় নেই বললেই চলে।

পরমাণুগুলি যেন সৌরজগতেরই এক একটি

ক্ষুদ্র প্রতিচ্ছায়া। যেরূপ সৌরজগতের কেন্দ্রে সূর্য্যের অবস্থিতি, সেরূপ পরমাণুগুলির কেন্দ্র প্রটন্ নিউট্রন্ ও পজিট্রনের অবস্থানস্থল। পরমাণুগুলির কেন্দ্রকে তাদের নিউক্লিয়াস্ বলা হয়। এই নিউক্লিয়াসকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন ভ্রমণকক্ষে বিভিন্নসংখ্যক ইলেকট্রন্ অনবরত ঘূর্ণিত হচ্ছে। এই ডিম্বাকার ভ্রমণপথগুলি বিভিন্ন পরিমাপের। কোন্ ভ্রমণপথে কোন্ অবস্থায় কতগুলি ইলেকট্রন নিজেদের স্থান সংকুলান করে নিতে পারে তা বিজ্ঞানীরা বের করেছেন। পরমাণুগুলির নিউক্লিয়াস্ থেকে দূরতম কক্ষে ইলেকট্রনের সংখ্যার উপর সেই পরমাণুর কার্য্যকরী ক্ষমতা, অর্থাৎ অন্য পরমাণুর সহিত মিশে নূতন অণু-গঠন নির্ভর করে। প্রত্যেক মৌলিক পদার্থের পরমাণুর ভেতর ইলেকট্রন্ প্রটন্ প্রভৃতির সংখ্যা ও তাদের অবস্থানভঙ্গি বিশেষ ধরনের বলেই বিভিন্ন মৌলিক পদার্থের পরমাণুগুলিও বিভিন্ন। কাজেই বিশেষ মৌলিক পদার্থের পরমাণুর ইলেকট্রন্ প্রটন্ প্রভৃতির সংখ্যা ও অবস্থানের তারতম্য ঘটিয়ে তাকে অন্য মৌলিক পদার্থে রূপান্তরিত করা সম্ভব এবং তা করাও হয়েছে।

কাজেই বিজ্ঞানের মতে সারা ব্রহ্মাণ্ডের প্রাথমিক উপাদান ইলেকট্রন্ প্রটন্ প্রভৃতি। ইলেকট্রন্ প্রটন্ প্রভৃতি প্রাথমিক দৃষ্টিতে কণাধর্ম্মী, তারা অনেকটা বলের মত। কিন্তু এদের সব সময়ই কণাধর্ম্মী বলে ধরে নিলে প্রাকৃতিক সবগুলো ঘটনা ব্যাখ্যা করা যায় না। কাজেই বিজ্ঞানীরা ভাবতে লাগলেন যে, পদার্থের কণাধর্ম্মই সব নয়।[১] অধ্যাপক ডি ব্রগলি ( De Broglie ) গণিতের ভিত্তিতে প্রমাণ করলেন যে ইলেকট্রন্ প্রভৃতি প্রকৃতপক্ষে তরঙ্গধর্ম্মী। কাজেই বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে সারা ব্রহ্মাণ্ড আজ তরঙ্গে রূপান্বিত।

জগতের মায়িকতা-সম্বন্ধে অদ্বৈত-বেদান্ত ও বিজ্ঞানের মত এক। বিজ্ঞানও বলে যে বাহ্যজগৎ-সম্বন্ধে আমাদের সাধারণ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। আমাদের ইন্দ্রিয় প্রকৃত জগতের ধারণা জন্মাতে অক্ষম।

অদ্বৈত-বেদান্তের মতে বাহ্যজগৎ-সম্বন্ধে আমাদের ধারণা অবিদ্যাপ্রসূত। অর্থাৎ আমাদের মন অজ্ঞানান্ধকারে নিমজ্জিত আছে বলে ভুল ধারণাকেই সত্য বলে ধরে নেয়। যেদিন আমাদের মন তার প্রকৃতরূপ ফিরে পাবে, সে দিনই সে বাহ্যপ্রকৃতি-সম্বন্ধে প্রকৃত জ্ঞান লাভ করবে। ফলে মায়াপ্রসূত ভেদজ্ঞান তার মন থেকে মুছে যাবে। সারা বিশ্বের আদি-কারণ অদ্বৈত ব্রহ্ম তার হৃদয়ে সেদিন প্রতিভাত হয়ে উঠবেন। অদ্বৈত-বেদান্তের মতে যৌগিক উপায়ে অবিদ্যা দূর করে মানুষের ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করা সম্ভব। আর ব্রহ্মকে জানা-ই মানবজীবনের মূল লক্ষ্য।

জগৎ-সম্বন্ধে বিজ্ঞানের জ্ঞানধারা যন্ত্রপ্রভাবে চালিত হয়ে আজ গণিতের রাজ্যে এসে ঠেকেছে। কাজেই জ্ঞানের সঙ্গে মানুষের সত্তার সম্বন্ধ কোথায় তা বিজ্ঞান আজও নির্দ্ধারণ করতে পারে নি। প্রগতিশালী বিজ্ঞানের ভবিষ্যতেই হয়ত সে রহস্যও নিহিত আছে।

কাজেই বিশ্বপ্রপঞ্চ-সম্বন্ধে বিজ্ঞানীর মত আজ অদ্বৈতবেদান্তীর মতের কাছাকাছি বললে খুব অসঙ্গত কিছু বলা হবে না।

[১] In the same way the picture of matter as a collection of minute particles, namely electrons and nuclei, explained some but not all of its properties, and these were mainly the large-scale properties. De Broglie suspected that a wave picture might be needed to explain the remainder."—The New Background of Science—by James Jeans

# শ্রীরামকৃষ্ণ

শ্রীজগদিন্দ্রচন্দ্র বসু

প্রণাম তোমারে হে রামকৃষ্ণ, মহাভারতের প্রাণ,
পরব্রহ্মের সহিত মিলিয়া হয়েছো জ্যোতিষ্মান!
দিয়ে গেছ তুমি পথের হদিস হিংসার পৃথিবীরে,
প্রেমের স্বর্গ রচিয়া গিয়েছো পবিত্র গঙ্গার তীরে।
মানোনি ধর্ম্ম, জাতির বিচার, তুমি ছিলে নির্ভয়,
সব ধরমের তাইতো সাধন করেছো সমন্বয়।
তোমার বাণীতে জেনেছে মানুষ ঈশ্বর এক জন—
তাঁহারে ডাকিতে আছে মত পথ অসংখ্য অগণন!
মহাভারতের শাশ্বত বাণী শুনায়ে জগৎজনে,
অক্ষয় তুমি করে গেছ তারে বিশ্বজনের মনে।
তোমারে চিনেছে মাটির পৃথিবী, ভোলে নাই তব বাণী,
তুমি নাই তবু রহিছ রহিবে, সন্দেহ নাহি মানি।

যুগে যুগে তুমি এসেছ ধরায় মুক্তিপ্রদীপ হাতে,
সহেছ গো ঘৃণা কাঁপো নাই তবু বিমুগ্ধ বেদনাতে।
বিশ্বমায়ের চরণে স'পিয়া ভাল ও মন্দ সব
জীবন ভরিয়া করে গেছ শুধু সাধনা-জপ-স্তব!
পশ্চিমে তুমি ছড়ায়ে দিয়েছো ভারতাত্মার বাণী,
ত্যাগের মন্ত্রে খুলিতে বলেছ স্বার্থের দ্বারখানি।
দিয়ে গেছ তুমি প্রজ্ঞার আলো—তুলনা তাহার নাই,
বলে গেছ ওরে—মানুষের মাঝে ঈশ্বর আছে ভাই!
সেদিন সে কথা যাহারা করেছে উপেক্ষা ঘৃণাভরে,
তারা প্রচারিছে আবার সে বাণী পৃথিবীর ঘরে ঘরে!
আজো ভুলে নাই মাটির পৃথিবী স্বামীজীর আহ্বান:
ভুলেনি ভগিনী নিবেদিতার ভালবাসা স্নেহ দান!

তুমি এসেছিলে গৌতম ও যীশু শ্রীচৈতন্যরূপে,
এই পৃথিবীর পাপের পঙ্কে একা একা, চুপে চুপে।
বিধাতা কোথায়? স্বর্গের বাণী মানুষই তো বয়ে আনে;
অন্ধকারের করে যায় শেষ নিজের জীবন-দানে!
ভগবান আসে অস্থির ভাবে দুঃখে কাঁদিয়া যায়,
মূর্খ অবোধ ভীরু মানুষেরা তবুও বোঝে না হায়!
জীবনে পায় না কোন সমাদর, পায় যা তুচ্ছ অতি
মরণে জানায় সহস্র আঁখি প্রণাম তাঁহার প্রতি।
এ ভুলের শেষ আজো কি হবে না? বলগো যুগাবতার,
তোমারে জেনে কি আজো জানিব না ইতিহাস সত্তার?
তোমার ধ্যানের তীর্থ আমার খুলিছে মানসচোখ
তোমার অমৃত বাণী পৃথিবীতে চির অক্ষয় হোক।

# স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ*

শ্রীসি রামানুজাচারী

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণের প্রথম শিষ্যগোষ্ঠীর অন্যতম। মাদ্রাজ রামকৃষ্ণ মিশনের প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা-ভার তাঁহারই উপর অর্পিত হয়। আজ সর্বত্রই—সন্ন্যাস শিক্ষা ও লোকসেবাব্রতী অসংখ্য প্রতিষ্ঠানে এবং তাঁহার পূতসঙ্গপ্রাপ্ত বহু ভাগ্যবানের জীবনে—আমরা রামকৃষ্ণানন্দজীর তপস্যার সুপক্ক পরিণতি লক্ষ্য করিতেছি।

তিনি কি সাধন করিয়াছেন তদ্বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হইলে তৎক্ষণাৎ উত্তর দিতেন, "আমার গুরু প্রয়োজনীয় সকল সাধনাই করিয়াছিলেন।" তদ্রূপ রামকৃষ্ণ মিশনের মাদ্রাজ-কেন্দ্রের সাফল্যের হেতু কি যদি কেহ জানিতে চাহেন, তবে আমরা কালবিলম্ব না করিয়াই বলিতে পারি, সে রহস্য নিহিত আছে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের উৎসর্গীকৃত জীবনে, অপরের কোন প্রচেষ্টায় নহে।

যে কাজে তিনি হাত দিয়াছিলেন, তাহার গৌরবময় পরিণতি ও জগদ্ধিতার্থ তাঁহার কর্মের সাফল্য আজ সম্মুখে দেখিতে পাওয়া আমাদের মহা সৌভাগ্য বলিতে হইবে।

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের জীবন ছিল ঘটনা-বিরল। কোন সাময়িক বিপ্লব দ্বারা উহা বিকশিত হয় নাই। যাহা হইবার তাহা একেবারেই হইয়াছিল। প্রয়োজন-বোধেই কেবল উহার তীব্রতার হ্রাসবৃদ্ধি হইত মাত্র। সাধনার প্রারম্ভে তিনি যাহা করিতেন, শেষেও তাহা করিয়া গিয়াছেন। এইরূপ জীবনের বর্ণনা দেওয়া সহজ, অনুভব করা কঠিন, এবং অপরের পক্ষে অনুশীলন করা প্রায় অসম্ভব।

## আধ্যাত্মিক শক্তি

সাংস্কৃতিক সংকটের আবর্তে দেশ যখন তমসাচ্ছন্ন হইল তখন যে সকল বিরাটব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন ব্যক্তি উহার মোহে আকৃষ্ট হইলেন তাঁহাদের মধ্যে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ একজন, কিন্তু আপন আধ্যাত্মিক শক্তিপ্রভাবে ও গুরু-কৃপায় তিনি সাফল্যের সহিত উহা হইতে বাহিরে আসিয়া জগতে জ্ঞানালোক বিতরণ করিলেন ও ঐ সংস্কৃতির পশ্চাতে যে প্রচ্ছন্ন বিপদ অবস্থিত, সে সম্বন্ধে দেশবাসীকে সতর্ক করিয়া দিলেন।

১৮৬৩ খৃঃ-এ ভূমিষ্ঠ হইয়া ৪৮ বৎসর তিনি এই মরধামে ছিলেন এবং মাদ্রাজকে চৌদ্দ বৎসর স্বাভিমুখে আকর্ষণান্তে ১৯১১ খৃঃ-এর ২১শে আগষ্ট মহাসমাধি লাভ করেন।

ধর্মপ্রাণ পিতামাতার সন্তানরূপে ইহজগতে আসিয়া তিনি একান্ত ধার্মিক পরিবেশে লালিত-পালিত হন। দেবপ্রতিম পিতার নিকট প্রাপ্ত ধর্মশিক্ষাই পরবর্তী কালে তাঁহার আধ্যাত্মিক জীবনের ভিত্তি হইয়া দাঁড়ায়। পিতা বীজবপন করিলেন এবং গুরুর সস্নেহ সাহচর্যে তাহা হইতে বিশাল বৃক্ষের উদ্ভব হইল।

শশী (শশিভূষণ চক্রবর্তী তাঁহার পূর্বাশ্রমের নাম) ছিলেন অতি মেধাবী ছাত্র এবং আশা করা

* অনুবাদক—শ্রীবুদ্ধদেব চট্টোপাধ্যায়

গিয়াছিল যে, তিনি যোগ্যতার সহিত বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবেন। অংকশাস্ত্রের প্রতি তাঁহার গভীর আকর্ষণ ছিল। জ্যোতির্বিদ্যাও তাঁহার ভাল লাগিত এবং জগৎ ও অনন্ত-সম্বন্ধে স্বমত-নির্ধারণে ইহা তাঁহাকে সাহায্য করিয়াছিল।

স্বামী বিবেকানন্দ, ব্রহ্মানন্দ ও অন্যান্য গুরুভ্রাতাদের মত আধ্যাত্মিক ভাবের প্রাবল্যে তিনিও কলেজ-জীবনে ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিয়াছিলেন। তাহাতে কিন্তু তাঁহার ধর্ম-তৃষিত অন্তরের পিপাসার নিবৃত্তি হয় নাই, বরং উহা অধিকতর ক্ষুধার উদ্রেক করিল। ব্রাহ্মসমাজ এই ক্ষুধা উপশান্ত করিতে পারে নাই; শ্রীগৌরাঙ্গ-চরিত ও বাইবেল-পাঠে তাঁহার তৃষ্ণা আরও বাড়িল।

বক্তৃতাকালে ব্রাহ্মনেতা কেশবচন্দ্র সেন শ্রীরাম-কৃষ্ণের মহত্ত্বের কথা পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করায় এইরূপ একজন আধ্যাত্মিক-গুণসম্পন্ন ব্যক্তি যে এত নিকটে আছেন তাহা তিনি অবগত হন।

## প্রথম মিলন

আপন জ্যেষ্ঠতাতপুত্র শরৎচন্দ্রের ( স্বামী সারদানন্দের ) সহিত তিনি শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে দেখিতে যান। সে সাক্ষাৎকার হয় দক্ষিণেশ্বরে ১৮৮৩ খ্রীঃ-এ অক্টোবর মাসে। সেই প্রথম দর্শনেই শ্রীরামকৃষ্ণ চিনিলেন শশী ও শরৎ তাঁহার দুই অন্তরংগ। প্রসঙ্গতঃ তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে তিনি শশীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার সাকারে না নিরাকারে বিশ্বাস ? শশী উত্তর করিলেন : 'ঈশ্বরের অস্তিত্বেই যখন আমার সন্দেহ বর্তমান, তখন ঠিক কোনটিতে বিশ্বাস করি তাহা বলিতে আমি অক্ষম।" এইরূপ সরল উত্তরে পরমহংসদেব অতীব প্রীত হইলেন।

এই সাক্ষাৎকার শশীর মনে চিরস্থায়ী রেখাপাত করিল ও তাঁহার জীবনে আমূল পরিবর্তন আনিল। সেই দিন হইতে তিনি প্রায়ই দক্ষিণেশ্বরে যাইয়া শ্রীগুরুর পদতলে বসিতেন। শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও চিন্তাধারায় শশী চিরদিনের জন্য বাঁধা পড়িলেন।

তাঁহার কলেজের পড়ার সকল আকর্ষণ নষ্ট হইল এবং পরমহংসদেবের অপরূপ ব্যক্তিত্বের প্রতি তিনি ক্রমশঃ আকৃষ্ট হইলেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের উপদেশকে তিনি দেবোপদেশরূপে গণ্য ও তাহা বর্ণে বর্ণে পালন করিতে আপ্রাণ চেষ্টিত হইলেন। তাঁহাকেই তিনি স্বীয় জীবনের ধ্রুবতারা করেন। শ্রীরামকৃষ্ণ-সম্বন্ধে তাঁহার উচ্চ ধারণা ধীরে ধীরে গভীর প্রেম ও শ্রদ্ধায় রূপায়িত হইল। সেইজন্যই শশী গুরুসেবায় আরও অধিক সময় নিয়োগ ও তাঁহার প্রীতির পরিচালনায় আধ্যাত্মিক সাধনা আরম্ভ করিলেন।

## সখ্য

শশী বলেন, "শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশ পাইবার পর আমার বক্তব্য আর কিছুই রহিল না। ব্যক্ত করিবার পূর্বেই তিনি আমার সকল সন্দেহ নিরসন করিতেন।" শরৎ ও নরেন্দ্রের সহিত শশীর অচ্ছেদ্য ও ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব হয় এবং তাঁহাদের মধ্যে যে অন্তহীন আলোচনা চলিত, তাহাতে সকলেরই বিশেষ মানসিক দৃষ্টিভংগী গঠিত হয়।

শুভাকাঙ্ক্ষী এক জন প্রতিবেশী যখন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সাধারণের যখন এই বিশ্বাস, চল্লিশের পর ধর্মাভ্যাস করা উচিত, তখন এত কম বয়স হইতে কেন তুমি ধর্মজীবন বরণ করিতেছ ?"—তদুত্তরে তিনি তৎক্ষণাৎ বলিলেন—"আপনি কি নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারেন আমি ততদিন জীবিত থাকিব ? মৃত্যু যে কোন সময়েই আসিতে পারে। আমার কি সেইজন্য প্রস্তুত হওয়া উচিত নয় ?"

ইহার পর প্রায় তিন বৎসর তিনি গুরুর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য-লাভের সুযোগ পান। এই সময় গৃহে থাকিয়া মাঝে মাঝে দক্ষিণেশ্বর-দর্শনে

যাইতেন। কিন্তু শ্রীশ্রীঠাকুরের পীড়া সঙ্কটাপন্ন হওয়ায় নিরবচ্ছিন্ন দৃষ্টি, সেবা ও শুশ্রূষার প্রয়োজন-বিধায় ঐ সান্নিধ্য গভীরতর হইতে লাগিল। যুবা শিষ্যগণের মধ্যে বার জন—তাঁহাদের মধ্যে শশী এবং নরেন্দ্রও ছিলেন—গৃহ ও পাঠ ত্যাগ করিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের পার্শ্বে সেবার্থ সমবেত হইলেন। ভক্তদিগের মধ্যেও ঐ সময়ে শশীর প্রাধান্য পরিস্ফুট হইল।

## গুরুসেবা

নিজের সুবিধা, সোয়াস্তি ও স্বাস্থ্যের প্রশ্ন চিন্তা না করিয়াই তিনি ঐকান্তিক ভক্তি-সহকারে দিবারাত্র শ্রীশ্রীঠাকুরের সেবা করিয়াছিলেন। শশীর জীবনীকার লিখিতেছেন—"অন্যান্য শিষ্যগণ যখন অধিকাংশ সময় আধ্যাত্মিক সাধনায় অতিবাহিত করিতেন, শশী তখন সর্বক্ষণ ছায়ার মত গুরুর পাশে পাশে থাকিয়া তাঁহার প্রয়োজন মিটাইতেন। গুরুসেবাই তাঁহার প্রধান সাধনা ছিল এবং ইহাই তাঁহার জীবনকে সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত করিল। এই সময়ে গুরু-সেবায় তিনি যে উদ্যম দেখাইয়াছিলেন, তাহাই শেষদিন অবধি তাঁহার জীবনের বৈশিষ্ট্যরূপে গণ্য হয়। শ্রীগুরুর চরণে তিনি নিঃসঙ্কোচে আত্ম-সমর্পণ করিয়াছিলেন এবং মনে প্রাণে গুরুপ্রীতি ও গুরুসেবাই তাঁহার জীবনের একমাত্র কামনা হইয়াছিল। এই সেবায় তাঁহার মন হইতে সংসার ও বন্ধু-বান্ধব, লেখাপড়া ও অন্যান্য কাজকর্ম সম্পূর্ণরূপে মুছিয়া গেল।

প্রত্যেক যুবাভক্তের গুরুভক্তির প্রাবল্য ছিল, কিন্তু শশীর ক্ষেত্রে তাহা খুব স্পষ্ট হইয়া উঠিল। ঐরূপ ভক্তির তুলনা নাই, উহা অতুলনীয় ও অননুকরণীয়। শশী ছিলেন সেবার মূর্তপ্রতীক। তিনি বেশ ভাল করিয়াই বুঝিয়া-ছিলেন যে, গুরুসেবাই সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্মসাধনা। তিনি অন্য কোনরূপ তপস্যা করেন নাই এবং অন্য কোন প্রকার কৃচ্ছ্রসাধন জানিতেন না।

গুরুর রোগযাতনা দূর করাই তাঁহার একমাত্র কাম্য ছিল। স্বীয় জীবনদানে যদি গুরু আরোগ্য-লাভ করিতেন, তাহা হইলে তিনি তাহাতেও প্রস্তুত ছিলেন। নিঃস্বার্থ ভালবাসার তিনি আদর্শস্থল। সেবার মাধ্যমেই তিনি পূর্ণতা লাভ করেন।

ইহা দেখিয়া সন্ত কান্নাপ নায়ানারের ভক্তির কথা মনে পড়ে। তিনি আপন ইচ্ছামত শিব-পূজা করিতেন। একদিন দেখিলেন যে, মহাদেবের চক্ষু হইতে রক্ত ঝরিতেছে। উহা নিরাময় করিতে তৎক্ষণাৎ নিজ চক্ষু উৎপাটন করিয়া শিবকে দান করিলেন।

## হনুমানের উপমা

হনুমান যে ভাবে ব্যক্তিগত সুখ-সুবিধার বিষয় বিবেচনা না করিয়া প্রশ্নহীন, আপত্তিহীন ও দাস্যভাবে অতুলনীয় গুরুভক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, শশী সেই আদর্শ সর্বদাই সম্মুখে রাখিতেন। সেবার মূল রহস্য কি তাহা তিনি আয়ত্ত করিয়াছিলেন, মানবজীবনের উদ্দেশ্য কি বুঝিয়াছিলেন এবং সেবা, কেবল সেবা করিয়াই গিয়াছেন। গুরুর বিশেষ করুণা লাভ করিয়া তিনি তাঁহার চিহ্নিত সেবক ও পুত্ররূপে গণ্য হইয়াছিলেন এবং তাঁহার সেবায় শশীর মত দ্বিতীয়টি আর কেহ ছিলেন না। গুরুভক্তির এইরূপ নিদর্শন খুব কমই পাওয়া যায়।

সর্বশেষ ও আনন্দময় মুহূর্ত যখন আসিল, গুরু যখন আনন্দোচ্ছ্বাসে জগন্মাতার ক্রোড়ে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন, তখন খুব শান্ত হইতে চেষ্টা করিয়াও এই দৈহিক বিচ্ছেদ সহ্য করিতে না পারিয়া শশী সমস্ত দেহমনে অবশ হইয়া পড়িলেন এবং ক্রন্দন করিতে করিতে অচেতন অবস্থায় গুরুর চরণে পতিত হইলেন।

অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার পর গুরুর ভস্মাস্থির অধিকাংশ নিত্যপূজার জন্ম রাখা হইল এবং উত্তরাধিকারী-দিগের জন্ম শশী এই সম্পদকে একনিষ্ঠভাবে রক্ষা করিয়া গেলেন। ইহাকে তিনি গুরু-মহারাজের রক্তমাংসের শরীররূপে গণ্য করিতেন। গুরুর ভস্মাস্থির উপর তিনি দ্বাদশ বৎসর ধরিয়া তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিয়াছিলেন, এক মুহূর্তের জন্মও উহাকে পরিত্যক্ত রাখেন নাই।

গুরুগতপ্রাণতার দ্বারা শশী মঠের মধ্যে শ্রীশ্রীঠাকুরের স্মৃতিকে উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছিলেন। ভিন্ন গৃহে একটি বেদীর উপর তিনি গুরুর ভস্মাস্থি রক্ষা করিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবিতকালে যেমনটি সেবা ও ভক্তি করিতেন তখনও ঠিক তেমনটি করিতে লাগিলেন। সেইজন্ম দিব্য-দেহে অবস্থান করিলেও মঠের সকলেই ঠাকুরের জীবন্ত উপস্থিতি অনুভব করিতে লাগিলেন।

অনবরত নামজপ ও অবিরাম স্মরণ তাঁহার নিকট স্বাভাবিক হইয়াছিল। তিনি প্রায়ই বলিতেন—"আমি কেবল এই কাজেই সমগ্র জীবন যাপন করিব। আর কিছু আমি চাই না।"

## শিষ্যদের রক্ষণাবেক্ষণ

গুরুর তিরোধান ও ১৮৯৭ খ্রীঃ-এ আমেরিকা হইতে ফিরিয়া স্বামী বিবেকানন্দ-কর্তৃক পৃথক মঠ-প্রতিষ্ঠা—এই দুই ঘটনার অন্তর্বর্তী কাল শিষ্যগণের নিকট ঘোর দুর্দিনরূপে উপস্থিত হইল। ঠাট্টা বিদ্রূপ খাদ্য ও ভরণপোষণের সংস্থানহীনতা প্রভৃতি বিভিন্ন দুঃখকষ্টের সহিত তখনকার দিনগুলি করুণ হইয়া উঠিল। বিধাতার কোন এক অলক্ষ্য বিধানে শশীর উপর শিষ্যদের পরিচালনা-ভার অর্পিত হইল। এই অবস্থায় পড়িলে মানুষের পক্ষে যতখানি করা সম্ভব, ততখানি উদ্যমের সহিত নির্ভীক হৃদয়ে অপূর্ব বিশ্বাসভক্তি-সহকারে সে কর্তব্য তিনি পালন করিয়া চলিলেন।

স্বামী বিবেকানন্দ যথার্থই বলিয়াছেন—"শশী ছিল মঠের মূল খুঁটি। সে না থাকিলে মঠ চলা অসম্ভব হ'ত।"

তাঁহার ব্যক্তিত্বের উন্মাদনায় ও আধ্যাত্মিকতার প্রভাবে মঠের প্রতি বেশ কয়েকটি অমূল্য জীবন আকৃষ্ট হইল এবং যথার্থ আধ্যাত্মিক শক্তিতে ধীরে ধীরে দীক্ষিত হইতে লাগিল। স্বামী বিবেকানন্দ প্রত্যাবর্তন করিলে শশীর জীবনের দ্বিতীয় পর্যায় আরম্ভ হইল।

প্রথম পর্যায়ের দ্বাদশ বৎসরে শ্রীগুরুর সেবাই তাঁহাকে পূর্ণভাবে অধিকার করিয়া ছিল। দ্বিতীয় পর্যায়ে তিনি যে কেবল সেই সেবারই অনুশীলন করিয়াছিলেন তাহা নহে, পরন্তু উহার সহিত শ্রীগুরুর উপদেশ ও বাণীপ্রচার-কার্য সংযোগ করিলেন। সব কাজকেই তিনি শ্রীগুরু মহারাজের কাজ বলিয়া জানিতেন।

১৮৯৭ খৃঃ-এর প্রারম্ভে মান্দ্রাজবাসিগণ স্বামী বিবেকানন্দকে পাইল। সেই প্রথম তিনি পাশ্চাত্ত্য-বিজয় ও যুগপ্রবর্তনকারী ভ্রমণান্তে ভারতে ফিরিলেন। মান্দ্রাজিগণের আকুল আকাঙ্ক্ষায় মান্দ্রাজে প্রথম একটি কেন্দ্র-স্থাপনের কথা তাঁহাকে পাইয়া বসে। সম্মত হইয়া স্বামীজী বলিলেন—"আমি তোমাদের নিকট এমন এক জন সন্ন্যাসীকে পাঠাইব যিনি দক্ষিণের সকল গোঁড়া ব্যক্তি অপেক্ষাও গোঁড়া; তিনি তামাক খান না, আর তোমরা যতখানি যত্ন-সহকারে পূজা-জপাদি কর, তিনি তদপেক্ষাও বেশী যত্ন-সহকারে তাহা করেন।" ইনিই স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ। ১৮৯৭ খৃঃ-এর মে মাসে তিনি মান্দ্রাজে আসিলেন।

## মান্দ্রাজে কাজের কথা

স্বকীয় উদ্যম ও অধ্যবসায়-সহকারে তিনি কর্মে রত হইলেন। ধারাবাহিক ভাবে হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা

দিতে লাগিলেন এবং শহরের বিভিন্ন অংশে বেদান্ত-ক্লাশ খুলিলেন। শহরের চতুর্দ্দিকে সপ্তাহে কমপক্ষে দশটি ক্লাশ বসিত।

১৯০২ খৃঃ-এ জুলাই মাসে মাত্র উনচল্লিশ বৎসর বয়সে স্বামী বিবেকানন্দ মরধাম ত্যাগ করিলেন। মাদ্রাজবাসিগণ স্থির করিলেন যে, তাঁহাদেরই আবিষ্কৃত পুণ্যশ্লোক স্বামীজীর স্মৃতিরক্ষার্থ একটি 'আনন্দ-মন্দির' স্থাপন করিবেন। তখন পর্য্যন্তও স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ 'আইস হাউসে' বাস করিতে-ছিলেন। যথেষ্ট তৎপরতা ও উদ্যমের সহিত স্মৃতিরক্ষা-কর্ম গ্রহণ করা হয় নাই।

১৯০৭ খৃঃ-এ একটি ছোট মঠবাড়ী ( বর্তমানের মঠবাড়ী নহে ) প্রস্তুত হইল এবং স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ উহাতে চলিয়া গেলেন। তখন মঠে যৎকিঞ্চিৎ ও কচিৎ কখনও সাহায্য আসিত।

স্বামী বিবেকানন্দের ব্যক্তিত্বপ্রভা, বাগ্মিতা ও সাফল্য মাদ্রাজের জনগণকে বিমোহিত করিল মাত্র, কিন্তু প্রবল কর্মপ্রেরণার কোন স্থায়ী প্রভাব রাখিয়া গেল না। তখনও শ্রীগুরু মহারাজের মাহাত্ম্য ও গৌরবের কথা লোকে খুব কমই জানিত।

শশী মহারাজ যখন শান্ত ও নীরব পরিবেশে কাজ আরম্ভ করিলেন, কেবল তখনই মাদ্রাজবাসী শ্রীগুরু মহারাজকে সম্পূর্ণ জানিতে, বুঝিতে ও পূজা করিতে আরম্ভ করিল। মিশনের কাজে জনসাধারণের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল।

## ছাত্রাবাস-প্রতিষ্ঠা

জনসেবার দিক হইতে 'দি রামকৃষ্ণ ষ্টুডেণ্টস্ হোম'-নামে অনাথাশ্রম-প্রতিষ্ঠাই তাঁহার চিন্তা ও শ্রমের প্রথম অনুভবযোগ্য বহিঃপ্রকাশ। ১৯০৫ খৃঃ-এ উহা প্রতিষ্ঠিত হয়। ক্ষুদ্র আকারেই উহার আরম্ভ হয়। ইহার স্থায়ী ক্রমোন্নতি ও অসাধারণ সাফল্যই তাঁহার আধ্যাত্মিক মহত্ত্ব ও বিশ্বাসের অভ্রান্ত নিদর্শন।

তাঁহার পরবর্তী কীর্তি হইল বাঙ্গালোরে মঠ-স্থাপন ও মহীশূর-রাজ্যে মিশনের ভবিষ্যৎ কর্ম-প্রসারের বীজ বপন করা। ব্রহ্মদেশ, ত্রিবাংকুর ও পদুকোটা রাজ্যে তাঁহার ভ্রমণের ফলে ঐ সকল স্থানে ভবিষ্যৎ কর্মের ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছিল।

তিনি প্রথমে মানুষ তৈরী করিতে চাহিতেন এবং তাহাদের দ্বারাই মিশনের কাজ গড়িয়া উঠিবে বলিয়া তাহাদিগকে ভিত্তিভূমি-রূপে গণ্য করিতেন।

তাঁহার মধ্যে ছিল কঠোর নিয়মনিষ্ঠা এবং যে সকল ব্রহ্মচারী তাঁহার সান্নিধ্যে আসিয়াছিলেন বা যাঁহারা তাঁহার নিকট শিক্ষা পাইয়াছেন তাঁহারা সকলেই যোগ্যতার প্রমাণ দিয়া রামকৃষ্ণ সংঘের উল্লেখযোগ্য সভ্যরূপে গণ্য হইয়াছেন।

'জীবন্ত বিশ্বাস' যে কি তাহা তিনি দেখাইয়াছেন। কৃত্যানুষ্ঠান বা পূজাপদ্ধতি শশী মহারাজের মত সাধুরা যখন গ্রহণ করেন, তখন উহা প্রাণস্পন্দনে ভরিয়া উঠে। তখন উহা সার্থক হয় বা উহার অর্থ উপলব্ধি করা যায়। এইগুলিকে তিনি নিছক অনুষ্ঠান-হিসাবে গণ্য করিতেন না, কারণ প্রভু তাঁহার নিকট ছিলেন প্রাণবন্ত। তিনি প্রত্যক্ষভাবে তাঁহার জীবন্ত উপস্থিতি অনুভব করিতেন।

## কৃত্যের মূল্য

শশী মহারাজের পূজা কৃত্যের সার্থকতা এবং মূল্য-সম্বন্ধে সকল সন্দেহের নিরসন করিয়াছিল। তাঁহার পূজা দেখিতে দেখিতে মানুষের অন্তরে ও দেহে ভগবৎপ্রীতির অপূর্বভাব প্রবাহিত হইত। আশ্রমের পবিত্রতার সহিত উপযুক্ত শান্ত পরিবেশ সৃষ্টি করাই ছিল তাঁহার অবিরাম প্রচেষ্টা। পূজার প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি বিষয়ে তিনি অতি-মাত্রায় যত্ন নিতেন। তিনি সব সময়েই বলিতেন —"ইহাকে কেবল শ্রীশ্রীঠাকুরের ছবিরূপেই গণ্য

করিও না। তিনি এখানে সদা বর্তমান আছেন। তাঁহার জীবন্ত উপস্থিতি অনুভব করিতে চেষ্টা কর এবং সেইমত সেবা কর।"

পূজার এবং ব্রহ্মচর্য ও সন্ন্যাসের নীতি ও পদ্ধতি শশী মহারাজ নির্ধারিত করিয়া গিয়াছেন এবং এইজন্য উপযোগী মন্ত্রও রচনা করিয়াছিলেন।

গুরু মহারাজের জীবনযাপন-ধারাকে তিনি সর্বদা অনুসরণ করিতেন। কোন ওজর-আপত্তি না করিয়াই সম্পূর্ণরূপে উহা গ্রহণ করিতেন। গুরু মহারাজ যাহা করতেন না তিনিও তাহা করেন নাই। গুরু মহারাজকে প্রদত্ত না হইলে তিনি কোন কিছুই গ্রহণ করিতেন না। এমন কি চিকিৎসকের নির্দেশে বিশেষ খাদ্য খাইতে হইলেও ঐ নিয়ম পালন করিতেন।

শশী মহারাজের মত সাধুর পক্ষে যদিও অদ্বৈতানুভূতি লাভ করা সহজ ও সম্ভব, তথাপি তিনি 'চিনি হওয়ার চেয়ে চিনি খেতেই' পছন্দ করিতেন। তিনি প্রায়ই বলিতেন, অদ্বৈতানুভূতির পর যে ভক্তি আসিয়া থাকে, তাহাই সর্বশ্রেষ্ঠ এবং পরা ভক্তি। আত্মসমর্পণ যখন সম্পূর্ণ হয়, তখন ভক্ত ও ভগবান এক হইয়া যান এবং উহাই অবশেষে অদ্বৈতানুভূতিরূপে ফল প্রসব করে। শশী মহারাজ আত্মসমর্পণকে সকল আধ্যাত্মিক সাধনার সর্বশ্রেষ্ঠ পরিণতিরূপে গণ্য করিতেন।

## শ্রীশ্রীমা

শ্রীশ্রীঠাকুরকে তিনি যতখানি ভক্তিশ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতেন, শ্রীশ্রীমাকেও (শ্রীসারদাদেবী—শ্রীরামকৃষ্ণের ধর্মপত্নী) সর্বদা সেইরূপ করিতেন। তিনি প্রায়ই বলিতেন, শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীমা উভয়েই ছিলেন অগ্নি আর তাহার দাহিকা শক্তির মত অভিন্ন। গুরুভ্রাতাদিগের প্রতি তাঁহার ভালবাসা ও ভক্তি ছিল অপূর্ব এবং তাঁহাদের মধ্যেই যে শ্রীগুরুদেব অধিষ্ঠান করেন, তাহা তিনি বিশ্বাস করিতেন।

শশী মহারাজকে স্বামী বিবেকানন্দ বিশেষ স্নেহ করিতেন এবং শ্রীগুরুর প্রতি অভিনব সেবা-প্রদর্শনের যোগ্য পুরস্কার-রূপে শশীকে রামকৃষ্ণানন্দ-নামে তিনিই অভিহিত করেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের মানসপুত্র ও রামকৃষ্ণ-সংঘের প্রথম সভাপতি স্বামী ব্রহ্মানন্দকে শশী মহারাজ শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন। স্থানীয় ভক্তগণকে আশীর্বাদ করিবার জন্য তিনি শ্রীশ্রীমা ও শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রথম শিষ্যগণের সকলকেই মান্দ্রাজে আনাইয়াছিলেন।

১৯১০ খৃঃ-এর মাঝামাঝি শশী মহারাজ দারুণ অসুখে পড়িলেন। তাঁহার বিশাল দেহ ভাঙ্গিয়া পড়িল। দ্বাদশ বৎসরের তপশ্চর্যা ও জীবনধারণোপযোগী দ্রব্যের স্বল্পতা লইয়া কঠোর জীবনযাপন এবং চৌদ্দ বৎসরব্যাপী সুস্থ পরিবেশ ও পরিস্থিতির অভাবের মধ্যেও মান্দ্রাজ-বাসীদের মধ্যে ভাবপ্রচার ও অবিরাম অক্লান্ত শ্রমের ফলে তিনি বহুমূত্র ও যক্ষ্মা-রোগে আক্রান্ত হইলেন। বিশেষ চিকিৎসার জন্য তাঁহাকে কলিকাতায় আনা হইল, কিন্তু ফল কিছুই হইল না।

## বিদায়বাণী

তাঁহার শেষ বাণী ছিল—"আমার কাজ শেষ হইয়াছে। ইহাতে আমার কোন কৃতিত্ব নাই। কিন্তু যাহা হইয়াছে তাহা কেবল শ্রীশ্রীঠাকুরের করুণায় ও স্বামীজীর আদেশে। শ্রীশ্রীঠাকুরের পাদপদ্মে আমি আমার দেহ-মন-প্রাণ সমর্পণ করিয়াছি, প্রভুর ইচ্ছাই পূর্ণ হইবে। যখন আমি তাঁহার কথা বলি, তখন সব ব্যথা দূরে যায়, দেহের কথা ভুলিয়া যাই।"

আধ্যাত্মিক জগতে শ্রীরামকৃষ্ণই শেষ সাধক। জগতের সর্বপ্রকার আধ্যাত্মিক সাধনার তিনিই চরম পরিণতি। তাঁহার শিষ্যগণ উহার এক একটি দিকের বিকাশ করিয়াছেন।

শশী মহারাজও একটি দিক গ্রহণ করিয়া সেই আদর্শে জীবনযাপন করেন।

তিনি ছিলেন খাঁটি ও খুব উচ্চ ধরনের সন্ন্যাসী। তাঁহার অনুভূতি গভীর ও সম্পূর্ণ এবং ঈশ্বর-বিষয়ে তাঁহার ধারণা সর্বব্যাপী ও উদার ছিল। বিভিন্ন দার্শনিক পন্থার তিনি যে সংযোগ-সাধন করিয়াছিলেন, তাহা শ্রীগুরুর নিকট হইতে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত হন। তিনি অবিভক্ত ভাবে এবং সর্বান্তঃকরণে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন।

অনিচ্ছা বা সাংসারিক কোন কিছু লাভের আশায় যে কৃচ্ছ্রসাধন, তাহার লেশমাত্রও তাঁহার মধ্যে ছিল না। তিনি ছিলেন শান্ত ও গম্ভীর এবং নিশিদিন সর্বক্ষণ কেবল শ্রীশ্রীঠাকুরের চিন্তায় ডুবিয়া থাকিতেন। আধ্যাত্মিকতার চরম সোপানে উঠিলেও তিনি ছিলেন বালকের মত সরল ও বিনীত। তাঁহার মধ্যে ভক্তি গভীরভাবে অনুস্যূত হইয়াছিল। আত্ম-সমর্পণ ও বিশ্বাস পূর্ণাংগ হইয়াছিল বলিয়াই তিনি বলিতে সমর্থ হইতেন, "আমি ভগবানের ভাবে পূর্ণ এবং অন্য কাহারও সাহায্যের প্রয়োজন বোধ করি না।" তিনি সকল মূর্তিকেই পূজা করিতেন এবং পথপার্শ্বে প্রত্যেক ক্ষুদ্র মন্দিরে ভক্তিভাবে প্রণাম করিতেন। তিনি ছিলেন মৌলিক চিন্তার অধিকারী।

প্রেম ও পবিত্রতা তাঁহার মধ্যে ঠিক ঠিক মূর্ত হইয়াছিল। তাঁহার জীবনের লক্ষ্য ও আদর্শ ছিল শ্রীরামকৃষ্ণকে ভক্তি করা। উহা যে কত গভীর ছিল তাহার ইতি করা যায় না। একমাত্র হনুমানের সংগেই যথাযোগ্যভাবে তাঁহার তুলনা হইতে পারে। উচ্চনীচ-ধনিনির্ধন-ভেদ তাঁহার মধ্যে ছিল না। পবিত্র কর্তব্যের বেদীতে তিনি আত্মবলি দিয়াছিলেন। সেই কর্তব্য হইল সকল জীবে শ্রীশ্রীঠাকুরকে পূজা করা ও অন্তরের দেবতাকে প্রত্যক্ষ করিতে তাহাদের সাহায্য করা। শ্রীরামকৃষ্ণের জন্যই তিনি এ জগতে আসিয়াছিলেন, অননুকরণীয় ভাবে শ্রীরামকৃষ্ণেরই সেবা করিয়াছিলেন এবং শ্রীরামকৃষ্ণেই প্রত্যাবর্তন করিলেন।

---

# সুখের আশা

শ্রীঅটলচন্দ্র দাশ, সাহিত্যশ্রী, কাব্যভারতী

যতো বেশী ক'রে সুখ পাবো বলে উন্মাদ আগ্রহে
বিষয়-অর্থ-কামনা জানাই মন্দির-বিগ্রহে,
তেতো বেশী বাড়ে বিষ-জঞ্জাল,
শ্রমে শঙ্কায় হই কঙ্কাল;
আশা এতো বাড়ে পুরে না কামনা, ভরি' দিক্ দিক্ রহে!
জ্বলে চোখ চুনী-চমক-জ্বালায়, হিয়া ধিক্ ধিক্ দহে।

পুরাও বাসনা নিদয় হ'ও না, হও মুহূর্ত মূর্ত,
যাচি ল'বো ধন মণি-কাঞ্চন, হ'বো বন্ধনমুক্ত।
তুমি দিলে পাই—তাই তোমা' চাই,
নাম-গানে ডাকি, দিন-রাত নাই;
এলে তুমি যবে রূপ-বৈভবে, বাক্য হলো না স্ফূর্ত,
সুখ-আশা তব চরণের 'পরে রহিল গো চিরসুপ্ত!

---

# বেদ-পুরাণসম্মত প্রাচীন ভারতের ইতিহাস

( পূর্বানুবৃত্তি সমাপ্ত )

অধ্যাপক শ্রীগৌরগোবিন্দ গুপ্ত, এম্-এ

অতি প্রাচীনকাল থেকেই আমরা ঋষিদের আধ্যাত্মিক শক্তি ও বিজয়ী বীরগণের ক্ষাত্র-শক্তি—এই যুগ্মশক্তি দ্বারাই ভারতীয় আর্য্যসমাজ সুসংবদ্ধ দেখতে পাই। আর্য্যেরা দলে দলে এক এক পুরোহিতের প্রেরণায় ও এক এক বিজয়ী পুরুষের সাহায্যে ভারতে ছড়িয়ে পড়তে থাকেন।

'ঋষি'-শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ—অগ্রগামী ( ঋষ্-ধাতু গমনে )। অথর্ব্ব-বেদে দ্বাদশ কাণ্ডের দ্বিতীয় সূক্তে সমাজে ঋষিদের কর্তব্যের চিত্র অতি সুস্পষ্টভাবেই পাওয়া যায়। এই সূক্তে শত্রুর বিরুদ্ধে অভিযানে হত এক বীর পুরুষের মৃতদেহের সৎকারান্তে ক্রব্যাদ অগ্নিকে দূরে পরাহত করে হব্যাগ্নি প্রজ্বলনান্তে ভৃগু ঋষিকে বিজয়ী বীরগণকে সম্বোধন ক'রে বলতে দেখতে পাই—

ইমে জীবা বি মৃতৈরাববৃত্রন্নভূদ্ ভদ্রা
দেবহূতির্নো অদ্য।
প্রাঞ্চো অগাম নৃতয়ে হসায় সুবীরাসো
বিদথমা বদেম ॥ ২২

এই সকল জীবিত বীরগণ মৃতদের থেকে একান্তভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে। আজ আমাদের দেবতাদের আবাহন কল্যাণময় হয়েছে। আমরা পূর্ব্বাভিমুখে এগিয়ে চলেছি আনন্দোৎসবের জন্য। বীর সুসন্তানগণে পরিবৃত হয়ে আমরা মন্ত্রণাসভা আহ্বান করতে চাই—

ইমং জীবেভ্যঃ পরিধিং দধামি নৈষাং নু
গাদপরো অর্থমেতম্।
শতং জীবন্তঃ শরদঃ পুরুচীস্তিরো মৃত্যুং দধতাং
পর্ব্বতেন ॥ ২৩

এই সকল জীবিত বীরপুরুষগণ ও মৃত্যুর মধ্যে আমি ব্যবধান তুলছি—এদের মধ্যে কেউই যেন আর এই সীমার বাইরে মৃত্যুহস্তে পতিত না হয়। এরা সকলেই যেন এক শত শরদ্ ( অর্থাৎ একশত বৎসর ) জীবিত থেকে মৃত্যুকে এই পর্ব্বতের অধঃস্থলে নিপতিত রেখে যায়।

অশ্মন্বতী রীয়তে সংরভধ্বং বীরয়ধ্বং প্র তরতা
সখায়ঃ।
অত্রাজহীত যে অসন্ দুরেবা অনমীবানুত্তরে
মাভি বাজান্।

হে আমাদের বীর সখাগণ, ঐ দেখ উপলবিষম নদী তীরবেগে বয়ে চলেছে। তোমরা বীরের মত এখানে সুসজ্জিত হয়ে উত্তীর্ণ হও। একান্ত-ভাবে সকল রকম অমঙ্গল বিতাড়িত করে চল আমরা মঙ্গলযুক্ত বিজয়-বস্তুর অভিযানে এগিয়ে যাই।

উত্তিষ্ঠতা প্র তরতা সখায়োঽশ্মন্বতী নদী
স্যন্দত ইয়ম্।
অত্রা জহীত যে অসন্নশিবাঃ শিবানৎস্যোনা-
নুত্তরে মাভি বাজান্।

ওঠ ওঠ, বীর সখাগণ, ঐ দেখ অশ্মন্বতী নদী বয়ে চলেছে। ঐ নদী উত্তীর্ণ হও। সকল রকম অমঙ্গল বিতাড়িত করে চল আমরা এখান হতে মঙ্গলময় কল্যাণময় বিজয়াভিমুখে এগিয়ে যাই।

বৈশ্ব দেবীং বর্চ্চস আরভধ্বং শুদ্ধা ভবন্তঃ
শুচয়ঃ পাবকাঃ।
অতিক্রামান্তো দুরিতা পদানি শতং হিমাঃ
সর্ব্ববীরা মদেম॥

হে বীরগণ, তোমরা ব্রহ্মতেজলাভ-কল্পে বিশ্বদেব-সম্বন্ধিনী স্তুতিরূপা বাগ্‌দেবীর আবাহন-কল্পে অগ্নি প্রজ্বলিত কর। ঐ অগ্নির শিখাসকল ব্রহ্মতেজে দীপ্যমানা হয়ে উঠুক। আমরাও ঐ তেজ লাভ করে দুর্গম ও দুরিতযুক্ত স্থানসকল অতিক্রম করে সকলে মিলে শতহেমন্ত আনন্দে কাল যাপন করব।

উদীচীনৈঃ পথিভির্ব্বায়ুমদ্ভিরতিক্রামন্তোঽবরান-
পরেভিঃ।

উত্তরদিগ্‌গামী বাত্যাক্রান্ত পথসকল ও উত্তরোত্তর নীচোচ্চ পর্ব্বতসকল আরোহণ করতে করতে আমরা চলেছি।

যো নো অগ্নিঃ পিতরো হৃৎস্বন্তরা বিবেশা-
মৃতো মর্ত্ত্যেষু।
ময্যহং তং পরি গৃহ্ণামি দেবং মা সো অস্মান্
দ্বিক্ষত মাবয়ংতম্॥

হে পিতৃগণ, যে অমৃত অগ্নি মর্ত্ত্য আমাদের হৃদয়ে প্রবেশ করেছেন, তাকে আমি দৃঢ়রূপে ধারণ করি। তিনি যেন কথনও আমাদের প্রতি বিমুখ না হন, আমরাও যেন কথনও তাঁর সেবায় পরাঙ্মুখ না হই।

সর্ব্বানগ্নে সহমানঃ সপত্নানৈষামূর্জ্জংরয়িমস্মাসু ধেহি।
—হে অগ্নি আমাদের শত্রুসকল পদদলিত করে তাহাদের খাদ্য বীর্য্য ও ঐশ্বর্য্য আমাদের দান কর।

এইরূপ এক এক জন তেজস্বী শক্তিমান ঋষিকে কেন্দ্র করেই আর্য্যদের এক এক গোষ্ঠী বা গোত্র স্থাপিত হ'ত। আজ পর্য্যন্ত সকল ভারত-সন্তান কোন না কোন গোত্রসম্ভূত। এইরূপ এক এক গোত্রের মধ্য থেকে সকলের প্রীতি-বিধায়ক বা 'রঞ্জক' কোন বিজয়ী বীরপুরুষকে তাঁরা 'রাজা' নামে অভিহিত করতেন।

ভারতে রাজ্যবিস্তার-কারক পূর্ব্বাগত সূর্য্য-বংশীয় আর্য্যগণের যে রাজার নাম আমরা পুরাণাদিতে সর্ব্বপ্রথমে পাই, ইনি হলেন ইক্ষ্বাকু। গাথাদিতে সর্ব্বত্রই এঁরই প্রথম উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়। ইক্ষ্বাকু থেকে আরম্ভ করে বৃহদ্বল পর্য্যন্ত সূর্য্যবংশীয় নৃপতিদের ও পুরূরবা থেকে আরম্ভ করে পরীক্ষিৎ পর্য্যন্ত চন্দ্রবংশীয় নৃপতিদের বংশাবলী ও কীর্ত্তিকলাপ গাথাকবিদের দ্বারা সুরক্ষিতভাবে অল্পবিস্তর পাওয়া গেছে। এদের মধ্যে সুবিখ্যাত রাজন্যবর্গকে কেন্দ্র করে আমরা ভারতরাষ্ট্র-গঠনের ইতিহাসও পেয়ে থাকি। ৪০০০ খৃঃ পূঃ থেকে এই রাষ্ট্রীয় ইতিহাসের আরম্ভ ধরা যেতে পারে।

পুরাণাদিতে মনুকেই আদিপুরুষ-রূপে ধরা হয়েছে। মনু থেকে সূর্য্যবংশীয় ও চন্দ্রবংশীয় নৃপতিগণের উৎপত্তি স্থির করা হয়েছে। মনুর পুত্র ইক্ষ্বাকু থেকেই সূর্যবংশ ও কন্যা ইলার স্বামী চন্দ্র থেকে ঐলবংশের বা চন্দ্রবংশের উৎপত্তি নির্ণীত হয়েছে।

সূর্য্যবংশীয় আর্য্যগণ যথন ভারতে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলেন, তথন মনুর নয় জন পুত্রের মধ্যে তাঁদের দ্বারা বিজিত উত্তর ভারতের প্রদেশসকল বিভাগ করে দেওয়া হল। জ্যেষ্ঠ পুত্র ইক্ষ্বাকু অযোধ্যাকে রাজধানী ক'রে তৎসন্নিহিত প্রদেশ-সকল শাসন করতে লাগলেন ও সূর্য্যবংশের প্রবর্ত্তক-রূপে গণ্য হলেন। নাভাগ যমুনাপ্রদেশে, করূষ শোণনদী-তীরস্থ প্রদেশে, ধৃষ্ট বাহ্লীক-প্রদেশে, নরিষ্যন্ত হিমালয়সন্নিহিত প্রদেশে, নাভানেদিষ্ঠ বৈশালী-প্রদেশে, শর্য্যাতি আনর্ত্ত-প্রদেশে এবং প্রাংশু ও পৃষধ্র কতকগুলি খণ্ডপ্রদেশে রাজত্ব করতে লাগলেন। অর্থাৎ সরযূ-নদীর তীর থেকে আরম্ভ করে উত্তর ভারতস্থ দেশসকল ও গুজরাট

এবং বর্ত্তমান রাজপুতানা বাদ দিয়ে ( শুষ্যমাণ জলাশয়-পরিপূর্ণ থাকার দরুন ) শোণনদী পর্য্যন্ত গাঙ্গযামুনপ্রদেশ-সকল সূর্য্যবংশীয় রাজগণের অধিকারভুক্ত হয়। পরে ইক্ষ্বাকুর এক পুত্র দণ্ডককে গুজরাটের দক্ষিণভাগের কতকাংশের শাসকরূপেও আমরা দেখতে পাই। এইরূপ রাজ্য-প্রসারের ফলে তাঁদের অবশ্যই প্রাচীন অনার্য্য অধিবাসীদের সহিত অল্পবিস্তর সংমিশ্রণ হয়। ইক্ষ্বাকুর একশত পুত্র থাকার অর্থ তৎকালীন সমগ্র বিন্ধ্যোত্তর ভারত তাঁদের দ্বারা অধিকৃত হয়েছিল।

অনুমান ৪০০০খৃঃ পূঃ-এ এই অধিকার চন্দ্রবংশীয় আর্য্যগণের আবির্ভাবে ক্ষুণ্ণ হতে থাকে ও ৩০০০ খৃঃ পূঃ-এর মধ্যে একমাত্র বর্ত্তমান পূর্ব্বপাঞ্জাব, অযোধ্যা ও তৎসন্নিহিত প্রদেশ ছাড়া আর সব স্থানই চন্দ্রবংশীয় নৃপতি পুরুর পুত্র আয়ু, তাঁর পুত্র নহুষ ও তৎপুত্র যযাতি দ্বারা অধিকৃত হয়। এই অধিকার স্থায়ী হওয়ার পর যযাতির পঞ্চপুত্রের মধ্যে বিভক্ত হয়। তা'ছাড়া আয়ুর ভ্রাতা অমাবসু-কর্তৃক কান্যকুব্জ এবং যযাতির এক ভ্রাতা ক্ষত্রবৃদ্ধ দ্বারা কাশী-রাজ্য স্থাপিত হয়। ৪০০০ খৃঃ পূঃ থেকে ২৮০০ খৃঃ পূঃ পর্য্যন্ত উত্তরভারতে রাজ্য-সংস্থানের মানচিত্র এইরূপ ধরা যেতে পারে।

চন্দ্রবংশীয় রাজগণের মধ্যে যদু থেকে অধস্তন বিংশ পুরুষ নৃপতি শশবিন্দুই প্রথম পরাক্রান্ত হয়ে উঠেন। তিনি সম্ভবতঃ দ্রুহ্যুগণকে উত্তর-পশ্চিম-কোণাভিমুখে বিতাড়িত করেন ও সমগ্র পৌরবরাজ্য নিজের শাসনে আনেন।

তারপর আমরা দেখতে পাই, সূর্য্যবংশীয় নৃপতি যুবনাশ্বের পুত্র মান্ধাতা সম্রাট ও রাজচক্রবর্ত্তী হয়ে সমগ্র উত্তরভারত নিজের অধীনে আনেন। দ্রুহ্যু নৃপতি গান্ধারকে বিতাড়িত করে ভারতে উত্তরপশ্চিম সীমান্ত পর্য্যন্ত বিশাল সাম্রাজ্য স্থাপন করেন। গান্ধার-রাজের নাম থেকেই গান্ধার-প্রদেশের নামকরণ হয়েছে। মান্ধাতা বেদেরও এক জন মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি। মান্ধাতার প্রাচীনত্ব ও খ্যাতি থেকেই বলা হয় 'মান্ধাতার আমল'। তাঁর তিন পুত্রও ( পুরুকুৎস, অম্বরীষ ও মুচুকুন্দ ) দিগ্বিজয়িরূপে পরিগণিত। বর্ত্তমান মান্ধাতা ( ঋক্ষপর্ব্বতের সানুদেশস্থ ) মুচুকুন্দ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ইহাই পরে 'মাহিষ্মতী' নামে বিখ্যাত হয়।

অযোধ্যারাজগণের পরাক্রম বেশীদিন স্থায়ী হতে পারেনি, যেহেতু তার পরেই আমরা কান্যকুব্জরাজগণকে রাজ্যজয়োন্মত্ত দেখতে পাই। কান্যকুব্জরাজ জহ্নু এক জন বিখ্যাত নৃপতি ছিলেন। তাঁর নামানুসারে গঙ্গার নাম জাহ্নবী হয়। তিনি এক জন বিখ্যাত ঋষিও ছিলেন। জাহ্নবী-নামই তাঁর খ্যাতির সূচনা করে।

অযোধ্যার পরাক্রম অস্তগত হওয়ার ফলে যদুবংশীয়গণের এক অংশ হৈহয়গণের রাজা সাহঞ্জ রাজ্যস্থাপন করেন। তাঁর পুত্র মহিষ্মন্ত ঋক্ষপর্ব্বতস্থ দেশসমূহ জয় করেন। 'মাহিষ্মতী' তার রাজধানী হয়। তাঁর উত্তরাধিকারী ভদ্রশ্রেণ্য কাশীরাজকে পরাস্ত ও পৌরব-গণকে বিধ্বস্ত করেন। কাশীরাজ দিবোদাস ভদ্রশ্রেণ্যের পুত্রদের অধিকার থেকে নিজরাজ্য পুনরধিকার করলেও গোমতীতীরে এক রাজধানী স্থাপন ক'রে রাজত্ব করতে থাকেন। এই সময় মধ্যভারত ও দণ্ডকারণ্যস্থ জঙ্গলপ্রদেশের প্রাচীন অনার্য্যগণ রাবণনামধারী এক অনার্য্যরাজের অধীনে পরাক্রান্ত হয়ে কাশী ও বারাণসী অধিকার করে এবং অযোধ্যারাজ অনরণ্যের রাজ্যও আক্রমণ করে।

এদিকে আণবগণের রাজা মহামন যিনি বর্ত্তমান পূর্ব্ব-পাঞ্জাব প্রদেশে রাজত্ব করতেন— বিজয়লিপ্সু হয়ে নিজেকে সপ্তদ্বীপের অধিকারী

বলে ঘোষণা করেন ও বহুদূর পর্য্যন্ত রাজ্যবিস্তার করেন। এই বিশাল রাজ্য দুই পুত্রের মধ্যে বিভক্ত হয়। প্রথম পুত্র উশীনর থেকে যৌধেয় অম্বষ্ঠ নবরাষ্ট্র প্রমুখ পাঁচটি বিভিন্ন রাজবংশ স্থাপিত হয়। তাঁর বিখ্যাত পুত্র দানবীর শিবি শিবপুর স্থাপন করেন ও শিবির চার পুত্র বৃষদর্ভ মদ্র কেকয় সৌবীর নিজ নিজ নামে রাজবংশ স্থাপন করেন। এইরূপে আণবগণ সমগ্র পাঞ্জাব-প্রদেশের অধিকারী হন।

দ্রুহ্যুগণ উত্তরপশ্চিম-প্রদেশ থেকে আরও উত্তরপশ্চিম দিগ্বিভাগে বিস্তৃত হয়ে পড়েন ও কথঞ্চিৎ ভারতীয় আর্য্যগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে শকাদি জাতিগণের সঙ্গে মিশে যান। সম্ভবতঃ এঁদের থেকেই বর্ত্তমান দরদ ইত্যাদি জাতি উদ্ভূত।

মহামনের আর এক পুত্র তিতিক্ষু বিদেহ বৈশালী প্রভৃতি জয় করে দক্ষিণপূর্ব্ব দেশ-সকল অধিকারে ব্যাপৃত হন ও বর্ত্তমান বিহার-রাজ্যের পূর্ব্ব-ভাগে অঙ্গরাজ্য স্থাপন করেন। অনুমান করা যেতে পারে যে, এই কারণে এই স্থানের ভাষার সহিত পূর্ব্ব-পাঞ্জাবের ভাষার মূল-গত মিল লক্ষিত হয়।

এই সময়েই কান্যকুব্জরাজ কুশ ও তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র অমূর্ত্ত-রায়ের পুত্র গয় বিহারের আর এক অংশে রাজ্য স্থাপন ও গয়া-নামে রাজ-ধানী স্থাপন করেন। অমূর্ত্ত-রায়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা গিরিব্রজ-নামে এক নগর স্থাপন করেন।

ইতোমধ্যে শর্য্যাতগণ দিন দিন দুর্ব্বল হয়ে পড়াতে অনার্য্যগণ-কর্তৃক বিধ্বস্ত হন ও হৈহয়গণের সঙ্গে মিশে যান। তাঁরাই তালজঙ্ঘ-নামে খ্যাত হন। আনর্ত্ত ও তৎসন্নিহিত প্রদেশ-সকলে বহুকাল থেকেই ব্রাহ্মণ ভার্গবগণই হৈহয়াদি রাজবংশের পুরোহিত-রূপে বাস করতেন। কোন বিশেষ কারণে হৈহয়বংশীয়গণের সহিত তাঁদের মনো-মালিন্য হওয়াতে ভার্গবগণ পূর্ব্ব দিকে ছড়িয়ে পড়তে থাকেন এবং অত্রিবংশীয় ব্রাহ্মণগণ তাঁদের স্থলাভিষিক্ত হতে থাকেন। বিচিত্রবাহু কার্ত্তবীর্য্য-নামে এক রাজা তখন হৈহয়াধিপতি। তিনি দত্ত ও আত্রেয়-নামে দুই জন ঋষিকে নিজের পুরোহিত মনোনীত করেন। কার্ত্তবীর্য্যই বিশেষভাবে ভার্গববিদ্বেষী ছিলেন। এই বিদ্বেষের জন্য ভার্গববংশীয় ঋচীক ঋষি কান্যকুব্জরাজ গাধির কন্যা সত্যবতীকে ও তাঁহার পুত্র জমদগ্নি অযোধ্যারাজের কন্যা রেণুকাকে বিবাহ করেন। এই পরিণয়-বন্ধন তখনকার দিনে আর্য্যসমাজে ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়-আদানপ্রদান সুপ্রচলিত থাকার বিশেষ দৃষ্টান্ত-স্বরূপ ধরা যেতে পারে। কার্ত্তবীর্য্যপুত্র কার্ত্ত-বীর্য্যার্জ্জুন রাজ্যাভিষেকের পর পরাক্রমোন্মত্ত হয়ে মাহিষ্মতী অধিকার করে হৈহয় রাজধানী স্থাপিত করেন ও হিমালয় পর্য্যন্ত নিজের বিজয়লব্ধ দেশসকল শাসনে আনেন। তিনি জাঙ্গল-প্রদেশস্থ অনার্য্য রাবণরাজেরও গর্ব্ব খর্ব্ব করেন।

এদিকে কান্যকুব্জরাজ গাধির পুত্র বিশ্বরথ নিজের পুত্র অষ্টককে রাজ্যাভিষিক্ত করে রাজ্য-ত্যাগ করেন ও দেবব্রত বিশ্বামিত্র-নাম ধারণ করেন এবং বশিষ্ঠ-কর্তৃক অব্রাহ্মণ বলে অপমানিত হওয়ায় ব্রাহ্মণত্বের অধিকার-কল্পে কঠোর তপস্যায় রত হন। উপরন্তু ব্রাহ্মণসমাজ-ভুক্ত হওয়ার উদ্দেশ্যে নিজের ব্রাহ্মণ ভাগিনেয় শুনঃশেফকে দত্তকপুত্র-রূপে গ্রহণ করেন। কিন্তু ঋষিত্ব লাভ করেও তিনি সমাজে ব্রাহ্মণ বলে পরিগণিত হতে পারলেন না। তাহার কারণ এরূপ অনুমিত হয় যে, তখন বর্ণধর্ম্ম এরূপ আকার ধারণ করেছে যে, বিবাহ-ব্যাপারে বর্ণে বর্ণে আদান-প্রদান থাকলেও বর্ণবিভাগ অপরিবর্ত্তনীয় বলে গণ্য হতে আরম্ভ হয়েছে।

অপর দিকে আবার ঔর্ব্ব ঋচীক ক্ষত্রিয়গর্ব্বধ্বংস-কল্পে ধনুর্বিদ্যায় পারদর্শী হয়ে উঠে নিজের পুত্রপৌত্রগণকে ক্ষাত্রশক্তি-লাভে উৎসাহিত করতে থাকেন। কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন জমদগ্নির হত্যাসাধন করায় জমদগ্নির পুত্র পরশুরাম কার্ত্তবীর্য্যকে নিহত ক'রে হৈহয়-রাজবংশের ধ্বংস-সাধন করেন এবং ক্ষাত্র-শক্তি দেশ থেকে উৎখাত করতে প্রবৃত্ত হন। পুরাণাদি-পাঠে আমরা জানতে পারি যে, তিনি একবিংশতি বার দেশকে নিঃক্ষত্রিয় করেন। এরূপ ঐতিহ্যের অর্থ তখনই হৃদয়ঙ্গম হয়, যখন আমরা এই সঙ্গে অযোধ্যা-রাজ্যের উত্থান-পতনের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করি।

# বেদান্ত বলিতে আমি কি বুঝি

ক্রিষ্টোফার ইশারউড্

অনুবাদক—শ্রীরমণীকুমার দত্তগুপ্ত, বি-এল্

( ১ )

বেদান্ত বলিতে কি বুঝি ইহা বলিতে হইলে আমাকে স্পষ্টরূপে প্রকাশ করিতে হইবে—বেদান্ত-সম্বন্ধে জানিবার পূর্বে আমি 'ধর্ম' অর্থে কি বুঝিতাম। ইহা করিতে হইলে আমাকে অনেকগুলি বদ্ধমূল পূর্বসংস্কারের পরিচয় দিতে হইবে—ইহাদের মধ্যে কতকগুলি অত্যন্ত বুদ্ধিহীন, কতকগুলি একেবারে অহেতুক নয়, আর সব-গুলিই আজকাল জগতের সহস্র সহস্র সুবুদ্ধিমান নরনারী তাহাদের হৃদয়ে পোষণ করিয়া থাকে।

'ধর্ম' বলিতে আমি খৃষ্টধর্ম অথবা আরও বিশেষরূপে ইংলণ্ডের গির্জা বুঝিতাম—যে ধর্মে ও গির্জায় শিশুকালে আমার অভিষেক (baptism) হইয়াছিল। অন্যান্য খৃষ্টীয় সম্প্রদায়গুলিকে সন্দেহ বা অবজ্ঞা করিতে আমি উৎসাহিত হইতাম; আমার চক্ষে ক্যাথলিকগণ ঐতিহ্যপরম্পরায় অ-ইংরেজ এবং হীন আন্তর্জাতিক রাষ্ট্রনীতিতে লিপ্ত ছিল; ননকনফর্মিষ্টগণকে সাধারণ ও মধ্য-বিত্তশ্রেণীভুক্ত মনে করিতাম। হিন্দু, বৌদ্ধ ও মুসলমানগণ আমার নিকট কেবলমাত্র সুসজ্জিত বিধর্মী বলিয়া প্রতিভাত হইত—ইহারা জগন্নাথের রথতলে নিজদিগকে নিক্ষেপ করে, মসজিদের চূড়া হইতে সকরুণ চীৎকার করে এবং প্রার্থনাকালে চক্রের মত ঘুরিতে থাকে। ইহারা মোটেই ধার্মিক বলিয়া পরিগণিত হইতে পারিত না। অভিজাত প্রোটেষ্টান্ট জমিদার-পরিবারভুক্ত হইয়া আমি উত্তরাধিকারসূত্রে এই সকল মনোভাব প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। আমি একটি ছোট দ্বীপে বাস করিতাম—ঐ দ্বীপটি সেই সময়ে এক বিশাল ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যের কেন্দ্র ছিল।

শৈশবের ধর্মাভিষেকের ফলে অসন্তুষ্ট খৃষ্টানগণ গির্জার প্রতি স্বতঃ বিদ্বেষ পোষণ করে। তাহারা বলে—বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে স্বাধীন ইচ্ছা জন্মিবার পূর্বে তোমাকে বলপূর্বক কেন ধর্মাভিষেকের যূপকাষ্ঠে বলি দেওয়া হয়? এই প্রশ্নের উত্তরে গির্জা বলে—সমর্থনজ্ঞাপক ধর্মীয় অনুষ্ঠান (ceremony of confirmation) প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিকে শৈশবকালের ধর্মবিশ্বাস স্বেচ্ছায় গ্রহণ বা পরিবর্জন করিবার সুযোগ দিয়া থাকে। দুর্ভাগ্যবশতঃ অন্যান্য বহুলোকের ন্যায় আমার সম্বন্ধে অনুমোদনের অনুষ্ঠান মোটেই স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয় নাই। বিদ্যালয়ে স্বতঃই বুঝিয়াছিলাম যে, ঐরূপ একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠান হইবে, কিন্তু আমার সমর্থন-প্রাপ্তির জন্য যথেষ্ট নৈতিক বলপ্রয়োগ করা হইয়াছিল। অবশ্য আমি আমার অসম্মতি জানাইতে পারিতাম—যেমন আমার জনৈক বন্ধু জানাইয়াছিল—কিন্তু ইহাতে প্রভূত স্বাতন্ত্র্য ও মনোবলের দরকার। এই দুইটি গুণের একটিও আমার ছিল না; সুতরাং আমি সম্মতি দিয়াছিলাম।

সমর্থনজ্ঞাপক ধর্মীয় অনুষ্ঠানের অনতিকাল পরে বুঝিতে পারিলাম যে, আমি আমার বিশ্বাস হারাইয়াছি—অথবা সঠিক বলিতে গেলে বলিতে হয়, আমার কখনও কোন বিশ্বাস ছিল না। আমার যখন বিশ বৎসর বয়স তখন আমি

নিজকে নিরীশ্বর বা নাস্তিক বলিয়া ঘোষণা করিলাম এবং পরবর্তী পনর বৎসর পর্যন্ত আমি নাস্তিকই রহিয়া গেলাম। আমি প্রকাশ্যে ও অপ্রকাশ্যে ধর্মের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করিতাম এবং বলিতাম যে, ধর্ম অনিষ্টকর কুসংস্কারযুক্ত প্রতিক্রিয়াশীল নির্বুদ্ধিতা; আমি সোৎসাহে স্বীকার করিতাম যে, ধর্ম বাস্তবিকই 'জনগণকে অভিভূত করিবার আফিম্' ('the opium of the people')। দুই-এক জন ব্যতীত আমার বন্ধুগণ সকলেই আমার এই মতের সমর্থন করিত। এইজন্য এই বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনার প্রয়োজনীয়তা মোটেই অনুভব করি নাই। যাহা হউক, যদি আমি প্রয়োজন বোধ করিতাম, তাহা হইলে সম্ভবতঃ নিম্নলিখিত ভাবে অল্প-বিস্তর আলোচনা করিতাম।

প্রথমতঃ, খৃষ্টধর্মের প্রতি আমার অনুরাগ ছিল না, কারণ ইহা দ্বৈতমূলক। ঈশ্বর স্বর্গলোক হইতে আমাদিগকে—তাঁহার হীন ও পাপী সন্তানদিগকে নির্মম ও ভীতিপ্রদ কঠোরতার সহিত শাসন করিতেছেন। তিনি ভাল, কিন্তু আমরা মন্দ। আমরা এতদূর মন্দ যে, যখন তিনি তাঁহার পুত্রকে আমাদের মধ্যে বাস করিবার জন্য প্রেরণ করিলেন, তখন আমরা নিঃসঙ্কোচে ও ক্ষিপ্রতার সহিত তাঁহাকে ক্রুশবিদ্ধ করিয়াছিলাম। প্রায় দুই হাজার বৎসর পূর্বে অনুষ্ঠিত আমাদের এই অপকর্মের জন্য আমাগিকে বংশপরম্পরাক্রমে ক্ষমাভিক্ষা করিতে হইতেছে! যদি আমরা আন্তরিকভাবে ক্ষমাভিক্ষা করিতাম এবং অনুতপ্ত হইতাম, তাহা হইলে আমরা নরকে প্রেরিত না হইয়া স্বর্গে যাইবার অধিকারলাভ করিতাম।

এরূপ এক ঈশ্বরসম্বন্ধে ধারণার বিরুদ্ধে কে বিদ্রোহী না হয়? কে তাঁহার স্বৈরাচারকে অবজ্ঞা না করে? কে এরূপ পরীক্ষার সম্পূর্ণ অযৌক্তিকতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ না করিবে—যে পরীক্ষায় এক ক্ষণস্থায়ী জীবনে আমাদিগকে মুক্তিলাভ অথবা অনন্ত নরকভোগ করিতে হইবে? কে ঈশ্বর-পুত্রকে ঘৃণা না করিবে—যিনি নম্রতার মুখোশ পরিয়া তাঁহার বিরুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতা করিবার জন্য আমাদিগকে প্রলুব্ধ করিতে ছদ্মবেশী প্ররোচকরূপে আমাদের নিকট আসিয়াছিলেন? এই সকল প্রশ্নই আমার মনে জাগিয়াছিল এবং উত্তরস্বরূপ আমি সিদ্ধান্ত করিয়াছিলাম যে, কেবলমাত্র ক্রীতদাসগণ এরূপ ধর্ম গ্রহণ করিতে পারে। যদি নরক বলিয়া কিছুর অস্তিত্ব থাকে (আমি নরকের অস্তিত্ব মোটেই স্বীকার করি না), তবে আমি গর্বের সহিত নরকভোগ করিতে প্রস্তুত আছি। নরকে সৎ ও সাহসী নর-নারীর সহিত সাক্ষাৎকারের সম্ভাবনা আছে।

আমি দেখিতাম, খৃষ্টধর্ম যেন কতকগুলি নেতিমূলক ভাবের সমষ্টি; তুমি সম্ভবতঃ যাহা করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলে উহাই পাপ বলিয়া নিষিদ্ধ ছিল। আমি পিউরিট্যান্ বা নৈষ্ঠিক আদর্শবাদী পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়াছি; যখনই 'পাপ'-শব্দ উচ্চারিত হয়, তখনই জন্মগত নৈষ্ঠিকতাবশতঃ আমার মনে দ্বন্দ্ব আত্মপ্রকাশ করে। এই সকল নেতিমূলক ভাবের বিরুদ্ধে আমি এরূপ সক্রিয়ভাবে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছিলাম যে, প্রতি পাপানুষ্ঠানকেই অবজ্ঞার চক্ষে দেখিতাম।

আমার আশে-পাশে খৃষ্টানদের দিকে তাকাইয়া আমি দেখিতাম তাহারা যেন এক দল নিরানন্দ নাকীসুরে বচনবাগীশ কপটাচারী অজ্ঞ প্রতিক্রিয়াশীল ধর্মপ্রচারক—তাহারা পাছে তাহাদের গির্জার প্রতিষ্ঠা ও অধিকার ক্ষুণ্ণ হয় এবং জনগণ নিজেরাই বুঝিতে পারে যে নেতিমূলক ভাবগুলি অনাবশ্যক, এই জন্য তাহারা সর্বপ্রকার

সমাজসংস্কার ও ব্যক্তি-স্বাধীনতার বিরোধী। আমি তাহাদের রবিবাসরীয় কৃত্রিম পরিচ্ছদ, গম্ভীর মুখমণ্ডল, দুর্বল নম্রতা, রসিকতারাহিত্য, ঈশ্বর-প্রসঙ্গকালে বিশেষজাতীয় কণ্ঠস্বর, বৃষ্টি স্বাস্থ্য ও যুদ্ধে জয়লাভের জন্য সকাম প্রার্থনা আমি পছন্দ করিতাম না। আমার মনে হইত, প্রত্যেক খৃষ্টান নিষিদ্ধ আমোদ-প্রমোদে লিপ্ত হইবার জন্য মনের নিভৃতকোণে ইচ্ছা পোষণ করিতেছে এবং ভীরুতা, ঘৃণা ও অক্ষমতা-হেতু ঐ সকল কার্য হইতে বিরত হইতেছে। ধর্মযাজকদের বিপথে গমন এবং সন্ন্যাসী বা সন্ন্যাসিনীদের গুপ্ত প্রেমের কাহিনীগুলি শুনিতে ও পড়িতে আনন্দ পাইতাম। তাহাদের বিরুদ্ধে আমার বিদ্বেষ ছিল অপরিসীম। আমি ইহাও বলিতাম যে, আমার নিজস্ব আদর্শানুসারে চরিত্র বিশুদ্ধ রাখিবার জন্য ধর্মের কোন প্রয়োজন নাই। দ্বাদশ অনুশাসন অথবা নরকের ভীতির জন্য আমি সদ্ভাবে জীবন-যাপনের চেষ্টা করি নাই; বিবেকের নির্দেশ অনুসরণ করিয়া স্বাধীনভাবে চলিবার ইচ্ছা থাকাতেই আমি সদ্ভাবে জীবন কাটাইতে চেষ্টা করিয়াছি।

এক জন মনোবিৎ হয়ত আমাকে বলিতে পারিতেন কি পরিমাণে এই সকল অতিরঞ্জিত প্রতিক্রিয়া পিতৃ-মনোভাব অথবা প্রভুত্বাশঙ্কাজনিত শৈশবের অভিজ্ঞতা হইতে উদ্ভূত হইয়াছিল। বক্ষ্যমাণ বিষয়-সম্পর্কে একথা খাটে না। কারণ আমার বদ্ধমূল পূর্ব সংস্কারগুলি কেবল স্নায়বিক-রোগজনিত ছিল না, বাস্তব ঘটনাবলীর সহিত ইহাদের মুখ্য সম্বন্ধ ছিল। সংঘবদ্ধ ধর্মের কতক-গুলি দিক আছে, যাহাদিগকে আমি এখনও কদর্য বলিয়া বিশ্বাস করি। আমি দেখাইতে চেষ্টা করিতেছি যে, জীবনের সেই সময়ে ধর্ম-সম্বন্ধে আমার মত বিকৃত ও অত্যন্ত অসম্পূর্ণ ছিল।

যদিও আমি নিজেকে নাস্তিক বলিতাম, তথাপি আমার একটা ধর্ম অথবা ধর্মের একটি বা দুইটি বিকল্প ছিল, কারণ আমার বিশ্বাস কতকটা বিরোধী ছিল। তন্মধ্যে প্রথমটি কলাবিদ্যায় বিশ্বাস। ইতোমধ্যে আমি বুঝিতে পারিলাম যে, আমার কিঞ্চিৎ সাহিত্যিক প্রতিভা আছে। আমি বিশ্বাস করিতাম যে, আমি যথাশক্তি ঐ বিদ্যার চর্চায় আত্মনিয়োগ করিব এবং উহার প্রতিবন্ধকগুলি দূর করিবার প্রয়াস পাইব। প্রবীণ সাহিত্যিকদের কথা শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করিতাম এবং ভাবিতাম তাঁহারা তাঁহাদের অনুপ্রেরণাগুলিকে রূপদান করিবার জন্য কিরূপ নির্ভীকভাবে দারিদ্র্য, সাধারণের অবজ্ঞা, অসুস্থতা, এমন কি কারাগার ও মৃত্যুকেও বরণ করিতে কুণ্ঠাবোধ করেন নাই। তাঁহাদিগকে আমি ঋষিকল্প ব্যক্তি বলিয়া মানিতাম এবং দীন শিক্ষানবিশ-রূপে তাঁহাদের আদর্শ অনুসরণ করিবার জন্য উৎসুক ছিলাম।

অনুসরণ করিতে পারিলে শিল্পীর এই ত্যাগোজ্জ্বল আদর্শ অতি সুন্দর। দুর্ভাগ্যক্রমে খুব অল্পসংখ্যক শিল্পীই এরূপ আদর্শ পালন করে। আমি নিজেও এই আদর্শ পালন করি নাই। প্রকৃতপক্ষে সাহিত্য-সাধনার প্রতি আমার মনোভাব সম্পূর্ণরূপে উদ্ধত ও আন্তরিকতাহীন ছিল। আত্মপ্রকাশের কথঞ্চিৎ ঝোঁক ছিল বলিয়া আমি নিজেকে সাধারণ লোকের অতি ঊর্ধ্বে এক বিশেষ ব্যক্তি বলিয়া মনে করিতাম। সত্যসত্যই আমি নিজকে 'উদ্ধারপ্রাপ্ত' ভাবিতাম। আমার প্রতিভার সদ্ব্যবহারের কথা অনেক বলিতাম, কিন্তু আমার কথার যথার্থ অর্থ এই ছিল যে, অন্যান্য লোক তাহাদের প্রতিভার সদ্ব্যবহার করুক, তাহারা যদি আমাকে গল্প লিখিবার কার্যে পরোক্ষভাবেও সাহায্য করিতে পারে তবে তাহারা নিজদিগকে সম্মানিত মনে

করিবে। সর্ববিধ অভিজ্ঞতা-গ্রহণের আবশ্যকতা-সম্বন্ধেও আমি অনেক কথা বলিতাম, যেহেতু অভিজ্ঞতাই শিল্পের প্রাথমিক উপকরণ। কিন্তু কার্যতঃ আমি শুধু উপভোগ্য অভিজ্ঞতাগুলিই গ্রহণ করিতাম। দারিদ্র্য ও জনগণের উপহাসের সম্মুখীন হইতে আমি নিতান্তই অনিচ্ছুক ছিলাম। আমি গোপনে ভাবিতাম, আমাপেক্ষা অধিকতর ধনী ও কম প্রতিভাসম্পন্ন বন্ধুগণের আমাকে সমর্থন করা উচিত। আমার গ্রন্থগুলির বিরূপ সমালোচনা বাহির হইলে আমি অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইতাম। সামান্য সফলতা লাভ করিলেই আমার গর্বের সীমা থাকিত না। ত্রিশ বৎসর বয়সে সাহিত্যিক-গোষ্ঠীতে আমার বেশ একটা সুনাম হইল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এরূপ জীবনের প্রতি অনেক সময় বিতৃষ্ণা জন্মিত এবং অস্বস্তির সহিত আশ্চর্য বোধ করিতাম যে, শুধু গ্রন্থকার হওয়ার জন্য এবং সংবাদপত্রে নাম কিনিবার জন্য পুস্তকের পর পুস্তক লিখিয়া যাওয়া প্রকৃতপক্ষে মানুষের উচ্চাকাঙ্ক্ষার পরাকাষ্ঠা কি না।

ইতোমধ্যে আমার এক দ্বিতীয় বিশ্বাস—সমাজসংস্কারে বিশ্বাস জন্মিল। এই বিশ্বাস আমার অপর বিশ্বাসের পরিপন্থী ছিল, কারণ ইহা দ্বারা সর্বজনের সমানাধিকার স্বীকার করিতে হইত। শিল্পী হিসাবে বিশেষ অধিকারের সহিত আমার সম্পর্ক ছিল এবং আমার গ্রন্থগুলির দোষগুণ-বিচারের ভার সাধারণ শ্রেণীর লোকদ্বারা গঠিত সাহিত্য-সমিতির উপর অর্পণ করিতে ইচ্ছা করি নাই। সমাজ-সংস্কার সুন্দর আদর্শ—ইহাতে যে কোন ব্যক্তি আত্মনিয়োগ করিতে পারেন। কিন্তু আমি যদি যথার্থই ঐ কার্যে আত্মনিয়োগ করিতাম, তাহা হইলে আমাকে আমার স্বকীয় সাহিত্য-সাধনা পরিত্যাগ করিয়া রাজনৈতিক সাংবাদিকতা ও প্রচারকার্যে লিপ্ত হইতে হইত। এ কার্য করিতে আমি ইচ্ছুক ছিলাম না। অতএব ধর্মের পরিবর্তে আমি যে দ্বিতীয় অনুকল্প গ্রহণ করিয়াছিলাম, উহাও প্রথম অনুকল্পের ন্যায় কার্যকর হয় নাই।

স্পেনের গৃহযুদ্ধ আরম্ভ হইলে সাধারণতন্ত্রী গভর্নমেণ্টকে সমর্থন করিবার জন্য আমি আমার বন্ধুবর্গ এবং বহুসংখ্যক ইংরেজ লেখকের সহিত যোগদান করিলাম। তখন আমাদের মনে হইয়াছিল যে, গভর্নমেণ্ট সম্পূর্ণরূপে ঠিক পথে চলিয়াছে, আর শত্রুগণ পুরোপুরি বিপথগামী হইয়াছে। ঘটনা এরূপ দাঁড়াইলে আমরা বিশ্বাস করিলাম যে, সর্বশক্তি প্রয়োগ করিয়া বিপক্ষকে পর্যুদস্ত করিবার অধিকার গভর্নমেণ্টের আছে। কিন্তু যুদ্ধ যতই চলিতে লাগিল ততই ইহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইল যে, আমরা যাহা বিবেচনা করিয়াছিলাম তদপেক্ষা জটিলতর পরিস্থিতি উপস্থিত হইয়াছে। গভর্নমেণ্টের ভিতরে থাকিয়া কতকগুলি দল ক্ষমতালাভের জন্য লড়াই করিতেছিল। তাহাদের আদর্শ ছিল বিভিন্ন এবং উদ্দেশ্য-সাধনের জন্য তাহারা পরস্পরের বিরুদ্ধে কুৎসা-রটনা, বিবাদ ও হত্যাকাণ্ডে লিপ্ত হইয়া সাধারণতন্ত্রী শাসন-ব্যবস্থার পতন ঘটাইতে ইতস্ততঃ করিত না। আমি তখন উপলব্ধি করিতে লাগিলাম যে, অসদুপায় অবলম্বন করিয়া সদুদ্দেশ্য কখনও সাধিত হইতে পারে না। ১৯৩৮ খৃঃ-এ যুদ্ধের সংবাদ-দাতা হইয়া চীনে গিয়া যখন স্বচক্ষে দেখিলাম অ-সামরিক অধিবাসিগণের উপর বোমাবর্ষণ এবং পুরোবর্তী পরিখায় যুদ্ধ করিবার জন্য শিশুগণের উপর বাধ্যতামূলক আইনজারী হইয়াছে, তখন আমি বুঝিলাম সহানুভূতির অভাব ও চিন্তাহীনতাবশতঃই আমি সশস্ত্র সংগ্রামকে সমাজ-সংস্কারের একটি সমর্থন-যোগ্য উপায়রূপে গ্রহণ করিয়াছিলাম। সত্য ও ন্যায়ের জন্য যাঁহারা সংগ্রাম করিতেন তাঁহাদিগকে

আমি সর্বদাই সম্মান করিতাম, কিন্তু ভবিষ্যতে আমি নিজকে প্রকাশ্যভাবে এক জন শান্তিবাদী বলিয়াই পরিচয় দিব।

১৯৩৯ খৃষ্টাব্দের প্রথম ভাগে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন ও অব্যবস্থিত চিত্তে আমি যুক্তরাষ্ট্রে আসিলাম। তথনও আমি গ্রন্থরচনার কার্য চালাইয়া যাইবার সঙ্কল্প করিলাম, কিন্তু স্বয়ংসম্পূর্ণ খাঁটি শিল্পী হিসাবে জীবনধারণ করিবার কোন যৌক্তিকতা পাইলাম না। আমি তথনও সমাজসংস্কারে বিশ্বাস করিতাম, কিন্তু বলপ্রয়োগ ও মিথ্যাপ্রচার-কার্য দ্বারা সমাজের সংস্কারসাধনে আমার বিশ্বাস আর রহিল না। জীবনের সার্থকতা খুঁজিয়া বাহির করিবার প্রবল আগ্রহ আত্মপ্রকাশ করিল, কিন্তু আমার পূর্ব বিশ্বাসগুলি একেবারেই অসমীচীন বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল এবং আমি তথনও তথাকথিত ধর্মের বিরুদ্ধে তীব্র বিদ্বেষ পোষণ করিতাম। আমার নবাবিষ্কৃত শান্তিপ্রিয়তা জীবন-গঠনের ভিত্তিস্বরূপ এতদূর সীমাবদ্ধ ও নেতিভাবাত্মক ছিল যে, যুদ্ধ ঘোষিত হইলে যুদ্ধে যোগদানে বিরত থাকিবার সিদ্ধান্তেই শুধু ইহা পর্যবসিত হইত। মনের এইরূপ উদ্বিগ্ন ও অব্যবস্থিত অবস্থায়ই আমি প্রথম বেদান্তশিক্ষার সংস্পর্শে আসিলাম। *

( পরবর্তী সংখ্যায় সমাপ্য )

* 'Vedanta and the West' ( বেদান্ত য়্যাণ্ড দি ওয়েষ্ট )-নামক ইংরেজী মাসিকপত্রে ( সেপ্টেম্বর-অক্টোবর, ১৯৫১ ) প্রকাশিত 'What Vedanta Means to Me' প্রবন্ধের বঙ্গানুবাদ।

# বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ

শ্রীশশাঙ্কশেখর চক্রবর্ত্তী, কাব্যশ্রী

নবভারতের হে পথদ্রষ্টা, জাগো তুমি সম্মুখে,
মুক্তিমন্ত্রে দাও নব আশা অবসাদ-ভরা বুকে।
মানুষের মাঝে দাও মানবতা, চিত্তদৈন্য নাশো,
রামকৃষ্ণের দীপ্ত সাধনা অন্তরে পরকাশো।
দূর কর পাপ, যত সন্তাপ, দূর কর মলিনতা,
ঘুচাও দুঃখ, ঘুচাও আর্ত্তি, ঘুচাও বেদনা-ব্যথা।
জাগো সন্ন্যাসী বীর!
নিজ হাতে তুমি মুছে দাও গ্লানি-অভিশাপ ধরণীর।

আজিকে দম্ভ তুলিয়াছে শির, করিছে সর্ব্ব জয়,
দিকে দিকে তাই জাগে হানাহানি' নিখিল বিশ্বময়।
মানুষের মাঝে উন্মাদ পশু ধরেছে করাল-বেশ,
ধ্বংস-দৃশ্য করিছে রচনা স্বার্থ-হিংসা-দ্বেষ।
মৈত্রী-শান্তি-প্রীতি-ভালবাসা, নাই আজ কোনখানে,
আদিম মানুষ জেগেছে আবার উলঙ্গ অভিযানে।
রোধো এ ধ্বংস-গতি,
দিব্য-প্রেরণা দাও তুমি প্রাণে, কর মানবতাব্রতী!

শত-অপমানে জর্জ্জর আজ মানুষের নারায়ণ,
নিঃস্বতা মাঝে ক্লিষ্ট আত্মা করিতেছে ক্রন্দন।
সমাজের দেহ ছিন্ন ভিন্ন, হেরি যেন নাই প্রাণ,
যত নির্জ্জীব মৃত-কঙ্কাল হতেছে দৃশ্যমান।
ভারতের মাটি কলঙ্কে দীন, অতীত-গরিমা-হারা,
বহে নাক আর গঙ্গা-যমুনা পবিত্র স্রোত-ধারা।
আঁধারে ভরেছে দিশি,
মৃত্যু-শ্মশানে প্রাণের চিহ্ন ভস্মে গিয়েছে মিশি।

আকাশে ছেয়েছে দুর্দ্দিন-মেঘ, ঝড়ের আভাস আসে,
অবোধ যাত্রী পথ-ভ্রষ্ট, কাঁদে বিপদের ত্রাসে।
ক্ষুব্ধ-সাগরে তরী টলমল, মাঝি আজ দিশাহারা,
পথের লক্ষ্য দেখায় না আর জীবনের ধ্রুব-তারা।
সূর্য্য-বিহীন আঁধার-রাত্রে নিভেছে দীপের শিখা,
হৃদয়ে হৃদয়ে জাগিছে ভয়াল মরণের বিভীষিকা।
পথ নাই, পথ নাই,
হে মরণজয়ি, আমাদের মাঝে আবার তোমাকে চাই!

মহাভারতের পাঞ্চজন্য ধর বীর তব করে,
নির্জ্জীব বুকে দাও সাড়া দাও মেঘগম্ভীর স্বরে।
যুগ-সঞ্চিত অত্যাচারের কর তুমি প্রতিকার,
গাণ্ডীবে আজ দাও উত্তর, তোল ভীম টঙ্কার।
তোমার বাণীতে জাগুক বিশ্ব রাতের আঁধার টুটে,
যাক্ পশুত্ব, দেবত্ব-রূপ হৃদয়ে উঠুক ফুটে।
জাগো বীর সন্ন্যাসী,
তোমার জীবনে লভুক জীবন আজিকে বিশ্ববাসী!

এই ভারতের যে মহাসাধনা রয়েছে সুপ্তপ্রায়,
মহাজীবনের যে অমিত তেজ ক্রমে ক্রমে নিভে যায়,
যে মহাশক্তি-প্লাবনের ধারা মরুপথে হয় হারা,
যে আশা এখনো পাষাণ-কারায় রয়েছে বন্দী পারা,
তা'রে দাও রূপ, তা'রে দাও ভাষা, তা'রে দাও তুমি প্রাণ,
মহাজাগরণ-লগ্নে আবার শুনাও বোধন-গান।
অরুণ-কিরণ-রাগে,
নবভারতের রাঙাও আকাশ, জাগো তুমি পুরোভাগে!

# নাট্যসাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ

অধ্যাপক শ্রীবিভূতিভূষণ ঘোষ, এম্‌-এ

মানুষের জীবন অপার রহস্যময়; তাহার যাত্রাপথ বন্ধুর ও কণ্টকাকীর্ণ। জীবনের প্রতি মুহূর্ত্তেই আন্তর ও বাহ্য ঘটনা তাহার চরিত্র ও প্রকৃতির উপর প্রভাববিস্তার করিতেছে। এই প্রভাবের ফলে মানবজীবন নানারূপ বৈচিত্র্যে মুখর হইয়া উঠিতেছে। মানুষের সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষা, আনন্দ-বেদনার রহস্যঘন বৈচিত্র্যই তাহার জীবন-নাট্যের রসদ যোগাইতেছে। নাট্যকার এই সব ঘটনাপ্রবাহের অন্তরালে থাকিয়া সমস্যাজটিল মানবজীবনের চিত্র অঙ্কিত করিয়া থাকেন। মানবজীবনের এই দ্রুত আবর্ত্তনের গতিলীলাকে লক্ষ্য করিয়া তাহার মর্ম্মকথাটি পাত্র-পাত্রীর চরিত্রচিত্রণের মধ্য দিয়া পরিস্ফুট করিয়া তোলাই নাট্যকারের একমাত্র কাজ। মানুষের অন্তর্নিহিত সহজাত শক্তি ও দুর্ব্বলতার আশ্রয়ে নিরন্তর যে অপরিমেয় জটিলতার সৃষ্টি হইতেছে, তাহার অবিকল চিত্রণেই নাট্যকারের কৃতিত্ব। যেখানেই নাট্যকার স্বীয় রুচি-অনুসারে নাটকের ঘটনাস্রোত ও পাত্র-পাত্রীর চরিত্রকে নিয়ন্ত্রিত করিবার চেষ্টা করেন, সেইখানেই তাঁহার সৃষ্টি হয় পঙ্গু ও ভারাক্রান্ত। সেইজন্য প্রত্যেক নাট্যকারের দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে একটা বস্তু-ধর্ম্মিতা থাকা একান্ত আবশ্যক; বাহিরের জগতে ঘটনাবলী সদাসর্ব্বদা যে ভাবে ঘটিয়া থাকে, তাহাকে অবিকল সেইভাবেই রূপায়িত করা নাট্যকারের একমাত্র কর্ত্তব্য। নাট্যকার থাকিবেন ঘটনার অন্তরালে, নাট্যসাহিত্যে গ্রন্থকার হইবেন শুধু দ্রষ্টা—প্রচলিত নাট্যরীতির ইহাই প্রথম ও প্রধান দাবী।

রবীন্দ্রনাথের নাট্যসাহিত্যে কিন্তু এই বস্তুনিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গীর কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। তাঁহার নাটকগুলি বিশদভাবে আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, তাঁহার ব্যক্তিগত সৌন্দর্য্যদৃষ্টি ও দার্শনিক চিন্তাই প্রাধান্যলাভ করিয়াছে; তাঁহার নিজের মনের সূক্ষ্মতম অনুভূতি ও তাঁহার নিজের জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতাই তাঁহার নাটকগুলির মধ্যে রূপায়িত হইয়াছে। তাঁহার প্রকাশভঙ্গীর মধ্যে বৈচিত্র্য আছে সত্য, কিন্তু তাঁহার প্রকাশবস্তু সকলক্ষেত্রেই এক ও অভিন্ন। সে প্রকাশ—আত্ম-প্রকাশ; রবীন্দ্রনাথের নিজের স্বরূপটিই তাঁহার নাটকের মধ্যে নানা ভাবে, নানা রূপে, নানা ছন্দে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। যে জীবনের ছবি তিনি তাঁহার নাটকের মধ্যে চিত্রিত করিয়াছেন, তাহা প্রচলিত সামাজিক ও নৈতিক রীতি-নীতির দ্বারা সীমাবদ্ধ জীবন নহে; এই স্থূল রীতি-নীতির বাহিরে মানুষের যে সূক্ষ্মতর ও বৃহত্তর জীবন আছে, তিনি তাহারই ছবি অঙ্কিত করিয়াছেন। এই কারণেই, বাংলা নাটকের ক্রমপরিণতির ধারার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের নাটকের কোন যোগ বা সামঞ্জস্য নাই। রবীন্দ্রনাথের নাটক এবং অন্যান্য বাংলা নাটক—এই দুই-এর মধ্যে যেন কত যুগযুগান্তরের প্রভেদ।

রবীন্দ্রনাথের সমস্ত নাটকের মধ্যে রূপক বা সাঙ্কেতিক নাটকগুলিই প্রধান। তাঁহার নাট্য-শিল্পের যে আসল রূপ তাহা এই রূপক-নাটকগুলির মধ্যেই পাওয়া যায়। রূপক-নাটকে রবীন্দ্রনাথ সত্যসত্যই অতুলনীয় ও অপরাজেয়। তাঁহার প্রতিভা এই নাটকগুলির মধ্যে সকল সময়েই

একটা অচিন্ত্য ও অতীন্দ্রিয় ভাবজগতের সন্ধানে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছে। ইহাদের মধ্যে বস্তুর সহিত সম্পর্ক নিতান্তই অল্প, ভাবের লীলা-সঙ্গীতই মুখ্য; সেইজন্য এই রূপক-নাটকগুলির মধ্যে মর্ম্মের অন্তর্নিহিত সুরধারা নানা রূপে ও নানা ছন্দে মুখর হইয়া উঠিয়াছে; রূপের পশ্চাতে অরূপের যে গোপন সঙ্কেত, সীমার অন্তরালে অসীমের যে আভাস-ইঙ্গিত, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের নেপথ্যে যে অতীন্দ্রিয় ভাবলোক—এই নাটকগুলি তাহাকে ধরিবার বিচিত্র প্রয়াস ব্যতীত আর কিছুই নহে। সংক্ষেপে বলিতে গেলে ঐই রূপক-নাটকগুলি রবীন্দ্রনাথের ভাবময় অন্তরের গোপন লীলাচাঞ্চল্যের স্বতঃস্ফূর্ত্ত বাহ্য প্রকাশ।

তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী নাটকগুলির মধ্যে কোন রহস্যময় ইঙ্গিত বা অস্পষ্ট ছায়া নাই। ইহারা অনেকটা প্রচলিত সাধারণ নাটকের লক্ষণাক্রান্ত, কিন্তু ইহাদের অন্তর্নিহিত সংঘাতের প্রকৃতি মূলতঃ এক ও অভিন্ন; সে সংঘাত ধর্ম্মবিরোধের সংঘাত। প্রকৃত ও স্বাভাবিক ধর্ম্মজ্ঞানের সহিত আনুষ্ঠানিক ধর্ম্মমতের সংঘর্ষই এই নাটকগুলির প্রধান উপজীব্য। রবীন্দ্রনাথের এই সমস্ত নাটকের মধ্যে নাটকোচিত রূপের বিকাশ বিশেষ কিছুই নাই। নাটকের যে সমস্ত সাধারণ রীতি-নীতি আছে, রবীন্দ্রনাথের নাটকে তাহাদের কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না। নাটকের চির-প্রচলিত আদর্শ কোথাও তিনি অনুসরণ করেন নাই। বাহ্য ঘটনার তীব্র সংঘাতই সাধারণ নাটকের মূল লক্ষণ, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের নাটকে বাহ্য ঘটনার সংঘাত নাই বলিলেই চলে। তাহা ছাড়া রবীন্দ্রনাথের নাটকে নাটকীয় ধর্ম্ম অপেক্ষা গীতিধর্ম্মেরই প্রাধান্য বেশী। গীতিধর্ম্মের প্রাধান্য ও প্রাবল্য-হেতু তাঁহার নাটকের নাটকীয় মর্য্যাদা যথেষ্ট ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। গীতিধর্ম্মের প্রবাহ অনেকটা একটানা, কিন্তু নাটকের প্রবাহ বৈচিত্র্যময়। এই বৈচিত্র্যের অভাবে রবীন্দ্রনাথের নাটকে নাটকের মুখ্য উদ্দেশ্য শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হইয়াছে। বোধ হয় একমাত্র এই কারণেই Dr. E. J. Thompson মন্তব্য করিয়াছেন: "His earlier dramas reached an achievement which he failed to carry to fulfilment."

এই নাটকগুলির পরেই রবীন্দ্রনাথের নাট্য-সাহিত্যে সাঙ্কেতিকতার সূত্রপাত হয়। রূপক বা সাঙ্কেতিক নাটক বাংলা-সাহিত্যে সম্পূর্ণ নূতন; রবীন্দ্রনাথের পূর্ব্বে বা পরে আর কেহ এই নূতন ধরনের নাটক রচনা করেন নাই। রূপক-নাটক রবীন্দ্রনাথের সম্পূর্ণ নিজস্ব প্রতিভার অপরূপ সৃষ্টি এবং রসানুভূতির সর্ব্বজনীনতায় অপূর্ব্ব ও অনুপম। বস্তু অপেক্ষা বস্তু-নিরপেক্ষ ভাবের ক্ষেত্রেই রবীন্দ্র-প্রতিভার উজ্জ্বলতর প্রকাশ; তাই দেখিতে পাওয়া যায়, বাস্তব জগৎ অপেক্ষা অতীন্দ্রিয় ও আধ্যাত্মিক ভাবরাজ্যে রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য অধিকতর পুষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। বস্তুজগৎকে উপেক্ষা করিয়া নিজের অন্তর-প্রেরণাকেই একমাত্র মূলধন করিয়া রবীন্দ্রনাথ অরূপের সাধনায় অগ্রসর হইয়াছেন। সেইজন্য তাঁহার রূপক-নাটকে বাহ্যক্রিয়াকে উপেক্ষা করিয়া মনোজগতের কোন বিশেষ অনুভূতি বা ভাবধারাকে রূপায়িত করিবার একটা প্রবল প্রয়াস দেখা যায়। বস্তুজগৎ উপেক্ষিত হইয়াছে বলিয়াই অতীন্দ্রিয় রাজ্য কবি-মানসকে অধিকতর নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে। এই স্থূল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের ঘটনা রবীন্দ্রনাথের মনের উপর খুব বেশী প্রভাব-বিস্তার করে নাই, কিন্তু মনোজগতের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অনুভূতি ও রসচেতনা তাঁহার সমগ্র সত্তা ও কবি-মানসকে উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া তুলিয়াছে। এই অতীন্দ্রিয় ও আধ্যাত্মিক অনুভূতিই রবীন্দ্রসাহিত্যের ভিত্তি এবং এই বিশিষ্ট ভাবদৃষ্টিকে অবলম্বন করিয়াই রবীন্দ্রপ্রতিভার পরিপূর্ণ প্রকাশ।

রবীন্দ্রনাথের রূপক-নাটকগুলিরও প্রধান

বৈশিষ্ট্য রূপের মধ্যে অরূপের ব্যঞ্জনা। এই যে বিশ্বপ্রকৃতি ইহা সেই চিরসুন্দরের রূপের প্রতিচ্ছবি —প্রকৃতির মধ্য দিয়া প্রকৃতির অধীশ্বরের গোপন প্রকাশ। বিশ্বপ্রকৃতির রাজ্যে যে আবর্ত্তন-বিবর্ত্তন ও ঋতু-পর্য্যায়ের নব নব চিত্র নিরন্তর ফুটিয়া উঠিতেছে, তাহা কবির নিকট সেই চিরানন্দময়ের রসবিলাস-মাত্র। বিশ্বের মধ্যে যে রূপ-রস-শব্দ-স্পর্শ-গন্ধের লীলা অনবরত চলিতেছে, তাহা সেই অচিন্ত্যেরই নিত্য প্রকাশ। সৃষ্টির মধ্যে স্রষ্টার, জড়ের মধ্যে চিন্ময়ের, খণ্ডের মধ্যে অখণ্ডের, সীমার মধ্যে অসীমের অনুভূতিই রবীন্দ্র-সাধনার মূলমন্ত্র এবং এই মন্ত্রই রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন রূপক-নাটকের মধ্যে বিভিন্ন ভাবে ও বিভিন্নরূপে উচ্চারিত হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের সূক্ষ্ম ও গভীর দৃষ্টি যে ভাবজগতের সন্ধান এই নাটকগুলির মধ্যে প্রদান করিয়াছে, তাহার স্বরূপ না ধরিতে পারিলে রসাস্বাদনে ব্যাঘাত ঘটা কিছুমাত্র বিচিত্র নহে।

রবীন্দ্রনাথের সাঙ্কেতিক নাটকগুলির আলোচনা করিলে দেখা যায়, তাঁহার নিজের একটি বিশিষ্ট philosophy আছে এবং সেই philosophyই তাঁহার রূপক-নাটকগুলির মধ্যে পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহার এই philosophy কোন বাঁধাধরা চির-প্রচলিত জীবন-তত্ত্ব নহে—ইহা জীবনপথে চলিতে চলিতে একটু একটু করিয়া সঞ্চয়-করা সত্য। এই সত্যই এই নাটকগুলির মধ্যে নানা রূপে ও নানা ছন্দে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। ধর্ম্মের কথা তিনি অনেক বলিয়াছেন, কিন্তু সে সব ধর্ম্ম-কথা কোথাও নীরস তত্ত্বকথা হইয়া উঠে নাই—হৃদয়ের প্রত্যক্ষ অনুভূতির মতই ফুটিয়া উঠিয়াছে। নীরস যুক্তি-তর্কের কোন অবতারণা না করিয়া তিনি সরল অনাবিল অনুভূতির মধ্য দিয়া অরূপের রহস্যময় আবির্ভাবটুকু ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। "এই অরূপ মানুষের একান্ত আত্মীয়, অত্যন্ত নিকট; পবন-হিল্লোলে তাঁর স্পর্শ, আকাশে-বাতাসে তাঁর ইঙ্গিত, অনুভূতির মধ্যে তাঁর আবির্ভাব-তিরোভাবের নিঃশব্দ পদসঞ্চার।" এই অরূপের সঙ্গে মানবমনের মিলনের আকাঙ্ক্ষা ও আনন্দই রবীন্দ্রনাথের রূপক-নাটকগুলির মধ্যে প্রকাশ পাইয়াছে।

অধ্যাত্মরসের দিকে রবীন্দ্রনাথের বাল্যকাল হইতেই একটা বিশেষ প্রবণতা ছিল এবং এই প্রবণতার জন্যই তাঁহার শেষ নাটকগুলি সাঙ্কেতিক ও রহস্যময় হইয়া উঠিয়াছে। এই সাঙ্কেতিক নাটকগুলির ভিতর দিয়া রবীন্দ্রনাথ যাহা প্রচার করিয়াছেন, তাহা কোন পার্থিব অভিজ্ঞতা নহে —আধ্যাত্মিক ভাবমাত্র। তাঁহার ব্যক্তিগত আন্তর ও বাহ্য জীবনের চরম অভিজ্ঞতাগুলিকে প্রকাশ করিবার জন্যই তাঁহার নাট্যসাহিত্যের সৃষ্টি। রবীন্দ্রনাথের নাটক রবীন্দ্রনাথের আত্ম-প্রকাশেরই বিশিষ্ট পথ।

---

"বেদান্তের সিদ্ধান্ত এই, আমরা বদ্ধ নই, আমরা নিত্য-মুক্ত। শুধু তাহাই নহে, আমরা বদ্ধ এই কথা বলা বা ভাবাই অনিষ্টকর; উহা ভ্রম, উহা আপনাকে আপনি মোহে অভিভূত করা মাত্র। যখনই তুমি বল আমি বদ্ধ, আমি দুর্ব্বল, আমি অসহায়, তখনই তোমার দুর্ভাগ্য আরম্ভ, তুমি নিজের পায়ে আর একটি শিকল জড়াইতেছ মাত্র।"

—স্বামী বিবেকানন্দ

# শ্রীশ্রীমহাপুরুষ মহারাজের পত্র

( ১ )

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্

Sri Ramakrishna Math

Belur Math

29. 12. 29

শ্রীমান্ প—,

তোমার পত্র পাইয়া সকল বিষয় অবগত হইলাম। বাবা, তুমি বৃদ্ধ পিতার সেবা করছ, এর চেয়ে কল্যাণকর কাজ আর তুমি কি করিবে বল? উহা ধ্যান জপ ও ভগবানের স্মরণ-মনন অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নহে। তাঁর আশীর্বাদে তাঁকে যদি সুখী করিতে পার, তাহা হইলে তোমার ভগবানে ভক্তি-বিশ্বাস সব লাভ হইবে।

ধ্যান-জপ করতে বসবার আগে ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করে নেবে—যেন তিনি মনের চাঞ্চল্য দূর করে দেন, ভক্তি দেন, বিশ্বাস দেন। তিনিই যে কর্ত্তা, তিনিই সব এই ভাবটা হৃদয়ে ঠিক করে নেবে। ধ্যান করতে যদি অসুবিধা বোধ কর, জপ করবে এবং প্রতি মন্ত্র উচ্চারণ করবার সঙ্গে সঙ্গে ইষ্টমূর্ত্তির হৃদয়ে চিন্তা করবে। এতে ধ্যান-জপ দুইই হইবে। ধ্যান ও জপ উভয়ই সমান—যার যেটি ভাল লাগে। জপ তুমি যত করতে পারবে তত ভাল—১০৮ বারের কম যেন না হয়।

কোন চিন্তা নাই—মনের অবস্থা, পারিপার্শ্বিক অবস্থা যেমনই হউক না কেন, ঠাকুরকে ধরে থাকবে—তাঁর কৃপায় কল্যাণ হইবেই। আমার শরীর ভাল নয়। তিনি তবে এক প্রকার চালিয়ে দিচ্ছেন। তুমি আমার আন্তরিক আশীর্ব্বাদ ও শুভেচ্ছা জানিবে। ইতি

সততশুভানুধ্যায়ী

শিবানন্দ

( ২ )

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্

Sri Ramakrishna Math

Belur Math

10.8.30

শ্রীমান্ প—,

তোমার পত্র পাইয়া সুখী হইলাম। তুমি ও গুরুদাস আশ্রমের কাজকর্ম্ম দেখা শুনা এবং ভজন সাধন কর জানিয়া আনন্দিত হইলাম। গুরুদাস অতিশয় ভক্তিমান, ত্যাগী, সাধু ও দেশপ্রেমিক। তাঁহার কথা শুনিয়া চলিলে তোমার কল্যাণ নিশ্চয়ই হইবে।

কংগ্রেসকর্ম্মী যাঁহারা তাঁহারা খুবই ত্যাগী—তাঁহারা নিজেদের যথাসর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া দেশের ও দশের সেবা করিতেছেন। ইহাতে দেশের ত কল্যাণ হইবেই—তাঁহাদের নিজেদের কল্যাণও হইবে। যাঁহারা ইউরোপীয় রাজনীতির ধারা অবলম্বন করিয়া কাজ করিতেছেন, তাঁহারা মনে করেন—রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা না হইলে ব্যক্তিগত জাতিগত সামাজিক উন্নতি কিছুই হইবে না। কিন্তু তোমাদের ধারা হইতেছে ঈশ্বরীয় শক্তির উপর বিশ্বাস—সেই শক্তি নিজেদের মধ্যেই রহিয়াছে আত্মবিশ্বাস-রূপে। তাহাকে ভিত্তি করিয়া জনসেবা করিতে

হইবে। সামাজিক ব্যক্তিগত ও জাতিগত জীবনে ঐ আদর্শে সাম্য প্রেম প্রীতি ও স্বাধীনতার প্রচার করা আবশ্যক। ধনি-নির্ধন সকলের সহিত সমান প্রীতির ভাব স্থাপন করা দরকার। এইরূপ হইলে রাষ্ট্রীয় সামাজিক অর্থনৈতিক উন্নতি আপনা হইতে হইবে। কিন্তু এই ভাবে অগ্রসর হইতে হইলে পদে পদে ভগবানকে অবলম্বন না করিলে চইবে না। তাঁহার কাছে সব সমান; ভগবদ্দৃষ্টিতে দেখিলে তবেই ঠিক ঠিক সেবা করা হয়। সকলেই আত্মা, সকলেই ভগবানের সন্তান—তিনি সকলকে সুখে দুঃখে রক্ষা করেন, দেখেন। তোমাদের জীবনে এই ভাবের পরিচয় যদি দিতে পার তাহা হইলে কত আশা, কত উদ্যমের উদ্দীপনা হয় বল দেখি। সৎসাহস ও উদ্যম হইলে সর্ব্ববিষয়ে স্বাধীনতা-লাভের কি আর বিলম্ব থাকে? তাই এ রাস্তায় কর্ম্মের সহিত ত্যাগ তপস্যা ও সাধনা চাই। ইহাতে নামযশ সুদূরপরাহত এবং কাজ চিরস্থায়ী ভিত্তির উপর স্থাপিত হইবে। দেশের মধ্যে আজ যে ভাব দেখছ তাহার মূলে স্বামীজির ন্যায় মহাপুরুষদের সাধনা ও ত্যাগ-তপস্যা বিদ্যমান। মহাত্মা গান্ধীর এই ত্যাগ তপস্যা ও সত্যনিষ্ঠা আছে বলিয়াই ত তিনি আজ জগৎপূজ্য। তোমরাও আশ্রমটিকে অবলম্বন করিয়া কাজ করিয়া যাও, ভগবানের কাছে প্রার্থনা কর, ঠাকুর-স্বামীজির ভাব সকলকে জানাও। তোমাদের দ্বারা—লোকে স্বীকার করুক না করুক—মহৎ কাজ সাধিত হইবে, জীবনে শান্তি ও আনন্দ লাভ করিবে।

পিতৃসেবা ভালই। গেরুয়া পরিলেই কি শান্তি পাওয়া যায়? শান্তি পাওয়া যায় তাঁহার কৃপায়। তাঁহার কাছে খুব প্রার্থনা কর—দশের মধ্যে তাঁহাকে দেখে সেবা কর এবং সকলের মধ্যেই যে তিনি রয়েছেন দেখিয়ে দাও। এর চেয়ে আর মহৎ ব্রত কি আছে বল। প্রার্থনা করি, তিনি তোমার কল্যাণ করুন, সব বুঝিয়ে দিন।

আমার শরীর এক প্রকার, কিন্তু তত ভাল নয়। তুমি আমার আশীর্ব্বাদ ও শুভেচ্ছা জানিবে এবং আশ্রমের ছেলেটিকে ও গুরুদাসকে জানাইয়া সুখী করিবে। ইতি

সততশুভানুধ্যায়ী
শিবানন্দ

---

# ভগিনী নিবেদিতা

(ইংরেজী হইতে অনূদিত)

কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়

বীরের জিগীষা মায়ের হৃদয়খানি,
দখিন পবন কয় যে মধুর বাণী,
অজেয় শক্তি পুণ্য মাধুরীরাশি,
আর্য্যবেদীরে তুলে যাহা উদ্ভাসি,
মুক্ত অবাধ যজ্ঞশিখার মত,
হোক দেবি তব অনায়াসে অধিগত।

আরো বহু কিছু তোমাতে দেখিতে চাই,
প্রাচীনেরা যাহা স্বপ্নেও ভাবে নাই,
যারা ভারতের অনাগত সন্ততি,
তাহাদের ভার তোমার হস্তে সতি।
একাধারে হও নেত্রী, সেবিকা, মিতা
সিস্টার নিবেদিতা।

# জীবাত্মা ও পরমাত্মা

( ঈশ্বর ও প্রাজ্ঞ, হিরণ্যগর্ভ ও তৈজস, বিরাট ও বিশ্ব )

স্বামী বাসুদেবানন্দ

"অহং ব্রহ্মাস্মি" ( বৃ উ, ১।৪।১০ ), "অয়মাত্মা ব্রহ্ম" ( বৃ উ, ২।৫।১৯ ) প্রভৃতি মহাবাক্যের দ্বারা এই বোঝা যায় যে, জীবই ব্রহ্ম, অর্থাৎ ব্যষ্টিচৈতন্যই (individual consciousness) সমষ্টিচৈতন্য (universal consciousness)। এই তাদাত্ম্য-বোধ ভারতীয় দার্শনিকেরা প্লেটোর জন্মের বহু বহু পূর্বেই প্রাপ্ত হন। শ্রীরাধাকৃষ্ণন্ বলেন, ব্যক্তিচৈতন্য কর্তৃপর, অর্থাৎ যাতে কর্তৃত্ব, ভোক্তৃত্ব-রূপ উপাধি (limitations) রয়েছে, যা মনন করে, জয় করে এবং ভালবাসে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যকে। প্রকৃতি কি ?—জ্ঞানের বিষয়। এই বিষয় জড় না চেতন ? জড়বস্তু বলে যা আমাদের অনুভূতি হচ্ছে সেটিও সমষ্টিচৈতন্যের নামরূপাত্মক একটি বিশিষ্ট পরিণাম (modes), সেটির জ্ঞাতা ব্যক্তি বা কর্তৃচৈতন্য। এই বিশিষ্ট পরিণামটি ব্যক্তির চৈতন্যের দৈশিক ও কালিক জ্ঞানের বাহ্য উত্তেজক। বেদান্তে বিশিষ্ট জ্ঞেয় ( object ) 'বিশ্ব' বলে পরিচিত এবং জ্ঞেয়ের সমষ্টি হলো 'বিরাট'। এই 'বিশ্ব' (objective) এবং 'প্রাজ্ঞ' বা ব্যক্তিচৈতন্য (subjective) উভয়ই সমষ্টিচৈতন্যে কাল্পনিক ও সমান্তরাল উপাধি ( two parallel and imaginary limitations )। সমষ্টি সাক্ষী বা তুরীয় বা কারণচৈতন্যই ঈশ্বর এবং ব্যষ্টি জ্ঞাতৃচৈতন্য যা সুষুপ্তিতে আমরা অনুভব করি, তাই হলো জীব বা প্রাজ্ঞ। এই তুরীয় বা সাক্ষীই (universal) হচ্ছেন প্রাজ্ঞ জ্ঞাতৃচৈতন্য (subjective) এবং প্রমেয় বিষয়চৈতন্যের (objective) ভিত্তি (ground)। 'জীব জগৎ ( সর্বং খল্বিদম্ ) ব্রহ্মই' —ঔপনিষদিক এই তাদাত্ম্যানুভূতির মূল হলো এই ভিত্তিটি। কিন্তু অধ্যাপকের ঐরূপ ব্যাখ্যার ফলে এই দাঁড়ায় যে, বেদান্তের উপদেশ স্পিনোজার প্যান্‌থিজিম্ ছাড়া আর কিছুই নয়—"Infinite is not beyond the finite but in the finite." কিন্তু বেদান্তের ব্রহ্ম-পদার্থটি সমষ্টি-কারণচৈতন্য বা ঈশ্বর (universal consciousness) এবং ব্যষ্টি জ্ঞাতৃচৈতন্য-সকলের এবং তাদের বিষয়েরও ভিত্তি। অর্থাৎ তিনি ঈশ্বর-রূপে সমষ্টি জীব বা প্রমাতৃচৈতন্যের এবং হিরণ্য-গর্ভরূপে অন্তঃকরণ-চৈতন্যের অর্থাৎ প্রমাণ-চৈতন্যের সাক্ষী এবং বিষয়চৈতন্যরূপে যাবতীয় নামরূপাত্মক জ্ঞেয় পদার্থের অধিকরণ। এই অবস্থাটি হলো ব্রহ্মের মায়াশবল রূপ। কিন্তু নির্বিকল্পে বা তুরীয়স্বরূপে তিনি নিরস্তমায়, অর্থাৎ জীব জগৎ ও ঈশ্বররূপ উপাধিকল্পনাতীত-রূপে সদা বিশুদ্ধ সচ্চিদানন্দস্বরূপ। যেমন মহাকাশ প্রতিবিম্বিত বিম্বাকাশেও আছে এবং বিম্বা-কাশকে অতিক্রম করে সদা অবিম্বস্বরূপেও বর্তমান। বেদান্তের "তত্ত্বমসি" ( ছা উ, ৬।৮।৭ ) প্রভৃতি মহাবাক্যের অর্থ এই ভাবেই বুঝতে হবে।

পল ডয়সন উপনিষদের এই অদ্বৈতবাদকে লক্ষ্য করেই বলেছেন: "Fix your attention upon it solely in its philosophical simplicity as the identity of God and the soul, the Brahman and the Atman, it will be found to possess a signi-

ficance reaching far beyond the Upanishads, their time and country; nay, we claim for it an inestimable value for the whole race of mankind."—(Philosopły of Upanishads, p. 39)

যেথানে সর্বজনীন চেতনার কথা বলা হয়েছে তা সমষ্টিরূপে ঈশ্বর এবং ব্যষ্টিরূপে প্রাজ্ঞ, যা গভীর নিদ্রায় আমাদের বোধ হয়, যাকে ইংরেজীতে অনেকে অনেক রকমে অনুবাদ করেছেন—the causal unconscious consciousness, subjective simple, negative consciousness of the universe (natura naturans), manifesting as other consciousness ইত্যাদি। বিষয় বা দৃশ্যমান প্রকৃতি যা আমরা দেখছি এটাও সেই ব্রহ্মেতেই একটা স্থূল, জড়, নামরূপাত্মক মিথ্যা দৃষ্টিভঙ্গি। এর সমষ্টি-অভিমানী চিদাভাসের নাম বিরাট এবং উহারই ব্যষ্টির নাম বিশ্ব। কার্টিসিয়ান বিস্তালয়ের দার্শনিকেরা এই জ্ঞাতৃপর (mental) এবং জ্ঞেয়পর (physical) জগতের সম্বন্ধনির্ণয় নিয়ে বেশ একটা গোলে পড়েছিলেন। দেকার্ত্ অবশেষে তাঁর আন্তর (mind) এবং বাহ্য (matter)-এর মধ্যে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সংযোগস্থাপন করলেন ঈশ্বরের ভেতর দিয়ে—"by the intervention of God" এবং স্পিনোজা ঐ সম্বন্ধটিকে আর একটু যুক্তিযুক্ত করলেন তাঁর universal parallelism-এর ভেতর দিয়ে।

কিন্তু বেদান্তীরা কারণ বা সমষ্টিচৈতন্যে প্রাজ্ঞ (subjective) ও বিশ্ব (objective)-উপহিত চিদাভাসের মধ্যে সংযোগ রক্ষার জন্য এই উভয়ের মধ্যবর্তী আর একটি করণ (mental staff or instrumental)-উপহিত চিদাভাস স্বীকার করলেন, যার সমষ্টির নাম হিরণ্যগর্ভ এবং ব্যষ্টির নাম তৈজস। এই করণ বা প্রমাণচৈতন্যের আর একটি নাম কার্যব্রহ্ম (Natura Naturata)—এরই মাধ্যমে বিষয়ী জীব বিষয় জগৎকে জানে। এই অন্তঃকরণের মাধ্যমেই প্রমাতৃচৈতন্যের নিজেতেই প্রমেয় বিষয়কে জানে। অথবা প্রমাতৃচৈতন্যের হয় নিজের সম্বন্ধেই একটা বিশেষণসম্বন্ধিত বিষয়-পরিণামের জ্ঞান হয়—যেমন, 'আমি সুখী', 'আমি দুঃখী' অর্থাৎ প্রমাতৃচৈতন্য নিজেকেই 'সুখী' বা 'দুঃখী'-রূপ বিশেষ্যবিশেষণতা-সম্বন্ধে বিষয়রূপে জানে, অথবা নিজেকেই কোন বিশিষ্ট চৈত্তিক নাম-রূপের জ্ঞাতারূপে বিষয়ীভূত করে, যা ঐ বিশিষ্ট নামরূপাত্মক চৈত্তিক বৃত্তির ও উহার উত্তেজক বাহ্য বিষয় হতে ভিন্ন। যেমন, (১) ঘটস্মৃতি বা (২) ঘটপ্রত্যক্ষ-কালে প্রমাতৃচৈতন্য নিজেকেই জানে—(১) ঘটস্মৃতি হতে পৃথক এবং ঘট-সংস্কারের স্মরণকর্তারূপে, অথবা (২) ঘট-আন্তর বৃত্তির জ্ঞাতারূপে, অর্থাৎ যে জ্ঞাতা ঐ বৃত্তি ও উহার উত্তেজক বাহ্য নামরূপাত্মক ঘট হতে ভিন্ন। এই ব্যষ্টি প্রাজ্ঞ বা জ্ঞাতা অল্পজ্ঞ, কারণ সে অখণ্ড প্রকৃতির একটা সসীম উপাধিমাত্র আশ্রয় করেছে, পরন্তু কারণ-চৈতন্য বা সমষ্টি-আভাস-চৈতন্য ঈশ্বর সর্বজ্ঞ, যেহেতু অখণ্ড প্রকৃতির তিনি অধীশ্বর। ব্যষ্টি-করণবৃত্তিচৈতন্য হলো তৈজস, আর এদের সমষ্টি হলেন হিরণ্যগর্ভ বা কার্যব্রহ্ম এবং ব্যষ্টি বিষয়াভিমানী চিদাভাস বা বিষয়চৈতন্য বিশ্ব এবং উহাদের সমষ্টি হলেন বিরাট বা বৈশ্বানর পুরুষ। বিষয়চৈতন্য বলার মানে, যখনই আমরা কোন নামরূপাত্মক বিষয়কে জানি, তখনই ঐ নামরূপটিকে চৈতন্যের একটি বিশিষ্ট পরিণতি-রূপে আধ্যাসিক স্বরূপসম্বন্ধেই জানি। তথা প্রমাণচৈতন্য বা কারণচৈতন্য বলার তাৎপর্যও

ঐ একই। কারণ প্রত্যক্ষাদি অনুভূতি-কালীন যে আন্তর বৃত্তির ব্যাপারক্রীড়া ( process of becoming ) চলে, সে সকল বৃত্তির জ্ঞান মানে চৈতন্যেরই এক একটি বিশিষ্ট আন্তর উপাধিবিশিষ্ট বিষয়রূপে অনুভূতি যা প্রমাতৃ-চৈতন্যে আধ্যাসিক তাদাত্ম্য-লাভ করে। অর্থাৎ এক সাক্ষিচৈতন্য বা তুরীয় জগদভাববৎ কারণ-প্রকৃতির জ্ঞাতারূপে ঈশ্বর, জ্ঞানকরণ-রূপে হিরণ্যগর্ভ এবং জ্ঞেয় বিষয়রূপে ( objective consciousness of the cosmos as a whole felt as external ) বিরাট পুরুষ। এ হলো একশ্রেণীর অদ্বৈত-বেদান্তীদের মত। আচার্য-পাদ সুরেশ্বর তাঁর পঞ্চীকরণ-বার্তিকে বিষয়টি নিম্নলিখিত ভাবে উপন্যস্ত করেছেন—

কিন্তু অধ্যাপক রাধাকৃষ্ণন্ বাচস্পতি মিশ্রের মতানুযায়ী মূলা মায়া ঈশ্বরে (universal consciousness) এবং তুলা মায়া জীবে (individual consciousness)—এইরূপ দ্বিবিধ মায়ার ভেদ স্বীকার করে সে চারটি অবস্থাকে ব্যাখ্যা করবার চেষ্টা করেছেন, তার সুস্পষ্ট ভাষ্য হচ্ছে—বিশ্বই হোক (from the standpoint of individual physical consciousness), তৈজসই হোক (from the standpoint of individual mental consciousness), অথবা প্রাজ্ঞই হোক (from the standpoint of individual causal consciousness) বাস্তবিক পক্ষে ব্যক্তি-চৈতন্যই দর্শন করে এবং তাদের কাছে সমষ্টি ঈশ্বর চৈতন্যোপহিত মূলা মায়াবচ্ছিন্ন জগৎ বিষয়-রূপে প্রতিভাত হয়। যেমন একটা ব্যষ্টি দেহ-চৈতন্য ( বিশ্ব ) হচ্ছে জ্ঞাতা, যার কাছে তদ্‌ভিন্ন যাবতীয় ব্যক্তি হচ্ছে বিষয়, অর্থাৎ ( ব্যষ্টি স্থূল মায়াবচ্ছিন্ন ) একটি বিশিষ্ট শারীর চৈতন্য বা শরীরাভিমানী ( প্রাজ্ঞ ) জ্ঞাতারূপে অবশিষ্ট যাবতীয় জড় বা স্থূল বাহ্য ব্যক্তিশরীরকে

* প্রতিবিম্বিত ও অপ্রতিবিম্বিত আকাশ স্বরূপতঃ একই, সেইরূপ মায়াশবল ও নির্গুণ ব্রহ্ম স্বরূপতঃ একই—উভয়কে একত্রে তুরীয় বা পুরুষোত্তম বলে ধরা হয়েছে।

(মূলমায়াকে) বিষয়রূপে নিজের উপাধির যোগ্যতানুপাতী দর্শন করে। সেইরূপ (ব্যষ্টিসূক্ষ্ম-মায়াবচ্ছিন্ন) একটি আন্তরচৈতন্য বা আন্তরাভিমানী (তৈজস) জ্ঞাতারূপে অবশিষ্ট যাবতীয় সূক্ষ্ম আন্তর জগৎকে বিষয়রূপে (অর্থাৎ মূলা মায়াকেই) নিজের বিশিষ্ট উপাধির যোগ্যতানুপাতী দর্শন করে। তথা (ব্যষ্টি কারণমায়াবচ্ছিন্ন) একটি কারণচৈতন্য বা কারণাভিমানী (প্রাজ্ঞ) স্বীয় অস্পষ্ট উপাধির যোগ্যতানুযায়ী অস্পষ্ট জ্ঞাতারূপে যাবতীয় অনভিব্যক্ত মূলা মায়াকে জগদভাববৎ বিশেষণতার সহিত (সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক সুষুপ্তি ভেদে) অজ্ঞানাকারে দর্শন করে। আর চতুর্থ (তুরীয়) হচ্ছে, এই উপাধিত্রয়ের সাক্ষিমাত্র বিশুদ্ধচৈতন্য।

তা হলে অধ্যাপকপ্রদত্ত অস্পষ্ট সরণীটি আর একটু পরিবর্ধিতাকারে সুস্পষ্ট কোরে নিম্নলিখিত রূপে দেখান যেতে পারে—

কাজেকাজেই অধ্যাপকের এ কথাটি সম্পূর্ণ স্বীকার্য যে "The Brahman of the Upanishads is no metaphysical abstraction, no indeterminate identity, no void of silence. It is the fullest and the most real being."

এই সগুণ ও নির্গুণ পুরুষোত্তমকে বুঝবার জন্য ছান্দোগ্যাদি উপনিষদের ওঁকারকে প্রতীক-

রূপে ব্যবহার করা হয়েছে ( ছা উ, ১।১।১ ; তৈ উ, ১।৮।১ ; কঠ উ, ১।২।১৫ ; গীতা, ৮।১৩ )। ওঁকারে অ-উ-ম বর্ণ ব্রহ্মা ( creative principle ), বিষ্ণু ( preservative principle ) এবং রুদ্র ( destructive principle )। অ-কার জাগ্রৎ ভূমি অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জড় জগৎ যা ব্রহ্মে অধ্যারোপিত, উ-কার স্বাপ্নভূমি অর্থাৎ যে আন্তর জগৎ ব্রহ্মে অধ্যস্ত এবং ম-কার অর্থাৎ যে জগদভাববৎ কারণ বা সৌষুপ্ত ভূমি ব্রহ্মে অধ্যস্ত। বিন্দু হচ্ছে সম্পরিষক্ত অর্দ্ধবৃগলাকার অর্ধনারীশ্বর বা পুরুষপ্রকৃতি এবং এই বিন্দুগর্ভ নাদ হচ্ছে বিক্ষেপাবরণাত্মিকা ব্রহ্মমায়া এবং তদতীত হচ্ছেন নিগুর্ণ ব্রহ্ম। এই স্থূলসূক্ষ্ম-কারণাত্মক অধ্যারোপিত জগতের ত্রিবিধ সত্তা বেদান্তীরা স্বীকার করেন—জাগ্রৎ=ব্যবহারিক সত্তা ; স্বাপ্ন=প্রাতিভাসিক সত্তা এবং সৌষুপ্ত= অনভিব্যক্ত সত্তা। তা ছাড়াও আরো দুটি সত্তার কথা বেদান্তে দেখা যায়, যথা—ব্রহ্ম হচ্ছেন পারমার্থিক সত্তা এবং খপুষ্পাদি তুচ্ছ সত্তা। ব্যবহারিক সত্তায় আপেক্ষিক নৈতিক শীল, বেদাদি-প্রমাণপ্রমেয়-ব্যবহার, জীবের বহুত্ব, উর্দ্ধ-অধো-লোকাদি এবং উহাতে জীবের গতি স্বীকৃত হয়। জাগ্রৎ ভূমি স্বপ্নবৎ অনৈতিক, কার্যকারণসম্বন্ধ-হীন, ধর্মাধর্মবর্জিত প্রাতিভাসিক এবং প্রলীন কারণ সত্তা হতে ভিন্ন। কিন্তু এই ত্রিবিধ সত্তাই বিশুদ্ধ ব্রহ্মজ্ঞানে বা নির্বিকল্পে বাধিত হয়। কিন্তু জগৎ যদি মাত্র দৃষ্টিসৃষ্টিবাদের উপর তুচ্ছ বা প্রাতিভাসিক রূপে স্বীকার করা যায়, তা হলে ব্রহ্ম একটা abstraction মাত্র হয়ে পড়েন একথা সত্য এবং ব্যক্তি ও সামাজিক জীবনে বেদান্তের প্রয়োগ নিষ্প্রয়োজন হওয়ায় মোক্ষ ও ধর্মের সাধনও নিষ্প্রয়োজন হয়ে পড়ে।

---

# জাগো ভগবান

## শ্রীদীনেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী

জীবন যাদের নিষ্পেষিত নিষ্ঠুর সংসারে,
লাঞ্ছিত যারা শক্তিমানের অন্যায়-অত্যাচারে,
তাহাদের তরে অশান্ত আজ সর্ববসুন্ধরা
　　　　হয়েছে পাগলপারা।

দুর্জ্জয় পথে অনল অনিলে
যাত্রী ভাসিছে নয়নসলিলে,
বাঁচাও তাদের তুমিই রক্ষক
　　　　তারা যে সর্ব্বহারা।

জীর্ণ বক্ষ উঠিছে গুমরি,
লক্ষ সাধনা যায় গড়াগড়ি,
শোষণ-পেষণ জয় জয়কার
　　　　বিশ্ব গুমরি মরে।

যুগে যুগে তুমি হে ভগবান
　　　　এসেছ পৃথ্বীপ'রে,
অত্যাচারী দমন করেছ
　　　　কালের মূর্ত্তি ধ'রে।

তুমি যে পরম পুরুষ প্রেমিক
　　　　যুগে যুগে অবতার
আসিয়া এবার মানবচিত্তে
　　　　জাগ জাগ পুনর্বার,
দাও শান্তি সুখ দাও সবে জ্ঞান,
তোমার বিশ্বে বাঁচাও নিঃস্বে
　　　　যাহারা সর্ব্বহারা।

# গ্রাম্য ছড়া-গান

শ্রীজয়দেব রায়, এম্-এ, বি-কম্

পল্লীগানের মধ্যে আকারের বৈচিত্র্য আছে সত্য, কিন্তু অন্তর্নিহিত ভাব ও সুরধর্ম প্রায় সম্পূর্ণ একই রকম। যে কোন একটি বাউল, ভাটিয়ালী অথবা অন্য শ্রেণীর পল্লীসঙ্গীতের সুর লইয়া পরীক্ষা করিলে তাহাই মনে হইবে। কেবলমাত্র আমাদের দেশেই নয়, পৃথিবীর সর্বত্রই পল্লীগানের মূল সুরটি একই শ্রেণীর। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের লোকসঙ্গীতের মধ্যে ভাষার পার্থক্য থাকিলেও সুরের গঠনে এবং বলিবার ভঙ্গীতে সমস্তই একই ঢঙের।

লোকসঙ্গীতে সুরের সহজ এবং স্বাভাবিক প্রকাশ ঘটিলেও এইগুলির সুরসৌন্দর্য্য জটিলতার অভাবে একঘেয়ে। গাহিবার সময় সকল স্বরের প্রয়োজন হয় না, রাগিণীর বৈচিত্র্য নাই, ছন্দের গভীরতা নাই—তথাপি এইগুলির স্বাভাবিকতা এই গুলিকে স্বাতন্ত্র্যদান করিয়াছে। কবি বলিয়াছেন এই প্রসঙ্গে—"পদ্মা বাহিয়া চলিতে চলিতে বালুচরের মধ্যে যখন চকাচকীর কলরব শুনা যায় তখন তাহাকে কোকিলের কুহুতান বলিয়া কাহারও ভ্রম হয় না, তাহাতে পঞ্চম মধ্যম কড়ি কোমল কোনোপ্রকার সুর ঠিকমতো লাগে না ইহা নিশ্চয়, কিন্তু তবু ইহাকে পদ্মাচরের গান বলিলে কিছুই অসঙ্গত হয় না। কারণ, ইহাতে সুর বেসুর যাহাই লাগুক, সেই নির্মল নদীর হাওয়ায় শীতের রৌদ্রে অসংখ্য প্রাণীর জীবন সুখসম্ভোগের আনন্দধ্বনি বাজিয়া উঠে। গ্রাম্যসাহিত্যের মধ্যেও কল্পনার তান অধিক থাক বা না থাক সেই আনন্দের সুর আছে। গ্রামবাসীরা যে জীবন প্রতিদিন ভোগ করিয়া আসিতেছে, যে-কবি সেই জীবনকে ছন্দে তালে বাজাইয়া তোলে সে-কবি সমস্ত গ্রামের হৃদয়কে ভাষা দান করে। পদ্মাচরের চক্রবাক-সঙ্গীতের মতো তাহা নিখুঁত সুরতালের অপেক্ষা রাখে না।"

বাউল, ভাটিয়ালী, সারি, মুর্সিদী, মারফতী, গম্ভীরা, জারি, গাজীর গানের মতন (অন্যত্র ইহাদের আলোচনা করিয়াছি) আর একশ্রেণীর ছড়া ও পাঁচালী এবং মেয়েলি গান পল্লীসঙ্গীতের ভাণ্ডারে আছে।

ছড়াগানও এই শ্রেণীর; ছড়া কেবল ছেলেই ভুলায় না, অনেকসময় প্রাপ্তবয়স্কদেরও মন ভোলায়। তবে ছড়ার মধ্যে কেমন যেন একটা শিশুসুলভ সরলতা আছে। অর্থহীন কথা, তুচ্ছ উপমা, সামান্য ইঙ্গিত এগুলিকে মনোরম করিয়া তোলে। এগুলির মধ্যে যেমন ছন্দের নৃত্য রহিয়াছে, সুরও তেমনি আছে। ছড়া গান করিয়াই বলা হয়, এইরকম সুরধর্মী ছড়া আমরা কিছু কিছু সংগ্রহ করিয়াছি। ছড়াগানের সুসময় পৌষালী উৎসবে, যখন গৃহস্থের আঙ্গিনা সোনার ধানে ভরিয়া থাকে, যখন 'গ্রাম পথে পথে গন্ধে গিয়াছে ভরিয়া'; জীবনের নিত্য-প্রয়োজনীয় দ্রব্যের সম্বন্ধে যখন লোকের উৎকণ্ঠার সাময়িক অবসান হয়, চাষীদের তখন অখণ্ড অবসরের আশ্বাস আসে, পল্লীর মেয়েরা তখন ঘরে ঘরে লক্ষ্মীর আসন পাতে—বাঙালীর আনন্দ-উৎসবের অজস্রতার সময় সেই ভরা পৌষমাসে এই ছড়া-গানের আয়োজন হয়।

রাজশাহী ও পাবনা জেলার গ্রামাঞ্চলে সারা পৌষ মাস বালকের দল বাঁশের আগায় ফুল

সাজাইয়া গৃহস্থের বাড়ী বাড়ী এই ছড়া বলিয়া বেড়ায়। যেমন—

ছত্তর ছত্তর সোনা রায়ের চেলা য্যালো একবছর আন্তর।
সোনা রায়ের চেলা দেখে যে করিবে হেলা।
তার দুই পায়ে দুই গোদ বারাবে চোখে বারাবে ঢ্যালা।
সোনা রায়ের চেলা দেখে যে করিবে হেলা।
তার কোলের ছেলে কারে নিয়া দিবে যমজ্বালা॥

'সোনা রায়' হইতেছেন ধানের দেবতা, কাজেই লোকের মঙ্গলামঙ্গলের বিধাতা। এই রকম—

সোনা রায় সোনা রায় মুখে চাপ দাড়ি;
হেলিতে দুলিতে গ্যালা গোয়ালজির বাড়ী।
গোয়ালজী, গোয়ালজী, দধি আছে ভাঁড়ে?
ঘোষ নাই বাথানে গ্যাছে দধি নাই ভাঁড়ে।
সুবুদ্ধি গোয়ালার নারীর কুবুদ্ধি ঘটিল,
ছিকার উপর দধি থুয়া পীরকে ফাঁকি দিল॥

তারপর গোয়ালিনীর কী দুর্দশা ঘটিল, শেষে ক্ষমা চাওয়ায় দুঃখ ঘুচিল—তাহারই রসাল বর্ণনা। এই ধরনের ছড়াগুলিতে গৃহস্থকে বিশেষতঃ গৃহস্থ-বধূদের নানারকম ভয় দেখান হইয়াছে। তাহাদের যাহাতে অবহেলা না করে সেজন্য এত আয়োজন। এই সব বালকদলের দুষ্টুমি। এই সময় প্রত্যেক বাড়ীতে তাহারা বিশেষ আদরযত্ন পায়, পাছে কেহ তাহা না করে, সেইজন্য অভিশাপের এত সতর্কতা।

ছেলের দলের সঙ্গে রাখাল বালকের সম্বন্ধ অতি গভীর, আর রাখাল বালকের প্রসঙ্গে বাঙ্গালীর মানসপটে যে ছবিটি ভাসিয়া উঠে, এই সব ছড়াগুলিতে তাহাও আছে—

সাজরে গোঠে রাখাল ভাই চল মাঠে যাই,
ডাক দেরে তোর ছিদাম বলাই কানু
প্রাণের ভাই—বল,
সোনারায় উঠিয়া বলে মানিকপীর রে ভাই,
গোয়ালা নগরে চল দেখা করে যাই—চল।
সাজ না গোঠে রাখাল ভাই চল মাঠে যাই—
ডাক দেরে তোর ছিদাম বলাই কানু
প্রাণের ভাই—বল॥

সোনারায় ও মানিকপীর উত্তরবঙ্গের গ্রামাঞ্চলের চাষীগৃহস্থের অতি প্রিয় দেবতা। তাঁহাদের নামই (সোনামানিক) তাঁহাদের জনপ্রিয়তা এবং আদরের পরিচায়ক।

উপরের ছড়াগুলি ছেলেভুলানো ছড়া নয়, তবু তাহাদের অর্থ কিছু আছে। আর শিশুদের মন ভুলাইবার জন্য যে অর্থহীন ছড়াগুলি পুরুষানুক্রমে ঠাকুরমা সন্ধ্যাবেলায় আঙ্গিনাতে বলিয়া আসিয়াছেন, সেগুলির মূল্য ভিন্ন প্রকার। কবি রবীন্দ্রনাথ একসময়ে এইগুলির সংগ্রহে বিশেষ উৎসাহী ছিলেন; তাঁহার ভাষায়—"বাংলা ভাষায় ছেলে ভুলাইবার জন্য যে সকল মেয়েলি ছড়া প্রচলিত আছে, কিছুকাল হইতে আমি তাহা সংগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত ছিলাম। আমাদের ভাষা ও সমাজের ইতিহাস-নির্ণয়ের পক্ষে সেই ছড়াগুলির বিশেষ মূল্য থাকিতে পারে, কিন্তু তাহাদের মধ্যে যে একটি সহজ স্বাভাবিক কাব্যরস আছে সেইটিই আমার নিকট অধিকতর আদরণীয় বোধ হইয়াছিল।"

ঐতিহাসিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, সেই সঙ্গে বাঙালীর কাল্পনিক এবং ভাবময় সাংস্কৃতিক জীবনের পূর্ণাঙ্গ চিত্র এই ছড়াগুলির মধ্যে আছে। যেমন—

ঘুমপাড়ানি মাসি পিসি আমাদের বাড়ী যেয়ো,
বাটা ভরে পান দেব, গাল ভরে খেয়ো।
আম কাঁঠালের বাগান দেব ছায়ায় ছায়ায় যেতে,
উড়কি ধানের মুড়কি দেব পথে জলপান খেতে।
আয় ঘুম ঘুম যায় ঘুম ঘুম বাঁদরে তেঁতুল খায়,
তারা নুন কোথায় পায়?

গঙ্গার জল বালি তারা নুন ব'লে ব'লে খায়।
খোকা ঘুমোল পাড়া জুড়োল বর্গি এল দেশে
বুলবুলিতে ধান খেয়েছে খাজ্‌না দেব কিসে?

সব মিলিয়া এক মায়াময় প্রশান্তিভরা চাষী গৃহস্থের আঙিনায় সন্ধ্যাবেলা। "এই ছড়াগুলির সঙ্গে চিরকাল যে স্নেহার্দ্র সরল মধুর কণ্ঠ ধ্বনিত হইয়া আসিতেছে আমার মতো মর্য্যাদা-ভীরু গম্ভীরস্বভাব বয়স্ক পুরুষের লেখনী হইতে সে ধ্বনি কেমন করিয়া ক্ষরিত হইবে? পাঠকগণ আপন গৃহ হইতে, আপন বাল্যস্মৃতি হইতে সেই সুধাস্নিগ্ধ সুরটুকু মনে মনে সংগ্রহ করিয়া লইবেন। ইহার সহিত যে স্নেহটি, যে সঙ্গীতটি, যে সন্ধ্যাপ্রদীপালোকিত সৌন্দর্য্যচ্ছবিটি চিরদিন একাত্মভাবে মিশ্রিত হইয়া আছে সে আমি কোন্ মোহমন্ত্রে পাঠকদের সম্মুখে আনিয়া উপস্থিত করিব? ভরসা করি, এই ছড়াগুলির মধ্যেই সেই মোহমন্ত্রটি আছে।"

এইবারে আমরা যে ছড়াগুলি সংগ্রহ করিয়াছি, সেগুলির প্রচলিত নাম মেয়েলি ছড়া। তবে ইহাদের ছড়া না বলিয়া প্রবাদ-প্রচলন বলিলে বোধ হয় অন্যায় হয় না; যেমন—

শোনরে ভাই পণ্ডিত।
উব্বইত্যা লাচারীর গীত॥
দাম্‌ড়ী ছিড়্‌য়া দড়ি দিল লড়্‌।
সে দড়ীতে কাঐন খায়॥
উব্বইত্যা লাচারীর ভায়।
লাও মুড়া দা (মাথায় দিয়া)
পাত্‌লা বায় (বওয়া)
আতাইলের (আল) মধ্যে উষ্টা
(হোঁচট) খাইয়া
খেত্‌টা (ক্ষেত্র) পড়্‌লো চিত্তর (চিত) হৈয়া॥

কোন কোন ছড়া গানের পর্য্যায়ে উন্নীত হইয়াছে। যেমন, নদের চাঁদ কুমীরের গান—

তোরা সবে শুন ভাই সকল, গোয়ালন্দের দক্ষিণেতে
ফুলতলার বন্দর।
ও নদের বাপে কান্দে, ও নদের চাঁদ তোমায় লয়ে
থাকব বসে আঙ্গিনার পরে।
ও নদের ভায়ে কান্দে, ও নদের চাঁদ, একবার দাদা
বলে আয় কোলে
তোমায় লয়ে করব খেলা ঐ ঘরের তলে।
ও নদের বোনে কান্দে, ও নদের চাঁদ, একবার দিদি
বলে আয় কোলে
তোমায় লয়ে করব খেলা ভূঁইয়ের পরে।
ও নদের বৌয়ে কান্দে ও সোনার পতি, আমার গতি
কি হবে?
ছয় মাস হল হলনি দেখা শিয়রের পরে।
ও নদের ওস্তাদ কান্দে ও নদের চাঁদ, একবার
ওস্তাদ বলে আয় কোলে
ছয় মাস অন্তর ডান হবে সাগ্‌রেদ রবে না॥

নদের মা কোথায় আশ্চর্য্য? তাঁহার কথা মেয়েরা হয়ত ভুলিয়া গিয়াছিল!

আর একশ্রেণীর ছড়া মুসলমান-বাংলায় সুপরিচিত, ইহার নাম 'জিন্দাপীরের ছড়া'। অশিক্ষিত মুসলমানের নিকট ইস্‌লামী সাংস্কৃতিক ছাপ এইগুলিতে আশা করা কিন্তু অন্যায় হইবে। যেমন—

দক্ষিণ দুয়ারি ঘর ঘর বাঁশের রুয়া।
বাহির করে দেও পিঁড়ি পান বাটা ভরা গুয়া॥
বাটা ভরি কাটা গুয়া পাঁচ পীরে খায়।
পাঁচ পীরে যুক্তি করে অরণ্যেতে যায়।
অরণ্যের বাঘ ভল্লুক দেখিয়া পলায়॥

—এই শ্রেণীর ছড়াগান মুর্শিদাবাদ অঞ্চলের গ্রামে গ্রামে শোনা যায়। বাংলাদেশের প্রাণের লোকটি 'সোনার গৌরাঙ্গ'! কবি সত্যেন্দ্রনাথ সত্যই বলিয়াছেন—"বাঙ্গালীর হিয়া অমিয়া অমিয়া নিমাই ধরেছে কায়া"। বাঙ্গালীর শ্রদ্ধা-প্রীতির সঙ্গে বাঙ্গালী মায়ের স্নেহ-ভালবাসা তাঁহাকে

আমাদের নিজেদের ঘরের লোক করিয়া রাখিয়াছে। চব্বিশপরগনা অঞ্চলের একটি নিমাই-ছড়া উদ্ধৃত করিয়া আমি এই আলোচনা শেষ করিব—

নিমাই দুখিনীর ধন,
দুঃখ পাসরার বেটা রে নিমাই ওরে নীলরতন ॥
একমাসের কালে নিমাই ভাসে গঙ্গাজল,
দুইও মাসের কালে নিমাই করে টলমল ॥

এইভাবে ক্রমে নিমাই বড় হইল, কিন্তু—

কোথা হতে এল যোগী কেশব ভারতী।
কিবা মন্ত্র কর্ণে দিয়া নিমাইয়ে বানাল সন্ন্যাসী ॥
দেখ দেখ নদীয়ার লোক দেখরে চাহিয়া।
নিমাইচাঁদ সন্ন্যাসী চললো জননী ছাড়িয়া ॥

মায়ের আর কি শক্তি আছে, তিনি পাঁচজনের কাছে প্রবোধ চাহিতেছেন, মনে মনে আশা করেন—

সন্ন্যাসী না হয়োরে নিমাই বৈরাগী না হও।
ঘরে বসে কৃষ্ণনামটি মাকে শোনাও ॥

---

# "মেরে জীবন-মরণকো সাথী"

শ্রীনির্মলকুমার ঘোষ

এখনও নামেনি সন্ধ্যা,
গোধূলির শেষ রক্তরাগ
এখনও রয়েছে জীবনের দিগন্তসীমায়,
কালরাত্রি নামেনি এখনো!
জীবনের মরণের চিরসাথী মোর
তবু তোমা করিগো আহ্বান!

তুমি শুধু আসিবে মরণে?
জীবনের সাথী কি গো নও?
জীবনে দেবে না দেখা?
গণা দিন হয়ে এল শেষ,
সূর্য্য চলে অস্তাচলে,
ম্লান ছায়ালোক, ধীরে ধীরে এল নেমে!
তবু তুমি নাহি দিলে ধরা!

আজ যেন পড়ে মনে মোর,
অস্পষ্ট চেতনা যেন এনেছিল বারতা তোমার
জীবনের ক্ষণে ক্ষণে!
যেন তুমি এসেছিলে
চুপে চুপে, ছদ্মরূপে,
পিতারূপে, পুত্ররূপে, শত্রুমিত্র শতরূপ ধরি,
কিন্তু তুমি দেওনি ত ধরা!
বহুরূপে তোমারে দেখেছি,
বহুরূপ—তোমারে দেখিনি!

তাই পলে পলে,
সারাটি জীবন ধরি আপনার চারিদিক ঘিরে
সহস্রবাসনাজাল উঠেছে জড়ায়ে,
মমতার সহস্রবন্ধন!
আপনারে রুদ্ধ করি আপনার অন্ধকারাগার
নিজহাতে করেছি রচন!

আজ মনে হয়,
যেদিন সে কালরাত্রি আসিবে নামিয়া,
মরণশিয়রে তুমি দাঁড়াবে আসিয়া
মরণের চিরসাথী তুমি!
তোমার উদাত্তকণ্ঠে ঝঙ্কারিয়া উঠিবে আহ্বান
"ওরে আয়, চলে আয়, শ্রান্ত সাথী মোর
জীবনের খেলা হ'ল শেষ!"

হয়ত সেদিন
অন্ধকারামাঝে শুদ্ধ চেতনা আমার
তোমারে দেবে না সাড়া!
বধির শ্রবণে মোর পশিবে না তোমার আহ্বান,
জ্যোতিহারা আঁখি মোর দেখিবে না ওরূপ সুন্দর!
ব্যর্থ হবে মরণ উৎসব!

তাই আজ
এখনো নামেনি সন্ধ্যা
কালরাত্রি আনেনি আঁধার,
তবু তোমা করিগো আহ্বান
মরণে আসিবে তুমি—জানি,
জীবনেতে এস একবার!

---

# মোহ

স্বামী শ্রদ্ধানন্দ

মোহের কাজ ভুলানো—তাই ভুলাইবার সাজ পরিয়া সে আসে। তাহার বেশভূষা দেখিয়া মনে হয় সে তো বন্ধুই—আনন্দ দিবে, বল বাড়াইবে, কল্যাণের পথে লইয়া যাইবে। তাহার পরিচ্ছদের কোন ভাঁজের মধ্যে যে গুপ্তহত্যার শাণিত ছুরিকাখানি লুকানো আছে এ সন্দেহ জাগিবার যেন অবসরই হয় না। মিত্রবেশে আসে বলিয়াই মোহের সম্পর্ক কাটানো অতি দুষ্কর। এক ছল ধরা পড়িলে চতুর শত্রু অন্য ছল পাতিয়া ভুলাইয়া রাখে। ছলনার তাহার অন্ত নাই।

মোহের হাতে বাজে দুই তারের একটি ক্ষুদ্র বীণা—রিন্ রিন্ করিয়া মৃদু আওয়াজ সর্বদাই তাহাতে ঝঙ্কৃত হইয়া চলে। এক তার বলে—সুখ, সুখ, সুখ—অন্য তারে ধ্বনিত হয়—মনোরম, মনোরম। সুখমাত্রই যে আনন্দ নয়—মনের পছন্দ হইলেই যে সে সুন্দর নয়, এ তথ্য বিচার করিবার ধৈর্য থাকে না। মানুষ ঐ দুই তারের সুরে আবিষ্ট হয়। মোহ হয় জয়ী।

মোহের নিজের কোন ঘর নাই—সে অপরের ঘরে শিকার ভুলাইয়া আনিবার দূতমাত্র। ভুলাইয়া সে সঁপিয়া দেয় মানব-শ্রেয়ের প্রসিদ্ধ শত্রুগুলির কবলে—কাম, ক্রোধ, লোভ, আত্মাভিমান, স্বার্থপরতা প্রভৃতির নিকট। তখন মানুষ বুঝিতে পারে ছদ্মবেশীর নিষ্ঠুর প্রতারণা। তাহার নকল বীণার তার ছিঁড়িয়া গিয়াছে—সখ্যের পরচুলা খসিয়া পড়িয়াছে; লাঞ্ছিত বিগলিত বিভ্রান্ত মানুষের দুর্গতি দেখিয়া সে খিল খিল করিয়া কুটিল হাসি হাসিতেছে।

শ্রেয়ের পথে চলিবার প্রারম্ভে মোহ আসে না। তখন বিপক্ষদল নিজেরাই সম্মুখযুদ্ধে উপস্থিত। পথিকও তখন অতি সাবধানী। লক্ষ্যে পৌঁছিবার প্রবল আগ্রহ, অক্লান্ত উৎসাহ, জাগ্রত দৃষ্টি এবং হৃদয়ের সকল শক্তি একত্র করিয়া সে সংগ্রাম করিয়া চলিতেছে। ঐ উদ্যমের নিকট প্রতিপক্ষ হটিয়া যায়। ঘরে ফিরিয়া কিন্তু তাহারা নূতনতর আঘাতের পরিকল্পনা করে। তখনই তাহাদের প্রয়োজন হয় মোহকে। রাবণপ্রেরিত মারীচ স্বর্ণমৃগ সাজিয়া চোখের সামনে দৌড়াদৌড়ি শুরু করিয়া দেয়, জনকনন্দিনীর নয়ন যায় ঝলসিয়া। পলকে অঘটন ঘটে। মুহূর্তের ভুল, বিপদ হইতে বিপদের রাশি টানিয়া আনে।

প্রচণ্ড পুরুষকার হানিয়া বাধাকে দূর করিয়া দিয়াছি—দিবারাত্র অতন্দ্রিত পর্যবেক্ষণ দ্বারা শত্রুর আঁটঘাট সব জানিয়া লইয়াছি—নিজের শক্তির উপর বিশ্বাস জন্মিয়াছে—যদিই আবার তাহারা আসে অনায়াসেই তাহাদিগকে শিক্ষা দিতে পারিব—আপাততঃ একটু জিরাইয়া লই, পথচারীর এই বিশ্রামস্পৃহাই মোহের পক্ষে সুবর্ণ সুযোগ। ঐ আরাম—আধাঘুম আধা-জাগরণের মুহূর্তেই তাহার দুইতারা বাজিয়া উঠে। অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় তন্দ্রাবেশের মধ্যে বেশ লাগে শুনিতে। ক্রমে সর্বনাশা বীণা একেবারে ঘুম পাড়াইয়া দেয়। সুপ্তি যখন টুটে, তখন আবিষ্কার হয় কি কালনিদ্রাই না আচ্ছন্ন করিয়াছিল। অমূল্য রত্ন তস্করে লুটিয়া লইয়া গিয়াছে।

করুণার বেশে আসে আসক্তি, নৈর্ব্যক্তিক সৌন্দর্যানুরাগের সূত্র ধরিয়া জড়ায় রূপতৃষ্ণা, সম্পূর্ণ ন্যায্য আত্মসংরক্ষণের চেষ্টা হইতে জন্মায়

দেহসর্বস্বতা, লোভ—কার্য সুসম্পন্ন করিয়া আত্মপ্রসাদ অনুভব করিতে করিতে দেখা দেয় অভিমান, দম্ভ। আসে ধীরে ধীরে—শুনাইয়া চলে বড় বড় আদর্শের সাজানো হিতবচন—সেগুলি যে গোঁজামিলে ভরা বিকৃত উপদেশ, তাহা যাচাই করিবার সুযোগ দেয় না—ক্রমে লইয়া চলে দুর্গের ঢালু রাস্তা দিয়া—অবনতির নিম্ন হইতে নিম্নতর প্রাঙ্গণে। যোগী হয় যোগভ্রষ্ট—ভগবানের ভালবাসা ছড়াইয়া পড়ে সংসারের সেবায়—কর্তব্যজ্ঞান দিগ্‌ভ্রান্ত হইয়া অসংখ্য বিষয়ভোগের অলিতে গলিতে ছুটাছুটি করে। পৌরুষ হয় খর্ব, জীবনের স্নিগ্ধ সৌরভ হয় তিরোহিত, দেবতার আসনে চলে ভূতপ্রেতের নৃত্য।

শত্রুকে শত্রু বলিয়া চিনিলে তাহার নিকট হইতে সাবধান হওয়া যায়, কিন্তু সে যদি মিত্র সাজিয়া আসে তাহা হইলেই সমূহ বিপদ। মোহের চাতুরী হইতে নিজকে বাঁচাইবার জন্য তাই যুগে যুগে জ্ঞানিজনের এত সতর্কবাণী। বুদ্ধ বলিয়াছেন—

অপ্পমাদো অমতং পদং পমাদো মচ্চুনো পদং।
অপ্পমত্তা ন মীয়ন্তি যে পমত্তা যথা মতা॥

( ধম্মপদ, ২।১ )

অপ্রমাদই অমৃতত্বের পথে লইয়া যায়—মোহই মৃত্যুর স্বরূপ। যিনি সদাজাগ্রত, তাঁহার বিনাশ নাই—অসতর্ক ব্যক্তি মরিয়াই আছে।

শঙ্করাচার্যের উক্তি—

লক্ষ্যচ্যুতং চেদ্ যদি চিত্তমীষদ্
বহির্মুখং সন্নিপতেত্ততস্ততঃ।
প্রমাদতঃ প্রচ্যুতকেলিকন্দুকঃ
সোপানপঙ্‌ক্তৌ পতিতো যথা তথা॥

( বিবেকচূড়ামণি, ৩২৫ )

চিত্ত যদি ঈষন্মাত্রও আদর্শচ্যুত হইয়া বহির্বিষয়ে আসক্ত হয়, তাহা হইলে সোপানশ্রেণীতে পতিত খেলিবার বলের মত ক্রমাগত গড়াইতে গড়াইতে নীচে চলিয়া যায়।

ছোট হরিদাস শ্রীচৈতন্যদেবেরই সেবার জন্য চাউল ভিক্ষা করিয়া আনিতে গিয়াছিলেন—তাহাও আবার "বৃদ্ধা তপস্বিনী আর পরম বৈষ্ণবী" মাধবী দেবীর নিকট—যাঁহাকে স্বয়ং শ্রীচৈতন্য রাধিকার গণ বলিয়া সম্মান করিতেন। তবুও ছোট হরিদাসকে মহাপ্রভু কী কঠোর দণ্ডই দিলেন। একবৎসর কাছে আসিতে দিলেন না, কিছুতেই ক্ষমা করিলেন না—অবশেষে প্রয়াগে ত্রিবেণীসঙ্গমে দেহত্যাগ করিয়া অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইল।

শুনি প্রভু হাসি কহে সুপ্রসন্ন চিত্ত।
প্রকৃতি দর্শন কৈলে এই প্রায়শ্চিত্ত॥

( শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, ৩।২ )

শ্রীচৈতন্য জানিতেন দোষ অতি সামান্য, কিন্তু সন্ন্যাসীর পক্ষে এই ঈষৎ অসতর্কতা আনিতে পারে সম্মোহ—সম্মোহ আসিলে দেখা দিবে স্মৃতিবিভ্রম—আর "স্মৃতিভ্রংশাদ্ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধি-নাশাৎ প্রণশ্যতি।" ( গীতা, ২।৬৩ )

শ্রীসনাতন গোস্বামী এক বৃক্ষতলে ত্রিরাত্রি পর্যন্ত বাস করিতেন না, পাছে আসক্তি আসে। এই সদাজাগ্রত আত্মদৃষ্টি—লক্ষ্যে সুদৃঢ় নিষ্ঠাই মোহের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার উপায়। বিবেক যাহার তীক্ষ্ণ, আদর্শে যাহার অবিচলিত প্রীতি সে মোহের ছদ্মবেশ মুহূর্তেই ধরিয়া ফেলে, মোহের প্রলোভন-গীতি তাহাকে আকৃষ্ট করিতে পারে না। তাহার কাম্য সুখ নয়, সত্য—আপাতরমণীয় ও সুন্দরের পার্থক্য সে জানে। যাহা সত্য, যাহা মংগল, তাহাই সুন্দর—তাহাই আনন্দ। উহাই পরম লক্ষ্য। এই লক্ষ্য হইতে যাহা বন্ধু সাজিয়া পিছনে টানিতে আসে, তাহাই মোহ—সর্বদা সর্বাবস্থায় সর্বতোভাবে তাহা বিষধর সর্পের মত পরিহার্য।

# সুইজারল্যাণ্ড-ভ্রমণ

শ্রীঅজয়কৃষ্ণ ঘোষ

লণ্ডন থেকে ফকষ্টোনে চ্যানেল পার হয়ে বোলন হতে প্যারিস পৌছলাম। প্যারিসে প্রায় তিন দিন ছিলাম। এবার দেখলাম প্যারিসের রূপ একেবারে বদলে গিয়েছে, গাছ-পালা পাতায় ভর্ত্তি, চওড়া রাস্তার দুধারে সারি সারি গাছ, চমৎকার দেখতে। মাঝে মাঝে কাফের সারি এবং তাতে লোক জন যথেষ্ট। প্যারিসে খুব ঘুরে দেখলাম এবার নেপোলিয়ানের সমাধি, ল্যুক্সেমবার্গ বাগান ইত্যাদি; আর সবই আমার আগের বার দেখা ছিল। মিউজিয়ম আমার খুব ভাল লেগেছিল; সেজন্ত এবার আমি অনেকক্ষণ সময় সেখানে কাটালাম। এখানে যত জগদ্‌বিখ্যাত তৈলচিত্র স্থান পেয়েছে। লিওনার্ডো ডা ভিঞ্চি-এর মনালিসা এবং র‍্যাফেল ভ্যানগগ ও বহু ইতালিয়ান চিত্রকরের ছবি আছে। গ্রীস ও রোমের বহু মূর্ত্তিও দেখলাম। জগদ্‌-বিখ্যাত ভেনাস্ ডি মিলস্ এখানেই আছে। সন্ধ্যায় এক দিন একটা বিখ্যাত ছায়াচিত্র দেখেছিলাম।

প্যারিস থেকে আমরা সোজা সুইজারল্যাণ্ডে যাই। প্রথমে লুসানে আসি। সুইজারল্যাণ্ডের প্রায় প্রত্যেকটি শহরই এক একটা হ্রদের ধারে। ফ্রান্সের সীমানায় হেম্যান হ্রদ, চমৎকার দৃশ্য, তিন ধারে তিনটি শহর—জেনেভা, লুসান, মনত্রে। এ ছাড়া ছোট ছোট গ্রাম অগণিত। লুসান থেকে প্রথমে জেনেভায় গেলাম। ফ্রান্স অনেকটা আমাদের দেশের মত, ট্রেনে ভিড়, লোকজন অলস, রাস্তাঘাট নোংরা, প্রত্যেক ক্ষেত্রে অযোগ্যতা, অপটুতা চোখে পড়ে। কিন্তু সুইজারল্যাণ্ডের সীমায় পা দিলেই সব বদলে যায়, ছোট দেশ—সব কিছু ছোট স্কেলে, অথচ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ছবির মত এবং কর্ম্মক্ষমতায় নাকি আমেরিকা-কেও হার মানায়। সুইজারল্যাণ্ড এক অদ্ভুত দেশ, এর একভাগ ফরাসী, একভাগ জার্ম্মান্ ও আরেক ভাগ ইতালীয়; সেইজন্ত জার্ম্মান্ দক্ষতা, ফরাসী কালচার ও ইতালীয় নিপুণতা এই তিনের সংমিশ্রণ হয়েছে এই দেশে। একে তিন ভাগে ভাগ করা যায় অনায়াসে, ফরাসী, জার্ম্মান্ ও ইতালীয় অংশে। ভাষাও তিনটি, কিন্তু অধিবাসীদের মধ্যে কোনও ভাষা বা সংস্কৃতিজনিত বিরোধ নেই, প্রত্যেকে নিজেকে সুইস্ বলে পরিচয় দেয় এবং অত্যন্ত গর্ব্ব অনুভব করে।

জেনেভায় আমরা তিন রাত থাকি। এত সুন্দর শহর এর আগে কখনও দেখিনি। হ্রদের ধারে শহর, চারি দিক্ আল্পস্-এ ঘেরা। পরিষ্কার দিনে এই পর্ব্বতশ্রেণীর সর্ব্বোচ্চ চূড়া মঁ ব্লাঁ স্পষ্ট দেখা যায়। জেনেভা শহর এত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন যে, মনেই হয় না যে রাস্তাঘাট লোকজন ব্যবহার করে। এখানে অনেকগুলি আন্তর্জাতিক সংঘের প্রধান কেন্দ্র আছে। আগে এখানে জাতি-সংঘের (League of Nations) অফিস ছিল। এখন ঐ বাড়ীতেই ইউ এন্ ও-র ইউরোপীয় কেন্দ্রের অফিস। আমরা একদিন প্যালে ডি নেশনস্ (U. N. O.) দেখতে গিয়েছিলাম। তখন ওখানে আন্তর্জাতিক অর্থনীতি

ও সামাজিক সম্মিলন হচ্ছিল। প্রায় প্রত্যেক দেশের প্রতিনিধি ছিলেন। ওখানে দেখলাম ভাষার সমস্যা চমৎকার ভাবে সমাধান করা হয়েছে। ইউ এন্ ও-র কতকগুলি অফিসিয়াল্ ভাগ আছে, যাঁর যেরূপ ইচ্ছা সেই ভাষায় বক্তৃতা করে যাচ্ছেন, সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেকটি অফিসিয়াল ভাষায় আবার তা অনুবাদ করে দিচ্ছেন কানে হেডফোন লাগিয়ে। সুইচ্ ঘুরিয়ে যে কোনও ভাষায় বক্তৃতা শোনা যায়। জেনেভায় আমার একটি চেনা ছেলে ছিল, তার কাকা ইউ এন্ ও-তে ভাল কাজ করেন। তিনি বহু বছর ওখানে আছেন। জেনেভা থেকে অনেক দিন আমরা মনত্রে গিয়েছিলাম। হ্রদের ধার দিয়ে ইলেকট্রিক ট্রেন খুব জোরে চলে। ট্রেন থেকে দুধারের দৃশ্য খুব সুন্দর।

জেনেভা থেকে আমরা তারপর যাই বার্নে। সেখানে বিশেষ কিছু না দেখেই ইণ্টারলেকেনে চলে যাই। শহরটি দুটি হ্রদের মাঝে, সেইজন্য এর নাম হয়েছে ইণ্টারলেকেন অর্থাৎ দুটি লেকের সংযোগ। এখানে একটি স্থানে পৃথিবীর বহু দেশের যাত্রী দেখলাম। বেশীর ভাগই আমেরিকান, ইংরেজও আছেন। স্থানটি একটা উপত্যকায় বা পাহাড়ের পাদদেশে। এর পরই আলপ্স্-এর উঁচু পর্ব্বত আরম্ভ হয়েছে। আমরা ইণ্টারলেকেন্ থেকে টাংফ্র্যান পাহাড়ে উঠেছিলাম। খানিক দূর ট্রেন পাহাড়ের গা বেয়ে ডি এইচ্ আর-এর মত উঠলো, তার পরই সুড়ঙ্গ সুরু হলো, তখন বিশেষ ধরনের ট্রেনে চড়ে সুড়ঙ্গের ভিতর দিয়ে চড়াই করে উঠে গেলাম। উচ্চতা প্রায় ১২০০০ ফুট—উঠতে সব শুদ্ধ মাত্র ৩ কি ৩-৩০ ঘণ্টা লেগেছিল। টাংফ্র্যান মানে ইয়ং মেইড্। এর উপরি ভাগ চিরতুষারমণ্ডিত। এতে বরফের ঝড়-ঝঞ্ঝা প্রায়ই হয়। এতে যাত্রীদের কিছুই অসুবিধা হয় না। পাহাড়ের ধার কেটে বেশ খানিকটা জায়গা কাঁচ দিয়ে ঘেরা আছে। যাত্রীরা তার বাইরে বড় একটা যান না, যাবার দরকারও হয় না। ওখানে একটি হোটেলও আছে। হোটেলটা পাহাড়ের ভিতর একটা কৃত্রিম গুহার ভেতর। তাছাড়া আর একটা বরফের গুহার ভেতর 'বরফ প্রাসাদ' (Ice Palace) আছে। ওখানে বহু ছেলে মেয়ে খেলা করছে দেখলাম। টাংফ্র্যানের দুধারে দুটি বরফের নদী আছে এবং সব কিছু মিলিয়ে উপর থেকে দৃশ্য খুব সুন্দর। টাংফ্র্যানের পাহাড়ের নীচে ইণ্টারলেকেন-এর কাছে কোনও জায়গায় কমলা নেহেরু মারা যান।

ইণ্টারলেকেন থেকে আমরা বার্নে ফিরে আসি। এটি সুইজারল্যাণ্ডের রাজধানী, একটা পাহাড়ের উপর শহর। এখানে ভারতীয় দূতাবাসে আমার এক জন পরিচিত বৈদেশিক দপ্তরের কর্ম্মচারী ছেলে আছে, তার সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে দূতাবাস দেখা হয়ে গেল। ছোট আবাস, তবে বেশ সাজান। এ শহরটি বিশেষ বড় নয়, তবে সব কিছুই ক্ষুদ্র আকারে। এটাই সুইজারল্যাণ্ডের বিশেষত্ব। বড় বড় কারখানা আছে, তবে দেখলে তা মনে হয় না। কলকারখানার বাড়ীগুলি ভিন্ন, কারখানাকে সিনেমা-গৃহ বলে ভ্রম হয়। সুইজারল্যাণ্ডের লোকেদের জীবনযাত্রার মান খুবই উঁচু। সাধারণ লোকের বাড়ীর ভিতরের আসবাবপত্র ইত্যাদি যা আছে, তা লণ্ডনের ওয়েষ্ট্ এণ্ডের বিলাসী ফ্ল্যাট্ ছাড়া আর কোথাও দেখা যায় না। সারা দেশে ষ্টিম সিষ্টেম নেই, ট্রেন হ'তে কলকারখানা—এমন কি রান্নাবান্না সাধারণ চাষার বাড়ীতেও বিদ্যুতে হয়। লোকজন সরল ও পরিশ্রমী। যে কোনও ছেলে মেয়ে তিন-চারটে ইউরোপীয় ভাষায় কথা লিখতে পড়তে জানে। কেবল-মাত্র ভাষা শেখবার জন্য ছেলেমেয়েরা

তিনচার বছর বিদেশে কাটিয়ে আসে। বার্ন-শহরে মধ্যযুগীয় আবহাওয়া পাওয়া যায়। রাস্তা-ঘাট ও বাড়ী-ঘরদোর খুব পুরনো, এর উপর শহরে মূর্ত্তি, ক্লক্ টাওয়ার ইত্যাদি প্রচুর।

বার্নে বহু ভারতীয় সে সময় ছিলেন। তাঁদের ভিতর ছাত্রের সংখ্যাই বেশী। বার্নের কাছাকাছি কয়েকটা জায়গায় কয়েক জন ভারতীয় বাড়ী-ঘরদোর কিনে বসবাসও করছেন। নেতাজী সুভাষচন্দ্রের অষ্ট্রিয়ান স্ত্রী ও কন্যা এখন বার্নেই থাকেন।

বার্ন থেকে আমরা লুসানে ফিরে আসি ও সেখান থেকে আবার প্যারিসে যাই। লুসান শহরের বহু হোটেল ও বাড়ী আগা খাঁ কিনেছেন।

সুইজারল্যাণ্ড এক অপূর্ব্ব দেশ। এর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য অতুলনীয়। তবে যিনি একবার হিমালয় ভাল করে দেখেছেন তাঁর কাছে বিশেষ নতুন কিছু একটা লাগে না। হিমালয়ের বহু স্থান এখনও অনাবিষ্কৃত অবস্থায় আছে, অধিকাংশ পাহাড় এখনও মানুষের অগম্য। সুইজারল্যাণ্ডে যে কোনও পাহাড়ের উপরই ওঠা যায় ট্রেনে। প্রত্যেকটি পাহাড়ের উপর বা রাস্তার ধারে, যেখান থেকে ভাল দৃশ্য দেখা যায়, সেখানে ভাল ভাল হোটেল বা কাফে আছে। সর্ব্ববিধ সুবিধা আছে ভ্রমণবিলাসীদের জন্য।

এবার গ্রীষ্মে ইউরোপের tourist traffic দেখলাম। আমাদের দেশের আর এদেশের ভ্রমণ একেবারে ভিন্ন। আমাদের দেশে যাত্রীদের সঙ্গে থাকে বাক্স, পেটরা, খাবার-দাবার, মায় চাকর-ঠাকুর পর্য্যন্ত। কোনও একটি বিশেষ জায়গায় আস্তানা গেড়ে সকাল থেকে সন্ধ্যা অবধি অপর্য্যাপ্ত আহার ও নিদ্রার সাহায্যে স্বাস্থ্যের অন্বেষণ করতে হয়। এদেশে আহার হলো অপ্রধান এবং বিহার হলো প্রধান, নিদ্রা নেই বললেই চলে। প্রত্যেকেরই কাঁধে হ্যাভারস্যাক্, পরনে ধুলায় মলিন পরিচ্ছদ, হাতে ম্যাপ্ ও কাঁধে ক্যামেরা। ছাত্র থেকে ব্যবসায়ী সকলেরই প্রায় এই পোষাক। সত্তর বছরের বৃদ্ধ আমেরিকান কোটিপতিকেও এই অবস্থায় দেখেছি। তিনি নিউইয়র্ক থেকে সাত দিনের জন্য সুইজারল্যাণ্ডে বেড়াতে এসেছিলেন। কোনও এক শহরকে কেন্দ্র করে এদেশে যাত্রীরা ঘোরেন জঙ্গলে বা পাহাড়ে পাহাড়ে। সেখানে কেউ ধরেন মাছ, কেউ পড়েন কবিতার বই, কেউ বা আঁকেন ছবি। সকলের ভিতরেই ভ্রমণ-জনিত আনন্দ, প্রচুর উৎসাহ, উদ্যম ও অপরিসীম আগ্রহ।

ফিরবার পথে প্যারিসেই দু'রাত থাকি। একদিন আশ্রম দেখতে গিয়েছিলাম, তার বিবরণ তোমায় জানিয়েছি। আশ্রম সত্যিই খুব ভাল লেগেছিল, অতটা আশা করিনি। তারপর লণ্ডনে ফিরে আসি এবং গতানুগতিক ভাবে চলছি।

আমার লণ্ডনে এক বছর হয়ে গেল। এখন লণ্ডন শহর কলকাতার মত চিনে ফেলেছি। তোমরা যদি আসতে কত সুবিধা হ'তো। এখন সকলের সঙ্গে মিশতেও পারি। এখানকার চাল-চলনও অনেকটা শেখা হয়ে গেছে। ইংরেজী বলাও বেশ অভ্যাস হয়ে গেছে। এখানে গায়ের রং-এর জন্য কখনও অসুবিধায় পড়িনি, এজন্য অনেক ভারতীয়ই অসুবিধা বোধ করেছেন। এদেশে বিদেশীর কাছ থেকে উৎসাহ এবং ভাল ব্যবহারই পাচ্ছি। দেশে থাকতে ইউরোপীয় সভ্যতার খারাপ দিকটাই চোখে পড়তো। এখানে এসে তার আসল দিকটা ভালভাবে দেখছি।

দিদির কাছ থেকে এইমাত্র চিঠি পেলাম, নতুন ফ্ল্যাট্ তার ভাল না লাগলেও মানিয়ে নিয়েছে। পূজোয় হয়তো কলকাতায় যেতে পারে। এখানে মানাদি ও নৃপেনবাবুদের সঙ্গে প্রায়ই দেখা হয়। ওরা প্রায়ই আমায় খাবার নেমন্তন্ন করেন; না যেতে চাইলে কিছুতেই ছাড়েন না। গত সপ্তাহে ওদের সঙ্গে উৎসব দেখতে গিয়েছিলাম। আবার আগামী কাল ওদের ওখানে নেমন্তন্ন আছে, আমি ভাবছি ওদের একদিন থিয়েটার দেখাব।

আমার পরীক্ষা নভেম্বরের শেষে বা ডিসেম্বরের গোড়ায় হবে। আমার হয়তো দেশে যাওয়া পিছিয়ে যেতে পারে। আমি এখানে একটা বড় ফার্ম্মে শিক্ষালাভের সুবিধা পেয়েছি। পৃথিবীর অনেক শহরে এদের কেন্দ্র আছে। শিক্ষাকালীন ভাল ভাতাও দেবে।

---

# সমালোচনা

**শ্রীশ্রীচণ্ডীতত্ত্ব-সুবোধিনী** (৩য় ও ৪র্থ খণ্ড)—পণ্ডিত শ্রীদেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, বি-এ, কাব্যতীর্থ-সম্পাদিত। ২১, পটুয়াটোলা লেন, কলিকাতা-৯ স্থিত ক্লাসিক প্রেস্ হইতে মুদ্রিত। প্রাপ্তিস্থান—প্রকাশক ও গ্রন্থকার শ্রীদেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, ১৭বি, শ্রীমোহন লেন, কালীঘাট, কলিকাতা-২৬। ৩য় খণ্ড—১৮৫ পৃষ্ঠা; মূল্য ১৸০ আনা ও চতুর্থ খণ্ড—৭৪ পৃষ্ঠা; মূল্য ৸০ আনা।

তৃতীয় খণ্ডে সমগ্র চণ্ডী-গ্রন্থের প্রতিশ্লোকের বঙ্গানুবাদ ও নিগূঢ়ার্থবোধিকা 'সুবোধিনী'-নামিকা একটি টীকা আছে। ইহাতে শ্রীশ্রীচণ্ডী-গ্রন্থ যে সগুণ ব্রহ্মের ব্রাহ্মী শক্তিরই প্রকাশক, তাহা ভালরূপেই প্রদর্শিত হইয়াছে। আমরা ইহার বহুল প্রচার কামনা করি। চতুর্থ খণ্ডে ষড়ঙ্গ ও দেবীসূক্তসহ মূল চণ্ডীগ্রন্থখানি প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে সংক্ষিপ্ত পাঠবিধিও প্রদত্ত। মূলগ্রন্থ-পাঠকগণের পক্ষে ইহা বিশেষ উপযোগী।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, তৃতীয় খণ্ডে 'প্রীতেঃ অর্ঘ্যম্' নামক রচিত শ্লোকের "সদাশয়োঽন্যঃ কশ্চিদ্দৃষ্টো লোকে" অংশে ছন্দপতন হইয়াছে এবং উভয় খণ্ডেই কয়েক স্থানে মুদ্রাকর-প্রমাদ আছে। আশা করি, পরবর্তী সংস্করণে এই ত্রুটিগুলি সংশোধিত হইবে।

স্বামী প্রশান্তানন্দ

**তত্ত্বজিজ্ঞাসা**—শ্রীসতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, এম্-এ, পিএইচ্-ডি-প্রণীত। গ্রন্থকার-কর্তৃক প্রকাশিত। প্রাপ্তিস্থান—দাশগুপ্ত এণ্ড কোং লিঃ, ৫৪।৩, কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। পৃষ্ঠা—১৭৭; মূল্য—২৲ টাকা।

ধর্ম দর্শন ও সংস্কৃতি-বিষয়ে তুলনামূলক আলোচনা বঙ্গভাষায় বিশেষ নাই। প্রাচ্য তথা ভারতীয় দর্শন-সম্বন্ধে প্রকাশিত বাংলা রচনা নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর না হইলেও প্রতীচ্যচিন্তাধারার সহিত ভারতীয় দার্শনিক ভাবধারার তুলনামূলক আলোচনা নগণ্যই বলিতে হইবে। শ্রদ্ধেয় লেখক বর্তমান পুস্তকে সেই অভাব দূর করিবার প্রয়াস করিয়াছেন।

গ্রন্থকার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক জন লব্ধকীর্তি দর্শনাধ্যাপক। ভারতীয় দর্শন-বিষয়ক ও অন্যান্য দার্শনিক আলোচনা-সম্বলিত পুস্তক-রচনা দ্বারা তিনি বিবুধসমাজে সুপরিচিত। তৎপ্রণীত 'The Fundamentals of Hinduism' প্রত্যেক সংস্কৃতিমান্ ভারতবাসীর পক্ষে অবশ্যপাঠ্য মনে করি। এই পুস্তকখানিতেও অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের অসামান্য মনীষা পরিস্ফুট। বিধাতার কোন নিগূঢ় উদ্দেশ্যসাধন করিবার জন্য পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ ও জাতি পরস্পর অব্যবহিত-সংস্কৃতি-সম্বন্ধে সম্বদ্ধ হইতে চলিয়াছে। কূটনৈতিক বাক্‌চাতুর্য ও ক্ষমতালিপ্সার কুজ্ঝটিকা ভেদ করিয়া দিগন্তবিস্তৃত তমোবিদারী সত্যের আলোকচ্ছটা প্রকাশিত হইবেই। ইহার অনিবার্য গতিপথের অগ্রদূত হইবে পারস্পরিক সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান। সুতরাং 'বিভিন্ন ধর্ম, দর্শন ও সংস্কৃতির মধ্যে একটি মিলনসূত্র রচনা করা'-রূপ পুস্তকখানির 'অন্যতম উদ্দেশ্য'কে আমরা সাদর অভিনন্দন-জ্ঞাপন করিতেছি।

ভারতীয় দার্শনিক ভাবধারা এবং পাশ্চাত্ত্য চিন্তাধারায় তুল্যাধিকারসম্পন্ন ব্যক্তিই এই অভীপ্সিত সাংস্কৃতিক সেতুরচনা করিতে পারেন। অধ্যাপক মহাশয় তাঁহার সুচিন্তিত ও উপপত্তি-মূলক আলোচনা দ্বারা বঙ্গভাষায় দার্শনিক রচনার মানোন্নয়নে কেবলমাত্র সমর্থ হন নাই, পরন্তু আমাদের মাতৃভাষাতে পাশ্চাত্ত্য দর্শনালোচনার পথও অনেকটা প্রশস্ত করিয়াছেন।

আর একটি কথা এখানে উল্লেখযোগ্য।

বঙ্গভাষায় পাশ্চাত্ত্যদর্শন-সম্বন্ধে আলোচনায় পরিভাষার স্বল্পতা একটি দুরতিক্রম্য অন্তরায়। বর্তমান গ্রন্থের আলোচনা বিশেষভাবে প্রতীচ্য-চিন্তালোকে সমুজ্জ্বল বলিয়া লেখককে বহুস্থানেই পরিভাষা-সৃষ্টি করিতে হইয়াছে। তাহাতেও তাঁহার কৃতিত্ব সমধিক প্রকাশিত। 'হিন্দুধর্মের স্বরূপ'-প্রবন্ধে হিন্দুধর্ম বহু-ঈশ্বরবাদী ( poly-theistic )-রূপ ভ্রান্ত ধারণার খণ্ডন বিশেষ চিন্তাকর্ষক হইয়াছে। 'কর্ম ও কর্মফল' 'বিশ্বশান্তি সম্মেলনের সার্থকতা কোথায় ?' প্রভৃতি প্রবন্ধ সর্ব শ্রেণীর জিজ্ঞাসু পাঠ করিয়া আনন্দ পাইবেন।

"মন যখন বিশুদ্ধ হইয়া বিমল আদর্শের ন্যায় বিশ্বরূপে প্রকাশমান পারমার্থিক তত্ত্বকে প্রতিফলিত করে, তখনই তাহার পূর্ণতালাভ হয় এবং প্রাণ যখন সর্বশক্তি-প্রয়োগ করিয়া বিশ্বের অগণন ও নিত্যনূতন ব্যাপারের মধ্য দিয়া ভাগবত-সত্তার প্রকাশের সহায়তা করে, তখনই তাহার চরমোৎকর্ষ ঘটে। মানুষ যখন অন্তরে দিব্য শান্তিভাব পোষণ করিয়া সানন্দে ও নিরহঙ্কারে অশেষ কর্ম সম্পাদন করিতে পারে তখনই তাহার চরমোন্নতি হয়। মুক্তি বা মোক্ষ বলিতে সর্বকর্মত্যাগ ও সর্ববিষয়ে ঔদাসীন্য বুঝায় না। অন্তরের শান্তি ও আত্মার কৈবল্যভাব অক্ষুণ্ণ রাখিয়া যিনি নিষ্কামভাবে সর্বকর্ম করিতে পারেন, উপেক্ষা মৈত্রী করুণা ও মুদিতা এই সব দিব্য ভাবের অধিকারী হইয়াছেন এবং সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ সত্যশিবসুন্দর-রূপ পরব্রহ্মে দৃঢ়প্রতিষ্ঠ হইয়া জীব ও জগতের সেবায় আত্মনিয়োগ করেন, তিনিই প্রকৃত মুক্ত পুরুষ এবং তাঁহার মুক্তিই যথার্থ মুক্তি।"—শ্রীঅরবিন্দ-দর্শনের বিবৃতি-প্রসঙ্গে গ্রন্থকারের এই অনন্যকরণীয় প্রকাশভঙ্গীতে গ্রন্থখানির মূল সুরও ধ্বনিত হইয়াছে মনে করি।

পুস্তকখানির বহুল প্রচার কামনা করি।

**অর্ঘ্য** — শ্রীসরলাবালা সরকার-প্রণীত। প্রকাশক—শ্রীঅশোককুমার সরকার, ৫ চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা। প্রথম সংস্করণ। পৃষ্ঠা—১৭৫। মূল্য—তিন টাকা।

পুস্তকখানি বিভিন্ন সময়ে রচিত লেখিকার কবিতাসংগ্রহ। তাঁহার দীর্ঘকালব্যাপী অতন্দ্র সাহিত্যসাধনার সাক্ষ্য বহন করিতেছে তাঁহার 'চিত্রপট' 'নিবেদিতা' 'কুমুদনাথ' 'প্রবাহ' প্রভৃতি গদ্য ও পদ্য-রচনা। লেখিকারচিত ভারত-প্রাণা ভগিনী নিবেদিতার জীবনী ভগিনী-বিষয়ক মুষ্টিমেয় পুস্তকের অন্যতম।

'ব্রহ্মাস্বাদসহোদর' রসানুভবই সত্যশিব-সুন্দরের অধিষ্ঠান। লেখিকা তাঁহার কবিতার মধ্যে এই দিব্যানুভূতিকেই বাঙ্ মূর্তি দিয়া বিমল আনন্দ পরিবেশন করিতে পারিয়াছেন মনে করি। 'একা বিষ্ণুপ্রিয়া' কবিতা হইতে একটি উদ্ধৃতি উপহার দিতেছি—

'শান্তিপুরে সবে দিলে দেখা,—
বঞ্চিতা সে বিষ্ণুপ্রিয়া একা।
সবা হ'তে আপন তোমার,
তাই তারে এত অত্যাচার !
তাই হোক, দাসী তাই মাগে,—
বিশ্ব হোক আপনার আগে !'

'মীরার প্রার্থনা' কবিতায়, পরমসাধিকা মীরাবাঈ-এর অকুণ্ঠ ভগবৎপ্রাণতা ও তীব্র আকুতি-বর্ণনায় লেখিকার কাব্য-প্রতিভার সুস্পষ্ট নিদর্শন—

'রূপ তব গগন ভুবন ভরা
দিলে হে মোরে দুটি আঁখি,
নয়নভরা রূপে ভরে না প্রাণ হে,
বাসনা হৃদয়ভরে দেখি।'

'নিবেদিতা' কবিতায় ভগিনী নিবেদিতার চরিত্ররূপায়ণ কত মর্মস্পর্শী !—

'সংসার-সমর মাঝে এসো গো অপরাজিতা,
চির বিজয়িনি !
এস ত্যাগ, এস প্রীতি, এস পুণ্যময়ী স্মৃতি,
চিত্তে বিজড়িতা।
এস পূর্ণতান-বীণা, রামকৃষ্ণপদে লীনা
চির নিবেদিতা।'

শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্য মধুরাদি বিচিত্রভাবের বিচিত্র অভিব্যঞ্জনা আমাদের সাহিত্য ও সংস্কৃতি-ভাণ্ডারের মহামূল্য রত্ন। শ্রদ্ধেয় লেখিকার এই কাব্যসঞ্চয়নে বহু ভাবরত্ন স্থান পাইয়াছে। তাঁহার দীর্ঘ জীবনের অশ্রান্ত অনলস কাব্যসাধনাকে 'লহ নমস্কার' বলিয়া অভিনন্দন জানাই।

সুমুদ্রণ ও সুদৃশ্য প্রচ্ছদপদ পুস্তকখানিকে আরও আকর্ষক করিয়া তুলিয়াছে। ইহার বহুল প্রচার কামনা করি।

অধ্যাপক শ্রীজ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র দত্ত, এম্-এ

# শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

**'উদ্বোধন'-এর নববর্ষ**—শ্রীভগবানের কৃপায় বর্তমান মাঘ মাসে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের বাংলা মুখপত্র 'উদ্বোধন' ৫৪ম বর্ষে পদার্পণ করিল। যুগাদর্শ শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের উপদেশালোকে ধর্ম দর্শন সংস্কৃতি প্রভৃতির মহত্ত্ব-কীর্তন এই মাসিক পত্রের জীবনব্রত। নববর্ষে পদক্ষেপ করিয়া এই মহান্ ব্রত-উদ্‌যাপনে 'উদ্বোধন' তাহার সহৃদয় লেখক গ্রাহক ও পাঠক-পাঠিকার সাহায্য ও সহানুভূতি প্রার্থনা করিতেছে।

**আচার্য স্বামী বিবেকানন্দের নবতিতম বার্ষিক জন্মতিথি**—আগামী ৫ই মাঘ (১৯শে জানুয়ারী) শনিবার কৃষ্ণা সপ্তমী তিথিতে আচার্য স্বামী বিবেকানন্দের নবতিতম জন্মতিথি-পূজাদি অনুষ্ঠিত হইবে।

**শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর নবনবতিতম বার্ষিক জন্মোৎসব**—গত ৪ঠা পৌষ পরমারাধ্যা শ্রীশ্রীসারদামণিদেবীর নবনবতিতম জন্মতিথি পূজা-উৎসব শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের সকল কেন্দ্রে যথানিয়মে অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

এই উপলক্ষে জয়রামবাটী (বাঁকুড়া) শ্রীশ্রীমাতৃ-মন্দিরে বিভিন্ন স্থান হইতে অনেক ভক্ত উপস্থিত হইয়াছিলেন।

এই দিন বেলুড় মঠে অপরাহ্নে শ্রীমৎ স্বামী বিশুদ্ধানন্দ মহারাজের সভাপতিত্বে আহূত এক জনসভায় স্বামী তেজসানন্দজী ও স্বামী গম্ভীরানন্দজী এবং কলিকাতা বাগবাজার শ্রীশ্রীমায়ের বাটীতে উক্ত স্বামীজিদ্বয় শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী-সম্বন্ধে বহু ভক্ত নরনারীর সমক্ষে মনোজ্ঞ বক্তৃতা প্রদান এবং স্বামী পুণ্যানন্দজী শ্রীশ্রীমায়ের কথা পাঠ করেন। উভয় স্থানে অনেক ভক্ত নরনারী উপস্থিত হইয়াছিলেন।

এই উপলক্ষে পাটনা রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমে চারি দিনব্যাপী উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। শেষ দিন ৭ই পৌষ শ্রীমতী সোহানীর সভানেত্রীত্বে আশ্রম-প্রাঙ্গণে আহূত এক মহিলাসভায় শ্রীমতী কমলকামিনী প্রসাদ, শ্রীমতী অদিতি দে ও শ্রীমতী মহামায়া সরকার শ্রীশ্রীমা-সম্বন্ধে মনোজ্ঞ আলোচনা করেন।

কানপুর-কেন্দ্রে স্বামী রাঘবানন্দজী শ্রীশ্রীমায়ের জীবন ও উপদেশ-সম্বন্ধে বক্তৃতা দান করিয়া সমাগত বহু নরনারীকে মুগ্ধ করিয়াছেন।

এতদ্ভিন্ন আমরা মালদহ, ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জ-কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর জন্মোৎসবের সংবাদ পাইয়াছি।

**'উদ্বোধন' শ্রীশ্রীমায়ের বাটীতে শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দ মহারাজের সপ্তাশীতিতম জন্মোৎসব**—গত ১৭ই পৌষ শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দ মহারাজের সপ্তাশীতিতম জন্মতিথি-পূজা ও উৎসব এখানে সাড়ম্বরে সম্পন্ন হইয়াছে। ঐ দিন প্রাতে স্বামী লোকেশ্বরানন্দজী উক্ত মহারাজের জীবনকথা পাঠ করেন এবং মধ্যাহ্নে স্বামী সৎস্বরূপানন্দজী ও স্বামী যোগেশ্বরানন্দজী হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা দেন। এই উপলক্ষে বহু ভক্ত নরনারীর সমক্ষে ভজন ও কালীকীর্তন হইয়াছে।

**শ্রীরামকৃষ্ণ-কল্পতরু-উৎসব**—গত ১৫ই পৌষ কাশীপুর উদ্যানবাটীতে এবং কাঁকুড়গাছি শ্রীরামকৃষ্ণ-যোগোদ্যানে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কল্পতরু-উৎসব সাড়ম্বরে সম্পন্ন হইয়াছে। পূজা পাঠ ভজন কীর্তন ও প্রসাদ-বিতরণ এই উৎসবের অঙ্গ ছিল। এই উপলক্ষে উভয় স্থানে বহু ভক্ত নরনারী উপস্থিত হইয়াছিলেন।

**রামকৃষ্ণ মিশন নিবেদিতা বালিকা বিদ্যালয় ও সারদামন্দির—১৯৪৭-১৯৫০ সনের কার্যবিবরণী**—ভারতগতপ্রাণা বিদুষী ভগিনী নিবেদিতার পুণ্যস্মৃতিপূত এই মহিলা-শিক্ষায়তনের কার্যবিবরণী পাঠ করিয়া আমরা সবিশেষ প্রীতিলাভ করিলাম। প্রাচীন ভারতের সুমহান আধ্যাত্মিক আদর্শের সহিত পরিপূর্ণ সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান-ভূয়িষ্ঠ ভারত 'জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ আসনে' আসীন হইবে—এই ছিল ভারতাত্মা আচার্য স্বামী বিবেকানন্দের ভবিষ্যদ্দৃষ্টি। আমাদের স্ত্রীজাতির দুর্দশা-বিড়ম্বিত জীবনের দুঃখময় চিত্র স্বামীজিকে মর্মে মর্মে পীড়িত করিয়াছিল। সেইজন্য আদর্শ নারী-জাতিগঠনের ভার দিয়াছিলেন তিনি তাঁহার সুযোগ্যা শিষ্যা ভগিনী নিবেদিতার উপর।

১৮৯৮ সনে ভারতবর্ষে আসিয়া ভগিনী নিবেদিতা ১৬নং বোসপাড়া লেনে একটি ক্ষুদ্র গৃহে তাঁহার কাজ আরম্ভ করেন। তাঁহার চেষ্টায় ছোট ছোট বালিকাদের জন্য একটি কিণ্ডারগার্টেন বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। তিনি নিজে হইলেন ইহার শিক্ষয়িত্রী। তাঁহার অসামান্য প্রতিভার নিকট ভারতীয় নারীশিক্ষার সত্যকার সমস্যা ধরা পড়িল। দীর্ঘকালের স্তূপীকৃত অজ্ঞান ও কুসংস্কার-জাত প্রবল প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যেও তিনি ধীর অবিচলিত পদক্ষেপে লক্ষ্যানুসরণ করিতে লাগিলেন। তিনি কায়মনোবাক্যে সম্পূর্ণ ভারতীয় ভাব, রীতিনীতি অবলম্বন করিয়া জনসাধারণের বিরুদ্ধ মনোভাবকে নিরস্ত করিতে চেষ্টা করেন। তাঁহার কর্মে সর্বান্তঃকরণে সহায়িকা হইয়াছিলেন ভগিনী ক্রিশ্চিন ও স্বর্গতা সুধীরা বসু।

বর্তমানে বিদ্যালয়টির পরিচালন-ভার রামকৃষ্ণ মিশন-কর্তৃক নিযুক্ত একটি পরিচালক-সমিতির উপর ন্যস্ত। বিদ্যালয়ের মাধ্যমিক বিভাগ একটি উপসমিতি দ্বারা পরিচালিত হয়। মাধ্যমিক বিভাগ (পঞ্চম হইতে দশম শ্রেণী পর্যন্ত) পশ্চিমবঙ্গ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত। শিশু ও প্রাথমিক বিভাগে কিণ্ডার-গার্টেন পদ্ধতি অনুসৃত। সমবেতভাবে সংস্কৃতস্তোত্রাবৃত্তি ও 'বন্দে মাতরম্'-সঙ্গীত-গীতান্তে বিদ্যালয়ের কার্যারম্ভ হয়। অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত সীবন ও সূচীশিল্প অবশ্যশিক্ষণীয় বিষয়। সুকুমারমতি ছাত্রীদের অন্তরে ধর্ম ও সাংস্কৃতিক ভাবাদর্শের উদ্দীপনার্থ অতিযত্ন-সহকারে উপযুক্ত পাঠ্যপুস্তক নির্বাচন করা হয়। প্রতিবৎসরে তিনটি পরীক্ষা হয়। যোগ্যা ছাত্রীদের উৎসাহ-বর্ধনার্থ বৃত্তি ও পুরস্কারের ব্যবস্থা আছে।

একটি ত্রিতল গৃহে বিদ্যালয়ের কাজ পরি-চালিত হয়। ইহাতে ৩০টি বৃহৎ প্রকোষ্ঠ আছে; প্রার্থনাপ্রকোষ্ঠও সুবিস্তৃত। সারদা-মন্দির ত্রিতলে অবস্থিত। এই আবাসিক প্রতিষ্ঠানে বিদ্যালয়ের ছাত্রী ও মহিলা কর্মিগণ অবস্থান করেন।

১৯৫০ সনের শেষে বিদ্যালয়-লাইব্রেরীতে ৩২০০ পুস্তক, তিনখানি দৈনিক পত্রিকা, দুইখানি ইংরেজী ও পাঁচখানি বাংলা মাসিক পত্রিকা ছিল।

১৮৯৮ সনে ভগিনী নিবেদিতা দরিদ্র পর্দানশীন নারীগণের শিক্ষার জন্য বিদ্যালয়ের শিল্পবিভাগ প্রতিষ্ঠা করেন। এখনও পর্যন্ত এই বিভাগে দর্জির কাজ, এমব্রয়ডারি, উলের কাজ শেখান হয়। এই বিভাগটি অবৈতনিক। ১৯৪৯ সনে এই বিভাগে ৪৯ জন শিক্ষার্থিনী ছিলেন। শিল্পবিভাগটি রাজ্যসরকার-কর্তৃক অনুমোদিত এবং সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত। ইহার শিক্ষার্থিনীগণ লেডি ব্র্যাবোর্ন ডিপ্লোমা পরীক্ষা দিয়া থাকেন।

বিদ্যালয়ের ছাত্রীসংঘ একটি সংস্কৃতিগোষ্ঠী।

ইহাতে পঞ্চম শ্রেণী হইতে দশম শ্রেণীর ছাত্রীরা যোগদান করে। ছাত্রীসংঘে শিক্ষয়িত্রীগণ ধর্ম জীবনী ইতিহাস সাহিত্য-সম্বন্ধে মনোজ্ঞ আলোচনা করিয়া থাকেন। বিশ্বের সাম্প্রতিক ঘটনাবলী-সম্বন্ধেও বিতর্কসভা অনুষ্ঠিত হয়। শিক্ষয়িত্রীগণের সক্রিয় সহায়তায় ছাত্রীগণ একটি হস্তলিখিত সাময়িক পত্র প্রকাশ করিয়া থাকে।

এই বর্ষচতুষ্টয়ে কয়েক জন বিশিষ্ট ব্যক্তি বিদ্যালয় পরিদর্শন করেন। পুরস্কারবিতরণ, শ্রীশ্রীসরস্বতী-পূজা এবং প্রতিষ্ঠাত্রীদিবসও সুচারুরূপে উদ্‌যাপিত হইয়াছে। ১৯৫০ সনে বিদ্যালয়ের ছাত্রীসংখ্যা ৬৫১ এবং সারদা-মন্দিরের আশ্রমিকাসংখ্যা ছিল ৪৫।

বিদ্যালয়ের কয়েকটি আশু প্রয়োজনের প্রতি সহৃদয় স্ত্রীশিক্ষানুরাগী ব্যক্তিগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। বিদ্যালয়টি এক ঘনবসতিপূর্ণ অঞ্চলে অবস্থিত। বিদ্যালয়-প্রাঙ্গণে বালিকাদের খেলাধূলার উপযুক্ত স্থানাভাব। যথেষ্ট অর্থাগম হইলে এই অভাবটি দূর করা যাইতে পারে। ব্রহ্মচারিণীগণের শিক্ষাকেন্দ্র-স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা বিশেষ ভাবে অনুভূত হইতেছে। এই শিক্ষাকেন্দ্রে কয়েকজন কলেজের ছাত্রীকেও 'আশ্রমিক পরিবেশে বাস করিবার সুযোগ দেওয়া যাইতে পারে। সারদা-মন্দিরের আশ্রমিকাগণ ধ্যানধারণার উপযুক্ত নির্জন শমপ্রধান স্থানে যাহাতে থাকিতে পারেন তাহার ব্যবস্থাও নিতান্ত অপরিহার্য। ব্রহ্মচারিণী ও ছাত্রীগণের আহারাদির ব্যবস্থার জন্যও অর্থের প্রয়োজন। কলিকাতার বিভিন্ন অঞ্চল হইতে ছাত্রী ও শিক্ষয়িত্রীগণের গমনাগমনের জন্য একটি মোটর বাস ক্রয় করা দরকার।

শ্রীমৎ ব্রহ্মচারী মাতৃকাচৈতন্যজীর তিরোধানে বিদ্যালয় একজন অক্লান্ত অমায়িক আদর্শগতপ্রাণ কর্মীকে হারাইয়াছে।

১৯৫০ সনে বিদ্যালয়ের প্রাথমিক বিভাগের মোট আয় ১৪,৫২৫।৶২ পাই এবং মোট ব্যয় ৬২,৮৭৩।৶৬ পাই।

---

## নবপ্রকাশিত পুস্তকাবলী

১। **Ramakrishna—His Life And Teaching** By Prof. F. Max Muller. 200 Pages. Price: Rs. 5/-.

২। **Complete Works of Swami Vivekananda, Vol VIII**—Mayavati Memorial Edition. 577 Pages. Price: Cloth-bound Rs. 7-8 and board-bound Rs. 6/-

৩। **Is Vedanta the Future Religion?**—By Swami Vivekananda. 35 Pages. Price: Annas Eight.

এই তিনখানা পুস্তক ৪, ওয়েলিংটন লেন, কলিকাতা-১৩, অদ্বৈত আশ্রম হইতে প্রকাশিত এবং প্রাপ্তব্য।

৪। **Mental Health and Hindu Psychology**—by Swami Akhilananda. Published by Harper & Brothers, New York. 231 Pages. Price $ 3-50

# বিবিধ সংবাদ

**কলিকাতা বিবেকানন্দ সোসাইটি**—গত অগ্রহায়ণ ও পৌষ দুই মাসে এই প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে স্বামী পুণ্যানন্দজী 'পূজ্যপাদ স্বামী প্রেমানন্দ মহারাজের জীবনকথা,' স্বামী জগদীশ্বরানন্দজী 'পূজনীয় স্বামী বিজ্ঞানানন্দ মহারাজের জীবনী', শ্রীরমণীকুমার দত্তগুপ্ত 'পূজ্যপাদ স্বামী সুবোধানন্দ মহারাজের জীবন-কাহিনী' ও 'যীশুখৃষ্টের জন্ম ও বাণী', স্বামী গম্ভীরানন্দজী 'পরমারাধ্যা শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী সারদামণিদেবীর পুণ্যকাহিনী ও উপদেশ' এবং স্বামী সুন্দরানন্দজী 'পূজ্যপাদ মহাপুরুষ স্বামী শিবানন্দ মহারাজের চরিত্র-মাহাত্ম্য ও উপদেশ' ও 'পূজ্য স্বামী সারদানন্দ মহারাজের জীবনকথা'-সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। বক্তৃতান্তে ঘোষ লেনস্থ কালীকীর্তন-সম্প্রদায়, বাগবাজার করুণাময়ী আশ্রমের ভক্তবৃন্দ প্রভৃতি বিভিন্ন সঙ্গীত ও কীর্তন-গায়কদল সুমধুর কালীকীর্তন ও শ্রীরামকৃষ্ণ-ভজন গাহিয়া শ্রোতৃ-বর্গের মনোরঞ্জন করেন। এতদ্ব্যতীত সাপ্তাহিক ধর্মালোচনা-সভায় পণ্ডিত শ্রীহরিদাস বিদ্যার্ণব 'গীতা' এবং শ্রীরমণীকুমার দত্তগুপ্ত 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাপ্রসঙ্গ' ও 'স্বামী বিবেকানন্দের ভারতীয় বক্তৃতাবলী' ধারাবাহিক ভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

**কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন-উৎসব**—গত ৬ই পৌষ হইতে চারি দিন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন-উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষে মধ্যপ্রদেশের রাজ্যপাল শ্রীমঙ্গলদাস পাকওয়াসা ভাষণপ্রসঙ্গে সমবেত ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্দেশে বলেন, "আপনারা স্বাধীন ভারতে নূতন জীবন আরম্ভ করিতে যাইতেছেন, আমাদের সময় আমরা বৈদেশিক শাসনপাশ-বিমুক্ত স্বাধীনভারতের কথা স্বপ্নেও চিন্তা করিতে পারিতাম না। আমাদের চতুষ্পার্শ্বস্থ পরিবেশের মধ্যে প্রতীচ্যের ছাপ থাকিত। যে শিক্ষা দেওয়া হইত, তাহা বিদেশী শাসকদের উদ্দেশ্যের অনুকূল ছিল। ইংরেজীকেই শিক্ষার বাহন করা হইয়াছিল। কিন্তু স্বাধীনভারতে একই পন্থা অনুসরণ করা হইবে কি না বিবেচনা করার সময় উপস্থিত হইয়াছে। যদি আমরা স্থির করি, যে উদ্দেশ্যে শিক্ষা প্রদান করা হইত তাহার পরিবর্তন-সাধন করিতে হইবে, তাহা হইলে নূতন পদ্ধতি অন্বেষণ করিতে হইবে।"

তিনি আরও বলেন, "গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে ব্যক্তির সর্বাঙ্গীণ উন্নতি-সাধনের সুযোগপ্রদানই শিক্ষার উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। অধুনা বিজ্ঞান চিন্তা-জগতের অধিকাংশ স্থান গ্রহণ করিয়াছে। বিজ্ঞান আণবিক বোমা আবিষ্কার করিয়াছে। উহার শক্তি এত প্রচণ্ড যে, উহা দ্বারা কয়েক মিনিটের মধ্যে একটি বিশাল অঞ্চল সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট এবং সহস্র সহস্র প্রাণনাশ হইতে পারে। এই আবিষ্কারের দ্বারা মানুষ আত্মবিলুপ্তির কিনারায় দণ্ডায়মান হইয়াছে। কিন্তু যদি এই বিপুল শক্তিকে মানুষ নৈতিক আদর্শের ভিত্তিতে প্রয়োগ করে, তবে তাহা মানুষের কল্যাণসাধন করিতে পারে।"

যথার্থ শিক্ষাদর্শ-সম্বন্ধে শ্রীপাকওয়াসা বলেন, "ছাত্রদিগকে ঠিক পথে পরিচালনা করা হইতেছে না। ছাত্রগণের নৈতিক ও আত্মিক শক্তি আমাদের সহায়তায় অগ্রসর হয় নাই। প্রতিক্ষেত্রেই তাঁহাদিগকে আত্মস্বার্থ অনুসরণ করিতে শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। আত্মত্যাগের মহান শিক্ষা দেওয়া হইতেছে না। যদি আজ আমরা অহঙ্কার, উচ্চাকাঙ্ক্ষা প্রভৃতি

ছড়াছড়ি দেখিতে পাই, তবে উহার কারণ কি তাহা অনুসন্ধান করিতে হইবে। কারণ-অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে যে, আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থা সম্পূর্ণ একতরফা, এই ব্যবস্থায় মানুষের নৈতিক শক্তি-উদ্বোধনের জন্য কিছুই করা হয় নাই। সুতরাং প্রকৃত শিক্ষা বলিতে শুধু জীবিকা অথবা নাগরিক অধিকার-অর্জনের জন্য শিক্ষা বুঝাইবে না। শিক্ষা আত্মিক শক্তির উদ্বোধন করিবে এবং সত্য ও ধর্ম-অনুশীলনে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করিবে। যদি ভারতকে পুনর্গঠন এবং উহার সংস্কৃতি ও সভ্যতা রক্ষা করিতে হয়, তাহা হইলে ভবিষ্যতে যে শিক্ষা দেওয়া হইবে তাহা যেন শুধু কারখানা অথবা ঐহিকসম্পদ-অর্জনের শিক্ষা না হইয়া চরিত্রের উন্নতি করিতে পারে এবং শুধু ঐহিক কল্যাণ ব্যতীতও নৈতিক এবং আত্মিক উন্নতি সাধন করিতে পারে।"

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলার পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল ডক্টর হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় বক্তৃতাপ্রসঙ্গে বলেন, "ছাত্রদের শারীরিক শিক্ষা-প্রদান করিবার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের উপযুক্ত শিক্ষাপ্রাপ্ত শারীরিকশিক্ষা-পরিচালক নিযুক্ত করা উচিত। তিনি অন্যান্য বিভাগের প্রধানদের অনুরূপ বেতন পাইবেন। শারীরিক শিক্ষাপ্রদানের জন্য উপযুক্ত শিক্ষাপ্রাপ্ত শিক্ষকদেরও নিযুক্ত করা কর্তব্য। তাঁহারাও অন্যান্য শিক্ষকদের ন্যায় বেতন ও মর্যাদার অধিকারী হইবেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা-পর্যায়ে ছাত্রদের শারীরিক শিক্ষা আমি আবশ্যিক বলিয়া ঘোষণা করা প্রয়োজনীয় মনে করি।"

তিনি আরও বলেন, "পশ্চিমবঙ্গে ১০ হইতে ৪০ বৎসরের মধ্যে যাহাদের বয়স, তাহাদের অধিকাংশই নিরক্ষর। তাহাদের শিক্ষালাভের কোন উপায় বা সুযোগ নাই। বর্তমান শিক্ষাপরিকল্পনা-অনুযায়ী যে ৬৭০টি প্রাপ্তবয়স্ক-শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তাহার মাধ্যমে ১ কোটি ৩৬ লক্ষ নিরক্ষরের মধ্যে মাত্র ৩০ হাজার নরনারীকে শিক্ষিত করা হইয়াছে। আর্থিক অনটনের জন্য আমাদিগকে সামর্থ্য-অনুযায়ী ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে।"

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্‌চ্যান্সেলার বিচারপতি শ্রীশম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বক্তৃতা-প্রসঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থিক অবস্থার কথা উল্লেখ করিয়া বলেন যে, আর্থিক অনটন বিশেষ অসুবিধার কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

ছাত্র-সমাজের উদ্দেশে তিনি বলেন, "বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ডিগ্রীলাভ করাই ছাত্রজীবনের উদ্দেশ্য বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। ভারতের জন-সাধারণকে শিক্ষিত করিয়া তুলিতে হইবে। ছাত্রদের প্রকৃত শিক্ষালাভ করা উচিত। প্রকৃত শিক্ষা বলিতে সত্যের প্রতি আকর্ষণ, কর্তব্যবোধ এবং জীবনের মহৎ উদ্দেশ্যসাধনে মানসদৃষ্টির উন্মীলন বুঝায়। শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য সত্যবাদিতা শৃঙ্খলা এবং চারিত্রিক দৃঢ়তা-অর্জন।"

বিচারপতি বন্দ্যোপাধ্যায় আরও বলেন, "ইংরেজী অথবা ফরাসী ভাষা না জানিলে বিশ্বের সহিত ভাবের আদান-প্রদান সম্ভব হইবে বলিয়া আমি মনে করি না। আমরা ইংরেজী ভাষা শিক্ষা করিয়াছি। সুতরাং উহা বজায় রাখা হইবে না কেন? অবশ্য আমি চিরকালের জন্য ইংরেজীকে রাষ্ট্রভাষা করিয়া রাখার কথা বলিতেছি না। সেদিন আমাদের চ্যান্সেলার বলিয়াছিলেন যে, হিন্দী ভারতের রাষ্ট্রভাষা হইবে। এই কথা স্বীকার করিয়াও প্রশ্ন উঠে যে, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে হিন্দীকে কি আমরা রাষ্ট্রভাষা-রূপে গ্রহণ করিতে পারিব? অথবা আমাদের কি এই কথা বলা উচিত নয় যে, দ্বিতীয় ভাষা হিসাবে আমরা ইংরেজী ভাষা শিক্ষা করিব—যতদিন না ইংরেজীর স্থান অধিকার করার জন্য একটি রাষ্ট্রভাষার উদ্ভব হয়। আমি এই বিষয়টি

ভারতের কল্যাণের জন্য সতর্কভাবে বিবেচনা করিয়া দেখিতে অনুরোধ করিতেছি।"

**পুরুষোত্তমপুর শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাসদনে গীতা-জয়ন্তী**—গত ২৩শে অগ্রহায়ণ এই প্রতিষ্ঠানে গীতা-জয়ন্তী অনুষ্ঠিত হইয়াছে। ঐ দিন পূর্বাহ্ণে সেবাসদন-বিদ্যালয়ের শিক্ষক শ্রীঅঘোর চন্দ্র শর্মা পার্থসারথি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পূজা এবং পণ্ডিত শ্রীরামেশ্বর কাব্যমীমাংসাতীর্থ মহাশয় অখণ্ড গীতা পাঠ করেন। অপরাহ্ণে শ্রীরবীন্দ্রনাথ পাণ্ডা, বি-এল্ মহাশয়ের অধিনায়কত্বে সেবাসদন-বিদ্যালয়ের কতিপয় ছাত্রী-কর্তৃক গীতার ধ্যান ও দ্বাদশ অধ্যায় পঠিত হইলে তিনি গীতাসম্বন্ধে এক মর্মস্পর্শী বক্তৃতা দেন। পরিশেষে সমাগত ব্যক্তিগণের মধ্যে প্রসাদ-বিতরণান্তে উৎসব শেষ হয়।

**শ্রীরামকৃষ্ণ-কল্পতরু-উৎসব**—গত ১৫ই পৌষ শ্রীহরেন্দ্র কুমার নাগ মহাশয়ের ৩৮, বিডন ষ্ট্রীটস্থ বাস-ভবনে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কল্পতরু-উৎসব উপলক্ষে পূজা ভজন কীর্তন প্রসাদ-বিতরণাদি অনুষ্ঠিত হইয়াছে। অপরাহ্ণে একটি আলোচনা-সভায় স্বামী সুন্দরানন্দজী, শ্রীরমণীকুমার দত্তগুপ্ত ও শ্রীকুমুদবন্ধু সেন কল্পতরু-সম্বন্ধে আলোচনা করেন। এই উৎসবে বহু ভক্ত নরনারী উপস্থিত হইয়াছিলেন।

**ভ্রম-সংশোধন**—গত অগ্রহায়ণ-সংখ্যায় প্রকাশিত "জৈনধর্মের সংক্ষিপ্ত পরিচয়"-প্রবন্ধে কয়েকটি ভুল আছে। মাননীয় জৈনপণ্ডিত শ্রীপূরণচাঁদ শ্যামসুখা এই ভুল দেখাইয়াছেন, এইজন্য তাঁহাকে কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। তিনি লিখিয়াছেন, পার্শ্বনাথের জন্ম ৮৭৭ খৃঃ পূর্বাব্দে, নির্বাণ ৭৭৭ খৃঃ পূর্বাব্দে এবং মহাবীরের নির্বাণ ৫২৭ খৃঃ পূর্বাব্দে হইয়াছিল। মহাবীরের জন্ম বৈশালীর নিকটবর্তী ক্ষত্রিয় কুণ্ডপুরে এবং নির্বাণ রাজগৃহের নিকট পাওয়াপুরী নামক স্থানে। মহাবীরের সম্প্রদায়ে স্থবিরকল্পী ও জিনকল্পী নামক দ্বিবিধ সাধু ছিলেন। প্রথমোক্ত পন্থিগণ এবং পার্শ্বনাথের সম্প্রদায় বস্ত্র পরিধান করিতেন এবং শেষোক্ত জিনকল্পিগণ নগ্ন থাকিতেন। প্রাগুক্ত পণ্ডিত মহাশয় আরও লিখিয়াছেন যে, "স্যাদস্তি ও স্যান্নাস্তি"র অর্থ 'থাকিতেও পারে, না-ও থাকিতে পারে' ইহা ঠিক নয়। ইহার অর্থ—'কোন অপেক্ষায় বা দৃষ্টিতে অস্তি এবং অন্য কোন অপেক্ষায় নাস্তি'। প্রত্যেক বস্তুতে এইরূপ অস্তি নাস্তি-ধর্ম রহিয়াছে। এইরূপ অর্থও সঙ্গত বলিয়াই আমাদের মনে হয়। ইহার যৌক্তিকতা বিশেষজ্ঞগণের বিচার্য। তিনি জানাইয়াছেন যে, শ্বেতাম্বর-সম্প্রদায়ের পণ্ডিত সুখলাল এখনও জীবিত আছেন।

# সকল ধর্মের সম্মিলন

সম্পাদক

সকল ধর্মের তুলনামূলক আলোচনা করিলে দেখা যায়—দেশ ও ভাষাগত পার্থক্যের জন্য উহাদের বহু বিষয় কেবল নামে বা শব্দে পৃথক, কিন্তু অর্থে কোন প্রভেদ নাই। খৃষ্টানদের ইংরেজী শব্দ 'গড্', মুসলমানদের আরবী শব্দ 'আল্লা' এবং হিন্দুদের সংস্কৃত শব্দ 'ঈশ্বর' ঠিক তাহাদের 'ওয়াটার' 'পানি' ও 'জল' এই তিনটি শব্দের ন্যায় সম্পূর্ণ একার্থবোধক। 'গ্রেটেষ্ট' 'আকবর' 'পরম' বা 'মহা' শব্দ ভাষার দিক দিয়া বিভিন্ন হইলেও ইহাদের অর্থ এক; 'গ্রেটেষ্ট গড্' 'আল্লা হো আকবর' 'অহুর্ মজ্দা' শব্দের অর্থ একই 'পরম দেবতা' বা 'মহাদেব'।

প্রাচীনকালে চীন দেশে শিক্ষিত ও সংস্কৃতিমান অপরিচিত ভদ্রলোকগণ কোন স্থানে একত্র হইলে একে অপরকে প্রথমতঃ জিজ্ঞাসা করিতেন, 'আপনি কোন্ মহান্ ধর্মাবলম্বী?' এক ব্যক্তি হয়তো কংফুস্-পন্থী, অপর ব্যক্তি হয়তো তাও-মতাবলম্বী, আর একজন হয়তো বৌদ্ধ; পরে তাঁহাদের প্রত্যেকে সকল ধর্মের প্রশংসা করিতেন এবং শেষে সকলে সমস্বরে বলিতেন, 'ধর্ম নানা-প্রকার, কিন্তু যুক্তি এক, আমরা বিভিন্ন-ধর্মা-বলম্বিগণ একে অপরের ভাই।' চীনের প্রসিদ্ধ দার্শনিক পণ্ডিত লু-সান্-ইয়ান্ বলিয়াছেন, "বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের উপদেশ বিভিন্ন নয়। উদার ব্যক্তিগণ উহাদিগকে একই সত্যের বিভিন্ন অভিব্যক্তি মনে করেন এবং সংকীর্ণমনা ব্যক্তিগণ উহাদের বিভিন্নতা ও পার্থক্য দেখেন। বিভেদ-দর্শন জান্তব মনের পরিচায়ক। একত্বের আত্মাই মানবাত্মা—সর্বব্যাপী আত্মা—অপৃথক আত্মা।'

'ধর্ম' শব্দের ইংরেজী প্রতিশব্দ 'রিলিজন্'। ইহা ল্যাটিন্ 'রি' ও 'লিজিয়ার' হইতে উৎপন্ন। 'রি' অর্থ—'পুনরায়' এবং 'লিজিয়ার' অর্থ—'বন্ধন করা'। সাধারণতঃ মানুষ ভগবান হইতে—এক মানুষ অপর মানুষ হইতে দূরে সরিয়া আছে, যাহা পুনরায় মানুষকে ভগবানের দিকে লইয়া যায়—যাহা মানুষকে মানুষের সহিত প্রেম ও সহানুভূতি-সূত্রে পুনরায় আবদ্ধ করে, তাহাই ধর্ম। সংস্কৃত 'ধর্ম' শব্দটি 'ধৃ'-ধাতু হইতে প্রাপ্ত। 'ধৃ' অর্থ ধারণ করা বা একত্রে বন্ধন করা। এই 'ধর্ম' ও পালি 'ধম্ম' শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থও ইংরেজী 'রিলিজন' শব্দটির প্রায় অনুরূপ। 'ইস্লাম্' শব্দের অর্থ—শান্তিপূর্ণভাবে ভগবানের শরণ-গ্রহণ—ঈশ্বরে শান্তিময় শরণাগতি—ক্ষুদ্র আমিত্ব ত্যাগ করিয়া বৃহৎ আমিত্ব-অবলম্বন—ক্ষুদ্র দেহবুদ্ধিজাত অহংবর্জিত হইয়া সর্বব্যাপী ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ। 'হে ভগবান, তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হ'ক, আমার নয়!'—ইহাই খৃষ্টধর্মের মূলতত্ত্ব। 'খৃষ্ট' অর্থ—ঈশ্বরীয় জ্ঞানে অভিষিক্ত

বা স্নাত হওয়া। 'বৈদিক ধর্ম'-এর মানে—বেদবিষয়ক বা জ্ঞানের ধর্ম। 'সনাতন ধর্ম'-এর অর্থ—চিরন্তন ধর্ম—নিত্য ধর্ম—চিরস্থায়ী ধর্ম। চৈনিক 'তাও' ধর্মের অর্থ—বন্ধন ত্যাগ করিয়া মুক্ত হইবার পথ।

সকল ধর্ম, সকল দর্শন ও সকল বিজ্ঞান ঈশ্বর প্রকৃতি ও মানুষ এই ত্রিতত্ত্ব কোন-না-কোন আকারে স্বীকার করেন। সকলেই বলেন—বিশ্ব-প্রকৃতি একমেবাদ্বিতীয়ম্ ঈশ্বরেরই প্রকৃতি। তিনি অপরিবর্তনীয়। প্রকৃতি তাঁহার সতত-পরিবর্তনশীল পরিচ্ছদ-বিশেষ। তিনি মানুষের মধ্যে আত্মা-রূপে বিদ্যমান। কাজেই মানুষ তত্ত্বতঃ ঈশ্বর। ভগবান আপনাকে ভুলিয়া মানুষের মধ্যে যেন নিদ্রিত হইয়া আছেন; তাঁহাকে আপনাতে জাগ্রত করাই মানুষের জীবনের প্রধান কর্তব্য।

সর্বধর্মসার বেদান্ত বলেন, "ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ"—'ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা, জীব ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য কিছু নয়।' এই নাম-রূপ-গুণের জগৎ নিয়ত পরিবর্তন ও ধ্বংসশীল, সুতরাং মিথ্যা। সকল জীব ও পদার্থ সেই এক ব্রহ্মসত্তায় অস্তিত্ববান। তিনিই সকলের সত্তা। অজ্ঞানরূপ মেঘদ্বারা জ্ঞান-সূর্য আবৃত আছে বলিয়া মানুষ সর্বভূতস্থিত ব্রহ্মকে দেখিতে পায় না। জ্ঞানোদয়ে তাঁহাকে সর্বত্র সর্বভূতে দেখা যায়। জীবাত্মা ও পরমাত্মায় পার্থক্য এই যে, জীবাত্মা জীবে-জীবে দেহরূপ সীমায় নাম রূপ ও গুণের আবরণে যেন আবৃত হইয়া সীমাবদ্ধ, পক্ষান্তরে পরমাত্মা ইহাদের সকলের বাহিরে সকলের সমষ্টি-স্বরূপে সকল নাম রূপ ও গুণাতীত নিত্যমুক্ত। সাধন-সহায়ে জীবাত্মা বা পরমাত্মার স্বরূপ জানিলে মানুষের জীবত্বের বন্ধন নষ্ট হয়; তখন সাধক আপনাকে ব্রহ্মরূপে দর্শন করিয়া বলেন, 'অহং ব্রহ্মাস্মি' বা 'তত্ত্বমসি'। এই মহাবাক্যের প্রতিধ্বনি করিয়া কোরান বলিয়াছেন, "আমি (ঈশ্বর) তোমার (মানুষের) মধ্যে, কিন্তু অন্ধ তুমি আমাকে দেখিতে পাও না।" অপর স্থলে—"যিনি আপনাকে জানিয়াছেন, তিনি ঈশ্বরকেও জানিয়াছেন।" মুসলমান সুফীগণ ঘোষণা করিয়াছেন, "তোমার হৃদয় অপেক্ষাও আমি (ঈশ্বর) তোমার নিকটবর্তী।" খৃষ্ট বলিয়াছেন, "আমি ও আমার পিতা এক।" ইহুদী-ধর্মসাধক ইসায়া সাধনার সর্বোচ্চ অবস্থায় উপনীত হইয়া প্রচার করিয়াছেন, "আমিই ঈশ্বর, অন্য কেহ নই।" বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্র উদানে আছে যে, একদিন বুদ্ধ সমাধি-ব্যুত্থিত হইয়া বলিয়াছিলেন, "সমাধি-ব্যুত্থিত সাধক নিজকে ব্রহ্ম বলিতে পারেন।" সুফী সাধক বাজাজিত বুস্তামী বলিতেন, "আমি কি আশ্চর্য—আমাকে প্রণাম।" জরথুষ্ট্র-পন্থী অব্‌মজ্‌ড ইসাত ঘোষণা করিতেন, "আমার প্রথম নাম আমি।" তাওধর্মী সাধক বলেন, "তোমার মধ্যে তাওকে দেখিলে তুমি সকলই জানিতে পারিবে।" কংফুস প্রচার করিয়াছেন, "অনুন্নত ব্যক্তি বাহিরে এবং উন্নত ব্যক্তি আপনার ভিতরেই সকল সন্ধান করেন এবং প্রাপ্ত হন।" এই আলোচনায় অতি স্পষ্টরূপে প্রতীত যে, ভাষায় ও ভাবপ্রকাশে পার্থক্য থাকিলেও সকল ধর্মের সর্বোচ্চ আদর্শ এক।

কেবল আদর্শে নয় পরন্তু অনেক বিষয়ে বিভিন্ন ধর্মের পার্থক্য কেবল ভাষা বা শব্দগত। বিভিন্ন ধর্ম বিভিন্ন ভাষায় একই কথা বলিয়াছেন। যিনি আপনার ভিতরে ও বাহিরে সর্বত্র সর্বভূতে একই ব্রহ্মকে দেখিতে পান, হিন্দুশাস্ত্রে তিনি জীবন্মুক্ত পূর্ণপুরুষ দিব্যপুরুষ অবতার পরমহংস, বৌদ্ধশাস্ত্রে অর্হৎ বুদ্ধ সম্বুদ্ধ, জৈনশাস্ত্রে তীর্থংকর, খৃষ্টানশাস্ত্রে মেসীয়া ঈশ্বর-সন্তান এবং মুসলমান-শাস্ত্রে ইসান্-উল্-কামিল মর্দ-ই-তমম্ মজ্‌হর-ই-আতামন্ বলিয়া অভিহিত।

হিন্দুধর্ম-প্রচারিত জ্ঞানমার্গ ভক্তিমার্গ ও কর্মমার্গের সঙ্গে খৃষ্টানধর্মের জ্ঞানপথ, অনুরক্তি

বা রাহস্যিক পথ এবং দাক্ষিণ্যের পথের বিশেষ কোন পার্থক্য দেখা যায় না। এ বিষয়ে ইস্লাম ধর্মের হকিকৎ তরিকৎ সরিয়ৎ, বৌদ্ধধর্মের সম্যক্‌দৃষ্টি সম্যক্‌সংকল্প সম্যক্‌-ব্যায়াম এবং জৈনধর্মের সম্যক্‌দর্শন জ্ঞান-চরিত্রম্‌ ও মোক্ষমার্গ প্রায় একার্থবোধক।

সকল ধর্মই জীবমাত্রেরই ত্রিবিধ শরীরের অস্তিত্ব স্বীকার করেন। হিন্দুশাস্ত্রে ইহা স্থূল সূক্ষ্ম কারণ, খৃষ্টানশাস্ত্রে ফিজিক্যাল্‌ সাট্‌ল্‌ কজাল্‌, মুসলমান-শাস্ত্রে নাপ্‌ দিল্‌ রোয়া, সুফী-শাস্ত্রে জিসিম্‌-ই-কুল রোয়-ই-কুল্‌ অকল্‌-ই-কুল্‌, জৈনশাস্ত্রে ঔদরিক তৈজস কর্মণ্য শরীর, বৌদ্ধশাস্ত্রে নির্মাণকায় সম্ভোগকায় ধর্মকায় এবং ইহুদীশাস্ত্রে নাফিস্‌ নেসামা রোয়া নামে অভিহিত।

যীশুখৃষ্ট বলিয়াছেন, 'তোমার প্রতিবেশীকে তোমার ন্যায় ভালবাস,' বুদ্ধ উপদেশ দিয়াছেন, 'অহিংসা দ্বারা হিংসা জয় কর', মহম্মদ প্রচার করিয়াছেন, 'সতের আশ্রয়ে অসতের প্রভাব নাশ কর,' হিন্দুধর্মাচার্যগণ বলিয়াছেন, 'সর্বভূতে মৈত্রীভাবাপন্ন হও,' লোজে ঘোষণা করিয়াছেন, 'দয়া দ্বারা নিষ্ঠুরতা দূর কর,' কংফুসে বলিয়াছেন, 'ন্যায়-সহায়ে অন্যায়কে দমিত রাখ,' চুয়াংজী উপদেশ দিয়াছেন, 'ভাললোকের প্রতি তো আমি ভাল ব্যবহার করিবই, মন্দ লোককেও ভাল করিবার জন্য তাহার প্রতিও ভাল ব্যবহার করিব।' বিভিন্ন ধর্মাচার্যগণের এই সকল উপদেশ সকল ধর্মসম্প্রদায়-কর্তৃক মুক্তকণ্ঠে স্বীকৃত।

বিভিন্ন ভাষার আবরণে সকল ধর্মই যে একই উপদেশ দেন, তৎসম্বন্ধে খ্যাতনামা সুফীসাধক মৌলানা রুমীর নিম্নলিখিত গল্পটি অতি উপাদেয়: এক সময়ে একজন আর্বী, একজন তুর্কী, একজন রোমান ও একজন পার্শী এই চারি জন বিভিন্ন ভাষাভাষী এবং সম্পূর্ণ অপরিচিত পথিক এক সঙ্গে একই পথে একই স্থানে যাত্রা করে। কতক দূরে যাইয়া তাহারা সকলেই ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় সমভাবে আক্রান্ত হয়। রাস্তার মাঝে মাঝে আঙ্গুরের ক্ষেত দেখিয়া তাহারা সকলেই ক্ষুধা-তৃষ্ণা উভয়ই দূর করিবার উদ্দেশ্যে মনে মনে উহা খাইবার ইচ্ছা করে। কিন্তু কেহ কাহারও ভাষা জানে না বলিয়া তাহারা পরস্পর মনোভাব-বিনিময় করিতে অসমর্থ হয়। পথিপার্শ্বস্থ একটি আঙ্গুর-ক্ষেতের রক্ষকের নিকট যাইয়া আর্বী বলে—'এনাব,' তাহার অনুসরণে তুর্কী যাইয়া বলে—'লিজাম্‌', এইরূপে রোমান বলে—আস্তাফিল্‌', এবং পার্শী বলে—'আঙ্গুর'। ক্ষেত্ররক্ষক কোন ভাষাই জানিত না বলিয়া সে বিস্মিত হইয়া তাহাদের দিকে তাকাইয়া থাকে। এই সময়ে একজন বহুভাষাবিদ্‌ ফলবিক্রেতা তথায় উপস্থিত হইয়া চারিজন পথিক বিভিন্ন ভাষায় এক আঙ্গুরই চাহিতেছে দেখিয়া সে তাহাদের সম্মুখে আঙ্গুর উপস্থিত করে। পরে সকলেই উহা ক্রয় করিয়া ও খাইয়া পরিতৃপ্ত হয়।

বর্তমান যুগে সর্বধর্মসমন্বয়াবতার শ্রীরামকৃষ্ণদেব আপনার সাধন-জীবনে এই উপদেশের সত্যতা সন্তোষজনক ভাবে প্রমাণ করিয়াছেন। তিনি একে একে সকল ধর্ম কার্যতঃ সাধন করিয়া একই অবস্থায় উপনীত হইয়া বলিয়াছেন—"যত মত তত পথ।" তাঁহার এই উপদেশ কেবল শাস্ত্র যুক্তি ও বিচারের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়, ইহা তাঁহার প্রত্যক্ষ বস্তুগত ও বাস্তবদর্শনের উপর স্থাপিত। এই মহাপুরুষের অনুষ্ঠিত ও প্রচারিত সর্বধর্মসমন্বয় যে পৃথিবীর সকল ধর্মের প্রকৃত সম্মিলনের একমাত্র পথ, ইহাতে আর সন্দেহ নাই।

# সাধনায় সঙ্কল্প

## শ্রীশ্রীমা-সারদামণি দেবী

## ( ১ )

শ্রীযোগেশচন্দ্র মিত্র

সাধনার চিরলীলাভূমি এই ভারতবর্ষকে শত শত পূতচরিতা সাধিকা সাধনার মাহাত্ম্যে পবিত্র করিয়াছেন। লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকিয়া কত সাধিকা যে এই দেশে পরম সত্যের আরাধনা বা সাধনা করিয়া পরমপদ প্রাপ্ত হইয়াছেন তাহার ইয়ত্তা নাই। বৈদিকযুগের মৈত্রেয়ী, গার্গী, বাক্‌, লোপামুদ্রা, বিশ্ববারা, ঐন্দ্রী, খেল প্রমুখ মহীয়সী ব্রহ্মবাদিনী মহিলা স্ব স্ব পুণ্যপ্রভায় বেদ আলোকিত করিয়াছেন। মহাকবি কালিদাস তাঁহার কুমারসম্ভব-কাব্যে পার্ব্বতী, উমা বা অপর্ণার তপস্যার যে অনুপম চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহা সাধনজগতে আদর্শ হইয়া রহিয়াছে। ব্রজেশ্বরী রাধিকার ও ব্রজগোপিনীদিগের সাধনার চিত্র বৈষ্ণবসাহিত্যের প্রাণস্বরূপ হইয়া রহিয়াছে। শবরীর শ্রীরামপদযুগল দর্শনোদ্দেশ্যে জীবন-ব্যাপী স্থৈর্য্য ও তপস্যা তাঁহার ইষ্টদর্শন-বিলম্বজনিত অশ্রুধারায় পূত হইয়া রহিয়াছে। মহাপ্রজাবতী শাক্যরাজ্ঞী গৌতমী, সিদ্ধার্থ-প্রেয়সী যশোধরা—গোপা, বিম্বিসার-পত্নী মগধ-রাজ্ঞী ক্ষেমা, গৃহধর্ম্মিণী বিশাখা মৃগারমাতা, থেরী অম্বপালী প্রভৃতি বৌদ্ধ সাধিকার একাগ্র সাধনা বৌদ্ধধর্ম্ম-ইতিহাসে অমর। মেবার-কুসুম মীরা ও ইতিহাস-উপেক্ষিতা নদীয়া-কুমুদিনী বিষ্ণুপ্রিয়া অপেক্ষাকৃত আধুনিক যুগে বৃন্দাবন ও নদীয়াকে সাধনসুরভিতে আমোদিত করিয়াছেন। আরও শত শত সাধিকার নাম করা যাইতে পারে।

ইঁহাদের মধ্যে হিমাচল-উৎসঙ্গপালিতা শৈলজা উমা অনেক উর্দ্ধে কৈলাসে অবস্থান করেন, খর্ব্ব উদ্বাহু বামন আমরা তাঁহার নাগাল পাই না। বৈদিক সাধিকাগণকে অনেক কষ্টে স্মৃতিপথে আরূঢ় করিতে হয়। হোমের ধূম-যবনিকার অন্তরালে তাঁহারা অস্পষ্ট। ব্রজবিলাসিনী রাধা পুরুষোত্তম শ্যামের অপ্রাকৃত সঙ্গিনী, তাঁহাকে নানাপ্রকার সাধক যিনি যেমন ভাবে পারিয়াছেন বর্ণনা করিয়াছেন। গৌড়ীয় সাধক ও কবিবৃন্দ তাঁহাকে অনুপম, অভিনব, অননুকরণীয় প্রেমপরিচ্ছদে আপাদমস্তক সজ্জিত করিয়াছেন। শবরীও প্রাগৈতিহাসিক যুগের; কালের দূরত্ব তাঁহার সাধনার একাগ্রতা ও কৃচ্ছ্রতাকে গাম্ভীর্য্য ও মহিমায় মণ্ডিত করিয়াছে। ইঁহারা কেহই ঐতিহাসিক নহেন। বৌদ্ধসাধিকাগণ সুদূর অতীতের কুহেলিকাগর্ভে নিমজ্জিত ও বিহার-প্রাচীরাভ্যন্তরে নিভৃত থাকায় স্পষ্ট না হইয়াও অসীম ঔৎসুক্যের উদ্রেক করেন। মীরা ও বিষ্ণুপ্রিয়ার যুগের দূরত্ব ইদানীন্তন কাল হইতে খুব অধিক না হইলেও ইতিহাস তাঁহাদের সঠিক সংবাদদানে সমর্থ নহে, কল্পনার স্থান বিস্তৃত। তখন বিদেশী প্রভাব এদেশে আসিয়াও প্রবল হয় নাই, সময় সাধনার উপযোগী ছিল, দেশ বস্তুতান্ত্রিক হইয়া উঠে নাই। কিন্তু

এই ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর সংশয়বাদের ও বস্তুতান্ত্রিক জড়বাদের গভীর সাগরে নিমজ্জিত কলিকাতা শহরে ও তাহার আশেপাশে অবস্থান করিয়া, প্রত্যহ ঐশ্বর্য্য দ্বন্দ্ব দম্ভ ও মালিন্য প্রত্যক্ষ করিতে করিতে অতন্দ্রিত, অবিশ্রান্ত, বিরুদ্ধাবস্থাবিক্ষুব্ধ অটল প্রচেষ্টা দ্বারা চৈতন্যলাভ করিয়া যিনি সাধনার অতুলনীয় আদর্শ বিশ্বচক্ষের সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়া গিয়াছেন; যিনি একাধারে প্রজ্ঞা প্রেম রূপ নাম ত্যাগ ও শক্তির একায়ন, তিনি মূর্তিমতী অবতীর্ণা সরস্বতী শ্রীশ্রীমা সারদামণি দেবী।

শ্রীমার সম্বন্ধে পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিয়াছিলেন—"ও সারদা সরস্বতী, জ্ঞান দিতে এসেছে। রূপ থাকলে পাছে অশুদ্ধমনে দেখে লোকের অমঙ্গল হয়, তাই এবার রূপ ঢেকে এসেছে।" সারদামণি দেবী, বিষ্ণুপ্রিয়া, গোপা প্রভৃতির সরস্বতীর অংশে জন্ম। তাঁহারা, অর্থাৎ সরস্বতীর এই অবতারগণ, ভোগের জন্য আসেন না। গৃহস্থ হইয়া ত্যাগের ভিতর দিয়া কিরূপে সংসার করিতে হয় ইঁহারা তাহাই দেখাইয়া যান। রুক্মিণী, সীতা প্রভৃতি লক্ষ্মীর অবতার।

তাঁহার সাধনার প্রথম পর্ব্বের আরম্ভ হয় তাঁহার আনুষ্ঠানিক সন্ন্যাসী পতিগুরুর নিকট কামারপুকুরে। তখন তিনি চতুর্দ্দশবর্ষীয়া বালিকা। এই অল্প বয়সেই তিনি বুঝিতে পারিলেন তাঁহার স্বামী সন্ন্যাসী। সুতরাং এই বয়সেই তাঁহার এই দৃঢ় ধারণা হইল যে তিনি সন্ন্যাসিনী, কেন না তিনি সন্ন্যাসীর সহধর্ম্মিণী এবং তাঁহার সারাজীবন যে ত্যাগের মধ্য দিয়া যাইবে, তাহার জন্য প্রস্তুত হইতে তিনি দৃঢ়সঙ্কল্প হইলেন। স্বামী সন্ন্যাসী হইলেও সহধর্ম্মিণীর প্রতি কর্ত্তব্য বিস্মৃত হইলেন না। সামান্য খুঁটিনাটি হইতে আরম্ভ করিয়া জীবনের চরম উদ্দেশ্য ঈশ্বরদর্শন ও ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ পর্য্যন্ত সকল বিষয়ে তাঁহাকে শিক্ষা দিলেন। তিনি বলিতেন—"ধর্ম্মের আঁচড়টি পর্য্যন্ত যেন বাগিয়ে না থাকে।" সেই জন্য তিনি সন্ন্যাসী হইয়াও কখনও সন্ন্যাসীর গৈরিক পরিধেয় ব্যবহার করেন নাই। বাহ্যিক আচরণে তিনি গৃহস্থের মতই থাকিতেন। মনে, ত্যাগে তিনি সন্ন্যাসী, কিন্তু তাই বলিয়া পত্নীর প্রতি কর্ত্তব্য করিবেন না কেন? এত লোকের প্রতি তিনি কর্ত্তব্য করিতেন, পত্নীও ত তাঁহাদের মধ্যে একজন, তিনিই বা বঞ্চিত হইবেন কেন? "তুঁহু জগন্নাথ জগতে কহায়সি জগ বাহির নহি মুই ছার।" ঋষভদেব পুত্রদের বলিয়াছিলেন—

গুরুর্ন স স্যাৎ স্বজনো ন স স্যাৎ পিতা ন স
স্যাজ্জননী ন সা স্যাৎ।
দৈবং ন তৎ স্যান্ন পতিশ্চ স স্যান্ন মোচয়েদ্ যঃ
সমুপেতমৃত্যুম্॥"

অর্থাৎ—যিনি সংসাররূপ মৃত্যুর কবলে পতিত জীবকে ভগবৎপ্রাপ্তির উপদেশ করিয়া উদ্ধার না করেন, তিনি গুরু হইয়া শিষ্য করিবেন না, পিতা হইয়া পুত্রোৎপাদন করিবেন না, জননী হইয়া সন্তান প্রসব করিবেন না, দেবতা হইয়া উপাসকের পূজা গ্রহণ করিবেন না, পতি হইয়া পত্নী গ্রহণ করিবেন না, এবং স্বজন হইয়া আত্মীয়তা করিবেন না। ইহাই শাস্ত্রের আদেশ। পরমহংসদেব এই আদেশ অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালন করিয়াছিলেন। শিষ্যাও গুরুর আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া চৈতন্যলাভান্তে ধন্য হন। সাধারণতঃ সন্ন্যাসী স্বামী লোকাচার ও শাস্ত্রাচারবশে, ভয়ে বা অহঙ্কারের আতিশয্যে স্ত্রীর মুখদর্শন করেন না। ঠাকুর এ পথে ত গেলেনই না, বরং স্বামি-স্ত্রীর বাহ্য সম্বন্ধ অক্ষুণ্ণ রাখিয়া অসীম করুণার বশে সর্ব্বপ্রকারে পত্নীর মন ও হৃদয়কে ব্যবহারিক ও পারমার্থিক সাধনার উপযোগী করিয়া দিলেন। কেবল আদর্শ গৃহী

মহর্ষিরাই ইহা পারিতেন ও করিতেন। সম্রাট অশোকের গুরু দণ্ডী সন্ন্যাসী উপগুপ্ত পতিতার রুগ্নদেহেরও স্বহস্তে সেবা করিয়াছিলেন—

"নিদারুণ রোগে মারী গুটিকায় ভরে গেছে
তার অঙ্গ,
রোগমসীঢালা কালী তনু তার
ল'য়ে পুরবাসী পুর পরিখার
বাহিরে ফেলেছে করি পরিহার বিষাক্ত
তার সঙ্গ।
সন্ন্যাসী বসি আড়ষ্ট শির তুলি নিল নিজ অঙ্কে,
ঢালি দিল জল শুষ্ক অধরে
মন্ত্র পড়িয়া দিল শিরোপরে
লেপি দিল তার দেহ নিজ করে শীত চন্দনপঙ্কে।"
( রবীন্দ্রনাথ )

দণ্ডী স্বামীর পক্ষে স্ত্রী-অঙ্গ স্পর্শ করা নিরয়-গমনোপযোগী অপরাধ, কিন্তু "করুণাকিরণে বিকচ নয়ান" এই গৃহত্যাগী সন্ন্যাসীর হৃদয়ে কারুণ্যের উচ্চতর প্রেরণা আসিয়াছিল। তিনি বিধি-নিষেধের দাসত্ব স্বীকার করিলেন না। তাঁর কাজই যে জগতের হিতসাধন করা। ঠাকুর রামকৃষ্ণও জগতের হিতের জন্য আসিয়াছিলেন। তিনি কোন নিয়মই ভাঙ্গিতে আসেন নাই; কিন্তু সকল নিয়মের ঊর্দ্ধে উঠিতেন ও উঠিতে পারিতেন। 'ব্রাহ্মণী' গুরুমাতা তাহা জানিয়াও পরমহংসদেবকে ভুল বুঝিলেন। ইহা জগজ্জননীর এক ভুবনমোহিনী মায়া। ব্রাহ্মণী বুঝিয়াও বুঝিলেন না যে ঠাকুর সোনার ঘটি।

এই শিক্ষার ফলে অশুভ সংস্কার ত্যাগ করিয়া কি প্রকারে শুভ সংস্কার অর্জ্জন ও রক্ষা করিতে হয় এবং পরে ঈশ্বরদর্শন-লাভের উদ্দেশ্যে কিরূপে সর্ব্ববিধ সংস্কারই ত্যাগ করিতে হয়, এই কিশোরীর সেই জ্ঞান হইল। কিশোর বয়সই সত্যগ্রহণের প্রকৃষ্ট সময়, তখন ত্যাগ আছে কিন্তু ভোগ আরম্ভ হয় নাই; উচ্চ আদর্শের প্রতি তখন লক্ষ্য থাকে; যাহা সুন্দর, যাহা মহৎ তাহার আকর্ষণ তখন প্রবল। সন্ন্যাসীও যে সর্ব্ব সংস্কার অতিক্রম করিয়া কর্ত্তব্যানুরোধে স্ত্রীকে নিকটে রাখিয়া গৃহীর মত সর্ব্বপ্রকার শিক্ষাদান করিতে পারেন, সারদামণি এই সুযোগে তাহা প্রত্যক্ষ করিলেন। ঠাকুর বলিতেন, "ঢোঁড়ায় ধরিলে কষ্ট, জাতসাপে ধরিলে তিন ডাকেই শেষ।" শ্রীমার সাধন তাঁহার নবীন জীবনে এই সাধুর প্রভাবে অতি সুন্দর ও পবিত্রভাবে দ্রুত গড়িয়া উঠিতে লাগিল। লক্ষ্য স্থির হইয়া গেল। পরে যখন তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া ঠাকুরের বিনা আহ্বানে দক্ষিণেশ্বরে আসিলেন তখন স্বামী তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি গো, তুমি কি আমাকে সংসারের পথে টেনে নিতে এসেছ?" মা তখন কৈশোরের সীমা অতিক্রম করেন নাই; অব্যাকুলিত চিত্তে তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন—"না, আমি তোমাকে সংসারের পথে কেন টানতে যাব? তোমার ইষ্টপথেই সাহায্য করতে এসেছি।" এই কথায় মা'র মহিমা যেন উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল; সাধনায় তাঁহার দৃঢ়সঙ্কল্পের আভাস এই কথায় পাওয়া যায়। যেন ব্রহ্মবাদিনী মৈত্রেয়ী যাজ্ঞবল্ক্যকে বলিতেছেন—"যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্য্যাম্?" যৌবনে সন্ন্যাসী স্বামীর নিকট থাকিয়া সাধনা করা শুধু যে নিরাপদ তাহা নহে, তাহা শোভন। ইহাতে মার শুভ-বুদ্ধির ও সৎসংস্কারের পরিচয় পাওয়া যায়; আর তখনকার দিনে স্বজননিয়ন্ত্রিতা অষ্টাদশবর্ষীয়া গ্রাম্য কিশোরীর সন্ন্যাসী স্বামীকে কোনও রূপ জিজ্ঞাসা না করিয়াই তাঁহার নিকট চলিয়া আসায় তাঁহার স্বভাবের দৃঢ়তা ও স্বামীর প্রতি অশেষ নির্ভর ও বিশ্বাস প্রকাশ পাইতেছে। দেবতুল্য স্বামীও স্ত্রীর এই স্বাধীনতাব্যঞ্জক আচরণে কিছুমাত্র অস্বাভাবিকতা দেখিতে পাইলেন না।

বরঞ্চ তাঁহাকে অতি সহজভাবে আদরের সহিত অভ্যর্থনা করিয়া অক্লান্ত শুশ্রূষা ও যত্নে ঝটিতি তাঁহার রোগমুক্তি করিলেন। তিনি নিজে স্বারাজ্যসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন, অপরের ন্যায্য স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করিবেন কেন? তা ছাড়া ঠাকুর শ্রীমাকে ভবিষ্যতে স্বীয় বাণীর বাহক ও প্রচারিকারূপে মনোনীত করিয়াছিলেন তাহা বেশ বুঝা যায়। যাঁহাকে এত বড় দায়িত্ব লইতে হইবে, প্রতিপদে তাঁহার প্রতি শিশুর মত ব্যবহার করিলে চলিবে কেন? ঠাকুর শ্রীমার মধ্যে তাঁহার আরাধ্যা দেবী শক্তিকেই দেখিতেন। দত্তকবি অমর শ্রীমধুসূদনের অপূর্ব্ব সৃষ্টি লঙ্কাপুরপ্রবেশিনী প্রমীলার "রাবণ শ্বশুর মোর, মেঘনাদ স্বামী" কথাটি মার এই দক্ষিণেশ্বর-প্রবেশের ব্যাপারে স্মরণ হয়। কিন্তু মার ক্ষেত্রে এ কথা নিরভিমান স্বাধিকারব্যবস্থিতির দ্যোতক-মাত্র, অভিমান-ব্যঞ্জক নহে। সুতরাং এ ক্ষেত্রেও মার সাধনায় সঙ্কল্পের দৃঢ়তা প্রকাশ পায়।

গঙ্গাস্নানের ছলে দক্ষিণেশ্বরে আসার আরও একটি উদ্দেশ্য ছিল। তাঁহার স্বামী যে সর্ব্বত্যাগী, পরম কারুণিক, ব্রহ্মান্বেষী নৈষ্ঠিক সন্ন্যাসী তাহা তিনি জানিতেন। কিন্তু তাঁহার পিত্রালয়ে সকলে ঠাকুরকে পাগল মনে করিত। তিনি উপায়হীন, স্ত্রীর ভরণপোষণে অক্ষম মনে করিয়া লোকে গঞ্জনা দিত। এমন কি ভানুপিসিও শেষ বয়স পর্য্যন্ত ঠাকুরের ভক্তদের নিকট এই সব কথা তুলিয়া রঙ্গ করিতেন। এইরূপ মনে করিবার কারণ যে একেবারেই ছিল না তাহা নহে, কিন্তু লোকে একটু ছুতা পাইলেই পরনিন্দায় প্রীতি-লাভ করে। "অলোকসামান্যমচিন্ত্যহেতুকং নিন্দন্তি মন্দাশ্চরিতং মহাত্মনাম্"—মন্দলোকেরা মহাত্মাদের অলোকসামান্য কল্পনাতীত সুন্দর চরিত্রেরও নিন্দা করে। এই বিষয়ে শ্রীমার পিতামাতাও দোষশূন্য ছিলেন না, তাঁহারাও জামাইএর পাগলামির উল্লেখ করিয়া অনুতাপ করিতেন, কেন না জামাতা যে স্তরে থাকিতেন, তাঁহারা সে স্তরের চিন্তাই করিতে পারিতেন না। রাজধানীর সমূহ বিবুধমণ্ডলীই কি তাহা পারিতেন? ফলতঃ এই সব নিন্দায় কিশোরী সারদামণির মনে অপরিসীম কষ্ট হইত সন্দেহ নাই। তিনি পরমলজ্জাশীলা ছিলেন, তাছাড়া পিত্রালয়ে চিরপরিচিতদের মধ্যে থাকিতেন বলিয়া প্রতিবাদ করা সেকালে সম্ভব হয় নাই, করিলে শোভনও হইত না। এই কারণে স্বামীর স্বরূপ জানিয়াও তপোনিরতা কুমারী অপর্ণার মত বলিয়া উঠিতে পারেন নাই—

"নিবার্য্যতামালি কিমপ্যয়ং বটুঃ পুনর্বিবক্ষুঃ
স্ফুরিতোত্তরাধরঃ।
ন কেবলং যো মহতোঽপভাষতে শৃণোতি
তস্মাদপি যঃ স পাপভাক্॥"

অর্থাৎ—'হে সখি, এই বটুক পুনর্ব্বার কি বলিবার জন্য সমুদ্যত হইয়াছে, বাক্যপ্রয়োগার্থ তাহার অধর কম্পিত হইতেছে, উহাকে নিষেধ কর। যে ব্যক্তি মহাপুরুষের নিন্দা করে, সে যে কেবল স্বয়ং পাতকের ভাগী হয় তাহা নহে, যে উহা শ্রবণ করে তাহাকেও পাপে নিমগ্ন হইতে হয়।' তাছাড়া মা অত্যন্ত মিষ্টভাষিণী ছিলেন, কাহারও মনে কোনরূপ কষ্ট দিতেন না। যে নিন্দক সে নিজেরই ক্ষুদ্রতা দেখায়। ভগবান শ্রীবুদ্ধ বলিয়াছেন, "বচী দুচ্চরিতং হিত্বা বাচায় সুচরিতং চরে"—অর্থাৎ বাক্যদ্বারা দুরাচরণ না করিয়া উহাদ্বারা মঙ্গলাচরণ করিবে। শ্রীমা ইহার দৃষ্টান্ত।

লোকের গঞ্জনা অসহ্য হওয়ায় শ্রীমা কাহারও সহিত মিশিতেন না। মাঝে মাঝে ভানুপিসির রোয়াকে গিয়া একান্তে অঞ্চল পাতিয়া শুইয়া থাকিতেন। লোকের এই অনুযোগ যে মিথ্যা তাহা প্রমাণ করিবার জন্য, অপ্রতিবাদে পতি-নিন্দাশ্রবণ-রূপ পাতক পরিহার করিবার জন্য ও

ঠাকুরের তদানীন্তন অবস্থা প্রকৃত কি তাহা প্রত্যক্ষ করিবার জন্য অবশেষে মা দক্ষিণেশ্বরে আসিলেন। আসিবার পর তাঁহার চক্ষুকর্ণের বিবাদ মিটিয়া গেল এবং স্বামীর নিকট যে যত্ন, আদর, শুশ্রূষা ও মহৎশিক্ষা পাইলেন তাহাতে তাঁহার স্বামী যে জ্ঞানী, ঈশ্বরভক্ত, কি ধনী কি নির্ধন, কি জ্ঞানী, কি অজ্ঞান তাঁহাকে কি গম্ভীর শ্রদ্ধা করেন এবং তিনি যে স্বীয় পত্নীর ভার গ্রহণে সমর্থ, এই সবই বুঝিলেন ও দেশের লোককে বুঝাইলেন। তখন তাঁহার দেশ হইতে এই পাগল, অখ্যাত, নিঃস্ব ব্রাহ্মণকে দেখিবার জন্য জনপ্রবাহের অবিরাম সমাগম হইতে লাগিল। সঙ্কল্পবদ্ধা মা জয়ী হইলেন।

শ্রীমার লোকগঞ্জনা শ্রবণ ও ঠাকুরের অসাংসারিকতার কথা আলোচনা করিলে একখানি সংস্কৃত কাব্যে বর্ণিত হরপার্বতীর বিবাহের বর্ণনা স্মরণ হয়। উমা-মহেশ্বরের বিবাহ, নগাধিরাজ হিমালয়ের সুসজ্জিত সভায় কত শত বরযাত্রী আসিতেছেন। প্রথমে ব্রহ্মা হংসপৃষ্ঠে আসিলেন। তিনি বিশ্বের স্রষ্টা, রজোগুণের ছড়াছড়ি, চারিদিকে কত বর্ণ গন্ধ রস ঐশ্বর্য্য শোভা উথলিয়া উঠিল; কত অনুচর, তাহাদের কত উজ্জ্বল পরিচ্ছদ, কত আভরণ ও সজ্জা। পরে আসিলেন বিষ্ণু, যাঁহার দ্বারে ত্রিভুবন দণ্ডায়মান; ঐশ্বর্য্যের পরাকাষ্ঠা, গরুড়েরই বা কি তেজোময় দেহ, স্বর্ণময় চঞ্চু, মরকতের পক্ষদ্বয়, কি বাহার! প্রহরী জয়-বিজয়ের দীপ্তিতে গিরিরাজসভা বৈদ্যুত-প্রভায় উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল! তারপর আসিলেন প্রজাপতিগণ, সম্পদের সীমা নাই, সর্বত্র প্রতুলতা ও প্রাচুর্য্য! পরে আসিলেন দিক্‌পালগণ—কত শোভা, সৌন্দর্য্য ও ঐশ্বর্য্যের মেলা! এইরূপে সকলে আসিবার পর সর্বশেষে আসিলেন বর—কৈলাসশিখরসন্নিভ তুষারধবল ও স্বচ্ছ; ঢুলুঢুলু ত্রিনয়ন, অর্দ্ধবাহ্য অবস্থা, অহি-ভূষণ, জাহ্নবীলীলায়িতধূর্জটী, চন্দ্রমৌলি, ভস্মাচ্ছাদিত, বাঘাম্বরপরিহিত মহেশ্বর, ডমরু হাতে রজতগিরিনিভ শুভ্র বৃষের উপর চড়িয়া। সঙ্গে অদ্ভুতাকার অনুচর নন্দী ও ভৃঙ্গী। কোনও বিষয়েই জাঁকজমক নাই; প্রভু, ভৃত্য, বাহন সকলেই সর্ববিষয়ে ধীর, সংযত, রিক্ত, আত্মস্থ। উমার আত্মীয়েরা বর দেখিয়া নিরতিশয় হতাশ হইলেন। গৌরীকে সম্বোধন করিয়া আক্ষেপ করিতে করিতে বলিলেন—"বৎসে, বঞ্চিতাসি—কষ্টে, কি ঠকাই ঠকেছ! ব্রহ্মা বিষ্ণুকে ছেড়েই যদি দেওয়া যায়, তবু অন্যান্য বরযাত্রীদের মধ্যে কাউকে, এমন কি যদি দিক্‌পালদেরও একজনকে বরণ করতে তাহলেও বরং মান থাকত। এ একেবারে 'কুকথায় পঞ্চমুখ কণ্ঠে ভরা বিষ', বৃষভবাহন, শ্মশানচারী, ধুতুরাপ্রিয় ভিখারী—এ করেছ কি? তুমি যে রাজার মেয়ে, হায় হায়!" তখন মনের দুঃখে পার্বতীর মাতা মেনকারাণীকে ডাক দিয়া ছল ছল নেত্রে ম্লানমুখে তাঁহারা বলিতে লাগিলেন—

রাণি, আয় আয় জামাই দেখবি আয়,
এমন ঘরে এমন বরে এ মেয়ে কি দেওয়া যায়।

এই সব কথা শুনিয়া গৌরীর মন মহেশের প্রতি বিন্দুমাত্রও বিরূপ হইল না। "ক ঈপ্সিতার্থ-স্থিরনিশ্চয়ং মনঃ পয়শ্চ নিম্নাভিমুখং প্রতীপয়েৎ", ঈপ্সিত বস্তুতে স্থিরনিশ্চয় মনকে ও নিম্নাভিমুখ জলকে কে প্রতিরোধ করিতে পারে? বরঞ্চ তিনি আশুতোষের অপরিসীম রূপগুণ স্মরণ করিয়া লজ্জাবনতমুখী হইয়া অপরিসীম দিব্য প্রেমাবেগে মুহুর্মুহুঃ কম্পিত ও রোমাঞ্চিত হইতে লাগিলেন। এই অবস্থায় বিশ্বজননী উমা যেমন প্রিয়মিলনের প্রাক্কালে আনন্দাতিশয্যে তাঁহার কঠোরতপস্যা-র্জ্জিত স্বামিগুরুর নিন্দাকারীদিগকে, অথচ প্রকারান্তরে প্রশংসাকারীদিগকে ও সারা বিশ্বকে ক্ষমা ও আশীর্বাদ করিয়াছিলেন, তেমনি শ্রীমা সারদামণিও স্বীয় স্বামিনিন্দকদিগকে ও সারা বিশ্বকে নিজের পতিভাগ্যের জন্য আশীর্ব্বাদ করিতেন—কাহারও উপর তাঁহার বিদ্বেষ ছিল না। মিথ্যা জানিয়াও বিনা বাক্যব্যয়ে অসীম ধৈর্য্যের সহিত নিন্দা, জুগুপ্সা সহ্য করা—মার সাধনার ইহা এক প্রধান অঙ্গ। তখন একা তিনিই জানিতেন তাঁহার স্বামী কি ও কে—"তুল্যপ্রিয়াপ্রিয়ো ধীরস্তুল্যনিন্দাত্মসংস্তুতিঃ।"

# পান্থ

শ্রীশশাঙ্কশেখর চক্রবর্ত্তী, কাব্যশ্রী

দিকে দিকে হেরি জাগে দুর্যোগ, দিকে দিকে জাগে প্রলয়াভাস,
গভীর রাত্রি নামে সম্মুখে, বিশ্বভুবন আঁধারময় !
জাগে বিভীষিকা পথে পথে আজ, চিত্তে চিত্তে দারুণ ত্রাস,
অসীম পথের যাত্রী চলেছি, ভয় নাই ওরে, আমি অভয় !

কুটিল কামনা ছলিছে নিয়ত, নয়নে রচিছে মায়ার জাল,
বিপথে টানিছে, বেদনা হানিছে, নিষ্ঠুর হয়ে করে আঘাত !
এই সংসার ঘূর্ণাবর্ত্তে জীর্ণ-তরণী খেতেছে টাল,
রোষে আক্রোশে মহা-অম্বরে ফুঁসিছে প্রবল ঝঞ্ঝাবাত !

কাল-সমুদ্রে উঠে তরঙ্গ রুদ্র-রূপের করি প্রসার,
পৃথিবীরে চায় করিতে জীর্ণ, সৃষ্টিরে চায় করিতে নাশ !
এ মহানিখিলে কাহারো করুণা আশ্বাস-বাণী দেয় না আর,
ঈশানের হাতে বাজিছে বিষাণ, ধ্বংসের লাগি কি উল্লাস !

সম্মুখে পিছে হেরি মৃত্যুরে অন্তরে মোর নাহিক ভয়,
শত বজ্রের ভীম-হুঙ্কারে হবে না ক্ষুণ্ণ চলার বেগ !
শত বিপদের সম্ভাবনায় টলিবে না মোর এ অন্তর,
হৃদয়ের আলো নাহি হবে ম্লান, যতই ঘনাক্ নিবিড় মেঘ !

প্রলয়ের এই রুদ্র-লীলায় হৃদয় আমার অচঞ্চল,
অন্তরে মোর চির জাগ্রত শান্ত শিবের শান্তি-ঠাঁই !
ধ্যান-গম্ভীর জীবনের রূপ পরম-জ্যোতিতে সমুজ্জ্বল,
বাহিরের এই বাধা ও বিঘ্ন, ভীতি ও দ্বন্দ্ব সেখানে নাই !

সেখানে বাজে যে মহাসঙ্গীত—স্তব্ধ করিয়া সকল সুর,
এই জগতের বিচিত্র রোল সেখানে শান্ত, হয়েছে লীন !
আনন্দ শুধু জেগে আছে সেথা—ভরে আছে সারা হৃদয়-পুর,
সর্ব্বপ্রসারী মহান্ আত্মা—সেখানে নিত্য আছে আসীন !

মোর জীবনের সেই ত লক্ষ্য—সম্মুখে মোর চলার পথ,
দুঃখ-দিনের আমি যে পান্থ, পার হয়ে চলি দেশ ও কাল !
নাহি আর ভয়, নাহিক ভাবনা—গতি-বেগে চলে বিজয়-রথ,
সহি সব ব্যথা চলি উল্লাসে, ঘুচায়ে বাধার অন্তরাল !

---

# বেদ ও কোরানের সাদৃশ্য

শ্রীরবীন্দ্রকুমার সিদ্ধান্তশাস্ত্রী, বি-এ

## মঙ্গলাচরণ

সনাতন সত্য বেদসমূহের প্রারম্ভে 'ওঁ' এই ব্রহ্মবাচক একাক্ষর শব্দটি ব্যবহৃত। ইহা যে ব্রহ্মবাচক, বেদের নানাস্থানে তাহার উল্লেখ আছে। শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতাতেও শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—

"ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্ মামনুস্মরন্।
যঃ প্রযাতি ত্যজন্ দেহং স যাতি পরমাং গতিম্॥"

'ওঁ এই একাক্ষর ব্রহ্ম উচ্চারণ-পূর্ব্বক আমাকে স্মরণ করিতে করিতে যে ব্যক্তি দেহ-ত্যাগ করে, সে শ্রেষ্ঠগতি লাভ করিয়া থাকে।'

কোরানের আরম্ভেও 'বিছ্‌মিল্লাহির্ রহমানির্ রহিম্' এই কথাটি লিখিত আছে। মৌলানা আক্রম খাঁ ইহার অনুবাদ করিয়াছেন—'করুণাময় কৃপানিধান আল্লার নামে।'

অতএব দেখা যাইতেছে যে, বেদের আদিতে যেমন ব্রহ্মবাচক প্রণব উচ্চারণ দ্বারা মঙ্গলাচরণ করা হইয়াছে, কোরানের আদিতেও তেমনি আল্লার নাম স্মরণ করিয়া মঙ্গলাচরণ করা হইয়াছে।

কোরানের প্রথম ছুরা ( ফাতেহা ) প্রকৃতপক্ষে কোরান হইতে পৃথক। অনেকে ইহাকে কোরানের সার বলিয়া থাকেন। বস্তুতঃ ইহা মঙ্গলাচরণ-মাত্র। সংস্কৃত-সাহিত্যে যেমন গ্রন্থারম্ভে মঙ্গলাচরণ করা হয়, ইহাও তেমনি। প্রকৃত প্রস্তাবে ছুরা বকরা ( ২য় ছুরা ) হইতেই কোরানের আরম্ভ।

ছুরা বকরার আদিতে 'বিছমিল্লাহির্ রহমানির্ রহিম্' কথাটি ত আছেই, অধিকন্তু তাহারও পূর্ব্বে আলেফ্, লাম্ মীম্ এই অক্ষর তিনটি সন্নিবেশিত হইয়াছে।

কোরানের তফছিরকারগণ ( ভাষ্যকারগণ ) এই অক্ষর তিনটির অর্থ নির্ণয় করিতে পারেন নাই। তাঁহাদের অধিকাংশেরই মত এই যে, উক্ত অক্ষর তিনটির অর্থ আল্লা ব্যতীত আর কেহই অবগত নহেন। উক্ত 'আলেফ্, লাম্, মীম্' অক্ষর তিনটির বেদের আদিতে বর্ত্তমান ওঁ ( অ-উ-ম )-এর সঙ্গে সাদৃশ্য আছে।

ওঁকারের অন্তর্গত অ উ ম অক্ষর তিনটি যথাক্রমে সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয়ের অধিষ্ঠাতা ব্রহ্ম বা শ্রীভগবানকে বুঝায়। সম্ভবতঃ অনুরূপ উদ্দেশ্যেই ছুরা বকরার আদিতেও পূর্ব্বোক্ত অক্ষর তিনটি প্রযুক্ত হইয়াছে।

কেবলমাত্র ছুরা বকরাতেই নহে, আলে-এমরান্ ( ৩য় ছুরা ) প্রভৃতি অন্যান্য ছুরার আদিতেও উল্লিখিত অক্ষর তিনটি সন্নিবিষ্ট আছে।

## নাম-মাহাত্ম্য

'বিছমিল্লাহির্ রহমানির্ রহিম্' বা 'করুণাময় কৃপানিধান আল্লার নামে' কথাটিতে যে নামের আশ্রয় গ্রহণ করা হইয়াছে, উহার সঙ্গেও বেদ পুরাণ সংহিতা ও তন্ত্রের সাদৃশ্য দেখা যায়।

উপরোক্ত কথাটির ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে মৌলানা আক্রম খাঁ লিখিয়াছেন—

"বিছমিল্লায় বলা হইয়াছে যে, সমস্ত সৎ ও মহৎ কর্ম্মের আরম্ভ আল্লার নামে ও তাঁহার দেওয়া শক্তির উপর নির্ভর করিয়া করিতে

হয়। আবার তাঁহাকে পাইতে হইলে প্রথমেই শরণগ্রহণ করিতে হয় তাঁহার নামের। এই নামের জপ বা জেকের সাধকের যাত্রাপথের প্রথম পথপ্রদর্শক।"

ছান্দোগ্য উপনিষদে বর্ণিত আছে, একদা নারদ মুনি ব্রহ্মজ্ঞান-লাভের সহজ উপায় জানিবার জন্য মহর্ষি সনৎকুমারের নিকট গিয়াছিলেন। সনৎকুমার তাঁহাকে বলিলেন—

"স যো নাম ব্রহ্মেত্যুপাস্তে যাবন্নাম্নো গতং তত্রাস্য যথাকামচারো ভবতি।" (৭।১।৫)

'যে ব্যক্তি নামকে ব্রহ্মবুদ্ধিতে উপাসনা করে, যে পর্য্যন্ত নামের অধিকার, তাহাতে এই উপাসকেরও যথেচ্ছ অধিকার জন্মিয়া থাকে।'

'বিছমিল্লাহির্ রহমানির্ রহিম্' কথাটিতে যে আল্লার নামগ্রহণ করা হইয়াছে, উহার সঙ্গে ছান্দোগ্য উপনিষদের উপরোক্ত সূত্রের সাদৃশ্য সুস্পষ্ট।

## ঈশ্বরের সর্ব্বব্যাপিত্ব

"পূর্ব্ব ও পশ্চিম একমাত্র আল্লারই অধিকারভুক্ত, অতএব তোমরা যে দিকে মুখ ফিরাও না কেন—আল্লার দৃষ্টি সেইখানেই। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্ব্বব্যাপক, সর্ব্বজ্ঞ।"

(কোরান, ২য় ছুরা, ১৪শ রুকু, ১১৫ আয়ত)

এই আয়তটির সঙ্গে ছান্দোগ্যোপনিষদের নিম্নলিখিত সূত্রাংশটির সাদৃশ্য দেখা যায়—

"স এবাধস্তাৎ স উপরিষ্টাৎ স পশ্চাৎ স পুরস্তাৎ স দক্ষিণতঃ স উত্তরতঃ স এবেদং সর্ব্বমিতি।" (৭।২৫।১)

—'তিনিই (ব্রহ্মই) নিম্নে, তিনিই ঊর্দ্ধে, তিনিই পশ্চাতে, তিনিই সম্মুখে, তিনিই দক্ষিণে, তিনিই উত্তরে, তিনিই সমুদয়।'

## ব্রহ্মের স্বরূপ অবগত হইবার উপায়

ছান্দোগ্য উপনিষদে কথিত আছে যে, ব্রহ্মের স্বরূপ অবগত হইবার উদ্দেশ্যে সূর্য্য চন্দ্র বিদ্যুৎ প্রভৃতির মধ্যে ব্রহ্মের যে শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়, তৎসম্বন্ধে চিন্তা করা উচিত। যথা—

"য এষ আদিত্যে পুরুষো দৃশ্যতে সোঽহমস্মি স এবাহমস্মি॥" (৪।১১।১)

"য এষ চন্দ্রমসি পুরুষো দৃশ্যতে সোঽহমস্মি স এবাহমস্মি॥" (৪।১২।১)

"য এষ বিদ্যুতি পুরুষো দৃশ্যতে সোঽহমস্মি স এবাহমস্মীতি॥" (৪।১৩।১) ইত্যাদি।

কোরানের ৯১তম ছুরা হইতে আরম্ভ করিয়া পরবর্ত্তী কয়েকটি ছুরাতেও এই ভাবে সূর্য্য চন্দ্র রাত্রি প্রভৃতির বিষয় চিন্তা করিয়া আল্লার মাহাত্ম্য অবগত হইবার জন্য নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

বেদ ও কোরানের সাদৃশ্যের আরও বহু উদাহরণ দেখান যাইতে পারে। এই স্থলে দিঙ্‌মাত্র প্রদর্শন করিয়াই বিরত হইলাম।

---

"যত মত তত পথ। যেমন এই কালীবাড়ীতে আসতে হলে কেউ নৌকোয়, কেউ গাড়ীতে, কেউ বা হেঁটে আসে, সেইরূপ ভিন্ন ভিন্ন মতের দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন লোকের সচ্চিদানন্দ লাভ হয়ে থাকে।"

—শ্রীরামকৃষ্ণ

# বেদান্ত বলিতে আমি কি বুঝি

ক্রিষ্টোফার ইশারউড্

অনুবাদক—শ্রীরমণীকুমার দত্তগুপ্ত, বি-এল্

( ২ )

বুদ্ধিবৃত্তির সাহায্যে বেদান্তের যৌক্তিকতা উপলব্ধি করিয়া আমি বেদান্ত-দর্শনকে গ্রহণ করিয়াছি ইহা বলিতে যাওয়ার অর্থ নিজকে নিছক যুক্তিবাদী বলিয়া দাবী করা। প্রকৃত-পক্ষে আমি তদ্রূপ নহি; আমাদের কেহই তদ্রূপ নয়। কেবল যুক্তি ও তর্কশক্তির সহায়তায়ই আমরা জীবনের নিশ্চিত প্রত্যয়-গুলি প্রাপ্ত হই না। প্রকৃত গুরু যথাসময়ে যথাস্থানে আসিবেন-ই এবং শিষ্যও গুরুদত্ত শিক্ষা গ্রহণ করিবার জন্য প্রস্তুত থাকিবে। আমার জীবনে এই সকল ঘটনা কিরূপে কার্যকর হইয়াছিল উহা বলিতে গেলে বর্ণনাটি অতি দীর্ঘ, জটিল ও খোলাখুলিভাবে আত্ম-শ্লাঘাত্মক হইবে। বেদান্ত আমার নিকট সর্বাধিক প্রাণস্পর্শী কেন হইয়াছিল এখানে উহার কয়েকটি কারণ নির্দেশ করিব।

(১) বেদান্ত অদ্বৈতমূলক। মনস্তত্ত্বের দিক দিয়া বিচার করিতে গেলে ইহা আমার নিকট খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল, কারণ ভগবানকে পিতা বলিতে আমি ভয় ও ঘৃণা করিতাম। আমার মনে হয় না, দ্বৈতবাদে যে দর্শনের আরম্ভ উহা আমি কখনও গলাধঃকরণ করিতে পারিতাম। বেদান্ত প্রথমেই আমাকে শিক্ষা দিল—আমি আত্মা এবং আত্মাই ব্রহ্ম; আমি স্বরূপতঃ ব্রহ্ম এবং পরিদৃশ্যমান জগতের যথার্থ স্বরূপ ব্রহ্ম। বেদান্ত আরও শিক্ষা দিল—এই সর্বান্তর্যামী 'অবাঙ্‌মনসোগোচরম্' ব্রহ্ম হইতেই সকল দেবদেবী ও অবতারের প্রকাশ—এই জন্যই গীতায় তাঁহাকে 'বিশ্বতো-মুখ' বলা হইয়াছে। জগতের চক্ষে 'এক-মেবাদ্বিতীয়ম্' ব্রহ্মই বহুরূপে প্রতিভাত হইয়া থাকেন। বেদান্তের এই ব্যাখ্যা শুনিয়া দ্বৈতবাদ আমার নিকট আর অপ্রীতিকর বোধ হইত না, কারণ আমি তখন দেবতাগণকে দর্পণের মত ভাবিতে পারিতাম—যাঁহাদিগের মধ্যে মানুষ সম্পূর্ণ অদৃশ্য বস্তু, নিজের অমর প্রতিচ্ছবির জ্যোতিকে ক্ষীণ বা অস্পষ্টভাবে দেখিতে পায়। এই সকল দর্পণের দিকে গম্ভীরভাবে ও অনন্যচিত্তে দৃষ্টিপাত করিলে তুমি ক্রমশঃ তোমার যথার্থ স্বরূপ জানিতে পারিবে। যখন আত্মস্বরূপকে সম্পূর্ণরূপে জানিতে পারিবে—উপলব্ধি করিবে, তখন দর্পণের মত দেবতা-গণের আর কোন প্রয়োজন থাকিবে না, কারণ দ্রষ্টা তাহার প্রতিবিম্বের সহিত পূর্ণভাবে সম্মিলিত হইয়া যাইবে। অদ্বৈতের ভিতর দিয়া দ্বৈতে পৌঁছিবার এই সাধনাটি আমার নিকট এত অধিক প্রাণস্পর্শী বোধ হইল যে, আমি অনতিবিলম্বে শ্রীরামকৃষ্ণ-কথিত ধর্মের প্রতি সক্রিয়ভাবে ও উৎসাহের সহিত অনুরক্ত হইতে লাগিলাম এবং এমন কি, খৃষ্টান গির্জাগুলির পাশ দিয়া চলিয়া যাইবার সময় তথায় একবার প্রবেশ করিয়া কিছুক্ষণের

জন্য বেদীর সম্মুখে হাঁটু গাড়িয়া বসিতাম। স্পষ্টতঃই অনেক বৎসর যাবৎ আমি এইরূপ করিবার একটা আকাঙ্ক্ষা পোষণ করিতেছিলাম। আমি ছিলাম এক জন ব্যর্থকাম ভক্ত।

(২) বেদান্তে কোন গোঁড়ামি নাই। পূর্বে আমি সর্বদাই মতবাদ, অনুশাসন ও উক্তির সাহায্যে ধর্ম বুঝিতে চেষ্টা করিতাম। ধর্মাচার্য কোন তত্ত্ব বা চরম মতবাদ ব্যাখ্যা করিতেন, আর শিষ্যকে কেবল উহা সমগ্রতঃ গ্রহণ করিতে হইত। গ্রহণ না করিয়া তুমি ইহা একেবারেই প্রত্যাখ্যান করিতে পারিতে। কিন্তু বেদান্তের সাহায্যেই আমি সর্বপ্রথম হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইলাম যে, কর্মে পরিণত ধর্ম পরীক্ষামূলক ও ভূয়োদর্শনজাত। তোমাকে সর্বদাই আত্মনির্ভরশীল হইতে হইবে, নিজের ভাবে তত্ত্বকে জানিতে হইবে। বেদান্ত তোমাকে এই ভাবে অগ্রসর হইতে বলিতেছে: "আত্মাকে জানা যায়। অন্যান্যের অতীত অনুভূতিই ইহার একমাত্র নজির। কিন্তু আমরা তোমাকে ইহা বিশ্বাস করিতে বলি না—তোমাকে কিছুই বিশ্বাস করিতে বলি না। আমরা কেবল তোমাকে যে ধ্যানের পদ্ধতি শিক্ষা দিয়াছি তদবলম্বনে নিজে আধ্যাত্মিক অনুভূতি লাভ করিবার যথাশক্তি চেষ্টা কর। যদি যুক্তিযুক্ত সময়ের মধ্যে তোমার কোনও উপলব্ধি না হয়, তবে রামকৃষ্ণ, যীশু বা অন্য কোন ধর্মাচার্যকে গ্রাহ্য করিও না; তখন সাহসের সহিত বলিতে পারিবে যে আমাদের শিক্ষা সর্বৈব মিথ্যা এবং আমরাও তোমাকে নির্ভীক উক্তির জন্য শ্রদ্ধা জানাইব। অন্ধ বিশ্বাসীদের প্রয়োজন নাই।" এইরূপ দ্বিধা ও শঙ্কা-হীন দাবিকে কে অস্বীকার করিতে পারে? আমি মনে মনে ভাবিতাম, "ইহাকেই প্রকৃত ধর্ম বলে। ধর্ম বলিতে কতগুলি নিষ্ক্রিয় উপদেশদান নহে—ইহা সক্রিয় তত্ত্বজিজ্ঞাসা ও সত্যানুসন্ধান। একথা পূর্বে আমাকে কেহ কখনও বলে নাই কেন?" প্রশ্নটি অবশ্য অসম্ভবরূপে অশোভনীয়। অসংখ্যবার আমাকে ইহা বলা হইয়াছে। জীবনের প্রতি মুহূর্তে আমি এই ধাঁধা বা প্রহেলিকার সম্মুখীন হইয়াছি—"জীবনের উদ্দেশ্য কি?" উত্তর পাইয়াছি—"জীবনের অর্থ কি উহা জানা।" যে কোন ঘটনা, সংগ্রাম, ব্যক্তি ও বস্তুর সম্মুখীন হইয়াছি, তাহাই কোন নূতনভাবে এই প্রশ্ন ও উত্তর প্রকাশ করিয়াছে। শুধু আমিই শুনিতে প্রস্তুত ছিলাম না। এক্ষণে ব্যবহারিক ধর্ম-সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ জ্ঞানলাভের পর হিন্দু ও খৃষ্টান সাধকদের উপলব্ধিসকলের মধ্যে পরস্পর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ দেখিয়া আমি অত্যন্ত বিস্মিত হইয়াছি। বৌদ্ধ ও তাও ধর্মের, সুফী ও ইহুদী ধর্মের পারস্পরিক নিবিড় সম্পর্কের কথা এখানে উল্লেখ করিলাম না। এইরূপে আমার অজ্ঞতার সহিত কতকগুলি খৃষ্টবিরোধী দৃঢ়মূল পূর্বসংস্কার দূরীভূত হইল।

(৩) বেদান্ত মানবজীবনের নশ্বরতা অথবা পাপের বিভীষিকার উপর গুরুত্ব আরোপ করে না। ইহা মানুষের নিত্য শুদ্ধ ভাগবত স্বরূপের মাহাত্ম্য ঘোষণা এবং পাপের প্রশ্রয় না দিয়া উহাকে নিন্দা করে। বিবেকানন্দ আমাদিগকে 'পাপী' বলিয়া ভাবিতে নিষেধ করিয়াছেন; নিজকে পাপী বলিয়া চিন্তা করিবার বিনয়াবনত মনোভাব আমাদিগকে নীচতা ও দুর্বলতার নিম্নস্তরে লইয়া যায়। মানুষের অন্তর্নিহিত দেবত্বের কথা নিরন্তর স্মরণ ও মনন করা সর্বতোভাবে শ্রেয় এবং এইরূপ উচ্চভাবে ভাবিত হইবার জন্য আমাদিগকে উপযুক্ত হইতে হইবে। পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য আমাদিগকে ভাবপ্রবণ ও উচ্ছ্বাসপূর্ণ অনুশোচনা করিতে হইবে না।

আমাদিগকে শুধু হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে—প্রত্যেক কার্যের ফলভোগ আছে; আমরা যাহা কিছু ভাবি, যাহা কিছু করি, যাহা কিছু বলি, তজ্জন্য সম্পূর্ণ ন্যায়পরতার সহিত আমরা উহার উপযুক্ত পুরস্কার অথবা শাস্তি পাইব। অহং-বুদ্ধির পরিপোষক কার্যাদি করিতে থাকিলে দেখিতে পাইব যে আমরা ক্রমশঃই আত্মজ্ঞান হইতে দূরে সরিয়া যাইতেছি। এইরূপ কার্যসকলের জন্য আমরা নিজেরাই দোষী। বিনাশের কোন কাল্পনিক শোকাবহ ব্যাপার নাই—ইহা নিতান্তই বুদ্ধিহীনতা-প্রসূত। কারণ যখনই আমরা প্রকৃত-পক্ষে থামিতে ইচ্ছা করি তখনই থামিতে পারি এবং আমাদের মধ্যে যে অফুরন্ত শক্তির উৎস রহিয়াছে উহার নিকট অকপটভাবে শক্তিভিক্ষা করিতে পারি।

ইহাই বিবেকানন্দ-প্রচারিত বেদান্তের বাণী। অন্যান্য অনেকের মত আমি এই বাণী প্রায় অবিশ্বাস্য উল্লাসের সহিত শ্রবণ করিয়াছি। অবশেষে বিবেকানন্দের মধ্যে আমি এমন এক মহাত্মাকে পাইয়াছি যিনি ঈশ্বরবিশ্বাসী অথচ পাপাতঙ্কগ্রস্ত পিউরিটানদের (যাহাদিগকে আমি বাল্যে অত্যন্ত ঘৃণা করিতাম) কুৎসিত মনোবৃত্তি-গুলির নিন্দা করিতে সাহসী। বিবেকানন্দের বীর্যপ্রদ বলিষ্ঠ আত্মপ্রত্যয়, রসবোধ ও সাহসিকতার জন্য আমি তাঁহার অনুরাগী হইয়াছি। পরিপূর্ণ পিউরিটান্-বিরোধী বীর, রবিবাসরীয় ধর্মের শত্রু, রবিবাসরীয় বিষাদের হন্তা, গতানুগতিক রীতি ও ঐতিহ্যের ভঞ্জক এবং হাস্য-পরিহাসচ্ছলে গভীর আধ্যাত্মিক তত্ত্বসমূহের আচার্যরূপে বিবেকানন্দ আমার হৃদয়কে স্পর্শ করিয়াছেন। ধর্মে যে রসবোধের স্থান আছে এবং রসবোধ যে যথার্থই আধ্যাত্মিক বিকাশের একটি ধারা—এই বিষয়ে আমার জ্ঞানোদয় হইল; কারণ পিউরিটান্ ধর্মমতে লালিত-পালিত প্রত্যেক ছোট বালকের ন্যায় আমি সর্বদাই গির্জায় উচ্চ হাস্য ও অসঙ্গত গোলমাল করিতে উদ্গ্রীব ছিলাম। আমি তখন জানিতাম না যে, খৃষ্টীয় ঐতিহ্যে রসিকতারও স্থান আছে। আমি জানিতাম না যে, সাধু ফিলিপ নেরি জনসাধারণের প্রার্থনার সময় গির্জার বেদীর চতুর্দিকে ছোট বালক-বালিকাদিগকে খেলা করিতে অনুমতি দিতেন এবং পোপের কোলে বসিয়া কৌতুকের সহিত তাঁহার দাঁড়ি টানিতেন।

বিবেকানন্দ-সম্বন্ধে বলিতে গিয়া আমাকে প্রসঙ্গতঃ আরও তিনটি সিদ্ধান্তের কথা উল্লেখ করিতে হইবে—যাহা আমাকে বেদান্ত-গ্রহণে প্রভূত সহায়তা করিয়াছে। বুদ্ধিমান্ পাঠকের নিকট এইগুলি কতকাংশে অকিঞ্চিৎকর বলিয়া প্রতিভাত হইতে পারে। আমি তাঁহাকে অবশ্যই স্মরণ করাইয়া দিব যে, ধর্মসম্বন্ধে আমার তৎকালীন মনোভাব কেবলমাত্র অস্পষ্ট ছিল না, অত্যন্ত সরলও ছিল।

প্রথমতঃ, বেদান্তকেই আমি সর্বাধিক সঞ্জীবক ধর্ম বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি, কারণ স্বয়ং রামকৃষ্ণ এবং বিবেকানন্দ, ব্রহ্মানন্দ, শিবানন্দ প্রমুখ গুরু-ভ্রাতৃগণ কিছুকাল পূর্বে এই ধর্ম সাধন ও উপলব্ধি করিয়াছেন। কালপ্রবাহে ঐতিহাসিক যীশু এবং অন্যান্য প্রধান খৃষ্টান সাধকদের স্মৃতি কতকটা ম্লান হইয়াছে। কিন্তু আমার জন্মগ্রহণের মাত্র আঠার বৎসর পূর্বে রামকৃষ্ণ মানবলীলা সংবরণ করেন। বিবেকানন্দকে জানিতেন এইরূপ তিন জনের আমি সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছি। আমার গুরু স্বামী প্রভবানন্দের গুরু ছিলেন ব্রহ্মানন্দ। ইঁহারা সুদূর অন্ধ যুগের লোক ছিলেন না, এখনও জীবিত ও প্রত্যক্ষ-দৃষ্ট আছেন। তাঁহাদের প্রতিকৃতি আছে। তাঁহাদের উপদেশ ও কার্যাবলী সবিস্তার লিপিবদ্ধ ও বিশ্বাস্য। তাঁহাদের দিব্য জীবনই বেদান্তের জীবন্ত ভাষ্য—এজন্যই বেদান্তের নিগূঢ় তত্ত্ব এত আশ্চর্যরূপে আমার হৃদয়কে স্পর্শ করিয়াছে।

দ্বিতীয়তঃ, বেদান্ত—অথবা আমেরিকার বেদান্ত-সমিতি—আমাকে আকৃষ্ট করিয়াছিল, কারণ এই ক্ষুদ্র আন্দোলনের মধ্যে ধনের প্রাচুর্য বা রাজনৈতিক প্রভাবের বিন্দুমাত্র ভড়ং ছিল না। সেই সময়ে প্রধান প্রধান খৃষ্টীয় গির্জাগুলির রাজনৈতিক চাল-চলনের প্রতি আমার আতঙ্ক ও ঘৃণা অত্যন্ত তীব্র ছিল এবং আজও ইহার হ্রাস হয় নাই। কোন প্রকার যুক্তি আমাকে কখনও হৃদয়ঙ্গম করাইতে সমর্থ হইবে না যে, আন্তর্জাতিক কূটনীতিতে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের হস্তক্ষেপ অনর্থ ব্যতীত অন্য আর কিছু। যদি ভবিষ্যতে কোনকালে বেদান্ত-সমিতি আমেরিকার রাজনীতির সহিত সংশ্লিষ্ট হয়, তাহা হইলে গির্জাগুলি যেমনি খৃষ্টকে প্রতারিত করিয়াছে, ইহাও তেমনি রামকৃষ্ণের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিবে। যথার্থ ধর্মাচার্যগণ সকলেই বলিয়াছেন—'আমার রাজ্য ইহজগতের নহে।' এইটি অন্ততঃ ভবিষ্যৎ কার্যনীতির নিদর্শন যে, ভারতের রামকৃষ্ণ-সংঘ (যাঁহার প্রভাব-প্রতিপত্তি নিশ্চিতই অসাধারণ) সহানুভূতি থাকা সত্ত্বেও গান্ধীর অসহযোগ-আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন নাই।

তৃতীয়তঃ, বেদান্ত সংস্কৃতে ব্যাখ্যাত হইয়াছে বলিয়া আমি ইহার প্রতি অনুরক্ত হইয়াছি। ইহার অর্থ এই নহে যে, আমি অজ্ঞেয় ও বিদেশীয় ভাবধারার অনুরাগী; বরং আমি ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত ভাব পোষণ করি। কিন্তু বেদান্তের সহিত আমার প্রথম পরিচয়ের সময় ঈশ্বর, পরিত্রাতা, সান্ত্বনাদাতা, আত্মা, স্বর্গ, মুক্তি, প্রেম প্রভৃতি যে সকল শব্দ আমার খৃষ্টীয় জীবন-যাত্রার সহিত সংশ্লিষ্ট ছিল, সেইগুলির প্রতি বিরূপ ভাব পোষণ করিতাম। বস্তুতঃ এইগুলির কয়েকটির সম্পর্কে আমার প্রতিক্রিয়া এইরূপ উদগ্র ছিল যে, উচ্চারণমাত্র আমি অস্থিরচিত্তে আমার মুষ্টি উদ্যত করিতাম। সম্পূর্ণ নূতন শব্দকোষের সাহায্যে ধর্মের নিগূঢ় তত্ত্ব বুঝিবার চেষ্টা করিতাম। সংস্কৃতই সেই শব্দকোষ জোগাইত। সংস্কৃতের মধ্যে অনেকগুলি নূতন শব্দ পাইলাম যেগুলি সম্পূর্ণ উপযোগী, অনিষ্ট-প্রতিরোধক এবং ধর্মযাজকদের ভাষণ, বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণের বাণী ও রাজনীতিজ্ঞদের বক্তৃতায় ব্যবহারের দ্বারা নিষ্কলুষ ছিল। প্রাচীন পন্থায় ফিরিয়া যাওয়া, পুরাতন শব্দবিন্যাস আহরণ করা প্রভৃতি কাজ প্রবর্তকের পক্ষে নিতান্তই বিরক্তিকর হইত। কিন্তু এক্ষণে উহার প্রয়োজন ছিল না। প্রত্যেক ভাবকেই নূতন ভাষায় পুনর্ব্যক্ত করিতে পারা যাইত। আমার পক্ষে পুনরভিব্যক্তিরই প্রয়োজন ছিল সর্বাপেক্ষা বেশী।

আমি এই সকল লিপিবদ্ধ করিলাম বটে, কিন্তু তথাপি প্রকৃতপক্ষে কিছুই বলি নাই। বেদান্ত বলিতে আমি কি বুঝি—ইহা ব্যাখ্যা করিতে আমি সম্পূর্ণ অসমর্থ। সম্ভবতঃ উহা অবশ্যম্ভাবী। ধর্ম মেধা বা বুদ্ধিবৃত্তি দ্বারা শিক্ষা করা যায় না—ইহা একজনের মাধ্যমে অন্যে সংক্রমিত হয়। এই প্রক্রিয়া কিরূপে বর্ণিত হইতে পারে? আমি নিজে ইহা বুঝিতেও আরম্ভ করি নাই। আমি এই মাত্র জানি যে, ধর্ম বলিতে যাহা কিছু বুঝি উহার মূলে রহিয়াছে গুরু-শিষ্য-সম্বন্ধ। এই সম্বন্ধ এত বাস্তব যে ইহাকে আমি নিঃসন্দিগ্ধ চিত্তে গ্রহণ করিয়াছি এবং ইহা এমন একটি নির্ভরযোগ্য অবলম্বন যে, ইহার সহায়তায় আমার দুর্বলতাকে অতিক্রম করিয়া আমি পরিণামে শাশ্বত জ্ঞান, শক্তি, আনন্দ ও শান্তির অধিকারী হইতে পারিব। এই সম্বন্ধ ব্যতীত আমার জীবন ভয়, বিরক্তি ও অস্বস্তির ঘোর অমানিশায় সমাচ্ছন্ন থাকিত। ইহা জানিয়াও যদি কেহ কোনও ভীতিপ্রদ উপায়ে উহা হইতে পুনঃ বঞ্চিত হয়, তাহা হইলে ইহা এই পৃথিবীতেই নরকভোগের তুল্য হইবে। ব্যক্তিগতভাবে আমি এই সম্বন্ধে মাথা ঘামাই না, কারণ আমি বিশ্বাস করি না যে, গুরু কখনও স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায় তাঁহার শিষ্যবর্গকে পরিত্যাগ করিতে পারেন। আমি বিশ্বাস করি, গুরু-শিষ্য-সম্পর্ক মৃত্যু, আকস্মিক দুর্ঘটনা, বিশ্বাস-ঘাতকতা ও সর্ববিধ আপদকে অতিক্রম করিয়া অক্ষুণ্ণ থাকে। প্রকৃতপক্ষে কেহই আমাকে বিপথগামী অথবা সত্যাশ্রয়ী প্রমাণ করিতে সমর্থ নহে। আমি অবশ্যই স্বীকার করিব যে, আমি স্বভাবতঃই অত্যন্ত আশাবাদী।

# সন্তোদ্যানে পুষ্পচয়ন

স্বামী বাসুদেবানন্দ

একবার নোয়াখালির বন্যার কাজ থেকে এসে শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীকে জিজ্ঞেস করি, "মা, দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়াই, আপনারা ত কেউ কাছে থাকেন না, কোন সন্দেহ বা মনের কোন গোলযোগ উঠলে কাকে যে কি জিজ্ঞেস্ করব কিছু ঠিক্ পাই না—তখন কি করা উচিত ?"

বল্লেন, "সর্বদা ঠাকুরের একখানা ছবি কাছে রাখবে, মনে করবে তিনি সর্বদাই তোমার কাছে আছেন, তোমাকে দেখছেন। কোন প্রশ্ন উঠলে তাঁর কাছেই প্রার্থনা করবে, দেখবে সমাধান তিনি মনের ভেতরই তুলে দেবেন। তিনি ত ভিতরে রয়েছেনই, মন বহির্মুখ বলে মানুষ সেদিকে নজর দেয় না, তাঁকে বাহিরে খুঁজে বেড়ায়। যখন যা প্রার্থনা করবে, সেটা যদি সত্যই তোমার পক্ষে খুব দরকার হয়, দেখবে ভেতর থেকে জবাব আপনি কেমন দপ্ করে উঠবে। কায়মনোবাক্যে একবার প্রার্থনা করলেই তিনি মনে রাখেন ও ব্যবস্থা করেন। ভদ্রলোককে কি এক কথা বিশবার বলতে হয় ?"

* * *

একদিন শ্রীশ্রীমহারাজ 'উদ্বোধনে' ঠাকুরঘর থেকে নেমে আসছেন কাঠের সিঁড়ি দিয়ে; আমি নীচে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছি। নামতে নামতেই বলতে লাগলেন, "আপন সাধনকথা না বলিবে যথাতথা।" ঠাকুর বলতেন, 'ধ্যান করবে মনে বনে ও কোণে'—গানে আছে জানত, 'মন তুমি দেখ আর আমি দেখি, আর যেন কেউ নাহি দেখে।' লোকের সঙ্গে প্রথম অবস্থায় সাধারণ ভাবে ধর্মচর্চা করতে হয়, ব্যক্তিগত সাধন নিয়ে সাধারণে চর্চা করা উচিত নয়—ভাব ফিকে হয়ে যায়, সাধন-ভজনের গাম্ভীর্য নষ্ট হয়ে যায়। যেখানে নানা লোকের হট্টগোল সেখানে বেশী থাকতে নেই, সেখান থেকে সরে যেতে হয়—হয় কোন কাজে মন দিতে হয়, নয় নির্জনে গিয়ে বসতে হয়।"

১৯২০ সনে পূজার পূর্বে হরিদ্বার থেকে ফেরবার পথে কাশীধাম হয়ে আসি। তখন পূজ্যপাদ হরি মহারাজের নিকট ললিত (স্বামী কমলেশ্বরানন্দ) 'যোগবাশিষ্ঠ' পড়ত এবং বহু সাধু ও প্রবীণ গৃহস্থ শ্রবণ করতেন। প্রসঙ্গক্রমে একদিন ব্রহ্মলোকের আলোচনা হয়। পরে মঠে দুর্গাপূজা কাটিয়ে 'উদ্বোধনে'র কার্যভার গ্রহণ করি। শ্রীশ্রীমহারাজ তখন বলরাম-মন্দিরে কাশী আশ্রমের খবর নিতে লাগলেন, কথায় কথায় যোগবিশিষ্ঠের ব্রহ্মলোকের এক উৎসবের (কাক ভূশণ্ডীর জন্মকথা-সম্বন্ধে) কথা উঠলো। আমি জিজ্ঞাসা করলুম, "মহারাজ, এই সব লোক-সম্বন্ধে আপনার মত শুনলে আমাদের মনে খুব দৃঢ় বিশ্বাস হয়।" এমন সময় সেখানে পূজ্যপাদ বাবুরাম মহারাজের ভ্রাতা শান্তিরাম বাবু ও অনঙ্গ (স্বামী ওঁকারানন্দ) উপস্থিত হন। বল্লেন, "দেখ, একবার জগন্নাথে দেখলুম একজন দেবতাদর্শনে এসেছেন, তাঁর গায়ের গন্ধ যেমন ৭।৮ শো বিঘে জমিতে বেল ফুল ফুটলে হয় তেমনি। তোমরা ভাব কেবল বুঝি মানুষেই তাঁকে দর্শন করতে আসে—দেবতারাও আসেন। এই থেকে ব্রহ্মলোক-নিবাসীদের সম্বন্ধে কিছু ধারণা করতে পারবে।"

এর পরে একবার বেলুড় মঠে ঠাকুরের তিথি-পূজার দিন হঠাৎ রাত্রে জিজ্ঞেস্ করেছিলেন, "ময়ূরচড়া দেবী কে, চারি পাশে মেলা পাখী।" আমি চণ্ডী থেকে কৌমারী শক্তির স্তব বল্লুম, "ময়ূরকুক্কুটবৃতে"। তিনি বল্লেন, "ঠাকুরকে দর্শন করতে এসেছিলেন। কিন্তু কুক্কুট মানে কেবল কুঁকড়ো না, পাখীও হয়।" তখনই লাইব্রেরী থেকে দেবীভাগবতের ও দুর্গাসপ্তশতীর টীকা এনে দেখা হলো। একটা টীকাতে দেখা গেল কুক্কুট মানে পিচ্ছ, ময়ূরকুক্কুটবৃতে মানে ময়ূরপিচ্ছধারিণী। ডাক্তার কাঞ্জিলাল বল্লেন, "তন্ত্রে কিন্তু ময়ূর ও কুক্কুট দুই আছে।" মহারাজ বল্লেন, "তা থাকতে পারে, কিন্তু আমি দেখলুম নানা পাখীর দল।"

* * *

১৯১৪ সনের আষাঢ় মাসের কথা, সেদিন স্নানযাত্রা। একজন রামায়েত সাধু মঠে এসে কয়েক দিন ধরে আছেন। যেখানে এখন শ্রীশ্রীমহারাজের মন্দির, সেখানে ধুনি জ্বালবার জন্য একখানি গোল ঘর ছিল। আগে ছিল সেটা মঠের উঠানে নিমগাছতলায়। সাধুটি সেখানে থাকতেন। কলাগাছের শুকনো ছোটা তিনি কৌপীনরূপে ব্যবহার করতেন, হাতে একটা লোহার চিমটে, দূর থেকে দেখাত যেন একটা তলওয়ার। তার ধরবার দিকে একটা লোহার বালা, সেইটে বাজিয়ে বাজিয়ে গান করেন, "সীতারাম, সীতারাম, সীতারাম। দিন গোয়াবে হরিগুণ গাবে পূরণ করলেও কাম। মনুয়া ভজলে সীতারাম, মনুয়া জপলে সীতারাম। মাতা পিতা জনম্ কি দাতা ঔর সহোদর ভাই। মরণকালমে স্মরণ বাতানে গুরুবিন্ গতি নেহি। মনুয়া ভজলে সীতারাম মনুয়া জপলে সীতারাম।" তিন দিনের বেশী এক জায়গায় থাকেন না। কেবল একটি ঝুলি, তাতে সীতারাম-বিগ্রহ। সেদিন বরাহনগর হতে কয়েক জন ভক্ত—ভুবনবাবু, নারায়ণবাবু, বড়ালমশায়, চন্দন-নগরের ভূষণ বাবু প্রভৃতি একখানি নৌকো ভাড়া করে এসেছেন, বৈকালে দক্ষিণেশ্বরী দর্শন করে আরতির পূর্বেই মঠে ফেরা হবে। সাধুটি তাঁর ঝুলি থেকে একখানি হংসগীতা বার করে গঙ্গার ধারের বেঞ্চিতে বসে আমাকে ব্যাখ্যা করে শুনাচ্ছেন। শ্রীশ্রীবাবুরাম মহারাজ এসে বল্লেন, "ঐ সাধুটিকে এবং করুণানন্দ, বীরেন প্রভৃতি যারা যেতে চায়, নিয়ে চল্ দক্ষিণেশ্বর দর্শন করে আসি।" আমরা সকলে নৌকোয় বসলে নৌকো ছেড়ে দেওয়া হলো—বাবুরাম মহারাজ সাধুটিকে বল্লেন, "বাবাজী, আপনার হাতে ও কি বই? একটু আমাদের শোনান। তিনি হংসগীতার সংস্কৃত শ্লোকগুলি আমাদের হিন্দীতে ব্যাখ্যা করে শোনাতে লাগলেন। প্রজাপতি হংসরূপ ধরে সাধ্যদেবগণকে উপদেশ করছেন—মর্মভেদী নৃশংস বাক্য বলবে না। নীচ ব্যক্তির দান গ্রহণ করা উচিত নয়। যে বাক্যে মানুষ উদ্বেগ প্রাপ্ত হয় বা পাপী বলে প্রমাণিত হয়, এমন নিষ্ঠুর কথা সাধু কখন উচ্চারণ করবে না। "বাক্‌শল্য মানুষকে দিবানিশি দগ্ধ করে; অতএব মর্মভেদী বাক্য হতে সাধু সর্বদা বিরত হবে।"

শ্রীশ্রীবাবুরাম মহারাজ বল্লেন, "অসতের দান গ্রহণ করলে ঠাকুর বলতেন, 'তার অসৎ সত্তা গ্রহণকারী পেয়ে থাকে।' আর বলতেন, 'পোকা-টিরও নিন্দে করতে নেই।' একটা গল্প শোন, অযোধ্যায় রামচন্দ্র রাজা হয়েছেন, খুব মহোৎসব, হনুমান ভাণ্ডারী, লোকজন কিছু চাইতে গেলে খুব গালমন্দ করেন। হঠাৎ লক্ষ্মণ এসে বল্লেন, 'মহাবীর, অমুক দ্বীপে এক তপস্বী আছেন, তুমি তাঁকে শ্রীরামচন্দ্রের নিমন্ত্রণ জানিয়ে নিয়ে এস।' হনুমান তৎক্ষণাৎ রওনা হলেন, গিয়ে দেখলেন এক জ্যোতির্ময় স্বর্ণবর্ণ পুরুষ ধ্যান করছেন, কিন্তু তাঁর মুখটা শূকরের মত। তিনি তাঁকে

শ্রীরামচন্দ্রের নিমন্ত্রণ জানালেন এবং বল্লেন, 'আমার স্কন্ধে আরোহণ করুন, এক্ষুনি আমি আপনাকে নিয়ে যাব।' তিনি শ্রীভগবানের নিমন্ত্রণ শুনে আনন্দে কম্পিত-কলেবর হলেন এবং কয়েকটি পদ্মপুষ্প নিয়ে এসে বল্লেন, 'এগুলি শ্রীপ্রভুর পাদপদ্মে নিবেদন করুন। আমি আপনার স্কন্ধে পাদস্পর্শ করতে পারব না, আপনি চলুন, আমি এই এলুম বলে।' শ্রীহনুমান মনে মনে চিন্তা করতে লাগলেন, 'আমি দর্শন না করিয়ে দিলে জীব একলা কি করে রামপদ দর্শন করবে?' যা হোক তিনি চিন্তা করতে করতে জিজ্ঞাসা করলেন. 'মহাত্মন্, আপনার এই জ্যোতির্ময় স্বর্ণবর্ণের সহিত শূকরমুখ কেন?' তিনি বল্লেন, 'পূর্ব্ব জন্মে আমি বহু দান করেছি, তাই জাতিস্মর হয়েছি এবং এইরূপ জ্যোতির্ময় দেহ পেয়েছি। কিন্তু দানকালে আমি বহুলোককে দুর্বাক্য বলতুম, তাই এই শূকরমুখ।' হনুমানজী বিস্মিত হয়ে বুঝলেন যে শ্রীলক্ষ্মণজী তাঁর শিক্ষার জন্যই তাঁকে এখানে পাঠিয়েছেন। তিনি তাঁকে নমস্কার করে বল্লেন, 'তা হলে আপনি আগমন করুন।' তিনি বল্লেন, 'আপনি রওনা হলেই আমিও রওনা হব।' মহাবীরজী সন্দিগ্ধ চিত্তে রওনা হলেন, যোগপথে শ্রীরামচন্দ্রের নিকট উপস্থিত হয়ে সব কীর্তন করে পদ্মগুলি ভগবানের পাদপদ্মে নিবেদন করলেন। তারপর তিনি শ্রীভগবানকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'প্রভু, আপনি আমায় বর দিয়েছেন যে আমার সাহায্য ছাড়া কেউ স্বয়ং আপনার পাদপদ্ম-দর্শনে সমর্থ হবে না, কিন্তু এই মহাত্মা কি করে একলা আপনার নিকট আসবেন?' শ্রীরাম হেসে বল্লেন, 'মারুতি, তুমি প্রসন্ন হওয়াতেই ঐ যোগী এই পদ্মমধ্যে নিজ শরীর সূক্ষ্মাকারে যোগবলে রক্ষা করেছেন, এবং তুমিই ঐ পদ্মগুলি আমার নিকট আনায় তিনি তোমার সহিতেই আমার নিকট উপস্থিত হয়েছেন।' মহাবীর সম্মুখস্থ যোগীকে দেখে একেবারে অবাক।"

সাধুটি অশ্রুপূর্ণ চক্ষে তাঁর চিমটে বাজিয়ে গান ধরলেন—

"সীতারাম সীতারাম সীতারাম সীতারাম।"

নৌকো চলতে লাগলো, কখন যে এসে দক্ষিণেশ্বরের ঘাটে লাগলো তা আমাদের খেয়ালই নেই।

* * *

পরেশ, অবনী, নগেন প্রভৃতি আমরা যখন চতুর্থবার্ষিক শ্রেণীতে পড়ি, তখন মাঝে মাঝে দল বেঁধে আমাদের মাষ্টার মশায়ের কাছে যাওয়া হোত। একদিন অবনীকে (স্বামী প্রভবানন্দ) মাষ্টার মশাই বল্লেন, "তোমরা মাঝে মাঝে শরৎ মহারাজের (স্বামী সারদানন্দ) কাছে যাবে, তিনি রামকৃষ্ণ মিশনের সেক্রেটারী, আমেরিকায় অনেক প্রচার করে এসেছেন।" একবার আমি ও পরেশ (স্বামী অমৃতেশ্বরানন্দ) পায়ে হেঁটেই অনেক জিজ্ঞাসা করতে করতে 'উদ্বোধনে' গিয়ে বেলা ৪টার সময় পৌঁছলুম। গিয়ে দেখলুম ঢুকেই বাঁ-দিকের ঘরে তিনি ও সান্ন্যাল মশায় বসে আছেন। জিজ্ঞেস্ করলেন, আমরা কোথা থেকে আসছি। আমরা সব পরিচয় দিলুম। আমি জিজ্ঞেস্ করলুম, "কি করে ধ্যান করতে হয় একটু বলুন।" বল্লেন, "মস্তকে শ্বেতবর্ণ পদ্মে গুরুর ধ্যান এবং হৃদয়ে রক্তবর্ণ পদ্মে ইষ্টের ধ্যান করতে হয়।" আমি বল্লুম, "আমার দীক্ষা হয়নি" কিন্তু আমার মনে হতে লাগলো, আমি যে স্বপ্নে মন্ত্র দেখেছিলাম, সেই বিষয় লক্ষ্য করেই আমাকে বলছেন। তিনি বল্লেন, "তা হলেও তুমি মস্তকে শ্বেতবর্ণ পদ্মে ঠাকুরের ধ্যান করবে। একখানা গুরুগীতা কিনে পোড়ো এবং মাঝে মাঝে এসে আমাকে শোনাবে।" তারপর বাতাস করতে বল্লেন। তাঁকে বাতাস করতে লাগলুম—পাশে

সান্যাল মশায় ছিলেন, তাঁর গায়ে লাগছিল না। তখন ঘণ্টাকর্ণের গল্প বলে খুব হাসতে লাগলেন।

একজন খুব শিবভক্ত ছিল, কিন্তু বিষ্ণুনাম একেবারেই শুনতে পারত না। লোকে তার দুর্বলতা বুঝতে পেরে তার সঙ্গে দেখা হলেই বিষ্ণুনাম করে তাকে উত্যক্ত করত। তখন সে দুই কানে দুটো ঘণ্টা বেঁধে রাখতো, কেউ বিষ্ণু-নাম করলেই মাথা নেড়ে ঘণ্টা বাজাতে থাকত —যেন বিষ্ণুনাম কানে না ঢোকে। একদিন মহাদেব তার এই মতুয়ার বুদ্ধি দেখে তার শিক্ষার জন্য, যখন সে শিবমূর্তির সামনে ধূপদান করছে, তখন হরিহর-মূর্তি, ( অর্থাৎ অর্ধেক শিবমূর্তি, অর্ধেক বিষ্ণুমূর্তি ) ধারণ করে প্রতিমায় আবির্ভূত হলেন। তখন সে একটা মতলব আঁটলো, সে বিষ্ণুর নাকটা টিপে ধরলো যেন ধূপের গন্ধ বিষ্ণুর নাকে না যায়। তখন মহাদেব বল্লেন, "তোর ভক্তির জন্য তুই দেহান্তে আমার গণত্বলাভ করবি, কিন্তু তোর সংকীর্ণ বুদ্ধির জন্য তোর পূজো হবে ঘেঁটু ফুল প্রভৃতি নিকৃষ্ট বস্তু দিয়ে।"

এমন সময় গিরীশ বাবুর ভাই ন—বাবু এলেন। হাতে একখানা বাইবেল—বল্লেন, "এই দেখ যীশু বলছেন: "I am the door···. I am the way".—অর্থাৎ আমিই স্বর্গরাজ্যের দ্বারস্বরূপ, আমিই একমাত্র পথ ( St. John, ch. 10.9; 14. 6 )। পরেশ বল্লে, "মহারাজ, এর মানে কি, ভাল করে বুঝিয়ে দিন। আমার খুব ভাল ধারণা হয়নি।" পূজ্যপাদ শরৎ মহারাজ শ্রীশ্রীঠাকুরের কথা দিয়ে কেমন বুঝিয়ে দিলেন, "ঘুলঘুলির মধ্য দিয়ে যেমন আকাশ দেখা, সেইরূপ অবতারের মধ্য দিয়ে সেই ব্রহ্মতত্ত্ব উপলব্ধি করতে হয়—সংসার যেন চারিপাশে প্রাচীরঘেরা কারাগার—অবতার যেন তার মধ্যে একটা ঘুলঘুলি—যার মধ্য দিয়ে অনেকটা মুক্ত আকাশের ধারণা হয়।"

* * *

পূজ্যপাদ হরি মহারাজ ( স্বামী তুরীয়ানন্দ ) অসুস্থ অবস্থায় যখন বলরাম-মন্দিরে থাকতেন, তখন একদিন মৈত্রী-করুণা-মুদিতা-উপেক্ষা-সম্বন্ধে আলোচনা হচ্ছিল, অর্থাৎ সাধুর সহিত মৈত্রী, দুঃখীর প্রতি করুণা, পরের ভাল দেখে আনন্দ এবং দুষ্টের প্রতি উপেক্ষা করা উচিত। বল্লেন, "দুর্জনের প্রতি উপেক্ষা অনেক নীচের কথা। এক সাধু একদিন স্নান করতে গিয়ে দেখলেন একটা বিছে গঙ্গায় ভেসে যাচ্ছে, তিনি হাত কোষ করে তাকে ডাঙায় তুলে ফেলে দিলেন। বিছে কিন্তু তার মধ্যেই তাঁকে হুল ফুটিয়ে দিলে, সাধু উঃ করে উঠলেন। তারপর আবার স্নানাদিতে মনোযোগ দিলেন। ইতোমধ্যে বিছেটা আবার ঢেউতে জলে গিয়ে পড়ল, সাধু আবার তাড়াতাড়ি কোষ করে সেটাকে তুলে ডাঙায় ফেলে দিলেন, বিছেটা তাঁকে আবার কামড়ালে। সাধুটি আবার উঃ করে চীৎকার করে উঠলেন। একজন লোক কিনারায় দাঁড়িয়ে ব্যাপারটা দেখছিল, বল্লে, 'বাবাজী, তুমি ত আচ্ছা বোকা দেখছি, কেন ওটাকে বারবার তুলছো?' সাধু বল্লেন, 'ওর যা স্বভাব ও তাই দেখাচ্ছে, আর আমার যা কাজ তাই আমি করছি'।"

কাজের ছোট-বড় নিয়ে অনুযোগ উঠলে পূজ্যপাদ হরি মহারাজ আমাদের একটি গল্প বলতেন, "খুরপী লেও"। এক প্রাচীন সাধু অনেক দিন ধরে এক গ্রামের ধারে জঙ্গলে তপস্যা করতেন। একদিন জমিদার স্বপ্ন দেখলেন যে তাঁর গৃহবিগ্রহ গোবিন্দ বলছেন, 'সাধুর বয়স হয়েছে, আর ঘুরে ঘুরে ভিক্ষা করে খেতে পারে না, তুমি ওর খাবারটা রোজ পাঠিয়ে দিও।' তাই হতে লাগলো। একদিন সাধু দেখেন জমিদারের লোক দুটো খাবার নিয়ে এলো। সাধু জিজ্ঞেস্

করলেন, 'ও খাবার কার'। সে বল্লে, 'আর একজন অল্পবয়সী সাধু এসেছেন, এই জঙ্গলের ওধারে, গ্রামে ভিক্ষা করতেও আসেন না—এ খাবার তাঁর জন্য।' এই বলে সাধুর খাবার দিয়ে সে সেই দিকে হন্‌হন্‌ করে চলে গেল। একদিন প্রাচীন সাধুটি যে খাবার আনে তাকে বল্লেন, 'খোলত দেখি ওর ভেতর কি আছে।' খুলে দেখা গেল সোনারূপোর বাটীতে খুব ভাল ভাল খাবার। দেখে সাধু চাকরটিকে জিজ্ঞেস্ করলেন, 'এ রকম বিষম ব্যবস্থা কেন?' লোকটি বল্লে, 'তা ত বাবা জানি না, বাবু যেমন পাঠান, আমি তেমনি নিয়ে আসি।' সাধু বল্লেন, 'জমিদারকে এর কারণটা কি জিজ্ঞেস্ কর।'

"তারপর দিন লোকটি এসে বল্লে, 'বাবু বল্লেন, গোবিন্দই এইরূপ ব্যবস্থা করেছেন, তিনি কিছুই জানেন না।' সাধু বল্লেন, 'জমিদার বাবুকে বল, যেন এ সম্বন্ধে গোবিন্দজীকে জিজ্ঞেস্ করা হয়, আমার বড় কৌতূহল হয়েছে।' তারপর দিন লোকটি এসে বল্লে, 'গোবিন্দজী আপনাকে বলতে বলেছেন, 'যদি ভাল না লাগে খুরপী লেও।" সাধু শুনে খানিক পরে কাঁদতে লাগলেন, বললেন, 'বহুত কৃপা! বহুত কৃপা! বহুত কৃপা! আমি আগে ঘাস ছুলে খেতুম, আর এখন ভগবানের নাম করি বলে বসে বসে নানাবিধ খাচ্ছি, তবুও ভগবানে পক্ষপাতিত্ব-দোষ দিচ্ছি—সাধু হয়ে পরের খাবারে লোভ করছি। তাই প্রভুজী আমায় শিক্ষা দিলেন।' সন্ধানে জানা গেল যে যুবক সাধুটি নূতন এসেছেন। তিনি একজন রাজকুমার, সর্বস্ব ত্যাগ করে একেবারে বিবিক্তদেশসেবী হয়ে রয়েছেন। অর্থাৎ সাধু-জীবনের এই বিশুদ্ধ কর্মযোগ যদি ভাল না লাগে, তাহলে সংসারে যা করছিলে তাই ফের করগে।"

---

# শ্রীরামকৃষ্ণ

শ্রীনকুলেশ্বর পাল, বি-এল্

জীবের কল্যাণ লাগি ধরি দিব্য নর-কলেবর
আনিলে ধরার বুকে প্রেমময় অমৃতের বাণী,
তোমার সে জ্যোতিচ্ছটা পূর্ণ করি বিশ্বের অন্তর
জ্বালাইলে প্রাণে প্রাণে জ্যোতির্ম্ময় দীপ্ত দীপখানি।

অজ্ঞান-তিমিরে ঢাকা আঁধারের যবনিকা-তলে
পাশ্চাত্ত্যের মোহে যবে লুপ্তপ্রায় ভারত-গরিমা,
আপন সত্তারে ভুলি মেঘমুক্ত উদয়-অচলে
উদ্ভাসিল বিশ্বমাঝে চিত্তজয়ী তোমার মহিমা।

ধরণীর বুকে আনি করুণার মূর্ত্ত প্রস্রবণ
নিখিলের প্রাণে প্রাণে এনে দিলে জীবনের সাড়া,
দেবতার রূপে নিত্য বিরাজিছে নর-নারায়ণ
আর্ত্তের যে ভগবান ঢালে নিত্য করুণার ধারা।

আত্মভোলা হে ঠাকুর, নিত্য-সিদ্ধ-মুক্ত-জ্যোতির্ম্ময়
মায়ের মূরতি গড়ি সাধনার পুণ্য বেদীতলে,
অপূর্ব্ব প্রেমের মূর্ত্তি দেখাইলে সর্ব্বরিপুজয়
সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয় সাধনার পুণ্য হোমানলে।

# যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ

শ্রীননীগোপাল চক্রবর্তী, বি-এ

অষ্টাদশ শতকের শেষার্ধে পলাশীর আম্রকাননে বাংলার স্বাধীনতা-সূর্য অস্তমিত হয়। ষোড়শ শতাব্দীর বাঙালীর কৃষ্টি ও সভ্যতা অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগে স্তিমিত হইয়া পড়ে। মুসলমান-যুগের অবসান ও ইংরেজ-আমলের আবির্ভাব—এতদুভয়ের অন্তর্বর্তী কালে বাংলার সমাজ-জীবনে এক বিরাট আলোড়নের সৃষ্টি হয়।

ভারতের ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে দেখা যায়, ভারতের আধ্যাত্মিক বেদীমূলে বৈদেশিক বিজেতৃগণ মস্তক অবনত করিয়াছে। গ্রীক দার্শনিকগণের মধ্যে অনেকেই ভারতীয় ভাবধারা দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন। এমন কি আর্যধর্মের প্রভাব খ্রীষ্টধর্মের মধ্যেও পরিলক্ষিত হয়। বৈদেশিক সভ্যতা ও শাসনে যখনই সনাতন হিন্দুধর্ম বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছে তখনই এক এক জন মহাপুরুষ আবির্ভূত হইয়া পতনোন্মুখ হিন্দুসংস্কৃতি রক্ষা করেন। জাতীয় জীবনের গতিকে নতুন ভাবধারার সহিত সামঞ্জস্য-বিধানে তাঁহারা কালোপযোগী করিয়া চালিত করিয়া থাকেন। মনীষী হ্যাভ্‌লক এলিস্ ( Havelock Ellis ) সত্যই বলিয়াছেন—

"To find a new vision of the world, or new path to truth, is the instinct of the artist or the thinker. He changes the whole system of our organised perceptions."—The New Spirit.

উনবিংশ শতকের প্রথমাদিতে বিজেতা ইংরেজ-কর্তৃক আনীত পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার প্রবল আঘাত ও আক্রমণে বিজিত বাঙালীর জীবনে পরানুবাদ পরানুকরণ প্রভৃতি দাসসুলভ মনোবৃত্তি দেখা দেয়। এই ভয়াবহ পরিস্থিতিতে সংস্কারযুগের পথপ্রদর্শক রাজা রামমোহন রায়ের আবির্ভাব ঘটে। স্বামী বিবেকানন্দের মতে রাজা রামমোহন হইতেই বাঙালীর জাতীয় জীবনে সম্প্রসারণ-শক্তির উদ্বোধন হয়। দেখা যায়, সংস্কারযুগের ধর্ম ও সমাজসংস্কার-আন্দোলন জাতীয় জীবনে কোন স্থায়ী ফল-প্রসব করে নাই। তাহার কারণ সংস্কারকেরা ধর্ম ও জাতি উভয়কেই একযোগে ভাঙ্গিয়া ফেলিতে চেষ্টিত হইয়াছিলেন। রাজা রামমোহন উপনিষদের সগুণ নিরাকার ব্রহ্মবাদ প্রচার[1] করিতে থাকেন, কিন্তু রামমোহন-প্রবর্তিত ব্রাহ্মসমাজ খ্রীষ্টান ধর্ম ও সমাজ দ্বারা অত্যন্ত প্রভাবিত হয়। হিন্দুধর্ম বিশেষ করিয়া হিন্দু-সমাজের বিরুদ্ধে ব্রাহ্মগণ প্রচার করিতে আরম্ভ করেন।

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণের অভ্যুদয়ে সমন্বয়যুগের সূত্রপাত হয়। সংস্কারযুগের শেষ প্রতিনিধি স্বনামধন্য ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র পরমহংসদেব-কর্তৃক আকৃষ্ট ও প্রভাবান্বিত হন। কেশবচন্দ্রের পরিবর্তন ব্যক্তিবিশেষের পরিবর্তন নহে—উহা সংস্কারযুগের আমূল পরিবর্তন। পাশ্চাত্ত্যের ভারততত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত মোক্ষমূলার এই সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

"কেশবচন্দ্রের সমগ্র জীবন পরিবর্তিত হইয়া গেলে এবং তাহার কয়েক বৎসর পরে কেশব বাবু নিজের ধর্মমত 'নববিধান' নামে প্রচার করিলেন; যে সত্য রামকৃষ্ণদেব বহুকাল হইতে শিক্ষা দিয়া

করলেন, 'ও খাবার কার'। সে বল্লে, 'আর একজন অল্পবয়সী সাধু এসেছেন, এই জঙ্গলের ওধারে, গ্রামে ভিক্ষা করতেও আসেন না—এ খাবার তাঁর জন্ম।' এই বলে সাধুর খাবার দিয়ে সে সেই দিকে হন্‌হন্‌ করে চলে গেল। একদিন প্রাচীন সাধুটি যে খাবার আনে তাকে বল্লেন, 'খোলত দেখি ওর ভেতর কি আছে।' খুলে দেখা গেল সোনারূপোর বাটীতে খুব ভাল ভাল খাবার। দেখে সাধু চাকরটিকে জিজ্ঞেস্ করলেন, 'এ রকম বিষম ব্যবস্থা কেন?' লোকটি বল্লে, 'তা ত বাবা জানি না, বাবু যেমন পাঠান, আমি তেমনি নিয়ে আসি।' সাধু বল্লেন, 'জমিদারকে এর কারণটা কি জিজ্ঞেস্ কর।'

"তারপর দিন লোকটি এসে বল্লে, 'বাবু বল্লেন, গোবিন্দই এইরূপ ব্যবস্থা করেছেন, তিনি কিছুই জানেন না।' সাধু বল্লেন, 'জমিদার বাবুকে বল, যেন এ সম্বন্ধে গোবিন্দজীকে জিজ্ঞেস্ করা হয়, আমার বড় কৌতূহল হয়েছে।' তারপর দিন লোকটি এসে বল্লে, 'গোবিন্দজী আপনাকে বলতে বলেছেন, 'যদি ভাল না লাগে খুরপী লেও।'" সাধু শুনে খানিক পরে কাঁদতে লাগলেন, বললেন, 'বহুত কৃপা! বহুত কৃপা! বহুত কৃপা! আমি আগে ঘাস ছুলে খেতুম, আর এখন ভগবানের নাম করি বলে বসে বসে নানাবিধ খাচ্ছি, তবুও ভগবানে পক্ষপাতিত্ব-দোষ দিচ্ছি—সাধু হয়ে পরের খাবারে লোভ করছি। তাই প্রভুজী আমায় শিক্ষা দিলেন।' সন্ধানে জানা গেল যে যুবক সাধুটি নূতন এসেছেন। তিনি একজন রাজকুমার, সর্বস্ব ত্যাগ করে একেবারে বিবিক্তদেশসেবী হয়ে রয়েছেন। অর্থাৎ সাধু-জীবনের এই বিশুদ্ধ কর্মযোগ যদি ভাল না লাগে, তাহলে সংসারে যা করছিলে তাই ফের করগে।"

---

# শ্রীরামকৃষ্ণ

শ্রীনকুলেশ্বর পাল, বি-এল্

জীবের কল্যাণ লাগি ধরি দিব্য নর-কলেবর
আনিলে ধরার বুকে প্রেমময় অমৃতের বাণী,
তোমার সে জ্যোতিশ্ছটা পূর্ণ করি বিশ্বের অন্তর
জ্বালাইলে প্রাণে প্রাণে জ্যোতির্ময় দীপ্ত দীপখানি।

ধরণীর বুকে আনি করুণার মূর্ত্ত প্রস্রবণ
নিখিলের প্রাণে প্রাণে এনে দিলে জীবনের সাড়া,
দেবতার রূপে নিত্য বিরাজিছে নর-নারায়ণ
আর্ত্তের যে ভগবান ঢালে নিত্য করুণার ধারা।

অজ্ঞান-তিমিরে ঢাকা আঁধারের যবনিকা-তলে
পাশ্চাত্ত্যের মোহে যবে লুপ্তপ্রায় ভারত-গরিমা,
আপন সত্তারে ভুলি মেঘমুক্ত উদয়-অচলে
উদ্ভাসিল বিশ্বমাঝে চিত্তজয়ী তোমার মহিমা।

আত্মভোলা হে ঠাকুর, নিত্য-সিদ্ধ-মুক্ত-জ্যোতির্ময়
মায়ের মুরতি গড়ি সাধনার পুণ্য বেদীতলে,
অপূর্ব্ব প্রেমের মূর্ত্তি দেখাইলে সর্ব্বরিপুজয়
সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয় সাধনার পুণ্য হোমানলে।

# যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ

শ্রীননীগোপাল চক্রবর্তী, বি-এ

অষ্টাদশ শতকের শেষার্ধে পলাশীর আম্রকাননে বাংলার স্বাধীনতা-সূর্য অস্তমিত হয়। ষোড়শ শতাব্দীর বাঙালীর কৃষ্টি ও সভ্যতা অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগে স্তিমিত হইয়া পড়ে। মুসলমান-যুগের অন্তর্ধান ও ইংরেজ-আমলের আবির্ভাব—এতদুভয়ের অন্তর্বর্তী কালে বাংলার সমাজ-জীবনে এক বিরাট আলোড়নের সৃষ্টি হয়।

ভারতের ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে দেখা যায়, ভারতের আধ্যাত্মিক বেদীমূলে বৈদেশিক বিজেতৃগণ মস্তক অবনত করিয়াছে। গ্রীক দার্শনিকগণের মধ্যে অনেকেই ভারতীয় ভাবধারা দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন। এমন কি আর্যধর্মের প্রভাব খ্রীষ্টধর্মের মধ্যেও পরিলক্ষিত হয়। বৈদেশিক সভ্যতা ও শাসনে যখনই সনাতন হিন্দুধর্ম বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছে তখনই এক এক জন মহাপুরুষ আবির্ভূত হইয়া পতনোন্মুখ হিন্দুসংস্কৃতি রক্ষা করেন। জাতীয় জীবনের গতিকে নতুন ভাবধারার সহিত সামঞ্জস্য-বিধানে তাঁহারা কালোপযোগী করিয়া চালিত করিয়া থাকেন। মনীষী হ্যাভ্‌লক এলিস্ ( Havelock Ellis ) সত্যই বলিয়াছেন—

"To find a new vision of the world, or new path to truth, is the instinct of the artist or the thinker. He changes the whole system of our organised perceptions."—The New Spirit.

ঊনবিংশ শতকের প্রথমাদিতে বিজেতা ইংরেজ-কর্তৃক আনীত পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার প্রবল আঘাত ও আক্রমণে বিজিত বাঙালীর জীবনে পরানুবাদ পরানুকরণ প্রভৃতি দাসসুলভ মনোবৃত্তি দেখা দেয়। এই ভয়াবহ পরিস্থিতিতে সংস্কারযুগের পথপ্রদর্শক রাজা রামমোহন রায়ের আবির্ভাব ঘটে। স্বামী বিবেকানন্দের মতে রাজা রামমোহন হইতেই বাঙালীর জাতীয় জীবনে সম্প্রসারণ-শক্তির উদ্বোধন হয়। দেখা যায়, সংস্কারযুগের ধর্ম ও সমাজসংস্কার-আন্দোলন জাতীয় জীবনে কোন স্থায়ী ফল-প্রসব করে নাই। তাহার কারণ সংস্কারকেরা ধর্ম ও জাতি উভয়কেই একযোগে ভাঙ্গিয়া ফেলিতে চেষ্টিত হইয়াছিলেন। রাজা রামমোহন উপনিষদের সগুণ নিরাকার ব্রহ্মবাদ প্রচার করিতে থাকেন, কিন্তু রামমোহন-প্রবর্তিত ব্রাহ্মসমাজ খ্রীষ্টান ধর্ম ও সমাজ দ্বারা অত্যন্ত প্রভাবিত হয়। হিন্দুধর্ম বিশেষ করিয়া হিন্দু-সমাজের বিরুদ্ধে ব্রাহ্মগণ প্রচার করিতে আরম্ভ করেন।

ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণের অভ্যুদয়ে সমন্বয়যুগের সূত্রপাত হয়। সংস্কারযুগের শেষ প্রতিনিধি স্বনামধন্য ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র পরমহংসদেব-কর্তৃক আকৃষ্ট ও প্রভাবান্বিত হন। কেশবচন্দ্রের পরিবর্তন ব্যক্তিবিশেষের পরিবর্তন নহে—উহা সংস্কারযুগের আমূল পরিবর্তন। পাশ্চাত্ত্যের ভারততত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত মোক্ষমূলার এই সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

"কেশবচন্দ্রের সমগ্র জীবন পরিবর্তিত হইয়া গেলে এবং তাহার কয়েক বৎসর পরে কেশব বাবু নিজের ধর্মমত 'নববিধান' নামে প্রচার করিলেন; যে সত্য রামকৃষ্ণদেব বহুকাল হইতে শিক্ষা দিয়া

আসিতেছিলেন, নববিধানের মত তাহারই আংশিক প্রতিবিম্ব ভিন্ন আর কিছুই নহে।"

মাতৃভাবে ঈশ্বরোপাসনার প্রেরণা তিনি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নিকট প্রাপ্ত হন। 'ধর্মতত্ত্ব'-পত্রিকায় ইহার উল্লেখ দেখিতে পাই—

"ভগবানের মাতৃ-সম্বন্ধীয় ভাব ব্রাহ্মসমাজ পরমহংসের সাধন-জীবন হইতে প্রাপ্ত হন। বিশেষভাবে আমাদিগের আচার্য ( কেশবচন্দ্র সেন ) তাঁহার নিকট হইতে ঈশ্বরকে 'মা' বলিয়া ডাকিতে এবং শিশুর সরলতা ও অভিমান লইয়া আব্দার করিয়া প্রার্থনা করিতে শিক্ষা করেন। ইতিপূর্ব্বে ব্রাহ্মধর্ম্ম জ্ঞানপ্রধান এবং শুষ্ক তর্ক-যুক্তিতে পূর্ণ ছিল। পরমহংসের জীবনাদর্শ ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম হইতে শুষ্কতা দূর করিয়া উহাকে অধিক প্রিয়তর এবং ভক্তিময় করিয়া তোলে।"—১লা আশ্বিন, ৮৮০৯ শক।

কেশবচন্দ্রের 'নববিধানের' সমীকরণ বিভিন্ন ধর্মের বিভিন্ন বাদের সম্মিলন—উদার সার্ব-ভৌমিক অথচ বস্তুতন্ত্রহীন। শ্রীরামকৃষ্ণ বিভিন্ন ধর্ম কার্যতঃ সাধন করিয়া উহাদের সত্যতা প্রমাণ করেন। তাঁহার মতবাদে সকল ধর্মেরই সম্মানিত স্থান আছে। ব্রাহ্মযুগের ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত জাতীয় আদর্শ রামকৃষ্ণযুগে কেন্দ্রীভূত ও সংহত হইয়াছে। শ্রীঅরবিন্দ 'কর্ম্মযোগিন্'-পত্রে লিখিয়াছেন—

"Ramakrishna and Vivekananda gave more perfect synthesis than Sankaracharya. Not Sankara but the Upanishad is the authority. Sankara's Mayavada is only one of the many interpretations."

স্বামী বিবেকানন্দ পরমহংসদেবের সমন্বয়-সম্বন্ধে উদাত্ত কণ্ঠে বলিয়াছেন—"এক্ষণে এমন এক ব্যক্তির জন্মের সময় হইয়াছিল, যাঁহাতে একাধারে হৃদয় ও মস্তিষ্ক উভয় বিরাজমান থাকিবে। যিনি একাধারে শঙ্করের অদ্ভুত মস্তিষ্ক এবং চৈতন্যের অদ্ভুত বিশাল অনন্ত হৃদয়ের অধিকারী হইবেন। * * এইরূপ ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং আমি অনেক বর্ষ ধরিয়া তাঁহার চরণতলে বসিয়া শিক্ষালাভের সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলাম। এইরূপ একজন মহাপুরুষের জন্মিবার সময় হইয়াছিল। * * তাঁহার পুঁথিগত বিদ্যা কিছুমাত্র ছিল না, এরূপ মনীষাসম্পন্ন হইয়াও তিনি নিজের নামটা পর্যন্ত লিখিতে পারিতেন না।"

দেবমানব পরমহংসদেব-কর্তৃক ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র, খৃষ্টভক্ত সাহেবীভাবাপন্ন প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, পরম সাধু বিজয়কৃষ্ণ ও সংশয়বাদী যুবক নরেন্দ্রনাথ সবিশেষ প্রভাবান্বিত হন। ইঁহাদের পরিবর্তনের সঙ্গে এক মহাসমন্বয়যুগের সূত্রপাত ঘটে। এই সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দ 'কর্ম্মযোগিন্'-পত্রে লিখিয়াছেন—"It was when the flower of the educated youth of Calcutta bowed down at the feet of an illiterate Hindu ascetic, a self-illuminated ecstatic and 'mystic' without a single trace or touch of the alien thought or education upon him that the battle was won. The going forth of Vivekananda, marked out by the master as the heroic soul destined to take the world between his two hands and change it, was the first visible sign to the world that India was awake not only to survive but to conquer."—The Awakening Soul of India.

স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন—"যদি সেই মূর্তিপূজক ব্রাহ্মণের পদধূলি আমি না পাইতাম তবে আমি কোথায় থাকিতাম?"

পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণ বিভিন্ন ধর্মের পরমত-অসহিষ্ণুতা বিনষ্ট করিয়া এক উদার সমন্বয়ের পথ প্রদর্শন করিয়াছেন। জগতের সকল ধর্মই সত্য। সকল ধর্মেই ভগবান আছেন। তবে এই সত্য জীবনে উপলব্ধি করার পথ ভিন্ন ভিন্ন। সাম্প্রদায়িক বিরোধ দূরীকরণে তিনি নিজ জীবনে অনুষ্ঠিত ধর্মসমন্বয়-বাণী—'যত মত তত পথ'—প্রচার করিয়াছেন। বিভিন্ন ধর্মের সাম্প্রদায়িক বিরোধের ফলে অতীতকালে ভারতের মহা অনিষ্ট সাধিত হইয়াছে। বর্তমানেও এই বিরোধের অবসান হয় নাই। স্বাধীন ভারতের প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্রকে ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে বটে, কিন্তু ইহাতেই কি হিন্দুমুসলমান-বিরোধসমস্যার সমাধান হইবে? একটু বিচার করিলেই দেখা যাইবে যে, এই ব্যবস্থার ফলে ভারতের হিন্দু-মুসলমান বিরোধ-সমস্যার সম্যক সমাধান হয় নাই। ভারতবর্ষ ও পাকিস্তানের সাম্প্রদায়িক বিরোধের মূলোচ্ছেদ করিতে হইলে উভয় স্থানের হিন্দু-মুসলমানের পরস্পরের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা এবং উভয় জাতির মধ্যে সদ্ভাব-স্থাপন অপরিহার্য। ইহা কার্যে পরিণত করিতে হইলে শ্রীরামকৃষ্ণদেব-প্রচারিত—'যত মত তত পথ'-এর আশ্রয়গ্রহণ ভিন্ন অন্য কোন উপায় দেখা যায় না। এই মহাপুরুষের নির্দেশানুসারে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায় পরস্পরের ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হইয়া ভ্রাতৃত্বসূত্রে আবদ্ধ হইলেই এই সমস্যার সমাধান হইতে পারে। বর্তমান যুগে ধর্মবিরোধসমস্যা-সমাধানের এই উপায় তিনি কার্যতঃ প্রদর্শন করিয়াছেন বলিয়াই পৃথিবীর মনীষিগণ তাঁহাকে যুগধর্মাবতার বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। জড়বিজ্ঞানের লীলাভূমি পাশ্চাত্ত্য জগতের জনগণের জীবনে ও চিন্তাধারায় শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের প্রভাব কিরূপ সুদূরপ্রসারী হইয়াছে তাহা মনীষী রোমাঁ রোলাঁর কথায় প্রমাণিত হয়—

"যুগাচার্য মহাত্মা শ্রীরামকৃষ্ণ ভারতীয় সকল মহাপুরুষের পূর্ণ প্রকাশরূপ। তিনি শত কোটি লোকের দুই সহস্র বৎসরের আধ্যাত্মিক জীবনের পূর্ণ পরিণতিরূপে প্রকট হইয়াছিলেন। পরমহংসদেবের মহাপ্রাণ এবং বিবেকানন্দের বলবান বাহুতে মানবজাতির মধ্যে প্রচলিত সকল দেবতার, সত্যের, সকল প্রকার অভিব্যক্তির এবং সকল মানবীয় স্বপ্নের যেরূপ মধুর সমাবেশ ও গ্রহণ দৃষ্ট হয় এরূপ কোন যুগের ধর্মভাবে আর কোথাও দেখি নাই। যাঁহারা ঈশ্বরবিশ্বাসী, যাঁহারা স্বপ্নরাজ্যে বিচার করেন কিন্তু অকপটচিত্তে তত্ত্বান্বেষী, যাঁহারা সাকারবাদী, যাঁহারা অজ্ঞেয়-বাদী, যাঁহারা বুদ্ধিজীবী এবং যাঁহারা নিরক্ষর—সকলের নিকটই শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ বিশ্বভ্রাতৃত্বের মহতী বাণী বহন করিয়া আনিয়াছেন।"

---

"আধ্যাত্মিক চিন্তা দ্বারা জগৎ বিজয় বলিতে আমি জীবনপ্রদ তত্ত্বসমূহের প্রচারকেই লক্ষ্য করিতেছি, শত শত শতাব্দী ধরিয়া আমরা যে শত শত কুসংস্কারকে আলিঙ্গন করিয়া রহিয়াছি, সেগুলি নহে। ঐ আগাছাগুলিকে এই ভারতভূমি হইতে পর্যন্ত উপড়াইয়া ফেলিয়া দিতে হইবে, যাহাতে উহারা একেবারে মরিয়া যায়। ঐগুলি জাতীয় অবনতির কারণস্বরূপ, ঐগুলি হইতেই মস্তিষ্কের নির্বীর্যতা আসিয়া থাকে।"

—স্বামী বিবেকানন্দ

# গীতার আলো *

শ্রীরবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

শোনা যায়, জার্মান্ মহাকবি গ্যেটে তাঁহার মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে এই স্বগতোক্তি করেন, "Light ! More Light !"—'আলো, আরো আলো !' জীবন-মরণের সন্ধিক্ষণে এইরূপ গভীর তাত্ত্বিক উক্তি গ্যেটের মত কবি-দার্শনিকের পক্ষে তেমন বিস্ময়জনক নয়। তাঁহার মহাকাব্যে উদ্ভিন্ন কবিত্ব-সুষমার অন্তরালে আছে প্রচ্ছন্ন দার্শনিকতা। কিন্তু আমরা দেখি, অল্পবিস্তর প্রত্যেক মানুষই তাহার অন্ধকার জীবনপথে সত্যালোকের সন্ধানরত। যে শাশ্বত আলোর সাধনায় ঔপনিষদ ঋষি লাভ করেন তমসাতীত আদিত্যবর্ণ মহান্ পুরুষের সাক্ষাৎকার, এবং গৌতমবুদ্ধ লাভ করেন মহাবোধির অমৃতজ্যোতিঃ, জগতের অধিকাংশ নরনারীই তাহার কণামাত্র-প্রাপ্তির জন্ম প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নিরন্তর চেষ্টায় ব্যাপৃত। গীতা আমাদের দেশের এমন একটি ধর্মশাস্ত্র যাহা সনাতন ভারতীয় সত্যসাধনার এক পরিণত বিগ্রহ এবং যুগে যুগে অসংখ্য সত্যকামী নরনারী যাহার মধ্যে এক স্বর্গীয় আলোর উৎস খুঁজিয়া পাইয়াছে। সত্যই, গীতা হইতে বিচ্ছুরিত ভাবরশ্মি শুধু ভারতের নয়, নিখিল বিশ্বের জ্ঞানাকাশকে উদ্ভাসিত করিয়াছে। ভারতবর্ষীয় ইতিহাসের অতীত কোন্ স্বর্ণোজ্জ্বল মুহূর্তে জন্মলাভ করিয়া গীতার বজ্রবাণী যুগে যুগে অনুপ্রাণিত করিয়াছে আসমুদ্রহিমাচল-অধিবাসী ভারতবাসীকে। আবার কর্মচঞ্চল ঔপনিবেশিক যুগে গীতার ভাবধারা বৃহত্তর ভারতেও ছড়াইয়া পড়ে। মুসলমান ও ব্রিটিশ শাসনকালে সমগ্র প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সভ্য জগৎ মহাভারতীয় ভাবসৌধের মূলস্তম্ভরূপে গীতার অনন্তসাধারণ পরিচয় পাইয়া চমৎকৃত হয়। সুদূর অতীতে পিথাগোরাসের সময় হইতে মেগাস্থিনিসের ভারতাগমন পর্যন্ত গ্রীক্ ও ভারত সংস্কৃতির মধ্যে যে আদান-প্রদান চলিয়াছিল গীতোক্ত শিক্ষার অবদান তাহাতে যথেষ্টই রহিয়াছে। গীতার উদ্ভবকাল হইতে অদ্যাবধি বিশ্বের সর্বদেশ ও সর্বজাতির চিন্তাশীল মনীষিবৃন্দ উহার অপূর্ব ভাবসম্পদ দর্শন করিয়া অভিভূত হইয়াছেন।

এখানে আমাদের মনে স্বভাবতঃই এই প্রশ্ন উঠে, চিন্তাজগতে গীতার সর্বদেশিক ও সর্বকালিক প্রভাবের কারণ কি? বিবিধ ভাবের কুহেলিকায় আবদ্ধ ও দিগ্‌ভ্রান্ত বিশ্ববাসীকে গীতা এমন কী দিব্যালোকের সন্ধান দিয়াছে? এই প্রশ্নের উত্তর পাইতে হইলে প্রথমেই আমাদের গীতার জন্মেতিহাসের দিকে দৃষ্টি ফিরাইতে হইবে।

আমরা জানি গীতার পূর্বে বেদ-উপনিষৎ ও ব্রহ্মসূত্রের উদ্ভব হইয়াছিল। উপনিষৎ বেদের অন্ত বা বেদান্ত। বিভিন্ন উপনিষদে যদিও একই ব্রহ্মবাদ বিবৃত, তথাপি উহাদের অভিব্যক্তির মধ্যে পার্থক্য দেখা যায়। কারণ

* গত ১০ই অগ্রহায়ণ বহুবাজার শ্রীরামকৃষ্ণ সমিতিতে অনুষ্ঠিত গীতাজয়ন্তীতে পঠিত

বেদান্তের ব্রহ্মবিদ্যা বিভিন্ন সত্যদ্রষ্টা ঋষির বিভিন্ন অনুভূতির ভাষাপ্রকাশ-মাত্র। সুতরাং পরবর্তী কালে উপনিষদাবলীর ইতস্ততো-বিক্ষিপ্ত ও আপাতবিরুদ্ধ তত্ত্বসমূহকে এক সংক্ষিপ্ত অথচ সুসংবদ্ধ আকারদানের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। এই প্রয়োজনের প্রেরণাতেই বাদরায়ণ ব্যাসের 'ব্রহ্মসূত্র' বা বেদান্তদর্শনের সৃষ্টি। কিন্তু কালে ব্রহ্মসূত্রের সিদ্ধান্ত-তত্ত্ব হইতে নানা বিরুদ্ধ মতবাদ সম্ভূত হইয়া ভারতের চিন্তাক্ষেত্রে দার্শনিক বিবাদের সূচনা করে। প্রচলিত সর্বমতের সমুচ্চয়সাধক কোন গ্রন্থের আবশ্যকতা এই সময়ে অপরিহার্য হইয়া উঠে। তাই তখনই ভারতের ভাবভূমিতে গীতার আবির্ভাব। সুতরাং ভাবদ্বন্দ্বের সমাধান-হেতুই গীতার জন্ম। প্রত্যেক মতবাদ যখন 'নান্যদস্তীতি-বাদী' এবং জনগণের চিত্ত যখন 'অব্যবসায়ী' হইয়া উঠিল, 'ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে' তখনই গীতামুখে শ্রীকৃষ্ণের সমন্বয়-বাণী পাঞ্চজন্য-নাদে ঘোষিত হইল। আমাদের দেশে তাই গীতার সুবিপুল সর্বজনীন স্বীকৃতি ও সমাদর —বেদান্তের প্রখ্যাত প্রস্থানত্রয়ের মধ্যে তাই উহা চরম স্থান অধিকার করিয়াছে। ভারতেতর দেশসমূহে ভাববিপর্যয় ও দার্শনিক মতবিরোধের ইতিহাস অধিকতর নৈরাশ্যজনক। এইজন্য গীতায় জ্ঞান ভক্তি কর্ম্ম ও যোগের যে অভিনব সমন্বয়-প্রচেষ্টা তাহাই উহার সর্বাঙ্গীণ বৈশিষ্ট্য এবং এই বৈশিষ্ট্যের ফলেই উহা দেশ-বিদেশের অকুণ্ঠ সমাদর-লাভে সমর্থ হইয়াছে।

প্রসিদ্ধ টীকাকার নীলকণ্ঠ-সূরির মতে সর্ব-বেদের সারার্থ মহাভারতে সংগৃহীত, আবার সমগ্র মহাভারতের দার্শনিক নির্যাস গীতায় প্রদত্ত। কিন্তু গীতা শুধু মহাভারতেরই সার নহে, সকল অধ্যাত্মশাস্ত্রের সার উহাতে বর্তমান। মহাভারতকার ব্যাসদেব তাই বলিয়াছেন, সর্বশাস্ত্রময়ী গীতা উত্তমরূপে পাঠ করিলে অন্যান্য শাস্ত্রপাঠের আবশ্যকতা নাই। গীতা বিচিত্রপ্রবাহিণী হিন্দুধর্ম-গঙ্গার একটি প্রধান স্রোতোধারা। ইহাতে আসিয়া মিশিয়াছে সনাতন বৈদিক যুগ হইতে অধুনাতন কালের বিরাট ভারতীয় অধ্যাত্ম-সাধনার অনন্তমুখী প্রবাহ। এমন কি, জগতের শ্রেষ্ঠ ধর্মাদর্শ-সমূহের সারতত্ত্ব এই অমূল্য গ্রন্থে প্রকটিত। জ্ঞান ভক্তি কর্ম ও যোগের পরস্পরনিরপেক্ষ মার্গচতুষ্টয় অষ্টাদশাধ্যায়ী গীতায় অপূর্ব সম্মিলন-সূত্রে গ্রথিত। নিখিল বিশ্বের বহুবিচিত্র দার্শনিক চিন্তাপ্রবাহও গীতাসমুদ্রে পতিত ও বিলীন। প্লেটোর ভাববাদ, স্পিনোজার নৈর্ব্যক্তিক পুরুষবাদ, রামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈত, মধ্বের দ্বৈত ও শঙ্করের অদ্বৈতবাদ, ইসলামীয় সুফীবাদ, ব্র্যাডলির মিথ্যাপ্রপঞ্চবাদ প্রভৃতি যাবতীয় দার্শনিক মতের, সর্ববিধ মানব-ধর্মের ও অধ্যাত্ম-ভাবের মহাসমন্বয়ী বার্তা গীতাই প্রথম ভাব-দ্বন্দ্ববিক্ষুব্ধ জগতের দ্বারে উপস্থাপিত করিয়াছে। তাই দেশ ও কালের ব্যবধানকে তুচ্ছ করিয়া গীতাধর্মের সুদূরপ্রসারী প্রভাব সর্বত্র বিস্তৃত। উক্ত কারণেই উহা বিশাল হিন্দুভারতের সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় ধর্মগ্রন্থ। স্বদেশে ও বিদেশে হিন্দুধর্মের অন্যতম প্রধান ধারক, রক্ষক ও বাহকরূপে তাই উহার অবদান অসামান্য। গীতার synthetic view বা সমন্বয়ী দৃষ্টিভঙ্গীর জন্যই উহা প্রাচ্য-প্রতীচ্যের প্রসিদ্ধ চিন্তানায়কগণ-কর্তৃক বিপুল-ভাবে প্রশংসিত ও বন্দিত।

গীতার আর একটি লক্ষণীয় চরিত্র আছে। মার্কিন্ দার্শনিক উইলিয়াম জেমস্ যে Pragmatism প্রচার করিয়াছেন, কিংবা জার্মান্

দার্শনিক অয়্কেন যে Activism-এর কথা বলিয়াছেন তাহা গীতাধর্মের বিশেষতঃ গীতার কর্মযোগের ক্ষীণ প্রতিধ্বনি-মাত্র। যুগে যুগে মানুষের সমাজ-বিবর্তনের মত ভাব-বিবর্তনও ঘটে। কিন্তু জগতে এমন কতক-গুলি শাশ্বত ভাবাদর্শ আছে যাহাদের রূপ বা বহিরঙ্গ পরিবর্তন হইতে পারে কিন্তু বস্তু বা অন্তরঙ্গের পরিবর্তন ঘটে না। ভারতীয় তথা গীতোক্ত জীবনাদর্শ নিঃসংশয়ে এই চিরন্তন ভাবগোত্রের অন্তর্ভুক্ত। দার্শনিক চিন্তাজগতে Pragmatism ও Activism এই আদর্শদ্বয় সাময়িক যুগ-প্রয়োজনে সম্ভূত। কিন্তু ভাবিলে আশ্চর্য হইতে হয় যে, প্রায় দুই সহস্র বৎসর পূর্বে ভারতীয় সাধনার বিপুল উৎকর্ষের সময়ে গীতাধর্মের মত সর্বযুগোপযোগী ও সর্বদেশোপ-যোগী আদর্শবাদ সৃষ্ট হইয়াছিল! বর্তমান কালে স্বামী বিবেকানন্দ-প্রচারিত Practical Vedanta গীতার ভাবানুসারী। স্বামীজীর পক্ষে কর্মজীবনে বা ব্যবহারিক ক্ষেত্রে বেদান্তের প্রয়োগ—'বনের বেদান্তকে ঘরে টানিয়া আনা'—সম্ভব হইয়াছিল গীতার জন্যই।

পাশ্চাত্ত্য মনীষী আর্নেষ্ট হকিং তাঁহার Types of Philosophy-গ্রন্থে Mysticism-কে দুই ভাগে ভাগ করিয়াছেন—Theoretical ও Practical. গীতাকে এই Practical Mysticism-এর এক অনুপম গ্রন্থ বলা চলে। ডক্টর মহেন্দ্রনাথ সরকার তাঁহার Mysticism in the Gita পুস্তকে ইহা স্পষ্টভাবে স্বীকার করিয়াছেন। Theoretical Mysticism-এর মূল বক্তব্য এই যে, পরম সত্যবস্তু ইন্দ্রিয়-জ্ঞানের গোচরীভূত নন, তিনি অতীন্দ্রিয়জ্ঞান-গোচর। নিও-প্লেটোনিক ভাবধারার প্রবর্তক প্লটিনাস বলেন, মিষ্টিক সাধক যখন এই দিব্য পরাজ্ঞানের অধিকারী হন, তখন তাঁহার 'জ্ঞাতা'-রূপ আমিত্ব জ্ঞেয় বস্তুতে একীভূত হয়। তাই তিনি অতীন্দ্রিয় করণে সত্যানুভূতি লাভ করিলেও সেই সত্যের স্বরূপ বাক্যের দ্বারা প্রকাশ করিতে পারেন না। অতএব সত্যবস্তু 'অবাঙ্‌মনসোগোচর'। গীতার 'যস্মিন্ গতা ন নিবর্তন্তি ভূয়ঃ', 'যদ্ গত্বা ন নিবর্তন্তে', অব্যক্তোঽয়মচিন্ত্যোঽয়ম্' প্রভৃতি বহু প্রসিদ্ধ শ্লোকাংশে এবং শ্লোকে উপর্যুক্ত মিষ্টিক ভাব সুব্যক্ত। Practical Mysticism কিন্তু সত্যবস্তুর স্বরূপ বা প্রকৃতি বর্ণনা করে না, সৎস্বরূপ উপলব্ধির উপায় উহার বর্ণনীয় বিষয়। উহা 'the way of knowing' বা সত্যজ্ঞানের পথ-নির্দেশ করিয়া দেয়। উপনিষদাদি দর্শনগ্রন্থ মূলতঃ ব্রহ্ম বা আত্মার স্বরূপের বিশদ বর্ণনায় নিযুক্ত। অপর পক্ষে গীতা পরমপুরুষ বা পুরুষোত্তমের প্রকৃতি-নির্ধারণে তত ব্যস্ত নয়, ব্রহ্মপদ বা ব্রাহ্মী স্থিতিলাভের বিভিন্ন কৌশল সুচিহ্নিত করাই উহার মুখ্য উদ্দেশ্য। অধ্যাত্ম-দর্শনের কার্যকরী (Practical) দিক্‌টির উপরে সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করিয়া গীতা বিশ্বের দর্শনেতিহাসে এক অপূর্ব অধ্যায় রচনা করিয়াছে। সম্ভবতঃ অন্য কোন ধর্মগ্রন্থ গীতার ন্যায় সাধক-জীবনের নিত্যসহচর বা চিরসঙ্গী বলিয়া ন্যায়সঙ্গত দাবী করিতে পারে না। তাই বোধ হয় ব্যাস-মতে ধর্মসাধক যদি গঙ্গা গায়ত্রী ও গোবিন্দের সহিত একমাত্র গীতাগ্রন্থকে তাঁহার হৃদয়ের মণি-কোঠায় স্থান দিতে পারেন, তবে আর তাঁহার পুনর্জন্ম হইবে না। বাস্তবিক এই অর্থেই মহাত্মা গান্ধী গীতাকে 'মানবের পারমার্থিক জননী' এবং কেশব-কাশ্মীরী 'সংসারজলধি-অতিক্রমের ভাগবত নৌকা'-রূপে বিশেষিত করিয়াছেন। সাংখ্য-যোগ, ন্যায়-বৈশেষিক ও মীমাংসা-বেদান্তের মূল ত্রিধারা গীতা-সঙ্গমে বিভিন্ন যোগরূপে অর্থাৎ পরমার্থলাভের বিবিধ কর্মকৌশলরূপে অভিব্যক্ত হইয়াছে। ঔপনিষদ মিষ্টিসিজমের সহিত গীতার

মিষ্টিক আদর্শের তুলনা-প্রসঙ্গে ডক্টর মহেন্দ্রনাথ সরকার বলেন, "The Gita links the silence of transcendence to the active stirrings of life. It is a departure from the ancient mysticism of the Upanishads, and in this it has its own problem."

গীতায় প্রকৃতির কথা ছাড়িয়া দিলেও দেখা যায়, উহার অবয়ব বা আকৃতি ব্যবহারিক মিষ্টিসিজমের ছাঁচে গঠিত। উপনিষদাদি দর্শন-গ্রন্থের আভ্যন্তরিক অংশে তো দূরের কথা, প্রারম্ভিক আলোচনায়ও লৌকিক সুখ-দুঃখ-হাসি-অশ্রুময় মানবজীবনের সামান্যমাত্র স্থান নাই। ঐসকল গ্রন্থের গঠনপ্রণালী হইতে কিন্তু গীতার আঙ্গিক চরিত্র সম্পূর্ণ বিভিন্ন। গীতা অলৌকিক ধর্মগ্রন্থ হইলেও উহা এক লৌকিক মহাসমরকে কেন্দ্র করিয়া উৎসারিত। উহা প্রথমেই সর্বোচ্চ তত্ত্বের নিরর্থক অবতারণা করিয়া বসে নাই। উহার প্রথমেই ধর্মযুদ্ধের প্রশ্ন, স্নেহ-প্রীতি, দয়া-দাক্ষিণ্য, মায়া-মমতা-জনিত সাধারণ অথচ মর্মঘাতী জিজ্ঞাসা—'কেন' বা 'প্রশ্ন' উপনিষদের অসাধারণ ব্রহ্মজিজ্ঞাসা নয়। আবার গীতায় সাধকবিশেষের উদ্দেশে স্বধর্মপালন ও স্বকার্যসাধনের সুস্পষ্ট নির্দেশও বহুস্থলে পাওয়া যায়। সাধক-জীবনের ক্রমবিবর্তনের তিনটি ধাপ গীতার সম্পূর্ণ অঙ্গটি রচনা করিয়াছে। সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ—এই ত্রিগুণ-ময় সংসারে সাধক প্রথমে তমোগুণের অভিভবকারী শক্তির কবলে পতিত। ফলে তাঁহার চিত্ত দ্বন্দ্ব-দোলায় আকুল। দ্বিতীয় ধাপে দেখিতে পাই কিংকর্তব্যবিমূঢ় সাধকের জীবনে দৈবী করুণার অবতরণ ও যুক্তিতর্কের দ্বারা দ্বন্দ্ব-নিরসনের নিষ্ফল প্রচেষ্টা। তৃতীয় স্তরে সাধক দৈবানুগ্রহে অধ্যাত্ম-চেতনায় (Mystic consciousness) সমারূঢ়। এই স্তরেই তিনি বিশ্বরহস্যের স্বরূপ অতীন্দ্রিয় চেতনাশক্তি দ্বারা প্রত্যক্ষ করিয়া জাগতিক সমস্যার আত্যন্তিক সমাধানের যোগ্যতা অর্জন করিলেন। দার্শনিক প্লটিনাসও জ্ঞানের জগতে এই তিনটি স্তর বা মাত্রা স্বীকার করিয়াছেন—opinion, science ও illumination. তাঁহার মতে শেষ স্তরের জ্ঞানটি দিব্যানুভূতি-সাপেক্ষ ও জ্ঞানের ক্রমবিকাশের চরম ফল।

গীতা কেবলমাত্র Practical Mysticism-এর গ্রন্থ নয় একথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। বলা বাহুল্য, ইহার তাত্ত্বিক দিকটিও স্বগরিমায় কম প্রোজ্জ্বল নয়। তবে ইহা গীতার মূল ব্যবহারিক দিকটির সহিত ওতপ্রোতভাবে জড়িত আছে। মানুষের চেতন-জীবনের সর্বপ্রকার কার্যকে বিভিন্ন মানসিক গঠন-অনুসারে বিভিন্ন পথে একই সত্যের অভিমুখী করিয়া তোলা গীতার একটি উদ্দেশ্য। সেইজন্ম উহা এক সর্বাত্মক ভাবধারার উৎস।

গীতাকে মিষ্টিসিজমের গ্রন্থ বলিলে একটি অসুবিধা হয়। কোনও মনীষী বলিয়াছেন, "*Science gives system, mysticism* illumination." সাধারণ মতও ইহাই। সুতরাং পরোক্ষভাবে ইহা স্বীকার করিতে হয় যে, গীতা সুসংবদ্ধ দর্শন-বিজ্ঞানের গ্রন্থ হইতে পারে না। কিন্তু গীতার মিষ্টিক আলোচনা-প্রণালীর বৈজ্ঞানিকতা-সম্বন্ধে লেশমাত্র সন্দেহ নাই। গীতার ধ্যানযোগের কথাই ধরা যাক। গীতোক্ত ধ্যানসাধন সম্পূর্ণভাবে মনোবৈজ্ঞানিক আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত। তাই সত্যই বলা হইয়াছে, "...The act of contemplation is for the mystic a psychic gateway."

গীতার একটি প্রধান শিক্ষা নিষ্কাম কর্ম। কর্মফলের আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিয়া কর্ম করিলে ব্রহ্মপুরুষ বিজ্ঞাত হন। কর্মত্যাগ নহে, কর্ম-ফলেচ্ছা-ত্যাগই গীতার অমূল্য বাণী। দেশ-বিদেশের অনেক মিষ্টিক সাধকই কর্মত্যাগের বা জাগতিক সংস্রব-বর্জনের উপদেশ দিয়াছেন। যেমন একহার্ট বলেন, 'If a man will work an inward work, he must pour all his powers into himself and must hide himself from all images and forms." অপরাপর মিষ্টিক-সাধনায় আমরা দেখিতে পাই world-flight, সংসার হইতে পলায়ন। কিন্তু গীতায় এই নির্ভীক কর্মযোগ বিবৃত—নির্বাসন হইলেই মুক্তি লাভ করা যায়।

# মাতৃ-দর্শন

শ্রীমণিমোহন মুখোপাধ্যায়

১৯১৬ সালের শেষভাগে আমার যখন ২৫।২৬ বৎসর বয়স তখন কাশীধামে গিয়া এক অচিন্ত্য উপায়ে পরমপূজ্যপাদ শ্রীশ্রীলাটু মহারাজের দর্শন পাই। পর বৎসর দুর্গাপূজার ছুটির সময় তাঁহার অযাচিত কৃপা পাইয়া কৃতার্থ হই। তাঁহার কৃপায় ও আদেশে কলিকাতায় ফিরিয়া শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত-প্রণেতা 'শ্রীম' বা শ্রীমহেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয়ের পবিত্র ভক্তিপূত সান্নিধ্যলাভ করি। স্বগ্রাম ভাটপাড়া হইতে তখন প্রায়ই সন্ধ্যায় শ্রীম'র দর্শনে আসিতাম; তাঁহার মুখ হতে কথামৃত-শ্রবণে আনন্দ পাইতাম। তিনি সব সময়ই শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের কথা নানাশাস্ত্র-সহায়ে আমাদের মত ইংরেজী শিক্ষিত যুবকদের উপযোগী করিয়া বলিতেন—বেশ সহজ ও সরলভাবে, ভক্তির সহিত। ভাল লাগিত, তাই যাইতাম।

১৯১৮ সালে শ্রীশ্রীদুর্গাপূজার সময় শ্রীম বলিলেন, "মাকে দর্শন করেছ? মহামায়ী দেহ ধারণ করে কত ভক্তকে দর্শন দিয়ে কৃতার্থ কচ্ছেন। যাও, কাল মহাষ্টমী, কালই কিছু পদ্মফুল নিয়ে তাঁর শ্রীপাদপদ্ম পূজো ক'রে এসো। তিনি বাগবাজার-মঠে আছেন। আর ফেরবার পথে আমাকে সব বলে যেও।" কথাটি ভাল লাগিল।

সেইদিন রাত্রে ভাটপাড়ায় ফিরিয়া ভাবিতে লাগিলাম, কোথা হইতে পদ্মফুল সংগ্রহ করি। এক বন্ধুবরের সহিত পরামর্শ করিয়া পরদিন প্রাতে উঠিয়া গ্রাম হইতে বহুদূরে পুকুরে পুকুরে পদ্মফুলের সন্ধানে ঘুরিতে লাগিলাম। দৈবক্রমে অনেক বেলায় একটি পুকুরে কিছু লাল পদ্ম পাওয়া গেল। উহা লইয়া কলিকাতায় আসিলাম এবং এক টাকার রসগোল্লা কিনিয়া বাগবাজার ১নং মুখার্জি লেনে (বর্তমান উদ্বোধন লেন) শ্রীশ্রীমাতৃমন্দিরে পৌঁছিলাম। তখন বেলা ২।২॥৹টা হইবে। পরে আরও অনেক দর্শনার্থী আসিয়া জুটিলেন। খোঁজ লইয়া জানিলাম, আজ আর শ্রীশ্রীমার দর্শন মিলিবে না। শ্রীশ্রীমার সেবক স্বামী অরূপানন্দ মহারাজ (রাসবিহারী মহারাজ) উপর হইতে আসিয়া বলিয়া গেলেন, "আজকার মত পুরুষ ভক্তদের দর্শন হয়ে গেছে। মায়ের পা জ্বলছে। তাঁর পায়ে এখন বরফ দেওয়া হচ্ছে। ৪টা হতে কেবল স্ত্রীভক্তেরা এসে দর্শন করতে পারবেন।" এই সংবাদ যখন শুনিলাম তখন আমি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া বাহিরের রোয়াকের উপর বসিয়া পড়িলাম। কে যেন জোর করিয়া বসাইয়া রাখিল; চলিয়া আসিতে পারিলাম না। কি করিব, কোথায় যাইব—কিছুই মনে উদিত হয় নাই। অথচ এক অদ্ভুত অনির্বচনীয় আকর্ষণে অভিভূতপ্রায় দুই ঘণ্টা বসিয়া রহিলাম। হাতে রসগোল্লার রস পড়িয়া গিয়াছে, পদ্মগুলি ক্রমশঃ শুকাইয়া যাইতেছে। মনে কোন কামনা-বাসনা নাই, অথচ ফিরিয়াও যাইতে পারিতেছি না; এমন সময় পূজনীয় রাসবিহারী মহারাজ আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,

আপনাদের মধ্যে কেউ কি মেডিকেল কলেজের দিক দিয়ে ফিরবেন?" আমি বলিলাম, "আমার যাওয়া হতে পারে।" কলেজ ষ্ট্রীট হইয়া শিয়ালদহ ষ্টেশনে ট্রেন ধরা আমার পক্ষে অসুবিধাজনক ছিল না। আর কলেজ ষ্ট্রীটের মোড় হইতে মেডিকেল কলেজ কিছু বেশী দূরও নহে।

রাসবিহারী মহারাজ বলিলেন, "আপনি উপরে আসুন, মা আপনাকে দেখতে চাইছেন।" অতঃপর যখন উপরে দোতলায় শ্রীশ্রীমার আহ্বানে যাইতেছি তখন হইতে এমন অভিভূত হইয়া গেছি যে মা যখন আমার মুখের দিকে চাহিলেন, তখন আমি মার শ্রীমুখ দেখিতে পাই নাই, কেবল শ্রীচরণ দুটি দেখিতে পাইয়াছিলাম। শ্রীচরণে পদ্মফুল দিবার পর রসগোল্লা এক পাশে রাখিয়া দিয়া কাঁদিয়া ফেলিলাম ও জোড় হাতে দাঁড়াইয়া আছি এমন সময় মা বলিলেন, "হ্যাঁ, এর দ্বারাই হবে। একে প্রসাদ দাও।" তখন স্ত্রীভক্তের ভিড়ে আমাকে একপাশে সরিয়া যাইতে হইল এবং প্রসাদধারণ করিবার পর রাসবিহারী মহারাজ আমাকে দুই জন স্ত্রীভক্তকে সঙ্গে দিয়া বলিলেন, "মায়ের আদেশ, তুমি মেডিকেল কলেজের পশ্চাতের গলিতে এদের পৌঁছিয়ে দেবে। এরা বাড়ীর নম্বর ভুলে গেছে। তবে বাড়ী দেখলে চিনতে পারবে" এবং তাদের বলিলেন "তোমরা এঁর সঙ্গে যাও। তোমাদের ইনি পৌঁছিয়ে দেবেন।"

তাঁদের লইয়া ট্রামে চাপিয়া মেডিকেল কলেজের নিকট নামিয়া উহার পশ্চাতের বস্তিতে একটি ছোট লেনে অনেক খুঁজিলাম। সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে, অন্ধকারে অনেক কষ্টে তাঁহারা বাড়ী চিনিতে পারিলেন। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ, রাত্রি হইয়া আসিল, পাড়া-গাঁয়ের মেয়ে সবে মাত্র কলিকাতায় আসিয়াছে। উভয়েই যুবতী, কেন এখনও ফিরিতেছে না ভাবিয়া বাড়ীর লোকেরা বিষম চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। আমাদিগকে পৌঁছিতে দেখিয়া তাঁহারা যে কতদূর আনন্দিত ও নিশ্চিন্ত হইলেন তাহা আমাকে আদর-আপ্যায়ন ও জলখাওয়ান প্রভৃতিতে প্রকাশ পাইল। বিদায়ের কালে আমার পুনঃ পুনঃ প্রতিবাদ সত্ত্বেও আমাকে তাঁহারা একখানি কাপড় ও একটি টাকা প্রণামী লইতে বাধ্য করিলেন। অতঃপর আমি আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটে শ্রীম-সমীপে আসিলাম। শ্রীম তন্ন-তন্ন প্রশ্ন করিয়া শ্রীশ্রীমার দর্শন ও তৎপরবর্ত্তী সব বৃত্তান্ত শুনিলেন এবং প্রীত হইলেন বুঝিতে পারিলাম। আমি কিন্তু তৃপ্ত হইলেও শ্রীশ্রীমার সঙ্গে কোন কথাবার্ত্তা হইল না ভাবিয়া একটু অনুযোগের সহিত বলিলাম, "কিন্তু মার সঙ্গে ত আমার কোন কথা হল না।"

শ্রীম গম্ভীরস্বরে উত্তর দিলেন, "কথা হয় নি, কি বলছো? মা লক্ষ্মী মুখ তুলে চেয়েছেন। মহামায়ী সাক্ষাৎ জগজ্জননীকে স্বশরীরে দর্শন করেছ। তোমার মানব-জন্ম সফল হ'ল।" 'মা লক্ষ্মী মুখ তুলে চেয়েছেন' এই কথাটি এত ভাবের সহিত আবৃত্তি করিলেন যে, আমার মনের সকল সংশয় ও দ্বন্দ্ব দূরীভূত হইয়া তাহার পরিবর্ত্তে হৃদয়ে অপূর্ব্ব বল ও আত্মবিশ্বাস জাগরিত হইল। সংসারে নির্ভয়ে চলিবার যেন পথ পাইলাম। শ্রীম আমার মাথায় ঐ নূতন কাপড়খানি পাগড়ীর মত জড়াইয়া দিলেন এবং বলিলেন, "আজ রাত্রে এইভাবে শোবে ও টাকাটিও সঙ্গে রাখিবে। কাল সকালে বাগবাজার শ্রীশ্রীমাতৃমন্দিরে উদ্বোধন-অফিসে ঐ টাকা ও কাপড়খানি রিলিফ ফণ্ডে জমা দিয়ে আসবে।" পরদিন সকালে উঠিয়া কাপড় ও টাকা উদ্বোধন-অফিসে রিলিফ ফণ্ডে জমা দিয়া আসিলাম। পূজ্যপাদ মাষ্টার মহাশয়ের ('শ্রীম') কথাটি 'মা মুখ তুলে চেয়েছেন'

ভাবিতে ভাবিতে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম। একদিনের জন্ম হলেও শ্রীশ্রীমার স্নেহ ও কৃপাদৃষ্টি লাভ আমার স্মৃতি-ভাণ্ডারের অক্ষয় অমূল্য সম্পত্তি।

শ্রীশ্রীমা কথা কহেন নাই বলিয়া দুঃখ ছিল। কিন্তু অভিনব উপায়ে তাহার পর মার বাণী শুনিয়াছিলাম। স্বপ্নে দেখিলাম ভাটপাড়ার গঙ্গার বাঁধাঘাটে যেখানে আমার পিতৃদেবের অন্তিম শয্যা রচিত হইয়াছিল (ঐ বৎসর ভাদ্র-মাসে পিতার দেহত্যাগ হয়) ঠিক সেই স্থানে মা আমার দেখা দিলেন এবং শ্রীশ্রীঠাকুরের একটি oilpainting ছবি দেখাইয়া গোলাপের মালা আমাকে দিয়া বলিলেন "মালা পরাও"। আমি মালা পরাইয়া কৃতার্থ বোধ করিলাম। ইহা স্বপ্নে হইলেও আমি কিন্তু ইহাকে বাস্তববোধে আনন্দ পাই এবং এখনও সুযোগ হইলেই গোলাপ ফুল বা মালা শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীচরণে অর্পণ করি।

পর বৎসর আমাদের বাড়ীতে শ্রীশ্রীকালীপূজা হয়। আমি শ্রীশ্রীকালীমাতার প্রতিমা বেশ করিয়া সাজাইয়া দিলাম এবং প্রতিমার পাশে শ্রীশ্রীমার ছবি রাখিয়াছিলাম। যখন পুরোহিত মহাশয় প্রতিমায় শ্রীশ্রীকালীমাতার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিলেন শ্রীশ্রীমা যেন আবির্ভূত হইয়া ঐ প্রতিমার মধ্য দিয়া আমাকে বলিয়া উঠিলেন, "আমি ত এসেছি।" এই দ্বিতীয় ঘটনাটিও আমার নিকট কল্পনা মনে হয় না। উহা আমার নিকট সত্য এবং ঐ স্মৃতি হৃদয়ে ধারণ করিয়া জীবনের নানা ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্যেও আনন্দে জীবিত আছি।

---

# মহাকবি গিরিশচন্দ্র

শ্রীপিনাকিরঞ্জন কর্ম্মকার, কবিশ্রী

কাব্য রচেছো তুমি!
নব মহিমায় উজল করিয়া সারাটি বংগভূমি।
তব অবদান আনে তাই সাড়া প্রতিমানুষের মনে
রিক্তা ধরণী ফিরে পায় ভাষা মধুর গোধূলি-ক্ষণে।
আঁধার রজনী হলো আলোকিত তোমার
দীপালি-দানে
তুমি মহোয়ান করে গেছ সেবা সাধনায় সবখানে।
ক্ষুধিত আর্ত্তপ্রাণ!
পায় নাকো আজি কোন সাড়া তব বেদনায়
ম্রিয়মাণ।
খণ্ডিত কায়ে লুণ্ঠিত পায়ে অনেক দুঃখে বাঁচে,
রোগে শোকে দাহে জর্জ্জর দেহে পরের
করুণা যাচে।
হয়েছে কাতর অন্নের দায়ে কুণ্ঠিত পরাধীন
জীবনের আশা এমনি করিয়া হ'য়ে যায় বুঝি লীন।
তারা কী বেদনা সবে?
কেমনে জাগিবে নবীন পুলকে জীবনের উৎসবে?
নিয়ত যেথায় ভাঙনের সুরে হৃদয়বীণাটি বাজে
ভাষা দাও কবি আবার আসিয়া তাদের জীবন-
মাঝে।
কাব্যবেদীতে নূতন মন্ত্রে দীক্ষিত করো হিয়া
সুদিনের তরে জেগে আছে সব বেদনার লিপি
নিয়া।

# অভিনয়

অধ্যাপক শ্রীযাদবেন্দ্রনাথ রায়, স্যায়তর্কতীর্থ

সৃষ্টির মূলেই রয়েছে অভিনয়, তাই অভিনয়ের প্রতি জীবমাত্রেরই আন্তর আকর্ষণ স্বভাবসিদ্ধ; সুতরাং অভিনয় জিনিষটা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। প্রাচীনতার দিক্ দিয়ে দেখতে গেলে সে-ই হোলো আদিম যুগের সৃষ্টি। এই অভিনয়-প্রবাহ অনাদিকাল থেকে চলে আসছে। যখন ইচ্ছা হ'ল "আমি এক, বহু হব" তখন অভিনয়ের আরম্ভ; সঙ্গে সঙ্গে সৃষ্টির গোড়াপত্তন। ব্রহ্মাণ্ড হ'ল নৃত্যমণ্ডপ। প্রকৃতি সাজলেন অভিনেত্রী। যাঁর ইচ্ছায় অভিনয় সুরু হ'ল তিনি সাজলেন অভিনেতা। অভিনেতার প্রধান শক্তি বা সহায় হচ্ছেন অভিনেত্রী। অভিনয় করতে গেলে আসলরূপ ঢাকা দেওয়ার দরকার হয়, তাই তাঁরা একটা জিনিষ নিলেন—মায়া। এই মায়া হলেন বড় হুসিয়ার কারিগর। যখন যা দরকার ইনি তা যোগাতে রইলেন। 'যা নেই' তা 'আছে'র সীমার মধ্যে আনতে থাকলেন।

অভিনেত্রী যে সব সময়ই অভিনয় করবেন তার কোন নিয়ম নেই। যখন তিনি তাঁর স্বরূপাবস্থায়; থাকেন। তখন চুপ্‌চাপ্। যখন সাজতে সুরু করেন, তখন তাঁর সেই রূপ দেখে মনে হ'বে না, এ হেন বিলাসিনীর বিলাস কোন কালে থামতে পারে। তবে তাঁর এই সাজ-সজ্জার যে একটা শৃঙ্খলা বা পারিপাট্য নেই তা বলা চলে না। এতে রয়েছে একটা স্পন্দন বা ছন্দ। সেইটে তালে তালে নৃত্যের মাধ্যমে বহুরূপে স্ফুরিত হয়ে উঠতে থাকে। জগৎটাকে যে ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্তনশীল বলে মনে হয়, তার মূলে রয়েছে অভিনেত্রীর প্রতিক্ষণে পট-পরিবর্তন। যখন বিলাসিনী তালে তালে পা ফেলতে থাকেন, তখন নটরাজ স্থির থাকতে পারেন না, তিনিও তাঁর সঙ্গে যোগ দেন। যোগ দেন বটে, তবে একটু পার্থক্য থেকে যায়। হাজার হোক, পুরুষের নাচ্ ত! তাই সেটা হ'য়ে উঠে তাণ্ডব। আর বিলাসিনীর লাবণ্য তখন সমধিক ফুটে উঠে, তাই তাঁর নাচনটা তখন পরিণত হয় লাস্যে। এ দুয়ের কোনো ক্রিয়া জগতে ব্যর্থ হবার নয়—তখন এই দুই নৃত্যের প্রথম অক্ষর যোগ করে তালের সৃষ্টি হয়। এই তালটা জগতের ব্যবহার-যোগ্য, কিন্তু তাণ্ডব বা লাস্য এখানকার জিনিষ নয়। শুধু একটা শক্তির ত আর বিকাশ হয় না, তাই যুক্ত-বিযুক্ত শক্তিরূপে এই শিবশক্তি জগতের ভারকেন্দ্রের সমতা রক্ষা করেন। সুতরাং দেখা গেল তালের মূলে একটা ক্রিয়া আছে, কিন্তু কালটাকে বাদ দিলে চলবে না। কাল হ'ল শিক্ষক। সে ক্রমশঃ অভিনেতাদের শিক্ষা দিয়ে তারপর রঙ্গমঞ্চে নিয়ে আসে। এই যে গোড়ার অভিনেতা আর অভিনেত্রী, এরা কিন্তু চিরযৌবনশীল। কাল এদের বার্ধক্য এনে দিতে পারে না। যখন অভিনয়ের ইচ্ছা না থাকে তখন বরং কর্মছাড়া হ'য়ে বসে থাকতে পারে, কিন্তু কালের কাছে এরা আত্ম-বিক্রয় করে না। বসে থাকাও চলে না, কারণ অবসাদ বলে কোন জিনিষ এদের নেই। কারণ এদের স্বরূপটাই হলো আনন্দময়। সুতরাং কোন একটা জাগতিক ধর্ম যদি এদের স্পর্শ করে, তবে এদের স্বরূপই থাকতে পারবে না। অতএব নিত্য-আনন্দময়ের স্বরূপবিচ্যুতি একান্তই অসম্ভব।

যখন আমরা অভিনয় দেখি, ইন্দ্রজাল দেখি, তখন আমরা সেটাকে কোনরূপেই মিথ্যা বলতে সাহসী হই না। যদিও জানি পরমুহূর্তে এর কিছুই থাকবে না, তবুও অভিনীত করুণ রস আমাদের অশ্রু আকর্ষণ না করে পারে না। বাল্মীকির বিজন আশ্রমে লক্ষ্মণ-পরিত্যক্তা একাকিনী জনকনন্দিনীর সেই অনাথ অবস্থার করুণ ক্রন্দনের অভিনয় কার না চিত্তকে দ্রবীভূত করে? যদি তেমন কোন পাষাণ থাকে থাকুক, তার কথা আমাদের আলোচনার বাহিরে।

অভিনয়ে যে রসের অনুভূতি, তা অভিনেতার স্বরূপানুভূতি হতে অভিন্ন। সোনার খনিতে কাচও সোনা হয়ে যায়, আনন্দের উৎসে আনন্দেরই প্রাচুর্য অনুভূত হয়। তোমার আমার দৃষ্টি নেই বলে দুঃখ-শোকে বিহ্বল হই, তা যে মায়ার যোগান সম্পদ্ তা পর্যন্ত একেবারে ভুলে যাই!

জন্মাবধি আমরা অভিনয় দেখতে, অভিনয় করতে অভ্যস্ত। অভিনয়ের রসে চিত্তকে নানা ভাবে রাঙান আমাদের স্বাভাবিক ধর্ম হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। তাই আমরা যে পৃথিবীর রঙ্গমঞ্চের এক এক জন অভিনেতা তাও ভুলে রয়েছি। আমরা নিত্য নূতন সাজে সজ্জিত হচ্ছি, তাও জানি, অভিনয়ের বুলিগুলি কোন্ রঙ্গমঞ্চে কি ভাবে বিন্যাস করতে হবে তাও জানি, চাতুর্যের যত প্রকার অভিনয়ে দর্শকদের চিত্ত আকর্ষণ করা সম্ভব তাও জানি, কিন্তু অনাদি-বিস্মৃতি আমাদের স্বরূপ বুঝতে দিচ্ছে না। একটা পোষাক খুলতে না খুলতেই বিলাসিনী মায়া পোষাক এনে তখনই সাজিয়ে বাহাবা দিয়ে আবার অভিনয়ের জন্য পাঠিয়ে দিচ্ছে। আমরাও তার মিথ্যা বাহাবায় মুগ্ধ হ'য়ে চোখ-ঢাকা ঘানির বলদের মত চলতেই আছি। স্বরূপ-উপলব্ধির অবসর কোথায়? তবে কি কোন উপায় নেই? এ মায়া-রাক্ষসীর কবল থেকে নিষ্কৃতির উপায় আছে। ঐ কান পেতে শোন—সিংহনাদ শোনা যাচ্ছে, শ্রীচৈতন্য শ্রীরামকৃষ্ণ প্রমুখ কলি-পাবন যুগাবতারগণের অভয়বাণী গগনপবন মুখরিত করে সপ্তসুরে তালে তালে তরঙ্গায়িত হ'য়ে চলে যাচ্ছে—

"মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে।"

---

# বিস্ময়

স্বামী শ্রদ্ধানন্দ

তুমি কি জাগিয়া রহ তন্দ্রাহীন আঁখি
আমার সকল প্রাণে? চল কি নিরখি
মন-বুদ্ধি-ইন্দ্রিয়ের প্রত্যেক স্পন্দন
প্রত্যহের চক্রগতি নিদ্রা জাগরণ?

আমার সকল আশা আবেগ উল্লাসে
তুমি কি রয়েছ ঘেরি নিশীথে দিবসে?
যে সমাপ্তি উদ্দেশিয়া অবিশ্রান্ত ভ্রমি
লয়ে গুরু কর্মভার সে লক্ষ্য কি তুমি?

আমারে যা নিরবধি ডাকিছে বাহিরে
তোমার আহ্বান সে কি? তোমারি কি সুরে
ঝঙ্কারিছে এ বিশ্বের যতেক সঙ্গীত
রূপে রূপে তোমারি কি আলো চারিভিত?

যতদূর যতদূর ধেয়ে চলি আমি
তুমি কি গিয়াছ সেথা মোরে অতিক্রমি?
অজস্র সন্ত্রাস মাঝে তুমি কি অভয়?
অসহায় রিক্ততার পরম আশ্রয়?

যখন ছিল না কিছু, তোমার চেতনা—
দেশ-কাল-হেতুহীন ছিল কি আপনা?
একক তুমি কি স্থির এ চঞ্চল ভবে
সব কিছু অবসানে তুমি কি রহিবে?

# মহাত্মা গান্ধী ও হিন্দুসংস্কৃতি

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, বি-এ

মহাত্মা গান্ধীর মতে হিন্দুসংস্কৃতি এবং হিন্দুধর্ম্ম সাম্প্রদায়িক এবং কোন দেশ, কাল ও ব্যক্তিতে সীমাবদ্ধ নয়। উভয়ই সার্ব্বভৌম, সনাতন ও সার্ব্বজনীন। হিন্দু নাম বৈদেশিক এবং ভারতের প্রকৃত নাম হিন্দুস্থান, কিন্তু এই দেশ বিশ্বকে আপন হইতে পৃথক্ করে না। মহাত্মা গান্ধী এক ব্যক্তির নাম বটে, কিন্তু এই নামে যে নামী ব্যক্তি, তিনি মানবসমাজকে নিজ হইতে পৃথক্ করেন নাই। তিনি নিজেকে হিন্দু বলিতেন, তাঁহার হিন্দুত্বে কোনরূপ সাম্প্রদায়িক গন্ধ ছিল না। সর্ব্বদেশ ও সর্ব্বজাতির প্রতি তাঁহার পবিত্র প্রেম ছিল বলিয়া তিনি হিন্দু হইয়াও নিজেকে খৃষ্টান মুসলমান পার্শী প্রভৃতি হইতে অভিন্নরূপে অনুভব করিতেন। খিলাফৎ আন্দোলন-সময়ে তাঁহার হৃদয় মুসলমানদের হৃদয়ের সহিত এক হইয়া গিয়াছিল। যখন জার্ম্মেনী চেকোস্লোভাকিয়ার উপর আক্রমণ চালায়, তখন চেকোস্লোভাকিয়ার সাহায্য করিতে তিনি প্রস্তুত হইয়াছিলেন। বৃটেনের প্রাণ যখন জার্ম্মেন্ আক্রমণের চাপে ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিল, তখন মহাত্মাজীর প্রাণ অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া পড়ে। তিনি যদি স্বাধীন ভারতে জন্মগ্রহণ করিতেন, তাহা হইলে তিনি পীড়িত মানব-সমাজের উদ্ধারের জন্য সম্পূর্ণ আত্মনিয়োগ করিতে পারিতেন। কিন্তু পরাধীন ভারতে জন্ম হওয়ায় তাঁহার বিশ্বপ্রেমী হৃদয়ে ভারতের পরাধীনতা হইতে মুক্তির ভাবই অভ্যুদিত হইয়াছিল। তিনি দক্ষিণ-আফ্রিকার পরাধীন ভারতীয়দিগের জন্য সংগ্রাম করিয়াছিলেন। পরে ভারতের স্বাধীনতাপ্রাপ্তি পর্য্যন্ত তিনি অহিংসাত্মক সংগ্রাম চালাইয়া গিয়াছেন। এই সংগ্রামে লিপ্ত থাকার মধ্যেও তাঁহার বিশ্বপ্রেমী হৃদয়ে মুহূর্ত্তের জন্য কাহারও প্রতি বিদ্বেষভাব জাগে নাই। গীতার 'অদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ'—এই ভাবটি তাঁহার জীবনে বিকাশলাভ করিয়াছিল।

মহাত্মা গান্ধীর লক্ষ্য ছিল—মোক্ষ আত্মজ্ঞান বা ঈশ্বর-প্রাপ্তি। তিনি রাজনীতিক কার্য্যকলাপকে স্বাধীনতাপ্রাপ্তি-রূপ সাধনমার্গের অংশ বলিয়াই মনে করিতেন। তাঁহার রাজনীতি-সাধনা ঈশ্বরের সহিত যোগেরই সাধনা। তিনি এই সাধনার শক্তি হিন্দুসংস্কৃতি হইতেই লাভ করিয়াছিলেন। কারণ, হিন্দুর ধর্ম্মনীতি রাজনীতি সমাজনীতি শিল্প কলা প্রভৃতি উক্ত লক্ষ্যেই পরিচালিত করে।

মহাত্মা গান্ধীর ধর্ম্মনিষ্ঠা এতই দৃঢ় ছিল যে, তিনি ভারতের স্বাধীনতার বাসনাও ছাড়িয়া দিতেন, যদি তাহা অহিংসার পথে লব্ধ না হইত। বস্তুতঃ সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত রাজনীতি ও অহিংসার উপর প্রতিষ্ঠিত রণনীতির কৌশল তিনি জগৎকে শ্রেষ্ঠ উপহাররূপে প্রদান করিয়া গিয়াছেন।

হিন্দুধর্ম্মের উপর মহাত্মাজীর যে ঐকান্তিক নিষ্ঠা ছিল, তাহা তাঁহার লেখার মধ্য দিয়াও প্রমাণিত হয়। তিনি ১৯২০ খৃষ্টাব্দের ২৯শে সেপ্টেম্বরের 'ইয়ং-ইণ্ডিয়া'-পত্রিকায় লিখিয়াছিলেন—"আমি নিজেকে সনাতনী হিন্দু বলি, কেন না—

(১) আমি বেদ উপনিষদ্ পুরাণ ও অন্যান্য ধর্ম্মগ্রন্থ মানি।

(২) আমি বর্ণাশ্রমধর্ম্মে বিশ্বাসী।

(৩) গোরক্ষারূপ ধর্ম্মের উপরও আমার বিশ্বাস আছে।

(৪) মূর্ত্তিপূজায়ও আমি অবিশ্বাসী নহি।"

মহাত্মা গান্ধী পূর্ব্বজন্মের সংস্কার ও আনুবংশিক সংস্কার মানিতেন। তিনি বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মকে মানবজাতির 'সহজধর্ম্ম' বলিয়া স্বীকার করিতেন। তিনি বলিতেন, "যদি এই সহজধর্ম্ম ঠিক ঠিক পালিত হয়, তবে সামাজিক উপদ্রব পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষপূর্ণ প্রতিদ্বন্দ্বিতা, যুদ্ধের জন্য সাজ সাজ রব, সহজেই প্রশমিত হইয়া যাইবে।"

মহাত্মাজী আধুনিক সমাজতন্ত্রবাদ ও সাম্যবাদের পক্ষপাতী ছিলেন না। তিনি ছিলেন ধর্ম্মবাদ ঈশ্বরবাদ ও হিন্দুসংস্কৃতির পরম্পরাবাদের পক্ষপাতী। গান্ধীবাদ হিন্দুসংস্কৃতিরই অনুকূল। হিন্দুসংস্কৃতিই গান্ধীবাদের মূল প্রেরণাশক্তি। কিন্তু তাই বলিয়া তিনি আধুনিক সমাজতন্ত্রবাদী, সাম্যবাদীদিগকে ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন না এবং তাঁহারাও তাঁহার মতের প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন ছিলেন।

তিনি ঈশ্বরের প্রেরণা ভিন্ন কোনও কাজ করিতেন না। 'নির্বলের বল রাম', ইহা তিনি নিজ হৃদয়ে অনুভব করিতেন। তিনি চাহিতেন যে, সমগ্র জগৎ ঈশ্বরাভিমুখী হউক। এইজন্য তিনি সমস্ত উদ্যোগ আন্দোলন ও উপবাসাদি ঈশ্বরের প্রতি প্রার্থনাপূর্ব্বক আরম্ভ করিতেন। ঈশ্বর-প্রার্থনা তাঁহার মহান্ আশ্রয় ছিল।

তিনি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাকে মাতৃস্বরূপিণী মনে করিতেন। তিনি বলিতেন, "আমার জন্মদাত্রী পার্থিব মাতা ত দেহান্তর-প্রাপ্ত হইয়াছেন, কিন্তু শাশ্বতী মাতা—গীতা সেইস্থান পূর্ণ করিয়াছেন।" যখন তিনি কোন দুঃখ বা বিপদের সম্মুখীন হইতেন, তখন গীতাকেই আশ্রয়-স্বরূপ মনে করিতেন। যদিও সকল সদ্গ্রন্থের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা ছিল, তথাপি গীতা ছিল তাঁহার নিকট ইষ্টদেবতাস্বরূপ। ভগবন্নামের মধ্যে রামনাম তাঁহার ইষ্টমন্ত্র ছিল। 'রঘুপতি রাঘব রাজা রাম, পতিতপাবন সীতারাম'—এই গানই তাঁহার নিকট সমধিক প্রিয় ছিল—যদিও তুলসীদাস মীরাবাঈ নরসিং মেহ্তা প্রভৃতির ভজনও তাঁহার প্রার্থনা-সময়ে গীত হইত। মহাত্মা গান্ধীর প্রভাবেই আজ-কাল ভারতীয় আকাশবাণীর সকল ষ্টেশনেই রামধুন্ ও সাধুসন্তদের ভজনাবলী শুনিতে পাওয়া যায়।

পূর্ণ বিশ্বাসের সহিত বলা যাইতে পারে যে, ভারতের রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার জন্মদাতা মহাত্মা গান্ধীর রামরাজ্য আধ্যাত্মিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এবং ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতীক। ভারতের ঋষি ও মহাপুরুষগণ ভারতকে যে শিক্ষা দিয়াছেন, মহাত্মা গান্ধীর পরম্পরাক্রমে তাহাই শিক্ষা। সকল দেশের ও সকল যুগের মহাপুরুষগণও এবংবিধ উপদেশের সমর্থক। যদিও মহাত্মাজীর লোকপ্রিয়তা, দিগন্তপ্রসারী কীর্ত্তি ভারতের রাজনীতিক সংগ্রামের জন্য, তথাপি তিনি যে সত্যের অনুসন্ধান করিয়াছেন, তাহা ভারতের প্রাচীন আধ্যাত্মিক সংস্কৃতিরই অনুরূপ। তাঁহার সত্য ছিল 'রাম'-নাম এবং 'রাম'-নাম ছিল তাঁহার সত্য। রামরাজ্যে যে ন্যায় সমত্ব প্রভৃতি দৈবী সম্পৎ প্রতিষ্ঠিত ছিল, তাহাতে মুগ্ধ হইয়াই তিনি স্বীয় ভাবনাময় আদর্শরাজ্যকে রামরাজ্য বলিতেন। আধুনিক রাজনৈতিক ক্ষেত্রের প্রধান প্রধান কর্ম্মিগণ ন্যায় সমতাদি গুণসমূহের প্রশংসা করিলেও তাঁহাদের অনেকেরই দৃষ্টিকোণ আধ্যাত্মিকভাবরহিত ও ধর্ম্মনিরপেক্ষ। কিন্তু মহাত্মা গান্ধীর দৃষ্টিকোণ ছিল আধ্যাত্মিক। সকল কাজই তিনি পরমসত্য-স্বরূপ শ্রীরামকে অর্পণ করিতেন। রামের জন্যই তিনি জীবিত ছিলেন এবং তাঁহার অন্তিম শব্দও—'হে রাম

হে রাম' ছিল। তাঁহার সমাজবাদও আধ্যাত্মিক ছিল। সমাজবাদ ও নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ তাঁহার পূর্ব্বেও কোন না কোন প্রকারে বর্ত্তমান ছিল, কিন্তু মহাত্মাজী তাহার উপর আধ্যাত্মিকতার ছাপ দিয়া উহাকে ভারতীয় করিয়াছিলেন।

মোটের উপর বলা যায়, মহাত্মা গান্ধীর জীবন হিন্দুসংস্কৃতির অনুরূপ জীবনের একটি বিশিষ্ট দৃষ্টান্ত। হিন্দুসংস্কৃতির অনুশাসন—জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত ধর্ম্মাচরণ এবং মানবজীবনের প্রধান লক্ষ্য ভগবৎ-প্রাপ্তি। মহাত্মাজীর জীবনে উহাই পরম ধ্যেয় ছিল। সেই পরমধ্যেয়ের বাচক প্রণব (ওঁ) বা 'রাম'। এইজন্য সমগ্র জীবন ধরিয়া তিনি রামনাম করিয়া গিয়াছেন এবং 'হে রাম' বলিয়াই প্রাণত্যাগ করিয়াছেন।

মহাত্মা গান্ধী চলিয়া গিয়াছেন। মুখ্যতঃ তিনি দেশকে রামরাজ্যরূপে স্থাপিত দেখিতে চাহিয়াছিলেন। স্বাধীনতা মিলিয়াছে বটে, কিন্তু রামরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। তাঁহার স্মৃতি অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইলে রামরাজ্য-স্থাপনের দিকেই ভারতরাষ্ট্রের লক্ষ্য হওয়া উচিত। ইহা বলা যাইতে পারে, হিন্দুসংস্কৃতির ধারক ও বাহক মহাত্মা গান্ধীর পন্থা অনুসরণ করিলে ভারতে রামরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইবে—দেশে সুখ ও সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পাইবে এবং সমগ্র জগৎ ভারতের রামরাজ্যের আদর্শ অনুসরণ ও অনুকরণ করিয়া ধন্য হইবে।

---

# 'ভালবাসি আমি এই পৃথিবীরে'

শ্রীশান্তশীল দাশ

আজো ভালবাসি আমি এই পৃথিবীরে,
　　আজো গাই জীবনের গান ;
জানি ঘিরে আছে তারে গভীর তিমিরে,
　　বিভা তার হয়ে গেছে ম্লান।
শুনি ক্রন্দনধ্বনি ওঠে দিকে দিকে
　　বেদনার ব্যাকুল নিশ্বাস ;
চারিধারে হতাশার বাণী যায় লিখে,
　　জীবনের মেলে না আভাস।

সে আঘাত বারে বারে বুকে এসে লাগে,
　　বেদনায় ঝরে আঁখিজল ;
তবু বাঁধি ধরণীরে নিবিড় অনুরাগে,
　　আঘাতে হই না চঞ্চল।

দূর আকাশের পানে চেয়ে থাকি একা,
　　চেয়ে দেখি কতরূপ তার ;
কখন উজল আলো, জোছনার রেখা,
　　কখন বা অমার আঁধার।

আজিকার এ-পৃথিবী নীলাকাশ-সম
　　ঘিরে আছে ক্ষণিকের মেঘে,
সরে যাবে এ তিমির এই সত্য মম
　　অন্তরে আছে সদা জেগে।
ভালবাসি তাই আমি এই পৃথিবীরে,
　　গাহি তাই জীবনের গান ;
যদিও এ ঘিরে আছে গভীর তিমিরে,
　　জানি তার হবে অবসান।

---

# ভারতের লুপ্তপ্রায় কয়েকটি আদিবাসী

শ্রীগোপীনাথ সেন

ভারতে দুই কোটি পঞ্চাশ লক্ষ আদিম জাতি বাস করে। এই সংখ্যা নিতান্ত অল্প নয়। তারা ভারতের সন্তানরূপে যাতে পূর্ণ অধিকার লাভ করতে পারে তার দিকে প্রত্যেক শিক্ষিত ভারতবাসীর মনযোগ দেওয়া উচিত। কিছুদিন পূর্ব্বে ভারত-মহাজাতি-মণ্ডলীর প্রথম অধিবেশনে পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন রাজ্যপাল ডক্টর কৈলাসনাথ কাটজু মহোদয় বলেছিলেন—"The Adibasis should mingle with us not in terms of inferiority or superiority but as one of us." এই চিরস্বাধীনতা-আকাঙ্ক্ষী সরলপ্রাণ আদিম অধিবাসিগণ নিজেদের ভেতরে সদা উন্মুক্ত সভ্যতা ও সংস্কৃতি রক্ষা করে চলেছে; তাদের পূর্ণস্বাধীন ভারতবর্ষে বিশিষ্ট স্থান রচনা করতে হবে। কিছুকাল থেকে শিক্ষিত ভদ্রসম্প্রদায় ব্যবসা ও অন্যান্য কাজের জন্য যাদের সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ পেয়েছে, তাদের মধ্যে সাঁওতাল, ওরাওঁ, গণ্ড, কোল, ভিল, মুণ্ডা, নাগা ইত্যাদি। যাদের সঙ্গে আমাদের পরিচিত হবার সুযোগ কম হয়েছে তাদের মধ্যে কয়েকটির কথা এখানে অবতারণা করছি। এখনও পর্য্যন্ত বহু আদিম অধিবাসী সুদূর দুর্গম এবং অন্ধকারাচ্ছন্ন বনে জঙ্গলে রয়েছে, তাদের সঙ্গে পরিচয়লাভ করবার সুযোগ হয়নি। তবে তাদের সামান্য ইতিহাস পেলে অনেকে অনুসন্ধানের সুবিধা করে নিতে পারবেন।

বঙ্গদেশ বিভক্ত হবার পর আমাদের বহু আদিবাসী ভাইদের হারাতে হয়েছে—যেমন চমকা দামাই সকি সুমুয়ার ইত্যাদি। তবুও পশ্চিমবঙ্গে প্রধান আদিবাসীদের মধ্যে লেপচা মেচ ম্‌ মুণ্ডা সাঁওতাল এবং ভুটিয়া রয়েছে। এরা কেউই সংখ্যালঘু নয়। সংখ্যালঘু আদিবাসীদের মধ্যে টোটোদের কথা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। জলপাইগুড়ির দুর্গম পল্লীতে মাত্র তিনশ জন টোটো বাস করে। তাদের পল্লীর ভেতর এখনও সভ্যতার আলো পৌঁছয়নি। তারা আদিমযুগের মত বনের ফলমূল খেয়ে বাঘভালুকের সঙ্গে বাস করছে। কিন্তু এদের সমাজজীবনের ছবি দেখে মনে হয় এক সময় উন্নত ধরনের সভ্যতা তাদের ছিল। নির্ম্মম কালের কষাঘাতে তারা আজ জীবন্মৃত। এরা এক জন দলপতির অধীনে জীবনযাত্রা পরিচালন করে। তাদের ভাষার তিব্বতী বা চীনা ভাষার সঙ্গে বিশেষ মিল আছে মনে হয়। এই জাতি হয়ত কিছুদিন পরে লুপ্ত হয়ে যাবে। টোটোপাড়ায় কুটিরে কুটিরে কুষ্ঠের মত রোগ প্রতিটি লোককে আক্রমণ করছে, আর তাদের আর্ত্তনাদে শোনা যায় 'আমরা তোমাদের পরিজন, আমাদের বাঁচাও'।

ভারতের ভিতরে সবচেয়ে বেশী আদিবাসীদের বাস আসাম-রাজ্যে। সেখানে বিখ্যাত নাগা কুকি লাখেয়ার মিশমি এবং সাঁওতাল শ্রেণীর বাস। এ ছাড়া রাভা নামে একটি সংখ্যাল্প আদিবাসী দেখা যায়। তারা বেঁটে, দেহ বলিষ্ঠ, চোখ দুটি ছোট, মাথার চুল শক্ত, আর রঙ একেবারে কালো। তাদের দেখলে

মনে হয়, গারোজাতিদের সঙ্গে বিশেষ মিল আছে। রাভাদের স্ত্রীলোকরা বাড়ীর সর্ব্বময়-কর্ত্রী, পুরুষের কথা বলবার সেখানে কোন উপায় নেই। কন্যারা পৈত্রিক সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হয়। পুরুষের বিবাহ হলে তাকে অর্থাৎ বরকে কনের বাড়ীতে ঘর করতে যেতে হয়। রাভাদের সমাজ কেবল মেয়েদের কর্তৃত্বের ওপর প্রতিষ্ঠিত। এমন কি যদি কোন স্ত্রীলোক পুরুষকে চপেটা-ঘাত করে তাকে মুখ বুজে হজম করে যেতে হয়। পোষা কুকুরের মত বাড়ী পাহারা দেওয়া ছাড়া পুরুষের অন্য কোন কাজ নেই। কারণ রাভা মেয়েরা তাঁত চালিয়ে আর ধান ভেনে দু'পয়সা রোজগার করে পুরুষদের খাওয়ায়।

রাভা মেয়েরা খুব কর্ম্মপটু ও তাঁত চালাতে সিদ্ধহস্ত। এমন কি তাঁতের সাহায্য ছাড়াও তারা হাতে কাপড় বুনতে পারে। এ কাপড়-বোনা অত্যন্ত অদ্ভুত ধরনের। পোড়েন সুতোটি নিজের কোমরে জড়িয়ে আর টানা সুতো গাছে বেঁধে কাপড় বুনে যায়। এছাড়া ধান-চাষের কাজ, পশুপালন ইত্যাদি গৃহকার্য্য করে থাকে। তারা কাজের মধ্যে ডুবে থাকলেও দেবদেবীর আরাধনা ভুলে না। তাদের বন্যদেবী মহামায়া এবং দেবতা সন্ন্যাসী ঠাকুর সকলের অন্তরে অধিষ্ঠিত হয়ে আছেন।

রাভা আদিবাসীদের আচার ও অনুষ্ঠান কিছুটা হিন্দুদের মত। বিবাহের পরে মেয়েরা সিঁথিতে সিঁদুর দেয় ও হাতে শাঁখা পরে। তাদের পুরুতঠাকুর বিবাহকার্য্যে পৌরোহিত্য করে। তারা মৃতদেহকে সমাধি দেয় এবং তের দিন অশৌচ পালন করে।

উড়িষ্যার লুপ্তপ্রায় জাতি কয়া আজও যেন আদিবাসীদের যাদুঘরে নিজেদের রক্ষা করে আসছে। গোদাবরী জেলার সন্নিকটে কোরাপুত জেলায় তাদের বাস। এরা কাপড় বুনতে বা চাষবাস করতে জানে না। পুরুষ ও মেয়েরা নগ্ন অবস্থায় থাকে। শীতকালে চট কিংবা গাছের ছাল গায়ে জড়িয়ে কোন রকমে ঠাণ্ডা থেকে নিজেদের রক্ষা করে। কয়াদের সমাজ-জীবন স্বাতন্ত্র্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত। যখন কোন যুবকের বিবাহ হয় সে তার স্ত্রীকে নিয়ে স্বতন্ত্র কুটির তৈরী করে, কিন্তু বাপমায়ের কাছ থেকে আলাদা হয়ে যায় না।

যখন কয়াপরিবার-ভুক্ত কোন ব্যক্তির মৃত্যু হয়, তখন সেই গৃহের গৃহস্বামী ছাতের ওপর উঠে ঢোল বাজিয়ে সকলকে সমবেত হবার জন্য আহ্বান জানায়। সকলে সমবেত হলে মৃতদেহকে নিয়ে জঙ্গলে কোন স্থানে সমাধি দিয়ে তার স্মরণার্থ ক্রুশের মত দুটি কাঠ পুঁতে রাখে। তাদের বিশ্বাস সে স্থানটিতে মৃতের আত্মা শান্তিতে বাস করে। তারা প্রতিদিন সেখানে এসে পূজো দেয়। তাদের ধারণা যদি মৃত ব্যক্তিদের আত্মাকে সন্তুষ্ট না করা যায়, তাহলে বংশের ক্ষতি হতে পারে।

প্রতিবছর কয়ারা অদ্ভুত একটি রোগে লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। তারা এ রোগটিকে কয়া রোগ বলে। নৃতত্ত্ববিদ্ ও চিকিৎসক যাঁরা এখানে গিয়েছেন, তাঁরা বলেন এ রোগটি হয়ত সিফিলিস্ হতে পারে। কিন্তু বিনা চিকিৎসায় কয়াদের বংশ ক্রমশঃ কমে আসছে। এদের চিকিৎসা শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের দিকে জনহিতকর প্রতিষ্ঠানসমূহের দৃষ্টি দেওয়া একান্ত প্রয়োজন।

অন্যান্য লুপ্তপ্রায় আদিবাসীদের মধ্যে দক্ষিণ ভারতের টোডোর নাম উল্লেখযোগ্য। এরাও বাংলার টোটোর মত নিশ্চিহ্ন হতে বসেছে। আদমসুমারীতে দেখা যায় তাদের সংখ্যা মাত্র ৬৩০০-এ ঠেকেছে। নীলগিরি পাহাড়ে এই ক্ষুদ্রজাতির বাস। টোডোরা খৃষ্টপূর্ব্ব যুগ থেকে যে বৃহত্তর জাতি ছিল,

তা ইতিহাস এখনও প্রমাণ দেয়। উনবিংশ শতাব্দীর গোড়া থেকেই তাদের ধ্বংস আরম্ভ হয়েছে। টোডোদের পূর্ব্বগৌরবরঞ্জিত দিনগুলি এখনও তাদের গ্রামগুলিতে দেখা যায়। তাদের কাঠ খোদাই-এর কাজ, লোককথা, গাথা, কবিতা ও কৃষিকাজ তাদের প্রাচীন কৃষ্টির পরিচয় দেয়। তারা যেন মহেন-জো-দারো ও হরপ্পার মত অতীত দিনের গৌরবের কথা বলতে থাকে। আমরা এই জীবন্ত ইতিহাস থেকে ইতিহাসের বহু মালমশলা সংগ্রহ করতে পারব।

এখানে কয়েকটি লুপ্তপ্রায় আদিবাসীর সামান্ত পরিচয় দিলাম। বহু আদিবাসী নানাদিকে ছড়িয়ে আছে। তাদের প্রতি আমাদের সরকার ও জনহিতকর প্রতিষ্ঠানসমূহের দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে দিল্লীতে শ্রীএ ভি ঠক্কর-প্রতিষ্ঠিত ভারতীয়-আদিবাসি-সেবকসঙ্ঘ সারা ভারতবর্ষে আদিবাসীদের মধ্যে নানা হিতকর কাজ করছেন। কলিকাতায় সেইরূপ একটি প্রতিষ্ঠান 'ভারত-মহাজাতিমণ্ডলী'-নামে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তাঁরা পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থানে আদিবাসী ও অনুন্নত শ্রেণীর সেবায় নিরত। ভারতীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতিকে পুনর্জীবিত করতে হলে আমাদের তরুণ-সম্প্রদায়ের প্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্য—গ্রামে পাহাড়ে ও জঙ্গলে গিয়ে মিশনারীর মত একাগ্রচিত্তে তাদের শিক্ষা স্বাস্থ্য প্রভৃতি বিষয়ে জ্ঞান দান করা।

---

# বেলুড় মন্দির

শ্রীউপেন্দ্র রাহা

বিরাজিছ ধ্যানমগ্ন ধূর্জটির প্রায়
নভস্পর্শী শিরে হেথা মৌন অবিচল,
রবি-চন্দ্র-করে দীপ্ত দিবস-নিশায়
পুরোভাগে ভাগীরথী বহে কল-কল।

শিল্পীর সুন্দর সৃষ্টি—পুণ্য-নিকেতন,
অঙ্গে অঙ্গে বিকশিত ভাস্কর্য্য সৌষ্ঠব,
শ্রীরামকৃষ্ণে করি বক্ষেতে ধারণ
লভিয়াছ তুমি মহাতীর্থের গৌরব।

'যত মত তত পথ' তব বেদীমূলে
মিলিত পরম ঐক্যে, হেথা জগজন
ধর্মভেদ বর্ণভেদ গতিভেদ ভু'লে
সম্ভ্রমে শ্রদ্ধার অর্ঘ্য করিছে অর্পণ।
রামকৃষ্ণ-মহিমার মূর্ত্ত প্রতিরূপ
শ্রীমন্দির নহ শুধু পাষাণের স্তূপ।

# পক্ষিতীর্থ

স্বামী শুদ্ধসত্ত্বানন্দ

মাদ্রাজ শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে প্রকাশন-বিভাগের অফিসে বসে কাজ করছি, এমন সময় শ্রীহেরম্ব মুখোপাধ্যায় এসে বল্লেন, "মহারাজ, এক বন্ধু আমাকে মোটরে করে পক্ষিতীর্থ ও মহাবলীপুরম্ নিয়ে যাচ্ছেন, আপনিও চলুন, বিকেলেই ফিরে আসব।" পক্ষিতীর্থের নাম পূর্ব্বেই শুনেছি, দেখারও বিশেষ আগ্রহ ছিল এবং এইরূপ অযাচিত সুযোগও উপস্থিত। সেদিন ছিল রবিবার, ৬ই জানুয়ারী, ১৯৫২, অফিসেও বিশেষ কাজ ছিল না, কাজেই সানন্দেই যেতে রাজী হলাম। তাড়াতাড়ি স্নান করে তৈরী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মোটর এসে উপস্থিত—এক বিরাট গাড়ী, তাতে আছেন সিম্‌সন কোম্পানীর পরিচালক শ্রীভেঙ্কটরমণ ও তাঁর একটি ছোট ছেলে। আমি ও হেরম্ব বাবু গাড়ীতে গিয়ে উঠলাম, তখন সকাল ১০টা। শুনলাম পক্ষিতীর্থ মাদ্রাজ-শহর হতে চুয়াল্লিশ মাইল। সুন্দর পিচের চওড়া রাস্তা, দুপাশে তেঁতুল গাছের সারি—এক পাশে মাদ্রাজ হতে টাম্বারাম্ পর্য্যন্ত ইলেকট্রিক্ ট্রেন্ অনবরত যাতায়াত করছে, অপরদিকে ধানের ক্ষেত, কিন্তু বৃষ্টি না হওয়ায় ধান বিশেষ হয়নি। শহর হতে ১০ মাইল দূরে মীনাম্বকম্ এরোড্রোমের পাশ দিয়ে আমরা দক্ষিণ দিকে এগিয়ে চল্লাম, দিনটি মেঘাচ্ছন্ন থাকায় গরম মোটেই ছিল না, বরং বেশ আরামদায়ক মনে হচ্ছিল। শীতকালে গরমের কথা শুনে হয়ত আশ্চর্য্য লাগবে, কিন্তু মাদ্রাজে মোটেই শীত নেই, তাপমাত্রা ৭৫° ডিগ্রীর নীচে বিশেষ নামে না। প্রায় ৪৫ মিনিটের মধ্যেই আমরা চিঙ্গলপুট্ শহরে পৌছলাম—এটি চিঙ্গলপুট্ জেলার সদর। মাদ্রাজ হ'তে কন্যাকুমারী পর্য্যন্ত প্রায় ৫৫০ মাইল এক বড় রাস্তা গেছে, এর নাম ট্রাঙ্ক রোড, আমরা এই রাস্তা ধরেই এতক্ষণ এসেছি। চিঙ্গলপুট একটি রেলওয়ে জংসন—এখান হ'তে কাঞ্চীপুরম্ প্রভৃতি স্থানে যাওয়ার ট্রেন পাওয়া যায়। আমরা রেললাইন পার হ'য়ে এখন দক্ষিণপূর্ব্বদিকে যেতে লাগলাম। এখান হতে পক্ষিতীর্থ মাত্র নয় মাইল। দূর হ'তেই পাহাড়ের ওপর মন্দিরের চূড়া দেখতে পেলাম এবং এগারটার একটু পরেই পাহাড়ের পাদদেশে এসে উপস্থিত হলাম। আমি ও হেরম্ব বাবু এই প্রথম এলাম। শ্রীভেঙ্কটরমণ অনেকবার এসেছেন, তিনি এখানে খুব সুপরিচিত। পূর্ব্বেই পুরোহিত ও মন্দিরের পরিচালককে খবর দিয়েছিলেন, তাঁরা এসে আমাদের অভ্যর্থনা করে মন্দিরে উঠ্‌বার জন্য বল্লেন। মন্দিরের পাদদেশে বেশ একটি ছোট শহর—নাম 'তিরুক্কলিকুণ্ড্রম্'। শহরটি দুই মাইল চওড়া ও আড়াই মাইল লম্বা এবং তাতে প্রায় দশহাজার লোকের বাস। এই তীর্থে দূরদূরান্তর থেকে বহুলোক বহুকাল ধরে পক্ষী দেখতে আসে, তাই এই স্থান পক্ষিতীর্থ নামেই বেশী পরিচিত। কেহ কেহ পাহাড়কে মৃত্যু-সঞ্জীবী পর্ব্বতও বলেন, কারণ এখানে এসে ভক্তিভরে শিব ও পক্ষী দর্শন করলে নাকি আর জন্মাতে হয় না।

পাহাড়ের ওপর শিবের মন্দির—শিবের নাম

'বেদগিরি'। কথিত আছে, ব্রহ্মা ইন্দ্র এবং অন্যান্য মুনি-ঋষিরা শিবকে উপদেশ দেওয়ার জন্য অনুরোধ করায় শিব রাজী হলেন। কিন্তু একটু উঁচু যায়গায় না বসলে ত সকলকে দেখা যাবে না। কাজেই তিনি ভাবছেন, এমন সময় ঋক্ সাম ও যজুঃ এই তিনটি বেদ একত্রে পাহাড়ের মূর্ত্তি ধারণ করলেন। অথর্ব্ববেদ বেদী হলেন এবং উহার উপর দেবাদিদেব মহাদেব কদলীপুষ্পের (মোচা) আকার ধারণ করে স্বয়ম্ভু মূর্ত্তিতে বসে উপদেশ দিয়েছিলেন। এখনও মন্দিরে শিব-লিঙ্গের পাশে ঐসব দেবতাদের কারও কারও মূর্ত্তি রয়েছে—মন্দিরের ভেতর অন্ধকার, দাক্ষিণাত্যে প্রায় সব মন্দিরই এইরূপ। পূজারী আলো জ্বেলে যাত্রীদের দর্শনের সুবিধা করে দেন। আমরা মন্দিরে যাওয়ার পরই পুরোহিত বেদগিরিকে কর্পূর আরতি করলেন এবং আমাদের ভস্ম ও চন্দন প্রসাদ দিলেন। একপাশে একটি ছোট কুঠুরীতে দেবীর মূর্ত্তি, দর্শনের পরই আমাদের একটু বসতে বলা হল এবং আমাদের সম্মানার্থ শিঙ্গা ঢোলক ইত্যাদি বাজনা কিছুক্ষণ হল। আমরা প্রণাম করে ও প্রণামী দিয়ে বেরিয়ে এলাম।

পাদদেশ হতে পাহাড়টির উচ্চতা ৫০০ ফুট এবং ৭০০ সিঁড়ি ভেঙ্গে ওপরে উঠতে হয়। তবে বেশ চওড়া ও লম্বা পাথরের সিঁড়ি —মোটা, বৃদ্ধ বা দুর্ব্বল লোক ছাড়া উঠতে কোনও কষ্ট হয় না। ওপরে মন্দিরের একটু নীচে চারদিকে খোলা নাটমন্দির। উহার সামনেই খানিকটা ফাঁকা যায়গা। সেখানে দেখলাম প্রায় ২।৩ শত নরনারী পক্ষি-দর্শনের জন্য অপেক্ষা করছেন। তাঁদের মধ্যে মাদ্রাজী গুজরাটী মাড়োয়ারী বাঙ্গালী ইউরোপীয় প্রভৃতি আছেন। দুইটি পাখী আছে, তারা ওখানে থাকে না—রোজ দুপুর সাড়ে এগারটা হতে বারটার মধ্যে আসে। তখন তাদের খাওয়ান হয়। চাল ঘি গুড় কলা ইত্যাদি দিয়ে এদেশী মিষ্ট পঙ্গলের মত তৈরী করা হয় এবং দুটি বাটি করে উভয় পাখী দুটিকে ভোগ দেওয়া হয়। ঠিক সাড়ে এগারটায় পুরোহিত এলেন—খালি গায়ে, কোমরে চাদর বাঁধা, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা ও বগলে ছাতি, কাল ও বেঁটে চেহারা। বয়স প্রায় ৪৫।৪৬। তিনি এসেই যাত্রীদের সব একটু দূরে সরিয়ে দিলেন ও সকলকে বসতে বল্লেন। যেখানে পক্ষী আসবে সেখানে ভোগ নিয়ে গেলেন এবং কাঠের পিঁড়িতে বসে কিছুক্ষণ প্রার্থনা করে দক্ষিণ দিকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করলেন। স্থানটি বেদগিরির মন্দিরের উত্তর-পূর্ব্বে এবং ২০।২৫ ফুট নীচে। সকলেই আকুল আগ্রহে পক্ষিরূপী দেবতার আগমন প্রতীক্ষা করতে লাগলেন। একটু পরেই দুইটি পক্ষী দক্ষিণদিক হতে এসে পুরোহিতের সামনে বসলে এবং ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে দুটি বাটী হতে দুজনে খেতে লাগল। পুরোহিত নিজেও মধ্যে মধ্যে হাতে করে পক্ষী দুটোকে খাওয়াতে লাগলেন। তারা খুব শান্তভাবে খেতে লাগল, কিছুক্ষণ পরে পাখী দুটি বাটী বদল করে নিল। ৫।৬ মিনিটের মধ্যেই খাওয়া শেষ করে একটু দূরে গিয়ে কয়েক সেকেণ্ড বসে আবার উড়তে আরম্ভ করলে এবং মন্দিরটি কয়েক বার প্রদক্ষিণ করে ধীরে ধীরে অদৃশ্য হয়ে গেল। কেউ কেউ ফটোও তুলে নিলেন। পুরোহিত পাখী দুটির ভুক্তাবশিষ্ট প্রসাদ সকলকে দিলেন। এত লোক, কেউ দাঁড়িয়ে, কেউ বসে, কেউ চলাফেরা করছেন, কেউ ক্যামেরায় ফটো নিচ্ছেন, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় পক্ষিদ্বয় নির্ব্বিকার! খাবার জিনিষ দেখে আশে পাশে কয়েকটি কাক ও চিল ঘোরাঘুরি করতে লাগল,

এতে কিন্তু পাখী দুটির ভ্রূক্ষেপ নেই। যেন স্বমহিমায় বিভোর। পাখী দুটি কতকটা শঙ্খ-চিলের অনুরূপ, তবে একটু বড়। ঠোঁট খুব লম্বা—প্রায় ৪ ইঞ্চি এবং পা ও ঠোঁট হলদে রংএর। পালক প্রায় সাদা, পিঠের ওপর পেছন দিকে কয়েকটি কালো পালক আছে। পা দুটিও বেশ বড়। কোনও স্বর শোনা গেল না। পাখী দুটি রোজ ১১॥০ হতে ১২টার মধ্যে নিয়মিত আসে এবং ঐ একই খাওয়া রোজ খায়। শুনলাম কদাচিৎ একটু আগে আসে এবং মন্দিরের চূড়ায় অপেক্ষা করে। পুরোহিতকে জিজ্ঞাসা করায় বল্লেন যে, তিনি পঁচিশ বছর যাবৎ পাখী দুটির পূজা ও ভোগ দিচ্ছেন। তাঁর পিতা, পিতামহ প্রভৃতিও ঐ পাখী-দেরই পূজা করতেন। আমাদের মঠের একজন স্বামীজী একবার নাকি তিনটি পাখীকে আসতে দেখেছিলেন—আমরা অবশ্য দুটিই দেখলাম। প্রসাদ-বিতরণের পর ধীরে ধীরে যাত্রীরা চলে যেতে লাগলেন। নামবার পথ আলাদা। আমরা তখন পুরোহিত মহাশয়ের কাছে পক্ষীদের বিষয় জানতে চাইলাম এবং ওরা কোথায় থাকে ও কোথা হতে আসে জিজ্ঞাসা করলাম। উত্তরে তিনি বল্লেন, 'পক্ষী দুটি থাকে চিদম্বরমে (দাক্ষিণাত্যে একটি বিখ্যাত তীর্থস্থান, মাদ্রাজ হতে প্রায় ১২০ মাইল; এখানে নটরাজের মন্দির খুব বিখ্যাত)। রোজ সকালে পক্ষিদ্বয় গঙ্গাস্নান-উদ্দেশ্যে যায় কাশীতে। সেখান হতে তীর্থদর্শন-মানসে আসে রামেশ্বরে, অতঃপর ভোজনের জন্য আসে পক্ষিতীর্থে। এই তাদের নিত্য কার্য্য-সূচী।'

স্কন্দপুরাণ ও লিঙ্গপুরাণে এই পক্ষিতীর্থের মাহাত্ম্য বর্ণিত আছে। পূর্ব্বেই বলেছি মন্দিরে শিবের নাম বেদগিরি এবং পাহাড়টির নাম বেদাচল। শিবের প্রধান অনুচর নন্দী কোনও সময় শিবাপরাধ করায় উহা ক্ষালনের জন্য এই বেদাচলে বহু বৎসর তপস্যা করেন। কথিত আছে কোনও সময়ে ব্রহ্মার আট জন মানস-পুত্র সারূপ্য-মুক্তি লাভের জন্য মহাদেবের কঠোর তপস্যা করেন। তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়ে শিব তাঁদের দর্শন দিয়ে জিজ্ঞাসা করেন—'তোমরা কি চাও?' উত্তরে তাঁরা বল্লেন, 'আমরা সাযুজ্য-মুক্তি চাই', অথচ সারূপ্য-মুক্তিই ছিল তাঁদের কাম্য। ভগবানের সামনে মনমুখের বৈষম্য দেখে শিবের অত্যন্ত ক্রোধ হয়। তিনি বলেন, 'তোমরা প্রথমে সারূপ্য-পদবী চেয়ে এখন আবার সাযুজ্য-পদবী চাচ্ছ। এতে তোমাদের শিবদ্রোহ করা হয়েছে। এই অপরাধে তোমরা পক্ষী হয়ে যাও এবং ইতস্ততঃ ঘুরতে থাক'। এই অভিশাপে অতিমাত্রায় ভীত হয়ে তাঁরা পদতলে পড়ে করুণ প্রার্থনা জানান এবং অজ্ঞতাবশতঃ এইরূপ অপরাধের জন্য বারংবার ক্ষমা ভিক্ষা করেন। ক্রোধ উপশান্ত হলে শিব তাঁদের বলেন, 'আমার বাক্য কখনও বৃথা হতে পারে না। পক্ষিরূপ তোমাদের হবেই, তবে এই বর দিচ্ছি যে সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি এই চার যুগের প্রত্যেক যুগের অন্তে তোমরা দু'জন করে মুক্ত হয়ে যাবে এবং তোমাদের পূর্ব্ব-প্রার্থিত সারূপ্য-পদবীও লাভ করবে।'

শিবের এই বাক্য-অনুসারে সত্যযুগে সাম্মলী-দেশের বৃদ্ধশ্রবের চণ্ড ও প্রচণ্ড নামে পক্ষি-রূপী দুই পুত্র জন্মগ্রহণ করে এবং এই পক্ষিতীর্থে এসে তারা কঠোর তপস্যা ও সত্যযুগান্তে সারূপ্য-মুক্তি লাভ করে। ত্রেতাযুগেও অপর দুজন শম্পাতী ও জটায়ুরূপে জন্মগ্রহণ করে এবং যুগাবসানে মুক্ত হয়।

দ্বাপর-যুগে গুপ্ত ও মহাগুপ্ত নামে দুই মুনির মধ্যে ঝগড়া হয়—শিব বড় না শক্তি বড় এই নিয়ে। ওঁরা তখন তপস্যা করেন, ফলে শিব প্রসন্ন হয়ে দর্শন দেন ও বলেন 'শিব ও শক্তি ভিন্ন নয়—দুয়ে এক।' কিন্তু শিবের কথায় ওঁদের বিশ্বাস না হওয়ায় শিবের অভিশাপে তাঁরা পক্ষিরূপ প্রাপ্ত হন। অবশেষে তাঁরই নির্দ্দেশে পক্ষিতীর্থে এসে কঠোর তপস্যা সুরু করেন এবং দ্বাপরযুগের শেষে উভয়েই মুক্ত হয়ে যান। কলিযুগের প্রারম্ভে পুষা ও বিধাতা নামে দুই ঋষি শিবের তপস্যা করেন এবং শিব খুশী হয়ে তাঁদের সারূপ্য-মুক্তি দেন—কিন্তু এতে তাঁরা সন্তুষ্ট না হয়ে সাযুজ্য মুক্তি চান। শিব ক্রোধে তাঁদের পক্ষী হয়ে যেতে বলেন। নিজেদের অপরাধ বুঝতে পেরে ওঁরা উহা মোচনের জন্ম এখন পর্য্যন্ত রোজ গঙ্গাস্নান, রামেশ্বর-দর্শন ও পক্ষিতীর্থে আগমন করেন। শিবের বরে কলি-যুগের শেষে ওঁরা মুক্ত হয়ে যাবেন—এইরূপ অনেকের বিশ্বাস।

প্রতি চৈত্রমাসে এখানে খুব বড় মেলা হয়। মাদ্রাজ হতে ট্রেনে চিঙ্গলপুট পর্য্যন্ত এসে ওখান হতে বাসে পক্ষিতীর্থে যেতে হয়। ভাড়া দু' টাকার মধ্যে। প্রতি রবিবারে মাদ্রাজ শহর হতে সরকারী বাস ছাড়ে—উহা এগারটা নাগাদ পক্ষিতীর্থে পৌছয়। ওখানে পক্ষিদর্শনানন্তর ঐ বাসযাত্রীদের নিয়ে দশ মাইল দূরে মহাবলী-পুরম্-এ যায়। সেখানে দর্শনাদি হয়ে গেলে আবার সন্ধ্যায় মাদ্রাজ পৌছিয়ে দেয়।

কথিত আছে যে পক্ষিতীর্থে শিবদর্শন করলে কৈলাস-দর্শনের ফল হয়। একবার শিব নন্দীকে বলেন যে, কৈলাসের তিনটি শিখর নিয়ে পৃথিবীর তিন স্থানে রাখ যাতে করে পৃথিবীর লোকের কৈলাস-দর্শনের সুবিধা হয়। তদনুযায়ী নন্দী কৈলাস হতে তিনটি শিখর নিয়ে একটিকে উত্তরে মল্লিকার্জ্জুনপুরে, দ্বিতীয়টিকে কালহস্তীতে এবং তৃতীয় শিখরটি পক্ষিতীর্থে স্থাপন করেন। ইহার কোনও একটি দর্শন করলেই নাকি কৈলাস-দর্শনের ফল হয়। পক্ষিতীর্থের কাছেই শঙ্খতীর্থ-নামে একটি ক্ষুদ্র কুণ্ড আছে। উহাতে স্নান করে শিবের স্মরণ করতে করতে বেদাচল প্রদক্ষিণপূর্বক শিব ও পক্ষী দর্শন করলে সব পাপ হতে বিমুক্ত হয়ে দর্শক সাযুজ্য-পদবী প্রাপ্ত হন। ইহার আশে-পাশে আরও কতকগুলি তীর্থস্থান আছে, তন্মধ্যে নিম্নোক্ত বারটি প্রসিদ্ধ। পাশে শঙ্খতীর্থ, পূর্ব্বদিকে ইন্দ্রতীর্থ, অগ্নিকোণে শম্ভু, রুদ্র, কোটীতীর্থ, দক্ষিণে বশিষ্ঠতীর্থ, নৈর্ঋতে অগস্ত্য, মার্কণ্ডেয় ও বিশ্বামিত্রতীর্থ, পশ্চিমে নন্দী ও বরুণতীর্থ এবং উত্তর-পশ্চিমে অকলিকা তীর্থ বিদ্যমান। পাহাড়ের উপর সম্ভাবতীর্থ। ইহাদের মধ্যে শঙ্খতীর্থে প্রতি বার বছর অন্তর এক-প্রকার নূতন শঙ্খ উৎপন্ন হয় এবং ওখানে পুষ্কর-উৎসব প্রতিপালিত হয়।

পক্ষিতীর্থ হতে আমরা গেলাম দশ মাইল দূরে মহাবলীপুরম্ দর্শন করতে। এটি খুব পুরাতন ইতিহাসপ্রসিদ্ধ যায়গা। চোল রাজারা এখানে রাজত্ব করতেন। একেবারে সমুদ্রের ধারে ছোট শহরটি অবস্থিত—প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি মনোরম। এই যায়গাটিকে 'সপ্ত প্যাগোডার দেশ' বলা হয়—পূর্ব্বে নাকি সাতটি সুন্দর প্যাগোডা এখানে ছিল—তন্মধ্যে ছয়টি সমুদ্রগর্ভে গেছে—এখন একটিমাত্র বর্ত্তমান। সমুদ্র উহাকেও গ্রাস করতে উদ্যত। প্যাগোডাটি খুবই পুরাতন—এক কোণে বিষ্ণুর অনন্তশয়ন-মূর্ত্তি রয়েছে। ভেতরে ভীষণ অন্ধকার। প্যাগোডার একদিকের দেওয়ালে সমুদ্রের ঢেউ এসে অনবরত আঘাত করছে—অনেকবারই উহা ভাল করে গাঁথা হয়েছিল, কিন্তু প্রতিবারেই মানুষের ক্ষমতা কত তুচ্ছ তাই

প্রমাণিত হয়েছে। মহাবলীপুরম্‌-এ দর্শনীয় বস্তু পাহাড়ের গায়ে কারুকার্য্য। ভারতবর্ষের উত্তরে যেমন হিমালয় ভারতবর্ষকে তাঁর পক্ষপুট দিয়ে আশ্রয় দিয়ে রেখেছেন, মহাবলীপুরম্‌-এরও উত্তর সীমায় পূর্ব্ব-পশ্চিমে লম্বা এক পাহাড় গ্রামটিকে যেন ঢেকে রেখেছে। পাহাড়ের ওপর কোনও গাছপালা বিশেষ নেই--কেবল পাথরের সারি। উহারই অনেকস্থানে খোদাই করে ঘর ও গুহা করা হয়েছে এবং পাহাড়ের গায়ে কোথাও শ্রীকৃষ্ণের লীলার নানারূপ চিত্র অঙ্কিত, কোথাও বা মুনি-ঋষির মূর্ত্তি খোদিত রয়েছে, এইসব দেখা যায়। অধিকাংশ স্থানেই একখানি মাত্র পাথর কেটে তার মধ্যে ঘর মূর্ত্তি স্তম্ভ ইত্যাদি খোদাই করা হয়েছে। অনেক যায়গায় সরকারের তরফ হতে সাইনবোর্ড টাঙ্গান হয়েছে এবং কোথাকার কি বিশেষত্ব, কোন্‌ দেবতা কোথায় আছেন, কখন খোদাই করা হয়েছে—এসব লেখা আছে। অধিকাংশই খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে খোদাই করা হয়েছিল। প্রায় দেড় হাজার বছরের পুরাতন হলেও এখনও মূর্ত্তিগুলি অবিকৃত অবস্থায় রয়েছে। এককালে এইস্থান শিল্পকলায় খুব সমৃদ্ধ ছিল। তার ভূরি ভূরি চিহ্ন বর্ত্তমান রয়েছে। বহু দর্শক এই স্থানে আসেন। পাহাড়ের পাশেই খুব পুরাতন বিষ্ণুমন্দির—এখন ভগ্নদশা-প্রাপ্ত হলেও এককালে যে ইহা খুব প্রসিদ্ধ এবং দর্শনীয় ছিল তার পরিচয় পাওয়া যায়। নিয়মিত পূজাদি এখনও হয়। পাহাড়ের উপর সম্প্রতি একটি বাতিঘর নির্ম্মিত হয়েছে। দর্শনাদি শেষ করে আবার পক্ষিতীর্থের পাশ দিয়ে আমরা মনভরা আনন্দ ও প্রশান্তি নিয়ে বিকালে মাদ্রাজে ফিরে এলাম।

---

# দেহ-মন্দির

শ্রীশশিভূষণ ভট্টাচার্য্য

এই মোর দেহখানি একি মিথ্যা একি ছায়া—
ক্ষিতি, অপ্‌, তেজ, ব্যোমে পঞ্চভূতে রচিয়াছে মায়া,
শুধু দু'দিনের তরে? ধরণীর বুকে এলো ভাসি'
কালের বিচিত্র পথে এতটুকু উচ্ছ্বসিত হাসি
সার্থকতা নাহি তার? তবে কেন দেহে জাগে প্রাণ,
কেন পরিপূর্ণতার অহোরাত্র করিছে সন্ধান
দেহ হ'তে দেহান্তরে, দেহাতীত আত্মা অবিরত
কোন মহাসাধনায় আপনায় খুঁজিছে সতত?

যুগে যুগে যুগান্তরে—দেহে মোর লীলা অবিরাম
সাবলীল মহিমার হিল্লোলিত আনন্দের গান,
উদ্বেলিত তরঙ্গের কলনাদে, মুখরিত করি
রূপ কী সে অপরূপ দুনয়নে তুলিতেছে ধরি
তাই দেহ দেহ নয় সে যে প্রভু তোমার মন্দির,
ধ্বনিতেছে সেথা তব নূপুরের মধুর মঞ্জীর।

---

# ভগিনী নিবেদিতা *

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

১৯০২ খৃষ্টাব্দের শেষ ভাগ হইতে ১৯১১ খৃষ্টাব্দের শেষার্ধ পর্যন্ত কাল ভারতীয়দিগের সেবাব্রতে ব্রতী এক য়ুরোপীয়া সন্ন্যাসিনীকে সকলেই শ্রদ্ধা করিতেন ও ভালবাসিতেন। তাঁহার পরিধানে গৈরিক বেশ—কণ্ঠে রুদ্রাক্ষের মালা। মাত্র ৪৪ বৎসর বয়সে যখন দার্জিলিং-এ তাঁহার মৃত্যু হয়, তখন যিনি তাঁহাকে ভগিনীর মত ভালবাসিতেন ও তাঁহার শেষশয্যা-পার্শ্বে বসিয়া তাঁহার সেবা করিয়াছিলেন, সেই অবলা বসুর (আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর পত্নী) যাহা মনে হইয়াছিল, তাহা তিনি লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন—

"যখন আমি তাঁহার শয্যাপার্শ্বে উপবিষ্ট ছিলাম, তখন তাঁহারই বর্ণিত হৈমবতী উমার গল্প আমার মনে হইতেছিল। এই সময়ে উমা তাঁহার পিত্রালয়ে আসিয়াছিলেন। হিমদেশের এই দুহিতা তেমনই বহুদিন বিরহের পরে তাঁহার ভারতীয় গৃহে আসিয়াছিলেন। অবস্থা জানিতে ও তাঁহার স্বদেশে আসিবার জন্য তাঁহাকে কি অপেক্ষা করিতে হইয়াছিল?"

তখন শরৎকাল শেষ হইয়াছে (১৩ই অক্টোবর, ১৯১১ খৃষ্টাব্দ)। মেঘাচ্ছন্ন আকাশে তাঁহার শেষ-শ্বাস ত্যাগের সময় সূর্যালোক ফুটিয়া উঠিয়াছিল।

দার্জিলিং-এ তাঁহার সৎকারের পরে তাঁহার দেহাবশেষ ভস্মরাশি যে স্থানে জননী ধরিত্রীর মৃত্তিকায় প্রোথিত হইয়াছিল, তথায় একটি সমাধি-মন্দির নির্মিত হয়। তাহাতে লিখিত আছে—

'রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দে সমর্পিত-জীবন যে ভগিনী নিবেদিতা (মার্গারেট ই নোব্‌ল) ভারতবর্ষকে আপনার সর্বস্ব দিয়াছিলেন তাঁহার ভস্মরাশি সমাধিস্থ।'

স্বদেশকে স্বর্গাপেক্ষা গরীয়সী মনে করার—স্বদেশীয়দিগকে "ভ্রাতৃভাব ভাবি মনে" স্নেহ-প্রদান করার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। কিন্তু অন্য দেশকে মাতৃভূমি মনে করিয়া সেই দেশবাসীর ভগিনী হওয়ার দৃষ্টান্ত আর আছে কি না বলিতে পারি না। যে চিন্ময়ী মাতাকে আমরা মৃন্ময়ী রূপে ভাবিয়া তাঁহার ধ্যান করি, তাঁহার আশীর্বাদে ও কৃপায় ভারতের নর-নারী যদি ভগিনী নিবেদিতার ভ্রাতা ও ভগিনীর সম্মানলাভের উপযুক্ত হয়, তবে আমরা ধন্য হইব।

স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্যত্ব-স্বীকার করিয়া য়ুরোপে জন্মগ্রহণ করিয়া ও তথায় শিক্ষালাভ করিয়াও খৃষ্টধর্ম-যাজক নোব্‌লের প্রথম সন্তান মার্গারেট আপনাকে ভারতীয় করিয়া লইয়াছিলেন। তিনি রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ অভিন্ন বুঝিয়াছিলেন এবং সেইজন্যই আপনাকে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের শিষ্যা বলিয়া পরিচিত করিয়া গিয়াছেন।

১৮৬৭ খৃষ্টাব্দের ২৮শে অক্টোবর ডাবলিনে তাঁহার জন্ম হয়। ৩৪ বৎসর বয়সে যখন তাঁহার পিতা পরলোকগত হ'ন, তখন তাঁহার অতর্কিত ও অপ্রত্যাশিত মৃত্যুর পরে—তাঁহার বিধবা তিনটি সন্তানকে 'মানুষ' করিবার কার্যে আত্ম-

* 'যুগান্তর'-এর সৌজন্যে প্রকাশিত।—উঃ সঃ

নিয়োগ করেন। মার্গারেট শিক্ষাব্রত গ্রহণ করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া ইংলণ্ডে তখন যাঁহারা নূতন শিক্ষাপদ্ধতির প্রবর্তনে সচেষ্ট, তাঁহাদিগের দলভুক্ত হইয়া—শিশুচরিত্র অধ্যয়ন করিয়া একাধিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করিবার পর স্বয়ং একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিয়া আপনার মনোমত শিক্ষা দিতে থাকেন। তখন যে সকল তরুণ সাহিত্য সমাজ নীতি প্রভৃতির আলোচনা সোৎসাহে করিতেছিলেন তিনি তাঁহাদিগের মণ্ডলীতে যোগ দেন। সেই সময় ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে কোন সম্মিলনে স্বামী বিবেকানন্দের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে আমেরিকায় বিরাট প্রদর্শনীর সহিত—তাহার অঙ্গরূপে যে ধর্মসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়, স্বামীজী তাহাতে যোগ দিতে গিয়াছিলেন। আর একজন বাঙ্গালী তাহাতে প্রতিনিধি হইয়া গিয়াছিলেন—তিনি ধর্মপ্রচারক কেশবচন্দ্র সেনের সহকর্মী ও সঙ্গী প্রতাপচন্দ্র মজুমদার। কেশবচন্দ্র ধর্মপ্রচারক ও বাগ্মিরূপে ইংলণ্ডে খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন এবং রাণী ভিক্টোরিয়া তাঁহাকে সম্মান দেখানয় ইংলণ্ডে ও ভারতে ইংরেজ-সমাজে তাঁহার আদর হয়। প্রধানতঃ বড়লাট লর্ড নর্থব্রুকের অভিপ্রায়ে কুচবিহারের নাবালক রাজার সহিত কেশবচন্দ্রের প্রথমা কন্যার বিবাহ হয়। কেশবচন্দ্র ইংলণ্ডে গিয়াছিলেন, আমেরিকায় গমন করেন নাই। প্রতাপচন্দ্রই ভারতীয় ধর্মপ্রচারক-রূপে প্রথম আমেরিকায় গিয়াছিলেন। ধর্মসম্মেলনে তাঁহার আমেরিকায় গমন তথায় তাঁহার দ্বিতীয়বার গমন। প্রতাপচন্দ্র ব্রাহ্ম ছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দ হিন্দু। ভগিনী নিবেদিতা বলিয়াছেন, সম্রাট অশোকের ব্যবস্থায় ভারতবর্ষের বাহিরে প্রচারকগণ ভারতীয় ধর্ম-প্রচারের জন্য গমন করিতেন। তাহার পরে ভারতবর্ষ বিদেশীর বিজয়-বাত্যার তাড়িত ও বিদেশীর বন্যায় পীড়িত হয়। ম্যাথু আর্নল্ড বলিয়াছেন, প্রাচী ঘৃণাভরে ধীরভাবে বিদেশীর বিজয়-বাত্যা সহ্য করিয়া সে বাত্যার পরে আবার চিন্তায় মগ্ন হইয়াছিল—

"The East bowed low before the blast,
In patient deep disdain;
She let the legions thunder past,
And plunged in thought again."

দীর্ঘকাল পরে—বৌদ্ধযুগের পরে—স্বামী বিবেকানন্দ প্রথম ভারতীয় ধর্ম-প্রচারকরূপে প্রতীচীতে গিয়াছিলেন। আমেরিকায় লোককে মুগ্ধ করিয়া ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে স্বামীজী ইংলণ্ডে আগমন করেন। ইংলণ্ডে সত্যের সন্ধানে আগ্রহশীল কুমারী নোব্‌ল স্বামীজীকে দেখেন। তিনি মধ্যে মধ্যে 'শিবম্! শিবম্!' উচ্চারণ করিতেছিলেন ও শ্রোতৃগণের প্রশ্নের উত্তর দিতেছিলেন। মার্গারেট স্বামীজীর উপদেশে আকৃষ্ট হ'ন এবং স্বামীজী যখন আবার আমেরিকায় যাইয়া ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডে আগমন করেন এবং ধর্ম-প্রচার করিতে থাকেন, তখন মার্গারেট তাঁহার শিষ্যা হ'ন। ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে স্বামীজী ভারতযাত্রা করেন। ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে মার্গারেট ভারতে আগমন করেন।

মার্গারেটের ভারতে আগমনের কারণ—স্বামীজীর আহ্বান। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের ২৩শে জুলাই স্বামীজী আলমোড়া হইতে তাঁহাকে লিখেন—"তুমি ভারতে না আসিয়া ইংলণ্ডে থাকিয়াই আমাদিগের জন্য অধিক কাজ করিতে পারিবে। দরিদ্র ভারতবাসীর কল্যাণের আগ্রহে তোমার বিরাট আত্মত্যাগের জন্য ভগবান তোমাকে আশীর্বাদ করুন।"

কিন্তু তিনি কয় দিনেই সে মত পরিবর্তিত করেন এবং ২৯শে জুলাই মার্গারেটকে লিখেন—"তোমাকে সুস্পষ্টরূপে বলিতেছি, আমার দৃঢ়

বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে, ভারতের কাজে তোমার অশেষ সাফল্যলাভ হইবে। ভারতের জন্য, বিশেষ ভারতের পুরুষ অপেক্ষা নারী-সমাজের—জন্ম একজন প্রকৃত সিংহিনী ( Lioness ) প্রয়োজন। ভারত এখনও মহীয়সী মহিলার জন্মদান করিতে পারিতেছে না; সেইজন্য অন্য জাতি হইতে তাঁহাকে ঋণ হিসাবে আনিতে হইবে। তোমার শিক্ষা, ঐকান্তিকতা, পবিত্রতা, অসীম প্রীতি, দৃঢ়তা এবং সর্বোপরি তোমার ধমনীতে প্রবাহিত কেলটিক রক্তই তোমাকে সর্বথা সেই উপযুক্ত নারীরূপে গঠিত করিয়াছে।"

কিন্তু ভারতের কল্যাণও স্বামীজিকে এই 'সিংহিনীর' সম্বন্ধে স্বার্থপরতায় অংগীভূত করিতে পারে নাই। সেইজন্য তিনি লিখিয়াছিলেন—

" 'শ্রেয়াংসি বহুবিঘ্নানি।' এ দেশে দুঃখ কুসংস্কার দাসভাব কিরূপ তুমি তাহার ধারণাও করিতে পার না। এ দেশে আসিলে তুমি আপনাকে অর্ধ-উলঙ্গ অসংখ্য নরনারীতে পরিবেষ্টিত দেখিবে। জাতি ও স্পর্শ-সম্বন্ধে তাহাদিগের ধারণা বিকট। তাহারা, ভয়েই হউক বা ঘৃণায়ই হউক, শ্বেতাঙ্গদিগকে এড়াইয়া চলে এবং শ্বেতাঙ্গরাও তাহাদিগকে তীব্রভাবে ঘৃণা করে। আবার শ্বেতাঙ্গরা তোমাকে বায়ুরোগগ্রস্ত মনে করিবে এবং তোমার প্রতি গতিবিধি সন্দেহের দৃষ্টিতে লক্ষ্য করিবে।

"তদ্ভিন্ন এ দেশের জলবায়ুও উষ্ণপ্রধান। এ দেশের প্রায় সকল স্থানের শীত তোমাদিগের দেশের গ্রীষ্মের মত; আর দক্ষিণাঞ্চলে ত সর্বদাই আগুনের হল্কা চলে।

"শহরের বাহিরে কোথাও য়ুরোপের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য কিছুমাত্র পাইবার উপায় নাই। যদি এ সকল সত্ত্বেও তুমি কার্যে প্রবৃত্ত হইতে সাহস কর, তবে অবশ্য তোমাকে শতবার স্বাগত সম্ভাষণ জানাইতেছি।"

স্বামীজী মানব-চরিত্র যেন নখদর্পণে দেখিতেন। সেইজন্যই তিনি এই তরুণী য়ুরোপীয়াতে 'সিংহিনীর' শক্তি দেখিয়াছিলেন। সে শক্তি সকল বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করিতে পারে।

স্বামীজীর আহ্বান অনুমতি মনে করিয়া মার্গারেট ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে কলিকাতায় আসিয়া বেলুড়ে একটি গৃহে কয় জন আমেরিকান বন্ধুর সহিত বাস করিতে থাকেন। যে সময় তাঁহার মনীষার জন্য স্বদেশে তাঁহার যশোলাভের সম্ভাবনা সুনিশ্চিত সেই সময় তিনি স্বামীজীর আহ্বানে ভারতের আহ্বান—অন্তরাত্মার আহ্বান মনে করিয়া ভারতের কার্যে আপনাকে নিযুক্ত করিয়া স্বামীজী-কর্তৃক নিবেদিতা-নামে অভিহিতা হইলেন। তখনই মার্গারেট নোবলের তিরোভাব আর ভগিনী নিবেদিতার আবির্ভাব।

১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের মে মাস হইতে নভেম্বর মাস পর্যন্ত ভগিনী নিবেদিতা, শ্রীমতী ওলি বুল প্রমুখ তিন জন বিদেশী মহিলা স্বামী বিবেকানন্দের সমভিব্যাহারে ভারতের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল, কুমায়ুন ও কাশ্মীর পরিভ্রমণ করেন। উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে বহু হিন্দু-তীর্থস্থান; সে সকল ও ভারতের পার্বত্য সৌন্দর্য-সম্বন্ধে এই বার নিবেদিতার সুস্পষ্ট ধারণা ও ভারতবাসি-সম্বন্ধে অভিজ্ঞতালাভ হয়। সেই পরিভ্রমণের ফলে তিনি বহু মনোজ্ঞ প্রবন্ধ রচনা করেন। সে সকলের ভাষা যেমন সরস, ভাব তেমনই আধ্যাত্মিকতা-সঞ্জীবিত। সে সকল ফুলের মত কোমল ও সুন্দর এবং তেমনই সৌরভসম্পৎ-সম্পন্ন।

ফিরিয়া আসিয়া নিবেদিতা তাঁহার অভিপ্রেত ও নির্দিষ্ট কার্যে প্রবৃত্ত হইবার জন্য উত্তর কলিকাতায় একটি বিদ্যালয়-প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু অবস্থা অনুকূল না হওয়ায় তাঁহাকে সে পরীক্ষা ত্যাগ করিতে হয়। তবে তাহাতে তিনি নিরাশ হন

নাই। কারণ, স্বামীজীর শিক্ষা—গীতার সেই উপদেশ—তোমার অধিকার কর্মে, ফলে নহে। ২৬শে মে (১৯০০ খৃষ্টাব্দ) স্বামীজী স্যানফ্রান্সিস্‌কো হইতে তাঁহার শিষ্যাকে আবার সেই কথাই—জানি না কোন্ কারণে বা প্রয়োজনে—স্মরণ করাইয়া দিয়াছিলেন; লিখিয়াছিলেন—

"আমার অনন্ত আশীর্বাদ জানিও এবং কিছুমাত্র নিরাশ হইও না। শ্রীওয়াহি গুরু, শ্রীওয়াহি গুরু। ক্ষত্রিয়-শোণিতে তোমার জন্ম। আমাদিগের অঙ্গের গৈরিকবাস ত যুদ্ধক্ষেত্রের মৃত্যুসজ্জা! ব্রত-উদ্‌যাপনে প্রাণপাত করাই আমাদিগের আদর্শ, সিদ্ধির জন্ম ব্যস্ত হওয়া নহে। শ্রীওয়াহি গুরু।"

কি উপলক্ষে—কি মনে করিয়া গুরু শিষ্যাকে এই কথা স্মরণ করাইয়া দিয়াছিলেন, তাহা জানিতে কৌতূহল হয়। তবে এই উপদেশ যেমন বিবেকানন্দের মত গুরুর উপযুক্ত, তেমনই নিবেদিতার মত শিষ্যার উপযোগী—সন্দেহ নাই। আর এই উপদেশ সময়-বিশেষের জন্ম বা ব্যক্তি-বিশেষের জন্ম নহে—ইহা সর্বাবস্থায় সকলের জন্ম। বিশেষ ইহা ত্যাগীর পক্ষে মন্ত্র।

স্বামীজী যে তাঁহার শিষ্যার পরিণতি সাগ্রহে ও সানন্দে লক্ষ্য করিতেছিলেন, তাহাতে সন্দেহ থাকিতে পারে না। একখানি পত্রে তিনি স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে লিখিয়াছিলেন—"মিস্ নোব্‌লের মত মেয়ে সত্যই দুর্লভ। আমার বিশ্বাস, বাগ্মিতায় সে শীঘ্রই মিসেস্ বেশান্তকে ছাড়াইয়া যাইবে।"

মিসেস্ বেশান্তের বাগ্মিতার পরিচয় যাঁহারা পাইয়াছেন, তাঁহাদিগকে আর বলিয়া দিতে হইবে না—তাঁহার বাগ্মিতা অসাধারণই ছিল। তিনি যখন বক্তৃতা করিতেন, তখনও 'মাইক্রোফোন' আবিষ্কৃত হয় নাই। তাঁহার কণ্ঠস্বর এমনই ছিল যে, কংগ্রেসের মণ্ডপের মত স্থানেও সকলে তাঁহার উচ্চারিত প্রত্যেক কথা শুনিতে পাইতেন।

স্বামীজী ভারতে সিংহিনীর প্রয়োজনে যাঁহাকে শিষ্যা করিয়া আনিয়াছিলেন, তাঁহাকে তিনি ১৯০১ খৃষ্টাব্দের ১২ই ফেব্রুয়ারী লিখিয়াছিলেন—

"সর্বপ্রকার শক্তি তোমাতে উদ্বুদ্ধ হউক। মহামায়া স্বয়ং তোমার হৃদয়ে ও বাহুতে অধিষ্ঠিত হউন। অপ্রতিহত মহাশক্তি তোমাতে জাগ্রত হউক এবং সম্ভব হইলে সঙ্গে সঙ্গে অসীম শান্তিও তুমি লাভ কর—ইহাই আমার প্রার্থনা।"

মহাশক্তির নিকট ভক্ত সাধক স্বামী বিবেকানন্দের এই প্রার্থনা অপূর্ণ থাকে নাই।

স্বামীজী যে এক দিন নিবেদিতাকে লিখিয়াছিলেন—"নিরাশ হইও না," তাহার কারণ বোধ হয় এই যে, তিনি যে কার্যে নিবেদিতাকে নিবেদন করিয়াছিলেন, সে কার্যের আরম্ভে বহু বাধা, বিঘ্ন ও বিপদ ছিল। কিন্তু হেমচন্দ্রের 'দশ-মহাবিদ্যা'য় শিব নারদকে বলিয়াছিলেন—

"না হও নিরাশ<br>
　　অরে ভক্তিমান,<br>
　　　ভূতেশ কহেন নারদে—<br>
দুঃখেরি কারণ,<br>
　　নহে জীবলীলা,<br>
　　　মোচন আছে রে আপদে।"

স্বামীজী বুঝিয়াছিলেন, তাঁহার নির্বাচন বৃথা হয় নাই। নিবেদিতাকে প্রদত্ত তাঁহার আশীর্বাদ ফলিয়াছিল।

১৯০১ খৃষ্টাব্দে তিনি কাশীধাম হইতে শিষ্যাকে আশীর্বাদ করিয়াছিলেন। ১৯০২ খৃষ্টাব্দে (৪ঠা জুলাই) স্বামী বিবেকানন্দ দেহরক্ষা করেন।

নিবেদিতা গুরু-প্রদত্ত কার্যভার বহন করিবার জন্ম তখন প্রস্তুত হইয়াছেন। একদিন তাঁহার যে চেষ্টা সাফল্য লাভ করে নাই ১৯০২ খৃষ্টাব্দে তাহা সফল হইল। তিনি কলিকাতার উত্তরাঞ্চলে বাগবাজারে—বসুপাড়ায় শিক্ষাকেন্দ্র

প্রতিষ্ঠিত করিলেন। কুমারী খ্রীন্ষ্টিডেল্ (ভগিনী ক্রিষ্টিন) এবার তাঁহার সহকর্মী হইলেন। এক দিন পল্লীর যে সকল মহিলা এই যুরোপীয়া মহিলার নিকটে আসিতে চাহেন নাই, তাঁহারাই তাঁহাকে ভগিনী বলিয়া বরণ করিয়া লইলেন—তাঁহার ব্যবহার তাঁহাদিগকে আকৃষ্ট করিল—তাঁহার কার্য তাঁহাদিগকে অনুভব করাইল, নিবেদিতা পর নহেন—একান্ত আপনার—সত্যই তিনি ভারত-মাতার দুহিতা, তাঁহাদিগের ভগিনী।

পল্লীর বালক-বালিকারা সাগ্রহে তাঁহার স্নেহ-লাভের চেষ্টা করিতে লাগিল; পল্লীর তরুণেরা তাঁহার আদর্শে কেবল নাগরিক কর্তব্য সম্বন্ধেই অবহিত হইল না; পরন্তু দেশাত্মবোধে যেমন অনুপ্রাণিত হইতে লাগিল, তেমনই ভারতীয় সংস্কৃতির অধ্যাত্মসম্পদের সন্ধানও লাভ করিতে লাগিল। যেন ঐন্দ্রজালিকের দণ্ডের স্পর্শে অজ্ঞতার অবসান হইল—সকলে নূতন জগতের নূতন জীবনের সন্ধান পাইল। বালিকারা অভিপ্রেত শিক্ষা লাভ করিতে লাগিল; তরুণরা নূতন শিক্ষা পাইতে লাগিল; প্রৌঢ়রাও ভগিনী নিবেদিতার সাহচর্যে জাতির ও মানবের প্রকৃত কর্তব্য-সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিতে লাগিলেন। তিনি পল্লীর কল্যাণরূপিণী ভগিনী হইলেন।

(ক্রমশঃ)

---

# প্রার্থনা

শ্রীমতী—

জীবনে মরণে তোমার ধেয়ানে
চিত্ত যদি ডুবে রয়,
সুখ-দুঃখ যত পুষ্পের মত
পূজা-উপচার হয়।
যদি আঁখি মুদি নিরখি তোমার
ভুবন-মোহন রূপ,
চরণ-কমলে বেড়ি সুখে খেলে
উন্মত্ত মনমধুপ।
তব সুধানাম যদি অবিরাম
চিত্ত বিনোদ করে,

শোকের যাতনা হবে উপাসনা
সতত তোমারে স্মরে।
কিসের ভাবনা যদি তোমা বিনা
কিছু না আমার রয়,
জুড়াবে জীবন শান্ত প্রাণ-মন
চারিদিক সুখময়।
বাঞ্ছাকল্পতরু দয়াময় গুরু
মোরে কর অকিঞ্চন,
সব কেড়ে নিয়ে শত দুঃখ দিয়ে
দাও শুধু ভক্তি ধন।

# সমালোচনা

**বিবেকানন্দ ইন্‌ষ্টিটিউশন পত্রিকা (রজত-জয়ন্তী সংখ্যা)**—ছাত্র-সম্পাদক শ্রীঅমলেন্দু সেনগুপ্ত ও শ্রীঅনিলকুমার পাল। পঞ্চবিংশতি বর্ষ—অগ্রহায়ণ, ১৩৫৮। শ্রীসুধাংশুশেখর ভট্টাচার্য-কর্তৃক বিবেকানন্দ ইন্‌ষ্টিটিউশন, ১০৭ নেতাজী সুভাষ রোড, হাওড়া হইতে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা—১৫৬।

বিবেকানন্দ ইন্‌ষ্টিটিউশন (হাওড়া) নামক বালক-বিদ্যালয়ের ছাত্রগণের রচনাসম্ভারে সমৃদ্ধ এবং কতিপয় প্রথিতযশাঃ মনীষী ও সাহিত্যিকের শুভেচ্ছা-পূত এই পঞ্চবিংশতি বর্ষপূর্তি উপলক্ষে স্মারক পত্রিকাখানি নানাদিক দিয়া মনোজ্ঞ ও উপভোগ্য হইয়াছে। ইহাতে ২২টি শুভেচ্ছা-বাণী এবং ধর্ম-নীতি-সাহিত্য-জীবনচরিত-ছোটগল্পসম্বন্ধীয় ৬১টি সুচিন্তিত প্রবন্ধ ও কবিতার সমাবেশ আছে। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বালকদের উদ্দেশে বলিয়াছেন—"ছোকরাদের অত ভালবাসি কেন? ওরা খাঁটি দুধ, একটু ফুটিয়ে নিলেই হয়—ঠাকুরের সেবায় চলে। তাদের জ্ঞানোপদেশ দিলে শীঘ্র চৈতন্য হয়।" স্বামী বিবেকানন্দও বলিয়াছেন, "যুবকরা সদ্যঃপ্রস্ফুটিত অনাঘ্রাত পুষ্পের মতো শ্রীভগবানের চরণে ও লোককল্যাণব্রতে নিবেদিত হইবার শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য।" তরুণদের উদ্বোধক, পরম-হিতৈষী, পথপ্রদর্শক ও আদর্শ স্বামী বিবেকানন্দের নামে অভিহিত বিদ্যায়তনে যুগাচার্য মহাপুরুষের ভাবধারায় অনুপ্রাণিত বিদ্যার্থিগণ এই পত্রিকার মাধ্যমে মহান্ ভাব ও আদর্শপ্রচারের জন্য ব্রতী হইয়াছে—ইহার সুস্পষ্ট অভিব্যক্তি দেখিতে পাওয়া যায় রচনাগুলির মধ্যে। পত্রিকাখানির যাত্রাপথ মঙ্গলময় ও জয়যুক্ত হউক। দেশের অন্যান্য বিদ্যালয়গুলির ছাত্রগণ বিবেকানন্দ ইন্‌ষ্টিটিউশনের বালকদের নিকট হইতে অনুপ্রেরণা লাভ করিলে স্বামীজি-পরিকল্পিত শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য সার্থক হইবে।

**কৃষ্ণচরিত্র**—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়-প্রণীত। শ্রীরাজেন্দ্রকুমার মিত্র-কর্তৃক আর-কে-পাব্লিশিং কোম্পানী, ১১।এ গোকুল মিত্র লেন, কলিকাতা-৫ হইতে পুনর্মুদ্রিত ও প্রকাশিত। পৃষ্ঠা—১৩০; মূল্য এক টাকা আট আনা।

এই পুস্তকখানি সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের 'কৃষ্ণচরিত্রের' পুনর্মুদ্রণ ও পুনঃপ্রকাশন। মহাভারত ভাগবত বিষ্ণুপুরাণ ব্রহ্মপুরাণ ব্রহ্ম-বৈবর্তপুরাণ ও হরিবংশ—এই ছয়খানি প্রাচীন গ্রন্থে, বিশেষরূপে ঐতিহাসিক কাব্যগ্রন্থ মহা-ভারতে শ্রীকৃষ্ণকে কি ভাবে দেখান হইয়াছে এবং তাহা হইতে কি সিদ্ধান্ত করা যায়, তাহাই বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার সুনিপুণ ও যুক্তিপূর্ণ লেখনী-সাহায্যে পাঠকদের নিকট পরিবেশন করিয়াছেন। "আমাদিগের শারীরিক ও মানসিক বৃত্তিসকলের সর্বাঙ্গীণ স্ফূর্তি ও পরিণতি, সামঞ্জস্য ও চরিতার্থতাই ধর্ম। এই ধর্ম অনুশীলন-সাপেক্ষ এবং অনুশীলন কর্মসাপেক্ষ। অতএব কর্মই ধর্মের প্রধান উপায়। এই ধর্ম অত্যন্ত দুরূহ, উহার শিক্ষা কেবল উপদেশেই হয় না—আদর্শ চাই। সম্পূর্ণ ধর্মের আদর্শ ঈশ্বর ভিন্ন আর কেহই নাই। অতএব যদি ঈশ্বর

স্বয়ং সান্ত ও শরীরী হইয়া লোকালয়ে দর্শন দেন, তবে সে আদর্শের আলোচনায় যথার্থ ধর্মের উন্নতি হইতে পারে। এই জন্যই ঈশ্বরাবতারের প্রয়োজন। ঈশ্বর জীবের প্রতি করুণা করিয়া শরীরধারণ করেন। শ্রীকৃষ্ণ আদর্শ মনুষ্য। মানুষ-চরিত্রে তিনি সর্বগুণের আধার, সর্বকর্মের অনুষ্ঠাতা অথচ স্বয়ং নিষ্কাম ও নির্লিপ্ত।"—বঙ্কিমচন্দ্র 'কৃষ্ণচরিত্রে' শ্রীকৃষ্ণের এই মানব-ভাবটি পরিস্ফুট করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে অবতারপুরুষ দেব-মানব—তাঁহার মধ্যে দেবভাব ও মানবভাব উভয়েরই পূর্ণ ও সুসমঞ্জস প্রকাশ থাকে। কেবলমাত্র সম্পূর্ণ দেবভাবের অভিব্যক্তি থাকিলে দুর্বলচিত্ত ও অসম্পূর্ণ মানব উহা ধরিতে ও অনুকরণ করিতে পারে না—অবতারের মধ্যে মানব-ভাব আছে বলিয়াই 'লোকসংগ্রহার্থ' ঈশ্বরের আবির্ভাবের যথার্থ সার্থকতা।

বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী ও যুক্তিবাদের যুগে বঙ্কিমচন্দ্রের 'কৃষ্ণচরিত্রের' পাঠ ও আলোচনা হওয়া আবশ্যক। এরূপ একখানা উপযোগী পুস্তকের সম্পাদনা ও প্রকাশন-কার্য অধিকতর যত্ন ও মনোযোগের সহিত নিষ্পন্ন হইলে পাঠকগণ উপকৃত হইবে। পুস্তকে মুদ্রাকর-প্রমাদ অনেক রহিয়া গিয়াছে; যতি-চিহ্নাদির নিয়মও যথাস্থানে প্রতিপালিত হয় নাই। পরবর্তী সংস্করণে পুস্তকখানি সর্বাঙ্গসুন্দর হইবে আশা করি।

**গোকুলচন্দ্র মিত্র ও সেকালের কলিকাতা (১ম ভাগ)**—শ্রীরাজেন্দ্রচন্দ্র মিত্র-প্রণীত। প্রকাশক—আর কে পাব্লিশিং কোং, ১১।এ গোকুল মিত্র লেন, কলিকাতা—৫; পৃষ্ঠা—১৬৪ + ৩৪ = ১৯৮; মূল্য আড়াই টাকা।

দুই শত বৎসর পূর্বেকার ব্রিটিশ-শাসিত কলিকাতার এবং তদানীন্তন অন্যতম প্রধান সমাজপতি বাগবাজারনিবাসী গোকুলচন্দ্র মিত্রের জীবনকাহিনীর একটি সুন্দর ও উপভোগ্য বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে এই পুস্তকখানিতে। গোকুল মিত্রের সমসাময়িক ও সমপর্যায়ভুক্ত আরও অন্যান্য বিশিষ্ট বিলাসী প্রতিপত্তিসম্পন্ন ভূম্যধিকারীর কাহিনী, কলিকাতার গঙ্গাতীরস্থ আটচল্লিশটি ঘাট ও অনেক রাস্তার নামের ইতিহাসও ইহাতে প্রধানতঃ স্থান পাইয়াছে। সে-কালে বাঙ্গালী নেতারা ব্যবসায়-বাণিজ্য, জমিদারী-সংগ্রহ ও ইংরেজ শাসকের কৃপাভিক্ষা করিয়া কিরূপে সৎ ও অসৎ উভয় উপায়েই বিপুল অর্থের মালিক হইয়াছিলেন এবং উপার্জিত অর্থের কিয়দংশ জনসাধারণের হিতার্থ ব্যয় করিয়াছিলেন—উহার একটি মনোরম চিত্র এই পুস্তকে পাওয়া যায়। ব্যবসায়-বাণিজ্য করিয়া সেকালে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর লোক ক্রোড়পতি হইয়া সবিশেষ প্রতিষ্ঠা অর্জন করিয়াছিলেন।

দেশের সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাষ্ট্রিক, শিল্প-কলা-ধর্ম-সংস্কৃতি-শিক্ষাসম্বন্ধীয় বিবরণই প্রকৃত ইতিহাস। সন-তারিখ সহ যুদ্ধ-বিগ্রহাদি ও শাসকদের নীরস বিবরণকেই ইতিহাস বলে না। এই পুস্তকখানিকে নানাদিক দিয়া প্রাচীন কলিকাতার একটি সুন্দর ও তথ্যপূর্ণ ইতিহাস বলা যাইতে পারে। সে-কালের বাঙ্গালী-সমাজের আচার-ব্যবহার ও সামাজিক রীতিনীতি-জ্ঞাপক কয়েকটি ছবি পুস্তকখানির অঙ্গসৌষ্ঠব বৃদ্ধি করিয়াছে। অনুসন্ধিৎসু ও সাধারণশ্রেণীর পাঠক-মাত্রের নিকটই ইহার বহুল প্রচার ইচ্ছা করি।

**জৈনদর্শনের রূপরেখা**—শ্রীপূরণচাঁদ শ্যামসুখা-প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান—আর এন্ চাটার্জি এণ্ড কোং, ২৩নং ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২; ১১৫+৮=১২৩ পৃষ্ঠা। মূল্য দেড় টাকা।

পুস্তকখানিতে জৈনদর্শনের একটি যুক্তিপূর্ণ মনোজ্ঞ আলোচনা ও ব্যাখ্যান পাওয়া যায়। ইংরেজী ভাষায় জৈনধর্ম ও দর্শনের তথ্যপূর্ণ

বিবরণ থাকিলেও বঙ্গভাষায় এ সম্বন্ধে বেশী আলোচনা হয় নাই। গ্রন্থকার দ্রব্য, নয়বাদ, স্যাদ্বাদ বা অনেকান্তবাদ, কর্মবাদ এবং গুণস্থান-ক্রমারোহ—এই কয়টি প্রধান বিষয়বস্তু-অবলম্বনে জৈনদর্শনের মূলতত্ত্বটি পাঠকসমাজের নিকট উদ্ঘাটিত করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। পারিভাষিক শব্দগুলির সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা প্রদত্ত হওয়ায় বিষয়বস্তু-অবধারণ অনেকাংশে সুগম হইয়াছে। কৃতী লেখকের নিকট বঙ্গভাষী সুধী ও পাঠকবর্গ অবশ্যই ঋণী থাকিবেন। আমরা পুস্তকখানির বহুল প্রচার ইচ্ছা করি।

**জৈনধর্মের পরিচয়**—শ্রীপূরণচাঁদ শ্যামসুখা-প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান—গ্রন্থকার, পি ৯২ লেক্ রোড, কলিকাতা—২৯; ৩৬ পৃষ্ঠা। মূল্য আট আনা।

এই পুস্তিকায় জৈনধর্মতত্ত্বের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। কালবিভাগ, তীর্থঙ্কর, সাধু ও সাধ্বী, শ্রাবক ও শ্রাবিকা, নবতত্ত্ব, ত্রিরত্ন, অহিংসা ও সৃষ্টির অনাদিত্ব—এই কয়টি বিষয়-বস্তুর সুন্দর ব্যাখ্যান ইহাতে আছে।

**জৈন তীর্থঙ্কর মহাবীর**—শ্রীপূরণচাঁদ শ্যাম-সুখা-প্রণীত। প্রকাশক—গ্রন্থকার, পি ৯২ লেক রোড, কলিকাতা—২৯; প্রাপ্তিস্থান—মেসার্স গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬, অথবা গ্রন্থকার। পৃষ্ঠা ৫১; মূল্য বার আনা।

এই পুস্তিকায় জৈন তীর্থঙ্কর মহাবীরের সংক্ষিপ্ত জীবন-কথা ও উপদেশ, ভারতের তৎকালীন রাষ্ট্রিক অবস্থা, মহাবীরের একাদশ জন গণধর ও পরবর্তী প্রধান আচার্যগণের বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। বঙ্গভাষায় মহাবীরের জীবনী ও উপদেশ-সম্বন্ধে কোন পুস্তক পূর্বে প্রকাশিত হয় নাই। গ্রন্থকারের এই অভাব-দূরীকরণের প্রয়াস প্রশংসনীয়। স্বল্পায়তন হইলেও ইহাতে মহাবীরের সাধকজীবন ও অমূল্য উপদেশের মোটামুটি সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়। আমরা অদূর ভবিষ্যতে গ্রন্থকারের যোগ্য লেখনী হইতে বৃহদায়তন একখানা গ্রন্থের প্রকাশন আশা করি। পুস্তিকাখানির বহুল প্রচার হউক—ইহাই কামনা।

শ্রীরমণীকুমার দত্তগুপ্ত, বি-এল্

**সচিত্র কেদার-বদরিকা ভ্রমণরহস্য**—গ্রন্থকার, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত গৌরহরি ঘোষ-কর্তৃক ৩নং নারিকেলবাগান লেন্, গড়পার; কলিকাতা—৯ হইতে প্রকাশিত। প্রাপ্তিস্থান—'বিদ্যাশ্রম', ৩নং নারিকেলবাগান লেন, অথবা কিশোর লাইব্রেরী, ২৭নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। প্রথম সংস্করণ; ১৩০ পৃষ্ঠা, মূল্য তিন টাকা।

ইহাতে গ্রন্থকার কয়েক জন প্রতিবেশী সহ উত্তরাখণ্ডে এই বিশিষ্ট তীর্থের ভ্রমণকাহিনী সবিস্তারে প্রাঞ্জল ভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। কতিপয় দৃশ্যের আলোকচিত্র, খরচপত্রের হিসাব ও ভ্রাম্যমাণের দিনপঞ্জী গ্রন্থখানিকে সমৃদ্ধ করিয়াছে। মোটের উপর কেদার-বদরিকা-দর্শনেচ্ছু ব্যক্তিগণের পক্ষে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় গ্রন্থখানিতে স্থানলাভ করিয়াছে। গ্রন্থখানির মূল্য অধিক বলিয়া মনে হয়। কিছু কিছু মুদ্রাকর-প্রমাদও আছে।

**ভক্তাঞ্জলি**—ডাঃ হীরেন্দ্রনাথ পাল, (৩৪নং প্রফুল্লনগর, বেলঘরিয়া, ২৪ পরগনা) কর্তৃক সঙ্কলিত। প্রাপ্তিস্থান ও প্রকাশক—শ্রীকৃষ্ণ হোমিও হাউস্, ১২৫নং সূর্য সেন রোড; আলমবাজার, কলিকাতা—৩৫। ৪৮ পৃষ্ঠা, মূল্য আট আনা।

পুস্তিকাখানিতে ১৪৪টি ভক্তিমূলক বাছা বাছা গান সঙ্কলিত হইয়াছে। ভক্তগণের ইহা ভালই লাগিবে।

**পার্থিব শিবলিঙ্গরহস্য**—শ্রীমৎ অদ্বৈতানন্দপুরী প্রণীত। ২য় সংস্করণ। প্রকাশক—শ্রীপ্রমোদরঞ্জন রায়। প্রাপ্তিস্থান—ঋষিধাম; জলদি, চট্টগ্রাম। ২১ পৃষ্ঠা, মূল্য ।৵০ আনা।

ইহাকে শিবলিঙ্গ-সম্বন্ধে একটি সুচিন্তিত প্রবন্ধ বলা চলে। ইহা পাঠ করিয়া চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ আনন্দিত হইবেন।

( ১ ) **বিরাটপর্ব-সংস্কার** ( ২ ) **শাস্ত্রার্থ-প্রকাশ**—শ্রীকৈলাসচন্দ্র ভট্টাচার্য, তর্কনিধি-বেদাচার্য কর্তৃক সঙ্কলিত ও প্রকাশিত। প্রাপ্তিস্থান—মালুগ্রাম, শিববাড়ী পোঃ শিলচর, কাছাড়। বিরাটপর্ব-সংস্কার—২০ পৃষ্ঠা, মূল্য এক টাকা ও শাস্ত্রার্থপ্রকাশ—৫০ পৃষ্ঠা, মূল্য দুই টাকা।

বিরাটপর্ব-সংস্কার—ভারতাচার্য মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীহরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ ও পুণা ভাণ্ডারকার অনুসন্ধানসমিতি হইতে ডক্টর শ্রীযুক্ত রঘুবীর-সম্পাদিত বিরাটপর্বের একটি প্রতিবাদ-গ্রন্থ। তর্কনিধি মহাশয়ের প্রস্তাবগুলি যথাযথ বিবেচিত হইয়া মহাভারতের পরবর্তী সংস্করণের উপযুক্ত সংস্কার বাঞ্ছনীয়।

শাস্ত্রার্থ-প্রকাশ (প্রথম গ্রন্থ)—বঙ্গীয় পণ্ডিতগণ-প্রকাশিত ক্রিয়া-কর্ম-পদ্ধতিতে বৈদিক শব্দের যে রকম পাঠান্তর ও ভুল-ভ্রান্তি আছে উহার বিচার ও সংশোধনই এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য। ইহা যে হেতু 'প্রথম গ্রন্থ' বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে তাহাতে মনে হয় গ্রন্থকার আরও এইরূপ গ্রন্থ ভবিষ্যতে প্রকাশ করিতে ইচ্ছুক।

'বিরাটপর্ব-সংস্কার'-এর শেষে গ্রন্থকার যাহা লিখিয়াছেন এবং যে অমুদ্রিত ও মুদ্রণার্থে প্রস্তুত পুস্তকগুলির তালিকা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে জানা যায় তর্কনিধি মহাশয়ের বয়স বর্তমানে অশীতি বর্ষেরও অধিক হইয়াছে। তাঁহার নিকট প্রায় ১৬ খানি অমুদ্রিত দুষ্প্রাপ্য তন্ত্রগ্রন্থ এবং মুদ্রণার্থে প্রস্তুত ২৩ খানি গ্রন্থ রহিয়াছে। এই দুষ্প্রাপ্য অমুদ্রিত ও মুদ্রণার্থে প্রস্তুত পুস্তকগুলি যাহাতে তাঁহার জীবদ্দশায়ই প্রকাশিত হয় তদ্বিষয়ে তাঁহার ও সুধীবৃন্দের সর্বশক্তি-নিয়োগ একান্ত বাঞ্ছনীয়। নতুবা এইগুলি বিলুপ্ত হইলে ভারতীয় জাতীয় সংস্কৃতির অপূরণীয় ক্ষতি সাধিত হইবে। পণ্ডিত মহাশয়কে এই পুস্তকগুলি-প্রকাশে যতদূর সম্ভব সাহায্য করিবার নিমিত্ত আমরা ভারত সরকার, বিশেষতঃ বঙ্গীয় সরকার, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, সংস্কৃত সাহিত্য পরিষৎ ও বিদ্বন্মণ্ডলীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, তর্কনিধি মহাশয় স্বয়ং বৈদিক মন্ত্রের ভুল প্রয়োগাদির সংশোধক হইয়াও তাঁহার প্রকাশিত মাত্র ৫০ পৃষ্ঠার পুস্তিকাতে বিরাট শুদ্ধিপত্র সংযোজন করিয়াছেন এবং ইহা সত্ত্বেও বহু ভুল রহিয়া গিয়াছে। ইহা অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়। আশা করি, পরবর্তী সংস্করণে ভালভাবে প্রুফ্-সংশোধনের ব্যবস্থা করা হইবে।

স্বামী প্রশান্তানন্দ

**অদ্বৈতানুভূতি-প্রকাশ** ( ১ম ও ২য় ভাগ )—শ্রীপ্রমোদেশ্বর সেন-প্রণীত। ভারতী শঙ্কর পরিষৎ হইতে শ্রীসতীশচন্দ্র শীল, এম্-এ, বি-এল্ কর্তৃক প্রকাশিত। প্রাপ্তিস্থান—২৯বি, বলরাম ঘোষ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৪। পৃষ্ঠা—২২৬। মূল্য—সাড়ে চার টাকা।

বর্তমান গ্রন্থের রচয়িতা আচার্য শঙ্কর-ব্যাখ্যাত অদ্বৈতবেদান্ত দীর্ঘকাল যাবৎ অনুশীলন করিতেছেন। দুরূহ অদ্বৈততত্ত্ব প্রাঞ্জল বঙ্গভাষায় সর্বশ্রেণীর পাঠকের উপযোগী করিয়া ব্যাখ্যানের উপর স্বামী বিবেকানন্দ বিশেষ গুরুত্বপ্রদান করিতেন।

অদ্বৈত আত্মতত্ত্বই পরম বেদিতব্য এবং অজ্ঞানধ্বান্ত-নিরসনে স্বপ্রকাশ সূর্যস্বরূপ। গ্রন্থখানির প্রথম ভাগে শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা পঞ্চদশী আত্মপুরাণ ব্রহ্মসূত্র অদ্বৈতসিদ্ধি প্রমুখ গ্রন্থের সার সংকলিত। ভগবান্ দত্তাত্রেয় পরশুরামকে যে সকল উপদেশ দিয়াছিলেন, দেবর্ষি নারদের গুরু ঋষি হারিতায়নও নারদকে গল্পচ্ছলে সেই সকল তত্ত্বোপদেশ দান করেন। এই উপদেশসমূহের ছায়াবলম্বনে দ্বিতীয় ভাগ অতি সরলভাষায় লিখিত। এই সরলতা দ্বারা দার্শনিক আলোচনায় প্রসন্নগম্ভীর প্রকাশ-ভঙ্গী কোথাও ব্যাহত হয় নাই। ইহা লেখকের কৃতিত্বের পরিচায়ক। এই অমূল্য অদ্বৈততত্ত্ব-দীপক গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া শ্রদ্ধেয় লেখক বঙ্গসাহিত্যের যথার্থই সমৃদ্ধি সাধন করিয়াছেন বলিলে অত্যুক্তি হয় না। গ্রন্থখানির বহুল প্রচার কামনা করি।

অধ্যাপক শ্রীজ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র দত্ত, এম্‌-এ

---

# শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

**ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সপ্তদশাধিক-শততম জন্মতিথি-পূজা**—আগামী ১৪ই ফাল্গুন বুধবার অনুষ্ঠিত হইবে।

**যুগাচার্য স্বামী বিবেকানন্দের নবতিতম জন্মোৎসব**—নিম্নলিখিত কেন্দ্রগুলিতে অনুষ্ঠিত হইয়াছে: এই উপলক্ষে বিশেষ-পূজা হোম পাঠ ভজন-সংগীত প্রসাদবিতরণ প্রভৃতি সকল স্থানের উৎসবের সাধারণ অনুষ্ঠান ছিল।

**বেলুড় মঠে**—গত ৫ই মাঘ অপরাহ্ণে মঠ-প্রাঙ্গণে আহূত এক বিরাট জনসভায় ডক্টর শ্রীকালিদাস নাগের পৌরোহিত্যে স্বামী গম্ভীরানন্দজী ও সাহিত্যিক শ্রীসজনীকান্ত দাস আচার্য স্বামী বিবেকানন্দ-সম্বন্ধে হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা প্রদান করেন। পরে সভাপতি ডক্টর নাগ মহাশয়ের মনোজ্ঞ অভিভাষণের পর ধন্যবাদ প্রদত্ত হইলে সভার কার্য শেষ হয়।

এই দিন রাত্রে শ্রীশ্রীকালীপূজা হয় এবং ১৭ জন সন্ন্যাস এবং ১০ জন ব্রহ্মচর্য-ব্রত গ্রহণ করেন।

**মাদ্রাজ শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে**—গত ৫ই মাঘ পাঁচ-ছয় শত ভক্ত নর-নারী আহুতি প্রদান করেন। সন্ধ্যায় স্বামী শুদ্ধসত্ত্বানন্দজী-কর্তৃক স্বামীজির পত্রাবলী পঠিত ও আলোচিত হয়। পর দিন হরিকথাকীর্তন এবং মাদ্রাজ হাইকোর্টের বিচারপতি শ্রী পি সত্যনারায়ণ রাও-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক জনসভায় অধ্যাপক শ্রী সি জগন্নাথ রাও, অধ্যাপক শ্রী বি লক্ষ্মীনারায়ণ, অধ্যাপক শ্রী ভি গণপতি, স্বামী নিঃশ্রেয়সানন্দজী যথাক্রমে তামিল তেলেগু ও ইংরেজী ভাষায় স্বামীজির বিভিন্ন দিক-সম্বন্ধে পাণ্ডিত্যপূর্ণ বক্তৃতা দেন।

**রাঁচি রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে**—গত ৫ই মাঘ অপরাহ্ণে ডক্টর শ্রীমহেন্দ্রনাথ সরকারের সভাপতিত্বে আহূত এক সভায় অধ্যাপক শ্রীবীরেন্দ্র শ্রীবাস্তব ও শ্রীমতী সুনন্দা সেন যথাক্রমে হিন্দী ও বাংলায় স্বামীজি-সম্বন্ধে মনোজ্ঞ বক্তৃতা প্রদান করেন। পরে স্বামী সর্বস্থানন্দজী ও সভাপতির অভিভাষণের পর সভার কার্য শেষ হয়।

**কামারপুকুর ( হুগলী ) রামকৃষ্ণ মিশনে**—গত ৫ই মাঘ সন্ধ্যারতির পর একটি সভায় শ্রীরামগতি কর, শ্রীভূপেন্দ্রনাথ সেন, ব্রহ্মচারী হরিপদ ও স্বামী গদাধরানন্দজী স্বামীজির জীবনী ও বাণীর বিভিন্ন দিক-সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া শ্রোতৃবৃন্দকে মুগ্ধ করেন।

**পুরী (উড়িষ্যা) রামকৃষ্ণ মিশন গ্রন্থাগারে**—গত ৫ই মাঘ এক জনসভায় উড়িষ্যা হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি শ্রীবীরকিশোর রায় সভাপতি এবং বিচারপতি শ্রীলিঙ্গরাজ পাণিগ্রাহী প্রধান অতিথির আসনে অধিষ্ঠিত হন। অধ্যাপক শ্রীসত্যবাদী মিশ্র, পণ্ডিত শ্রীবাসুদেব মিশ্র ও অবসরপ্রাপ্ত প্রিন্সিপ্যাল শ্রীদ্বিবেদী যথাক্রমে হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা ও ধন্যবাদ প্রদান করিলে সভার কার্য শেষ হয়। পরদিন স্বামীজি-সম্বন্ধে ছাত্রদের এক বক্তৃতা-প্রতিযোগিতা এবং ৭ই মাঘ বালক-বালিকাদের ক্রীড়া প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল।

**পাটনা রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে**—গত ১৩ই মাঘ পাটনা হাইকোর্টের বিচারপতি শ্রীযুগল-কিশোর নারায়ণের পৌরোহিত্যে আহূত একটি জনসভায় শ্রীআঘোরী গোপীকিশোর, শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্র, এডভোকেট, শ্রীএন্ ভি সোহানী, আই-সি-এস্ ও প্রিন্সিপ্যাল্ শ্রীভগবতীকুমার সিংহ স্বামীজি-সম্বন্ধে মনোজ্ঞ বক্তৃতা দেন।

**বরাহনগর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে**—গত ৫ই মাঘ হইতে ১৩ই মাঘ স্বামীজির জন্মোৎসব সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। প্রায় দশ ফুট দীর্ঘ স্বামীজির একটি প্রতিকৃতি সুসজ্জিত মণ্ডপের শোভাবর্ধন করে। এই উপলক্ষে স্বামীজির জীবনী অবলম্বনে একটি শিক্ষাপ্রদ প্রদর্শনী এই উৎসবের বৈশিষ্ট্য ছিল। এই কয় দিন স্বামী বিশুদ্ধানন্দজী, স্বামী আত্মপ্রকাশানন্দজী, পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল, ডক্টর নলিনীকান্ত ব্রহ্ম, ডক্টর কালিদাস নাগ, শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার, শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, শ্রীচপলাকান্ত ভট্টাচার্য, শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা প্রদান করেন। অনেক খ্যাতনামা সংগীতজ্ঞের কণ্ঠ ও যন্ত্র-সংগীত শ্রোতৃবৃন্দের বিশেষ উপভোগ্য হইয়াছিল। শেষ দিন একটি শোভাযাত্রা কাশীপুর উদ্যানবাটী হইতে দক্ষিণেশ্বর-মন্দিরে উপস্থিত হইলে প্রসাদবিতরণের পর উৎসব শেষ হয়।

এতদ্ব্যতীত আমরা ঢাকা নারায়ণগঞ্জ ও বালিয়াটী কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত স্বামীজির জন্মোৎসব-সংবাদ পাইয়াছি।

**নিউইয়র্ক রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ বেদান্ত-কেন্দ্রে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আবক্ষ মূর্তি-প্রতিষ্ঠা**—গত ১১ই জানুয়ারী এই প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন ধর্মের প্রতিনিধিগণের উপস্থিতিতে শ্রীরামকৃষ্ণ-দেবের একটি আবক্ষ মূর্তির আবরণ উন্মোচিত হইয়াছে। মার্কিনদেশের নারী-ভাস্কর মিস্ ম্যাল্ভিনা হফ্‌ম্যান্ মূর্তিখানি নির্মাণ করিয়াছেন। গত বৎসর ইঁহার নির্মিত স্বামী বিবেকানন্দের একখানি মূর্তি এই বেদান্ত-কেন্দ্রে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। নিউইয়র্ক বেদান্ত-কেন্দ্রের অধ্যক্ষ স্বামী নিখিলা-নন্দজী ভারতের রাষ্ট্রপতি ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদ-প্রেরিত একটি বাণী পাঠ করেন। ডক্টর প্রসাদ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করিয়া বলেন যে, পরমহংসদেব ভারতীয় ঋষিগণের আধ্যাত্মিক বাণী-প্রচারের দ্বারা স্বামী বিবেকানন্দ প্রমুখ অন্যান্যকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছেন। এই উপলক্ষে বেদান্ত-কেন্দ্রে স্থানীয় অনেক নরনারীর সমাগম হইয়াছিল।

**স্যান্‌ফ্রান্‌সিস্‌কো বেদান্ত সোসাইটি**—গত নভেম্বর মাসে এই প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে অধ্যক্ষ স্বামী অশোকানন্দজী নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়াছেন: (১) ‘কুণ্ডলিনী বা

মানুষের অন্তর্নিহিত সুপ্ত শক্তি' (২) 'জগৎ কি সত্য না মিথ্যা ?' (৩) 'নীরবতার শক্তি' (৪) 'সাধকের দিনপঞ্জী' (৫) 'ব্যষ্টি ও সমষ্টি-শক্তির উৎস' (৬) 'মনঃসংযম ও জ্ঞানোন্মেষ'।

এতদ্ব্যতীত সহকারী স্বামী শান্তস্বরূপানন্দজী (১) 'অনর্থ অজ্ঞান-প্রসূত' এবং (২) 'ভগবানকে কোথায় খুঁজিতেছ' সম্বন্ধে দুইটি বক্তৃতা করেন।

**লণ্ডন রামকৃষ্ণ বেদান্ত-কেন্দ্র**—৬৩ ক্রমওয়েল রোড্, লণ্ডন-স্থিত এই প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে স্বামী ঘনানন্দজী গত অক্টোবর, নভেম্বর ও ডিসেম্বর মাসত্রয়ে কিংস্ওয়ে হলে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন: (১) 'ব্যক্তিত্বের পূর্ণাঙ্গীকরণ' (২) 'ভারতীয় মনস্তত্ত্ব' (৩) 'জগতের মহান্ আচার্যগণ' (৪) 'সংক্ষেপে বেদান্ত' (৫) কর্মযোগ' (৬) 'কর্তব্যের ধারণা' (৭) 'ঈশ্বর, আত্মা ও ধর্ম' (৮) 'মুক্ত আত্মা' (৯) 'প্রাচ্যদেশীয় ধর্মাচার্য যীশু'।

এতদ্ব্যতীত বেদান্ত-কেন্দ্রের অনুরাগী ও সদস্যগণের নিকট ধ্যান ও সাধারণ ধর্মোপদেশের সহিত 'ভগবদ্গীতা' ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

### নবপ্রকাশিত পুস্তক

**Religion And Dharma**—By Sister Nivedita. With a preface by S. K. Ratcliffe. Published by Swami Yogeshwarananda, Advaita Ashrama, Mayavati, Almora, Himalayas. 150 pages. Price: Rs. 2/-, Deluxe: Rs. 3/8. To be had of Advaita Ashrama, 4, Wellington Lane, Calcutta—13.

---

# বিবিধ সংবাদ

**আচার্য স্বামী বিবেকানন্দের নবতিতম জন্মোৎসব**—নিম্নলিখিত প্রতিষ্ঠান-সমূহে অনুষ্ঠিত হইয়াছে:

**দেরাদুনে**—স্থানীয় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের সহায়তায় বঙ্গীয় সংস্কৃতি সংসদের উদ্যোগে গত ৬ই মাঘ এই উপলক্ষে সার্ভে কলোনী স্কুলে শ্রী সি সি সেনের সভাপতিত্বে আহূত এক সভায় স্বামী আত্মস্থানন্দজী, অধ্যাপক শ্রী জে এম দে, শ্রীকেশব মিশ্র, শ্রীনারায়ণ নাথ ও শ্রীনরেশ পাল আচার্য স্বামী বিবেকানন্দ-সম্বন্ধে মনোজ্ঞ বক্তৃতা দেন। ডাক্তার শ্রীঅমৃতলাল দত্ত ইহার অন্যতম প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন।

**পুরুলিয়ায়**—গত ৬ই মাঘ শ্রীভুজঙ্গভূষণ ঘোষের নীলকুঠীডাঙ্গায় বাটীতে এই উপলক্ষে পূজাদি-অন্তে অপরাহ্ণে এক টি-পার্টিতে স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ সমবেত হইয়াছিলেন। এই সম্মেলনে স্বামীজি-সম্বন্ধে আলোচনা হয়।

**নবদ্বীপ শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাসমিতিতে**—গত ৬ই মাঘ বিশেষ পূজা ও সঙ্গীতের অনুষ্ঠান হয় এবং পরদিন এই প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে স্থানীয় পোড়ামাতলায় কৃষ্ণনগর কলেজিয়েট স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীতামসরঞ্জন রায়ের সভাপতিত্বে আহূত এক জনসভায় সাহিত্যিক শ্রীসাহাজী একটি কবিতা পাঠ করিলে উক্ত সমিতির সম্পাদক স্বামী চিন্ময়ানন্দজী, সাহিত্যিক শ্রীরমণীকুমার দত্তগুপ্ত, পণ্ডিত শ্রীদিগিন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য, স্বামী সুন্দরানন্দজী এবং পণ্ডিত শ্রীগোপেন্দুভূষণ সাংখ্যতীর্থ স্বামীজির জীবনী ও বাণীর বিভিন্ন দিক

সম্বন্ধে সময়োপযোগী বক্তৃতা দেন। শেষে সভাপতির পাণ্ডিত্যপূর্ণ অভিভাষণের পর সভার কার্য শেষ হয়।

**আমেদাবাদ শ্রীবিবেকানন্দ-মণ্ডলী পাঠচক্রে**—গত ৬ই মাঘ সমূহ-বেদমন্ত্র-উচ্চারণ সমূহ-ধ্যান নামধুন প্রবচন সমূহ-প্রার্থনা প্রভৃতি হইলে স্বামী কেবলানন্দজী ও শ্রীকৃপাশঙ্কর পণ্ডিত স্বামীজি-সম্বন্ধে হৃদয়গ্রাহী আলোচনা করেন।

**কলিকাতা বিবেকানন্দ সোসাইটির উদ্যোগে ইউনিভারসিটি ইনষ্টিটিউট হলে**—গত ২০শে মাঘ আচার্য স্বামী বিবেকানন্দের স্মৃতি-সভা অনুষ্ঠিত হইয়াছে। নির্বাচিত সভাপতি পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল মাননীয় শ্রীহরেন্দ্র কুমার মুখার্জি অসুস্থতানিবন্ধন উপস্থিত হইতে না পারায় সভায় পৌরোহিত্য করেন স্বামী সুন্দরানন্দজী। সভার প্রারম্ভে শ্রীমতী বিজন ঘোষ-দস্তিদার বিবেকানন্দ-প্রশস্তিবাচক একটি উদ্বোধন-সঙ্গীত গান করেন। সোসাইটির সম্পাদক শ্রীপ্রকাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক বার্ষিক কার্যবিবরণী পঠিত হইলে শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, ডক্টর শ্রীরমা চৌধুরী, ডক্টর শ্রীনলিনীকান্ত ব্রহ্ম, শ্রীঅমরগোপাল নন্দী, স্বামী সৎস্বরূপানন্দজী ও সভাপতি স্বামী বিবেকানন্দের জীবনবেদ ও বাণীর বিভিন্ন দিক-সম্বন্ধে পাণ্ডিত্যপূর্ণ ও হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা দেন। সভায় বিপুল লোকসমাগম হইয়াছিল এবং স্বামীজির একখানি সুসজ্জিত ধ্যানস্থ প্রতিকৃতি সভার গাম্ভীর্য বৃদ্ধি করিয়াছিল।

**সুরেন্দ্রনাথ কলেজে**—গত ৪ঠা মাঘ এক ছাত্রসভায় স্বামী সুন্দরানন্দজী ও শ্রীরমণীকুমার দত্তগুপ্ত 'বিবেকানন্দের শিক্ষা' সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। সভাপতি কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীপ্রফুল্লকুমার গুহ স্বামী বিবেকানন্দের জীবনী ও শিক্ষা অনুসরণ করিতে ছাত্রসমাজকে আহ্বান করেন। একটি বিবেকানন্দ-প্রশস্তি গান করেন শ্রীপ্রমথনাথ গাঙ্গুলী। সভায় স্বামীজির একখানি প্রতিকৃতি সুসজ্জিত করিয়া রাখা হইয়াছিল।

**প্রাচ্যবাণী-মন্দির**—গত ৬ই ও ৭ই মাঘ কলিকাতা রাজভবন মার্বেল হলে এই প্রতিষ্ঠানের অষ্টমবার্ষিক অধিবেশন সমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। এই উপলক্ষে প্রথম দিন রাজ্যপাল ডক্টর শ্রীহরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় এবং ডক্টর যদুনাথ সরকার যথাক্রমে সভাপতি ও প্রধান অতিথিরূপে এবং ডক্টর শ্রীনলিনীরঞ্জন সেনগুপ্ত উদ্বোধন-প্রসঙ্গে প্রাচ্যবাণী-মন্দিরের কার্যপদ্ধতি ও গবেষণা-গ্রন্থাবলীর সুখ্যাতি করিয়া মনোজ্ঞ বক্তৃতা দেন। পরদিন প্রাচ্যবাণী ছাত্রদিবস উদ্‌যাপিত হয়। ইহাতে পাঁচ শতাধিক ছাত্রছাত্রী যোগদান করে। এই সভায় শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত পৌরোহিত্য করেন এবং রাজ্যপালের পত্নী শ্রীবঙ্গবালা মুখোপাধ্যায় প্রধান অতিথির আসনে অধিষ্ঠিত হন। প্রেসিডেন্সি বিভাগের কমিশনার শ্রীযতীন্দ্রনাথ তালুকদার সভার উদ্বোধনপ্রসঙ্গে সংস্কৃত-সাহিত্যের ভূয়সী প্রশংসা করেন। শেষে প্রাচ্যবাণী-মন্দিরের যুগ্মসম্পাদক ডক্টর শ্রীযতীন্দ্রবিমল চৌধুরী সংস্কৃতশিক্ষার বহুল প্রচারের জন্য একটি সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়-স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা-সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। উভয় দিনই মন্দিরের সদস্যগণ মহাকবি ভাস-রচিত 'প্রতিমানাটক' সংস্কৃত ভাষায় অভিনয় করিয়া সমবেত সুধীবৃন্দের মনোরঞ্জন বিধান করেন।

# সমুচ্চয়বাদ

সম্পাদক

আচার্য সুরেশ্বর তাঁহার একাধিক গ্রন্থে ব্রহ্মদত্ত, মণ্ডনমিশ্র ও ভর্তৃপ্রপঞ্চ-প্রচারিত সমুচ্চয়বাদ খণ্ডন করিয়াছেন। এই প্রবন্ধে ঐ জটিল বিষয়ের সারমর্ম সহজ ভাষায় অতি সংক্ষেপে প্রদত্ত হইল :

ব্রহ্মদত্তের মতে ভাবনা-জনিত সাক্ষাৎকারাত্মক জ্ঞান হইতে অজ্ঞাননিবৃত্তি হয়, বেদান্তবাক্যজন্ম জ্ঞান হইতে অজ্ঞান-নিবৃত্তি হয় না। তিনি বলেন, বেদান্তবাক্য যথাযথ শ্রবণ-মননের পর 'অহং ব্রহ্মাস্মি' ইত্যাকার পরোক্ষ জ্ঞান হইয়া থাকে। ইহার পর অপরোক্ষ জ্ঞানের জন্ম দীর্ঘকাল উপাসনা করা একান্ত আবশ্যক। সাধন করিতে করিতে ভাবনা বা ধ্যান ক্রমে উৎকর্ষপ্রাপ্ত হইলে অপরোক্ষ জ্ঞান জন্মে এবং ইহা দ্বারা অজ্ঞান পূর্ণরূপে নিবৃত্ত হয়। তিনি লিখিয়াছেন—"দেবো ভূত্বা দেবান্ অপ্যেতি" এই শ্রুতিই ইহার প্রমাণ। ইহার আশয় এই যে, ভাবনা বা ধ্যানের চরম উৎকর্ষে দর্শন এবং দেহপাতের পর উপাস্য দেবতার প্রাপ্তি হয়।

ব্রহ্মদত্ত কর্মকাণ্ডের ন্যায় উপনিষৎকেও বিধিপ্রধান বলিয়াছেন। তাঁহার মতে উপনিষদের বিধি কর্মবিধি নহে, পরন্তু উপাসনা-বিধি। এই উপাসনা ভাবনাত্মক। 'আত্মানমেব প্রিয়মুপাসীত' ইত্যাকার উপাসনা-বিধিতেই উপনিষদ্-বাক্যের তাৎপর্য। তিনি বলেন, 'তত্ত্বমসি'-বাক্য মুখ্য নহে। কারণ, ইহাতে উপাসনার বিষয়মাত্র নির্দিষ্ট হইয়াছে। তাঁহার মতে বেদান্তবাক্য-জন্ম জ্ঞান দ্বারা মোক্ষ হয় না, কিন্তু প্রসংখ্যানের (আত্মানুসন্ধান) জন্ম উহা আবশ্যক। যতক্ষণ পর্যন্ত অবিদ্যানিবৃত্তি অথবা ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার না হয়, ততক্ষণ সাধনকর্ম আবশ্যক। শংকর বলেন যে, 'তত্ত্বমসি' ইত্যাদি বেদান্তবাক্যজনিত জ্ঞান দ্বারা উত্তম অধিকারী পুরুষ ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার করিতে পারেন। কিন্তু ব্রহ্মদত্তের মতে ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার করিতে উক্ত জ্ঞান-অর্জনের পর উপাসনা বা ধ্যানের আবশ্যকতা আছে। তিনি বলেন, উপনিষদ্‌জ্ঞান এবং মুক্তিপ্রাপ্তির মধ্যে বৈদিক কর্মানুষ্ঠান অপেক্ষিত। এই জন্ম তাঁহার মতে জ্ঞানের সঙ্গে কর্মের সমুচ্চয় স্বীকার্য।

মণ্ডনমিশ্রের মতেও ক্রিয়া বা উপাসনাতেই উপনিষদ্‌বাক্যের তাৎপর্য। 'তত্ত্বমসি' ইত্যাদি বাক্য বিধি-বাক্যের অধীন। তিনি বলেন, শ্রাবণ জ্ঞানের পর উপাসনা অর্থাৎ ধ্যানাদি আবশ্যক। কারণ, বেদান্তবাক্য দ্বারা যে 'অহং ব্রহ্ম' ইত্যাকারক জ্ঞান হয়, উহা সংসর্গাত্মক জ্ঞান। এই জন্ম উহা দ্বারা অজ্ঞানের নিবৃত্তি এবং আত্মস্বরূপের ঠিক ঠিক জ্ঞান হয় না। "বিজ্ঞায়

প্রজ্ঞাং কুর্বীত ব্রাহ্মণঃ" এই শ্রুতিই ইহার প্রমাণ। ইহার অর্থ—বিজ্ঞানের অনন্তর ব্রহ্মকে জানিয়া প্রজ্ঞার সাধন করিতে হইবে। মণ্ডনের মতে সাক্ষাৎকারাত্মক অসংসর্গাত্মক জ্ঞানের নিরন্তর ক্রিয়াভ্যাসই অজ্ঞান-নিবৃত্তির উপায়। এই জন্ম সমুচ্চয় আবশ্যক।

মণ্ডন বলেন, বৈদিক বা লৌকিক সকল প্রকার বাক্য হইতেই সংসর্গাত্মক অর্থ হৃদয়ঙ্গম হয়। এজন্য তত্ত্বমস্যাদি বাক্য হইতেও 'অহং ব্রহ্ম' ইত্যাকার সংসর্গাত্মক জ্ঞান প্রথম উৎপন্ন হইতে পারে। অতঃপর প্রত্যগাত্ম-বিষয়ক 'অহং ব্রহ্ম' ইত্যাকারক অবাক্যার্থরূপ জ্ঞান যতক্ষণ আবির্ভূত না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত নিদিধ্যাসনের অভ্যাস অপরিহার্য। এই জ্ঞান হইতেই কৈবল্যলাভ হয়। মণ্ডনের বক্তব্য এই যে, যখন সংসর্গবুদ্ধি উৎপন্ন করাই শব্দের স্বভাব, তখন উহা দ্বারা অবাক্যার্থ জ্ঞানের আশা করা যায় না। এই জন্ম শাব্দ জ্ঞান অপেক্ষিত। ইহা হইতে যথার্থ জ্ঞান উৎপন্ন হইলে উহা দ্বারা অবাক্যার্থ-প্রতিপত্তি হয়।

ভর্তৃপ্রপঞ্চের মতেও সমুচ্চয় আবশ্যক। ইনি ভেদাভেদবাদী অর্থাৎ ভেদ ও অভেদ উভয়কেই সত্য বলিয়া মনে করিতেন। ভেদ সত্য হওয়ায় কর্ম অপেক্ষিত এবং অভেদ সত্য হওয়ায় উহার উপলব্ধির জন্ম জ্ঞানও অপেক্ষিত। এইজন্ম মুমুক্ষুর পক্ষে জ্ঞান ও কর্মের সমুচ্চয় আবশ্যক। ভর্তৃপ্রপঞ্চ বলেন, অভেদ মানিলে 'অহং ব্রহ্মাস্মি' জ্ঞান উৎপন্ন হইতে পারে না। এজন্ম তাঁহার মতে ব্রহ্ম ভিন্নাভিন্নাত্মক।

সুরেশ্বর এই তিনটি মতই খণ্ডন করিয়া আচার্য শংকরের মত স্থাপন করিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন যে, প্রসংখ্যান উপাসনা বা ধ্যানাদির আবশ্যকতা শংকরও স্বীকার করিয়াছেন বটে, কিন্তু এই আচার্যপ্রবরের মতে একমাত্র উপনিষদ্‌বাক্য হইতেই সাক্ষাৎরূপে ব্রহ্মস্বরূপের পরিজ্ঞান হয়। এই জ্ঞান ধ্যানাদি অপেক্ষিত আগন্তুক ধর্ম নহে। আগন্তুক গুণ নশ্বর। আত্মা সচ্চিদানন্দস্বরূপ। অজ্ঞান-মেঘ দূরীভূত হইলেই সূর্যের ন্যায় আত্মা স্বতঃই প্রকাশিত হন। সুরেশ্বর বলেন, বাক্য হইতে সংসৃষ্ট বা অসংসৃষ্ট অথবা পরোক্ষ বা অপরোক্ষ যে জ্ঞান হয়, ইহার নিশ্চয় প্রমেয়ের অধীন। অসংসৃষ্ট ব্রহ্ম বস্তুতঃ প্রত্যগাত্মা হইতে অভিন্ন বলিয়া তত্ত্বমস্যাদি বাক্য দ্বারা অপরোক্ষ জ্ঞান হইতে কোন বাধা নাই। এই কারণে বেদান্তজ্ঞানের জন্ম প্রসংখ্যানের সহকারিতা অপেক্ষিত নহে। কিন্তু নিম্ন-অধিকারী প্রসংখ্যান দ্বারা উচ্চ-অধিকার লাভ করিতে পারেন। ইহার ফলে তিনি মহাবাক্য-সমূহের যথার্থ অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিবার যোগ্যতা অর্জন করেন। সুরেশ্বরের মতে প্রসংখ্যান দ্বারা অপরোক্ষ জ্ঞানের প্রতিবন্ধের নিবৃত্তি হয়। প্রতিবন্ধকের অভাবে ইন্দ্রিয় অথবা শব্দাত্মক প্রমাণ-নিরপেক্ষ হইয়াই অপরোক্ষ জ্ঞান প্রকাশ পাইয়া থাকে। তিনি বলেন, প্রসংখ্যান প্রমাণ নহে। এই প্রসংখ্যান বা নিদিধ্যাসনাদি শব্দ-জন্য আত্মজ্ঞানের পরবর্তী হইতে পারে না, পরন্তু উহারা আত্মজ্ঞানের পূর্ববর্তী।

এই সংক্ষিপ্ত আলোচনায় প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, সুরেশ্বর ও মণ্ডনমিশ্র এক ব্যক্তি নহেন। উভয়ের মতে যথেষ্ট পার্থক্য আছে। এইজন্য যাঁহারা বলেন যে, মণ্ডনমিশ্র আচার্য শংকরের নিকট বিচারে পরাজিত হইয়া তাঁহার শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়া সুরেশ্বর-নামে পরিচিত হন, তাঁহাদের মত যথার্থ নহে।

---

# সাহিত্যে নারীর দান

ডক্টর শ্রীমতী রমা চৌধুরী

দোষত্রুটি-সত্ত্বেও বর্তমান বঙ্গসাহিত্যের যে দিগ্‌বিদিক্-প্রসারী বিজয়যাত্রার শুভ দুন্দুভি-নিনাদ ধ্বনিত হচ্ছে, তাই আজ আমাদের নূতন আশার বাণী শোনাচ্ছে। গল্প উপন্যাস কবিতা সমালোচনা বিজ্ঞান-শিল্পকলা মাসিকপত্র, দৈনিক-পত্র-সম্পাদন প্রভৃতি প্রায় প্রত্যেক বিভাগেই বাংলার দান ভারতীয় সাহিত্যে অতুলনীয় বল্‌লেও কিছুমাত্র অত্যুক্তি হয় না। সর্ববাদিক্রমে বাংলা ভারতের শ্রেষ্ঠ, সমৃদ্ধতম, সর্বাপেক্ষা প্রাণবন্ত, সর্বাপেক্ষা বর্ধনশীল ভাষা এবং জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ ভাষাসমূহের অন্যতম। আধুনিক বাংলা-সাহিত্যের দুটি প্রধান বিচ্যুতি আজ কোনো কোনো ক্ষেত্রে (সব ক্ষেত্রে নয় অবশ্য) পাঠক-সমাজকে পীড়িত ও উদ্‌ভ্রান্ত করছে—ভাবের দিক্ থেকে অত্যধিক বস্তুতান্ত্রিকতা, ভাষার দিক্ থেকে অত্যধিক উচ্ছৃঙ্খলতা। কিন্তু এই দুটি লক্ষণই বাঙালীর প্রকৃতিবিরুদ্ধ। বাঙালী সর্বদাই আদর্শবাদী, স্বপ্নবিলাসী, নিয়মতান্ত্রিক। এই দুই আপাত-বিরুদ্ধ গুণের সমন্বয়ে যুগে যুগে বাঙালীই প্রথম স্বপ্ন দেখেছে রাষ্ট্রীয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিপ্লবের, আবার বাঙালীই জীবনপণ করে সেই স্বপ্নকে বাস্তবে পরিণত করেছে। বরঞ্চ অত্যধিক ভাবে আদর্শবিলাসী ও অত্যধিক ভাবে প্রাচীনপ্রেমিক বলেই ত বাঙালীর দুর্নাম। হয়ত এই অত্যধিকতার প্রকোপেই হয়েছে আজ উদয় বিপরীত দিকে অত্যধিকতার। সেজন্য উদ্‌গ্রীব হবার কিছু হয়ত নেই। যা স্বভাববিরুদ্ধ, তা স্বভাবতঃই ক্ষণস্থায়ী। তা সত্ত্বেও বাংলা-সাহিত্যের প্রাণের অবাধ, উচ্ছল গতি যাতে হঠকারিতা ও অর্বাচীনতার উপলখণ্ডে ব্যাহত হয়ে রুদ্ধ না হয়, সে দিকে দৃষ্টি রাখা কর্তব্য।

এদিকে নারীদের বিশেষ কর্তব্য আছে। বাংলা, তথা ভারতীয় বা সংস্কৃত-সাহিত্যের একটি প্রকৃষ্টতম বৈশিষ্ট্য হল এই যে, সৃষ্টির আদি থেকে এই সাহিত্য পুরুষের সঙ্গে সঙ্গে নারীদের দানেও সুসমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে। জগতের অন্য কোনো সাহিত্য যেমন সেদিক্ থেকে ভারতীয় বা সংস্কৃত-সাহিত্যের সঙ্গে তুলনীয় নয়, ভারতের অন্য কোনো প্রাদেশিক সাহিত্যও ঠিক তেমনি সেদিক্ থেকে বাংলা-সাহিত্যের সঙ্গে তুলনীয় নয়। জগতের প্রাচীনতম গ্রন্থ ঋগ্বেদেই আমরা ঘোষা গোধা বিশ্ববারা প্রমুখ ২৭ জন নারী-ঋষিরচিত সূক্ত পাই। পরবর্তী যুগেও ভারতীয় নারীগণ সংস্কৃত-সাহিত্যের প্রায় প্রত্যেক বিভাগ তাঁদের রচনাবলী দ্বারা সমৃদ্ধতর করে গিয়েছেন। সেজন্য সুবিখ্যাত কবি নাট্যকার ও আলঙ্কারিক তাঁর সুপ্রসিদ্ধ 'কাব্য-মীমাংসা'-নামক গ্রন্থে বলেছেন—"পুরুষবদ্‌যোষিতোঽপি কবীভবেয়ুঃ। সংস্কারো হ্যাত্মনি সমবৈতি, ন স্ত্রৈণং পৌরুষং বা বিভাগমপেক্ষতে। শ্রূয়ন্তে দৃশ্যন্তে চ রাজপুত্র্যো মহামাত্য-দুহিতরো গণিকাঃ কৌতুকিভার্যাশ্চ শাস্ত্র-প্রহতবুদ্ধয়ঃ কবয়শ্চ।"

সংস্কৃত-সাহিত্যে কাব্যরচনায় শীলা ভট্টারিকা, বিজ্জা, গঙ্গা দেবী, তিরুমলাম্বা প্রভৃতি, স্মৃতিশাস্ত্র-রচনায় লক্ষ্মী দেবী, তন্ত্রে প্রাণমঞ্জরী, পৌরাণিক রচনায় বীণবায়ী প্রভৃতি বহু মহীয়সী রমণী স্থায়ী

আসন ভাষায় লাভ করেছেন। বৌদ্ধথেরী—উপ্পলবণ্ণা অম্বপালি ক্ষেমা শুভা সুমেধা ইসিদাসী প্রমুখ কবির নাম পালিতে ও অনুলব্ধা অবন্তিসুন্দরী প্রভৃতির নাম স্বর্ণাক্ষরে লিখিত আছে। বঙ্গ-সাহিত্যেও নারীর দান গৌরবোজ্জ্বল এবং সংখ্যাতেও স্বল্প নয়। স্বর্ণকুমারী দেবী, গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী, মানকুমারী বসু, কামিনী রায়, নিরুপমা দেবী, অনুরূপা দেবী প্রভৃতির প্রখ্যাতি সর্বজনস্বীকৃত। এ সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণী এস্থলে দেওয়া নিষ্প্রয়োজন মনে করি। তবে আজকের দিনে এটি অবশ্য স্মরণীয় যে, নারীদের দানে ভারতীয় সাহিত্য চিরকাল সংপুষ্ট।

সাহিত্যের সুবর্ণক্ষেত্রে নারীদের বিশেষভাবে কোন্ স্বর্ণ বীজ রোপণ করে, কোন বিশেষ সুবর্ণ ফল লাভ করে দেশকে ঐশ্বর্যশালী করে তুলতে হবে—সে বিষয়ে আধুনিক নারীপ্রগতির দিনে প্রশ্ন স্বভাবতঃই উঠতে পারে। প্রশ্ন অবশ্য আজ আর এই নয় যে, নারীদেরও সহায়তা ও দান এক্ষেত্রে অত্যাবশ্যক কি না—আজ এ সত্যটি সানন্দে সকলেই স্বীকার করে নিয়েছেন যে, জীবনের ক্ষুদ্র-বৃহৎ, আভ্যন্তরীণ-বাহ্যিক, নিত্য-নৈমিত্তিক, প্রত্যেক ক্ষেত্রেই পুরুষদের সঙ্গে সঙ্গে নারীদেরও সমান গুরুত্বপূর্ণ অর্ধাংশ গ্রহণ করা শুধু বাঞ্ছনীয় নয়, অবশ্যপ্রয়োজনীয়ও। কিন্তু প্রশ্ন এই যে, নারীদের নিজস্ব বিশেষ দান অন্যান্য ক্ষেত্রের সঙ্গে সাহিত্য-ক্ষেত্রেও অত্যাবশ্যক কি না। এস্থলে সন্দেহের উদয় হতে পারে যে, নরনারীর সমান শক্তি-সামর্থ্য, সমান কর্তব্য অধিকার যখন আজ শাসনতন্ত্রে স্বীকৃত হয়েছে, তখন নারীদের বিশেষ কর্তব্য কর্ম বা দানের প্রশ্ন আর উত্থাপন করা চলে না। সেজন্য, এখন থেকে রাষ্ট্র সমাজ সাহিত্য প্রভৃতি বিভিন্ন ক্ষেত্রে নরনারী-নির্বিশেষে প্রত্যেকেই একই ভাবে, অভিন্ন ভাবে দান করে যাবেন—এইটিই প্রার্থনীয়।

আমাদের শাসনতন্ত্রে নরনারীভেদে যে কোনরূপ অধিকারগত বা আইনগত পার্থক্য করা হয়নি—তা আমাদেরই শাশ্বত সভ্যতা-সংস্কৃতি-সম্মত। ভারতে মানুষ চিরকাল মানুষ বলেই সম্মানার্হ হয়েছে—স্ত্রীপুরুষ-ভেদ, জাতিভেদ বা পদমর্যাদা-ভেদের জন্য নয়—পরবর্তী যুগে দেশাচারে তা যতই কদর্য হোক না কেন। "ন মনুষ্যাৎ শ্রেষ্ঠতরং হি কিঞ্চিৎ" ( মহাভারত ), "সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই" ( চণ্ডীদাস )—এটাই আমাদের কৃষ্টি ও সংস্কৃতির শাশ্বত বাণী ; কিন্তু পূর্বেই বলা হয়েছে যে, ভারত যেমন একদিকে বহুর মধ্যে একের মঙ্গলময় স্বরূপ শাশ্বত কাল উপলব্ধি করেছে, ঠিক তেমনি অন্যদিকে সে একের মধ্যেও বহুর ব্যক্তিত্ব ও স্বতন্ত্র সত্তা সমান আনন্দ ও গৌরবের সঙ্গে স্বীকার করেছে। সেজন্য জীবনের প্রতিক্ষেত্রে নরনারীর সমান কর্তব্য-অধিকার থাকলেও প্রতিক্ষেত্রেই আবার নর ও নারীভেদে বিশেষ বিশেষ কর্তব্য-অধিকারও নিশ্চয় আছে। যথা, স্ত্রীপুরুষের প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য-ভেদে গৃহে নারীর ও বাহিরে পুরুষের কর্তব্য-অধিকারের তারতম্য অকাট্য সত্য। একই ভাবে জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও নরনারীর সমান শক্তি ও অধিকার স্বীকার করে নিয়েও সাহিত্যের কুসুম-কুঞ্জে নারী যে কয়েকটি বিশেষ কুসুম-বৃক্ষ বিশেষভাবে রোপণ ও বর্ধন করবেন, তা স্বীকার করতে বাধা নেই।

পুরুষ অপেক্ষা নারীর মন সূক্ষ্মতর, অধিকতর অনুভববিশিষ্ট তন্ত্রীতে বাঁধা সন্দেহ নেই। পুরুষ উপলব্ধি করে বুদ্ধির মাধ্যমে, বাইরে থেকে ; নারী উপলব্ধি করে হৃদয়ের সাক্ষাৎ সংস্পর্শে, মর্মের ভিতর থেকে। পুরুষ প্রত্যক্ষ করে জগৎকে

দ্রষ্টব্য বস্তুরূপে. স্বীয় সত্তা থেকে পৃথক্ করে, নারী প্রত্যক্ষ করে জগৎকে অনুভাব্য বস্তুরূপে, স্বীয় সত্তার সঙ্গে একীভূত করে। সমগ্র বিশ্বকে একটি অখণ্ড সমগ্র সার্বজনীন সত্তারূপে সাক্ষাৎ অনুভূতি নারীর পক্ষে যেমন সহজাত, পুরুষের পক্ষে হয়ত ঠিক তেমন নয়। প্রকৃতি গঠন করেছেন নারীকে মাতৃস্বরূপিণী-রূপে। মাতাই হলেন সমগ্র পরিবারের ভারকেন্দ্র, মিলনসূত্র। পরিবারের বিভিন্ন ব্যক্তিগণের আপাত-বিরোধী স্বার্থ মাতারই চরণতলে এসে সকল বিরোধ বর্জন করে একাভিমুখী হয়ে সংসারের সমতা রক্ষা করে। সেজন্য ভেদের মধ্যে অভেদ, বিচ্ছেদের মধ্যে মিলন, বহুর মধ্যে একের মঙ্গলময় উপলব্ধি বিশেষ করে নারীরই ধর্ম, পুরুষের নয়। এই সার্বজনীন অনুভূতিই সকল সৃষ্টির মূল প্রেরণা। ছিন্ন বিচ্ছিন্ন উৎপাদন উৎপাদনই মাত্র, সৃষ্টি নয়। সৃষ্টির মধ্যে আছে স্বীয় সত্তাকে প্রকাশের আকৃতি—প্রয়োজনের অনুরোধে নয়, উদ্বেল আবেগের, আনন্দের, পরিপূর্ণতার অদম্য অনুপ্রেরণায়। এই আবেগের স্বতঃস্ফূর্ত লীলাভূমি রমণীর রমণীয় মন।

সেজন্যই নারী আজন্ম আদর্শবাদী, আজন্ম কবি, আজন্ম দরদী, মরমী ভাবের ভাবুক। জগতের আদিকবি নারী—প্রাত্যহিক জীবনের ছোট খাট কাজে: কোলের ছেলেকে ঘুম পাড়াতে, জল আনতে, ধান ভানতে—নারীরই কণ্ঠে ধ্বনিত হয়ে উঠেছে অলিখিত, অজ্ঞাত কত গীত, কত গাথা। সাহিত্য-রচনা নারীর এরূপে সহজাত প্রবৃত্তি, স্বভাবজ শক্তি। নারীর 'অশিক্ষিত-পটুত্ব' সত্যই যদি কোনো ক্ষেত্রে থাকে ত তা সাহিত্যের ক্ষেত্রেই প্রধান। প্রকৃতির ক্ষেত্রে যেমন, মানসক্ষেত্রেও ঠিক তেমনি নারী আজন্ম স্রষ্ট্রী—নবজীবনের নব-ভাবের নবজনয়িত্রী।

আজ সেই সৃষ্টির সার্বজনীন প্রেরণাকে, সেই আদর্শের মানসমূর্তিকে সাহিত্যের মাধ্যমে নারীকে স্থায়ী রূপ দিতে হবে। এতদিন যা ছিল স্বভাবজ 'অশিক্ষিতপটুত্ব'-মাত্র, শিক্ষার আলোকে তাকে উজ্জ্বলতর করে তারই আলোকে পুনরায় ভাস্বর করে তুলতে হবে আমাদের জাতীয় সাহিত্যকে। আমাদের সাহিত্যের মধ্যে ফুটে উঠবে এক বিশ্বজনীন চেতনার অখণ্ড আভাস—তবেই সে উন্নীত হবে শাশ্বত বিশ্ব-সাহিত্যে। এই বিশ্বজনীন চেতনা, এই উদার দৃষ্টিভঙ্গী, এই সার্বজনীন প্রাণের স্পন্দন দেবে আমাদের সাহিত্যকে বিশ্বজনীন আকর্ষণ, বিশ্বজনীন সৌন্দর্য ও উপভোগ্যতা। বিশ্বজননীর মূর্ত প্রতিচ্ছবি নারীদের এই হবে সাহিত্যে বিশেষ দান।

যেমন পরিবারের তেমনি সাহিত্যেরও নারী হবে বিশেষ 'বিবেক-রক্ষক'। সাহিত্যের আদর্শ পরমসুন্দরের আদর্শ। 'পরমসুন্দর' ও 'চরম-শুচি' সমার্থক। যা অশুচি তার সৌন্দর্য নেই, থাকতে পারে না। বাস্তব জগতের কুশ্রীতা বীভৎসতা অশুচিতা নীচতা প্রভৃতি যা আছে, তাদের ঠিক সেই ভাবেই, ঠিক সেই নগ্ন, কর্কশ কুৎসিত ভয়ঙ্কর ভাবেই বর্ণনা করলে তা যতই বাস্তব প্রতিচ্ছবি হোক না কেন, সাহিত্য-পদবাচ্য নয়। 'পরমসুন্দর' ও 'পরমশুচি', পুনরায় 'পরম-শিব' ও 'পরম-আনন্দের' সঙ্গে সমার্থক। যা অসুন্দর তা অশুচি, যা অশুচি তা অশিব, তা কোনোদিনই প্রকৃত কল্যাণ ও মঙ্গলের হেতু হতে পারে না। পরিশেষে, যা অশিব তা নিরানন্দ; কেবল মঙ্গলই আনে প্রকৃত শান্তি ও আনন্দ। এরূপে সংসারের ক্ষেত্রে সুন্দর = শুচি = শিব = আনন্দ—এই যে শাশ্বত, মূলগত equation বা সমীকরণ ও সমর্থীকরণ নিহিত রয়েছে, সাহিত্যের ক্ষেত্রেও তারই প্রতিফলন

অত্যাবশ্যক। জীবনের মূলগত সত্যকে সাহিত্য অবজ্ঞা বা অবহেলা করতে অসমর্থ। সেজন্ম জীবনে যেমন, সাহিত্যেও তেমনি সেই সত্যং শিবং সুন্দরম্-এর প্রতিচ্ছবি উদ্ভাসিত করে তুলতে হবে—তবেই ত হবে জীবন ও সাহিত্য ধন্য ও সার্থক। সাহিত্যের এই শ্রী সুরুচি ও শালীনতা নারীদের হাতেই বিশেষ ভাবে ফুটে উঠবে বলে আমরা আশা করি। কারণ, শুচিতা শালীনতা বিশেষভাবে নারীরই জীবনের জীবন।

সাহিত্য-ক্ষেত্রে আরেকটি দিক্ থেকেও নারীদের দান হবে বিশেষ আদরণীয়; সেটি হচ্ছে sense of proportion and equanimity—সমতা সৌষ্ঠব ও সামঞ্জস্য-জ্ঞান। যেখানে মনের গতি অবাধ, যেখানে হৃদয়ের লীলাখেলা উদ্দাম, সেই সাহিত্যক্ষেত্রে মনের ভাবনাপুঞ্জ ও হৃদয়ের ভাবলহরী যে প্রায়ই সীমা অতিক্রম করে আতিশয্য ও অতি-উচ্ছ্বাস-দোষে দুষ্ট হয়ে পড়তে পারে—তা আর আশ্চর্যের বিষয় কি? কিন্তু জীবনের ক্ষেত্রে যেমন, সাহিত্যের ক্ষেত্রেও ঠিক তেমনি—স্থৈর্য ও সংযমই সিদ্ধির জনক। এক্ষেত্রেও গৃহের কেন্দ্রস্বরূপা নারী স্বভাবতঃই সংযমশীলা, সৌষ্ঠব-জ্ঞানসম্পন্না। সেজন্ম বিশেষ করে নারীদের হাতেই যে সাহিত্য গড়ে উঠবে এক সমতা ও সংযমের ঋজু পথে—যে পথে মনের স্বাধীন বিকাশ ও হৃদয়ের স্বচ্ছন্দ স্ফূর্তির সম্পূর্ণ সুযোগ থাকলেও উচ্ছৃঙ্খলতা ও উদ্দামতার হয়েছে চিরসমাধি—তা আশা করাও অসঙ্গত নয়।

বস্তুতঃ সাহিত্য-সাধনা জীবন-সাধনা। সাহিত্যিক স্রষ্টৃরূপে সাহিত্যে তাঁর নিজের সৃষ্টিতে নিজেকেই প্রকাশ করেন, দান করেন। স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যে কোনোরূপ কৃত্রিম ভেদের অস্তিত্ব থাকতে পারে না। প্রকৃত স্রষ্টা তিনিই যিনি নিজের সৃষ্টিতে নিজেই বিলীন হয়ে যান, নিজেকেই মূর্ত করে তোলেন, নিজেকেই নিঃশেষে দান করেন। সেজন্ম নারী-জীবনের যা কিছু শ্রেষ্ঠ সম্পদ, নারীসত্তার যা কিছু অনুপম বৈশিষ্ট্য, তা সবই নারীসৃষ্ট সাহিত্যে রূপে রংএ বিভাসিত হয়ে উঠবে—সাহিত্যে নারীদের এইটিই বিশেষ দান।

স্বাধীন যুগের স্বাধীন মেয়ে আমরা। অন্যান্য ক্ষেত্রের সঙ্গে সাহিত্যক্ষেত্রেও আমরা আজ পুরুষের সঙ্গে সমান অংশ গ্রহণ করব। রাষ্ট্রীয় সামাজিক ও পারিবারিক সকল দিক্ থেকেই আজ আমাদের জ্ঞান-বিজ্ঞানের পথের সকল বাধাই প্রায় অপসারিত হয়ে যাচ্ছে। সাহিত্যচর্চায় আজ নারীদের সেজন্ম বহুগুণে অধিক আত্মনিয়োগ করা কর্তব্য। এ কথা অবশ্য সত্য যে, অন্যান্য প্রতিভার ন্যায়ই সাহিত্য-প্রতিভাও জন্মগত সম্পদ—কেবল বাহিরের শিক্ষা, অনুশীলন ও প্রচেষ্টায় এই অপূর্ব সম্পদ্ অলভ্য। কিন্তু অন্য দিকে যথাযথ অনুশীলনের অভাবে, উপযুক্ত সুযোগ সুবিধার অভাবে যে অপূর্ব প্রতিভাও অঙ্কুরে ঝরে বিনষ্ট হয়ে যায়, তাও সমান সত্য। সেজন্য আজ নব-ভারতের নবপরিবেশের নবারুণালোকে আমাদের নারীদের সুপ্তশক্তি ও প্রতিভা সহস্রদিক্‌প্রসারী সহস্রদলের মতই বিকশিত হয়ে উঠুক—আজ এই আমাদের হৃদয়ের কামনা

স্বাধীন ভারতের প্রথম নাগরিকা আমরা বিধাতার অশেষ আশীর্বাদের ফলেই করেছি এই যুগসন্ধিক্ষণে জন্মলাভ। শত-শত বৎসরের পরাধীনতার অসহনীয় অন্ধতমিস্রার ঘনান্ধকার ভেদ করে স্বাধীনতা-উষাগমের সেই প্রথমোদ্ভাসিত অরুণরেখা আমরাই ত করেছি—পুলকোদ্বেল হৃদয়ে দু'চোখ ভরে দর্শন। সেদিক্ থেকে আমরা সত্যই অতি সৌভাগ্য-

বর্তী, কিন্তু অন্যদিক্ থেকে এই নবজীবনের প্রথম পথ-প্রদর্শিকারূপে আমাদের দায়িত্বও কম নয়। নূতন ভারতে, নূতন রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে আমাদেরই ত করে যেতে হবে এক নূতন জীবনের পথনির্দেশ, যা অনুসরণ করে আমাদের ভবিষ্যবংশীয়েরা আরও উন্নততর লক্ষ্যে উপনীত হবার প্রেরণা পাবেন—আভাস পাবেন এক মহান্ আদর্শের যা আমাদের অতি পুরাতন সেই শাশ্বত আদর্শ, অথচ যা বর্তমান বিজ্ঞানের যুগে, নারীপ্রগতির যুগে, জনজাগরণের যুগে অসমঞ্জস নয়। স্বাধীনতার প্রথম অমৃতময় স্পর্শে আনন্দোচ্ছ্বসিতা বা ভাবাবেগাকুলা হয়ে যদি আমরা স্থিরবুদ্ধি হারিয়ে ফেলি এবং তার ফলে ভ্রান্ত পথ অবলম্বন করে মরীচিকার অনুধাবনেই মনপ্রাণ নিয়োগ করি, তাহলে তা হবে জাতির জীবনে এক মর্মান্তিক অভিশাপ। কারণ, একবার পথভ্রান্ত হলে সেই পথ পুনরায় খুঁজে পাওয়া অতি কষ্টসাধ্য ব্যাপার।

সেজন্য আজ আমাদের ধীরতার সঙ্গে, সুবিবেচনার সঙ্গে লক্ষ্যপথে অগ্রসর হতে হবে। আজ বিশ্বে সত্যই এক যুগসন্ধিক্ষণ সমুপস্থিত। জনজাগরণের বিজয়-দুন্দুভি আজ দিকে দিকে নবজীবনের নব-আশার গীতি ধ্বনিত করছে। বর্তমান যুগ 'মানুষের যুগ'—মানুষের মনুষ্যত্বকেই আজ আমরা শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করছি। ধনি-দরিদ্র, উচ্চ-নীচ, ব্রাহ্মণ-শূদ্র, শ্বেত-অশ্বেত বর্ণের সকল বিভেদ-বৈষম্য ভেদ করে আজ আমরা স্বপ্ন দেখছি এক অপূর্ব One World-এর জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নিরপেক্ষ—এক সুমহান্, সার্বজনীন মনুষ্যসমাজের, যেখানে 'ন মনুষ্যাৎ পরতরং হি কিঞ্চিৎ', যেখানে 'সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই'। এই স্বপ্ন আজও পরিপূর্ণভাবে সত্যে সার্থক হয়ে উঠেনি সত্য, কিন্তু তা সত্ত্বেও এই অশেষ শুভজনক স্বপ্ন, এই যে বিশ্বমানবের একত্ব ও অচ্ছেদ্যত্বের সুমহতী উপলব্ধি, তা আজ সকল ভেদ-বিচ্ছেদ, সন্দেহ-নৈরাশ্যের মধ্যেও এক নবযুগের নব-আভাস-গরিমা প্রকাশ করছে সন্দেহ নেই। মুমূর্ষু বিশ্বের নবজন্মের এই পরম শুভলগ্নে মঙ্গল-পরিষিঞ্চনে আমাদের নারীদেরই ত হতে হবে অগ্রণী—কারণ, পূর্বেই বলা হয়েছে ভেদের মধ্যে অভেদ, বিচ্ছেদের মধ্যে মিলন, বহুর মধ্যে একের মঙ্গলময়ী সৃষ্টি বিশেষ করে নারীরই ধর্ম, পুরুষের নয়।

ভারতের মহাসভ্যতার মহাখনি মহাভারত মেয়েদের সম্বন্ধে অনেক আদর করে বলেছেন—

"পূজনীয়া মহাভাগাঃ পুণ্যাশ্চ গৃহদীপ্তয়ঃ।
স্ত্রিয়ঃ শ্রিয়ো গৃহস্যোক্তাস্তস্মাদ্ রক্ষ্যা বিশেষতঃ॥"

অর্থাৎ নারীরাই পূজনীয়া পরমমঙ্গলময়ী পুণ্যশীলা গৃহদীপ্তি গৃহশ্রী—সেজন্য তাঁরা বিশেষ যত্নের সঙ্গে রক্ষণীয়া।

এ কেবল আদরের কথাই নয়, কথার কথাও নয়—অক্ষরে অক্ষরে সত্য। সত্যই মেয়েরাই ত গৃহের দীপ্তি, সংসারের শ্রী। এই দীপ্তি, এই শ্রী, আজ গৃহ অতিক্রম করে দেশের প্রত্যন্ত প্রদেশ আলোকিত করুক—এই আমাদের বিশেষ প্রার্থনা।

---

"মেয়েদের মধ্যে একজনও যদি কালে ব্রহ্মজ্ঞা হন, তবে তাঁর প্রতিভাতে হাজারো মেয়েমানুষ জেগে উঠবে এবং দেশের ও সমাজের কল্যাণ হবে।"

—স্বামী বিবেকানন্দ

# জৈন সাধনমার্গ

ডক্টর শ্রীনাথমল টাটিয়া, এম্-এ, ডি-লিট্

যে সকল মহাপুরুষের আবির্ভাবে পুণ্যভূমি ভারতবর্ষ গৌরবান্বিত হইয়াছে ভগবান মহাবীর তাঁহাদের অন্যতম। ভগবান্ বুদ্ধ ও ভগবান্ মহাবীর প্রায় একই সময়ে আবির্ভূত হন। চিরপ্রচলিত সন্ন্যাস-মার্গে যে সকল ত্রুটি-বিচ্যুতি দেখা গিয়াছিল তাহা দূর করিয়া পবিত্র সন্ন্যাস-মার্গের পুনঃপ্রতিষ্ঠাই ছিল উভয়ের উদ্দেশ্য। ভগবান্ বুদ্ধ একটির পর একটি করিয়া নানা সাধন-মার্গ পরীক্ষা করিলেন এবং অবশেষে এমন একটি মধ্যম-মার্গ আবিষ্কার করিলেন যাহার দ্বারা পরস্পরবিরুদ্ধ মার্গগুলির সমন্বয় সাধিত হইল। অন্যদিকে ভগবান্ মহাবীর অতি প্রাচীন-কাল হইতে বিদ্যমান নির্গ্রন্থ (জৈন) ধর্মের সাধনা অঙ্গীকার করিলেন এবং সেই ধর্মে পরবর্তী কালে যে সকল ত্রুটি ও ন্যূনতা দেখা গিয়াছিল সেইগুলি দূর করিয়া তাহার সংস্কার ও পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিলেন। বেদ ও উপনিষদে যে ত্যাগমার্গের উপদেশ দেখিতে পাওয়া তাহা জৈন ও বৌদ্ধতন্ত্রের ত্যাগমার্গের উপদেশ হইতে মূলতঃ ভিন্ন নহে। ইহাদের মৌলিক ঐক্য ইহাই প্রতিপাদন করে যে এই সমস্ত সাধনমার্গ-গুলি একই সংস্কৃতির বিভিন্ন রূপমাত্র।

অধ্যাত্ম-সাধনার উপায়ের মধ্যে জ্ঞান-মার্গ ভক্তি-মার্গ ও কর্ম-মার্গ প্রধান। একমাত্র সত্য-মিথ্যা-বিবেককেই চরম মুক্তির কারণ বলিয়া যাঁহারা স্বীকার করেন তাঁহারা জ্ঞানমার্গী। যাঁহারা অনাদি সিদ্ধ নিত্যমুক্ত করুণাময় ঈশ্বর বা পরমেশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া তাঁহার নিকট আত্ম-নিবেদনকেই মুক্তির একমাত্র উপায় বলিয়া স্বীকার করেন, তাঁহারা ভক্তিমার্গের অনুযায়ী। যাঁহাদের মতে শাস্ত্রবিহিত কর্মানুষ্ঠান-পূর্বক স্বীয় শক্তিবলে কর্মক্ষয়-ব্যতিরেকে মুক্তি সম্ভব নহে তাঁহারা কর্মমার্গের সাধক। ভিন্ন ভিন্ন মার্গে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার সাধনা বিহিত হইয়াছে এবং সেই বিধানগুলির মূলে রহিয়াছে স্ব স্ব মৌলিক সিদ্ধান্ত। জ্ঞান স্থিরীভূত হইলে ইচ্ছাশক্তি ও ক্রিয়াশক্তি জ্ঞানের অধীন হইয়া যায়—এই মৌলিক সিদ্ধান্তের উপর জ্ঞানমার্গ প্রতিষ্ঠিত। ভক্তিমার্গের মূলে রহিয়াছে এইরূপ একটি দৃঢ় বিশ্বাস যে আমাদের জ্ঞানশক্তি, ইচ্ছাশক্তি ও ক্রিয়াশক্তি—এই তিনটির মধ্যেই এমন একটি ন্যূনতা ও ত্রুটি রহিয়াছে যাহা অসীম জ্ঞান ও ক্রিয়ার আধার ঈশ্বর বা পরমেশ্বরের সাহায্য-ব্যতিরেকে কখনই দূরীভূত হয় না। জ্ঞানশক্তি ইচ্ছাশক্তি ও ক্রিয়াশক্তিতে যে ন্যূনতা ও ত্রুটি রহিয়াছে তাহাকে দূর করিবার শক্তিও আমাদেরই মধ্যে রহিয়াছে এবং ইচ্ছাশক্তি ও ক্রিয়াশক্তিকে সম্পূর্ণভাবে নিজের অধীনে আনিতে না পারিলে জ্ঞানশক্তির পূর্ণতা ও মুক্তি কখনই সম্ভব নহে—এইরূপ সিদ্ধান্তকে অবলম্বন করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে কর্মমার্গ ও তাহার সাধনধারা। ভগবান্ মহাবীর কর্মমার্গের এইরূপ একজন সাধক ছিলেন। ইহা তাঁহার কঠোর তপস্বী জীবন হইতে আমরা স্পষ্টই বুঝিতে পারি। যে সাধন-মার্গের অনুসরণ করিয়া তিনি স্বয়ং সিদ্ধিলাভ করেন এবং অন্যের সিদ্ধিলাভের উপায় বলিয়া যাহা তিনি প্রতিপাদন করেন তাহার স্বরূপ এই প্রবন্ধে সংক্ষেপে আলোচিত হইবে। জৈনধর্মের মূলকথা

বুঝিতে হইলে এই সাধনমার্গের জ্ঞান অত্যন্ত আবশ্যক।

আধ্যাত্মিক সাধনার প্রথম সোপান দর্শন-শুদ্ধি। দর্শন বলিতে শ্রদ্ধা বা বিশ্বাস বুঝায়। নিবিড় রাগ-দ্বেষে আবৃত জীব সত্য-অসত্য, মঙ্গল-অমঙ্গল ও ধর্ম-অধর্ম বিবেকশূন্য হইয়া নানা দুঃখ-কষ্টভোগ করিতে থাকে। তবে স্বভাবতই তাহার মধ্যে এমন একটি শক্তির উন্মেষ হইতে থাকে যাহার দ্বারা সে যথাসময়ে সেই রাগ-দ্বেষের নিবিড়তা দূর করিতে সমর্থ হয় এবং অবশেষে তাহার হৃদয়ে যাহা প্রকৃত সত্য ও মঙ্গলময় এবং যাহা প্রকৃত ধর্ম তাহার প্রতি শ্রদ্ধা বা বিশ্বাস জন্মায়। এইরূপ শ্রদ্ধাকে জৈন-শাস্ত্রে সম্যক্ দর্শন বলা হয়। এই দর্শনশুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জীবের জ্ঞানও শুদ্ধ বা সম্যক্ হইয়া যায় এবং ক্রমশঃ ইচ্ছাশক্তি ও ক্রিয়া-শক্তির শুদ্ধিও সম্ভবপর হয়। এই শুদ্ধি কিন্তু পূর্ণতা নহে। ইহা স্বরূপলাভের সর্বনিম্ন অবস্থা-মাত্র। এই অবস্থাপ্রাপ্ত হইলে জীব সম্যক্ কর্ম শক্তি বা সম্যক্ চরিত্রের অধিকারী হয়।

সম্যক্ কর্ম বা সম্যক্ চরিত্রের মূল উদ্দেশ্য জীবের সকল প্রকার বিকৃতি দূর করিয়া তাহার স্বাভাবিক শক্তিগুলির বিকাশসাধন। রাগ-দ্বেষ সকল বিকৃতির কারণ—অতএব রাগ-দ্বেষ দূর করাই চরিত্রের মূল উদ্দেশ্য। জড় ও চেতনের সংমিশ্রণই সংসার এবং রাগ-দ্বেষ রহিয়াছে সেই সংমিশ্রণের মূলে। জড়ের কবল হইতে মুক্ত হইয়া অবাধ জ্ঞান ও স্বাতন্ত্র্য-লাভের জন্ম চেতন সর্বদাই চেষ্টা করিতেছে। এই চেষ্টাকে ফলবতী করিতে হইলে অসীম কষ্টসহিষ্ণুতা ও আত্মসংযম আবশ্যক এবং সেই উদ্দেশ্যেই জৈন-শাস্ত্রে নানাবিধ তপস্যার বিধান করা হইয়াছে। সংসারের প্রতি জীবের আসক্তি এতই দৃঢ় যে তাহাকে হেয় বুঝিতে পারিয়াও তাহার পরিত্যাগ জীবের পক্ষে অত্যন্ত দুষ্কর। যাঁহারা চেতন হইতে পৃথক্ কোনও জড়ের অস্তিত্ব স্বীকার করেন নাই তাঁহারাও সত্যমিথ্যা-বিবেকের জন্ম আত্ম-সংযমের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিয়াছেন।

সংসারে আবদ্ধ হইবার মূল কারণ রাগ-দ্বেষ হইতে মুক্তি পাইতে হইলে রাগদ্বেষ-প্রণোদিত হইয়া যে সকল কার্যে আমরা প্রবৃত্ত হই সেইগুলি ত্যাগ করিতে হইবে। আমাদের বিকৃত ও অপূর্ণ স্বাতন্ত্র্য প্রকাশ পায় নানা উপায়ে বহির্জগতে স্বীয় প্রভুত্বস্থাপন করিবার প্রচেষ্টারূপে। এই প্রভুত্বস্থাপন করিতে গিয়া জীব সকলপ্রকার হিংসাকার্যে রত হয় এবং অসত্য ও চৌর্যেরও আশ্রয় লয়। অন্যদিকে ভৌতিক কামনাবাসনা-তৃপ্তির জন্ম সে ব্রহ্মচর্য হইতে ভ্রষ্ট হয় এবং ধনধান্যাদি পরিগ্রহ-সঞ্চয়ে প্রবৃত্ত হয়। এইরূপে হিংসা অসত্য চৌর্য অব্রহ্মচর্য এবং পরিগ্রহ-সঞ্চয়—এই পঞ্চবিধ কার্যে সংসারের মূল রাগ-দ্বেষ আত্মপ্রকাশ করে। অতএব এই পঞ্চবিধ কার্য হইতে বিরতি সংসার হইতে মুক্তিলাভের উপায়রূপে শাস্ত্রে বিহিত হইয়াছে। এই বিষয়ে ভারতীয় সকল ধর্মসম্প্রদায় একমত। তবে জৈনধর্মে হিংসা হইতে বিরতি অর্থাৎ অহিংসা বিশেষ প্রাধান্যলাভ করিয়াছে এবং উহাই সর্বপ্রকার ধর্মাচরণের মূলভিত্তি-রূপে স্বীকৃত হইয়াছে। তাই আমরা দেখিতে পাই যে, গৃহস্থ বা সাধুজীবনের নিয়ন্ত্রণের জন্ম যে সকল নিয়ম উপনিয়ম জৈনশাস্ত্রে বিহিত হইয়াছে সেইগুলিতে হিংসাবিরতির প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা হইয়াছে। আমাদের কায়িক বাচিক ও মানসিক সর্বপ্রকার ক্রিয়া এইরূপ হওয়া আবশ্যক যাহাতে কোনও জীব কোনও প্রকারে পীড়িত বা সন্ত্রস্ত না হয়। জীবনধারণের জন্ম নিতান্ত আবশ্যক প্রবৃত্তিগুলি ভিন্ন অন্য সর্ব-

প্রকার প্রবৃত্তি হইতে বিরত থাকিবার জন্ম গৃহস্থ ও সাধু উভয়কে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। তবে গৃহস্থজীবনে অখণ্ডরূপে অহিংসাদি ব্রতের পালন সম্ভবপর নহে বলিয়া সেইগুলির আংশিকরূপে যথাশক্তি পালন বিহিত হইয়াছে। সাধুজীবনে কিন্তু সেইগুলির সম্পূর্ণ পালন অবশ্য-কর্তব্য। আত্মসংযম ও তপস্যার কথা পূর্বে বলা হইয়াছে। সংক্ষেপে বলিতে গেলে অহিংসা আত্মসংযম ও তপস্যা—এই তিনটিই সম্যক্-চরিত্রের প্রধান উপায়।

উপরোক্ত আলোচনা দ্বারা ইহা প্রতিপাদিত হয় যে সম্যক দর্শন, সম্যক্ জ্ঞান এবং সম্যক্ চরিত্র—এই তিনটি জৈন সাধন-মার্গের প্রধান অঙ্গ। সম্যক্ চরিত্রের পরাকাষ্ঠা তখনই সম্ভব যখন আমাদের প্রতিক্রিয়া রাগদ্বেষবিহীন হইয়া যায় এবং জড়-চেতনের ভেদজ্ঞান নিত্য বিদ্যমান থাকায় সংসারের সকল বস্তুর প্রতি পরম বৈরাগ্য আমাদের মনে উদিত হয়। এইরূপ অবস্থায় উপনীত হইলে জীব সংসারের বাস্তবিক স্বরূপ উপলব্ধি করে এবং সম্যক্ দর্শন, সম্যক্ জ্ঞান ও সম্যক্ চরিত্রের পরিপূর্ণ বিকাশ করিয়া সকল সাংসারিক বন্ধন ছিন্ন করিতে সমর্থ হয়।

জৈনসাধন-মার্গে গৃহস্থ এবং সন্ন্যাসী উভয়ে উপযুক্ত স্থান পাইয়াছে। নির্বিঘ্ন সন্ন্যাসমার্গ-পালনের অনুকূল পরিস্থিতি গৃহস্থবর্গের সহায়তা-ব্যতিরেকে কখনই সম্ভব নহে এবং সন্ন্যাসমার্গের আদর্শ সম্মুখে না থাকিলে গৃহস্থজীবনেরও অধিকতর বিকাশ হইতে পারে না। এই দুইটির কোনও একটি অবজ্ঞাত হইলে অপরটির বিলোপ অবশ্যম্ভাবী। এই জন্যই জৈন ঋষিগণ এই দুইটির কোনটিরই অবজ্ঞা করেন নাই এবং যাহাতে গৃহস্থ ও সাধুজীবনের সামঞ্জস্য সম্পূর্ণরূপে রক্ষিত হয় সেই ভাবে সাধনমার্গের বিধান করিয়াছেন। সন্ন্যাসি-সম্প্রদায়ের জন্ম অহিংসা সত্য প্রভৃতি যে পঞ্চ মহাব্রতের সম্পূর্ণরূপে পালন বিহিত হইয়াছে, গৃহস্থজীবনে সেইগুলিরই আংশিকভাবে যথাশক্তি পরিপালনের নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

ভারতীয় অন্যান্য ধর্মগুলির ন্যায় জৈনধর্মের প্রতিও এইরূপ আক্ষেপ করা হয় যে, ইহা সংসারকে দুঃখময় বলিয়া হেয় প্রতিপাদন করে এবং উহা হইতে পলায়নের উপদেশ দেয়। কিন্তু যদি আমরা বিশেষ প্রণিধান-সহকারে দেখি, তবে দেখিতে পাইব যে ভারতীয় প্রত্যেক ধর্মেই সাংসারিক জীবেরই মধ্যে এইরূপ একটি স্বাভাবিক শক্তি স্বীকার করা হইয়াছে যাহা তাহাকে অন্ধকার হইতে আলোক, অজ্ঞান হইতে জ্ঞান এবং অপূর্ণতা হইতে পূর্ণতার দিকে লইয়া যায়। সংসার হইতে পলায়ন অজ্ঞান অথবা অপূর্ণতা হইতে জ্ঞান অথবা পূর্ণতার দিকে যাওয়া বই আর কিছুই নহে। সংসারে দুঃখ নাই, অপূর্ণতা নাই, অজ্ঞানতা নাই—ইহা কোন দার্শনিকই প্রতিপাদন করিতে পারেন নাই। দুঃখ অজ্ঞান ও অপূর্ণতার সার্থকতা সিদ্ধ করিতে অনেকে প্রয়াসী হইয়াছেন। কিন্তু তাঁহারাও ইহা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন যে, এইগুলিকে অতিক্রম করাই জীবনের উদ্দেশ্য। অতএব উপরোক্ত আক্ষেপ সর্বথা নিরর্থক ও নিষ্প্রয়োজন।

জৈনসাধন-মার্গের এই সংক্ষিপ্ত আলোচনার দ্বারা আমরা স্পষ্টই বুঝিতে পারি যে, ভারতীয় অন্যান্য সাধন-মার্গগুলির সহিত ইহার মৌলিক ঐক্য রহিয়াছে। ভারতীয় সংস্কৃতির রহস্য বুঝিতে হইলে এই ঐক্য-বিষয়ে অবহিত হওয়া অত্যন্ত আবশ্যক।

# সাধনায় সঙ্কল্প

## শ্রীশ্রীসারদমণি দেবী

## ( ২ )

শ্রীযোগেশ চন্দ্র মিত্র

শ্রীশ্রীমা পরমহংসদেবের শিক্ষা যথাযথ গ্রহণ করিয়া সত্বর সাধনায় মগ্ন হইয়াছিলেন। কবি সত্যই বলিয়াছেন—বিদ্বৎসু সংকবিবচো লভতে প্রকাশম্। প্রকৃষ্ট আধারে শিক্ষা শীঘ্রই ফলবতী হইয়া প্রকাশিত হয়। ঠাকুরের সহিত এই ব্রহ্মচারিণী আটমাস কাটাইয়াছিলেন। তখন ঠাকুরের প্রতিরাত্রিতেই গভীর সমাধি হইত এবং মা তাহা প্রত্যক্ষ করিতেন। এক একদিন এমন হইত যে ঠাকুরের সমাধি হইতে কিছুতেই ব্যুত্থান হইত না। তখন মা ভীত হইয়া পড়িতেন। একবার রাত্রিতে অতি সুগভীর সমাধি হওয়ায় মা ভাগিনেয় হৃদয়কে ডাকাইয়া আনিলেন। হৃদয় ঠাকুরের কানে নাম শুনাইতে শুনাইতে তাঁহার ব্যুত্থান হইল। তখন কিরূপ সমাধি হইলে কিরূপ নাম শুনাইতে হইবে মা ঠাকুরের নিকট শিখিয়া লইলেন। ঠাকুরের এইরূপ সমাধি প্রতিদিন ও প্রতিরাত্রি দেখিতে দেখিতে এবং তাঁহার অপূর্ব্ব শিক্ষায় মাও যোগারূঢ় হইতে শিক্ষা করিলেন। মার শমগুণ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। মা যে নহবতে গভীর রাত্রিতে বারান্দায় বসিয়া সমাধিস্থ হইয়া থাকিতেন তাহা যোগেন মহারাজ লক্ষ্য করিয়াছিলেন। পরে তাঁহার অনেক শিষ্য শিষ্যা ও ভক্তগণ এবিষয়ে প্রত্যক্ষ প্রমাণ দিয়াছেন। শেষ রাত্রিতে জপ-ধ্যানের পর লক্ষ নামজপ না হইলে শ্রীমা জলগ্রহণ করিতেন না। ইহা সে সময়ে জপ ও ধ্যানে তাঁহার তন্ময়তা প্রকাশ করে।

এই অবস্থা হইবার পূর্ব্বে প্রাত্যহিক জীবন-যাত্রার মধ্যেই মার সাধনচতুষ্টয় অভ্যস্ত হইয়াছিল। পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, স্বামি-প্রদত্ত প্রাথমিক শিক্ষা হইতেই তিনি বুঝিয়াছিলেন তাঁহার জীবন ভোগের নয়, ত্যাগের। ঠাকুর কেবল সন্ন্যাসীর আদর্শ লইয়া আসেন নাই, সকলেই গৃহস্থাশ্রমে শ্রীভগবানকে লাভ করিতে পারে তিনি তাহাও দেখাইয়া গিয়াছেন। তিনি গৃহস্থ হইয়াও সন্ন্যাসী বা সন্ন্যাসী হইয়াও গৃহস্থ, উভয় জীবনের সামঞ্জস্য তিনি দেখাইলেন। মা প্রথম হইতেই দেখিতেন যেন তাঁহার মতই একটি মেয়ে সব সময়ে তাঁহার নিকটে আছে এবং প্রয়োজন হইলেই সেই মেয়েটি তাঁহার মধ্যে মিলাইয়া যাইত। ইহাতে তিনি বুঝিলেন যে, তাঁহার রক্তমাংসময় তথাকথিত জড় দেহটাই তিনি নহেন, তাঁহার প্রত্যগাত্মা সর্ব্বদা তাঁহাতে বিরাজিত—ভিতরে এবং বাহিরেও। এইরূপে তাঁহার আত্মানাত্মবিবেক হইয়াছিল। তারপর কি পিত্রালয়ে কি শ্বশুরালয়ে কোথাও বিশেষ সচ্ছল অবস্থা ছিল না। দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের ঈশ্বরারাধনায় গভীর নিমজ্জন ও ভোগস্পৃহাশূন্যতা লক্ষ্য করিতে করিতে শ্রীমারও ঐহিক ও পারত্রিক ফলভোগবিরাগ আসিল। কখনও ঠাকুরের নিকট কোন জিনিসই চাহেন নাই, অথচ জানিতেন চাহিলেই পাইবেন। শিষ্যশিষ্যাদের বলিতেন—'কারো কাছে কিছু চেয়ো না। বাপের কাছে ত নয়ই, স্বামীর কাছেও নয়…যে চায় সে পায় না,

যে চায় না সে পায়।' বেদে গৃৎসমদ শৌনক একজন অসাধারণ প্রতিভাশালী ঋষি ছিলেন। তিনি বিশ্বামিত্র অপেক্ষাও প্রাচীন ঋষি এবং পুরূরবার বংশে জন্মগ্রহণ করেন, অর্থাৎ ক্ষত্রিয় ঋষি। ভিক্ষাবৃত্তির উপর তাঁহার বিজাতীয় ঘৃণা ছিল। স্বকীয় চেষ্টায় তিনি মহাশাল গৃহস্থ হইয়াছিলেন। তিনি বরুণের নিকট প্রার্থনা করিতেছেন—'মাহং রাজন্ অন্যকৃতেন ভোজম্'—অর্থাৎ হে রাজা বরুণ, অন্য লোকের পরিশ্রমে যে অন্ন উপার্জ্জিত হয়, তাহা যেন আমাদিগকে ভোজন করিতে না হয়। সেটা ছিল সত্যযুগ, আর এখন কলিযুগ। মা আমাদের সত্যযুগের ছিলেন। মা কিছু চাহিতেন না বলিয়া তাঁহার কিছুই অপ্রতুল ছিল না। একবার যখন কাশীতে ছিলেন তখন স্বামী ব্রহ্মানন্দ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলিলেন—"মা, এখানে সেবাশ্রম করে ত এক মুশ্‌কিল হ'ল। আমাদের সেবাশ্রম ত দুঃস্থদের জন্য, কিন্তু যত বড় বড় লোক এখানে এসে বিনাব্যয়ে চিকিৎসিত হয়, এখান থেকে ওষুধ নিয়ে যায়। তারা স্বচ্ছন্দে নিজের খরচে এসব করতে পারে। তাদের কি ওষুধ দেওয়া হবে, চিকিৎসা করা হবে?" মা কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিলেন—"বাবা, ওষুধ দেবে, চিকিৎসা করবে। আমাদের সব সমান, ধনীই বা কি, গরীবই বা কি। তা ছাড়া বাবা, যে চায় সেই ত গরীব।" পল্লীগ্রামে একে অপরের সাহায্য করে বলিয়া চলে, একের অপরের নিকট চাওয়া কিছু দোষের নহে। এই পল্লীক্রোড়পালিতা শ্রীমার চক্ষে দারিদ্র্যের প্রকৃত স্বরূপ কিরূপে প্রকাশিত হইয়াছিল ইহা ভাবিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। যাঁহার স্বামী "টাকা মাটি মাটি টাকা" বলিতে বলিতে উভয়ই গঙ্গাজলে বিসর্জন দিয়াছিলেন, ধাতব পদার্থ স্পর্শ করিলে যাঁহার আঙ্গুল বাঁকিয়া যাইত, সেই নিষ্কিঞ্চন মহাধনীর সহধর্ম্মিণী তিনি, তাঁহার মধ্যে যাচকের হীনতা পরিস্ফুট হইবে না ত কাহার মধ্যে হইবে? পরমহংসদেবের দিব্য প্রেমে শ্রীমার মন এব "দিব্য উল্লাসে" পূর্ণ হইয়া থাকিত, যেন তাঁহার হৃদয়ে আনন্দের পূর্ণঘট স্থাপিত হইয়াছে, তিনি কোনও অভাবই বোধ করিতেন না; তাঁহার নিজের অভাববোধ কিছুই ছিল না। এক একজন ঈর্ষ্যাবশে তাঁহার ঠাকুরের নিকট যাওয়ার প্রতি কটাক্ষ করায়, তিনি স্বামীর সান্নিধ্যে যাওয়াই ছাড়িয়া দিলেন। দক্ষিণেশ্বরে, শ্যামপুকুরে ও কাশীপুর বাগানে থাকিবার কালে তিনি এরূপ ভাবে থাকিতেন যেন তিনি ঠাকুরের নিকটসম্পর্কীয় কেহ নহেন, অথচ মন তাঁহার ঠাকুরের জন্য স্বর্গীয় প্রেমে পূর্ণ; দিনান্তে তাঁহাকে একবার দেখিতে পাইলেই কৃতার্থ হইলেন মনে করিতেন। এইরূপে তাঁহার ইহামুত্রফলভোগ-বিরাগ অভ্যস্ত হইয়াছিল।

শ্রীমা তাঁহার পিতামাতার সর্ব্বজ্যেষ্ঠ সন্তান, অবস্থাও সচ্ছল ছিল না। সংসারের সব কাজই করিতে হইত, ভাইবোনদের মানুষ করিতে হইত। মা সর্ব্বদাই কাজে ব্যস্ত থাকিতেন। কৈশোরের বাহ্যসীমা পর্য্যন্ত পিতৃগৃহে ও শ্বশুরগৃহে মার এইরূপ নিরন্তর পরিশ্রম গিয়াছিল। দক্ষিণেশ্বরে আসিয়াও বিরাম ছিল না। ঠাকুরের জন্য ত পাক করিতে হইতই, তার উপর সেখানে তাঁহার শাশুড়ী এবং প্রায়ই ঠাকুরের কোনও না কোন স্ত্রীভক্ত থাকিতেন। বাহিরে আসিবার উপায় ছিল না, রাত্রি তিনটার সময় একবার শৌচ ও সন্ধ্যার পরে। ইহার উপর সেই পারাবতকক্ষ আবার দরমা দিয়া ঘেরা; মা আমাদের দক্ষিণেশ্বরে প্রায় কারাবাসিনী ছিলেন। এই অচলতার

মধ্যে দরমার মধ্যে ফুটা করিয়া মাঝে মাঝে ঠাকুরের যে মূর্ত্তি চকিতে দেখিতে পাইতেন তাহাতেই তাঁহার সব কৃচ্ছ্রসাধনের ক্ষতিপূরণ হইত। এক শিষ্যাকে বলিয়াছিলেন স্বামীর সহিত গাছতলাও রাজ-অট্টালিকা। এই সাধ্বী যখন শ্যামপুকুরের বাসাবাড়ী ও কাশীপুরের বাগানে ছিলেন তখনও নিভৃতবাসের কঠোরতা কিছুই কমে নাই। তার উপর মাঝে মাঝে হৃদয়ের হৃদয়হীনতা, আগন্তুক রমণীমণ্ডলীর কাহারও কাহারও ঈর্ষ্যা ও অযাচিত উপদেশ-প্রদান মার মনকে সঙ্কুচিত করিবার কারণ হইত। কিন্তু মা কিছুতেই দমিতেন না। সব সময়ে সত্যের প্রতি চাহিয়া ভবিষ্যৎ জীবনকে লক্ষ্য করিয়া মা নীরবে, হাসিমুখে এ সব সহ্য করিতেন। মার পরিণত বয়স পর্য্যন্ত সহ্যগুণ অটুট ছিল, তাহা স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যায়। এইরূপে সাধনমার্গে শমদমষট্-সম্পত্তি তাঁহার অধিগত হইল। তপস্যাপূতা মা সাধনার উচ্চ স্তরে উঠিতে লাগিলেন। ঠাকুর তাহা লক্ষ্য করিয়াছিলেন, সেই জন্য হৃদয় একবার মার প্রতি দুর্ব্যবহার করিলে বলিয়াছিলেন—'ওকে তুই জানিস না, যদি বিরূপ হয় তবে সব ছারখার করে দিতে পারে। বিকৃতমস্তক হরিশকে ভূমিতে ফেলিয়া জিভ টানিয়া চপেটাঘাত করিতে করিতে মার শাসন করা ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। তবুও ত ইহা দৈহিক শাসনমাত্র। করুণাময়ীর অসাধারণ করুণা, তাই ইহাই যথেষ্ট মনে করিয়াছিলেন। তা ছাড়া শাসিত এখানে একজন পাগলমাত্র।

মুক্তপুরুষ ঠাকুরের অপার ঈশ্বরপ্রেম, গভীর সমাধিসাগরে নিমজ্জন দেখিয়া ও তাঁহার অনুপম শিক্ষায় শ্রীমার মুমুক্ষুত্ব অচিরে জাগ্রত হইল; তিনি বুঝিলেন যে জীবন কেবল তুচ্ছ দেহসুখভোগের জন্য নহে, উহার মহৎ উদ্দেশ্য আছে এবং তাহা হইতেছে সত্যে প্রতিষ্ঠা ও ব্রহ্ম-লাভ। এইরূপে মার মুমুক্ষুত্ব তাঁহাকে গভীর হইতে গভীরতর সাধনায় প্রণোদিত করিল। মনুষ্যত্ব মুমুক্ষুত্ব ও মহাপুরুষ-সংশ্রয় সাধনার এই তিন স্তম্ভের উপর মার পারমার্থিক সৌধ প্রতিষ্ঠিত হইল। তিনি সাধনচতুষ্টয়ে ব্যবস্থিত হইয়া 'ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে'-রূপ অবস্থা প্রাপ্ত হইলেন, অর্থাৎ 'ব্রহ্মভূত' হইবার উপযুক্ত হইলেন ও উচ্চতর সাধনায় নিমগ্ন হইলেন।

ইহার পরের যে অবস্থা, অর্থাৎ তৃতীয়স্তবের সাধনার নিগূঢ় ধাপগুলি পার হইয়া ব্রহ্মলাভ, তাহার বর্ণনা নিজে ছাড়া অপরের দ্বারা হয় না। সকলের অনুভূতি এ বিষয়ে সমান নহে, তা ছাড়া এ অবস্থায় সাধক বা সাধিকাকে বর্ণনাকারীর পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্য্যবেক্ষণ আবশ্যক এবং নিজের এ বিষয়ে অনুভূতি থাকা আবশ্যক। নতুবা এ সব বিষয় তাঁহার বোধ-গম্য হইবার কোনও উপায়ই নাই। লেখকের সে সব সুবিধা কিছুই হয় নাই। তা ছাড়া শ্রীমার হৃদয় আকাশবৎ বিস্তৃত, তাহার কোথায় কি ঘটিয়াছে কে তাহার ঠিকানা রাখিয়াছে বা রাখিতে পারে? একা ঠাকুরই হয় ত তাহা জানিতেন। সাধক নিজেই এ সব বিষয় বর্ণনা করিতে পারেন না, কেন না তাহা লবণ-পুত্তলিকার সাগর পরিমাপ করিবার মত হইবে। সুতরাং এ বিষয়ে আলোচনা করা নিরর্থক। তবে "ফলানুমেয়াঃ প্রারম্ভাঃ সংস্কারাঃ প্রাক্তনা ইব।" শাস্ত্রে ব্রহ্মজ্ঞ ও নির্ব্বিকল্প-সমাধিমান্ ব্যক্তিদের যে সব বর্ণনা আছে তাহা মিলাইলে মা যে সে সব অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন সে বিষয়ে সংশয় থাকে না। গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ের শেষ দিকে এবং অন্যান্য শাস্ত্রে এই সব লক্ষণগুলি দেওয়া আছে, মার পরবর্ত্তী

জীবনের ঘটনাগুলির সহিত মিলাইয়া দেখিলে তাহা স্পষ্ট হইবে। আবার সমাধির পরে তাঁহার ব্যুত্থান হইলে তিনি বলিতেন—"যোগেন, আমার হাত কোথায় গেল, পা কোথায় গেল?" অর্থাৎ সে সময়ে দেহজ্ঞান থাকে না। অহংই ছিল না, তাহার পুনরুত্থানে সমাধিভঙ্গ হয়। সমাধির সময় মন সাম্যে থাকে—"সাম্যে ব্রহ্ম প্রতিষ্ঠিতম্।" তথায় সত্ত্ব রজঃ তমঃ জ্ঞান মন প্রাণ এষণা ও বাসনা সব মিলিয়া একাকার হইয়া আনন্দরূপ ধরে। তাহাই সত্য। বাকী যাহা তাহা সব অসত্য। ব্রহ্মজ্ঞের নিকট হাত পা জগৎ একটা প্রতীতি-মাত্র। সমাধির বিশুদ্ধ আনন্দের পর এই অসত্যে পুনরাগমন করিতে সময় লাগে। তাই ব্যুত্থানের ঠিক পরে হাত পা এ সবের খোঁজ-খবর থাকে না। শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দেরও এইরূপ হইত, ব্যুত্থানের পর কেবল মস্তকটি আছে ইহাই তাঁহার অনুভূতি (sensation) সমাধির সময় সে সব অঙ্গ হইতে চলিয়া গিয়াছে। এ সব অনুভূতি ত্রিগুণাত্মক, তাহারা তখন ঊর্দ্ধে উঠিয়া আনন্দের অপার সাগরে সাহঙ্কারা বুদ্ধির সহিত ডুবিয়া গিয়াছে। মার ক্ষেত্রেও অপরে তাঁহার হাত পা টিপিয়া তাহাদের অবস্থান দেখাইয়া দিত।

শ্রীমার ব্রহ্মজ্ঞ হওয়ার আর একটি প্রকৃষ্ট প্রমাণ এই যে, পরমহংসদেব তাঁহাকে দীক্ষা দিবার অধিকার দিয়াছিলেন। অবশ্য শাস্ত্রে আছে "তদ্বিজ্ঞানার্থং গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্"—অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞানের জন্য সমিৎপাণি হইয়া শ্রোত্রিয় ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুর নিকট যাইবে। ইহাও ত হইতে পারে যে ঠাকুর যাকে ব্রহ্মনিষ্ঠা দেখিয়া এই অধিকার দিয়াছিলেন—মা হয়ত তখনও ব্রহ্মজ্ঞা হন নাই। কিন্তু তাহা নহে। কেশবের যে সব বর্ণনা ঠাকুরের বাক্যেই "কথামৃতে" প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ থাকে না যে, তিনি ব্রহ্মনিষ্ঠ ছিলেন। তথাপি ঠাকুর কেশবচন্দ্রকে বলিয়াছিলেন—"তোমার চাপরাশ কোথায় যে লোকশিক্ষা-ব্রত গ্রহণ ক'রেছ? "যদি শিব শুক নারদ আমায় বলিতেন তোমার হইয়াছে তবে আমি এই উক্তি স্বীকার করিতাম; তোমার নিজেরই হয় নাই তা তুমি আমার পাঁচ সিকে পাঁচ আনা হইয়াছে বলিলে মানিব কিরূপে?" শ্রীমার না হইলে তিনি যে তাঁহার পরম ভক্তদিগকে দীক্ষা দিতে তাঁহাকে বলিতেন ইহা মনে করাই যায় না। ঠাকুর দ্বারা প্রেরিত হইয়াই সাধু যোগেন মহারাজ ও স্বামী ত্রিগুণাতীত শ্রীমার নিকট দীক্ষা লইয়াছিলেন। এই দুইজনই মায়ের প্রথম শিষ্য।

---

# বঙ্গভারতী *

শ্রীকালীপদ চক্রবর্তী, এম্‌-এ

বঙ্গভারতী, করিগো প্রণতি আরতি তোমার করি,
তব গৌরব-যশঃ-সৌরভ ওঠে দিগন্ত ভরি।
ছন্দে ছন্দে গাহে আনন্দে কত গুণী কত জ্ঞানী,
প্রণমি তোমারে বঙ্গভারতী প্রণমি বঙ্গবাণী।

প্রণমি তোমারে বঙ্গভারতী বাঙালী জাতির মান,
তব গৌরবে গরবিত মোরা বাঙালীর সন্তান।
যেখানেই রই বিদেশ-বিভুঁই—সাত সাগরের পারে,
তোমার বীণার জাগে ঝংকার হৃদয়ের তারে তারে।
তোমারে সেবিয়া দৈন্য ভুলিয়া ধন্য জীবন মানি,
বঙ্গভারতী করিগো প্রণতি আমারি বঙ্গবাণী।

জাগে হাহাকার কত বেদনার কত ঝরে আঁখিনীর,
কত যে আঘাত কত সংঘাত—নুয়ে পড়ে আজ শির।
দৈন্য-দুরাশা আছে তবু আশা, নহি তো আমরা দীন,
তোমার বীণার ঝংকারে যার মন্ত্রিত মনোবীণ।
দুঃখের মাঝে নব-গৌরবে নবীন অভ্যুদয়,
দেবি, তব বরে, মৃত্যুবাসরে হবো মৃত্যুঞ্জয়।
তোমারে সেবিয়া দুঃখ ভুলিয়া ধন্য জীবন মানি,
বঙ্গভারতী করিগো প্রণতি আমারি বঙ্গবাণী।

* মেরাঠে বাংলা সাহিত্য সমিতির সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত সাহিত্যসভায় পঠিত।

# বুদ্ধি ও বোধি

## স্বামী বাসুদেবানন্দ

বুদ্ধির তাৎপর্য্য হচ্ছে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় জগতের ভেতরকার সম্বন্ধভূমিটি নির্ণয় করা। এই ভূমিটাই হচ্ছে জীবন ও যুক্তিক্রিয়ার মূল তত্ত্ব। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে, প্রত্যেক ব্যক্তিগত বুদ্ধি এই সম্বন্ধভূমিটি আয়ত্ত করতে পারে না। বুদ্ধি তার যাবতীয় নাম ও রূপ জগৎ অর্থাৎ তার যাবতীয় প্রতীক সম্পদ পরিভাষা স্বীকৃতি ও সাংবৃতিক নিয়েও সেখান থেকে বিফলমনোরথ হয়ে ফিরে আসে—"যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ" (তৈঃ উঃ, ২।৪), "ন তত্র চক্ষুর্গচ্ছতি ন বাগ্‌ গচ্ছতি নো মনঃ" (কেন উ, ১৩), "যেনেদং সর্বং বিজানাতি তং কেন বিজানীয়াদ্‌ বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াদিতি"—(বৃ উ, ২।৪।১৪), "অদৃষ্টো দ্রষ্টাঽশ্রুতঃ শ্রোতাঽমতো মন্তাঽবিজ্ঞাতো বিজ্ঞাতা" (বৃউ, ৩.৭ ২৩), "নান্যদতোঽস্তি দ্রষ্টৃ নান্যদতোঽস্তি শ্রোতৃ নান্যদতোঽস্তি মন্তৃ নান্যদতোঽস্তি বিজ্ঞাতৃ" (বৃউ, ৩।৮।১১), "যন্মনসা ন মনুতে যেনাহুর্মনো মতম্‌। তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে" (কেন উ, ১৬)। গার্গী যাজ্ঞবল্ক্যকে জিজ্ঞাসা করলেন, "কস্মিন্নু খলু ব্রহ্মলোকা ওতাশ্চ প্রোতাশ্চ"—হে যাজ্ঞবল্ক্য, ব্রহ্মের আধার কি? যাজ্ঞবল্ক্য বল্লেন, "মাঽতিপ্রাক্ষীঃ"—গার্গি! অতিপ্রশ্ন করো না (বৃউ, ৩.৬ ১), অর্থাৎ আমরা দৃশ্য জগতেরই পরিমাপ করতে পারি, কারণ স্বতঃসিদ্ধ ব্রহ্মবস্তু দেশ, কাল ও সম্বন্ধ হতে স্বতন্ত্র। "হে গার্গি, যা দ্যুলোকের উর্দ্ধে, যা পৃথিবীর নিম্নে, যা পৃথিবী এবং দ্যুলোকের মধ্যে অর্থাৎ অন্তরীক্ষে—এই সব যা কিছু পণ্ডিতেরা বলে থাকেন, তা আকাশে ওতপ্রোত।" "কিন্তু হে যাজ্ঞবল্ক্য, আকাশ কিসে ওতপ্রোত?" "হে গার্গি, ব্রহ্মজ্ঞেরা একেই অক্ষর বলে থাকেন। ইতি অস্থূল অনণু অহ্রস্ব অদীর্ঘ অলোহিত অস্নেহ অচ্ছায় অতমঃ অবায়ু অনাকাশ অসঙ্গ অরস অগন্ধ অচক্ষুষ্ক অশ্রোত্র অবাক্‌ অমনঃ অতেজস্ক অপ্রাণ অমুখ অমাত্র অনন্তর ও অবাহ্য।" (বৃউ ৩।৮।৮) "যস্মাদর্বাক্‌ সংবৎসরোঽহোভিঃ পরিবর্ততে" (বৃউ, ৪।৪।১৬)—যার অধস্তলে কালপ্রবাহ চলেছে। "আকাশশ্চ প্রতিষ্ঠিতঃ" (বৃউ ৪।৪।১৭)—যার ওপর অনন্ত দেশিক কল্পনার অধ্যারোপ হয়েছে। কার্য্যকারণ-সম্বন্ধ ত পরিণামী জগতেই সম্ভব, পরন্তু ব্রহ্ম হলেন অচল অব্যয় অক্ষর—যাতে যাবতীয় সীমা ক্ষণ ও সম্বন্ধ আধ্যাসিক স্ফুরণমাত্র। এই ভ্রান্তিবিলাস সেই অসীম অপরিণামীর বক্ষে ক্রীড়াচঞ্চল।

যুক্তির দিক থেকে, অধ্যাপক বলতে পারেন, রামানুজের শ্রীভাষ্য-মতে "The nearest approach of truth is the conception of an organised whole"—কিন্তু বুদ্ধি-জগতের-সিদ্ধান্ত বলে সেটাকে সম্পূর্ণ সিদ্ধান্ত বলা চলে না—কারণ বুদ্ধি দেশ কাল নিমিত্তের উপাধি অতিক্রম করে ত আর যেতে পারে না। আমরা বুদ্ধির মধ্য দিয়ে যে টুকু তত্ত্ব প্রাপ্ত হই, সেটা কৈবল্যের চকিত আভাসমাত্র। আমাদের যেতে হবে বুদ্ধির এলাকা ছাড়িয়ে বোধির ভাস্বর জগতে। সেখানে সত্য ও জ্ঞাতার মধ্যে বাহ্য বা আন্তর জগতের কোন আবরণ বা ব্যবধান থাকবে না,

শ্রীরামকৃষ্ণ যাকে বোধে বোধ বলেছেন। প্যাসকেল "incomprehensibility of God" সম্বন্ধে অনেক বিচার করেছেন, কিন্তু বোসুয়ে (Bossuet) বলছেন, আমরা যেন দ্বৈতজগৎ দেখে হতাশ না হই, "...but regard them all trustfully as the golden chains that meet beyond mortal sight at the throne of God." বুদ্ধির সম্পূর্ণতা হচ্ছে এই বোধিতে (intuition)—এখানেই সম্বিৎ ও চিত্তের মিলন ঘটে থাকে—"man's existence and divine being coincide." এ হলো ঠিক ঠিক প্রত্যক্ষ বা অপরোক্ষানুভূতি, কারণ ইন্দ্রিয়জ প্রত্যক্ষেও ইন্দ্রিয়ের মাধ্যম থেকে যায়। এখানে "অশ্রুতং শ্রুতং ভবতি" (ছা উ, ৬।১৩)। "পাণ্ডিত্যং নির্বিদ্য বাল্যেন তিষ্ঠাসেৎ" (বৃ উ, ৩।৫।১)। রাধাকৃষ্ণন্ শংকরের অর্থ ত্যাগ করে ডয়সন এবং গাফ্-এর অর্থ গ্রহণ করেছেন—"Let a Brahmin renounce learning and become a child." কারণ তা হলেই অর্থটা New Testament এর অনুকূল হয়—"Except ye be converted and become as little children, ye shall not enter into the kingdom of heaven." (Matt. 18 3)। শংকর মানে করেছেন, পাণ্ডিত্যম্ = আত্মজ্ঞানম্, বাল্যম্ = অনাত্মপ্রত্যয়-তিরস্কারম্, নির্বিদ্য = নিঃশেষং কৃত্বা। এরূপ মানে না করলে পরের বাক্যের সহিত সম্বন্ধ থাকে না। তা ছাড়াও শ্রুতি বলছেন, "নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যঃ" ইত্যাদি—(মুণ্ডক উ, ৩।২।৩; কঠ উ, ১।২ ২৩)।

বোধি হচ্ছে প্রাতিভ জ্যোতিঃ, যে আলোকে চরম সত্যের ধ্যানে ও সম্ভোগে আমরা নিজেদের হারিয়ে ফেলি। যে শান্তির আলোকে রিপুর তাড়না নেই, ইন্দ্রিয়ের চাঞ্চল্য নেই, চিত্তের উদ্বেগ ও যাতনা নেই, মিথ্যা ধারণা নেই, যা আমাদের সাম্প্রদায়িকতা, সংকীর্ণতা, উৎকট ভোগের উচ্চাকাঙ্ক্ষা এবং কৃত্রিম বিধিনিষেধের হাত হতে আমাদের মুক্তি দান করে। প্লটিনাসের মতে, "In the vision of God, that which sees is not reason, but something greater than and prior to reason, something presupposed by reason, as is the object of vision. He who then sees himself, when he sees, will see himself as a simple being, will be united to himself as such, will feel himself become such. We ought not even to say that he will see, but he will be that which he sees, if indeed it is possible any longer to distinguish seer and seen, and not boldly to affirm that the two are one. He belongs to God and is one with Him, like two concentric circles; they are one when they coincide and two only when they are separated."—(Inge: Plotinus, Vol. II, p. 140) এই বোধিকে লক্ষ্য করে বেদ বলছেন, "এষাস্য পরমা গতিঃ এষাস্য পরমা সম্পৎ এষোঽস্য পরমো লোক এষোঽস্য পরম আনন্দঃ"—(বৃ উ, ৪.৩।৩২)। এই বোধি ইন্দ্রিয়দৃশ্য নয়, অথবা অপর কিছুর দ্বারা প্রমাণিতও হয় না। এ কারুর কাছে প্রকাশ করবারও যো নেই। এই অন্তরালোকে বাক্যালোক অভিভূত হয়। বুদ্ধি নিষেধমুখে কিছু দূর অগ্রসর হতে পারে; কিন্তু সত্যের স্বরূপবোধ বোধি ভিন্ন সম্ভব নয়। "ন তস্য প্রতিমা অস্তি যস্য নাম মহদ্‌যশঃ" (শ্বে উ, ৪।১৯)। উপনিষদে ব্রহ্ম-পদার্থে বিরোধী বিশেষণের সংযোগ দেখা যায়,

তার কারণ আপেক্ষিক জগতে যা সত্য, পারমার্থিকের দিক থেকে তা স্বীকার করা চলে না। অর্থাৎ স্বপ্নে প্রাতিভাসিক যা সত্য, জাগ্রতে তা মিথ্যা, জাগ্রৎ বা ব্যবহারিকে যা সত্য তুরীয়ে তা মিথ্যা। জানি না এমন নয়, জানি কিন্তু সোপাধিক ভাবে "সত্যানৃতে মিথুনীকৃত্য" ( ব্রহ্মসূত্র, উপোদ্‌ঘাতভাষ্য )। আবার ব্যবহারিক দিক থেকে যা অনিত্য, পারমার্থিক দিক থেকে তা নিত্য। ব্যবহারিক ঘট অনিত্য, কিন্তু তার পারমার্থিক দিক মৃত্তিকা সত্য। ব্যবহারিক শারীরাত্মা অনিত্য, কিন্তু পারমার্থিক আত্মা নিত্য।

বুদ্ধি অনেক দূর পৌঁছিয়ে দেয়, কিন্তু সম্পূর্ণ লাভ করতে পারে না। বুদ্ধি যখন সম্পূর্ণতা-লাভ করে, তখন তার বুদ্ধিত্ব চলে গেছে, সে পরমাত্মার সহিত তাদাত্ম্য-লাভ করেছে। শ্রীরামকৃষ্ণের ভাষায়, "বিশুদ্ধ বুদ্ধি ও চৈতন্য এক।" তিনি বলতেন, "সত্ত্বগুণী বুদ্ধি গাঁ পর্যন্ত পৌঁছতে পারে, কিন্তু গাঁয়ে ঢুকতে পারে না, কারণ সে চোর, পুলিশে ধরবে।" অর্থাৎ তার বৃত্তি উপাধিকৃত, "সে দেশে রাজার প্রবল প্রতাপ"—বুদ্ধি সেখানে নিরুপাধিক হয়ে পড়ে। 'যদি মনে কর ঠিক জেনেছি, তা হলে বুঝতে হবে তুমি অল্পই জেনেছ"—( কেন উ, ১।১-২ )। রাজা বাস্কলি বাহবকে জিজ্ঞাসা করলেন, "ব্রহ্ম কি রূপ?" বাহব চুপ করে রইলেন। বাস্কলি আবার জিজ্ঞাসা করলেন, তখন বাহব বল্লেন, "আমি বল্লুম, কিন্তু তুমি বুঝতে পারলে না—শান্তোঽয়মাত্মা।"—( ব্রঃ সূঃ, ৩।২।১৭—শংকরভাষ্য )। রাধাকৃষ্ণনের নিম্নলিখিত বাক্যগুলি প্রণিধানযোগ্য—"The antinomies of cause and effect, substance and attributes, good and evil, truth and error, subject and object, are due to the tendency of man to separate terms which are related. Fichte's puzzle of self and not-self, Kant's antinomies, Hume's opposition of facts and laws, Bradley's contradictions can all be got over, if we recognise that the opposing factors are mutually complementary elements based on one identity."

বুদ্ধির আলোক যখন অতীব কেন্দ্রীভূত হয়, তখন হলো বোধি বা যোগশাস্ত্রে যাকে অগ্র্যা বুদ্ধি বলে। সে লৌহাবরণের অন্ধকার বুদ্ধ্যালোক ভেদ করতে পারে না, Cosmic Ray যেখানে প্রতিহত হয়, বোধি ভেতর দিয়ে তার নিজ গতিবিধির রাজপথ দেখতে পায়। বোধি পদার্থটি বুদ্ধিমাধ্যমে বিশ্লেষণ করা চলে না, তবে তার ফলগুলি ন্যায়ের কষ্টিপাথরে ঘষে সত্য মিথ্যা পরীক্ষা করা চলে। যাতে বোধি আবির্ভূত হয়েছে, তিনিই আপ্ত পুরুষ। স্বামীজী আপ্ত-পুরুষের লক্ষণ করছেন, "First see that the man is pure, and that he has no selfish motive; that he has no thirst for gain or fame. Secondly, he must show that he is super-conscious. Thirdly, he must give us something that we cannot get from our senses, and which is for the benefit of the world. And we must see that it does not contradict other truths; *if it* contradicts other scientific truths reject it at once. Fourthly, the man should never be singular; he should only represent what all man can attain." (Raja Yoga, Ch. 1, Aphor. 7) বোধি যে সত্য দান করে তা অপর বৈজ্ঞানিক অসত্যকে নিরাশ

করলেও অপর যে কোন বৈজ্ঞানিক সত্যের সহিত ঠিক খাপ খাইয়ে চলবেই। বুদ্ধির পেছনে যদি এই বোধ না থাকে তা হলে তার ফল হবে আনন্দ-রহিত অসমাপ্ত খণ্ডজ্ঞান। কিন্তু বোধিজাত সত্যগুলিকে ভিত্তি করে যে অনুমিতিগুলি পাওয়া যায়, সেগুলোর যদি ন্যায়ানুমোদিত প্রমাণ সিদ্ধ না হয়, তা হলে বুঝতে হবে যে সেটা সঠিক বোধিসম্ভূত নয়, পরন্তু একটা অন্ধভাবমূলক কল্পনা। কাজে কাজেই বোধিজাত সত্য হতে লভ্য অনুমিতিগুলির সত্যাসত্য-নির্ণয়ের কষ্টি-পাথর হলো বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা, যাতে উত্তীর্ণ হলে আমাদের চিত্তে অলৌকিক সত্য-সম্বন্ধে বিশুদ্ধ বিশ্বাস এসে উপস্থিত হয়। কিন্তু কেবল যুক্তি দিয়ে কোন কালেই জীবনসমস্যার সমাধান হবে না, কারণ যুক্তি বহুকে অতিক্রম করে থাকতে পারে না, আবার বহু থাকলেই সেখানে থাকবে সংগ্রাম ও প্রতিযোগিতা, যতদিন ও দুটি থাকবে, ততদিনই জীবনে থাকবে অসমাপ্তি ও অশান্তি, কাজেকাজেই বাস্তব জীবনে মিথ্যাদৃষ্টি এবং কুনীতি একেবারে চিরন্তনী হয়ে রইল।

কেবল নিজ স্বার্থ-সিদ্ধির জন্য সামাজিক বিশ্লেষণ, জল্প ও বিতণ্ডারূপ free-lancing-কে শ্রীরামকৃষ্ণ 'জাঁতি-ধর্ম' বলতেন, কারণ তার দ্বারা কাটা ছাড়া—ধ্বংসছাড়া গঠনমূলক কোন কিছুর সন্ধান সমাপ্তির দিক্‌চক্রে পাওয়া যায় না, ধ্বংসোপকরণে সৃষ্টির প্রক্রিয়া আনে এই বোধি—বাস্তব ও আন্তর জগতে এই রহস্যময় সৃষ্টিরসিকই শিবসুন্দর। উচ্ছৃঙ্খল তর্ক হতে অন্ধবিশ্বাস অনেক সময় জীবনে হিংস্র ব্যাঘ্রসর্প-বৃত্তিগুলিকে নিরুদ্ধ করে রাখে। কারণ তার দ্বারাও অনেকটা সামাজিক শান্তি, শৃঙ্খলা এবং শীল রক্ষা পায়, আর নইলে চলতে থাকবে অশান্ত উন্মত্ত উদ্দেশ্যহীন পশুবৃত্তির চিরন্তনী গতি। হেগেল ও মার্ক্স উভয়েই অশান্ত দার্শনিক —চিরসংগ্রামের পক্ষপাতী। কিন্তু তবুও দুজনেই দুটো শেষ 'Utopia' স্বীকার করেছেন। হেগেলের মতে বিরোধটা জীবনপ্রগতির সর্বপ্রধান উত্তেজক তত্ত্ব। Absolute Idea-র সম্পূর্ণতা না হওয়া পর্যন্ত এ চলবেই। তিনি এই সিদ্ধান্তে এসেছিলেন যে ঐতিহাসিক পূর্ব ও উত্তর পক্ষের অর্থাৎ dialectical account of historyর ভেতর দিয়ে যে সামাজিক সম্পূর্ণতা সর্বশেষে এসে উপস্থিত হবে, সেটি হচ্ছে 'Prussian State'-এর পরিপূর্ণ প্রতিষ্ঠা। আর একদিকে মার্ক্স ও হেগেলের dialecticটি নিজের Utopia-সিদ্ধির জন্য গ্রহণ করে দেখালেন যে সমাজ-প্রগতির বিভিন্ন স্তরের শেষ সিদ্ধান্ত হচ্ছে 'classless society', অর্থাৎ যখন যাবতীয় বিশ্বসমাজ এক communistic ভিত্তিতে গঠিত হবে। হেগেল সমাজপ্রগতির যে পূর্ব-উত্তর-সিদ্ধান্তপক্ষীয় ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর বিবৃতির ভেতর দিয়ে আইনগুলি আবিষ্কার করেছেন, সেই পদ্ধতিটি মার্ক্সও গ্রহণ করেছেন। দুজনের মতেই ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশের একটা যুক্তিযুক্ত ক্রম আছে। কেবল মার্ক্স হেগেলের 'philosophical Idealism'-এর পরিবর্তে 'revolutionary science'-কে আশ্রয় করেছেন। হেগেলের চরম ঔপাদানিক সত্য হলো 'mind' আর মার্ক্সের হলো 'matter' —কিন্তু উভয় প্রগতিই হচ্ছে অনন্ত অপরিসমাপ্ত পরিশ্রম, আর এ প্রগতিপথে এগোতে হবে যে কোন নিষ্ঠুরতাকে আশ্রয় করে, Ultimate Utopia বা সমষ্টি-প্রগতির ক্ষুধিত বেদীর পাদমূলে ত্যাগের পরিচ্ছদে যাবতীয় ব্যক্তিত্বের immolation ( বলিদান ) স্বীকার করে।

এখন বেদান্তীরা জিজ্ঞাসা করতে পারেন, সত্যই যদি মানবসমাজের প্রগতি চৈত্তিক অথবা

জড়ীয় শক্তির নিরবচ্ছিন্ন সংঘর্ষোত্থ হয় তা হলে 'Ideal Prussian State' অথবা 'Classless and Equalitarian State'-দ্বয়ই বা কি করে এই অশান্ত 'laws of dialectical progress' থেকে অব্যাহতি পাবে? যদি না পায়, তা হলে আবার নূতন 'antithesis' নিশ্চয় 'thesis'-এর বিরুদ্ধে বৃদ্ধি পাবে। ডায়েলেক্‌টিকের লক্ষণই যদি revolutionary হয়, তা হলে তাত কথনও জগৎকে শান্ত হতে দেবে না। ডায়েলেক্‌টিক পদ্ধতি দিয়ে প্রাণপ্রগতির কোন বিশিষ্ট সিদ্ধান্তে আমরা যদি উপনীত হই, তা হলে তা থেকে দুটো নূতন অনুমিতি এসে উপস্থিত হয়—(১) জড় অথবা মন জগতের পূর্ব উত্তর ও সিদ্ধান্ত-পক্ষরূপ ঐতিহাসিক ক্রমের চিরাবসান অথবা (২) প্রগতিসম্বন্ধীয় কোন নূতন আইন যা এখনও অজ্ঞাত, রজ্জুতে সর্পভ্রান্তির মত অকস্মাৎ মনুষ্যজীবনে বিবর্তিত হয়ে উঠবে। বেদান্ত বলছেন, সংগ্রামহীন জীবন নির্জীব আমরা স্বীকার করি, কিন্তু সে সংগ্রাম কেবল দৈহিক ও দৈহিক ভোগের জন্য জড় প্রকৃতির উপর আধিপত্য নয়, প্রকৃতির আসুর বৃত্তিকে নিরোধ করে দৈবী সম্পদের শ্রীবৃদ্ধি। সত্ত্বরজস্তমোগুণাত্মিকা সমষ্টি প্রকৃতির ক্রীড়া অনাদি অনন্ত আমরা স্বীকার করি, সেইজন্য সৃষ্টির এই ঐন্দ্রজালিক চলন্তিকা-দর্শনের আনন্দ ও দ্বন্দ্ব হারাবার ভয় নেই, তবে ব্যষ্টিমায়াকে আমরা সীমা দেই, ব্যষ্টিজীবের মুক্তি আমরা স্বীকার করি। কারণ আমরা দেখতে পাচ্ছি অবিশ্রান্ত জলস্রোতের এই মুহূর্তের জলকণা চিরকাল কথন তরঙ্গশৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকে না, তা সমষ্টিপ্রবাহ চিরকাল চলতে থাকুক, তাতে আমাদের কোন ক্ষতি নেই।

স্বামী বিবেকানন্দেরও যে প্লেটোর ন্যায় সমাজদর্শনের একটা 'Utopia' ছিল না এমন নয়। তিনি ছিলেন একজীববাদী বেদান্তী—তিনি ব্যক্তিগত মুক্তির আকাঙ্ক্ষাটা বন্ধনের হেতু মনে করতেন; তিনি ছিলেন বিশ্বাসী এক সমষ্টি-চেতনায়, যা নিজের সচ্চিদানন্দস্বরূপ-প্রকাশের জন্য বহুর ভিতর দিয়ে নিজের আত্ম-প্রকাশের চেষ্টা করছে। আমরা যে একে অন্যকে ভালবাসি, সাহায্য করি, সমাজ-সংহতি গড়ে তুলি, আবার উভয় সমাজের সংঘর্ষে যে ধ্বংস এবং নবসৃষ্টি গঠিত হয়—তার মূলে রয়েছে ঐ সমষ্টি জীবচেতনার নিজের আনন্দস্বরূপে ফিরে যাবার বুভুক্ষা—হারিয়ে ফেলা জিনিষটা ফিরে পাবার চেষ্টা। এই প্রচেষ্টার ফলস্বরূপে নানাকালে দিগ্‌দর্শনের জন্য এক একটি বিরাট চিত্তে পরীক্ষাগার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, যাকে আমরা বলি চার্বাক মুসা ব্যাস বুদ্ধ সোক্রেটিস্ প্লেটো এরিষ্টটল্ খৃষ্ট শঙ্কর রামানুজ ক্যান্ট হেগেল মার্ক্স বিবেকানন্দ রবীন্দ্রনাথ গান্ধী। ব্যক্তিগত মুক্তি নিয়ে পলায়নের পথ নেই, যতদিন একটি ব্যক্তিচেতনাও শৃঙ্খলিত থাকবে, ততদিন by law of relativity তুমিও শৃঙ্খলিত। তিনি দৃষ্টিসৃষ্টিবাদ গ্রাহ্য করেন নি, অর্থাৎ আমার মুক্তিতে সকলের মুক্তি, আমার স্বপ্ন ভেঙে গেলে স্বপ্নমধ্যস্থ সকল ব্যক্তির মুক্তি। তিনি ছিলেন সৃষ্টিদৃষ্টিবাদী, সমষ্টিসৃষ্টির মুক্তি ভিন্ন ব্যষ্টিচেতনার দৃষ্টি কথনও বাধিত হবে না। এ যাত্রায় অজ্ঞান হতে জ্ঞানে উপস্থিত হওয়া নয়, পরিপূর্ণ জ্ঞান হতেই আমরা যাত্রা সুরু করে যে কোন কারণে রাস্তা হারিয়ে ফেলেছি, আবার আমরা সেই পরিপূর্ণ জ্ঞানেই ফিরে যাব। জড় হতে আমরা সুখস্বাচ্ছন্দ্যের আনন্দানুভূতির দিকে যাচ্ছি না, এক চৈতন্যস্বরূপকে লীলায়িত ভাবে সম্ভোগের জন্য আমাদের সৃষ্টিরঙ্গমঞ্চ নির্মাণ করেছি, খেলা শেষ হলে আমরা সকলে বাড়ি ফিরে যাব—খেলা এক এক করে ভাঙবে

না, সকলের এক সঙ্গেই ভাঙবে, তার জন্য ধৈর্যের সহিত সকলের জন্ম সকলকে অপেক্ষা করতে হবে। এই জন্ম তিনি চেয়েছিলেন এমন একটি রাষ্ট্র গঠন করতে, "যাতে ব্রাহ্মণ-যুগের জ্ঞান, ক্ষত্রিয়ের সভ্যতা, বৈশ্যের সম্প্রসারণ-শক্তি এবং শূদ্রের সাম্যের আদর্শ—এ সবগুলিই ঠিক ঠিক বজায় থাকবে অথচ দোষগুলি থাকবে না, তা হলে তা একটি আদর্শ রাষ্ট্র হবে।" (পত্রাবলী ২য় ভাগ ৬৫ নং, ১৩৫৬ বঙ্গাব্দ)—অর্থাৎ এ রাষ্ট্রে থাকবে না ব্রাহ্মণের অস্পৃশ্যতা ও সংকীর্ণতা, ক্ষত্রিয়ের শাসন ও শৃঙ্খলার নামে নিষ্ঠুরতা, বৈশ্যের শরীরনিস্পেষণ ও রক্তশোষণকারী ক্ষমতা অথচ বাইরে প্রশান্ত ভাব এবং শূদ্রের অসাধারণ প্রতিভার অভাব।

যা হোক ক্রোচে (Croce) তাঁর 'What is living and what is dead of the Philosophy of Hegel'-নামক গ্রন্থে হেগেলের হিসাবের এই ভুলটা ধরে দিলেন, 'struggle of opposites' নয় 'evolution of distincts.' "Light and darkness negate each other. They are incompatible. The presence of the one implies the absence of the other. The opposites cancel each other. But the distincts like truth and beauty, philosophy and art, do not exclude each other. The idea of limit is different from that of negation. Negation is not the only aspect of nature. If economic forces condition historic evolution, it does not follow that other forces do not. The forces of economic necessity and religious idealism may interact and mould the future of history."

রাধাকৃষ্ণন্ ঠিকই বলেছেন, যে, যতক্ষণ আমরা বুদ্ধিরাজ্যের দ্বন্দ্বের মধ্যে বাস করি ততক্ষণ এক ব্রহ্মেই সদসৎ, ভাবাভাবাদি বিচিত্র বিশেষণের মধ্য দিয়ে তাঁর ধারণা করবার চেষ্টা করি, কিন্তু যখন বোধির আলোকে তাঁর সাক্ষাৎকার ঘটে, তখনই যথার্থ সদসদতীত সত্তার প্রকাশ ঘটে। ইমার্সন তাই গীতার বাক্যাবলম্বনেই এই দৃশ্য-জগতের আলোছায়ার একটা সামঞ্জস্য করবার চেষ্টা করেছেন, "When me they fly I am wings; I am the doubter and the doubt."—"The one eternal spirit expresses, embraces, unifies and enjoys the varied wealth of the world with all its passions and paradoxes, loyalties and devotions, truths and contradictions."—এখানেই বেদান্তের 'thesis' এবং 'antithesis'-এর সমাধান 'synthesis'. অজ্ঞানী এই ভূমাকে না জানাতেই বুদ্ধি রসবোধ এবং নৈতিক প্রগতিসংগ্রামে পশ্চাৎপদ হয়ে পড়ে এবং হয় ক্রমনিরোধের অর্থাৎ ক্রম-সংকোচের গতিতে গা ভাসিয়ে দেয়, নয় হিংস্র আকস্মিক পরিবর্তনের আশ্রয় গ্রহণ করে।

বাস্তবিকই হেনরি বার্গসোঁর নিম্নলিখিত কথাটি গভীর অর্থপূর্ণ—"Look to that God common to all mankind, the mere vision of whom, could all men but attain it, would mean the immediate abolition of war." ঔপনিষদ ধর্ম এমন একটা সংযম যা মানুষের হিতাহিতবুদ্ধি প্রবুদ্ধ করে, মিথ্যা হঠকারিতা ও অসত্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করে, লোভ ও ঘৃণার হাত হতে মানুষকে ত্রাণ করে; নৈতিক শক্তির রুদ্ধ দ্বার উন্মুক্ত করে দেয়, সেবাব্রতে ব্রতী করায়।

এই ঔপনিষদ ধর্মবলেই এত বড় মহাদেশে একটা ঐক্য স্থাপিত হয়েছিল। ভিন্সেন্ট স্মিথ তাঁর ভারতীয় ইতিহাসের গবেষণার ফলেই এ সিদ্ধান্তে এসেছিলেন, "India beyond all doubt possesses a deep underlying fundamental unity, far more profound than that produced either by geographical isolation or by political superiority. That unity transcends the innumerable diversities of blood, colour, language, dress, manners and sect." অধ্যাপক ক্লেমেণ্ট ওয়েব মহাভারতের বিচিত্র অবতার, গ্রাম্যদেবতা, দলকর্তা, ত্যাগী মহাত্মা, প্রতীক ও প্রবাদের মধ্য দিয়েই মহাধর্মের অনুসন্ধান পেয়েছিলেন—তাঁরা কোন মত-পথকে ত্যাগ করেন নি, তা যতই ছোট হোক বা বড় হোক—কারণ সবই যে সেই ব্রহ্মশক্তির বিচিত্র ক্রীড়া—প্রাণের অতি নিম্নস্তর হতে সূক্ষ্মস্তর পর্যন্ত তাঁরই নানা রঙ্গভঙ্গী। তাই ভারতীয় ধর্মেতিহাসে ক্রমভঙ্গ নেই, সকলেরই একটা বিশিষ্ট স্থান আছে এবং সকলেই স্ব স্ব গণ্ডির ভেতর হতে ক্রমবর্দ্ধমান হয়ে অনন্তের পথে অগ্রসর হতে পারে, যতক্ষণ না সে বুঝতে পারে যে তারই আত্মার চিরমহিমময়ী শক্তি কখন নিজেকে গোপন করেছে, কখনও বা বিচিত্র উপাধির ভেতর দিয়ে নিজের অনির্বচনীয়তা প্রকাশ করছে—"Without loss of continuity with its past, into a universal religion which would see in every creed a form suited to some particular group or individual, of the universal aspirations after one Eternal Reality" (Needham—Science, Religion and Reality).

---

# শ্রীরামকৃষ্ণ

শ্রীমাধুর্য্যময় মিত্র

এ কি হেরি অভিনব,
সকল তীর্থ মিলিয়াছে আসি রাতুল চরণে তব !
জ্ঞান-ভকতি আদি যত যোগ
তোমারি মাঝারে পেল সংযোগ,
যত সাধনার পথে পথে তব চরণচিহ্ন আঁকি
সাধকের পথে নির্দ্দেশ তরে যতনে গিয়াছ রাখি।

মহা-মিলনের মহৎ উদার বাণী
তব হৃদয়ের প্রতিস্পন্দনে উঠিতেছে রণরণি।
সব ধরমের বক্ষে নিহিত
একই চরম পরম সত্য
হল বিকশিত হৃদয়ে তোমার ; সকল বিভেদ নাশি
বেদ বাইবেল কোরান পুরাণ পড়ে আছে পাশাপাশি।

তুমি যোগরত সাধক অথবা তুমি মহা-অবতার
সে পরিচয়ের প্রয়োজন কি বা আর ?
তমসাময় রজনীর শেষে
ভাস্কর-সম দাঁড়ায়েছ এসে,
বিশ্বজনের অন্ধনয়নে করুণা-কিরণ ঢালি
দিয়াছ আলোক, দিব্য দৃষ্টি, জ্ঞানের প্রদীপ জ্বালি।

হে অনাড়ম্বর !
পূত গৈরিক পরিধেয় নহে, রাঙায়েছ অন্তর।
মোক্ষের পথ দেখাতে সবারে
গৃহি-সন্ন্যাসি-বেশে একাধারে
'ষোল টাং' তুমি করেছ সাধনা, সুকঠোর সুকঠিন ;
সে তপ নেহারি বিশ্বভবন স্তব্ধ পলকহীন।

'শুধু এক টাং কর'
মুক্তিকামীরে দিয়াছ আদেশ মিনতি-করুণ-স্বর।
হে রামকৃষ্ণ, একি পরিহাস—
তব তুলনায় সাধনপ্রয়াস ?
মর জগতের মলিন-মানবে সম্ভব সে কি কভু !
অপূর্ব্ব তুমি, অতুলন তুমি, পরমব্রহ্ম বিভু।

---

# শ্রীমৎ স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ মহারাজের পত্র

Math, Belur, Howrah.
25th Feb., 98.

মহাশয়েষু,

আপনার প্রেমপূর্ণ পত্র পাইয়া যারপরনাই আনন্দপ্রাপ্ত হইয়াছি। আপনি ছোট লাট সাহেবের সভায় যাওয়াতে ততোধিক আহ্লাদিত হইলাম। Mr. এবং Mrs. Sevier-এর জন্ম স্বামী বিবেকানন্দ পৃথক্ লোকও (Dr. Nitai Ch. Halder যিনি এক্ষণে যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের সঙ্গে ৬কাশীধামে বাস করিতেছেন) পাঠাইয়াছিলেন, সেজন্ম উক্ত ইংলণ্ডবাসিদ্বয়ের কোনও প্রকার অসুবিধা হয় নাই।

ক্রমশঃ আপনার শরীর শিথিল হইয়া আসিতেছে শুনিয়া দুঃখিত হইলাম। পরন্তু কিঞ্চিৎ পরিমাণে সুখসম্ভোগও করিলাম। কারণ মনুষ্য যত অন্তিমকালের নিকটত্বপ্রাপ্ত হয় ততই সে জ্ঞানলাভ পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর পরিমাণে করিতে থাকে।

আপনি সর্ব্বদাই আমাকে স্মরণ করিয়া থাকেন একথা আপনার পত্রে পড়িয়া সন্তোষলাভ করিলাম।

আপনার যখন বার্দ্ধক্য অবস্থা আসিয়া পড়িয়াছে, তখন আর আপনার তর্কস্থলে উপনীত হওয়া কর্ত্তব্য নয়। ইহা বারংবার আপনাকে লিখিতেছি। আপনার পত্রের মধ্যাংশের উত্তর—

প্রথমতঃ স্বামী বিবেকানন্দের শত সহস্রবার মম্বাদি স্মৃতি বিশেষরূপে পাঠ করা আছে। ইহা আমরা ভালরূপ জানি। পরন্তু সত্য কথা বলিতে কি—স্বামী বিবেকানন্দ যে কোনও অংশে আপনার মম্বাদি স্মৃতিকর্ত্তার অপেক্ষা নিম্নপদস্থ নহেন। ইহা ক্রমশঃ আপনি জানিতে পারিবেন। আপনি পরমবন্ধু বলিয়াই একথা আপনাকে পূর্ব্বেই বলিয়া রাখিলাম।

দ্বিতীয়তঃ আপনার যখন উপবীত প্রভৃতি নাই, তখন আপনি শূদ্র। "ন শূদ্রে পাতকং কিঞ্চিৎ ন চ সংস্কারমর্হতি" ইতি মনুঃ। আপনার আবার আহারাদি বিচার কি? আপনি যে সমস্ত কার্য্য করিতেছেন সমস্তই মনুমতে গর্হিত এবং আপনার নিজের মতে নিজে আপনি ক্রমশঃ পাপপঙ্কে নিমগ্ন হইতেছেন।

তৃতীয়তঃ মনুর মতে (১) সকলকে গোমাংসাদিতে তর্পণাদি ক্রিয়া করিতে হয়। তাহা আপনার মতবাদী হিন্দুগণ করেন কৈ? (২) অসবর্ণে বিবাহাদি করেন না কেন? (৩) শূদ্রের পাক অন্ন তিন বর্ণ খান না কেন? ইত্যাদি……।

চতুর্থতঃ আপনি যখন শূদ্রবাচ্য তখন মনুর মতে আপনার কর্ত্তব্য—আপনার যাবতীয় ধন আছে সমস্ত বিতরণ করিয়া 'চাকরের' বৃত্তি অবলম্বন করা; ইহা যদি না করেন তাহা হইলে জানিব যে, আপনি (আপনার মনুর মতেই) বৃথা মানুষ এবং আপনার জন্ম বৃথা।

পঞ্চমতঃ এক্ষণে আমাদিগের মতে আপনি অন্যায় অশাস্ত্রীয় কাজ করিতেছেন। আপনি শূদ্র নন। আপনি ক্ষত্রিয়। আসুন, আমরা আপনাকে যজ্ঞোপবীত দিব। আপনি যদি ভীরু না হন, 'পণ্ডিতমূর্খের' (অর্থাৎ যাহারা দুএক পাতা শাস্ত্র পড়ে ঘোর মূর্খতার পরিচয় দেয়) কথায় না টলেন তো আসুন, আপনাকে নব-জীবন দান করিব। পরমহংসদেবের

জন্মতিথি-পূজার দিনে স্বামী বিবেকানন্দ অনেক লোককে উপবীত দিয়াছেন—তাহারা নবজীবন লাভ করিয়াছে।

ষষ্ঠতঃ। আপনি মনে করিবেন না যে, আপনাকে উপরি-উক্ত প্রকারে লিখিলাম বলিয়া আমরা আপনাকে অশ্রদ্ধা করি বা অবমাননা করি। এরূপ পত্র বন্ধু ভিন্ন অপরকে লেখা যায় না। আমরা আপনার বন্ধু, আপনি আমাদিগের বন্ধু। আপনাকে বন্ধুভাবে এবং অতি প্রীতির সহিত লিখিলাম। কিন্তু আপনি তর্কস্থলে উপনীত হইবেন না—ইহা আপনাকে বন্ধুভাবে আবার বলিতেছি।

মঠ-নির্ম্মাণের ব্যয়ভার ঈশ্বরই গ্রহণ করিয়াছেন। ৪০ হাজার টাকা দিয়া ১৮ বিঘা উত্তম জমি গঙ্গার পশ্চিমকূলে ক্রয় করা হইয়াছে। আরও মঠের জন্ম প্রায় একশত বিঘা জমি ঐ জমির চতুষ্পার্শ্বে ক্রয় করিবার মত আছে। জমিতেই প্রায় ২ লক্ষ টাকা পড়িয়া যাইবে। এতদ্ব্যতীত মন্দিরাদি-নির্ম্মাণ করিতে প্রায় ১০।১২ লক্ষ টাকা পড়িবে। এ সমস্ত বৃহদ্ব্যয়ভার একমাত্র ঈশ্বর ব্যতীত আর কে লইতে সমর্থ?

স্বামী বিবেকানন্দের মুখে দিন কতক হইল শুনিয়াছিলাম যে, পশ্চিমাঞ্চল হইতে আসিবার সময় আপনার ভবন হইয়া আসিবার ইচ্ছা তাঁহার ছিল। কিন্তু কার্য্যবিপাকে তাহা ঘটে নাই। ইহাতে প্রকাশ পাইতেছে যে তাঁর প্রীতি আপনার উপর যায় নাই।

শ্রীশ্রীপরমহংসদেবের জন্মোৎসব উপলক্ষে ১০৲ পাইলে আপনাকে লিখিব। হিন্দুপত্রিকা-সম্বন্ধে চাঁদা এক টাকা আমাদিগের নিকট পাঠাইবার কারণ লিখিবেন। হিন্দুপত্রিকা তো আমাদের পত্রিকা নহে।

অখণ্ডানন্দ স্বামী মঠে আসিয়াছেন। আমাদিগের সকলকার প্রীতি ও ভালবাসা জানিবেন ও আপনাদিগের কুশলসমাচার সর্ব্বদা লিখিবেন। ইতি *

আপনার শুভাকাঙ্ক্ষী বন্ধু—
ত্রিগুণাতীত

* স্বর্গীয় প্রমদাদাস মিত্র মহাশয়কে লিখিত।

# গুরু

শ্রীশশাঙ্কশেখর চক্রবর্ত্তী

সংসার-পথে চলিতে চলিতে রুক্ষ ঊষর-বুকে,
পিপাসায় প্রাণ কাতর যখন, কে তুমি বন্ধু এলে?
হস্তে তোমার অমৃত-ঝারি, হাসি ঝরে মধুমুখে,
নিদাঘ-কিরণ আড়াল করিয়া তরু-ছায়া দিলে মেলে।

গভীর আঁধারে দুর্য্যোগ রাতে চলেছিনু যবে একা,
শঙ্কিত হিয়া কেঁপে কেঁপে উঠে ভরেছিল বেদনাতে,
ভাস্বর-দীপ হস্তে ধরিয়া সম্মুখে দিলে দেখা,
প্রিয়-সাথী সম দেখাইয়ে পথ নিয়ে গেলে তব সাথে।

আমি ত তোমারে চিনি নাই কভু, মনে ছিল সংশয়,
তোমারে মানিনি, তোমারে বুঝিনি, করিয়াছি অনাদর।
আপন বক্ষে তবু দেছ মোরে সুশীতল আশ্রয়,
শিখায়েছ মোরে তোমারেই শুধু করিবারে নির্ভর।

অহমিকা-ভারে আপনার বোঝা করিয়াছি গুরুভার,
নিজ হাতে তুমি নামায়ে নিয়েছ দুঃখ লাঘব করি।
মোহভরে মাথে সে ভার তুলেছি পুনরায় কতবার,
হাসিমুখে তুমি ফিরে নামায়েছ চলার পথের 'পরি।

কামনার মোর শেষ নাহি ভবে, ছুটাছুটি তারি তরে,
মরীচি-মায়ায় ভুলে চলে যাই—নাহি তার উদ্দেশ,
পিছনে পিছনে তবু আসো তুমি, দিন কাটে খেলাভরে,
আমি দূরে গেলে তুমি রহ কাছে, নাহি তব ক্রোধ-লেশ।

মোর কাছে তুমি ভালবাসা চেয়ে পেলে যত অপমান,
শুচি ও শুদ্ধ মন চেয়ে চেয়ে লভিলে কলুষ-গ্লানি!
বারেকের তরে হওনি বিমুখ স্নেহ দিয়ে অফুরান্—
মায়ের মতন ভুলে গেছ দোষ, বক্ষে নিয়েছ টানি!

দুর্দ্দিনে তুমি প্রিয়-বান্ধব, সাথী দুর্গম-পথে,
ভব-পারাবার-সঙ্কট মাঝে তরণী-কর্ণধার,
আলোকের দ্যুতি প্রসন্ন-জ্যোতি অজানা ভবিষ্যতে
শ্রান্তজনের আশ্রয়-তরু বিগ্রহ করুণার!

# কাব্যের জন্মকথা

অধ্যাপক শ্রীহরেন্দ্রচন্দ্র পাল, এম্-এ

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'সাহিত্যের তাৎপর্য্যে' বলিয়াছেন, "হৃদয়ের জগৎ আপনাকে ব্যক্ত করিবার জন্ম ব্যাকুল। তাই চিরকালই মানুষের মধ্যে সাহিত্যের আবেগ।" এই সাহিত্যের আবেগ বা রসানুসন্ধিৎসা যখন অনুভূতির ভিতর তার আদর্শকে লাভ করিতে পারে তখনই তাহা কাব্য হইয়া উঠে। তাই সংস্কৃত আলঙ্কারিক বলিয়াছেন, 'বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম্।' এই 'রসের' স্বরূপপ্রকাশ করিতে গিয়া শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত অভিনবগুপ্তের উক্তি অনুসরণ-ক্রমে লিখিয়াছেন, "রস হচ্ছে নিজের আনন্দময় সম্বিতের ( Consciousness ) আস্বাদ-রূপ একটি ব্যাপার। মনের পূর্বনিবিষ্ট রতি প্রভৃতি ভাবের বাসনা দ্বারা অনুরঞ্জিত হয়েই সম্বিৎ আনন্দময় সৌকুমার্য প্রাপ্ত হয়। লৌকিক 'ভাব' এর কারণ ও কার্য, কবির গ্রথিত শব্দে সমর্পিত হয়ে, সকল হৃদয়ে যে মনোরম বিভাব ও অনুভাব রূপ প্রাপ্ত হয়, সেই বিভাব ও অনুভাবই কাব্যপাঠকের অন্তর্নিবিষ্ট ভাবগুলিকে উদ্‌বুদ্ধ করে।" আবার উপনিষদে রহিয়াছে, "রসো বৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি।" তিনিই রস। এই রসকে পাইয়াই মানুষ আনন্দিত হয়।

ইংরেজ-কবি কীট্‌স্ বলিয়াছেন: Truth is beauty, beauty truth. আবার উপনিষৎ বলিতেছেন—আনন্দরূপমমৃতং যদ্-বিভাতি। এই সকল উদ্ধৃতি দ্বারা রবীন্দ্র-নাথ কাব্যের লক্ষ্য-সম্বন্ধে 'সৌন্দর্য্যবোধ'-প্রবন্ধে বলিয়াছেন, "সত্যের এই আনন্দরূপ অমৃতরূপ দেখিয়া সেই আনন্দকে ব্যক্ত করাই কাব্য-সাহিত্যের লক্ষ্য। সত্যকে যখন শুধু আমরা চোখে দেখি, বুদ্ধিতে পাই, তখন নয়, কিন্তু যখন আমরা হৃদয় দিয়া পাই তখনই তাহাকে সাহিত্যে প্রকাশ করিতে পারি।" তাই বোধ হয় আলঙ্কারিক রসের আস্বাদকে বলিয়া-ছেন 'পরব্রহ্মাস্বাদসচিবঃ'।

কিন্তু এই ভাবে আমরা যতই কাব্য-স্বরূপ ব্যাখ্যা করি না কেন, তাহা সাধারণের নিকট কথনই বিশেষ পরিচয়লাভ করিতে পারিবে না। তাই এখানে রূপকভাবে 'কাব্যের জন্ম-কথা' বর্ণনা করা হইতেছে। এই রূপকটি কতকটা পরিবর্ত্তিত ও সংক্ষিপ্ত আকারে প্রাচীন উর্দু সাহিত্যের এক প্রসিদ্ধ গন্থকার মুল্লা উয়াজ্‌হির 'সবরস' হইতে গ্রহণ করা হইয়াছে।

প্রাচীন ভারতীয় শিল্প ও সাহিত্যের কেন্দ্রস্থল অবন্তি-রাজ্যে 'জ্ঞান' নামে এক শক্তিধর রাজা ছিলেন। তাঁহার একমাত্র পুত্রের নাম 'জীবন'। রাজপুত্র বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তাঁহাকে 'দেহ'-রাজ্যের যুবরাজপদে অভিষিক্ত করা হইল।

একদিন কথাপ্রসঙ্গে যুবরাজ 'জীবনের' অন্তরঙ্গ বন্ধু 'অনুসন্ধিৎসা' তাঁহার নিকট 'সঞ্জীবনী বারির' উল্লেখ করিল। এই বারির কথা শুনামাত্রই যুবরাজ ইহাকে লাভ করিবার জন্ম একেবারে ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন এবং ইহার চিন্তায় একেবারে আহার-নিদ্রা পরিত্যাগ

করিলেন। অবশেষে নিরুপায় হইয়া 'অনুসন্ধিৎসা'কে ইহার খোঁজে বাহির হইতে হইল। কিছুদূর গিয়াই পথিমধ্যে 'নিরাপত্তা'-নামে একটি সুন্দর শহর দেখিতে পাইল। ইহার রাজা 'নিরাকাঙ্ক্ষের' সহিত সাক্ষাৎ করিয়া 'সঞ্জীবনী বারির' সন্ধান করিলেন। কিন্তু 'নিরাকাঙ্ক্ষ' অনুসন্ধিৎসা'কে এই বিষয়ে কোন সংবাদ দিতে পারিলেন না। তিনি বলিলেন, "সঞ্জীবনী বারি তো কল্পনা-মাত্র; বাস্তবিক এর কোন অস্তিত্ব নাই। সঞ্জীবনী বারি বলতে মানুষের আনন্দানুভবকেই বুঝায়।" 'অনুসন্ধিৎসা' নিরাশ হইয়া আরো অগ্রসর হইতে লাগিল। চলিতে চলিতে সে একটি উচ্চ পর্ব্বতের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। অনুসন্ধান করিয়া জানিল যে এই পাহাড়ের নাম 'কুচ্ছ্রাদ্রি' এবং ইহা এক বৃদ্ধ 'বক-ধর্ম্ম'-নামধারীর বাসস্থান। তাহার সন্নিধানে গিয়া 'অনুসন্ধিৎসা' 'সঞ্জীবনী'র কথা জিজ্ঞাসা করিল। উত্তরে 'বক-ধর্ম্ম' বলিল, "পৃথিবীতে এর সন্ধান কোথায় পাবে? এ তো স্বর্গের জিনিষ। তবে প্রেমিকরা অনেক সময় চোখের জলের মধ্যে এর অনুসন্ধান করে থাকেন।"

কিন্তু এই উত্তরও অনুসন্ধিৎসার মনোমত হইল না। নিরাশ হইয়া অগ্রসর হইতে লাগিল এবং কিছু দূরেই উচ্চচূড়া-সমন্বিত একটি দুর্গ দেখিতে পাইল। এই দুর্গ 'নেতৃত্ব'-নামে প্রসিদ্ধ এবং ইহার অধিকারী 'মানবতা'। মনুষ্যত্ব ও ব্যক্তিত্বের আধার 'মানবতা' অনুসন্ধিৎসাকে বলিল, "মানস সরোবরের নিকটে 'প্রত্যক্ষানুভূতি'-নামে একটি নগর আছে; সেই নগরে 'চন্দ্রমুখ'-নামে একটি উদ্যান অবস্থিত। সেই উদ্যানের মধ্যস্থিত 'সুভাষণ'-নামে একটি ঝরণার মধ্যে 'সঞ্জীবনী বারি' পাওয়া যায়। সেই 'সঞ্জীবনী বারি' তোমাকে খোঁজে বের করতে হবে।" এ পথ অতিশয় দুর্গম। নির্ভয় ও সাহসী ব্যক্তিই কেবল সেখানে যাবার উপযুক্ত। তাছাড়া 'প্রত্যক্ষানুভূতি'র 'প্রতিদ্বন্দ্বিতা'-নামে এক নগররক্ষক আছে। সে অতি হিংসুক, সে কোন অপরিচিত লোককে সেই নগরে ঢুকিতে দিতে নারাজ। কিন্তু 'মানবতা' অনুসন্ধিৎসাকে সঞ্জীবনী বারি খোঁজ করিতে খুবই উৎসাহপ্রদান করিল এবং সেই সঙ্গে 'প্রত্যক্ষানুভূতি'-বাসী তাহার ভাই 'সরলতা'র নামে 'অনুসন্ধিৎসা'র প্রশংসা করিয়া একটি হাতচিঠি দিয়া দিল।

'অনুসন্ধিৎসা' নানা দুঃখ-কষ্ট অতিক্রম করিয়া অবশেষে 'প্রতিদ্বন্দ্বিতা'-রাজ্যে গিয়া উপস্থিত হইল। তাহাকে দেখিয়াই প্রহরীর দল 'অনুসন্ধিৎসা'কে বন্দী করিয়া 'প্রতিদ্বন্দ্বিতা'র সম্মুখে উপস্থিত করিল। 'প্রতিদ্বন্দ্বিতা'র উগ্রমূর্ত্তি দেখিয়া তাহার নিজের জীবনের আশঙ্কা হওয়ায় বেশ চতুরতার সহিত সে নিজেকে পণ্ডিত ও রসায়নবিদ্ বলিয়া পরিচয় দিল এবং সেই সঙ্গে তাহাকে এইরূপ আভাসও দিল যে, সুযোগ-সুবিধা পাইলে সে সাধারণ জিনিষ হইতে বহু মূল্যবান ধাতু তৈয়ার করিতে পারে। ইহা শুনিয়া 'প্রতিদ্বন্দ্বিত'ার মনে লোভের উদ্রেক হইল এবং 'অনুসন্ধিৎসা'কে বেশ খাতির করিতে লাগিল। পরে যখন তাহার উপর মূল্যবান দ্রব্যাদি তৈয়ার করিবার আদেশ হইল তখন সে বলিল, "রসায়ন-বিষয়ক এমন কতকগুলি জিনিষ আমার চাই, যা কেবল 'প্রত্যক্ষানুভূতি'-শহরেই পাওয়া যায়; তাই তুমি আমায় তথায় নিয়ে চল, তাহলেই তোমাকে স্বর্ণাদি তৈরি করে দিতে পারিব।"

সেখানে গিয়া 'সরলতা'র সহিত অনুসন্ধিৎসার সাক্ষাৎ হইল এবং সে মানবতার চিঠিটি তাহাকে প্রদান করিল। তাহারই

সাহায্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার হাত হইতে রক্ষা পাইয়া 'অনুসন্ধিৎসা' 'প্রত্যক্ষানুভূতি'-নগরের দিকে আরো অগ্রসর হইতে লাগিল। ক্রমে সে 'মুখচন্দ্র'-উদ্যানে আসিয়া পৌঁছিল এবং সেখানকার সৌন্দর্য্য দেখিয়া একেবারে মুগ্ধ হইয়া গেল।

'সৌন্দর্য্য'-নাম্নী এক নারী এই উদ্যানের অধিকারিণী। এই মহীয়সী নারী 'প্রেম'-নামক সম্রাটের একমাত্র কন্যা। 'প্রেম' এই সাম্রাজ্যের প্রবল পরাক্রমশালী সম্রাট। ঘটনাক্রমে সৌন্দর্য্যের ভ্রমণরতা এক সখীর সঙ্গে অনুসন্ধিৎসার সাক্ষাৎ হইল। সখী 'কুন্তল' তাহাকে দেখিয়া খুবই আশ্চর্য্যান্বিত হইল এবং এরূপ ভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করিতে লাগিল যে, 'অনুসন্ধিৎসা' ভয় পাইয়া গেল। সে 'কুন্তল'কে বিশেষ অনুনয়-বিনয় করিয়া বলিল, "আমি অতিশয় বিপদাপন্ন, আমি কোনক্রমে এখানে এসে গিয়েছি; কিন্তু এখন তুমি আমাকে সাহায্য না করলে আমার আর উপায় নেই। তুমি আমার প্রতি কৃপা কর।" ইহাতে 'কুন্তলে'র তাহার প্রতি দয়া হইল। সে তাহাকে সঙ্গে করিয়া কতকদূর নিয়া গেল। বিদায়মুহূর্তে তাহার মাথার একমুঠো কেশ দিয়া বলিল, "যদি কখনও তোমার কোন বিপদ আসে, তা হ'লে এর দু-একটি আগুনে পুড়িয়ে দিও—তন্মুহূর্ত্তেই আমি জানতে পারব এবং তোমার সাহায্যার্থ প্রস্তুত থাকব।"

আরো কিছুদূর অগ্রসর হইয়া অনুসন্ধিৎসার 'দৃষ্টিপাতের' সহিত সাক্ষাৎ হইল। 'দৃষ্টিপাত' অনুসন্ধিৎসার ভাই। কিন্তু শিশুকাল হইতেই তাহারা উভয়েই একে অন্য হইতে পৃথক হইয়া গিয়াছিল বলিয়া কেহ কাহাকেও চিনিতে পারিল না। এই 'মুখচন্দ্র' উদ্যানেরই রক্ষক। 'দৃষ্টিপাত' একজন অপরিচিত লোককে তথায় দেখিতে পাইয়া তৎক্ষণাৎ তাহাকে মারিবার উপক্রম করিল। কিন্তু হঠাৎ তাহার দৃষ্টি 'অনুসন্ধিৎসা'র হাতের কবচের উপর পড়িল। তাহাদের মা উভয়ের হাতে তাহাদের জন্মের পরই তাহাদের পরিচিতি-স্বরূপ একই প্রকার কবচ বাঁধিয়া দিয়াছিল। 'দৃষ্টিপাতে'র চক্ষু ইহার উপর পড়ামাত্রই অনুসন্ধিৎসাকে একেবারে জড়াইয়া ধরিল এবং আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিল। অনুসন্ধিৎসা ভাইকে সকল ব্যাপার বিস্তৃত বলিল। 'দৃষ্টিপাত' সৌন্দর্য্যের একজন সহচর; সে তাহাকে সৌন্দর্য্যের নিকট নিয়া গেল।

সৌন্দর্য্য 'দৃষ্টিপাতের' নিকট হইতে তাহার ভাই 'অনুসন্ধিৎসা'র পাণ্ডিত্য ও অভিজ্ঞতা-সম্বন্ধে সমস্ত অবগত হইয়া তাহার নিজের বহুমূল্যবান আংটির মধ্যস্থিত প্রস্তর-খোদাই মনোহর মূর্ত্তি তাহাকে দেখাইয়া ইহার সম্বন্ধে সে কিছু জানে কি না জিজ্ঞাসা করিল। এই মূর্ত্তি দেখিয়া 'অনুসন্ধিৎসা' একেবারে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া গেল। সে বলিল, "এ যে আমাদের যুবরাজ 'জীবনের' মূর্ত্তি দেখতে পাচ্ছি।" ইহা শুনিয়াই 'সৌন্দর্য্য' তাহার প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হইল। অনুসন্ধিৎসা তখন বলিল, "'জীবন' 'সঞ্জীবনী বারি'র অনুসন্ধানে আছে এবং সে এর জন্য একেবারে অস্থির। এ আপনার অধীনেই আছে। যদি তাঁর ইহা কোন উপায়ে লাভ করিবার সুযোগ থাকে, তবে তাঁকে আপনার নিকট নিয়ে আসতে পারি।"

'সৌন্দর্য্য' ইহাতে সম্মত হইল এবং আজ্ঞাবহ 'ভাব'কে বহুগুণযুক্ত একটি হীরার আংটি দিয়া উভয়কে বলিল, "তোমরা যাও এবং যত শীঘ্র সম্ভব আমার 'জীবনকে' নিয়ে এসো। এ আংটি 'সঞ্জীবন-বারির' নিদর্শনস্বরূপ। এ মুখে রাখিলে নিমিষে লোকচক্ষুর আড়াল হয়ে যাবে এবং যেখানে ইচ্ছা যেতে পারবে।" তাহারা উভয়ে শীঘ্রই 'দেহ'-রাজ্যে আসিয়া উপস্থিত হইল। 'জীবনে'র সহিত সাক্ষাতের

পর 'ভাবে'র সহিত তাহার বিশেষ আলাপ-পরিচয় হইলে সে জীবনকে একটি 'সৌন্দর্য্যের' চিত্র বাহির করিয়া দেখাইল। দেখিবামাত্রই 'জীবন' ইহার প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইল এবং 'অনুসন্ধিৎসার' সহিত পরামর্শক্রমে এইরূপ ঠিক হইল যে 'জীবন' তাহাদের সঙ্গে 'প্রত্যক্ষানুভূতি'তে 'সৌন্দর্য্য'-মিলনে রওনা হইবে।

এইদিকে 'জীবনে'র পিতা 'জ্ঞান'-রাজার 'উদ্বেগ'-নামে একজন পরমশুভাকাঙ্ক্ষী মন্ত্রী ছিলেন। যুবরাজ ও অনুসন্ধিৎসার সলা-পরামর্শের সংবাদ শীঘ্রই তাঁহার নিকটে পৌঁছিল। সে রাজাকে 'জীবন'-অভিযানের খবর দিয়া বলিল, "যুবরাজ যে 'অনুসন্ধিৎসার' পরামর্শক্রমে এবং 'ভাবের' ইচ্ছায় দূরদেশে 'প্রত্যক্ষানুভূতি'তে রওনা হচ্ছেন, তাতে রাজ্যে ভীষণ অমঙ্গলের সূচনা দেখা যাচ্ছে। সুচতুর 'ভাবে'র ইচ্ছার মধ্যে নিশ্চয়ই কোন অসৎ-উদ্দেশ্য নিহিত আছে। অনতিবিলম্বেই সম্রাট 'প্রেমের' সহিত আলাপ-আলোচনা দ্বারা মিত্রতা-বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া উচিত। তা না হলে কোনক্রমে যদি যুদ্ধের উপক্রম হয়, আমরা পেরে উঠব না। কারণ, প্রেম মহাশক্তিধর রাজা।" 'জ্ঞান' এই খবর পাইয়া বিশেষ উদ্বিগ্ন হইলেন এবং 'উদ্বেগে'র পরামর্শক্রমে 'জীবন' ও 'অনুসন্ধিৎসা'কে বন্দী করিয়া তাহাদের উপর কড়া পাহারার ব্যবস্থা করিলেন।

'জীবনে'র নিকট যে আংটি প্রেরিত হইয়াছিল, ইহা সে সুযোগমত অনুসন্ধিৎসাকে দিয়া দিল। সে ইহা মুখে রাখামাত্র লোকচক্ষুর অদৃশ্য হইয়া গেল। কারাগার হইতে মুক্ত হইয়া সে 'প্রত্যক্ষানুভূতি'-নগরে গিয়া পৌঁছিল। সেখানে 'মুখচন্দ্রে'র নিকটেই 'সঞ্জীবন বারি' তাহার দৃষ্টিগোচর হইল। এই বারি-দর্শনে লোভের বশবর্ত্তী হইয়া যেমনি ইহা পান করিতে যাইবে, অমনি তাহার মুখ হইতে হীরার আংটিটি জলে পড়িয়া গেল এবং তাহার সম্মুখ হইতে' সঞ্জীবন বারি' অদৃশ্য হইয়া গেল। শীঘ্রই সে 'প্রতিদ্বন্দ্বিতা'র চোখে পড়িল এবং সে দেখিবামাত্র তাহাকে ধরিয়া বন্দী করিয়া রাখিল। লোভের বশবর্ত্তী হইয়া কর্ত্তব্য-অবহেলার জন্য সে খুবই লজ্জিত হইল এবং চরম অশান্তির সহিত তাহার বন্দিজীবন কাটাইতে লাগিল।

হঠাৎ একদিন তাহার 'কুন্তলে'র কেশের কথা মনে পড়িল। ইহার একটি কেশ আগুনে নিক্ষেপ করা মাত্র 'কুন্তল' আসিয়া উপস্থিত হইল। সকল ইতিবৃত্ত জানিতে পারিয়া সে তাহাকে বন্দিশালা হইতে বাহির করিয়া আনিয়া 'মুখচন্দ্রে'র উদ্যান-পথ দেখাইয়া দিল। 'অনুসন্ধিৎসা' সেখান হইতে গিয়া 'সৌন্দর্য্যের' সহিত মিলিত হইল। 'সৌন্দর্য্য' সব শুনিয়া অত্যন্ত নিরাশ হইল। সে তাহার উদ্যানের রক্ষী ও তাহার শুভাকাঙ্ক্ষী 'দৃষ্টিপাত'কে 'অনুসন্ধিৎসার' সঙ্গে দিয়া বলিল, "তোমরা উভয়ে মিলিত হইয়া বুদ্ধি, চতুরতা বা বশীকরণ প্রভৃতি যে কোন উপায়ে 'জীবন'কে এখানে ধরে নিয়ে এসো।"

সুচতুর এবং অভিজ্ঞ দুই ভাই 'দেহ'-রাজ্যের দিকে রওনা হইল। ইত্যবসরে যখন 'অনুসন্ধিৎসা' দেহরাজ্যের বন্দিশালা হইতে অদৃশ্য হইয়া গিয়াছিল, তখনই 'জ্ঞানে'র মনে হইল যে 'অনুসন্ধিৎসা' নিশ্চয়ই কোন বিপদ ডাকিয়া আনিবে। তাই সীমান্ত-প্রদেশের সকল সর্দারদের নিকট আদেশ জারী করিয়া পাঠাইল যে, 'অনুসন্ধিৎসা' বন্দিশালা হইতে পলায়ন করিয়া চলিয়া গিয়াছে, তাহাকে যেখানেই পাওয়া যায় বন্দী করা হউক।

পার্ব্বত্য প্রদেশের অধিকারী 'কৃচ্ছ্রাদ্রি'র পুত্র 'অনুতাপ'ও এই আদেশ অবগত হইয়াছিল। 'অনুতাপ' পর্ব্বতের উপর হইতে 'দৃষ্টিপাত' ও

'অনুসন্ধিৎসা'কে সৈন্য-সামন্ত সহ এই দিকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া তাহাদের ঘিরিয়া ফেলিবার জন্য নিজ সৈন্যদিগকে আদেশ করিল। দুই ভাই অসমসাহসিকতার সহিত 'অনুতাপ'কে পরাজিত করিল এবং 'অনুতাপ' যুদ্ধে পরাজিত হইয়া পলাইয়া গেল। এই স্থান হইতে অগ্রসর হইয়া তাহারা সাধুর বেশ পরিধানপূর্ব্বক 'নিরাপত্তার' রাজা 'নিরাকাঙ্ক্ষে'র সহিত সাক্ষাৎ করিল। তাহাদের সাধু ব্যবহার 'নিরাকাঙ্ক্ষ'কে এমনভাবেই অভিভূত করিল যে, তিনি অনুসন্ধিৎসা'কে বন্দী করা দূরে থাকুক, নিজেই সন্ন্যাসগ্রহণপূর্ব্বক সংসারত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন।

এই দিকে 'অনুতাপ' পলাইয়া গিয়া 'জ্ঞানে'র নিকট উপস্থিত হইল এবং সকল বৃত্তান্ত ও 'দৃষ্টিপাতে'র সুচতুরতার কথা রাজাকে জ্ঞাপন করিল। রাজা 'দৃষ্টিপাতে'র শক্তির বিষয় জানিতে পারিয়া 'জীবন'কে বন্দিশালা হইতে ডাকাইয়া আনিলেন এবং 'সৌন্দর্য্যের' সৈন্যসামন্তের প্রভূত ক্ষমতার কথা পুত্রকে বিশদভাবে বুঝাইয়া বলিলেন, "এদের কোন রকমেই বিশ্বাস করা যায় না। তুমি যদি এদের প্রতারণায় ভুলে শত্রুপক্ষ সমর্থন কর, তা হলে তোমার নিজ রাজ্য হতেই বঞ্চিত হবে, আর কোন লাভ হবে না। আমাদের কথা শুনে এদের বিরুদ্ধে দাঁড়াও। একা যাওয়া সমীচীন নয়, সৈন্য-সামন্ত নিয়ে অগ্রসর হও।" 'জীবনে'র এই উপদেশ মনে ধরিল। সে মনে মনে ভাবিল, যদি জয়লাভ হয় তাহা হইলে তো 'সৌন্দর্য্য' আমার করায়ত্ত। আর পরাজিত হইলে ক্ষমাভিক্ষা তো হাতেই রহিল।

'জীবন' এই যুদ্ধের নেতৃত্ব গ্রহণ করিলেন এবং 'জ্ঞানের' প্রধান সেনাপতি 'ধৈর্য্য' সৈন্য-সামন্ত নিয়া তাহার অনুসরণ করিলেন। কিছুদূর অগ্রসর হইয়াই খবর পাইল যে, সম্মুখের জঙ্গলেই অনেক সুন্দর সুন্দর হরিণ বিচরণ করিতেছে। ইহা শুনিয়া শিকারের প্রবৃত্তি যুবরাজের মনে প্রবল হইয়া উঠিল এবং তীর-ধনু সহ অশ্বারোহণপূর্ব্বক শিকারান্বেষণে বাহির হইলেন। কিন্তু এই সকল হরিণ প্রকৃতপক্ষে 'দৃষ্টিপাতে'র মায়াবী সৈন্য। তাহাদের কে শিকার করিতে পারে? এই সৈন্য 'জীবন'কে প্রতারণা দ্বারা ভুলাইয়া ক্রমে ক্রমে 'প্রত্যক্ষানুভূতি'-নগরে নিয়া আসিল। তারপর 'দৃষ্টিপাত' 'সৌন্দর্য্য'কে এই খবর দিলে সে বিশেষ আনন্দিত হইল।

কিন্তু এখন প্রধান সমস্যা হইল—'জ্ঞান' যে বিস্তর সৈন্যবাহিনী সহ অগ্রসর হইতেছেন তাহার কি করা যায়? আর কি করেই বা এই বিপদের সম্মুখীন হওয়া যায়। অবশেষে এইরূপ সিদ্ধান্ত হইল যে 'সৌন্দর্য্য' তাহার পিতাকে এই বিষয়ে ওয়াকিবহাল করিবে, যাহাতে সে ইহার সম্মুখীন হইয়া তাহাদের এই বিপদ হইতে রক্ষা করিতে পারে। সেই মতে 'সৌন্দর্য্য' তাহার পিতাকে পত্রদ্বারা জানাইল, "আমার এক আজ্ঞাবহ 'ভাব' অনেক দিন নিরুদ্দেশ হইয়াছে। অনেক খোঁজাখুঁজির পর জানা গেল যে, 'জ্ঞান' রাজা কর্ত্তৃক বন্দী হইয়া রহিয়াছে। 'ভাব'কে ছাড়িয়া দিতে অনুরোধ করিয়া লোক পাঠানো হইলে সে অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া একেবারে রাজ্য-সীমানায় আসিয়া উপস্থিত।" 'প্রেম' তাহার আদরের কন্যার এই পত্র পাইয়া একেবারে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া উঠিলেন এবং চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "'জ্ঞানে'র এতদূর সাহস যে আমার রাজ্যে এসে তার শক্তি জাহির করতে চায়। পাগল না হলে কি আর আমার সঙ্গে যুদ্ধ করতে 'জ্ঞান' সাহস পায়!"

অনতিবিলম্বে 'প্রেম' তাঁহার বীর সেনাপতি 'দয়া'কে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে আদেশ দিলেন। 'জ্ঞান' তাহার বিশাল সৈন্যবাহিনী দেখিয়া বিস্ময়ান্বিত হইলেন এবং তাঁহার পুত্রের অবিবেচনা ও নিজের কৃতিত্বের জন্য বিশেষ অনুশোচনা করিতে লাগিলেন। 'দৃষ্টিপাত' 'জ্ঞান'কে প্রথম দিন আক্রমণ করিল এবং 'জ্ঞান'কে অনেকটা কাবু করিয়া ফেলিল। দ্বিতীয় দিন 'সরলতা'র আক্রমণে 'জ্ঞান' একেবারে নাজেহাল হইয়া গেলেন। তৃতীয় দিন 'কুন্তল' নৈশ আক্রমণ দ্বারা নিদ্রিতদের সকলকে একসঙ্গে বন্দী করার উপক্রম করিল। এমন সময় 'সুবাস' আসিয়া উপস্থিত। তাহাতে 'জীবনে'র সৈন্যদের মধ্যে একটা উদ্দীপনার ভাব ফিরিয়া আসিল। 'সুবাস' কুন্তলের সৈন্যদের এমন ভাবে জব্দ করিল যে, তাহাদের পলায়ন করিয়া কোনরূপে রক্ষা পাইতে হইল।

'সৌন্দর্য্য' যুদ্ধের এই খবর শুনিয়া হতাশ হইয়া পড়িল। তাহার সহচরী 'তিল' তাহাকে পরামর্শ দিল, "হিমালয়ের পাদদেশে তোমার এক 'সহোদরা' আছে। সে অতি চতুরা ও সাহসী; সৌন্দর্য্যও তাঁহার নিখুঁত। সে যদি তোমার সাহায্যার্থ আসে, তাহলে আর তোমার কোন ভয় নাই।" 'সৌন্দর্য্য' বলিল, "তাকে এই অল্প সময়ের মধ্যে কি করে আর খবর দেওয়া যায়?" 'তিলের' পক্ষে ইহা মোটেই কষ্টসাধ্য হইল না। যাদুমন্ত্র দ্বারা অতি অল্প সময়ের মধ্যে 'সহোদরা' সেখানে আনীত হইল। 'সৌন্দর্য্য' তাহাকে সকল বৃত্তান্ত শুনাইল। 'সহোদরা' কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিল, "এতে আর ভয়ের কি আছে? 'জ্ঞানে'র এমন শক্তি নাই যে, সে আমার আক্রমণ রোধ করতে পারে।" এই বলিয়া সে তাহার 'ইসারা', 'প্রেমাদর' প্রভৃতি সৈনিককে সেনাপতি 'দয়া'র সাহায্যার্থ প্রেরণ করিল। 'সৌন্দর্য্যে'র নিকট 'ভ্রূকুটি'-নামক এক সিদ্ধহস্ত ধনুর্দ্ধারী ছিল। তাহাকেও যুদ্ধে প্রেরণ করা হইল। 'ভ্রূকুটি'কে পাইয়া 'দয়া'র সৈন্যসামন্ত সকলেই বেশ উৎসাহ ও উদ্দীপনা অনুভব করিল। 'ভ্রূকুটি' যুদ্ধক্ষেত্রে সহজেই অগ্রসর হইয়া চলিল। তাহার বীরত্বের সম্মুখীন হইতে কেহই সাহস পাইল না। সে একেবারে 'জীবনে'র সম্মুখে গিয়া উপস্থিত এবং অজ্ঞাতসারে তাহার প্রতি এমনই তীক্ষ্ণ বাণ নিক্ষেপ করিল যে, সে অশ্ব-পৃষ্ঠ হইতে অচেতন হইয়া মাটিতে পড়িয়া গেল। ইহা দেখিয়া জীবনের সৈন্যসামন্ত বিশৃঙ্খল হইয়া একে একে পলাইতে লাগিল। 'জ্ঞান'ও আর কোন উপায় না দেখিয়া পলায়ন করিয়া রক্ষা পাইলেন।

যুদ্ধজয়ের আনন্দধ্বনিতে নগর মাতিয়া উঠিল। 'জ্ঞান'কে নিকটে দেখিতে না পাইয়া 'প্রেমে'র সৈন্যগণ 'জীবন'কে বন্দী করিয়া 'সৌন্দর্য্যে'র নিকট লইয়া আসিল। 'জীবনের' অবস্থা দেখিয়া 'সৌন্দর্য্য' নীরবে অশ্রুবিসর্জ্জন এবং 'ভ্রূকুটি'ও তাহার সহচরদের কটূক্তি করিতে লাগিল। তাহার নিজের ধাত্রী 'আদর'কে তাহার দুঃখকষ্টের সকল কথা খুলিয়া বলিল। ধাত্রী বলিল, "এখন ক্রন্দন-সংবরণ করে বিশেষ ধৈর্য্য-সহকারে কার্য্যে অগ্রসর হওয়া চাই; তা'না হলে কেবল দুর্নামেরই ভাগী হতে হবে। আমার মতে এখন আমাদের উচিত 'জীবন'কে 'চন্দ্রমুখ'-উদ্যানের মধ্যস্থিত 'টোল' নামে যে একটি গভীর কাঁচা সোনার তৈরী কূপ রয়েছে, তাতে বদ্ধ করে রাখা। এতে বন্দী থাকলেও এর আবহাওয়া 'জীবনকে' কতকটা আনন্দ দিবে।" এইভাবে বেচারা 'জীবন' বন্দী হইয়া রহিল, আর 'সৌন্দর্য্য' বিরহজনিত অশান্তি ভোগ করিতে লাগিল।

অবশেষে আর সহ্য করিতে না পারিয়া 'সৌন্দর্য্য' তাহার সহচরী ও সেনাপতি 'দয়া'র কন্যা 'বিশ্বস্ততা'কে তাহার বিরহের সকল যন্ত্রণা খুলিয়া বলিল এবং ইহার একটা প্রতিকার করিতে অনুরোধ করিল। বিশ্বস্ততা বলিল, "আমার মতে, এই শহরেই অবস্থিত 'রস-সরোবরে'র পাশে 'পরিচিতি'-উদ্যানের মধ্যে লতাকুঞ্জপরিবেষ্টিত যে একটি ছোট কুঠরী আছে, সেখানে জীবনকে আনিয়া রাখ এবং নৈশ-অভিযানে খিড়কী-দরজা দিয়া তার সহিত মিলিত হও। তা হলে মিলন-উল্লাসের আনন্দ তোমরা উভয়েই সম্ভোগ করতে পারবে।" 'সৌন্দর্য্য' তদনুসারে 'বিশ্বস্ততা'কে ইহার সুব্যবস্থা করিতে অনুরোধ করিল।

এই সঙ্গে 'সৌন্দর্য্য' 'কুন্তল'কে 'জীবনে'র বন্ধন মুক্ত করিয়া দিবার আদেশ দিল। 'কুন্তল' 'জীবন'কে বন্ধনমুক্ত করিয়া 'টোল' হইতে বাহির করিয়া লইয়া আসিল এবং বিশেষ সমাদরের সহিত 'পরিচিতি'-উদ্যানের দিকে লইয়া চলিল। 'জীবন' এখানকার অপরূপ সৌন্দর্য্য দেখিয়া বিমুগ্ধ হইয়া গেল। ঠিক এই সময়ে 'বিশ্বস্ততা'ও আসিয়া যোগ দিল। সে বলিল, "আপনাকে বন্দী করিয়া রাখার মধ্যে 'সৌন্দর্য্যে'র কোন দোষ নাই। সে অবস্থানুযায়ীই এরূপ করতে বাধ্য হয়েছিল। তা না হলে হয়ত 'প্রেম' সম্রাটের আদেশে আপনার হত্যার ব্যবস্থা হতো। বস্তুতঃ 'সৌন্দর্য্য' আপনার উপকারই করেছে। আপনার তার প্রতি ক্রুদ্ধ হওয়া তো মোটেই উচিত নয়, বরং সেজন্য কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। 'সৌন্দর্য্য' আপনাকে মনে মনে খুবই ভালবাসে।" এইরূপ মধুরবাক্যে আপ্যায়িত করিয়া 'জীবনকে' উদ্যানে লইয়া আসা হইল। উদ্যানের সৌন্দর্য্য দেখিতে দেখিতে এবং এইরূপ চিত্তাকর্ষক বাক্য শুনিতে শুনিতে 'জীবন' সেইস্থানেই পুষ্পাবৃত তৃণের উপর নিদ্রাভিভূত হইল।

এই খবর 'সৌন্দর্য্যের' নিকট পৌছিবামাত্র সে আনন্দে আত্মহারা হইয়া 'জীবনের' নিকট ছুটিয়া আসিল। নিদ্রায় অচেতন 'জীবনে'র মাথা কোলে রাখিয়া 'সৌন্দর্য্য' ইহাতে তাহার হাত বুলাইতে লাগিল। হঠাৎ তাহার চোখের একফোঁটা জল 'জীবনের' কপালে আসিয়া পড়িল। জাগিয়া 'সৌন্দর্য্যকে' নিকটে দেখিতে পাইয়া 'জীবন' একেবারে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া গেল। তাহার নিকট মাধুর্য্যমণ্ডিত একটি নূতন পৃথিবী ভাসিয়া উঠিল। 'সৌন্দর্য্যকে' তাহার নিকট স্বর্গের দেবী বলিয়া মনে হইল। সে আনন্দে আত্মহারা হইয়া 'সৌন্দর্য্যের' পদতলে লুটাইয়া পড়িল। 'সৌন্দর্য্য' তাহাকে গ্রহণ করিল। বিদায়মুহূর্ত্তে 'সৌন্দর্য্য' বলিল, "তোমার প্রেম আমাকে এখানে আকর্ষণ করিয়া আনিয়াছে। এখন আমাকে বিদায় দাও। শীঘ্রই আমি শুভ-মিলনের ব্যবস্থা কচ্ছি। আমাকে আর কোনরূপ অবিশ্বাস করো না।"

সন্ধ্যার সঙ্গে সঙ্গে সেই ছোট কুঠরীতে 'বিশ্বস্ততা' ও 'আদর' শুভ-মিলনের ব্যবস্থা করিল। 'অনুসন্ধিৎসা,' 'ভাব' ও 'স্মিতহাস্য' সরোবরের নিকট আসিয়া মিলিত হইল। ওদের উপর 'জীবন'কে প্রেমোন্মত্ততার ঔষধ পান করাইবার আদেশ হইল এবং সেই অচেতন অবস্থায় কুঠীতে নিয়া আসিবার জন্য 'কুন্তল'কে আদেশ দেওয়া হইল। এই ভাবে রোজ রোজ 'জীবনকে' কুঠীতে লইয়া আসা চলিতে লাগিল এবং 'জীবন' ও 'সৌন্দর্য্য' মিলন-সুখ অনুভব করিতে লাগিল।

কিন্তু এইরূপ ভাব কতদিন আর চলিতে পারে? 'প্রতিদ্বন্দ্বিতা'র 'ঈর্ষা'-নামে এক কন্যা 'সৌন্দর্য্যে'র সহচরী হিসাবে তাহার সঙ্গে থাকিত। যদিও সে বাহ্যতঃ তাহার শুভাকাঙ্ক্ষিনীই ছিল, কিন্তু মনে মনে 'সৌন্দর্য্যে'র প্রতি সকল সময়ই তাহার একটা বিরাগের ভাব ছিল। সে দেখিল, সৌন্দর্য্য একা একা রোজ

কোথায় যায়, আর সব সময়ই কি যেন তাহার নিকট হইতে গোপন রাখিতে চায়। তাই সে একদিন গোপনে গোপনে সৌন্দর্য্যের পেছন ধরিল এবং কুটিরের পাশে লুকাইয়া থাকিয়া সব বিষয় সঠিক অবগত হইতে পারিল।

ঘটনাক্রমে একদিন 'সৌন্দর্য্য' শহরে গিয়া ঐদিন আর ফিরিতে পারিল না। 'ঈর্ষা' সুযোগ বুঝিয়া মিলনকুটিরে গিয়া উপস্থিত হইল। সে যাদুমন্ত্রে সিদ্ধহস্ত। সে 'সৌন্দর্য্যের' পোষাক পরিয়া যেমন ভাবে সৌন্দর্য্য 'কুন্তল'কে আদেশ দেয়, ঠিক তেমনি ভাবে জীবনকে অচেতন অবস্থায় মিলন-কুটিরে নিয়া আসিবার জন্ত 'কুন্তল'কে আদেশ করিল। কতক্ষণ পরই 'ভাব' নিদ্রা হইতে জাগিয়া 'জীবন'কে তাহার স্থানে দেখিতে না পাইয়া খুঁজিতে খুঁজিতে মিলন-কুটিরে আসিয়া দেখিল যে, সে ঈর্ষার কোলে অচেতন অবস্থায় শুইয়া রহিয়াছে। তখনই সে শহরে দৌড়িয়া গেল, এবং সকল বৃত্তান্ত 'সৌন্দর্য্য'কে খুলিয়া বলিল। এই সংবাদে 'সৌন্দর্য্য' ঈর্ষার আগুনে জ্বলিয়া মরিতে লাগিল এবং তৎক্ষণাৎ মিলন-কুটিরে ছুটিয়া আসিয়া তাহাদের একই অবস্থায় দেখিতে পাইয়া প্রলয়কাণ্ড আরম্ভ করিয়া দিল। ঈর্ষা কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া চুপচাপ অন্তপথে বাহির হইয়া গেল। 'সৌন্দর্য্য' জীবনের প্রতিও খুব রাগান্বিত হইল এবং তাহার এই কপট প্রেম ও অকৃতজ্ঞতা-সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইয়া 'সৌন্দর্য্যের' মন একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িল। সে তৎক্ষণাৎ অনুসন্ধিৎসা, ভাব ও স্মিতহাস্তকে আদেশ দিল, এ কপটাচার মূর্খকে এখনই এ উদ্যান হতে বের করে দাও।

ঈর্ষা জীবন ও সৌন্দর্য্যকে প্রতারিত করিল এবং পিতার নিকট গিয়া তাহাদের ভালবাসার সকল বৃত্তান্ত বলিল। 'প্রতিদ্বন্দ্বিতা' এই সব শুনিয়া একেবারে রাগে অগ্নিশর্ম্মা; তখনই বন্দীশালা হইতে জীবনকে বাহির করিয়া নিজস্থানে লইয়া গেল। তথায় 'বিরহ'-নামক দুর্গে কারারুদ্ধ করিয়া রাখিল। জীবন একেবারে হতাশ হইয়া ভাবিতে লাগিল, আমি জীবনে এমন কি অপরাধ করেছি, যার জন্ত সৌন্দর্য্য হঠাৎ অস্বাভাবিক ভাবে আমার প্রতি এরূপ কঠোর আচরণ করল।

জীবনের প্রতি সহানুভূতি বশতঃই হউক বা অন্ত কোন কারণেই হইক, ঈর্ষার মনে হঠাৎ ভাবের পরিবর্ত্তন দেখা গেল। সে তাই সৌন্দর্য্যকে পত্র দ্বারা জানাইল, এই ব্যাপারে দুর্ভাগ্য জীবনের কোন দোষ নাই, যা কিছু দোষ আমারই। সে প্রকৃতই প্রেমিক। তার উপর রাগ করে আপনার ক্রোধাগ্নি অনর্থক এক জন নির্দোষকেই পোড়াইয়া মারিবে। পরে সে সেইরাত্রির সকল ব্যাপার লিখিল।

এই চিঠি পড়িয়া সৌন্দর্য্য তাহার কৃতকর্ম্মের জন্ত বিশেষ অনুতপ্ত হইল। সে তৎক্ষণাৎ একটি পত্র জীবনের নামে লিখিয়া 'ভাব'-এর মারফৎ পাঠাইয়া দিল। চিঠিতে সে তাহার নির্দোষতা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিল এবং সঙ্গে সঙ্গে ঈর্ষার ব্যাপার বর্ণনা করিয়া তাহার নিজের অজানিত অন্যায়ের জন্ত ক্ষমাভিক্ষা করিল। সৌন্দর্য্যের চিঠি পাইয়া জীবন সব ব্যাপার যথার্থ বুঝিতে পারিল। সে লিখিল, এতে তোমার কোন দোষ-ই দেখি না—দোষ যা সব ঈর্ষারই। তবে তুমি যদি প্রেমোন্মত্ততা ঔষধ খাওয়াইয়া অনর্থক আমাকে অজ্ঞান না করতে, তা হলে তো আর 'ঈর্ষা' আমাকে এরূপ ভাবে প্রতারিত করতে পারতো না। যাক, অদৃষ্টের লিখন অন্যথা হইবার নয়।

এইদিকে রাজা 'জ্ঞান' যুদ্ধ হইতে পলায়ন করিয়া আসিয়া নিজ রাজধানীতে বিমর্ষভাবে চুপচাপ বসিয়া রহিলেন। আর তাঁহার সেনাপতি 'ধৈর্য্য'

পলায়ন করিয়া 'নেতৃত্ব' শহরে আসিয়া পৌছিলেন এবং 'মানবতা'র নিকট তাহাদের দুঃখের সকল কাহিনী খুলিয়া বলিলেন। 'মানবতা' ইহা শুনিয়া বিশেষ দুঃখিত হইল এবং যথেষ্ট সহানুভূতির সহিত বলিল, জ্ঞানের সহিত আমার অনেক দিনের বন্ধুত্ব। তাঁকে আমার এই বিপদে সাহায্য করা নিতান্তই দরকার। 'ধৈর্য্য' অন্যান্য পরাজিত বা নিহত বীরদের কি অবস্থা হইয়াছে তাহার কোন খবর দিতে পারিল না। তাই 'মানবতা' তখনই সশস্ত্র সৈন্যসামন্ত নিয়া 'প্রত্যক্ষানুভূতি'র দিকে অগ্রসর হইল। আর পথে পথে 'জ্ঞান' ও 'জীবনে'র খোঁজ-খবর নিতে লাগিল। চলিতে চলিতে 'সরলতা'র উদ্যানে আসিয়া পৌছিল।

'সরলতা' তাহার ভাই-এর সাক্ষাৎ পাইয়া বিশেষ সুখী হইল এবং তাহার কার্য্যাদির জন্য বিশেষ প্রশংসা করিল। মানবতা তাহার নিকট হইতে জানিতে পারিল যে জীবন প্রায় এক বৎসর যাবৎ বিরহ-দুর্গে আবদ্ধ আছে। আর 'জ্ঞান' পলায়ন করিয়া নিজ দেশে চলিয়া গিয়াছেন। আরো বলিল, প্রেমের সহিত যুদ্ধে পেরে উঠা খুবই কঠিন; তার সহিত মিত্রতা-স্থাপনের চেষ্টা করাই যুক্তিসঙ্গত। 'প্রেম'কে কোনরূপে বুঝিয়ে এর একটা সুব্যবস্থা করাই উচিত। তিনি একজন মহান সম্রাট—তাঁকে যদি অনুনয়-বিনয় করা যায়, তাহলে তিনি নিশ্চয়ই মিত্রতাই প্রশস্ত মনে করবেন। 'মানবতা'ও ইহাই যুক্তিসঙ্গত মনে করিল।

তখনই সৈন্যসামন্ত পরিত্যাগ করিয়া 'মানবতা' একাই প্রেমের রাজদ্বারে গিয়া উপস্থিত হইল। তাহার স্তবস্তুতিতে বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইয়া প্রেম তাহাকে সাদরে গ্রহণ করিলেন ও রাজপাশে সসম্মানে আসন দিলেন। 'মানবতা' সুযোগ বুঝিয়া জ্ঞান ও জীবনের কথা উত্থাপন করিল এবং এইরূপ বুদ্ধিমত্তার সহিত তাহাদের পক্ষ সমর্থন করিল যে 'প্রেম' তাহার সকল প্রস্তাবই মানিয়া লইলেন। অনেক আলাপ-আলোচনার পর এইরূপ স্থির হইল যে প্রেম রাজার মন্ত্রিত্ব-পদ 'জ্ঞান'কে দেওয়া হইবে এবং রাজার পরই তাঁহার পদাধিকার হইবে।

পরে 'প্রেম' 'জ্ঞান'কে তাঁহার রাজ্য হইতে বিশেষ সমাদরের সহিত আনিবার জন্য সেনাপতি 'দয়া'কে আদেশ করিলেন। 'জ্ঞান' যখন দেখিতে পাইলেন যে, তাঁহার সৈন্য-সামন্ত কে কোথায় আছে তাহার কোন ঠিকানা নাই, তখন অগত্যা প্রেমের আমন্ত্রণ রক্ষা করিয়া 'দয়া'র সহিত প্রেম-রাজ্যে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। 'জ্ঞান' আসিলে 'প্রেম' তাঁহাকে অতি সমাদর করিলেন এবং গলায় জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন, তুমি আমার মন্ত্রী। তোমার উপর রাজ্যের সকল ভার দিয়া আমি নিশ্চিন্ত হতে চাই। তোমার ইচ্ছায় রাজ্য চলিবে।

এইরূপ ঠিক হওয়ার পর 'প্রেমের' আদেশমত 'মানবতা' জীবনকে বিরহ-কারাগার হইতে মুক্ত করিয়া লইয়া আসিল এবং তাহার স্থানে ঈর্ষাকে শৃঙ্খলবদ্ধ করিয়া রাখা হইল। 'প্রতিদ্বন্দ্বিতা'কেও সমুচিত শাস্তি দেওয়া হইল। 'জীবন' আসিয়া সম্রাট 'প্রেম' ও তাহার পিতার সহিত মিলিত হইল। রাজ্যের সকল ব্যাপার সুশৃঙ্খল হওয়ার পর 'প্রেম' ও 'জ্ঞান' উভয়ের ইচ্ছামত 'জীবন' ও 'সৌন্দর্যে'র বিবাহ স্থির হইল। তাহাদের বিবাহ সম্পন্ন হইয়া গেল।

বিবাহের পর একদিন 'জীবন' 'মানবতা' ও 'অনুসন্ধিৎসা' তিন জনে মিলিয়া 'মুখচন্দ্রে'র উদ্যানে বেড়াইতে বাহির হইয়াছে। সেখানে পৌছিয়া তাহাদের সঞ্জীবন-বারি ঝরণা দৃষ্টিগোচর হইল। সেখানে এক বৃদ্ধ ঋষিকে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিতে পাইল। 'মানবতা' তাহাকে দেখাইয়া 'জীবন'কে বলিল, এই যে শুভ্রবেশ ঋষিকে দেখতে পাচ্ছ, তাঁর নাম 'কবিত্ব-শক্তি'। তাঁকে প্রণাম করে তাঁর শুভ-আশীর্ব্বাদ গ্রহণ কর। 'জীবন' মানবতার কথামত তাহাই করিল। তাঁহার আশীর্ব্বাদে 'জীবনে'র নিকট জীবনের সকল গূঢ় রহস্যই প্রকাশিত হইল।

তারপর 'জীবন' ও 'সৌন্দর্য্য' সুখে ও শান্তিতে দিনযাপন করিতে লাগিল। ক্রমে পুত্রপৌত্রাদিতে তাহাদের গৃহ মুখরিত হইয়া উঠিল। তাহাদের এই পুত্র-পৌত্রাদি আর কেহ নহে—আমাদেরই বিশ্বের শ্রেষ্ঠ কাব্য-সামগ্রী।

# স্বামী বিবেকানন্দ

শ্রীবিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য

আঁধারে যখন ভারত-জননী,
উদাত্ত তব স্বর
মুগ্ধ করিল সভ্য জগতে,
লঙ্ঘি মহাসাগর।
চমকি চাহিল 'ভগিনী-ভ্রাতারা'
গৈরিক তব বাসে,
কত বিশ্বাসে ছুটিল সকাশে
জ্ঞান-ভিক্ষার আশে।
প্রাচ্য-প্রতীচী পুলকে শুনিল
উদাত্ত ধর্ম্ম-বাণী,
প্রাচ্য-প্রতীচী বরিল তোমায়,
মূর্ত্ত প্রতিভা জানি।
হিমাদ্রি হ'তে সিংহলে গাহি
জ্ঞানকাণ্ডের জয়,
বুঝালে দেশেরে ধর্ম্ম তাহার
অন্নভাণ্ডে নয়।
আর্ত্তের তরে ব্যথিত-হৃদয়
তৃষিত শিক্ষা তরে,
কত না স্থাপিলা মন্দির মঠ,
দানের পাত্র করে।
গেলে গো চলিয়া গুরুর সকাশে,
ত্বরা সারি নিজ কার্য্য,
প্রণমি তোমায় ওগো ভারতের
নব শঙ্করাচার্য্য।

---

# মরণ

শ্রীমধুসূদন বসু

জীবন-মরণ-মাঝে সত্যকার নেই ব্যবধান,
যারে মৃত্যু বলি মোরা জীবনের সে তো অন্য নাম!
মোহময় জীব মোরা মরণেতে তাই কাঁদে প্রাণ,
মরণ তো কিছু নয়, জীবনের আর এক ধাম।

এই যে সুন্দর ধরা, এই যে সুন্দর ধরাতল,
সুন্দর জীবন এই, জীবনের বিচিত্র চঞ্চল
হাসি গান দুঃখ শোক আশা আর যত কলরব,
মৃত্যুর মাঝেতে এরা অক্ষয় রূপেতে আছে সব।

মরণেতে শোক কেন, মরণ তো নতুন জীবন—
মরণ তো জীবনেরে দুই হাতে করে আলিঙ্গন:
পরিপূর্ণ করে তোলে জীবনের যত কিছু আশা,
মরণের মাঝখানে জীবন তো পায় খুঁজে ভাষা।

ক্ষণিকের তরে তাই মরণের গাই জয়গান,
জীবনের কবি তুমি, জীবনেরে করেছ মহান!
জীবনের মাঝারেতে পেয়েছি এ সত্যের সন্ধান,
জীবনেতে মরণেতে নেই কোন সূক্ষ্ম ব্যবধান।

---

# বৈদিক ভারতের সমাজ-ব্যবস্থা

শ্রীমতী বাসনা দেবী, এম্‌-এ ,কাব্য-বেদান্ততীর্থ

বহুপুরাকালে ভারতীয় গ্রীক শ্রেভ জার্ম্মান্‌ এবং ইটালীয়ানগণের পূর্ব্বপুরুষগণ যে এক ছিলেন এবং একই প্রদেশে ইঁহারা বাস করিতেন—মধ্য এশিয়াই হউক অথবা ভারতবর্ষই হউক—এবং একই ভাষায় কথা বলিতেন, তাহা তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের দ্বারা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইয়াছে।

সিন্ধু যাহা সময়ে সময়ে সমুদ্র-নামে অভিহিত হয়, তাহাই ঋগ্বেদের বহু-প্রশংসিত সরস্বতী-নদী (১০।৭৪।৫)। এই নদীর মাহাত্ম্যে ঋষিগণ অনুপ্রাণিত হইয়া বহু মহিমময় মন্ত্র রচনা করিয়াছেন। যে গঙ্গার মাহাত্ম্য পরবর্ত্তী কালে প্রচারিত হইয়াছে, তাহার কথা মাত্র একবার উল্লিখিত। অতএব এই সকল প্রমাণ হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, প্রাচীন আর্য্যগণের দেশ পাঞ্জাবই ছিল। এই প্রদেশের গ্রাম ও নগর-সম্বন্ধে ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের ১৪৪ অধ্যায়ের ১ বর্গে বহু কথা উক্ত হইয়াছে। সমগ্র বেদ আলোচনা করিলে বৈদিক যুগের সামাজিক জীবনযাত্রার একটি পূর্ণ ছবি পাওয়া যায়। বৈদিক যুগে গো-পালন ও কৃষিজীবন-যাত্রার প্রধান উপায় ছিল এবং ঋগ্বেদের বহু স্থলে আমরা অশ্ব গো প্রভৃতির জন্য দেবতাদের নিকট স্তবস্তুতি দেখিতে পাই। খাদ্যশস্যের মধ্যে যবের উল্লেখ দেখা যায়। ঋগ্বেদের মধ্যে ধানের উল্লেখ নাই, অথর্ব্ববেদে উল্লেখ আছে—ব্রীহিমত্তং যব মত্তমথো মাসমথতি লম্‌ (৪।১৪০।২) যজ্ঞীয় কর্ম্মের জন্য পশুবলির কথাও বেদের নানা স্থলে পাওয়া যায়। সোমরস-পানের বিষয়ও বহু স্থলে উল্লিখিত হইয়াছে। সোমরস যে কেবল দেবতাদের প্রিয় ছিল তাহা নহে, ঋত্বিগ্‌গণও তাহা পান করিতেন। ব্যবসাবাণিজ্য প্রভৃতি যত প্রকার বৃত্তি মনুষ্যজীবনে সম্ভব ঋগ্বেদের ৯ম মণ্ডলের ১১২ অধ্যায়ের ১ হইতে ৪ পর্য্যন্ত মন্ত্রে তাহার উল্লেখ করা হইয়াছে। বয়নশিল্প সার্ব্বজনীন ভাবে শিক্ষা দেওয়া হইত। স্বাভাবিক এবং কৃত্রিম উপায়ে জলসেচন-ব্যবস্থার উল্লেখ দেখা যায় (৭।৪৫।৩)। চিত্ত-বিনোদনের জন্য অক্ষক্রীড়ার প্রচলন ছিল।

পরিবার দ্বারাই সমাজ গঠিত ছিল এবং এই পরিবারের প্রধান কর্ত্তা ছিলেন পিতা। বিবাহ একটা পবিত্র এবং প্রয়োজনীয় কার্য্য বলিয়া পরিগণিত হইত। স্ত্রী স্বামীর সহিত যজ্ঞে সহকর্ম্মিণী হইতেন। ইহা দ্বারা বুঝা যায় যে, স্ত্রীলোকের উচ্চ সম্মান এবং মর্য্যাদা ছিল। পিতা গৃহপতি এবং মাতা গৃহের পরিচালিকা—এই ছিল সমাজের ভিত্তি। পরবর্ত্তী যুগে যে গৃহিণীর গৌরব পরিলক্ষিত হয়—ন গৃহং গৃহমিত্যাহুর্গৃহিণী গৃহমুচ্যতে—বেদেও তাহা অবিদিত ছিল না। বেদের দশম মণ্ডলে আছে বিবাহের পর স্বামিগৃহে স্ত্রীর স্থান কত গৌরবময় হইবে—

> সম্রাজ্ঞী শ্বশুরে ভব সম্রাজ্ঞী শ্বশ্ৰ্বাং ভব।
> ননান্দরি সম্রাজ্ঞী ভব সম্রাজ্ঞী অধি দেবৃষু॥
> (১০।২৭।১১-১২)

বৈদিক যুগে বিবাহ-সম্বন্ধে কিছু বলিতে হইলে ইহাই বলা যায় যে, তখন স্বয়ংবরপ্রথার প্রচলন ছিল। স্ত্রীলোক স্বীয় ইচ্ছানুসারে স্বামী পছন্দ

করিতে পারিতেন। আবার সমাজে বহু অবিবাহিত কন্যাও পিতার গৃহে থাকিত। সাধারণতঃ ক্ষত্রিয়গণের মধ্যে বহুবিবাহের প্রচলন ছিল। স্ত্রীলোকের সহমরণ-সম্বন্ধে ঋগ্বেদে স্পষ্টরূপে কিছু বলা হয় নাই। তবে অথর্ব্ববেদে সহমরণকে পুরাণধর্ম্মরূপে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে ( অথর্ব্ববেদ—১৮।৩।১ ), কিন্তু ইহা সর্ব্বজনপ্রযোজ্য ছিল না। বিবাহকার্য্য যথন সমাজে এত পবিত্র সংস্কাররূপে গণ্য হইত তখন মনে হয় যে বিধবা-বিবাহের সাধারণতঃ প্রচলন ছিল না। অবশ্য এই মন্ত্র হইতে প্রমাণিত হয় যে, বিধবা স্ত্রীলোক তাঁহার স্বামীর মৃত্যুর পর দেবরকে বিবাহ করিতে পারিতেন।

কুহস্বিদ্দোষা কুহবস্তোরশ্বিনা কুহাভিপিত্বং
করতঃ কুহষোতুঃ।
কো বাং শযুত্রা বিধবেব দেবরং মর্য্যং ন
যোষা কৃণুতে সধস্থ আ॥
( ঋগ্বেদ, ১০।৪০।২ )

বৈদিক যুগ যে জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত হইয়াছিল তাহাতে স্ত্রীলোকেরও দান বড় কম ছিল না। বহু স্ত্রী-ঋষির পরিচয় আমরা বেদের মধ্যে দেখিতে পাই—যেমন কক্ষিবানের কন্যা ঘোষা এবং অত্রি ঋষির কন্যা অপালা, অম্ভৃণ-ঋষির দুহিতা বাক্ প্রভৃতি। "অম্ভৃণস্য দুহিতা বাঙ্নাম্নী ব্রহ্মবিদুষী স্বাত্মানমস্তৌৎ অতঃ ঋষিঃ—" ঋগ্বেদে এই সূক্ত দেবীসূক্ত-নামে প্রসিদ্ধ। বাক্ আত্ম-সাক্ষাৎকার করিয়া আত্মস্তুতি করিয়াছিলেন, "অহং রুদ্রেভির্বসুভিশ্চরাম্যহমাদিত্যৈরুত বিশ্বদেবৈঃ—অহং রাষ্ট্রী সংগমনী বসুনাং চিকিতুষী প্রথমা যজ্ঞিয়ানাম্' ( ঋগ্বেদ—১০।১২৫।১ )। কেবলমাত্র আধ্যাত্মিক জগতেই স্ত্রীলোকের উচ্চস্থান ছিল তাহা নহে, ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের ১১৭ অনুবাকের ১১৬ সূক্তে দেখা যায় যে, রাণী বিশপলা অতীব বীরত্বের সহিত যুদ্ধক্ষেত্রে যুদ্ধ করিতে গিয়াছিলেন এবং যুদ্ধে একটি পা হারাইয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতেও তিনি ক্ষান্ত হন নাই, পুনরায় লৌহপদ যোজনা করিয়া যুদ্ধ করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতিরেকে ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলে ইন্দ্রসেনা মুদ্গলানীর অপূর্ব্ব বীরত্বের কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে ( ১০।১০২।২-২৬ )।

পরিবারের ভিত্তিতে রাষ্ট্র গঠিত হইত। রাজাই রাষ্ট্রের প্রধান ছিলেন। নৃপতিগণ ঋত্বিগ্‌গণকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করিতেন এবং বহু মন্ত্রে তাঁহাদের একত্র উল্লেখ আছে।

আত্বাহার্ষমন্তরেধি ধ্রুবস্তিষ্ঠাবিচাচলিঃ।
বিশস্ত্বা সর্ব্বাবাঞ্ছন্তুমাত্বদরাষ্ট্রমধিভ্রশৎ॥
( ঋগ্বেদ, ১০।১৭৩।১ )

এই ঋঙ্মন্ত্র হইতে বুঝিতে পারা যায় যে প্রজাবৃন্দের ইচ্ছা ব্যতিরেকে কোন রাজা রাজত্বলাভ করিতে পারেন নাই। গণতন্ত্রের পূর্ণচ্ছবি বেদমন্ত্রেও অঙ্কিত হইয়াছে।

এখন ধর্ম্ম-সম্বন্ধে প্রশ্ন এই যে বৈদিক আর্য্যগণ মূর্ত্তিপূজা করিতেন কিনা? মোক্ষমূলার বলেন—বৈদিক ধর্ম্মে পৌত্তলিকতার স্থান নাই। ভারতবর্ষে মূর্ত্তিপূজা পরবর্ত্তী কালে প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। আমরা এই যে মূর্ত্তিপূজা করি অর্থাৎ ঈশ্বরকে শরীরী করচরণাদি-অবয়ব-বিশিষ্টরূপে চিন্তা করিয়া তাঁহার পূজা করি তাহা যদি বেদে না থাকে বা বেদের অনুকূল না হয় তাহা হইলে ধর্ম্ম হইবে না। এইরূপ যাঁহারা মনে করেন তাঁহাদের উক্তির উত্তরে ঋগ্বেদের এবং শুক্ল-যজুর্ব্বেদের পুরুষসূক্তটির উল্লেখ করা প্রয়োজন। সেই পুরুষসূক্তটির মধ্যে বিরাটপুরুষ পরমেশ্বরের সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—

ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীদ্ বাহু রাজন্যঃ কৃতঃ। উরূ তদস্য যদ্বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রো অজায়ত। চন্দ্রমা মনসো জাতশ্চক্ষোঃ সূর্য্যো অজায়ত। শ্রোত্রং তদ্

বায়ুশ্চ প্রাণশ্চ মুখাদগ্নিরজায়ত। নাভ্যা আসীদন্তরিক্ষং শীর্ষ্ণো দ্যৌঃ সমবর্ত্তত পদ্ভ্যাং ভূমির্দিশঃ শ্রোত্রাৎ তথা লোকানকল্পয়ন্॥ ( ১০।৯০।১২-১৪ )

অর্থাৎ ব্রাহ্মণ এই বিরাট পুরুষের মুখ ছিলেন, বাহুদ্বয় রাজন্য অর্থাৎ ক্ষত্রিয়, উরুযুগল বৈশ্য আর উভয়পদ হইতে শূদ্রের উৎপত্তি। তাঁহার মন হইতে চন্দ্র উৎপন্ন হইল, চক্ষু হইতে সূর্য্য জন্মিল, কর্ণ হইতে বায়ু ও প্রাণের উৎপত্তি হইল এবং মুখ হইতে অগ্নি জন্মলাভ করিল; নাভি হইতে অন্তরিক্ষ জন্মিল, মস্তক হইতে দ্যুলোকের আবির্ভাব হইল, পদদ্বয় হইতে ভূমি ও শ্রবণ হইতে দিক্ হইল এবং অপরাপর লোকের অর্থাৎ প্রাণীর সৃষ্টি করা হইল। এইরূপ শত শত শ্রুতিবাক্য আছে যাহাতে ঈশ্বরকে মূর্ত্তিমান করচরণাদি-অবয়ববিশিষ্ট বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে।

প্রশ্ন হইতে পারে যে—প্রজাপতি ইন্দ্র রুদ্র বরাহ প্রভৃতি সকলেই যদি ঈশ্বর হন তাহা হইলে তো ঈশ্বরের ছড়াছড়ি হইয়া পড়ে—ব্রহ্মের বাহুল্য হইয়া পড়ে। ইহাই কি বেদের উদ্দেশ্য? ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে, ইঁহাদের সকলেই ব্রহ্ম বটে, আবার ব্রহ্ম একও বটে—অনেক নহে। একেরই ব্যাস বহু এবং বহুরই সমাস এক। ইহা শ্রুতির দ্বারাই প্রমাণিত হইয়াছে।

ইন্দ্রং মিত্রং বরুণমগ্নিমাহুরথো দিব্যং স
সুপর্ণো গরুত্মান্।
একং সদ্‌বিপ্রা বহুধা বদন্ত্যগ্নিং যমং
মাতরিশ্বানমাহুঃ॥
( ঋগ্বেদ, ১।১৬৪।৪৬ )

ইহার অভিপ্রায় এই যে, একই পরমেশ্বর অনন্ত দেবগণের অনন্ত নাম গ্রহণ করেন। আর বিপ্রগণ এক সৎপদার্থকেই অর্থাৎ ব্রহ্মকেই ইন্দ্র মিত্র বরুণ অগ্নি যম মাতরিশ্বা প্রভৃতি বহুনামে বহুপ্রকারে উল্লেখ করিয়া থাকেন।

কিন্তু শ্রুতি আবার পরক্ষণেই বলিতেছেন—'অজায়মানো বহুধা বিজায়তে'—অর্থাৎ পরমেশ্বর না জন্মিয়াই বহু প্রকারে বহুভাবে জন্মগ্রহণ করেন। কথাটা হেঁয়ালির মত হইল। ইহার সমাধানরূপে গীতায় বলা হইয়াছে—

অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্।
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া॥
( গীতা, ৪।৬ )

ইহার ভাবার্থ এই যে পরমেশ্বর অজ অর্থাৎ জন্মরহিত এবং অব্যয় নির্ব্বিকারস্বরূপ হইলেও প্রকৃতিকে আশ্রয় করিয়া সৃষ্টি করেন, কিন্তু পারমার্থিক দৃষ্টিতে তাহা জন্মই নহে।

অতএব এই সকল শ্রুতিবাক্য হইতে বুঝা যায় যে, বৈদিক যুগেও মূর্ত্তিপূজা বিদ্যমানই ছিল। ইহা কোন পরবর্ত্তী কালের কথা নহে। মোক্ষমূলার প্রমুখ পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিত বেদের প্রতি সেইরূপ নিবদ্ধদৃষ্টি না হইয়াই এই প্রকার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণের মধ্যে একমাত্র বোলেনসন্ ভিন্নমত পোষণ করেন। তাঁহার মতে 'দিবো নরঃ নৃপেশসঃ' প্রভৃতি যে বিশেষণ দেবতাদিগের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়, তাহা দ্বারা ইহা প্রমাণিত হয় যে, কেবল কল্পনাতে দেবদেবীর ধ্যান করা হইত না, পরন্তু কার্য্যতঃ তাঁহাদের মূর্ত্তিরও পূজা হইত।

বৈদিক ভারতের সমাজ-ব্যবস্থার আলোচনা করিলে আরও একটি প্রশ্ন মনে জাগে। তাহা এই যে, বেদে জাতিভেদ-প্রথা ছিল কি না। ধর্ম্মব্যবস্থাই হিন্দুর জীবনে অধিকতর প্রাধান্যলাভ করিয়াছে এবং জাতিভেদ-প্রথার ন্যায় এত প্রভাব কোন ব্যবস্থায় নাই। ইহার

দৃষ্টিকটু বৈষম্য এবং তিক্ত উৎপীড়ন কতক সময়ে হিন্দুর প্রকৃত রূপ নষ্ট করিয়াছে। বর্ত্তমান জাতিভেদ-প্রথার ন্যায় কোন ব্যবস্থা বৈদিক ভারতে ছিল না। কেবলমাত্র চারিবর্ণের বিষয় বেদে উল্লিখিত আছে। পুরুষসূক্ত-আলোচনা করিলে এই কথা স্পষ্টরূপে প্রতীত হয়। এতদ্ব্যতিরেকে ভগবদ্গীতার মধ্যে—চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ (গীতা, ৪।১৩) উক্তি দ্বারা স্থিরীকৃত হইল যে, জাতিভেদ-প্রথা গুণ ও কর্ম্মের উপর নির্ভর করিত।

ভারতের মন্ত্রদ্রষ্টা আর্য্য ঋষিগণ ভারতের লক্ষ্য ও জীবনাদর্শ অতি সুপ্রাচীন কাল হইতেই নির্দ্দিষ্ট করিয়া গিয়াছেন। ভারতের বৈদিক যুগ হইতে ইতিহাসের পটভূমিকায় বহু রাজশক্তির উত্থান-পতন, বহু ধর্ম্মবিপ্লব ও রাষ্ট্রবিপ্লব ঘটিয়া গিয়াছে, কিন্তু তাহাতে ভারতের লক্ষ্যের পরিবর্ত্তন সাধিত হয় নাই। আজ পাশ্চাত্ত্যের তত্ত্বদৃষ্টি দিয়া সেই জীবনাদর্শের বিচার করিতে গেলে সম্পূর্ণ ভ্রান্তি হইবে। এই লক্ষ্য হইতেছে পরমার্থ বা পরম প্রয়োজন। এই পরমার্থ-শব্দের মধ্যে ভারতের প্রকৃত পরিচয় নিহিত রহিয়াছে। এই পরমার্থ-সাধনায় ভারতবর্ষ যে অধ্যবসায়, যে কঠোরতা, যে স্বার্থত্যাগ দেখাইয়াছে, তাহার দশমাংশও যদি কোন জাতি রাজনৈতিক ক্ষেত্রে দেখাইত, তবে সেই জাতি আজ পৃথিবীর রাজনৈতিক ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করিত সন্দেহ নাই।

পরমার্থের সাধন সংরক্ষণ ও প্রচারই যদি ভারতের মূল উদ্দেশ্য হয়, তবে তাহার শিক্ষাও যে পরমার্থনিষ্ঠ হইবে তাহা বলা বাহুল্য। আর্য্য ঋষি বলিয়াছেন—"দ্বে বিদ্যে বেদিতব্যে পরা চৈবাপরা চ তত্রাপরা ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্ববেদঃ শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণং ছন্দো জ্যোতিষমিতি, অথাপরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে" (বৃঃ উঃ)—অপরা বিদ্যার মধ্যে নানা বিদ্যার উল্লেখ করা হইয়াছে, কিন্তু পরা বিদ্যা তাহাই যাহার দ্বারা অক্ষর ব্রহ্মকে জানা যায়।

যুগপ্রবর্ত্তক স্বামী বিবেকানন্দ তাই বলিয়াছেন—"Education is the manifestation of perfection already in man." মানুষের মধ্যে যে পূর্ণতা বিদ্যমান আছে তাহারই বিকাশসাধন করাই শিক্ষা। বৈদিক ভারতের শিক্ষাব্যবস্থার ইহাই ছিল বৈশিষ্ট্য যে, অধিকারিভেদে সকলকে শিক্ষাপ্রদান করিয়া মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য পরমার্থলাভের পথ উন্মুক্ত করিয়া দেওয়া। ভারতীয় শিক্ষা গ্রহণ করিয়া কেহ যেন আদর্শবিচ্যুত না হন বা পূর্ণত্ববিকাশে অক্ষম না হন ইহার প্রতি ভারতীয় ঋষিগণের যথেষ্ট দৃষ্টি ছিল। সেইজন্য প্রাচীন ভারতে গুরুগৃহে বাস করিয়া ছাত্রগণ যে শিক্ষালাভ করিতেন তাহা দ্বারা তাঁহাদের জীবনের আদর্শ, উদ্দেশ্য সকলই নির্দ্দিষ্ট হইত।

ইহাই ভারতীয় সমাজব্যবস্থার চিরন্তন স্বরূপ। সমাজব্যবস্থা এইরূপ ছিল বলিয়াই ভারতীয় সমাজ বহু শতাব্দীর ঘাতপ্রতিঘাত সহ্য করিতে পারিয়াছিল। আজ ভারতের স্বাধীনতা-লাভের পর বৈদিক ভারতের সমাজব্যবস্থার কতকটা অনুরূপ সমাজ গঠিত হইলে জাতির এবং দেশের কল্যাণ সাধিত হইবে।

# যুগাচার্য্য স্বামী বিবেকানন্দ

শ্রীআশা দেবী, এম্-এ

যুগাচার্য্য স্বামী বিবেকানন্দের শুভ জন্মতিথি উপলক্ষ্যে দেশে বিদেশে লক্ষ লক্ষ নরনারী তাদের অন্তরের শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেছে। পরে কয়েক দিন ধরেই তাঁর শুভ আবির্ভাব-দিনটির কথা স্মরণ করে ভারতের সর্বত্র উৎসব-উপলক্ষে তাঁর জীবন অনুধ্যান, তাঁর মহান্ আদর্শ কর্ম ও সাধনার কথা বহু-মুখে বহুভাবে আলোচিত হয়েছে।

দক্ষিণেশ্বরে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের পদতলে উপবিষ্ট স্বামী বিবেকানন্দ শুনেছিলেন, "ঈশ্বর-লাভই মানবজীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য।" জীবনের অর্থ সেই দেবত্বকে, অন্তর্নিহিত সেই পরম সত্তাকে প্রকাশ করা, পরমাত্মার সঙ্গে জীবাত্মার ঐক্যসাধন। ভারতবর্ষ তার সনাতন ধর্ম বিস্মৃত হয়ে পার্থিব ভোগসুখকেই জীবনের উদ্দেশ্য মনে করেছিল। শ্রীরামকৃষ্ণদেব স্বামী বিবেকানন্দকে মহামন্ত্রে দীক্ষিত করলেন সমগ্র ভারতের তথা জগতের অজ্ঞান-তিমিররাশি নাশ করে দিব্য আলোকের, অমৃতত্বের সন্ধান দেবার জন্যে। তিনি স্বামী বিবেকানন্দকে উত্তরাধিকারী করে মহাশক্তিতে প্রতিষ্ঠিত করলেন—তাঁকে লোকগুরুর চাপরাশ দিয়ে গেলেন।

যাঁকে যুগ-পরিচালনার দায়িত্ব নিতে হবে তাঁর আত্মমোক্ষ-চিন্তায় বা উচ্চ সমাধি-অবস্থায় থাকা চলে না। শ্রীরামকৃষ্ণের দেহত্যাগের পর স্বামী বিবেকানন্দ অশান্ত হয়ে উঠলেন। মনে হয় পরবর্ত্তী কালে সমগ্র জগতে তাঁকে যে বিরাট কাজ করতে হবে, যে মহাশিক্ষা দান করতে হবে তার সম্ভাবনার আলোড়ন তাঁর চিত্তকে অশান্ত করে তুলেছিল। সমগ্র ভারতকে পর্য্যবেক্ষণ করবার জন্য, তার প্রকৃত অবস্থা হৃদয়ঙ্গম করার জন্য, ভারতের সুদূর পূর্ব প্রান্ত থেকে কপর্দ্দকশূন্য পরিব্রাজক সন্ন্যাসী তাঁর যাত্রা সুরু করলেন। অগণিত জনপদের মধ্য দিয়ে আসমুদ্র হিমাচল তিনি পরিভ্রমণ করলেন। ভারতের নিদারুণ অবনতি তাঁর হৃদয়ে বেদনার সঞ্চার করল। যে ভারতবর্ষ সুদূর অতীতকাল থেকে সারা পৃথিবীর মধ্যে আধ্যাত্মিকতায়, জ্ঞান-গরিমায় জগদ্‌গুরুর স্থান অধিকার করেছিল, সেই ভারতবর্ষ বহুদিনের পরাধীনতার ফলে পুঞ্জীভূত জমাট কুসংস্কারের স্তূপে পরিণত হয়েছে। যখন বহুদেশ অনাবিষ্কৃত—বহুদেশের অধিবাসিগণ সভ্যতার আলোক থেকে বঞ্চিত, তখন ভারতবর্ষ সেই সব দেশে মৈত্রী ও শান্তির বাণী প্রচার করেছে, জাগতিক উন্নতির উপায়-নির্দেশ করেছে—আজ নিষ্প্রাণ বলহীন ইহকাল-পরকাল-ভ্রষ্ট আত্মবিশ্বাসহীন ভারতবর্ষ সেই সব দেশের দিকে ভিক্ষুকের মত তাকিয়ে আছে। সেই পরাধীন ভারতের অন্নহীন বস্ত্রহীন বিদ্যাহীন লক্ষ লক্ষ নরনারীর সংস্পর্শে তিনি এলেন, উপলব্ধি করলেন তার মর্ম্মকথা। কুমারিকার সমুদ্রবেষ্টিত প্রস্তরখণ্ডের উপর বসে ধ্যানমগ্ন স্বামী বিবেকানন্দ ভারতের ইতিহাস মনন করলেন। তাঁর ধ্যানদৃষ্টিতে ভারতের অতীত বর্ত্তমান এবং ভবিষ্যৎ এককালে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো। তিনি উপলব্ধি করলেন ভারত এবং জগতের মহাকল্যাণ-সাধনের জন্য ভারতবর্ষকে তার

পূর্ব মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করতে হবে, আর একমাত্র আধ্যাত্মিকতার দ্বারাই তা সম্ভব। ভারতের সেই সনাতন বাণী পাশ্চাত্ত্য জগতে প্রচার করবার আহ্বান তিনি আপন অন্তরে অনুভব করলেন। ১৮৯৩ সালের ১৪ই সেপ্টেম্বর চিকাগো ধর্ম-মহাসভায় তাঁর মহাকার্য্যের প্রথম উদ্বোধন।

পাশ্চাত্ত্য জগৎ তখন বিজ্ঞানসহায়ে ব্যবহারিক জগতে প্রভূত উন্নতিসাধন করেছে। কিন্তু অপরিমেয় ঐশ্বর্য্য, অসীম শক্তি সত্ত্বেও পাশ্চাত্ত্য জাতি স্বার্থপরতাকে অতিক্রম করে মহামানবতার দৃষ্টি গ্রহণ করতে পারেনি, ফলে জড়বাদীর ঐহিক উন্নতি জগতের কল্যাণের অন্তরায় হয়ে উঠেছিল। স্বামী বিবেকানন্দ সর্বপ্রথম পাশ্চাত্ত্যবাসীদের চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন যে, তাদের ব্যবহারিক উন্নতি আধ্যাত্মিকতার উপর প্রতিষ্ঠিত নয় বলে উহা জাতির পরিপূর্ণতারূপ কল্যাণের পথে নিয়োজিত না হয়ে মানবজাতিকে ধ্বংসের পথেই নিয়ে চলেছে। স্বামীজীর শ্রীমুখে পাশ্চাত্ত্য জগৎ বিস্মিত হয়ে শুনলে ভারতে সেই পরমবাণী আছে যা শিক্ষা দেয় প্রত্যেক মানবের মধ্যে রয়েছে এক অখণ্ড অনন্ত সত্তা, বিভিন্ন তার নামরূপবিশিষ্ট বহিঃপ্রকাশ, আর সেই সত্তাকে উপলব্ধি করাই জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য। একমাত্র আত্মজ্ঞানের দ্বারাই মানুষের ভেদদৃষ্টি চলে যায় ও তার হৃদয় পূর্ণ হয় অপার্থিব প্রেমে। কেবল তখনই সে তার সর্বশক্তি নিয়োজিত করতে পারে যথার্থ জাগতিক কল্যাণে। জগৎকে মহাকল্যাণের পথে পরিচালিত করবার, শ্রেয়ঃ নির্দ্দেশ করবার ক্ষমতা একমাত্র ভারতেরই আছে, কিন্তু বহুবর্ষ পরাধীনতার ফলে ভারতের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবন তখন বিপর্য্যস্ত হয়ে পড়েছে। স্বামী বিবেকানন্দ উপলব্ধি করলেন আধ্যাত্মিক শক্তিতে প্রতিষ্ঠিত হবার পূর্ব্বে তার ব্যবহারিক জীবনের উন্নতি অধিক প্রয়োজন। অদ্বৈতবাদী স্বামীজী এমন কথা কখনও বলেন নি যে জগৎটা ভ্রম অবাস্তব অলীক। শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে তিনি জেনেছিলেন দেহাত্মবুদ্ধি থাকলে সোঽহং রূপ উক্তি সম্ভব নয়। সাধারণ মানুষ ব্যবহারিক জগৎ নিয়েই চলে। সর্ব্বদা বহির্জগৎ-সম্বন্ধে সচেতন মানুষের পক্ষে জগৎকে উড়িয়ে দেওয়া সম্ভব নয়। জগৎকে অস্বীকার করলেই বলা চলত যে, ধর্ম্মরূপ মাদকতায় মোহগ্রস্ত আমরা বাস্তবের সম্মুখীন হতে ভয় পাই। স্বামীজীর ধর্ম্মের ব্যাখ্যায় এরূপ কোন ভ্রমের স্থান নেই। দেহ মন বুদ্ধি ইন্দ্রিয় প্রভৃতি উপাধিবিশিষ্ট জীবাত্মাকে পরমাত্মার সঙ্গে একাত্মবোধ করতে গেলে উপরোক্ত উপাধিগুলিকে অবলম্বন করেই সাধনায় অগ্রসর হতে হয়। সেই রকম ব্যবহারিক জীবনের মধ্য দিয়েই আমাদের পারমার্থিক লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হতে হবে। তাই আধ্যাত্মিক জীবন লাভের পূর্ব্বে ব্যবহারিক জীবনের উন্নতি সর্বাগ্রে আবশ্যক। নিজের জীবন এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থাকে সেই মহান ভাবপ্রকাশের সহায়ক করে তুলতে হবে। সেইজন্যেই স্বামীজী বলেছেন খালি পেটে ধর্ম্ম হয় না। ধর্ম্ম আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য, কিন্তু তার জন্যে আগে কর্মের দ্বারা অন্ন-সংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে। যুগাচার্য্য স্বামীজী "আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ" একদল শক্তিশালী যুবক চেয়েছিলেন যারা নির্ভয়ে তাঁর প্রদর্শিত পথে অগ্রসর হবে। কেবল বক্তৃতাদ্বারা আদর্শ-প্রচার এবং কর্ম্মপন্থা নির্দ্দেশ করেন নি, পরন্তু আদর্শকে প্রাণবন্ত এবং কর্ম্মপন্থাকে কার্য্যকর করে গেলেন সঙ্ঘস্থাপন করে। এক কথায় স্বামীজীর আদর্শ মানবজাতির মুক্তিসাধন। উপায়—ত্যাগ প্রেম ও সেবার দ্বারা জাতিকে মহাবীর্য্যশালী করে তোলা। ত্যাগ ও সেবাকে

মূলমন্ত্র হিসাবে গ্রহণ করে যদি ভারতের উন্নতি-সাধনে জনসাধারণ তাদের সমগ্র শক্তি নিয়োজিত করে তবেই সম্ভব তাদের নিজেদের কল্যাণ এবং তার দ্বারা জগতের কল্যাণসাধন।

নব ভারতের পথপ্রদর্শকরূপে আজ স্বামী বিবেকানন্দ আমাদের কাছে উপাস্য। আজ দেশের সর্বত্র যে কোন মতবাদের এবং সম্প্রদায়ের মধ্যে যাঁরা নিজেদের দেশের যথার্থ হিতকামী বলে মনে করেন তাঁরা সকলেই স্বামীজীর বাণী উদ্ধৃত করে বলতে চান, স্বামীজীর আদর্শ ই তাঁরা অনুসরণ করছেন। বাস্তবিক জাতীয় জীবনের উন্নতির পরিকল্পনায় স্বামীজীকে অনুসরণ না করে উপায় কী? তাঁর চেয়ে কে বেশী উজ্জ্বল এবং স্পষ্টভাবে দেশের অবনতির কারণ-বিশ্লেষণ এবং তা থেকে উদ্ধারের উপায়নির্ণয় করেছেন? কিন্তু মুশ্‌কিল এই যে, সাধারণ আমরা সকলেই আমাদের ক্ষুদ্র দৃষ্টিভঙ্গীর দ্বারা, আমাদের সঙ্কীর্ণ মাপকাঠির দ্বারা স্বামীজীকে বুঝবার চেষ্টা করি এবং ভাবি আমিই তাঁকে যথার্থ বুঝেছি। তাই আজ সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ, আধ্যাত্মিক গুরু বিবেকানন্দকে সরিয়ে রেখে জনসাধারণ ভাবে দেশপ্রেমিক এবং সমাজ-সংস্কারক বিবেকানন্দই আমাদের আদর্শ। সাধারণতঃ তাই দেখা যায় সর্ববিধ জাতীয় উন্নতি, সমাজ-সংস্কার অথবা বর্ত্তমান সমাজধারাকে অস্বীকার করে বৈদেশিক বিপ্লববাদ আনবার প্রচেষ্টার মধ্যে স্বামী বিবেকানন্দকে টেনে আনবার প্রয়াস। সাধারণের ধারণা আধ্যাত্মিক গুরু হিসাবে, আচার্য্য হিসাবে স্বামীজী কেবলমাত্র তাঁর শিষ্য অথবা সন্ন্যাসি-সম্প্রদায়ের কাছেই উপাস্য। এখানেই আমাদের স্বামীজীকে বুঝতে সব থেকে বড় ভুল হয়। স্বামীজীর মতে গৃহস্থ বা সন্ন্যাসী সকলেরই উদ্দেশ্য এক, কিন্তু উপায় বিভিন্ন ও পথ আলাদা। এ কথা ভুলে গেলে চলবে না, আধ্যাত্মিক গুরু, যুগাচার্য্য স্বামিজীই ভারতের তথা জগতের মহাকল্যাণের পথ আগে নির্দ্দেশ করেছেন। তার পরে দেশপ্রেমিক ও সমাজ-সংস্কারক বিবেকানন্দ তার উপায়-নির্দ্দেশ করেছেন। সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও ভাবতে হবে যে, উদ্দেশ্য-সাধনের দায়িত্ব কেবল সন্ন্যাসি-সম্প্রদায়ের উপর ও ব্যবহারিক জগতের উন্নতি-সাধন জনসাধারণের উপর তা নয়। স্বামীজীর অখণ্ড পরিকল্পনার মধ্যে এই খণ্ডিত দৃষ্টি-ভঙ্গির স্থান কোথাও নেই। রবীন্দ্রনাথও বলেছেন—ভারতবর্ষ একদা জগতের গুরুর স্থান অধিকার করেছিল। এখন সেইস্থান হতে সে চ্যুত হয়েছে বলেই তার এই দুর্গতি। সেই স্থান তাকে পুনরায় অধিকার করতে হবে। নইলে বিশ্বের দরবারে ভারতবর্ষের আর কি দেবার আছে? পাশ্চাত্ত্য জাতির কাছ থেকে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানলাভ করে দেশের জাতীয় জীবনের ব্যবহারিক উন্নতিসাধন করতে হবে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মনে রাখতে হবে, জগতকে সেই চিরন্তন বাণী শোনাবার জন্য—অমৃতত্বের সন্ধান দেবার জন্যে তার এই মহাপ্রস্তুতি। যে কোন পাশ্চাত্ত্য জাতির অনুকরণ করে একটি শক্তিশালী রাষ্ট্র হিসাবে গড়ে ওঠাই যদি ভারতবর্ষের কাম্য বা আদর্শ হয়, তবে ভারতের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য কোথায়? জড়বাদী পাশ্চাত্ত্যের যে কোন প্রগতিশীল রাষ্ট্রই কি আজ প্রমাণ করছে না যে কল্যাণের পরিবর্ত্তে সে ধ্বংসের পথে দ্রুত এগিয়ে চলেছে! মানব-জাতি অহরহ সংশয়াকুল চিত্তে পরিত্রাণের পথ খুঁজছে। কিন্তু বিশ্বব্যাপী ক্ষমতালোভীদের গ্রাস থেকে তাকে রক্ষা করবার শক্তি কোন্‌ রাষ্ট্রের আছে?

জাতীয় জীবনের উন্নতির তাৎপর্য্য কি আজ আমাদের বুঝতে হবে। যদি জীবনের মহা উদ্দেশ্যের কথা ভুলে গিয়ে বহির্জগতের উন্নতিই

আমাদের দেশনায়কদের একমাত্র কাম্য হয় অথবা পাশ্চাত্ত্য রাষ্ট্রের অনুকরণে কোনও সম্প্রদায় যদি তাকে নূতন ছাঁচে গড়ে তোলবার চেষ্টা করে তাহলে একথা বলতেই হবে যে তার মধ্যে স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শ অনুসৃত হয়নি এবং সেই লোকগুরুর আদর্শ যদি অনুসৃত না হয় তাহলে ভারতের প্রকৃত কল্যাণসাধন কখনও সম্ভব নয়।

ভবিষ্যদ্দ্রষ্টা স্বামী বিবেকানন্দ ১৮৯৭ সনে বলেছেন—"আগামী পঞ্চাশৎ বর্ষ জন্মভূমি তোমাদের একমাত্র উপাস্য দেবতা হউন।" বিংশ শতাব্দীর ইতিহাস পর্য্যালোচনা করলে দেখা যায়, স্বামীজীর মহাবাণী কার্য্যে পরিণত করবার চেষ্টা সর্ব্বত্র বিদ্যমান। বিংশ শতাব্দীর গোড়ায় বিপ্লববাদ এবং সন্ত্রাসবাদের মধ্যে ভারতকে স্বাধীন করবার আপ্রাণ চেষ্টাই দেখা যায়। দলে দলে নির্ভীক যুবক হাসিমুখে মৃত্যুবরণ করেছেন ভারতমাতাকে শৃঙ্খলমুক্ত করতে। ১৯২১ সন থেকে মহাত্মা গান্ধী দেশবন্ধু প্রমুখ অপরাপর দেশ-নায়কগণের নেতৃত্বে লক্ষ লক্ষ কংগ্রেস-সেবক সর্ব্বপ্রকার স্বার্থত্যাগ এবং ক্লেশস্বীকার করে প্রাণপণ চেষ্টা করেছেন ভারতকে স্বাধীন করতে। নেতাজী সুভাষচন্দ্রের অক্লান্ত উদ্যম, অসম্ভব উপায়-অবলম্বনের মধ্যে মাতৃভূমিকে স্বাধীন করবার প্রয়াস। রামকৃষ্ণ মিশন নীরবে অক্লান্ত সেবা ও গঠনমূলক কার্য্যের দ্বারা পরাধীন জাতিকে আত্মস্থ করবার চেষ্টাই করেছেন।

স্বামীজীর ভবিষ্যদ্বাণী সফল করে পঞ্চাশৎ বর্ষ পরে ১৯৪৭ সনে ভারতবর্ষ স্বাধীনতা-লাভ করেছে। সত্য, আজ ভারতবর্ষের মধ্যে স্বাধীনতার প্রকৃত কল্যাণমূর্ত্তি আমরা এখনও দেখতে পাইনি। শত শত বৎসর পরাধীনতার অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ মহা অজ্ঞতা জড়তা নীচতা দারিদ্র্য এখনও ভারতভূমিকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে, কিন্তু নবযুগের মহাসম্ভাবনার ইঙ্গিতও পাওয়া যাচ্ছে।

"সুদীর্ঘ রজনী প্রভাতপ্রায়া বোধ হইতেছে। মহাদুঃখ অবসানপ্রায় প্রতীত হইতেছে। মহা-নিদ্রায় নিদ্রিত শব যেন জাগ্রত হইতেছে। ইতিহাসের কথা দূরে থাকুক, কিংবদন্তী পর্য্যন্ত যে সুদূর অতীতের ঘনান্ধকার-ভেদে অসমর্থ—তথা হইতে এক অপূর্ব্ববাণী যেন শ্রুতিগোচর হইতেছে। জ্ঞান, ভক্তি, কর্ম্মের অনন্ত হিমালয়-স্বরূপ আমাদের মাতৃভূমি ভারতের প্রতিশৃঙ্গে প্রতিধ্বনিত হইয়া যেন ঐ বাণী মৃদু অথচ দৃঢ় অভ্রান্ত ভাষায় কোন অপূর্ব্ব রাজ্যের সংবাদ বহন করিতেছে। যতই দিন যাইতেছে ততই যেন উহা স্পষ্টতর, ততই যেন উহা গভীরতর হইতেছে। * * * নিদ্রিত শব জাগ্রত হইতেছে। তাহার জড়তা ক্রমশঃ দূর হইতেছে। অন্ধ যে সে দেখিতেছে না, বিকৃতমস্তিষ্ক যে সে বুঝিতেছে না যে, আমাদের এই মাতৃভূমি গভীর নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া জাগ্রত হইতেছেন। আর কেহই এক্ষণে ইঁহার গতিরোধে সমর্থ নহে, আর ইনি নিদ্রিত হইবেন না—কোন বহিঃস্থ শক্তিই ইহাকে চাপিয়া রাখিতে পারিবে না। কুম্ভকর্ণের নিদ্রা ভাঙ্গিতেছে।"

স্বামীজী আবার বলছেন—"মহা Spiritual tidal wave ( আধ্যাত্মিক বন্যা ) আসছে—নীচ মহৎ হয়ে যাবে, মূর্খ মহাপণ্ডিতের গুরু হয়ে যাবে তাঁর কৃপায়—উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ ( goal ) নিবোধত।"

ভারতকে স্বাধীন করা রূপ মহাকার্য্য সাধিত হয়েছে। এখন স্বাধীন ভারতবর্ষকে স্বামীজীর পরিকল্পনা-অনুযায়ী রূপদান করবার দায়িত্ব বিশেষ করে তরুণ-সম্প্রদায়ের উপরেই নির্ভর করছে। আজ ভারতের নরনারীকে স্বার্থ, দলা-দলি, জাতীয় সঙ্কীর্ণতা, সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ত্যাগ

করে স্বামীজী-প্রদর্শিত ত্যাগ সেবা ও প্রেম মূলমন্ত্ররূপে গ্রহণ করে অগ্রসর হতে হবে। নিজ নিজ সামর্থ্য-অনুযায়ী ভারতবাসীকে স্বামীজী-প্রদর্শিত পথে চলতে হবে। স্বামীজী আজ স্থূল শরীরে বর্ত্তমান নেই। কিন্তু তাঁর উদাত্ত আহ্বান এখনও ধ্বনিত হচ্ছে—"মেয়ে-মদ্দ দুই চাই—শক্তির বিকাশ চাই। হাজার হাজার পুরুষ চাই, স্ত্রী চাই—যারা আগুনের মত হিমাচল থেকে কন্যাকুমারী—উত্তর মেরু দক্ষিণ মেরু দুনিয়াময় ছড়িয়ে পড়বে। ছেলেখেলার কাজ নাই—সময় নাই—যারা ছেলেখেলা করতে চায় তফাৎ হও এই বেলা; নইলে মহা আপদ তাদের—কুঁড়েমি দূর করে দাও, ছড়াও ছড়াও আগুনের মত সব জায়গায়।"

নিজের অহমিকা ত্যাগ করে যে তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়ে স্বামী বিবেকানন্দের দেশ-মাতৃকা-পূজারূপ মহাকার্য্যে যোগ দিতে পারবে সেই ধন্য।

# দেহত্যাগ

স্বামী ভূমানন্দ ( কালীপুর আশ্রম, কামাখ্যা )

( ১ )

'দেহত্যাগ' ও 'মৃত্যু'—এই শব্দ দুইটিকে আমরা সাধারণতঃ একার্থবিশিষ্ট বলিয়াই মনে করি। কিন্তু সূক্ষ্মভাবে বিচার করিলে দেখা যায়, 'দেহত্যাগ' এবং 'মৃত্যুর' মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য আছে; দেহত্যাগ, মৃত্যু নয়। দেহ-ত্যাগে দেহীর স্বাধীনতা ও কর্তৃত্ব আছে, মৃত্যুতে তাহা নাই। দেহ-সম্বন্ধে একটু স্থির চিত্তে চিন্তা করিলে দেখা যায়, দেহ অস্থি-চর্ম্ম-মাংস-রক্ত-মেদ-লোম প্রভৃতির সমষ্টিমাত্র; এই উপাদানসমূহ সকলেই জড় পদার্থ; তাহাদিগের স্বাধীন ভাবে চিন্তা ও কার্য্য করিবার ক্ষমতা, অনুভব-শক্তি আকাঙ্ক্ষা বাসনা হর্ষ বিষাদ ক্রোধ দয়া প্রভৃতি কিছুই নাই। কিন্তু দেহের কার্য্যকলাপ দেখিলে মনে হয়, এই সমস্ত শক্তি ও ভাব তাহাতে বর্ত্তমান। সুতরাং স্বীকার করিতে হয়, দেহের অভ্যন্তরেই দেহের প্রযোজক দেহী বর্ত্তমান রহিয়াছেন এবং দেহ তাঁহারই নির্দ্দেশ বা ইচ্ছানুসারেই স্পন্দিত হইতেছে। এই দেহ যখন উষ্মারহিত শ্বাস-প্রশ্বাস-বিহীন, বিবর্ণ ও স্পন্দশক্তিবিরহিত হয় এবং ইন্দ্রিয়াদিও কার্য্যক্ষম থাকে না, তখনই আমরা সেই দেহকে 'মৃত' বলি এবং দেহের মৃত্যুকেই দেহীর মৃত্যু বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়া ভয় শোক ও দুঃখে অভিভূত হই। দেহ পঞ্চভূতাত্মক জড়পদার্থ, দেহী তাহার অধীশ্বর। দেহী দেহে বর্ত্তমান থাকাতেই দেহের স্থায়িত্ব এবং তিনি দেহ হইতে বিযুক্ত হইলেই দেহ স্পন্দরহিত হইয়া শবে পরিণত হয়। দেহী নিত্য, দেহ অনিত্য। সুতরাং দেহের মৃত্যু হইলে দেহীর মৃত্যু হয় না। তাই, শ্রীমদ্‌ভগবদ্-গীতায়ও দেখি, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন—

দেহী নিত্যমবধ্যোঽয়ং দেহে সর্ব্বস্য ভারত॥

২।৩০

দেহের] মৃত্যু নানাবিধ কারণে সংঘটিত হইতে

পারে। স্বাভাবিক নিত্যক্ষয়-প্রভাবে দেহ কালে জরাগ্রস্ত হইয়া বিনষ্ট হয়; আধি অর্থাৎ মানসিক বিকার এবং শারীরিক ব্যাধিবশেও দেহের ধ্বংস হয়; ভাবের প্রাবল্যে অত্যন্ত উল্লাস বা অত্যন্ত শোক-দুঃখ প্রভৃতিতেও দেহ-নাশ হয়। লটারি প্রভৃতি দ্বারা হঠাৎ ভাগ্যোন্নতি হইলে অত্যন্ত উল্লাসে মৃত্যু-মুখে পতিত হওয়ার বিবরণ শুনিতে পাওয়া যায়; পক্ষান্তরে ব্যাঙ্ক প্রভৃতি ফেল হওয়ায় সহসা ভাগ্য-বিপর্য্যয় হইলেও হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া রুদ্ধ হইয়া মৃত্যু সংঘটিত হওয়ার ঘটনাও বিরল নহে। আধি, ব্যাধি প্রভৃতি ভিন্নও মৃত্যুর অপর কতকগুলি কারণ আছে; তাহাদিগকে আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক বলে। সর্প-দংশন, ব্যাঘ্রাদি বা আততায়ী দ্বারা হত হওয়ার কারণ আধিভৌতিক এবং বজ্রাঘাত প্রভৃতি হইতে মৃত্যুর কারণ আধিদৈবিক। এ-সমস্তই দেহের মৃত্যু; ইহাদিগকে 'দেহত্যাগ'-সংজ্ঞায় আখ্যাত করা যায় না। অপর এক প্রকারের মৃত্যুও আছে, তাহাতে অবশ্য দেহীর কর্তৃত্ব বিদ্যমান, যেমন বিষভক্ষণ, উদ্বন্ধন, স্বদেহ-দাহ, জলে নিমজ্জন প্রভৃতি দ্বারা নিজের মৃত্যু-সংঘটন। এই সব ক্ষেত্রে কর্ত্তার কর্তৃত্ব থাকিলেও ইহাকে অপমৃত্যু বা আত্ম-হত্যাই বলিতে হয়, কারণ ইহা মানসিক বিকৃতিবশে উৎকট উপায়-বিশেষের সাহায্যে স্বদেহের বিনাশসাধন-মাত্র। শাস্ত্রে এইরূপ বিকারগ্রস্ত হইয়া দেহনাশের তীব্র নিন্দাই করা হইয়াছে।

পুরাকালে যে সহ-মরণের ব্যবস্থা ছিল, তাহাও এই শ্রেণীরই মৃত্যু। এই প্রসঙ্গে বহু কাল পূর্ব্বের একটি আশ্চর্য্য ঘটনার বিবরণ বাল্যকালে শুনিয়াছিলাম। নদীয়া জেলার অন্তর্গত লোকনাথপুর গ্রামের এক ব্রাহ্মণের মৃত্যু হইলে তাঁহার স্ত্রী সহমরণে যাইতে কৃতসংকল্প হন। ইহার বহুপূর্ব্বেই আইনদ্বারা সহমরণ-প্রথা রহিত হইয়া গিয়াছিল; সুতরাং কর্তৃপক্ষগণ শোকার্ত্তা সতীকে এক গৃহে রুদ্ধ করিয়া রাখিয়া শব লইয়া সৎকার করিবার জন্য শ্মশানে প্রস্থান করেন। সৎকারান্তে তাঁহারা গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া অবরুদ্ধ গৃহের দ্বার উন্মোচন করিয়া দেখেন, রমণী মৃতাবস্থায় পড়িয়া আছেন; তাঁহার শরীরে আত্ম-হত্যার কোন প্রকার চিহ্নও নাই। এই দৃশ্য দেখিয়া সকলে আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন এবং অবশেষে স্বামীর চিতায়ই তাঁহার সৎকার করা হইল। এই বংশের বংশধরগণ এখনও বর্ত্তমান; সুপ্রসিদ্ধ কবি সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় তাঁহাদিগের অন্যতম। পাতিব্রত্যধর্ম্মে একান্ত অনুগামিনী বা সতীত্বধর্ম্ম-রক্ষায় উৎসর্গীকৃতপ্রাণা সতীর সহমরণ অগ্নিপ্রবেশ বা জহরব্রত দ্বারা আত্মনাশ অথবা আত্মসম্মানরক্ষায় কৃতসংকল্প সৈনিকের আত্মহনন প্রভৃতির আদর্শ ইতিহাসে উচ্চ মর্য্যাদা-লাভ করিয়াছে সন্দেহ নাই; কিন্তু এই সকল ব্যাপারও ভাবের অতি-প্রবলতাহেতু মৃত্যুমাত্র। এই সকল ক্ষেত্রেও মনের সুস্থ অবস্থায় এবং দেহ ও দেহীর সম্যক জ্ঞান-বর্ত্তমানে মৃত্যু সংঘটিত না হইয়া দেহাত্ম-জ্ঞানবিশিষ্ট অবস্থায়ই মৃত্যু হইয়া থাকে।

'মৃত্যু' ও 'দেহত্যাগে'র মধ্যে আরও বহু প্রকারের বিভিন্নতা আছে; তন্মধ্যে একটি প্রধান কথা এই যে, মৃত্যুতে মরণভীতি আছে, দেহ-ত্যাগে তদনুরূপ বিভীষিকা-বোধ আদৌ নাই; বরং উহা দেহীর পক্ষে আনন্দেরই বিষয় হয়। সাধকপ্রবর গোবিন্দ চৌধুরী প্রয়াণ-কালের অব্যবহিত পূর্ব্বে গাহিয়া গিয়াছেন—

আমি চ'ল্লেম রে ভাই আনন্দ-কাননে,
সংসারের লোকে যারে শ্মশান ব'লে ভয় পায় মনে।

দেহত্যাগ-কালে এবং মৃত্যু-সময়ে শ্বাস-প্রশ্বাসের গতিরও ভেদ হয়। শ্বাস-ক্রিয়ার অন্তর্মুখী অবস্থায় দেহ-ত্যাগ হয়, পরন্তু উহার

বহির্মুখী বা বিকর্ষণাত্মক প্রশ্বাস-ক্রিয়া অবলম্বনে প্রাণ বহির্গত হইলে মৃত্যু হয়। মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বেই দেখা যায়, প্রাণবায়ুর অধোমুখী ক্রিয়া অত্যন্ত বৃদ্ধি পায় এবং উহার গতি নাভি পর্য্যন্ত গমন করে; এই জন্য গ্রাম্য ভাষায় ঐ সময়ের প্রশ্বাসকে 'নাভিশ্বাস' বলে। অপর পক্ষে, দেহত্যাগ-কালে যোগীর প্রশ্বাস-ক্রিয়া ক্রমে ক্ষীণ হইতে হইতে 'নাসাভ্যন্তরচারী' হয় ও পরে উর্দ্ধে গমন করিয়া ক্ষীণতর হইতে হইতে সহস্রারে লয়-প্রাপ্ত হয়। আরও এক কথা এই যে, মৃত্যুতে দেহান্তরপ্রাপ্তির সম্ভাবনা অপনীত হয় না, দেহী এক দেহ পরিত্যাগ করিয়া অপর দেহগ্রহণ করেন মাত্র। তাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন—

"বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্ণাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা-
ন্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী ॥"

গীতা, ২।২২

সুইডেন্‌বার্গ বলিয়াছেন—"When the body is separated from the Spirit which is called dying, the man still remains and lives". পক্ষান্তরে দেহত্যাগে পুনর্জ্জন্মের সম্ভাবনা আদৌ নাই, দেহী জন্ম-মৃত্যুর চক্র অতিক্রম করেন—"অতিমৃত্যুমেতি।"

শাক্যসিংহ এই ক্ষণভঙ্গুর দেহের মৃত্যু-অবলোকন করিয়াই বিচারদ্বারা ইহার নশ্বরত্ব-অনুধাবন করিয়াছিলেন। ফলে, তাঁহার অন্তরে বিবেক ও বৈরাগ্যের উদয় হওয়ায় তিনি পিতা, মাতা, রাজত্ব, স্ত্রী ও সদ্যোজাত পুত্র পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়া সত্যানুসন্ধানের নিমিত্ত বহির্গত হইয়াছিলেন এবং এক অশ্বত্থবৃক্ষ-মূলে যোগাসনে উপবিষ্ট হইয়া স্থিরসঙ্কল্প করিয়াছিলেন যে, প্রকৃত সত্যের সন্ধান না পাওয়া পর্য্যন্ত আসন হইতে উত্থান করিবেন না, শরীর বিনষ্ট হয় হউক—

"ইহাসনে শুষ্যতু মে শরীরং
ত্বগস্থিমাংসং প্রলয়ঞ্চ যাতু।
অপ্রাপ্য বোধিং বহুকল্পদুর্লভাং
নৈবাসনাৎ কায়মতশ্চলিষ্যতে ॥"

এই অবস্থায় সাধন-প্রভাবে তিনি কালে দেহীর প্রকৃত সত্তা উপলব্ধি-পূর্ব্বক আত্মজ্ঞানী হইয়া 'বুদ্ধ' হইয়াছিলেন। তখন তাঁহার জ্ঞানে প্রতিভাত হইয়াছিল, দেহ মর ও দেহী অমর। এই জ্ঞানেরই নাম তত্ত্ব-জ্ঞান এবং তত্ত্বজ্ঞানীই 'বুদ্ধ'-সংজ্ঞায় অভিহিত হন—

"তত্ত্বং বুদ্ধ্বা ভবেদ্ বুদ্ধঃ।"

ব্রহ্মপুরাণ, ২৩৮।১১

পুরাকালে ঋষি-যুগেও এইরূপ বহু বিবেকী সাধক দেহ ও দেহীর প্রকৃত সম্বন্ধ এবং তৎ-সম্বন্ধের অন্তরালে যে চিরন্তন সত্য নিহিত রহিয়াছে, তাহার অনুসন্ধানে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন; তাহার বিবরণ শাস্ত্রে অপ্রচুর নহে।

শাক্যসিংহের ন্যায় আত্মজ্ঞানলাভের নিমিত্ত প্রাণপণ সাধনের বর্ণনা শ্রীমদ্ভাগবতেও দেখিতে পাই—

"সোঽহং কালাবশেষেণ শোষয়িষ্যেঽঙ্গমাত্মনঃ।
অপ্রমত্তোঽখিলে স্বার্থে যদি স্যাৎ সিদ্ধিরাত্মনি ॥"

সত্যানুসন্ধানী সাধকগণ প্রত্যক্ষানুভূতির দ্বারা অবগত হইয়াছেন যে, দেহ ও দেহী পৃথক এবং দেহাতিরিক্ত দেহীর স্বতন্ত্র ও স্বাধীন সত্তা আছে। এই জ্ঞানই পরিণত বয়সে ও প্রারব্ধক্ষয়ে দেহীকে স্বদেহ-পরিত্যাগ করিতে প্রেরণা দেয়; এই জ্ঞানই প্রকৃত জ্ঞান—

"ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞয়োর্জ্ঞানং যত্তজ্ জ্ঞানং মতং মম ॥"

শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা, ১৩।৩

যুগে যুগে আত্মজ্ঞানী সাধকগণ তাঁহাদিগের

সাধনধারার মধ্য দিয়া দেহত্যাগের প্রকৃত তত্ত্ব ও পন্থা নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। আমরা এক্ষণে সেই প্রকৃত দেহত্যাগ-সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

দেহত্যাগ সম্পূর্ণ পৃথক ব্যাপার, ইহা মৃত্যু নহে। দেহত্যাগ যোগেরই একটি কৌশলবিশেষ। কৌশলজ্ঞ গুরুর নিকট তাহা শিক্ষা করিয়া ধীরে ধীরে ও অত্যন্ত সাবধানে দীর্ঘকাল অভ্যাস করিতে হয় এবং সাধনের পরিপক্ক অবস্থায় সাধক স্বেচ্ছায় দেহত্যাগ করিতে সমর্থ হন। একটু লক্ষ্য করিলে দেখা যায়, জীবমাত্রেরই দেহের মধ্যে দুইটি স্বাভাবিক বিপরীত ক্রিয়া দিবারাত্র স্বতই চলিতেছে, একটি আকর্ষণাত্মক ও অপরটি বিক্ষেপণাত্মক। আকর্ষণাত্মক ক্রিয়ামূলে শ্বাস ঊর্দ্ধ দিকে আকৃষ্ট হয় ও বিক্ষেপণাত্মক ক্রিয়া-প্রভাবে পুনরায় উহা প্রশ্বাসরূপে বহির্গত হইয়া যায়। এই দুই ক্রিয়ার কর্ত্তা জীব নহে। কারণ, মাতৃগর্ভে থাকা অবস্থায় এবং নিদ্রিতাবস্থায়ও জীবের কোনচেষ্টার অপেক্ষা না করিয়াই এই ক্রিয়াদ্বয় স্বতই চলিতে থাকে। ইহাদিগের মধ্যে নিম্নগামী বিক্ষেপণ অর্থাৎ বহির্মুখী ক্রিয়া মেরুদণ্ডের অভ্যন্তর দিয়া মূলাধার পর্য্যন্ত গমন করে ও ঊর্দ্ধগামী আকর্ষণাত্মক অর্থাৎ অন্তর্মুখী ক্রিয়া সেই পথেই প্রত্যাগমন করিয়া তালু, মূর্দ্ধা ও দ্বিদল (ভ্রূমধ্য) অতিক্রম করিয়া সহস্রারে (মস্তকের শীর্ষ-প্রদেশে) গমন করে। দেহত্যাগ করিবার ইচ্ছায় যোগী পুরুষ এই পথেই প্রাণবায়ুকে ঊর্দ্ধে আকর্ষণ করিয়া প্রণব-ধারণা-পূর্বক প্রাণকে দেহমুক্ত করেন। এই পথেরই নাম 'দেবযান।' ভগবান শ্রীকৃষ্ণ জ্ঞান ও যোগের উপদেশচ্ছলে অর্জ্জুনকে এবম্বিধভাবে দেহত্যাগের কৌশল-সম্বন্ধে গীতায় ইঙ্গিত দিয়াছেন—

(ক) প্রয়াণকালে মনসাঽচলেন
ভক্ত্যা যুক্তো যোগবলেন চৈব।
ভ্রুবোর্মধ্যে প্রাণমাবেশ্য সম্যক্
স তং পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্॥ ৮।১০

(খ) সর্ব্বদ্বারাণি সংযম্য মনো হৃদি নিরুধ্য চ।
মূর্দ্ধ্ন্যাধায়াত্মনঃ প্রাণমাস্থিতো যোগধারণাম্॥
ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্ মামনুস্মরন্।
যঃ প্রয়াতি ত্যজন্ দেহং স যাতি পরমাং গতিম্॥
৮।১২-১৩

ইহারই নাম 'দেহত্যাগ', ইহা মৃত্যু নহে। শ্রীকৃষ্ণের উক্তিতে 'ত্যজন্ দেহং' শব্দ দুইটি লক্ষ্য করিলে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়, দেহ-ত্যাগের নির্দ্দিষ্ট কৌশল বা উপায় আছে এবং যোগী পুরুষ সেই উপায়-অবলম্বনেই দেবযান-পথে দেহত্যাগ বা মহাপ্রয়াণ করিয়া থাকেন। অর্জ্জুনের উপদেষ্টা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যদুবংশ ধ্বংস করিয়া স্বয়ং এই উপায়-অবলম্বনেই দেহত্যাগ করিয়াছিলেন—

সঞ্চিন্ত্যয়ন্নন্ধকবৃষ্ণিনাশং কুরুক্ষয়ঞ্চৈব মহানুভাবঃ।
মেনে ততঃ সংক্রমণস্য কালং ততশ্চকারেন্দ্রিয়-
সন্নিরোধম্॥

... ... ...

স সংনিরুদ্ধেন্দ্রিয়বাঙ্মনাস্তু শিশ্যে মহাযোগমুপেত্য
কৃষ্ণঃ॥

... ... ...

ততো রাজন্ ভগবানুগ্রতেজা নারায়ণঃ
প্রভবশ্চাব্যয়শ্চ।
যোগাচার্য্যো রোদসী ব্যাপ্য লক্ষ্ম্যা স্থানং প্রাপ
স্বং মহাত্মাঽপ্রমেয়ম্॥
মহাভারত, মৌষল পর্ব্ব, ৪।১৯-২৩

# ভগিনী নিবেদিতা

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

( ২ )

বোম্বাই নগরে ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে প্লেগ-মহামারীর প্রাদুর্ভাব ঘটে। রোগ সংক্রামক ও স্পর্শাক্রামক। স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যবস্থা করিয়া প্লেগ দূর করিবার যে চেষ্টা তথায় হইয়াছিল, তাহা রোগেরই মত ভয়াবহ। ব্যবস্থাপ্রবর্তন-কার্যে ইউরোপীয় সৈনিক-নিয়োগে অবস্থা আরও জটিল হয় এবং সৈনিক-দিগের অত্যাচারে ও অনাচারে লোক জর্জরিত হয়। সেই জন্য দুই বৎসর পরে যখন অস্বাস্থ্যকর বস্তি-বহুল কলিকাতায় প্লেগ দেখা দেয়, তখন শহরবাসী রোগের ভয়ে যেমন—বোম্বাই শহরে সৈনিকদিগের অত্যাচার স্মরণ করিয়া তেমনই—শহর ত্যাগ করিয়া পলাইতে আরম্ভ করে। ট্রেনগুলি পলায়নপর নরনারীতে পূর্ণ হইতে থাকে। কোন পলায়নরতা নারী হাওড়া সেতুর উপরেই সন্তানপ্রসব করিয়াছিলেন। এই অবস্থায় ভগিনী নিবেদিতা কলিকাতার জনবহুল উত্তরাঞ্চলে একটি হাসপাতাল প্রতিষ্ঠিত করিয়া প্লেগগ্রস্ত রোগীদিগকে তথায় লইয়া চিকিৎসা করিবার প্রস্তাব করেন। মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী শ্যামবাজারে তাঁহার পৈতৃক গৃহ হাসপাতালের ব্যবহার জন্য প্রদান করেন; ডাঃ রাধাগোবিন্দ কর চিকিৎসা করিবার ভার-গ্রহণে সম্মত হন। উক্ত অঞ্চলের মিউনিসিপ্যাল কমিশনার ভূপেন্দ্রনাথ বসু কার্যে উদ্যোগী হন। কিন্তু কে সেই দারুণ রোগে আক্রান্ত রোগী-দিগের শুশ্রূষা করিবেন? ভগিনী নিবেদিতা সে কাজ গ্রহণ করিতে অগ্রসর হইলেন। কলিকাতা হইতে শ্রমিকরা চলিয়া যাওয়ায় ব্যবসা অচল হইয়া দাঁড়ায়। শেষে ছোটলাট ঘোষণা করেন—"সম্মতি না পাইলে কোন রোগিণীকে তাহার স্বামীর নিকট হইতে বা কোন রোগীকে তাহার স্ত্রীর নিকট হইতে (বলপূর্বক) স্থানান্তরিত করা হইবে না।" ব্যাধি বিশেষ বিস্তার-লাভ করে নাই, কিন্তু রোগাক্রান্ত একটি বালক শুশ্রূষারত নিবেদিতার অঙ্কে শেষ শ্বাসত্যাগ করিয়াছিল। সে বিকারের বিভ্রান্ত অবস্থায় তাঁহাকেই তাহার মাতা মনে করিয়া তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিয়াছিল। আর তাঁহার দৃষ্টান্তে ও উপদেশে পল্লীর তরুণরা পল্লীর অস্বাস্থ্যকর স্থানসমূহ পরিচ্ছন্ন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। নাগরিকের কর্তব্য-সম্বন্ধে তিনি তাহাদিগকে সচেতন ও সেবাব্রতে ব্রত করিয়া-ছিলেন। নিবেদিতা সে বিষয়েও স্বামীজীর উপযুক্ত শিষ্যা ছিলেন—দীনদরিদ্রদিগকে নারায়ণ-জ্ঞানে সেবা করিতেন।

জনসেবার সেই আদর্শ রামকৃষ্ণ মিশনের সেবাশ্রমসমূহে মূর্ত হইয়াছিল। কাশীতে সেবাশ্রম-প্রতিষ্ঠার জন্য নিবেদিতা যে আবেদনপত্র রচনা করিয়াছিলেন, তাহা মাতৃহৃদয়ের করুণার মন্দাকিনীধারা-সিঞ্চনে পবিত্র। সাংবাদিক র‍্যাট্‌ক্লিফ বসুপাড়া লেন (নিবেদিতার বাসস্থান) হইতে বিকীর্ণ সেবানুরাগের প্রভাবে বাঙ্গলার তরুণগণের প্রভাবিত হইবার বিষয় সশ্রদ্ধভাবে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। নিবেদিতা তাহাদিগকে স্বামীজীর প্রভাবে প্রভাবিত করিয়াছিলেন।

আমেরিকায় কোন ধনীর গৃহে নিমন্ত্রিত হইয়া আতিথ্য-স্বীকার করিলে স্বামীজী তথায় সুকোমল শয্যা ত্যাগ করিয়া হর্ম্যতলে লুণ্ঠিত

হইয়া কাঁদিয়াছিলেন—তাঁহার দেশবাসীরা কত দরিদ্র—কত দুঃখী। তিনি বলিয়াছিলেন, দেশের দরিদ্র জনগণের অর্থে যে শিক্ষাপদ্ধতি পরিচালিত, তাহাতে শিক্ষালাভ করিয়া যাহারা শিক্ষিত হয়—দেশে এক জন লোকও যতক্ষণ নিরক্ষর থাকে, ততক্ষণ তিনি সেই শিক্ষিতদিগকে ক্ষমা করিতে পারেন না।

স্বামীজী ভারতবাসীকে বলিয়াছিলেন—"বল, আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই; বল, মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই।"

আর যে দেশপ্রেম তাহা সম্ভব করে, তাহার বিকাশকল্পে তিনি বলিয়াছিলেন—"বল, ভারতবাসী আমার ভাই, ভারতবাসী আমার প্রাণ, ভারতের দেবদেবী আমার ঈশ্বর, ভারতের সমাজ আমার শিশুশয্যা, আমার যৌবনের উপবন, আমার বার্ধক্যের বারাণসী; বল, ভাই, ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ, ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ।"

তখন বাঙ্গলার তরুণ সমাজে স্বামীজীর প্রভাব ইংরেজ রাজকর্মচারীদিগের ভয়ের কারণ হইয়াছিল। ছাত্রাবাসে তাঁহারা স্বামীজীর রচনা ও ছাত্রাবাসের কক্ষে কক্ষে স্বামীজীর বাণী দেখিয়া ভয় পাইয়াছিলেন—স্বামীজী যে জাতীয়তা প্রচার করিয়াছিলেন তাহা ধর্মপ্রবণ। স্বামীজীর শিক্ষায় জাতীয়তা আধ্যাত্মিকতার সহিত সম্মিলিত হইয়া গঙ্গা-যমুনার মিলিত ধারার মত পবিত্র ও প্রবল হইয়াছিল।

স্বামী বিবেকানন্দের মত ছিল—পরাধীনতা জাতির পক্ষে অভিশাপ—তাহা জাতির মনুষ্যত্ব নাশ করে। সে কথা শ্রীঅরবিন্দও লিখিয়া গিয়াছেন—রাজনৈতিক স্বাধীনতালাভ না করিয়া সমাজ-সংস্কার, শিক্ষা-সংস্কার, শিল্প-বিস্তার, জাতির নৈতিক উন্নতিসাধন—এ সকলের আশা দুরাশা মাত্র—ভাবুকের কল্পনা। স্বাধীনতালাভ-চেষ্টায় আয়র্লণ্ডের সহিত ভারতের অনেক সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। আইরিশ মহিলা নিবেদিতা ভারতের স্বাধীনতালাভ-প্রচেষ্টার সমর্থন করিতেন। ১৯০১ খৃষ্টাব্দে বরদার মহারাজার নিমন্ত্রণে তিনি বরদায় গমন করেন। তথায় অরবিন্দের সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। তখন যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তথায়। যতীন্দ্রনাথ সেনাদলে প্রবেশ করিয়া আবশ্যক অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য—এলাহাবাদে যাইয়া হিন্দী শিখিয়া—যতীন্দর উপাধ্যায় নাম লইয়া অরবিন্দের সাহায্যে বরদার সেনাদলে সাধারণ সৈনিকরূপে প্রবেশ করেন। ১৯০২ খৃষ্টাব্দে যতীন্দ্রনাথ যখন কলিকাতায় আসিয়া একটি রাজনৈতিক সমিতি স্থাপন করিয়া দেশের তরুণদিগকে বিপ্লবের জন্য প্রস্তুত করিতে থাকেন, তখন নিবেদিতা তাঁহাকে সাহায্য করিতে ত্রুটি করেন নাই। যতীন্দ্রনাথের সমিতির কথায় ডাঃ যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায় লিখিয়াছেন—"এটি প্রকৃতপক্ষে ছিল—বিপ্লবী নীড়। এখানে ঘোড়দৌড়, সাইকেল, সাঁতার, মুষ্টিযুদ্ধ, লাঠিখেলা শেখান হ'ত এবং বিপ্লবী ভাবে উদ্বুদ্ধ করার জন্য বক্তৃতা ও পাঠচক্র পরিচালিত হ'ত। ভগিনী নিবেদিতা এটির সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত ছিলেন। তিনি দিলেন বিপ্লববাদের পুস্তক-সংগ্রহ। তাঁর বইগুলির মধ্যে ছিল—আইরিশ বিদ্রোহের ইতিহাস, সিপাহী-যুদ্ধের ইতিহাস, আমেরিকার স্বাধীনতাযুদ্ধের ইতিহাস, ডাচ প্রজাতন্ত্রের কথা, ইটালীর মুক্তিদাতা ম্যাটসিনি ও গ্যারিবল্ডির জীবনী, রমেশ দত্ত, ডিগবী, দাদাভাই নৌরজীর অর্থনৈতিক বই, অধ্যাপক ওকাকুরার বই প্রভৃতি। নিবেদিতা যতীন্দ্রনাথকে রাজনীতি শেখাবার জন্য এবং দল-গঠনের জন্য এই বইগুলি দিয়েছিলেন।"

কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের মতই নিবেদিতার মত

ছিল—"ধর্ম্য প্রয়োজন ব্যতীত যে হিংসা, তাহা হইতে বিরতিই পরম ধর্ম। নচেৎ হিংসাকারীর নিবারণ জন্য হিংসা অধর্ম নহে; বরং পরম ধর্ম।" সেই কারণে কতকগুলি যুবক যখন ডাকাইতি করিতে যাইবার জন্য তাঁহার রিভলবার চাহিতে গিয়াছিল, তখন তিনি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন এবং যতীন্দ্রনাথকে তাহাদিগের কথা বলিয়া দিয়াছিলেন।

শ্রীঅরবিন্দের সহিত নিবেদিতার পরিচয় সহজেই ঘনিষ্ঠতায় পরিণত হইয়াছিল। আলিপুরে বোমার মামলা হইতে অব্যাহতি-লাভ করিয়া অরবিন্দ যখন 'কর্মযোগিন্' ও 'ধর্ম' পত্রদ্বয় প্রকাশ করিতেছিলেন, তখন সরকার আবার তাঁহাকে মামলাসোপর্দ করিবার ব্যবস্থা করেন। ঘটনাক্রমে নিবেদিতা তাহা জানিতে পারেন এবং তাঁহারই পরামর্শে ও প্ররোচনায় অরবিন্দ কলিকাতা ত্যাগ করিয়া চন্দননগরে গমন করেন। ভগিনী নিবেদিতাই তাঁহার পাথেয় সংগ্রহ করিয়া দিয়াছিলেন। সে অর্থ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু দিয়াছিলেন।

আচার্য জগদীশচন্দ্রের এই কার্যেই বুঝা যায়, বাঙ্গলার শিক্ষিত-সমাজে তখন স্বাধীনতালাভ-চেষ্টা কিরূপ সমর্থন লাভ করিয়াছিল। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় যে কেবল ইটালীর মুক্তি-সংগ্রামের নায়ক ম্যাটসিনি ও গ্যারিবল্ডির প্রশংসা করিয়া বক্তৃতায় তরুণদিগকে মাতাইয়া তুলিতেন, তাহাই নহে; পরন্তু তিনি লিখিয়াছেন, যাঁহারা ইংরেজী জানেন না, তাঁহাদিগের জন্য ম্যাটসিনির জীবনকথা বাঙ্গালায় লিপিবদ্ধ করিবার জন্য তিনি রজনীকান্ত গুপ্ত ও যোগেন্দ্রচন্দ্র বিদ্যাভূষণ—উভয়কে প্ররোচিত করিয়াছিলেন। বাঙ্গালার বিপ্লবী তরুণদিগের সম্বন্ধে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের সকরুণ সহানুভূতির পরিচয় অনেকেই পাইয়াছিলেন। আশুতোষ মুখোপাধ্যায় যে বিপ্লবী কোন তরুণকে (শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ) পুলিশের কবল হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন, তাহা আজ আর গোপন করিবার কারণ নাই। বঙ্গবাসী কলেজের অধ্যক্ষ গিরীশচন্দ্র বসু বিপ্লবী ছাত্রদিগকে তাঁহার প্রতিষ্ঠানে যোগ দিতে অবাধে অনুমতি দিলেন। বাঙ্গালায় সশস্ত্র বিপ্লবের প্রথম নেতা যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় হিন্দী শিখিবার জন্য যখন এলাহাবাদে শিক্ষার্থী হইয়া গমন করেন, তখন রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় তাঁহার অভিভাবকত্ব করিয়াছিলেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। মহারাষ্ট্রে বালগঙ্গাধর তিলক, পঞ্জাবে লালা লাজপত রায়, মান্দ্রাজে চিদাম্বরম্ পিলে—ইঁহাদিগের কথা বলা বাহুল্য। এমন কি 'মডারেট'-দলের অন্যতম প্রধান নেতা গোপালকৃষ্ণ গোখলেও বারাণসীতে কংগ্রেসের অধিবেশনে (১৯০৫ খৃষ্টাব্দে) সভাপতির অভিভাষণে বাঙ্গালার রাজনীতি-আন্দোলনে 'সামান্য অনাচারের' সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন—জনগণ যখন দাসত্ব হইতে মুক্তির দিকে অগ্রসর হয়—অভিযান করে—তখন ঐরূপ ব্যাপার ঘটিয়া থাকে; তাহাতে বিচলিত হইবার কোন কারণ নাই।

যে জাপানী অধ্যাপক ওকাকুরার পুস্তক নিবেদিতা বিপ্লবীদিগকে উপহার দিয়াছিলেন তিনি এশিয়ার দেশসমূহের সঙ্ঘগঠনের পরিকল্পনা লইয়া ভারতে আসিয়াছিলেন ও ভারতের প্রগতিশীল দলের নেতৃবৃন্দের সহিত সে বিষয়ে আলোচনা করিয়াছিলেন। প্রাচীতে প্রতীচীর শাসন ও শোষণ শেষ করাই সেই পরিকল্পনার লক্ষ্য ছিল। ওকাকুরা 'প্রাচীর আদর্শ'-সম্বন্ধে যে পুস্তকে ভারতের সহিত জাপানের সংস্কৃতিগত ঐক্য প্রমাণ করেন, তাহার আরম্ভে লিখিত হয়—"এশিয়া এক" অর্থাৎ অভিন্ন। নিবেদিতা সেই পুস্তকের ভূমিকা লিখিয়াছিলেন। তাহাতে তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যায়।

ভগিনী নিবেদিতার পাণ্ডিত্যের ও স্মৃতিশক্তির তীক্ষ্ণতার একটি পরিচয় আমরা প্রদান করিতেছি। লর্ড কার্জন অত্যন্ত দাম্ভিক ছিলেন। তাঁহার সম্বন্ধে তাঁহার স্বদেশে একটি ছড়া প্রচলিত হয়—তাহাতে কার্জনের সহিত মিল করিয়া বলা হয়—"I am quite a Superior Person." তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক সভায় বলেন—সভ্য প্রতীচীর লোকদিগের নিকটেই আদৃত প্রাচীর অধিবাসীরা মিথ্যাবাদী ও তোষামোদকারী। বক্তৃতান্তে—তিনি চলিয়া যাইবার পর—যখন গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ কয় জন সম্ভ্রান্ত লোক বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট হলের প্রবেশকক্ষে দাঁড়াইয়া সেই অপমানজনক উক্তি-সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছিলেন, তখন নিবেদিতা জিজ্ঞাসা করেন, কাহারও নিকটে কি কার্জনের 'Problems of the Far East' পুস্তক আছে? উহা গুরুদাস বাবুর কাছে ছিল। নিবেদিতা তাঁহার সহিত তাঁহার গৃহে যাইয়া উহা আনয়ন করেন। উহাতে লর্ড কার্জন তাঁহার কোরিয়াভ্রমণ-প্রসঙ্গে লিখিয়াছিলেন—"রাজার সহিত সাক্ষাতের পূর্বে আমি কোরিয়ার পররাষ্ট্র-দপ্তরের প্রেসিডেন্টের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাই। * * * আমাকে পূর্বেই সতর্ক করিয়া দেওয়া হইয়াছিল, আমার বয়স যে ৩৩ বৎসর মাত্র তাহা যেন আমি স্বীকার না করি—কারণ, সে দেশে সেরূপ অল্প বয়সের কোন সম্ভ্রম থাকে না। সে দেশের প্রথানুসার প্রথমেই যখন আমাকে জিজ্ঞাসা করা হইল—'আপনার বয়স কত?' তখন আমি দ্বিধা না করিয়া বলিলাম, '৪০ বৎসর।' প্রেসিডেন্ট বলিলেন, 'বটে! আপনাকে দেখিয়া ত আপনার অত বয়স মনে হয় না! তাহার কারণ কি?' আমি বলিলাম, 'আমি যে কোরিয়ার নৃপতির রাজ্যে এক মাস যাপন করিয়াছি—তাহাতেই ইহা মনে হইতেছে।' শেষে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আপনি বোধ হয়, ইংলণ্ডের রাণীর আত্মীয়?' আমি বলিলাম 'না।' কিন্তু আমার উত্তরে তাঁহার মুখে যে বিরক্তির ভাব লক্ষ্য করিলাম, তাহা দেখিয়া বলিলাম, 'তবে আমি এখনও অবিবাহিত।' সেই কথা অসঙ্কোচে বলিয়া আমি তাঁহার অনুগ্রহ পুনরায় লাভ করিলাম।"

ভগিনী নিবেদিতা যে পল্লীতে বাস করিতেন—সেই পল্লীতে 'অমৃতবাজার পত্রিকার' কার্যালয় অবস্থিত। অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদকরা তাঁহাকে বিশেষ শ্রদ্ধা ও স্নেহ করিতেন। তিনি 'অমৃতবাজার পত্রিকায়' লর্ড কার্জনের ঐ উক্তি উদ্ধৃত করিয়া প্রমাণ করিলেন—লর্ড কার্জন স্বয়ং মিথ্যাসক্ত ও তোষামোদকারী। ঐ পত্রে লর্ড কার্জনের বক্তৃতার আপত্তিকর অংশ ও এই স্বীকৃতি পাশাপাশি প্রকাশিত হইল। লর্ড কার্জনের পক্ষে যেন জলৌকার মুখে চূণ পড়িল। বিখ্যাত সাংবাদিক গার্ডিনার এই ব্যাপারে মন্তব্য করেন—"India was dissolved in laughter. It almost forgot the insult for the sake of the jest."

নিবেদিতাই যে লর্ড কার্জনের দাম্ভিকতা ভূমিতে লুণ্ঠিত করাইয়াছিলেন, তাহা অনেকেই জানিতে পারেন নাই। কোন বিখ্যাত ইংরেজ সাংবাদিক—তাহা কোন অসাধারণ স্মৃতিশক্তি-সম্পন্ন হিন্দুর কার্য বলিয়াছিলেন। সে কথা কি অসঙ্গত? বোধ হয় না। কারণ, নিবেদিতা মনে করিতেন—"ভারতবাসী আমার ভাই। * * ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ, ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ।"

আচার্য জগদীশচন্দ্রের ও তাঁহার পত্নীর সহিত নিবেদিতার অসাধারণ ঘনিষ্ঠতা ছিল।

তিনি বিদেশে বন্ধুজায়ার পীড়ায় তাঁহাকে সেবা করিয়া সুস্থ করিয়াছিলেন, আর তিনি স্বয়ং মরণাহত হইয়া বন্ধু-পরিবারে যাইয়া শেষ শ্বাস-ত্যাগ করেন। নিবেদিতার ভ্রাতা লিখিয়াছিলেন —তিনি যে বন্ধু-পরিবারে যাইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার মনে হইয়াছে—ভগিনী তাঁহার স্বদেশে স্বজনগণেই শেষ সময়ে পরিবেষ্টিত ছিলেন।

অসাধারণ কৃচ্ছ্রসাধন ও পরিশ্রমই নিবেদিতার ৪৪ বৎসর বয়সে মৃত্যুর কারণ। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে যখন পূর্ববঙ্গে লোক বন্যায় ও দুর্ভিক্ষে বিপন্ন তখন নিবেদিতা অসুস্থ শরীরেও তাহাদিগকে সেবা ও সাহায্য দিতে পূর্ববঙ্গে গমন করিয়াছিলেন। তথায় তিনি ম্যালেরিয়াগ্রস্ত হন। অতিশ্রম ও রোগজনিত দৌর্বল্যে তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়। তিনি কিন্তু পরিশ্রমে বিরত হন নাই। তখনও ভারতবর্ষ-সম্বন্ধীয় দুইখানি পুস্তক—একখানি আমেরিকার ও একখানি ইংলণ্ডের পুস্তক-প্রকাশকের জন্য লিখিতেছিলেন। ইংলণ্ডে ও আমেরিকায় যাইয়াও তিনি নষ্ট স্বাস্থ্যের পুনরুদ্ধার করিতে পারেন নাই। তাহার পরে ১৯১১ খৃষ্টাব্দে তিনি ভারতবর্ষে ফিরিয়া আসিয়া ১৩ই অক্টোবর দার্জিলিংএ দেহরক্ষা করেন। তিনি স্বদেশেই শেষ শ্বাসত্যাগ করিয়াছিলেন।

স্বামীজি নিবেদিতাকে সতর্ক করিয়া দিয়াছিলেন—তিনি ভারতে আসিলে শ্বেতাঙ্গরা তাঁহাকে 'বায়ুরোগগ্রস্ত' মনে করিবে এবং তাঁহার গতিবিধি সন্দেহের দৃষ্টিতে লক্ষ্য করিবে। এ দেশের লোকেরাও প্রথমে তাঁহাকে ভুল বুঝিয়াছিলেন। কলিকাতার হিন্দু নারীরা প্রথমে তাঁহাকে বর্জন করিতেন—পরে তাঁহাকে ভগিনী মনে করিয়াছিলেন। তিনি যখন এ দেশে আসিয়া প্রথম রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন, তখন রবীন্দ্রনাথ তাঁহাকে সাধারণ খৃষ্টান পাদ্রী মহিলা মনে করিয়া নিজ কন্যাকে শিক্ষাদানের ভার প্রদান করিতে চাহিয়াছিলেন। নিবেদিতা যখন বলিয়াছিলেন, সাধারণ প্রচলিত প্রথায় শিক্ষাদান তাঁহার অভিপ্রেত নহে, তখন রবীন্দ্রনাথ তাঁহাকে 'বায়ুরোগগ্রস্ত' মনে করিয়াছিলেন কি না, জানি না। কিন্তু তাহার পরে তাঁহার রচনা ও ব্যবহার রবীন্দ্রনাথকে এমনি আকৃষ্ট করিয়াছিল যে, নিবেদিতার মৃত্যুতে তিনি 'প্রবাসী'তে যে প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, তাহা নিবেদিতার উদ্দেশে নিবেদিত শ্রদ্ধার অর্ঘ্য ব্যতীত আর কিছুই নহে।

তিনি কত কত বাঙ্গালীকে যে ইংরেজী রচনায় ও রচনার প্রসাধনে সাহায্য করিয়াছিলেন, তাহা আজ আর জানিবার উপায় নাই। দীনেশচন্দ্র সেনের বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাসে তিনি যে কেবল ভাষা সংশোধন করিয়াছিলেন, তাহাই নহে—রচনার বিষয়-সম্বন্ধে অনেক আলোচনা করিয়াছিলেন। দীনেশ বাবু লিখিয়াছেন—"কোন একটা বিষয়ের ভার লইলে তিনি এটা মনে করিতে পারিতেন না যে, উহা পরের। সেটি সম্পূর্ণ আপনার ভাবিয়া খাটিতেন—এই ভাবের পরিশ্রম কেহ মূল্য দিয়া ক্রয় করিতে পারে না। কোন দিন সকাল হইতে রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত তিনি খাটিয়াছেন; ইহার মধ্যে তিনি ও আমি ২।৫ মিনিটের জন্য খাইয়া লইয়াছি মাত্র। এরূপ নিঃস্বার্থ, আত্মপরভাব-বিরহিত, প্রতিদান-সম্পর্কে শুধু উদাসীন নহে—একান্ত বিরোধী, কার্যে তন্ময় লোক আমি জীবনে বেশী দেখিয়াছি বলিয়া জানি না। তিনি আমাকে নিষ্কাম কর্মের যে আদর্শ দেখাইয়াছেন, তাহা শুধু গীতায় পড়িয়াছিলাম। তাঁহার মধ্যে এ ভাবটি পূর্ণরূপে পাইয়াছিলাম।"

# সমালোচনা

**বিদ্যামন্দির পত্রিকা**— প্রকাশক—স্বামী তেজসানন্দ, অধ্যক্ষ, রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির, পোঃ বেলুড় মঠ, হাওড়া। ১০৬ পৃষ্ঠা।

পত্রিকাখানি রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দিরের (আবাসিক মহাবিদ্যালয়) প্রাক্তন ও বর্তমান বিদ্যার্থিগণের লিখিত সুচিন্তিত রচনাসম্ভারে সমৃদ্ধ। ইহা মুদ্রিত পর্যায়ের দ্বিতীয় সংখ্যা। শিক্ষা, ধর্ম, দর্শন, সংস্কৃতি, স্বাস্থ্য, ভ্রমণ-বৃত্তান্ত, গল্প, সাহিত্য, বিজ্ঞান, অর্থনীতি, সমালোচনা প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ের প্রসঙ্গ লিপিবদ্ধ হওয়ায় পত্রিকাখানি সর্বাঙ্গসুন্দর ও সুখপাঠ্য হইয়াছে। স্বামী বিবেকানন্দ-প্রচারিত শিক্ষার আদর্শ ও উদ্দেশ্য—মানুষের অন্তর্নিহিত পূর্ণত্বের সম্যক্ বিকাশ-সাধন, দেহ-মন-হৃদয়-আত্মার সুসমঞ্জস স্ফূর্তি। ভারতের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণের জন্য তিনি প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের—বেদান্ত ও জড় বিজ্ঞানের, অধ্যাত্মবিদ্যা ও আভ্যুদয়িক জ্ঞানের মধুর সংমিশ্রণ ও সমন্বয়সাধন চাহিয়াছিলেন। প্রতীচ্যের বৈজ্ঞানিক শিক্ষাকে ভারতের ধর্মমূলক সনাতন শিক্ষাপদ্ধতির অধীন রাখিয়া পরিপূরকরূপে গ্রহণ করিলেই এদেশের শিক্ষা কল্যাণকরী ও নিখুঁত হইবে। রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির মুখ্যতঃ স্বামীজি-পরিকল্পিত শিক্ষাদর্শকে রূপদান করিবার জন্যই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বিদ্যামন্দিরের বিভিন্নমুখী শিক্ষা-প্রচেষ্টা বিদ্যার্থিগণের চরিত্রগঠন ও জীবিকা-সংস্থানের সহায়ক হইলেই আদর্শ-রূপায়ণের কার্য সাফল্যের দিকে অগ্রসর হইতেছে বুঝিতে হইবে। বিদ্যামন্দিরের 'বিচিত্রা'-বিভাগের মাধ্যমে বিবিধ আনন্দানুষ্ঠান, জাতীয় উৎসবপালন ও মহাপুরুষদের জন্মবার্ষিকী-উদ্‌যাপন, ছাত্রাবাসে ও বিদ্যায়তনে ধর্ম-নীতি-শিক্ষা, ব্যায়াম-অনুশীলন ও বিবিধ খেলাধূলা এবং বাহিরে আর্ত-সেবা ও স্বেচ্ছাসেবকের কার্য বিদ্যার্থিগণের চরিত্রগঠনে প্রভূত সহায়তা করিতেছে।

বিদ্যামন্দিরের অধ্যক্ষ-লিখিত 'ভারতের শিক্ষাদর্শ ও স্বামী বিবেকানন্দ'-নামীয় নবালোক-সম্পাতকারী প্রবন্ধটি এবং সম্পাদকীয় মন্তব্য ছাত্রসমাজ, শিক্ষাব্রতী ও শিক্ষা-পরিচালকদের অনুধাবনযোগ্য। ষোলখানি মনোরম চিত্র পত্রিকার অঙ্গসৌষ্ঠব বৃদ্ধি করিয়াছে। পত্রিকার মাধ্যমে ছাত্রসমাজে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভাবধারা ও ভারতের জাতীয় শিক্ষাদর্শের বহুল প্রচার হউক—ইহাই কামনা করি।

**ভূমিকা (Universal Religion and Philosoply)**—শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বাক্‌চি-প্রণীত। গ্রন্থকার-কর্তৃক শান্তিপুর, কাশ্যপ-পাড়া হইতে প্রকাশিত। প্রাপ্তিস্থান—(১) মহেশ লাইব্রেরী—২।১ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা, (২) সাধন-সমর কার্যালয়, মুক্তারাম বাবু ষ্ট্রীট, কলিকাতা। পৃষ্ঠা—৭০; মূল্য এক টাকা।

গ্রন্থকার এই পুস্তিকায় সনাতন হিন্দুধর্মের ভিত্তি যে যথার্থই সার্বভৌম ও বৈজ্ঞানিক ইহা প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। আলোচনায় লেখকের জ্ঞানের গভীরতা ও প্রসারের পরিচয় পাওয়া যায়। ধর্ম ও দর্শন-সম্বন্ধীয় লেখা ভুল-ভ্রান্তিশূন্য হওয়া বাঞ্ছনীয়। পুস্তিকার বহু স্থানে বর্ণাশুদ্ধি আছে। জ্ঞানার্থী পাঠক ইহা পাঠ করিয়া উপকৃত হইবেন।

শ্রীরমণীকুমার দত্তগুপ্ত, বি-এল্

# শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

**যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সপ্তদশাধিকশততম জন্মতিথি-উৎসব**—গত ১৪ই ফাল্গুন বুধবার বিভিন্ন মঠ আশ্রম প্রভৃতিতে যথাবিধি অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এই উপলক্ষে বিশেষ পূজা হোম পাঠ ভজন প্রসাদ-বিতরণ এবং আলোচনাদি সকল প্রতিষ্ঠানেরই সাধারণ কার্যক্রম ছিল। পশ্চিমবঙ্গ-সরকার এই দিন সরকারী অফিসগুলির অর্ধদিবস ছুটি ঘোষণা করেন।

**বেলুড় মঠে**—এই দিন অপরাহ্ণে মঠ-প্রাঙ্গণে এক জনসভার অধিবেশন হয়। ইহাতে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের ভাইস প্রেসিডেণ্ট শ্রীমৎ স্বামী বিশুদ্ধানন্দজী মহারাজ সভাপতির আসনে অধিষ্ঠিত হন। তাঁহার মনোজ্ঞ অভিভাষণের পর স্বামী অবিনাশানন্দজী ও শ্রীকুমুদবন্ধু সেন শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বিভিন্ন দিক্-সম্বন্ধে হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা দেন।

এই দিন রাত্রে কালীপূজা হয় এবং ২৫ জন সন্ন্যাস ও ২১ জন ব্রহ্মচর্যব্রতে দীক্ষিত হন।

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব-উপলক্ষে গত ১৮ই ফাল্গুন রবিবার বেলুড় মঠে বিরাট জন-উৎসব ও মেলা অনুষ্ঠিত হয়।

এই দিন মন্দিরের পূর্ব-প্রাঙ্গণে নির্মিত একটি মণ্ডপে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের একখানি বৃহৎ প্রতিকৃতি পত্র-পুষ্পশোভিত করিয়া রাখা হইয়াছিল। সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত স্থানে স্থানে ভজন ও কীর্তনাদি চলিয়াছিল।

উৎসবের অন্যতম প্রধান আকর্ষণ ছিল শ্রীশ্রীঠাকুরের ব্যবহৃত দ্রব্যাদির প্রদর্শনী। তাঁহার বস্ত্র বিছানা খড়ম প্রভৃতি প্রদর্শনীতে স্থান পায়। সহস্র সহস্র নরনারী শ্রীশ্রীঠাকুরের পবিত্র স্মৃতিজড়িত এই দ্রব্যগুলি দর্শন করিয়া তাঁহার উদ্দেশে অন্তরের শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করেন।

এই আনন্দোৎসবে বিস্তীর্ণ বেলুড় মঠ জনাকীর্ণ হয়। যাত্রি-সাধারণের সুবিধার জন্য বহুসংখ্যক সরকারী এবং বে-সরকারী অতিরিক্ত যান-চলাচলের ব্যবস্থা ছিল। তৎসত্ত্বেও অসংখ্য নরনারী ঐগুলিতে স্থানসংগ্রহ করিতে পারেন নাই। গঙ্গাঘাটে কয়েক শত নৌকা যাত্রি-পারাপারে নিযুক্ত ছিল।

সারাদিন লাউড স্পীকারযোগে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনী ও বাণীপ্রচার, ভজন এবং ধর্মগ্রন্থ-পাঠের এক মনোজ্ঞ কর্মসূচী অবলম্বিত হয়। ভারতের বিভিন্ন স্থানের শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারিগণ গীতা, বৈদিক স্তোত্র, ধম্মপদ, বাইবেল, জেন্দাবেস্তা, কোরান, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাপ্রসঙ্গ এবং শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত পাঠ করেন। ইহা ছাড়া তামিল, মালয়ালম্, তেলেগু, মারাঠী গুজরাটী, বাঙ্গলা, ইংরেজী এবং হিন্দী ভাষায় শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনী ও বাণী-সম্বন্ধে আলোচনা হয়।

সমস্ত দিন মাঝে মাঝে সানাইয়ের সুমধুর সুর, কীর্তন ও ভজন অগণিত জনচিত্তে নির্মল আনন্দ সৃষ্টি করে। এই উপলক্ষে মঠ-কর্তৃপক্ষ সমবেত সহস্র সহস্র ভক্ত নরনারীকে প্রসাদ-বিতরণের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

জনতা-নিয়ন্ত্রণের জন্য ২৮টি প্রতিষ্ঠানের আটশতাধিক স্বেচ্ছাসেবক সর্বক্ষণ নিযুক্ত

ছিলেন। এতদ্ভিন্ন অতিরিক্ত পুলিশ এবং স্পেশাল কনষ্টেবল জনতা ও যানবাহন পরিচালন করেন।

সেণ্ট জন এম্বুলেন্স, ব্রিগেড এবং ভারতীয় রেডক্রশ, প্রাথমিক শুশ্রূষা-কেন্দ্র স্থাপন করেন। বিকালে, ভিড়ের চাপে সর্দিগর্মি ও অন্যান্য সামান্য দুর্ঘটনায় অসুস্থ প্রায় ত্রিশ জনকে প্রাথমিক চিকিৎসা করা হয়।

ভিড়ে প্রায় পঞ্চাশ জন নিখোঁজ হইলে স্বেচ্ছাসেবক ও পুলিশের সহায়তায় তাহাদিগকে আত্মীয়স্বজনের নিকট ফিরাইয়া দেওয়া হয়।

**মাদ্রাজ শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে**—গত ১৪ই ফাল্গুন সন্ধ্যায় আরাত্রিকের পর স্বামী শুদ্ধসত্ত্বানন্দজী শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সর্বধর্মসমন্বয়-সম্বন্ধে হৃদয়গ্রাহী আলোচনা এবং কথামৃতের ইংরেজী অনুবাদ ব্যাখ্যা করেন।

১৮ই ফাল্গুন সাধারণ উৎসবে শ্রীপাণ্ডুরঙ্গ ভাগবতার তামিল ভাষায় শ্রীরামকৃষ্ণলীলা-কীর্তন করেন। অপরাহ্নে স্যার আলাডি কৃষ্ণস্বামী আয়ারের সভাপতিত্বে আহূত এক জনসভায় তামিল তেলেগু ও ইংরেজী ভাষায় শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনের বিভিন্ন দিক্-সম্বন্ধে মনোজ্ঞ বক্তৃতা প্রদত্ত হইলে রাও বাহাদুর রামানুজাচারী কর্তৃক ধন্যবাদ প্রদানানন্তর সভার কার্য শেষ হয়। ইহাতে সহস্রাধিক শ্রোতা উপস্থিত ছিলেন।

**রাঁচি শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে**—গত ১৪ই ফাল্গুন অপরাহ্নে স্বামী শান্তানন্দজীর পৌরোহিত্যে আহূত এক জনসভায় স্বামী সর্বস্থানন্দজী ও শ্রীরমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ-সম্বন্ধে চিত্তাকর্ষক আলোচনা করিয়াছেন।

**কামারপুকুর রামকৃষ্ণ মিশনে**—গত ১৪ই ফাল্গুন অপরাহ্নে এক সভায় শ্রীধীরেন্দ্রনাথ দাস, শ্রীরমেশচন্দ্র বিশ্বাস, শ্রীরবীন্দ্রনাথ দাস ও স্বামী গদাধরানন্দজী ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবন ও উপদেশ-সম্বন্ধে মনোজ্ঞ বক্তৃতাদান করিয়াছেন।

**রামকৃষ্ণ মিশন নিবেদিতা বিদ্যালয়ে পুরস্কারবিতরণী সভা**—গত ১৬ই ফাল্গুন অপরাহ্নে এই প্রতিষ্ঠানে মাধ্যমিক শিক্ষা-পরিষদের সভাপতি শ্রীঅপূর্বকুমার চন্দের সভাপতিত্বে আহূত সভায় ভূতপূর্ব রাজ্যপালের কন্যা শ্রীসুভদ্রা হাক্সার পুরস্কার-বিতরণ করেন। সমবেত বেদপাঠ দ্বারা মঙ্গলাচরণ করা হইলে সম্পাদিকার বিবরণী পঠিত হয়। সভাপতি বিদ্যালয় ও ইহার প্রতিষ্ঠাত্রীর উদ্দেশে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করিয়া জনসাধারণকে বিদ্যালয়ের উন্নতি-সাধনের জন্য সহযোগিতা ও সাহায্য করিতে অনুরোধ করেন।

অতঃপর প্রাথমিক বিভাগের শিশুগণ নানাবিধ নৃত্যগীত ও শিশু-নাট্য এবং মাধ্যমিক বিভাগের বালিকাগণ 'অবাক জলপান' নামে একটি কৌতুক-নাট্য ও 'গৈরিক পতাকা' হইতে কয়েকটি দৃশ্য অভিনয় করে। দশম শ্রেণীর একটি ছাত্রীর দশাবতার-স্তোত্র-আবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন মুদ্রার সাহায্যে নৃত্য সকলেরই উপভোগ্য হইয়াছিল। বিদ্যালয়ের কার্য-নির্বাহক সভার সভাপতি শ্রীনিবারণচন্দ্র ঘোষ ধন্যবাদ-জ্ঞাপন করেন। তিনি বিদ্যালয়ের সকল বিষয়ে পারদর্শী ছাত্রীর জন্য ২০৲ টাকা এবং শ্রীঅমূল্যকৃষ্ণ ভড় বিভিন্ন শ্রেণীতে রন্ধন পারদর্শিতার জন্য ২০৲ টাকা পুরস্কার দেন।

**রাঁচি রামকৃষ্ণ মিশন যক্ষ্মা-নিবাসের প্রথমবার্ষিক সভা**—গত ১৩ই মাঘ ইষ্টার্ন কমাণ্ডের ডেপুটি ডিরেক্টর জেনারেল মেজর-জেনারেল শ্রী বি আর ট্যাণ্ডনের সভাপতিত্বে এই নিবাসের প্রথমবার্ষিক সভা আহূত হয়।

ইহাতে স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ যোগদান করেন। সম্পাদক স্বামী বেদান্তানন্দজী এই প্রতিষ্ঠানের সংক্ষিপ্ত বিবৃতিদান-প্রসঙ্গে বলেন, গত বৎসর ২৮ জন রোগীকে জেনারেল ওয়ার্ডে, ৭ জনকে স্পেশাল ওয়ার্ডে এবং ৫ জনকে কটেজে স্থান দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। ২৪৮ জন রোগী এখানে ভর্তি হইবার জন্ত আবেদন করিয়াছিলেন। সম্প্রতি দীঘা-ঘাট পাটনার বাটাকর্মী যক্ষ্মানিবারণী সমিতির অর্থানুকূল্যে একটি ডবল বেড্ কটেজ নির্মিত হইয়াছে। এই বর্ষে ১১ জন রোগীর চিকিৎসার সম্পূর্ণ ব্যয় এবং অপর ৬ জনের আংশিক ব্যয় বহন করা হইয়াছে। কতিপয় বহিরাগত রোগীও এখানে ডাক্তারের পরামর্শ ও এ-পি পি-পি-চিকিৎসা গ্রহণ করেন। একটি বহির্বিভাগ-স্থাপনের চেষ্টা করা হইতেছে। অর্থাভাবে রোগমুক্ত যক্ষ্মারোগিগণের উপনিবেশ-স্থাপনের পরিকল্পনা এ পর্যন্ত কার্যকরী হয় নাই। তথাপি অন্যান্ত হাসপাতাল হইতে আগত ৭জন রোগমুক্ত যক্ষ্মারোগীকে আশ্রয় দেওয়া হইয়াছে।

এই স্বাস্থ্যনিবাসে একটি এডমিনিষ্ট্রেটিভ ব্লক্ নিতান্ত আবশ্যক। বর্তমানে অপারেশন থিয়েটার, লেবরেটরী, ডিস্পেন্সারী, এক্সরে, বৈদ্যুতিক চিকিৎসাগার এবং অফিস স্থানাভাবের জন্ত ছোট ছোট ঘরে পরিচালিত হইতেছে। অধুনা অপারেশন থিয়েটারের নির্মাণকার্য আরম্ভ হইয়াছে। স্ত্রী-রোগীদিগের জন্ত একটি বিশেষ ওয়ার্ড থাকাও আবশ্যক। এবার বহু রোগীকে স্থান দেওয়া সম্ভব হয় নাই। ডাক্তার এবং নার্সদের জন্ত বাসস্থান এবং অন্ততঃ আরও একটি সাধারণ ওয়ার্ড-স্থাপন অত্যন্ত আবশ্যক।

বিবৃতি-পাঠের পর রাঁচি গভর্নমেণ্ট কলেজের হিন্দী-বিভাগের প্রধান অধ্যাপক শ্রী এন কে গৌড় হিন্দীতে এবং ডাক্তার যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায় বাংলায় বক্তৃতা করেন। উভয়ে স্বামী বিবেকানন্দের ত্যাগ ও সেবার মহান্ আদর্শ-অনুসরণ করিতে বলেন।

সভাপতি মেজর-জেনারেল ট্যাণ্ডন বলেন, স্বাধীন ভারতে এইরূপ সেবা-প্রতিষ্ঠান গড়িবার বিশেষ সুযোগ রহিয়াছে এবং এই সকল প্রতিষ্ঠানের দ্বারাই স্বামীজির ভবিষ্যৎ ভারতের স্বপ্ন সফল হইবে।

**লণ্ডন রামকৃষ্ণ বেদান্ত-কেন্দ্র**—এই প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে অধ্যক্ষ স্বামী ঘনানন্দজী কিংসওয়ে হলে গত জানুয়ারী ফেব্রুয়ারী ও মার্চ মাসত্রয়ে প্রতি বৃহস্পতিবার নিম্নলিখিত বিষয়গুলি-সম্বন্ধে বক্তৃতা-প্রদান করিয়াছেন: (১) 'সৃষ্টি-বিজ্ঞান', (২) 'বেদান্ত-মনস্তত্ত্ব ও অদ্বৈতমার্গ', (৩) 'বেদান্ত-মনস্তত্ত্ব ও ভক্তিমার্গ', (৪) 'কার্যকর বেদান্ত', (৫) 'যোগসাধন', (৬) 'কার্যকর আধ্যাত্মিকতা-সম্বন্ধে নির্দেশ', (৭) 'আধ্যাত্মিক জীবন ও অনুভূতি', (৮) 'ব্রহ্মাণ্ড', (৯) 'ক্ষুদ্র-জগৎ'। এতদ্ব্যতীত প্রতি মঙ্গলবার গীতা, ধ্যানযোগ ও সাধারণ ধর্মোপদেশ ব্যাখ্যাত হইয়াছে। গত ৪ঠা মার্চ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্ম-বার্ষিকী উপলক্ষে এক সভা আহূত হইয়াছিল। এই কেন্দ্র হইতে প্রতিমাসে একটি 'বেদান্ত বুলেটিন্' প্রকাশিত হইতেছে।

# বিবিধ সংবাদ

**ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সপ্তদশাধিক-শততম জন্মোৎসব**—নিম্নলিখিত প্রতিষ্ঠানে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। বিশেষ পূজা হোম পাঠ ভজন প্রসাদ-বিতরণ প্রভৃতি সকল প্রতিষ্ঠানেরই সাধারণ কার্যক্রম ছিল।

**হুগলী শহরে**—গত ১৪ই ফাল্গুন হইতে ১৮ই ফাল্গুন পর্যন্ত ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শুভ জন্মোৎসব হুগলী বাবুগঞ্জ শ্রীরামকৃষ্ণ পার্কে অনুষ্ঠিত হয়। দ্বিতীয় দিবস সন্ধ্যায় স্বামী সুন্দরানন্দজীর সভাপতিত্বে এক সভা আহূত হইয়াছিল। ইহাতে প্রায় তিন-চার সহস্র ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয় উপস্থিত ছিলেন। শহরের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে মহারাজজীকে মাল্য ও স্তবক-প্রদান করা হইলে ইটাচুনা হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীপ্রতুল চৌধুরী শ্রীশ্রীমায়ের জীবন-সম্বন্ধে আলোচনা করেন। পরে সভাপতির অভিভাষণান্তে সভার কার্য শেষ হয়। তৃতীয় দিবস সন্ধ্যায় হুগলীর জেলা জজ শ্রীরেবতীমোহন চট্টোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে এক সভা হয়। চতুর্থ দিবস অপরাহ্নে স্থানীয় কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের, স্থানীয় হাইস্কুলের ছাত্রদের স্বামীজির এবং ছাত্রীদের শ্রীশ্রীমায়ের সম্বন্ধে রচনাপ্রতিযোগিতা-সভায় হুগলী জেলাশাসক ডক্টর অবনীভূষণ রুদ্র মহাশয় সভাপতিত্ব করেন। পঞ্চম দিনে দরিদ্র-নারায়ণ-সেবা হইলে উৎসব-কার্য শেষ হয়।

**সালেপুর (হুগলী) রামকৃষ্ণ-যুবসংঘে**—ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব উপলক্ষে এই প্রতিষ্ঠানে গত ১৪ই ফাল্গুন দ্বিপ্রহরে দরিদ্র-নারায়ণ-সেবা হইয়াছে।

**আমেদাবাদ শ্রীবিবেকানন্দ-মণ্ডলী পাঠ-চক্রে**—গত ১৮ই ফাল্গুন স্থানীয় উদিচ্নী বাড়ীতে সন্ধ্যায় শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মজয়ন্তী-উৎসব উদ্‌যাপিত হইয়াছে। এই উপলক্ষে আহূত সভায় বেদমন্ত্র ও বৈদিক প্রার্থনা, প্রবচন, নামধুন অন্তে স্বামী কেবলানন্দজী ও শ্রীকৃপাশঙ্কর পণ্ডিত শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের সাধনা এবং লোকশিক্ষা-বিষয়ে মনোজ্ঞ বক্তৃতা দিয়াছেন।

**আজমীর শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে**—গত ১৪ই ফাল্গুন স্থানীয় টাউন হলে চিফ্ কমিশনার শ্রীএ ভি পণ্ডিত, আই-সি-এস্ সভাপতির আসন গ্রহণ করিলে সহকারী সম্পাদক শ্রীবিষ্ণুপ্রসাদ মেহতা আশ্রমের কার্য-বিবরণী পাঠ করেন। পরে শ্রীরামনারায়ণ চৌধুরী, স্বামী আদিভবানন্দজী ও সভাপতি হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা দেন।

**প্রাচ্যবাণী-মন্দিরে মহিলা-সভা**—কিছু দিন হয় প্রাচ্যবাণী-মন্দিরে অনুষ্ঠিত এক মহিলা-সভায় সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নলিখিত প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে:

(১) পশ্চিমবঙ্গের নারীশিক্ষা-নিকেতন-সমূহের অধ্যক্ষা, অধ্যাপিকা ও অন্যান্য শিক্ষা-ব্রতিনীদিগের এই সভা বঙ্গদেশে এবং ভারতের অন্যান্য সমস্ত রাজ্যে স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষায় সংস্কৃত অবশ্যপাঠ্যরূপে গ্রহণের নিমিত্ত বিশেষ আবেদন জানাইতেছে।

(২) এই সভা সংস্কৃতভাষা ও সাহিত্যের প্রচার ও প্রসারের নিমিত্ত যথাবিহিত উপায়-নির্ধারণের জন্য অনুরোধ করিতেছে।

লেডী ব্রেবোর্ন কলেজের অধ্যক্ষা ডক্টর রমা চৌধুরী, ভিক্টোরিয়া ইন্‌স্টিটিউশনের অধ্যক্ষা শ্রীসুপ্রভা চৌধুরী, গোখলে মেমোরিয়াল কলেজের

অধ্যক্ষা শ্রীরাণী ঘোষ, হুগলী উইমেন্স কলেজের অধ্যক্ষা শ্রীশান্তিসুধা ঘোষ, সাউথ কলিকাতা গার্লস কলেজের অধ্যক্ষা শ্রীনির্মলা সিংহ, সুরেন্দ্রনাথ কলেজের উপাধ্যক্ষা শ্রীমীরা দত্তগুপ্তা, উইমেন্স ক্রিশ্চিয়ান কলেজের অধ্যক্ষা ষ্টেলা বসু, উইমেন্স কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীধীরেন্দ্রলাল দে, মুরলীধর কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীনলিনীমোহন শাস্ত্রী, বিভিন্ন কলেজের অধ্যাপিকা ও স্কুলের শিক্ষয়িত্রীগণ উপরি-লিখিত প্রস্তাব সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করেন।

বক্তৃগণ বিভিন্ন দিক হইতে সংস্কৃতের বিশেষ উৎকর্ষ এবং জাতীয় ও ব্যক্তিগত জীবনে ইহার বিশেস প্রয়োজনীয়তা আলোচনা করিয়া সিদ্ধান্ত করেন যে, জীবনের প্রথম শিক্ষাপর্বে সংস্কৃতের অনুশীলন না হইলে ভারতীয় শিক্ষাপদ্ধতি জাতীয় জীবনের উপযোগী হইতেই পারে না। সংস্কৃত-ভাষা যাহাতে সুন্দরতর, সুষ্ঠুতরভাবে স্কুলে শিক্ষা দেওয়া হয় তদ্বিষয়েও দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়।

বক্তৃমণ্ডলী এ বিষয়ে সকলেই একমত যে, সংস্কৃতের অনুশীলন ব্যতীত ভারতীয় রাজ্যের যে কোনও ভাষা, বিশেষতঃ বঙ্গদেশে বঙ্গভাষায় কোনও সুস্পষ্ট ধারণা একেবারে সম্ভবপর নহে, হিন্দীভাষা সম্বন্ধেও একই যুক্তি প্রযোজ্য। তজ্জন্য সংস্কৃতকে অনিবার্য পাঠ্যরূপে নির্বাচন করিতেই হইবে।

প্রধান অতিথি শ্রীরাধারাণী দেবী বলেন যে, পাশ্চাত্যের সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা আছে এবং সংস্কৃতের পরিচয়ই ভারতের বিশেষ পরিচয়।

শ্রীযুক্তা সুনীতিবালা গুপ্তা জাতীয় জীবনের সর্বদিক হইতেই সংস্কৃতের অত্যাবশ্যকতা প্রাণস্পর্শী ভাবে বুঝাইয়া বলেন।

এই সভায় বঙ্গদেশের লব্ধপ্রতিষ্ঠ বহু শিক্ষা-ব্রতিনী, বিশিষ্ট পণ্ডিতগণ ও অন্যান্য সুধীমণ্ডলী উপস্থিত ছিলেন। সভার প্রারম্ভে মঙ্গলাচরণ ও অন্তে শান্তিপাঠ করেন লেডী ব্রেবোর্ন কলেজের ছাত্রী শ্রীসুনন্দা মুখোপাধ্যায়, শমিতা মুখোপাধ্যায় ও স্বপনা দাশ।

---

# আবেদন

## গদাধর আশ্রম, ভবানীপুর, কলিকাতা

বেলুড় মঠের অন্তর্গত এই প্রতিষ্ঠানটিতে অনেক দিন যাবৎ ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নিত্য-পূজা, বিবিধ উৎসব, শাস্ত্রপাঠ, ভজন প্রভৃতি অনুষ্ঠিত এবং শাস্ত্রাদি-অনুশীলনের জন্য একটি বেদবিদ্যালয় ও উচ্চাঙ্গের একটি গ্রন্থাগার পরিচালিত হইতেছে। এই বিদ্যালয় হইতে অনেক বিদ্যার্থী কাব্য ব্যাকরণ ও দর্শনাদিতে অভিজ্ঞ হইয়াছেন এবং হইতেছেন। ন্যূনাধিক নব্বই বৎসর পূর্বে নির্মিত এই জনহিতকর আশ্রমবাটীর আশু সংস্কার একান্ত প্রয়োজন। এজন্য দশ হাজার টাকা আবশ্যক। আমরা এ বিষয়ে ধনবান ভক্তবৃন্দ ও ধর্মপ্রাণ বদান্য ব্যক্তিগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

এই উদ্দেশ্যে কোন প্রকার সাহায্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় সাদরে গৃহীত ও স্বীকৃত হইবে :

(১) সাধারণ সম্পাদক, বেলুড় মঠ, বেলুড় মঠ পোঃ (হাওড়া) (২) গদাধর আশ্রম, ৮৬এ, হরিশ চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট, ভবানীপুর, কলিকাতা—২৫

বিনীত—

৮. ৩. ৫২. স্বামী ব্রহ্মেশ্বরানন্দ

অধ্যক্ষ, গদাধর আশ্রম

# প্রার্থনা

আ ব্রহ্মন্ ব্রাহ্মণো ব্রহ্মবর্চসী জায়তামা রাষ্ট্রে
রাজন্যঃ শূর ইষব্যোহতিব্যাধী মহারথো জায়তাং
দোগ্ধ্রী ধেনুর্বোঢ়ানড্বানাশুঃ সপ্তিঃ পুরন্ধির্যোষা
জিষ্ণূ রথেষ্ঠাঃ সভেয়ো যুবাস্য যজমানস্য বীরো
জায়তাং নিকামে নিকামে নঃ পর্জন্যো বর্ষতু
ফলবত্যো ন ওষধয়ঃ পচ্যন্তাং
যোগক্ষেমো নঃ কল্পতাম্॥

শুক্লযজুর্বেদ, ২২।২২

হে পরমাত্মন্, আমাদের রাষ্ট্রে ধর্মনিষ্ঠ পুরুষগণের আবির্ভাব হউক জীবন যাঁহাদের জ্ঞানপ্রভায় সমুজ্জ্বল—দেশ যাঁহারা শাসন করিবেন তাঁহারা যেন হন মহাবীর্যসম্পন্ন নির্ভীক যুদ্ধ-বিশারদ—পয়স্বিনী গাভী এবং বলিষ্ঠ বৃষসমূহের প্রাচুর্যে আমাদের গো-সম্পদ যেন হয় সমৃদ্ধ—দ্রুতগামী তেজীয়ান অশ্বযূথ দ্বারা আমাদের অশ্বসম্পদ যেন থাকে অক্ষয়। আমাদের নারীগণ লাবণ্যবতী এবং সর্বগুণসম্পন্না হউন, যোদ্ধৃগণ হউন বিজয়ী, গৃহস্থগণ যেন হন বিদ্যা-গুণ-চরিত্রে সুযোগ্য বীরপুত্রের জনক। দেশে যেন কামনানুরূপ বৃষ্টির অভাব না ঘটে—ব্রীহিযবাদি শস্যনিচয় যেন হয় যথাসময়ে ফলপ্রসূ। উন্নতি এবং স্থিতির পথে আমাদের জাতি যেন অগ্রসর হইয়া চলে।

---

# বনের বেদান্ত ঘরে

ইহাই নাকি ছিল তাঁহার জীবন-স্বপ্ন।

কিন্তু অরণ্যচারী যতিগণ একান্ত নিভৃতে মুষ্টিমেয় অধিকারীর নিকট যাহা অনেক বিবেচনা করিয়া, অনেক রাখিয়া ঢাকিয়া প্রকাশ করিতেন—সংসারবিরাগী সন্ন্যাসিগণেরই কেবল যে রহস্য-বিদ্যায় অধিকার—সেই সূক্ষ্ম সুগোপ্য বেদান্ত-বিজ্ঞান ঘরে ঘরে ছড়াইয়া দেওয়া—আপামর জনসাধারণকে ডাকিয়া ডাকিয়া উপনিষৎ-প্রচারিত আত্মতত্ত্বের কথা শুনাইয়া যাওয়া—এত বড় একটা বিদ্রোহী কল্পনা স্বামী বিবেকানন্দকে পাইয়া বসিয়াছিল কেন? আবালবৃদ্ধবনিতা সকলকে নির্বিচারে নির্বাণের উপদেশ দিয়া ভগবান বুদ্ধের ধর্ম ভারতীয় জাতিকে দুর্বল করিয়া ফেলিয়াছে এই মন্তব্য করিতে যিনি ইতস্ততঃ করেন নাই সেই স্বামীজী কতিপয়ের জন্ম নির্দিষ্ট বেদান্ততত্ত্বকে সহস্র সহস্রের কাছে উপস্থাপিত করিতে চাহিয়াছিলেন কোন্ বিবেচনায়? তাঁহার বনের বেদান্ত ঘরে আনিবার স্বপ্নের পটভূমি কি ছিল ভগবান বুদ্ধের মত ত্রিতাপ-ক্লিষ্ট নরনারীর প্রতি গভীর বেদনা-অনুভব? মানুষকে পরমপুরুষার্থ মুক্তির আলোক দেখাইতেই কি স্বামীজী ব্যাকুল হইয়াছিলেন? সেক্ষেত্রে তিনি আত্মজ্ঞানের অধিকারিবিচারের কথা ভুলিয়া গিয়াছিলেন কি? বনের বেদান্তকে ঘরে আনিলে উহা ঘরকে সমৃদ্ধ করিবে তাঁহার এই বিশ্বাসের ভিত্তি ছিল কোথায়? অযোগ্য দুর্বল হাতে পড়িয়া শক্তিশালী অস্ত্র দারুণ অনর্থও যে ঘটাইতে পারে স্বামীজী কি ইহা ভাবিয়া দেখেন নাই?

যে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের চরণতলে বসিয়া তিনি শিক্ষাদীক্ষা লাভ করিয়াছিলেন তাঁহার প্রাধানতম বাণী ছিল—ঈশ্বরলাভই মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য। সন্ন্যাসী বিবেকানন্দও যে এই নিঃশ্রেয়সের বার্তা প্রচার করিবেন ইহা স্বাভাবিকই। দেশ-প্রেমিক বিবেকানন্দ, জাতীয়মন্ত্রের উদ্গাতা নেতা ও সংগঠক বিবেকানন্দ, কবি-শিল্পি-দার্শনিক-বক্তা বিবেকানন্দ—স্বামীজীর বহুমুখী ব্যক্তিত্বের এই সকল দিক্ আমাদের চিত্তকে অভিভূত করিলেও তাঁহার চরিত্রের মূল বৈশিষ্ট্য যে তাঁহার অনন্যসাধারণ আধ্যাত্মিক তত্ত্বজ্ঞানে, তাহা জোর করিয়াই বলিতে পারা যায়। সত্যলাভ করিবার জন্ম কী আগ্রহই না শ্রীরামকৃষ্ণদেব যুবক নরেন্দ্রের মধ্যে লক্ষ্য করিয়াছিলেন! গুরুকৃপা এবং কঠোর সাধনা দ্বারা অধ্যাত্ম-সত্যকে করা-মলকবৎ প্রত্যক্ষ করিয়া তিনি নিজে যে কৃতার্থতা লাভ করিয়াছিলেন তাঁহার উদার সহানুভূতিসম্পন্ন হৃদয় উহা বিশ্বের আত্যন্তিক শান্তিকামী অপরাপর সকলকেও বিলাইবার জন্ম যে উদ্‌গ্রীব হইবে ইহা তাঁহার গুরুও ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া গিয়াছিলেন। বলিয়াছিলেন, নরেন্দ্র শিক্ষা দেবে। বস্তুতঃ স্বামীজীর 'সন্ন্যাসীর গীতি' পড়িলে মনে হয় অজ্ঞানাচ্ছন্ন মানুষের হৃদয়ে তত্ত্বদীপালোক জ্বালিয়া দিবার প্রেরণাদানই ছিল তাঁহার জীবনের একমাত্র ব্রত—তিনি ভারতের প্রাচীন সন্ন্যাসিকুলেরই একজন একনিষ্ঠ বার্তাবহ ব্রহ্মবিদ্যানুশীলন এবং প্রচারই যাঁহার মুখ্য কাজ।

প্রশ্ন জাগে, মানুষের পারমার্থিক কল্যাণ-সাধনই স্বামীজীর জীবনের শ্রেষ্ঠ ব্রত মানিলে উহার সংসাধনের জন্ম তিনি বনের বেদান্তকে ঘরে আনিতে চাহিয়াছিলেন কোন্ অর্থে? পাত্রাপাত্র-

নির্বিচারে সকলকে বৈদান্তিক সন্ন্যাসী করিতে চাহিয়াছিলেন কি? ধর্মগুরু বিবেকানন্দের বাণী কি সংসার-ত্যাগের বাণী? না। উপনিষৎ-প্রতিপাদিত আত্মসত্যকে স্বামীজী একটি সীমাবদ্ধ ধর্মমতরূপে দেখেন নাই—দেখিয়াছিলেন সমগ্র মানবজাতির আধ্যাত্মিক আকাঙ্ক্ষার জীবনপ্রদ প্রতিষ্ঠারূপে। যিনি যে ধর্মসাধনাতেই ব্রতী থাকুন বেদান্তের পটভূমিকায় দাঁড়াইয়া উহাতে নিরত থাকিলে সাধনার পথ অনেক সহজ হইবে—ধর্মসাধনায় সঙ্কীর্ণতা, দুর্বলতা, অনেক কুসংস্কার, বিদ্বেষবুদ্ধি দূর হইবে, ইহাই ছিল স্বামীজীর বিশ্বাস। শারীরবিজ্ঞান, মনস্তত্ত্ব, অর্থনীতি প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক তথ্যগুলিকে যেমন দেশের, ধর্মের, জাতির গণ্ডীতে বাঁধিয়া রাখা যায় না—সকল মানুষেরই জীবনে কমবেশী যেমন উহা সমানভাবে প্রযোজ্য—বেদান্তবিজ্ঞানও সেইরূপ মানুষের সাধারণ প্রকৃতির একটি বিজ্ঞানবিশেষ যাহার সহিত পরিচিত হইলে সকলদেশের, সকলধর্মের সাধক-সাধিকা অপূর্ব আধ্যাত্মিক প্রেরণা পাইতে পারিবেন। এখানে সন্ন্যাসি-গৃহীর প্রশ্ন উঠে না—হিন্দু-মুসলমান-খ্রীষ্টানের তারতম্য রাখিবার প্রয়োজন হয় না। বেদান্ত মানুষের উন্নততম প্রকৃতির বিজ্ঞান। মানুষ যদি উচ্চতম লক্ষ্যে অগ্রসর হইতে চায় বেদান্ত দাঁড়াইবে তাহার পরম বন্ধুরূপে। এই পরমবন্ধুকে অরণ্যে লুকাইয়া রাখিবার প্রয়োজন আছে কি এই জ্ঞান-বিজ্ঞানের যুগে—যখন মানুষের উন্নত মনীষা এবং আবিষ্কার-স্পৃহা জগৎ ও জীবনের কোন ক্ষেত্রকেই আর তমসাবৃত রাখিতে চাহিতেছে না—যখন মানুষ সকল ক্ষেত্রের পূর্বসঞ্চিত জ্ঞানরাশিকে নূতন করিয়া সাজাইয়া, বিশ্লেষণ করিয়া, পরিবর্তন-পরিবর্ধন করিয়া নূতন নূতন বিজ্ঞানের কোঠায় উপনীত করিতেছে?

মানুষের ঈশ্বরবিশ্বাসের ভিত্তি কি, তাহার সুনীতি-পুণ্যাচরণ-উপাসনা-পারলৌকিকতা—তাহার শান্তি - কামনা — বৈরাগ্য-মুক্তিস্পৃহার বনিয়াদ কোথায়—তাহার ধর্মজীবনের কতটুকু খাঁটি, কতটুকু মেকী—এই সকল প্রশ্নের বৈজ্ঞানিক আলোচনাকে এই যুগে আর ঠেকাইয়া রাখা সম্ভবপর নয়। "অতিপ্রশ্নান্ মা প্রাক্ষীঃ" বলিয়া এ যুগে কাহাকেও ধমক দেওয়া চলে না। যে দৃষ্টি অনন্ত আকাশে লক্ষ লক্ষ গ্রহ-তারকার দলে, সমুদ্রের অতল সীমায়, অণু-পরমাণুর নিবিড় রহস্যে নির্ভয়ে ছুটিয়া চলে—বিশ্বপ্রকৃতির আবরণের পর আবরণ উন্মোচন করিয়া জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিজয়-নিশান উড়াইয়া চলে—সে দৃষ্টি মন্দির, গির্জা, দেববিগ্রহ, জপমালা দেখিয়া এখন থমকাইয়া দাঁড়াইবে না। স্বামীজী বলিলেন—বেশ তো, তাহার পথ আটকাইও না—ধর্মের আঙ্গিনায় তাহাকে আসিতে দাও—কিন্তু ভয় পাইও না—যুক্তি ও বিজ্ঞানের সকল জিজ্ঞাসাকে খুশী করিবার পথ রহিয়াছে। পথ ধর্মের বিজ্ঞান—বেদান্ত। কিন্তু বনের একান্তে সে পথ যদি লুকাইয়া থাকে তাহা হইলে চলিবে কিরূপে? সে পথকে ঘরের পাশ দিয়া, মানুষের জীবনপ্রবাহের অতি কাছে কাছে স্থাপন করিতে হইবে। সে পথ দিয়া চলিবে না শুধু মুণ্ডিতশীর্ষ ভিক্ষা-পাত্রহস্ত শ্রমণের দল—চলিবে সকল দেশের, সকল বিশ্বাসের, সকল পর্যায়ের ধর্মসাধক—হিন্দু - মুসলমান - পারসিক - জৈন - বৌদ্ধ-খৃষ্টান—সন্ন্যাসি-গৃহী—পুরুষ আবার নারী। বেদান্তকে সীমাবদ্ধ একটি ধর্মমত-মাত্রে পর্যবসিত যদি না করিয়া ফেল, তাহা হইলে বৌদ্ধযুগের ব্যাপক-প্রচারিত নির্বাণমার্গের অনর্থের আশঙ্কা থাকিবে না।

ধর্মাচার্যরূপে স্বামীজীকে পূজা করিবার লোকের অপেক্ষা দেশ-প্রেমিক, লোকসেবক, কর্মী বিবেকা

নন্দকে শ্রদ্ধা মান দিবার মানুষের সংখ্যা কম নয়। ভারতীয় জাতির তিনি ঘুম ভাঙ্গাইয়াছিলেন—এই জাতির গৌরবময় ভবিষ্যৎসম্বন্ধে কতই না চিত্র আঁকিয়া গিয়াছিলেন। ঐ ভবিষ্যৎকে বাস্তবে পরিণত করিবার জন্ম তিনি দেশসেবকগণকে যে কর্মপন্থা দিয়া গিয়াছিলেন তাহারও ভিত্তি ছিল বেদান্ত। এখানেও তিনি বনের বেদান্তকে ঘরে আনিতে চাহিয়াছিলেন। আত্ম-বিশ্বাসহীন, হীনবোধ, তমোগুণাচ্ছন্ন জনগণকে আত্মার অভয়মন্ত্র শুনাইবার উদ্দেশ্য তাহাদিগকে 'তৎ-ত্বং' পদার্থের শোধন দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ করিয়া তোলা নয়—তাহাদিগের প্রাণে আশা, উৎসাহ, কর্মশক্তি, উন্নতিস্পৃহা উদ্বুদ্ধ করা। 'তুই হীন, তুই অস্পৃশ্য, তুই দুর্বল' শতাব্দীর পর শতাব্দী এই ধিক্কার শুনিয়া যাহারা মৃতপ্রায় হইয়া রহিয়াছে—'তোর ভিতর অনন্তশক্তি লুকাইয়া আছে, তুই মহাতেজা, তুই ব্রহ্ম' এই অগ্নিবাণী শুনাইলে তাহারা যে নবপ্রাণ লাভ করিবে ইহাতে স্বামীজীর সন্দেহ ছিল না। শ্রদ্ধার শক্তি, বিশ্বাসের শক্তি, আশা ও উৎসাহের শক্তি অপরিসীম ইহা তিনি নিজের চোখে আমেরিকায় দেখিয়া-ছিলেন। দেশ হইতে বিতাড়িত, লাঞ্ছিত, ভীত আইরিস উদ্বাস্তুগণ স্বাধীনতা-সাম্য-মৈত্রীর মুক্তবাতাসে আসিয়া কয়েক মাসের মধ্যেই কিরূপ বুক ফুলাইয়া চলে—কিরূপ আশা-আনন্দ-কর্মতৎপরতায় তাহাদের দেহ-মন উচ্ছল হইয়া উঠে দেখিয়া স্বামীজী স্তম্ভিত হইয়াছিলেন। ভাবিয়াছিলেন যাহারা নিছক জড়বাদী, মানুষের চৈতন্যসত্তা-সম্বন্ধে যাহাদের কোন ধারণাই নাই তাহারা যদি সমাজের, শিক্ষার, কর্মজীবনের উদারতা ও সাম্য প্রচার করিয়া মানুষকে এতটা আগাইয়া দিতে পারে, তাহা হইলে সর্বভূতস্থিত সর্বশক্তিমান চেতন পরমাত্মাকে যাহারা বিশ্বাস করিবে তাহারা সেই বিশ্বাসের দৃষ্টিতে মানুষকে দেখিলে মানুষের অগ্রগতির সম্ভাবনা আরও কতই না বাড়িয়া যাইবার কথা। প্রহেলিকা লাগিতেছিল, আব্রহ্মস্তম্ব পর্যন্ত এক সমরস চৈতন্যসত্তা বিদ্যমান—জীবে জগতে, জীবে জীবে প্রভেদ মহাভ্রম— উপনিষদের এই চরমসিদ্ধান্ত যে দেশে আবিষ্কৃত হইয়াছিল সে দেশের লোক মানুষে মানুষে এত পার্থক্য সৃষ্টি করিতেছে কি করিয়া—চৈতন্যবাদী জাতি এত দুর্বল, এত প্রাণহীন, এত তমসাচ্ছন্ন হইয়া পড়িল অদৃষ্টের কোন্ বিড়ম্বনায়? আত্মসত্য কোন্ গহ্বরে লুকাইয়া আছে? এই প্রহেলিকাকে স্বামী বিবেকানন্দ দূর করিতে চাহিলেন নূতন উপলব্ধিতে। তাই গড়িয়া উঠিল তাঁহার জীবন-স্বপ্ন—বনের বেদান্তকে ঘরে আনা। শুধু নিঃশ্রেয়সকামীকে নয়—অভ্যুদয়কামীকেও মানবাত্মার অনন্তশক্তি অনন্ত মহিমাতে উদ্বুদ্ধ করা। চৈতন্যই যদি মানুষের প্রকৃতস্বরূপ হয়, অমিত বল, জ্ঞান, আনন্দ যদি তাহার জন্মগত অধিকার হয় তাহা হইলে এই সত্যকে কতিপয় ভাগ্যবানের জন্ম পেটিকাবদ্ধ করিয়া রাখার কোন যুক্তি এই উদার সন্ন্যাসী খুঁজিয়া পাইলেন না। স্বামীজী অবশ্যই আশা করেন নাই সমাজের সকল স্তরের সকল লোকই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া বসিবে, কিন্তু 'তুমি ছোট নও, তোমার ভিতর ভগবান রহিয়াছেন, সকল মানুষই এক' এই কথা শুনাইলে লোকে পশুস্তর হইতে মানুষের স্তরে উঠিতে পারিবে এ বিষয়ে তাঁহার বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না। জাতির সংগঠনে এইটিই তো প্রথম কর্তব্য। ঘুমন্ত লোক জাগিলে তবে তো তাহারা চলিবে, যুদ্ধ করিবে, বিজয়লাভ করিবে। উপনিষদের অভয়বাণীর অপেক্ষা অধিকতর তেজঃপ্রদ জাগরণীমন্ত্র স্বামী বিবেকানন্দ খুঁজিয়া পান নাই।

তাই বনের বেদান্ত ঘরে আনিবার স্বপ্ন তিনি শুধু মানুষের পারমার্থিক সমস্যার সমাধানের জন্যই দেখেন নাই—প্রেমিক সন্ন্যাসীর হৃদয় বরং বেশী কাঁদিয়াছিল ঐহিক জীবনে সর্বহারাদের জন্য। যাঁহারা শিক্ষিত, সমাজের অগ্রণী, দেশসেবায় উৎসুক তাঁহাদের চিন্তা ও কর্মধারাকে স্বামীজী বেদান্তের সার্বভৌম দৃষ্টিতে দৃঢ়নিবদ্ধ করিবার উপদেশ দিয়াছিলেন। সর্বজীবে একত্ববোধ, উচ্চাবচ সকলের মধ্যে সাম্য উপলব্ধি প্রভৃতি বেদান্ত-সিদ্ধান্ত পুঁথির পৃষ্ঠায় অচল হইয়া না থাকিয়া মূর্খ, দরিদ্র, পীড়িত, আর্ত, পতিতের সেবার ভিতর দিয়া জীবন্ত হইয়া উঠুক ইহাই ছিল তাঁহার কল্পনা। সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক সাম্য বৈদান্তিক দৃষ্টি ছাড়াও দেশে দেশে নানাভাবে রূপপরিগ্রহ করিতেছে দেখিয়া স্বামীজীর বিশ্বাস ছিল মানুষ বুঝিতে না পারিলেও বৈদান্তিক সত্যেরই আভাস এই সকল মত ও আচরণে অভিব্যক্ত হইতেছে। সাম্য ও সহযোগিতার মূল উৎস ধরিতে পারিয়া মানুষ যদি কর্মে অগ্রসর হয় তাহা হইলে সেই কর্ম আরও কত সুন্দর ও কল্যাণকর হইবে। ভারতের দেশকর্মিগণকে তাঁহাদের জনসেবা বৈদান্তিক সত্যে প্রতিষ্ঠিত করিবার নির্দেশ সত্যই স্বামী বিবেকানন্দের অপূর্ব অবদান। এমন করিয়া অরণ্যের বেদান্ত ঘরে পূর্বে আর কখনও আসে নাই।

বস্তুর মধ্যে নিহিত শক্তি যখন প্রচ্ছন্ন থাকে তখন বস্তুর আকৃতি ও স্বভাব এক প্রকার দেখিতে পাই—আর সেই নিদ্রিত শক্তি যখন জাগিয়া উঠে তখন তাহার চেহারা ও কাজ হইয়া যায় সম্পূর্ণ আলাদা। বর্তমান যুগের মানুষ আণবিক শক্তির ক্ষেত্রে এ তথ্যের প্রত্যক্ষ পরিচয় লাভ করিয়াছে। মানবাত্মার ভিতর যে বীর্য, যে জ্ঞান-আনন্দ-পূর্ণতা নিহিত রহিয়াছে তাহার বিকাশ শুধু ধর্মে নয়—শিক্ষায়, সমাজে, সংস্কৃতিতে, শিল্পে, বিজ্ঞানে—মানুষের জীবনের বহুবিচিত্র ক্ষেত্রে সম্ভবপর ইহাই স্বামীজী-কথিত কর্মপরিণত বেদান্ত (Practical Vedanta)। বনের বেদান্ত ঘরে আনা বলিতে তিনি ইহাই বুঝিয়াছিলেন, তাঁহার এই জীবন-স্বপ্ন দেশে ও বিদেশে ধীরে ধীরে কি ভাবে সফল হইয়া উঠিতেছে স্বামীজী আজ স্থূলদেহে থাকিলে দেখিয়া নিশ্চিতই তৃপ্তিলাভ করিতেন।

---

# বুদ্ধবাণী

শ্রীশশাঙ্কশেখর চক্রবর্তী

আকুল জীবন তার যাহা ছিল রুদ্ধ এক দিন
আলোহীন পর্বত-কন্দরে,
সেই ক্ষীণ প্রস্রবণ নদীরূপে হয়ে যায় লীন
সীমাশূন্য অতল সাগরে।

মানব-জীবন-নদী জন্ম আর মৃত্যুতে গ্রথিত,
কালচক্রে হতেছে ঘূর্ণন;
নয়ন-সমক্ষে যাহা হেরি আজ হতেছে গঠিত,
কাল তাহা রবে না তেমন।

স্বর্গ মর্ত্য সব জেনো এই মহা চক্রের অধীন,
শান্তি আর শ্রান্তি কভু নাহি;
পরিবর্তনের লীলা বিশ্বমাঝে চলে নিশিদিন,
জন্ম আর মৃত্যু-পথ বাহি।

অতীতের গর্ভ হতে নিত্য জাগে এই বর্তমান,
আলো পায় অন্ধকার হতে;
আজ যাহা নাই হেথা, কাল তাহা পাবে নবপ্রাণ,
দেখা দিবে জগতের স্রোতে।

উন্নতি বা অবনতি ঘটে সদা কর্ম-অনুযায়ী,
প্রকটিত তাই কর্মফল,
তোমার অশান্তি-মূল তুমি শুধু, অন্য নহে দায়ী,
কর্মদোষে চোখে অশ্রুজল।

আছে পথ, আছে লক্ষ্য—চাও যদি সত্য চিরন্তন,
বাসনার কর তবে শেষ;
হিংসা হতে ক্ষান্ত হও, কাহারেও করো না বঞ্চন,
কর প্রাণে জ্ঞানের উন্মেষ।

মরুপথে ক্লান্ত পান্থ, দেখিতেছ শুধু মরুমায়া,
পাও নাই পিপাসার জল,
ফিরে এস ভ্রান্তি হতে, পাবে শান্তি-আনন্দের ছায়া,
পাবে মুক্তি পবিত্র নির্মল।

---

# ঠাকুর ও পুরুষকার

বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

মানুষ যুগে যুগে নানা রকমের বিঘ্ন-সঙ্কুল অভিযানে বেরিয়েছে। বেরিয়েছে তুষারাবৃত মেরুপ্রদেশের রহস্যকে আবিষ্কার করতে, বেরিয়েছে অভ্রভেদী পর্বতশিখরের কুয়াশাচ্ছন্ন সংবাদ জানতে, বেরিয়েছে তরঙ্গসঙ্কুল কূলহীন সমুদ্রের পারে নূতন দেশের সন্ধান পেতে। কিন্তু ঈশ্বরকে পাওয়ার জন্য যারা ত্যাগের ক্ষুরধার পথে বেরিয়ে পড়েছে তাদের নির্ভীকতার সঙ্গে আর কারও নির্ভীকতার তুলনা হয় না। তিনি আছেন—কিন্তু যুক্তির দ্বারা তাঁর অস্তিত্বকে প্রমাণ করবার কোন উপায় নেই। তাঁকে যারা খুঁজতে বেরিয়েছে তাদের একমাত্র অবলম্বন বিশ্বাস। অজানার বুকে ঝাঁপ দেবার ভিত্তি যেখানে বিশ্বাস ছাড়া আর-কিছু নেই সেখানে ঈশ্বরের অন্বেষণে বেরিয়ে পড়া যার তার কাজ নয়। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস কেটে যায় কিন্তু তাঁর দেখা নেই! কোথায় স্ত্রী, কোথায় পুত্র, কোথায় ঘর-সংসার! সুখের ডাঙা কত দূরে পড়ে আছে! যাঁকে পাওয়ার জন্য সর্বস্ব পেছনে রেখে কূলহীন সমুদ্রের বুকে তরী ভাসানোর এই দুরন্ত পাগ্‌লামি—তাঁর কাছ থেকে কোন সাড়াই পাওয়া যায় না। বিচ্ছেদ-বেদনা অসহনীয় হয়ে ওঠে। সাধকের আত্মহত্যা করতে ইচ্ছা হয়। কিন্তু যাঁকে দেখ্‌বার জন্য এই অভিযান—তাঁর দেখা না পেয়ে সংসারে ফেরার কথা ভাবতেই পারে না। ঈশ্বর পাওয়ার জন্য যুগে যুগে যারা অভিযানে বেরিয়েছে সমস্ত প্রিয় বস্তুকে পেছনে রেখে—তাদের কথা হোলো :

For we are bound where mariner has not yet dared to go, And we will risk the ship, ourselves and all.

( Whitman )

রবীন্দ্রনাথের ভাষায় :

আমার এই যাত্রা হল সুরু, এখন ওগো কর্ণধার<br>
তোমারে করি নমস্কার!<br>
এখন বাতাস ছুটুক্, তুফান উঠুক্ ফিরবো<br>
না গো আর<br>
তোমারে করি নমস্কার!

একটা বজ্রকঠোর দুর্জয় সংকল্প ব্যতীত ঈশ্বরকে কে কবে পেয়েছে? পাশ্চাত্ত্যের এক জন মনীষীর ভাষায় ঈশ্বর পাওয়ার জন্য দুঃখের পথে আত্মার এই অভিসার হচ্ছে The most audacious adventure that one can dare. শ্রীচৈতন্য, শ্রীরামকৃষ্ণ এঁদের কি লোকে পাগল বলে বিদ্রূপ করেনি? যাদের ইচ্ছাশক্তি দুর্বল, নিষ্ঠায় জোর নেই পরমহংসদেব তাদের বল্‌তেন ভ্যাদ্‌ভেদে, চিঁড়ের ফলার। যাদের কোন আঁট নেই, এক পা এগিয়ে গিয়ে দু'পা পিছিয়ে যায়—তারা চির কালই ঈশ্বর থেকে দূরে থাকবে।

সুকঠিন তপশ্চর্যা ছাড়া যাঁর কাছে পৌঁছানোর কোন উপায় নেই তাঁকে গুরুবাদের অথবা ভোগবাদের সহজ পথে পাওয়া যায়—একথা বিশ্বাস করা কঠিন। আমাদের দেশের শাস্ত্র-কারেরা আত্মসংযমের উপর বরাবরই জোর দিয়েছেন। অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য এবং অপরিগ্রহের আদর্শকে বর্জন করে ঈশ্বরে মন রাখা সম্ভব নয়—এই কথাই আমাদের দেশের

ঋষিদের কণ্ঠ থেকে যুগে যুগে উৎসারিত হয়েছে। পরীক্ষায় পাশ করাবার জন্ম Sanskrit made easy, Essentials of Grammar ইত্যাদির ব্যবস্থা আছে। সারা বছর আড্ডা দিয়েও ছাত্র যাতে সহজে পরীক্ষা-সাগর উত্তীর্ণ হতে পারে তার জন্ম বাজারে অনেক রকমের বই পাওয়া যায়। কোন রকমের বিধিনিষেধ না মেনে মাদুলির জোরে তিন দিনে রোগ সারানো যায় —এরকমের কথাও আমরা খবরের কাগজে বিজ্ঞাপনে পড়ে থাকি। ঈশ্বরকেও সহজে পাওয়ার ব্যবস্থাপত্র দেবার মতো আজকাল বিজ্ঞ লোকের অভাব নেই। কিন্তু সহজে যা হবার নয় তাকে সহজসাধ্য বলার কোন মানে হয় না। দীর্ঘকালের ব্যায়ামচর্চা ব্যতীত মল্লবীর হওয়া যেমন অসম্ভব, দীর্ঘকালের আত্মসংযম ব্যতীত ঈশ্বরকে পাওয়াও তেমনি অসম্ভব। ভগবানলাভের জন্ম যাত্রা শুরু করতে যারা ইচ্ছুক তাদের জাগতিক সব কিছুই এবং সর্বশেষে নিজেকে পর্যন্ত ত্যাগ করতেই হবে। এই ত্যাগের দুর্গম রাস্তাকে বরণ করে নেবার মতো মানুষ চিরকালই সংখ্যায় কম। এইজন্মই ঈশ্বরের অন্বেষণে বেরিয়ে পড়েছে—এরকমের লোকও চির দিনই সংখ্যায় কম। মায়া দৈবী এবং তাকে অতিক্রম করা কঠিন।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতের ১ম ভাগে আছে—"গুরু, বাবা ও কর্তা, এই তিন কথায় আমার গায়ে কাঁটা বেঁধে। আমি তাঁর ছেলে, চিরকাল বালক, আমি আবার 'বাবা' কি? ঈশ্বর কর্তা, আমি অকর্তা; তিনি যন্ত্রী, আমি যন্ত্র।" "আমার কোন শালা চেলা নেই। আমিই সকলের চেলা। সকলেই ঈশ্বরের ছেলে, সকলেই ঈশ্বরের দাস—আমিও ঈশ্বরের ছেলে, আমিও ঈশ্বরের দাস।"

ঠাকুর আসেন নি গুরুগিরি করতে, চেলার দল পুষ্ট করতে। তিনি জানতেন কানে মন্ত্র দেওয়া সহজ, ঈশ্বর পাওয়া কঠিন।

কবি হুইট্‌ম্যানের ( Walt Whitman ) Song of Myself-এ আছে:

Not I, not anyone else can travel the road for you, you must travel it for yourself.

আমার পক্ষে অথবা আর কারও পক্ষে তোমার হয়ে পথ চলা সম্ভব নয়, তোমাকে পথ চলতে হবে নিজেরই জোরে।

ধর্মসাধনার দুর্গম পথে চলার ব্যাপারে পুরুষকারের সার্থকতাকে ঠাকুর কখনও ছোট করে দেখেন নি। ঠাকুরের কথামৃতের ১ম ভাগে আছে:

"ঈশ্বর আছেন বলে বসে থাক্‌লে হবে না। যো সো ক'রে তাঁর কাছে যেতে হবে। নির্জনে তাঁকে ডাকো।...দিন কতক না হয় সব ত্যাগ করে তাঁকে এক্‌লা ডাকো।

"শুধু 'তিনি আছেন' বলে বসে থাক্‌লে কি হবে? হালদারপুকুরে বড়ো মাছ আছে। পুকুরের পাড়ে শুধু বসে থাকলে কি মাছ পাওয়া যায়? চার করো, চার ফেলো, গভীর জল থেকে মাছ আস্‌বে, আর জল নড়বে। তখন আনন্দ হবে।"

ঠাকুরের কণ্ঠে এখানে পুরুষকারেরই জয়গান। ঈশ্বরে বিশ্বাস থাকার এবং তাঁর শরণাগত হওয়ার প্রয়োজনকে তিনি ছোট করে দেখেছিলেন —এমন কথা বলা হচ্ছে না। তিনি বারংবার বলেছেন, 'তাঁতে বিশ্বাস থাকা আর শরণাগত হওয়া, এ দুটি দরকার।' কিন্তু সাধনের উপরেও তিনি খুব জোর দিয়েছিলেন। তিনি বল্‌তেন:

"মুখে বল্‌লেই জনক রাজা হওয়া যায় না। জনক রাজা হেঁটমুণ্ড হয়ে ঊর্ধ্বপদ করে কত তপস্যা করেছিলেন। তোমাদের হেঁটমুণ্ড বা

ঊর্ধ্বপদ হতে হবে না, কিন্তু সাধন চাই; নির্জনে বাস চাই। নির্জনে জ্ঞানলাভ, ভক্তিলাভ করে তবে গিয়ে সংসার করতে হয়।" এ হচ্ছে 'Made easy'-র যুগ। না লড়ে বীর এবং না পড়ে পণ্ডিত হবার যুগ। এই চালাকির যুগে ভগবান পাওয়ার রাস্তাকেও আমরা সহজ এবং আরামপ্রদ করবার তালে আছি, গুরুকরণের সহজ পথে আমরা ঈশ্বরকে দেখার আশা পোষণ করতে আরম্ভ করেছি, 'বৈরাগ্যসাধনে মুক্তি সে আমার নয়'—কবির এই বাণী কপচিয়ে ত্যাগের মূল্যকে উড়িয়ে দিতে চাচ্ছি। এসব লক্ষণ জাতির আধ্যাত্মিক জীবনের দুঃসময়ের লক্ষণ। হুঁশিয়ার হবার সময় এসেছে। ঠাকুর বলেছিলেন:

"বই, শাস্ত্র, এসব কেবল ঈশ্বরের কাছে পঁহুছিবার পথ বলে দেয়। পথ, উপায় জেনে লবার পর আর বই শাস্ত্রে কি দরকার? তখন নিজে কাজ করতে হয়।" হুইট্‌ম্যানের Leaves of Grass-এও আছে: Each man to himself and each woman to herself, is the word of the past and present, and the true word of immortatity;

No one can acquire for another
—not one,
No one can grow for another
—not one.

কেউ কারও হয়ে কিছু আহরণ করতে পারে না, কেউ কারও হয়ে কিছু করে দিতে পারে না—এই স্বাবলম্বনের বাণী হুইট্‌ম্যানের বাণী। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতের মধ্যেও স্বাবলম্বনের জয়গান শুনতে পাই। Leaves of Grass আর কথামৃত—পাশাপাশি রেখে পড়লে আশ্চর্য হয়ে যেতে হয় উভয়ের মিল দেখে।

---

# ভেঙে যদি যায়

শ্রীব্রহ্মানন্দ সেন

বেদনার ঘায়ে ভেঙে খান খান হলো কি বন্ধু তোমার হিয়া?
জান না কি সখা নির্ঝর বয় ধরণী বুকের ফাটল দিয়া?
হল-চালনায় ভূমি বিদারিলে তবেই তাহাতে ফসল আসে,
নির্মম প্রাণে দুগ্ধ মথিলে তবেই তাহাতে নবনী ভাসে।
বিধির বিধান মাথা পেতে নিয়ে বল তাই নমি দেবতা-পায়—
"হে দেব, দুখের কাঁটায় ভরেছ অন্তর মোর ক্ষতি কি তায়?
শুধু এ মিনতি সেই কাঁটাবন সুবাস কুসুমে ভরিয়া দিও,
বর্ণে গন্ধে সুষমায় তার সবাকার মন হরিয়া নিও।
সুধার কলস যদি উঠে ভবে আমার বেদনা-সিন্ধু মথি,
যত ব্যথা দিবে সহিব নীরবে ভেঙে যাক্ হিয়া ভাঙিবে যদি।"

# দেহত্যাগ

## ( ২ )

স্বামী ভূমানন্দ, কালীপুর আশ্রম, কামাখ্যা

শ্রীমদ্ভাগবতেও দেখি, ব্রহ্মশাপগ্রস্ত রাজা পরীক্ষিৎ যখন গঙ্গাতীরে প্রায়োপবেশনে অবস্থিত হইয়া মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলেন, তখন শুকদেব তথায় উপস্থিত হন ও রাজাকে বহু প্রকার উপদেশ দিয়া বলেন, তক্ষক তোমার দেহ দংশন করিলে দেহেরই নাশ হইবে, তোমার নাশ হইবে না; তক্ষক-দংশনে তুমি মরিবে এই পশুবুদ্ধি ত্যাগ কর—

ত্বন্তু রাজন্ মরিষ্যেতি পশুবুদ্ধিমিমাং জহি।
ন জাতঃ প্রাগ্‌ভূতোঽদ্য দেহবৎ ত্বং ন নঙ্ক্ষ্যসি॥

শ্রীমদ্ভাগবত, ১২।৫।২

আরও বলিলেন, প্রকৃতপক্ষে তোমার জন্মমৃত্যু কিছুই নাই; অতএব তুমি এক্ষণে মদুপদিষ্ট কৌশল অবলম্বন করিয়া পরমাত্মায় মন সমাধান কর, তাহা হইলেই তোমার দেহজ্ঞান থাকিবে না এবং তক্ষক-দংশনও অনুভব করিবে না—

অহং ব্রহ্ম পরং ধাম ব্রহ্মাহং পরমং পদম্।
এবং সমীক্ষ্য চাত্মানমাত্মন্যাধায় নিষ্কলে॥
দশন্তং তক্ষকং পাদে লেলিহানং বিষাননৈঃ।
ন দ্রক্ষ্যসি শরীরঞ্চ বিশ্বঞ্চ পৃথগাত্মনঃ॥

শ্রীমদ্ভাগবত, ১২।৫।১১-১২

কি কৌশলে দেহ-ত্যাগ করিতে হয়, শুকদেব তাহাও পূর্বেই পরীক্ষিৎকে শিক্ষা দিয়াছিলেন—"স্থিরাসনে বসিয়া প্রাণ-বায়ুকে মূলাধার হইতে ক্রমে ঊর্ধ্বে উত্থাপিত করিয়া নাভি, বক্ষস্থল, কণ্ঠ, তালু, মূর্ধা প্রভৃতি স্থান অতিক্রম করিয়া দ্বিদলে (ভ্রূমধ্যে) প্রাণ ও মনকে স্থির করিয়া ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ দ্বারা দেহ-ত্যাগ করিলেই সাধক পরব্রহ্মে লীন হন।" (শ্রীমদ্ভাগবত, ২।২।১৯-২১) পরীক্ষিৎও এই উপায়-অবলম্বন করিয়াই আত্মস্থ হইয়া যখন বাহ্যজ্ঞানপরিশূন্য অবস্থায় ছিলেন, সেই সময়েই তক্ষক তাঁহাকে দংশন করিল ও তাঁহার দেহস্থ জীব পরমাত্মায় লীন হইলেন।

রামায়ণেও দেখিতে পাই, ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের মহাপ্রয়াণের পরই তাঁহার ভূভারহরণ-কার্যে সহায়তা করিবার জন্য যে সকল দেবতা স্বকীয়াংশে মনুষ্য-দেহে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহারাও যোগবলে দেহত্যাগ করিয়া দিব্য দেহধারণ-পূর্বক স্বর্গে গমন করিয়াছিলেন—

মানুষং দেহমুৎসৃজ্য বিমানং চারুরোহ সঃ।

রামায়ণ, ৭।১১২।২৩

দেবী সতীও দক্ষ-যজ্ঞে শিব-নিন্দা শ্রবণ করিয়া যোগাবলম্বনে দেহত্যাগ করিয়াছিলেন—

কৃত্বা সমানাবনিলৌ জিতাসনা
সোদানমুত্থাপ্য চ নাভিচক্রতঃ।
শনৈর্হৃদি স্থাপ্য ধিয়োরসি স্থিতং
কণ্ঠাদ্ ভ্রুবোর্মধ্যমনিন্দিতানয়ৎ॥
... ... ...
দদর্শ দেহো হতকল্মষঃ সতী
সদ্যঃ প্রজজ্বাল সমাধিজাগ্নিনা।

শ্রীমদ্ভাগবত, ৪।৪।২৫-২৭

মহারাজা পৃথুর ও শরীরত্যাগ এইরূপ—

এবং স বীরপ্রবরঃ সংযোজ্যাত্মানমাত্মনি।
ব্রহ্মভূতো দৃঢ়ং কালে তত্যাজ স্বং কলেবরম্‌॥

শ্রীমদ্ভাগবত, ৪।২৩।১৩

শ্রেষ্ঠ শাস্ত্র উপনিষদেও দেহত্যাগ-সম্বন্ধে বহু উল্লেখ আছে। জাবাল উপনিষদে দেখি, যাঁহারা সন্ন্যাস-অবলম্বন করিয়া নারায়ণে তন্ময় হইয়া দেহত্যাগ করিতে সমর্থ, তাঁহারাই 'পরমহংস'-নামে অভিহিত। (জাবাল উপনিষৎ, ৬)

নারদ-পরিব্রাজক উপনিষদ বলেন, জীবাত্মা ও পরমাত্মার ঐক্যসাধন করিয়া প্রণব-ধারণা দ্বারা 'আমিই ব্রহ্ম' এই জ্ঞানে যিনি দেহ-ত্যাগ করিতে সমর্থ তিনিই কৃতকৃত্য।

( নারদ পরিব্রাজক উপনিষৎ, ৩।৮৮ )

এই দেহত্যাগও দ্বিবিধ—সাময়িক ও আত্যন্তিক। স্বীয় দেহ পরিত্যাগ করিয়া পুনরায় সেই দেহেই প্রত্যাগমনকে সাময়িক দেহত্যাগ বলে। যোগবাশিষ্ঠে দেখিতে পাই, রাণী চূড়ালা অন্য দেহ ধারণ করিয়া তাঁহার স্বামী রাজা শিখিধ্বজকে জ্ঞানযোগের উপদেশ দ্বারা প্রবোধিত করিয়াছিলেন। মহাভারতে আছে, আত্মজ্ঞানী সুলভা রাজর্ষি জনকের দেহ আশ্রয় করিয়া তাঁহাকে স্তম্ভিত করিয়াছিলেন। আচার্য শঙ্করের জীবনীতে রহিয়াছে তিনি স্বকীয় দেহ পরিত্যাগ করিয়া অমরুক রাজার দেহে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন। শিষ্যগণ দ্বারা তাঁহার দেহ গুপ্ত স্থানে সযত্নে রক্ষিত হইয়াছিল এবং শঙ্কর শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া পুনরায় নিজ দেহে প্রবেশ করেন। এই সকল দেহত্যাগ সাময়িক। জ্ঞানের পরিপক্ক অবস্থায় এবং প্রারব্ধ-ক্ষয়ে দেহীর দেহ হইতে চিরকালের জন্য মুক্ত হওয়ার নাম আত্যন্তিক দেহত্যাগ। দেহান্তে দেহী স্বস্বরূপে লীন হন। পুরাণাদি পাঠে দেখা যায়, পূর্বে খ্যাতনামা মহর্ষিবৃন্দ এবং অনেক ক্ষত্রিয় রাজর্ষিও যোগবলে দেহত্যাগ করিয়া মহানির্বাণ লাভ করিয়াছিলেন। বর্তমান যুগেও অনেক মহাপুরুষের জীবনীতে দেখিতে পাই দেহত্যাগের পূর্বেই মহাপ্রয়াণ-ক্ষণ তাঁহারা জানাইয়া দিয়াছিলেন, এবং পরে ঠিক সেই সময়েই যোগাবলম্বনে দেহত্যাগ করেন।

কুরুক্ষেত্র মহাযুদ্ধের পর মহাভারতে বর্ণিত কয়েক জনের দেহত্যাগের বিবরণ অতি সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়া বর্তমান প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

(ক) ইচ্ছামৃত্যু মহারথী ভীষ্মদেব শরশয্যায় অবস্থান করিয়াই যুধিষ্ঠিরকে রাজধর্ম, আপদ্ধর্ম, স্ত্রী-ধর্ম, মোক্ষ-ধর্ম, জ্ঞানযোগ, কর্মযোগ প্রভৃতির উপদেশ দিতেছিলেন; ক্রমে যোগীদিগের বাঞ্ছিত দেহত্যাগ-কাল উত্তরায়ণ উপস্থিত হইল। তখন ভীষ্ম তাঁহার উপদেশের উপসংহার করিয়া তূষ্ণীম্ভাব ধারণ করিলেন, সর্ব ইন্দ্রিয় নিরোধ করিয়া পরমাত্মায় মন সমাধানপূর্বক শ্বাস ঊর্ধ্বগ করিলেন এবং তদবস্থায়ই ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ দ্বারা দেহত্যাগ করিয়া নির্বাণপ্রাপ্ত হইলেন।

(শ্রীমদ্ভাগবত, ১।৯।৪৩; মহাভারত, অনুশাসন, ১৬৮।২, ৭)

(খ) দ্রোণাচার্য, যুধিষ্ঠির-বাক্যে পুত্র অশ্বত্থামা যুদ্ধে নিহত হইয়াছেন মনে করিয়া শোকে ও দুঃখে অস্ত্র পরিত্যাগপূর্বক যোগ-অবলম্বন করিলেন এবং পরমাত্মায় মন সমাধান করিয়া প্রণবধারণা-সহায়ে দেহত্যাগ করেন। তাঁহার দেহ হইতে এক পরম জ্যোতিঃ নির্গত হইয়া আকাশে বিলীন হইল; দ্রোণ এই ভাবে ব্রহ্মলোকে গমন করিলে ধৃষ্টদ্যুম্ন তাঁহার মৃত দেহের শিরশ্ছেদন করিলেন।

( মহাভারত, দ্রোণ, ১৯১।৫০-৫৫)

(গ) সাত্যকির সহিত ভূরিশ্রবার প্রাণপণ যুদ্ধকালে ভূরিশ্রবা যখন খড়্গদ্বারা সাত্যকির শিরশ্ছেদন করিবার জন্য হস্ত উত্তোলন করিয়াছিলেন, তখন অর্জুন বাণ দ্বারা তাঁহার সেই হস্ত ছিন্ন করেন। ভূরিশ্রবা তখন প্রায়োপবেশনে দেহত্যাগ করিতে সংকল্প করিয়া মন সমাধান-পূর্বক মৌনী এবং প্রাণবায়ু নিরোধ করিয়া যোগযুক্ত হইলেন।

( মহাভারত, দ্রোণ, ১৪১।১৬-১৮ )

(ঘ) কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ শেষ হইলে যুধিষ্ঠির রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া পঞ্চদশ বৎসর রাজত্ব করিবার পর ধৃতরাষ্ট্র ব্যাসদেবের অনুমতি লইয়া কুন্তী ও গান্ধারীর সহিত বন-গমন করিলেন; বিদুরও তাঁহাদিগের অনুগামী হইলেন। পরে যুধিষ্ঠির ধৃতরাষ্ট্রের সহিত সাক্ষাৎ করিতে তাঁহার আশ্রমে গমন করিলেন। ধৃতরাষ্ট্রের সহিত বাক্যালাপ করিয়া যুধিষ্ঠির বিদুরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে বনান্তরে গমন করেন। বিদুর ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠিরকে দেখিয়াই যোগ-অবলম্বনে দেহত্যাগ করিয়া যুধিষ্ঠিরের দেহে লীন হন।

( মহাভারত, আশ্রমবাসিক, ২৬।২৫-২৮)

উপরি-উদ্ধৃত উক্তিসকল বিচার করিলে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, লয়যোগের সাধন-বিশেষ দ্বারা স্বেচ্ছায় দেহত্যাগ-শক্তি লাভ করা যায়। সকলেই যে এই কৌশল শিক্ষা করেন তাহা নহে; এবং এই ভাবে দেহত্যাগ না হইলেই যে সাধক পূর্ণ জ্ঞান লাভ করিয়া মুক্ত হইতে পারেন না তাহাও নহে। আত্মজ্ঞান-লাভের আকুল আগ্রহে পরম শ্রদ্ধার সহিত জ্ঞানযোগের বিচার ও ক্রিয়াযোগাদির অভ্যাস-দ্বারা অদ্বৈত আত্মতত্ত্বের জ্ঞান যাঁহাদিগের পরিস্ফুট হইয়াছে, তাঁহারা সকলেই জীবন্মুক্ত অর্থাৎ জীবিত অবস্থায়ই মুক্ত এবং একই অবস্থা-বিশিষ্ট; তাঁহাদিগের পরস্পরের জ্ঞানের মধ্যে কোন পার্থক্যই নাই; দেহান্তে তাঁহারা সকলেই বিদেহ-মুক্তি লাভ করেন।

যাঁহারা প্রকৃত জ্ঞানী, তাঁহাদিগের অনেকেই আকাশগমন, অগ্নি-প্রবেশ প্রভৃতি বাহ্য শক্তি বা বিভূতি সঞ্চয়ের নিমিত্ত আগ্রহ বা চেষ্টা করেন না, কারণ এই সকল বাহ্যশক্তি দ্রব্য, ক্রিয়া কাল প্রভৃতি যোগেই অভ্যাসদ্বারা লাভ হইতে পারে। তাঁহাদিগের জ্ঞানে এই সকল বিষয় অবিদ্যারই অন্তর্গত ও বন্ধের হেতু। এই জন্যই প্রকৃত জ্ঞানী পুরুষ এই সকল বিষয়ে আগ্রহশীল হন না; তাঁহারা আত্মানন্দেই বিভোর হইয়া থাকেন—

অনাত্মবিদমুক্তোঽপি নভোবিহরণাদিকম্।
দ্রব্যকর্মক্রিয়াকালশক্ত্যা প্রাপ্নোতি রাঘব॥
নাত্মজ্ঞস্যৈষ বিষয় আত্মজ্ঞো হ্যাত্মবান্ স্বয়ম্।
আত্মনাত্মনি সন্তৃপ্তো নাবিদ্যামনুধাবতি॥

( যোগবাশিষ্ঠ, উপশম, ৮৯।১২-১৩ )

বাহ্য শক্তি অবশ্য সকলের সমান হয় না, কারণ শক্তি-সঞ্চয় বিভিন্ন প্রকারের সাধন-সাপেক্ষ। দেহত্যাগ-শক্তিও এই প্রকারেরই কৌশল-বিশেষের অভ্যাসদ্বারা লাভ হইতে পারে; তাহা আত্মজ্ঞানের অপেক্ষা নাও রাখিতে পারে। পক্ষান্তরে দেহ হইতে দেহীর প্রয়াণের প্রকারভেদের সহিতও আত্মজ্ঞানের কোন সম্বন্ধ নাই। মুক্তি জ্ঞানীর হয়, দেহের নহে—

সদেহা বাপ্যদেহা বা মুক্ততা বিষয়ে ন তু॥

( যোগবাশিষ্ঠ, ২।৪।২ )

দেহের মুক্তিতে যে মুক্তি তাহা শৃগাল-কুকুরেও বর্তমান—

যা মুক্তিঃ পিণ্ডপাতেন সা মুক্তিঃ শুনি শূকরে।

আত্মজ্ঞানী গুরুর শরণাপন্ন হইয়া তাঁহার উপদেশানুসারে দীর্ঘকাল দৃঢ় অভ্যাস-সহকারে বিচারপরায়ণ হইলে মনুষ্যমাত্রেই আত্মদর্শন লাভ করিয়া আর্য ঋষিদিগের পরমপ্রিয় দেহত্যাগ-কৌশল পরিজ্ঞাত হইয়া কালে দেহ-ত্যাগপূর্বক স্ব স্ব রূপে লীন হইতে সমর্থ হইতে পারেন। যাঁহারা আত্মদর্শী, প্রাণ-শক্তি স্বভাবতই তাঁহাদিগের ইচ্ছায়ত্ত।

# সন্তোদ্যানে পুষ্পচয়ন

স্বামী বাসুদেবানন্দ

১৯১৮ সালের পূজার পূর্বে এক জন শ্রীশ্রীমাকে জিজ্ঞাসা করেছিল, "মা, মনের মধ্যে অসৎ চিন্তা ওঠে কেন?" মা বললেন, "সাধারণ মনের স্বভাবই হলো নীচের দিকে যাওয়া। মানুষ কত মনের জোর সম্বল করে বাঁধ দিয়ে রাখে, আবার বাঁধ ভেঙে কখন কখন জল বেরিয়ে পড়ে। তবুও বরাবর চেষ্টা রাখতে হয়। কিন্তু জানবে সাধুসঙ্গ সৎচর্চায় মন খুব ঊর্ধ্বমুখী হয়, সাধুদের কৃপায় অতি নীচ লোকেরও মনের গতি ফিরে যায়, দেখ বৃন্দাবনের সেই সোনাখোঁজা সাধুর মহাপুরুষের কৃপায় দিব্যজ্ঞান হয়ে গেল, পরশ পাথর পেয়েও ফেলে দিলে। সাধুর বেশ ধরে এক ব্যাধ পাখী ধরতে গিয়ে পাখীদের সরল নির্ভয় ভাব দেখল, তাতে নিজেরই বৈরাগ্য উদয় হলো; সে ব্যাধবৃত্তি ছেড়ে দিলে। সেই জন্য সৎসঙ্গ সময় পেলেই করবে, সাধুসঙ্গ না পেলে সৎ গ্রন্থ পড়বে, মহাপুরুষদের জীবন আলোচনা করলে চিত্ত শুদ্ধ হয়। দেখ জলের গতি স্বভাবতঃ নীচের দিকে, কিন্তু সূর্যের আলো পেয়ে সেই জল আবার আকাশে ওঠে, পাহাড়ের মাথায় বরফ হয়ে যায়, আবার বৃষ্টি, ঝরণা, নদী হয়ে জীবের কত কল্যাণ করে।"

* * *

এক দিন শ্রীশ্রীমা ও সুধীরা দেবী উদ্বোধনের রাস্তার ধারের বরান্দায় বসে স্কুলবাড়ীর কার সম্বন্ধে কথাবার্তা বলছেন। মা বলছেন—"মানুষ নিজের মন খতাতে চায় না, কেবল অপরের দোষ দেখে। নিজের দোষগুলো যদি মানুষের চোখে পড়ে এবং সেইগুলো যাতে যায় তার চেষ্টা করে, তা হলে আর অপরের দোষ ধরবার প্রবৃত্তি থাকে না। মানুষের এই এক স্বভাব মহামায়া সৃষ্টি করে রেখেছেন, নিজের তিল প্রমাণ গুণটা তাল করে দেখা, আর অপরের তাল প্রমাণ গুণটাকে তিল করে দেখা, নিজের মহত্ত্ব নিয়ে নিজেই মসগুল, অপরের কথা ভাবে কি? 'সকলেই যে ঠাকুরের' এটা মনে থাকলে সকলকেই ভালবাসতে ইচ্ছা করে। আমার একবার এমন অবস্থা হলো যে নৈবেদ্য থেকে পিঁপড়েটাকে পর্যন্ত তাড়াতে পারি নে, বোধ হয় যেন ঠাকুর খাচ্ছেন। সকলের ভেতর ঠাকুরকে দেখতে না পেলেই ঐ সব পরনিন্দা পরচর্চা ভাল লাগবে। নিজের উন্নতির চেষ্টা না থাকলেই অপরের ভাল মন্দ নিয়ে নিজের মনকে কেবল অযথা উত্তেজিত করবেই।"

* * *

ভক্তের প্রতি ভগবানের যে বাণী তা অতি মৃদু—সংসারের সকল কোলাহল থেকে কুড়িয়ে এনে চিত্ত স্থির করে শুনতে হয়। রূপ-রসের হট্টগোলে তা শোনা যায় না। শ্রীশ্রীমহারাজ (স্বামী ব্রহ্মানন্দ) বলতেন, "বছরের তিন মাস কেবল ঈশ্বরচিন্তা নিয়ে থাকতে হয়। এইজন্য একটা season কেবল এর জন্য রাখতে হয়। তখন মনে করবি, 'ঈশ্বর ছাড়া আর আমার কেউ নেই।' তখন কেবল তাঁর সম্বন্ধে কথা বলা, পড়া, ধ্যান করা, জপ করা ছাড়া আর কিছু থাকবে না। বহির্মুখী বৃত্তিরা এলে বলতে হয়, এখন দেখা

হবে না, যেমন বড় লোকের অসুখ করলে লোকে বলে না, এখন তাঁর সঙ্গে দেখা হবে না, দেখা করা নিষেধ, ডাক্তারের মানা।"

* * *

একবার আমরা মহাপুরুষ মহারাজকে জিজ্ঞাসা করি, "ঠাকুর যদি ঈশ্বর হন, তা হলে তিনি সৃষ্টি-স্থিতি-লয় করতে পারেন কি?" তিনি বলেন, "যিনি স্বামীজীর এই মনটাকে এক মুহূর্তে উড়িয়ে দিয়ে জগৎ টগৎ সব লয় করে দিলেন, আবার 'এখন থাক' বলে সেই জগতের সহিত মনটাকে যথাস্থানে সন্নিবেশিত করতে পারলেন, তাঁকে ঈশ্বর ছাড়া আর কি বলা যেতে পারে।"

* * *

একবার শ্রীশ্রীবাবুরাম মহারাজ বলেন, "যে ঠিক ঠিক ঈশ্বরের ভক্ত, তাকে শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে আসতে হবেই"—কথাটা শুনে দপ্ করে ভগবান যীশুখ্রীষ্টের কয়েকটি কথা মনে পড়লো —"He calleth his own sheep by name and leadeth them out"..."He goeth before them; and the sheep follow him, because they know his voice." (St. John, ch.10.3,4) অর্থাৎ মেষপালক নিজের মেষদিগকে জানে এবং নাম ধরে ডাকতে ডাকতে আগে আগে চলতে থাকে এবং বাহিরে খাওয়াবার জন্য নিয়ে যায়। তারা তার পেছনে পেছনে যেতে থাকে, কারণ তারা তাদের প্রভুর স্বর চেনে। ভক্তেরাও তেমনি অবতারের কণ্ঠস্বর চিনতে পেরে সংসারগণ্ডি থেকে বেরিয়ে এসে তাঁর অনুসরণ করে। যাদের পিতামাতা ভগবদ্ভক্ত তারা তাতে আপত্তি করে না, বরং তাতে সাহায্য করে—"To him the porter openeth." "And other sheep I have that are not of this fold: them also I must bring." —"(St. John, 10.16)—আমার মেষ যদি অন্য খোঁয়াড়েও গিয়ে পড়ে, তাদেরও আমি নিয়ে আসব। "I know mine, and mine know me." (St. John, 10,14)—কারণ আমি আমার মেষ জানি এবং তারাও আমাকে চেনে। অর্থাৎ ঈশ্বরভক্তেরা ভিন্ন সম্প্রদায়ে থাকলেও তাদের তিনি আকর্ষণ করেন, কারণ কণ্ঠস্বর (উপদেশ) শুনলেই তারা ঈশ্বরের আবির্ভাব বুঝতে পারে। "And there shall be one fold and one shepherd"—কারণ এক রাখাল এবং একটি দলই থাকবে। অর্থাৎ তাঁর আবির্ভাবে সে যুগের যাবতীয় দল, মত, পথ, সম্প্রদায় তাঁতে "স্বাহা হয়ে যায়।" আমাদের পাঠ্যাবস্থায় পূজ্যপাদ শরৎ মহারাজ বাইবেলের এই স্থানগুলি ব্যাখ্যা করে নির্দেশ করেন।

* * *

বাবুরাম মহারাজ আবার বলতেন, "উদার ভাবে সব মত পথ দেখতে হয়। প্রভু বলতেন, 'যে, উদার সে ধন্য।' কিন্তু উদারতা মানে ইষ্টনিষ্ঠা-ত্যাগ নয়। ইষ্ট স্বয়ং ভগবান, তাঁতে নিষ্ঠা থাকলে তিনি জানিয়ে দেন যে তিনিই সব হয়েছেন—

"মন্নাথঃ শ্রীজগন্নাথো মদ্‌গুরুঃ শ্রীজগদ্‌গুরুঃ।
মদাত্মা সর্বভূতাত্মা তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥"

(গুরুগীতা)

—আমারই নাথ যে জগন্নাথ। শোন্—দুই ভায়ের দুই ঠাকুর ছিল, কালী ও কৃষ্ণ। দুজনেরই খুব ইষ্টনিষ্ঠা, কেউ কখনও নিজের ঠাকুরঘর ছেড়ে অপরের ঠাকুরঘরে যায় না। একবার তাদের বাগানে সুন্দর এক কাঁদি কলা ফললো। দুজনেই মনে করলো, পাকলে নিজের ঠাকুরকে দেবে। ক্রমে কলা পুষ্ট হয়ে উঠলো, ছোট ভাই ভাবলে, 'আমি একটু কাজে বিদেশে যাচ্ছি, শীঘ্র ফিরে এসেই কৃষ্ণকে শিন্নি করে দেব।' এদিকে ছোট ভাই ফেরবার আগেই বড় ভাই কাঁদিটি,

মা কালীর ভোগে লাগিয়ে দিয়েছে।' ছোট ভাই যখন ফিরছে, দূরের থেকে ছাথে কাঁদি নেই, তার আর বুঝতে বাকি রইলো না, তখন ক্রোধে এমন অন্ধ হয়ে গেল যে আর কাউকে কিছু না বলে হাতের লাঠিটা নিয়ে ছুটলো, 'কালীকে আজ ভাঙবই।' মন্দিরে ঢুকে দেখে গোবিন্দজী ফিক ফিক করে হাসছেন। সে ছুটে বেরিয়ে এলো, আর ভাবলে যে 'আমি ক্রোধে এমন অন্ধ যে আর একটু হলেই আমি আমার গোপালকেই ভেঙে ফেলতুম।' তারপর, আর এক মন্দিরে গিয়ে দেখে সেই একই গোপাল বাঁশী বাজাচ্ছেন ও হাসছেন! ভুল হয়েছে ভেবে সে আবার ছুটে অন্য মন্দিরে গেল, গিয়ে দেখে সেই একই গোপাল। তখন সে বুঝতে পারলে, 'মন্নাথঃ শ্রীজগন্নাথঃ।' তার মতুয়ার বুদ্ধি নষ্ট হলো। সে করজোড়ে কাঁদতে কাঁদতে ক্ষমা চাইতে লাগলো।" বল্লেন—

"পৃথক প্রণব নানা লীলা তব কে বুঝে
এ কথা বিষম ভারী।
নিজ তনু আধা, গুণবতী রাধা আপনি পুরুষ
আপনি নারী।
ছিল বিবসন কটি এবে পীত ধটী
এলো চুলে চূড়া বংশীধারী॥"
( রামপ্রসাদ )

আমাদেরও সেদিন সন্ধ্যার ভজনে জোর গান চলল—

"এ ত নয়গো তোমার শ্রীহরি।"...
"প্রেমিক বলে মায়ায় ভুলে মরলি ভেদ জ্ঞান করি।
অভেদ জ্ঞানে ছাখ নয়নে যে কালী সেই মুরারি॥"

* * *

একদিন গীতা-ক্লাশে "যদৃচ্ছালাভসন্তুষ্টঃ" ( গীতা, ৪।২২ ) শ্লোকটি-সম্বন্ধে আলোচনা হচ্ছে। বাবুরাম মহারাজ বল্লেন "ভোগ্য বস্তু নিয়ে যত আলোচনা করবে তত আত্মা দেহগামী হয়, যা পেলে খেলে, যা পেলে পরলে, যেখানে যায়গা একটু পেলে শুয়ে পড়লে।" এই ক্লাশে পূজ্যপাদ হরি মহারাজও ছিলেন। তিনি বললেন, "যারা তারিয়ে তারিয়ে খায়, রান্নার ক্রমাগত প্রশংসা করে, রাঁধুনীর খবর নেয়, খাদ্যের উপাদান ও জাতি-সম্বন্ধে বিচার করে, তাদের আত্মা জিহ্বা-স্বরূপ হয়ে যান, তারা তখন চার্বাক। দেখ, ভাগবত বলছেন, 'জিতং সর্বং জিতে রসে—' ( ভাগবত, ৮।২১ )— অর্থাৎ ততদিন পর্যন্ত পুরুষকে জিতেন্দ্রিয় বলা যায় না যত দিন না তিনি রসনা জয় করতে পারেন, কারণ রসনা জয় হলেই সর্বেন্দ্রিয় জয় হলো।"

* * *

সাধুরা পরস্পর নিন্দা করলে হরি মহারাজ একটি গল্প করতেন, "গৌকা মাফিক্, ভৈঁসা কা মাফিক্"—হৃষীকেশে একজন শেঠ সাধুভোজন করাবেন বলে একজন সাধুকে জিজ্ঞেস করলে— "অমুক সাধু কেমন?" সাধু বল্লেন, "ও তো একঠো ভৈঁসা হৈ।" শেঠ আবার সেই সাধুটিকে প্রথম সাধুটির কথা জিজ্ঞেস করলেন, "ও মহাত্মা কৈসা হৈ!" সাধু বল্লেন, "আরে ও ত একঠো গৌ হৈ।" শেঠ দুজনকেই নিমন্ত্রণ দিলেন। সাধুদুটি যখন ভিক্ষার জন্য তার কাছে গেলেন, তখন শেঠ দুখানা থালায় করে জাব এনে দিলেন। সাধুরা চটে জিজ্ঞেস করলেন, "য়হ কৈসা জী!" শেঠ বললেন, "আপনারা উভয়ে উভয়ের যে পরিচয় দিয়েছিলেন, সেই অনুযায়ী ভিক্ষার ব্যবস্থা করেছি!"

# বঙ্কিমচন্দ্র

শ্রীযতীন্দ্রমোহন চৌধুরী

ইংরেজ কোম্পানী আর ইংরেজ রাজপ্রতিভূর দণ্ডের অভিঘাতে যখন ভারতবাসী সোজা পথে চল্‌তে থাকে, তখন বঙ্কিমচন্দ্রই প্রথমে বঙ্কিম-পথ ধর্‌লেন। ভারতবাসীর ক্ষুব্ধ আত্মা দপ্তর ও লালফিতার আবেষ্টনে থেকেও মুক্তির নিঃশ্বাস ফেল্‌তে শিখ্‌ল। স্মৃতিবহুল, শ্যামল, রৌদ্র-ঝল্‌মল্‌ বাংলার মাটিতে আত্ম-মুক্তির রঙিন স্বপ্ন যে সাধক দেখ্‌লেন, তিনি আমাদের বর্তমান রাষ্ট্রনায়কগণের অবি-সংবাদিত অধিনায়ক।

বঙ্কিমচন্দ্রের মন ছিল ষোল-আনা ভারতীয়, মত ছিল ইউরোপের উনবিংশ শতকের জলে-ধোওয়া। তাই, তা হয়েছিল স্ফটিকের মত স্বচ্ছ। মিল্‌-বেন্থাম-রুশো-ডেকার্টের খোসার আব্‌ডালে বেদান্ত-দর্শনের শাঁস—তাঁর কৃষ্ণচরিত্র-সমালোচনায় পাই। ইউরোপের যুক্তিবাদ এনে দেয় তার মুক্তিবাদ, অর্থাৎ Age of Reason এর পর দাবাগ্নির মত আসে Age of Revolution। ইউরোপের সমাজ-তন্ত্রের কাঠামো তখন ভেঙে নূতন করে গড়ে উঠেছিল—ম্যাট্‌সিনি, গ্যারিবল্ডি এবং ক্যাভুরের নব-বিধানে। সেই ঢেউ এসে লেগেছিল কল্পনা-কুশলী শিল্পীর মনে। মনে হয়, সেই জন্যে বঙ্কিমের শ্রীকৃষ্ণ হয়ে উঠেছিলেন অতিমানব। অর্থাৎ রণবীর নেপোলিয়ন রং দিয়েছিলেন গণবীর শ্রীকৃষ্ণে। কিন্তু নারীত্বের আলোচনে বঙ্কিম ছিলেন পুরোদস্তুর ভারতীয়। তাঁর সাধ ও সাধনার ভারত-মাতা দ্বি-সপ্তকোটিভুজৈধৃ´তখরকরবালা; তিনি কখনও নন অবলা। তাঁর জ্যোৎস্নাময়ী, উদাসিনী, ষোড়শী 'মৃন্ময়ী' সত্যি-সত্যিই চিন্ময়ী। তাঁর 'কপালকুণ্ডলা' বাংলা-সাহিত্যে কেন, বিশ্ব সাহিত্যে অভূতপূর্ব, অনবদ্য, অনতিক্রমণীয়। মিরাণ্ডা মানবী, শকুন্তলা দেবী, আর কপালকুণ্ডলা মানবী হয়েও দেবী। তাঁর প্রফুল্লর (অর্থাৎ দেবী-রাণীর) পরিণতি 'শ্রী'-তে। তাঁর 'নিমাই' 'কমলমণির' প্রথম সংস্করণ এবং 'কমলমণি' 'শ্যামাসুন্দরীর' রাজ-সংস্করণ। বিপথচারিণী 'শৈবলিনী' এবং 'রোহিণী'র মধ্যে যে স্বভাব-গত বৈষম্য আছে, তা সত্ত্বেও তারা ভারতীয়। শৈবলিনীর প্রায়শ্চিত্তের মধ্যে 'দান্তে'র নরকের গন্ধ পাই, তবুও দেখি, তার অগ্নি-দগ্ধ মন পরে পূজার উপচারের যোগ্য হয়ে উঠে। শিল্পীর সৃষ্টির বৈচিত্র্যে প্রতিটি নর-নারী, নিজ নিজ পরিবেশকে অতিক্রম করে ব্যক্তিত্বের মহিমায় ফুটে উঠেছে। 'মতি-বিবি', 'বিমলা', 'ইন্দিরা'—এদের প্রত্যেকের জীবনেতিহাস ঘটনার প্রতিঘাতে অনেকটা একই ধারায় চল্‌লেও বৈচিত্র্যের বিলসনে উজ্জ্বল। উপেন্দ্র-ইন্দিরার অজ্ঞাতবাস, পদ্মাবতীর দেহ-মনের রূপান্তর, বিমলার বিষাদময় অতীত—বৈচিত্র্যকে পরিস্ফুট করে। শ্রী-জয়ন্তী-রমা-নন্দা বঙ্কিমের পরিণত বয়সের ও পাকা হাতের সৃষ্টি হলেও অপূর্ব নারী-চতুষ্টয়। অন্ধনারী 'রজনী'র ভালবাসা কেমন অনাবিল, কি গভীর! 'ধীরে রজনি ধীরে'—এই সতর্কতার বাণী ভারতবর্ষের সুর, অথচ ভাব এল 'লিটনের' লেখা থেকে। সরলা 'তিলোত্তমা' তাঁর প্রথম সৃষ্টি, রূপে

গুণে উত্তমা, সেইজন্তে সে রজনী-গন্ধা হয়ে ওঠে নি। 'কুন্দ' না ফুটলে হয়ত রজনী-গন্ধা নির্গন্ধা হত। তাই বলা যায়, বঙ্কিমের একনিষ্ঠ সাধনায় সিদ্ধিও এসেছিল ধীরে, নারী-চরিত্র-অঙ্কনে। বঙ্কিম কোন দিনই স্বয়ং-সিদ্ধ বা কৃপা-সিদ্ধ ছিলেন না। বরঞ্চ, তিনি কৃপা বিলিয়ে দিয়েছিলেন বলেই রমেশচন্দ্র বাংলায় কলম ধরলেন, নবীনচন্দ্র কল্পনার মোড় ফেরালেন, রবীন্দ্রনাথ সাহিত্য-গুরুর সন্ধান পেলেন।

বঙ্কিমের সৃষ্ট নরনারী—রক্তমাংসের তৈরী হলেও খানিকটা অসাধারণ, কোন কোন ক্ষেত্রে একটু অস্বাভাবিক। বিমলা-সম্বন্ধে 'বঙ্কিম সাহিত্য-পরিচিতি' গ্রন্থে লিখেছিলাম—"দুর্গেশনন্দিনীর বিমলা-চরিত্র বহুলাংশে অ-বাঙ্গালী চরিত্র। বাংলার বাহিরে তাহার জন্ম। 'মাহরু'-নামে এক বিচিত্র পরিবেশের মধ্যে তাহার বাল্যকাল অতিবাহিত হয়। পিতার সন্ধানে তাহার একাকিনী দিল্লীতে গমন; তথায় মহারাজ মানসিংহের নব-পরিণীতা মহিষী ঊর্মিলা দেবীর সাহচর্য; ঊর্মিলা দেবীর নিকট বিবিধ শিল্প-কার্য, নৃত্য-গীত ও লেখা-পড়া শিক্ষা; বীরেন্দ্র-সিংহের সহিত পরিচয় ও প্রণয়; অস্বাভাবিক দাম্পত্য-জীবন এবং গড়মান্দারণ দুর্গে দীর্ঘকাল আত্ম-গোপন করিয়া অবস্থিতি; গজপতি বিদ্যা-দিগগজের সহিত শৈলেশ্বর মন্দিরাভিমুখে নৈশাভিযান, গভীর নিশীথে পাঠান-সৈন্তের অতর্কিত ভাবে দুর্গ-প্রবেশেও ভীতির অভাব এবং সেই চরম বিপদের মুহূর্তে হাব-ভাব-বিলাস প্রদর্শনে স্বকর্ম-সাধনের চেষ্টা, এবং অবশেষে প্রতিহিংসাবশে ছুরিকাঘাতে সুরামত্ত কতলু খাঁর নিধন, এই সকল বিষয় একসঙ্গে চিন্তা করিলে তাহাকে সাধারণ বাঙ্গালী নারী বলিয়া একবারও মনে হয় না। তাহার চরিত্রের এই অসাধারণত্বই তাহাকে মনোজ্ঞ ও সুন্দর করিয়া তুলিয়াছে।" কল্যাণীর কন্যা-কোলে বনমধ্যে পলায়ন, ইন্দিরার অভিযান ও কলকাতার জন-সমুদ্রে অবগাহন, জীবানন্দের গৃহ-লক্ষ্মী তাপসী 'শান্তির' অপূর্ব্ব পৌরুষ—সব ব্যাপারেই বঙ্কিম আদর্শ-সৃষ্টির উদ্দেশ্যে বাংলার নারী-চরিত্রকে পেলবতার মধ্যে সুকঠোর করে তুলেছেন। আবার সুগভীর সহানুভূতি ও দরদ দিয়ে নারী-জীবনের দুঃখ-শোককে বাঙ্গালার জীবন থেকে বিশ্ব-নারীত্বের পর্যায়ে উন্নীত করেছেন। আমার মনে হয়, চরিত্র-চিত্রণের গভীরতা ও ব্যাপকতায় স্কট্ বা লিটনের সঙ্গে তুলনা না করে বঙ্কিমচন্দ্রকে সেক্স্পীয়রের সঙ্গে তুলনা করা অধিক সঙ্গত হবে।

'বঙ্গ-দর্শন' 'প্রভাকরে'র সংহত রশ্মি। 'গুপ্ত'-কবির আমন্ত্রণ এবং অকুণ্ঠ সহযোগিতা না পেলে 'বঙ্গদর্শনের' পরিপুষ্টি তেমন হত না। আবার, রবীন্দ্রনাথের 'ভারতী' 'বঙ্গদর্শনের' বৃহত্তর দর্শন। বঙ্কিমের পাণ্ডিত্য 'বঙ্গদর্শনের' সম্পাদনে ধারাল হয়েছিল। কথা-শিল্পের রূপায়ণ ছিল তাঁর বিজ্ঞানী মনের বহিঃপ্রকাশ। 'লোক-রহস্তের' পরিপুষ্ট ফল 'কমলাকান্ত'। লোক-রহস্তের ছিন্ন-সূত্র গ্রন্থিবদ্ধ করেছে কমলাকান্তের দপ্তরকে। ইংরেজী ভাষায় 'wit' প্রধানতঃ কথার উপর নির্ভর করে—আর হাস্যরস হৃদয়ের অনুভূতি থেকে উৎপন্ন। কথার সৌষ্ঠব বজায় রেখে তীক্ষ্ণ ও মার্জিত ব্যঙ্গের পরিবেশন তিনি করেছিলেন ধীরে ধীরে। 'দুর্গেশনন্দিনী'-তে গজপতি আর আশমানীর রূপ-বর্ণনায় যে স্থূলতা ছিল, 'কপালকুণ্ডলা'য় তা ক্ষীয়মাণ হয়ে সরস ও উপভোগ্য হয়েছে। 'দেবী-চৌধুরাণী'র লাঠি-প্রশস্তি অতুলনীয় ব্যঙ্গোক্তি বা satire। 'চন্দ্রশেখরে' প্রতাপের ভৃত্য রামচরণ ব্যঙ্গের আধার। সে যে ইংরেজি ভাষাকে 'ইণ্ডিল্-মিণ্ডিল্' আর 'আমিয়টু'কে আমবাত বলত, তার

ভেতরের প্রচ্ছন্ন শ্লেষ জটিল, অথচ উপভোগ্য। 'বিষবৃক্ষে' নগেন্দ্রের বিরাট্ সংসারের বর্ণনা-প্রসঙ্গে আমরা পড়েছি—"ভাতের উমেদারিতে অনেকগুলি ছেলে, মেয়ে, কাঙ্গালী, কুকুর বসিয়া আছে। বিড়ালেরা উমেদারি করে না, তাহারা অবকাশ-মতে 'দোষভাবে পরগৃহে প্রবেশ করতঃ বিনা অনুমতিতে খাদ্য লইয়া যাইতেছে।" প্রথম পরিচ্ছেদে আছে—"নারিকেল গাছে চিল বসিয়া রাজমন্ত্রীর মত চারিদিক্ দেখিতেছে, কাহার কিসে ছোঁ মারিবে। বক ছোট-লোক, কাদা ঘাঁটিয়া বেড়াইতেছে। ডাহুক রসিক লোক, ডুব মারিতেছে। আর পাখী হাল্কা লোক, কেবল উড়িয়া বেড়াইতেছে।" রস-বোধ গভীর হয় জ্ঞান ও অনুভূতির প্রাখর্যে। ও জিনিস পাণ্ডিত্যের পরিপক্ক ফল। বঙ্কিমের পাণ্ডিত্য সাধনা-সম্ভূত এবং ক্রমবর্ধনশীল। স্বাধীনচিন্তা এবং রস-সৃষ্টির জন্যে নব নব পন্থার উদ্ভাবন তাঁর পাণ্ডিত্যের পরিণতি। বঙ্কিম এক প্রবন্ধে লিখেছেন—"বিদ্যাপতি প্রভৃতির কবিতার বিষয় সংকীর্ণ, কিন্তু কবিত্ব প্রগাঢ়; মধুসূদন বা হেমচন্দ্রের কবিতার বিষয় বিস্তৃত, কিন্তু কবিত্ব প্রগাঢ় নহে। জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কবিত্ব-শক্তির হ্রাস হয় বলিয়া যে প্রবাদ আছে, ইহা তাহার একটি কারণ।" এই উক্তি থেকে বোঝা যায়, বঙ্কিমের কবিমন তাঁর সকল শক্তির উৎস। তাঁর 'বিবিধ প্রবন্ধ' জ্ঞান ও রসের খনি। এই রস সঞ্চারিত হয়েছে তাঁর কথা-সাহিত্যে।

বঙ্কিম-সাহিত্যের আর একটি বৈশিষ্ট্য তাঁর সৃষ্ট ঘটনা-পরম্পরার অন্তরালস্থিত আধ্যাত্মিক শক্তি-সম্পন্ন মহাপুরুষগণ। বঙ্কিমের সাহিত্য-সাধনার ক্রমোন্নতির সঙ্গে এই সকল মহাপুরুষ বা অতি-মানবের মধ্যেও ক্রমবিকাশের ভাব দেখা যায়। অভিরাম স্বামী প্রথম যৌবনে নানা স্খলন সত্ত্বেও সাধনা-বলে মুক্ত পুরুষের স্তরে উন্নীত হয়েছিলেন। রমানন্দ স্বামী আদৌ সংসারী না হয়েও প্রগাঢ়-ভাবে সংসারাভিজ্ঞ ছিলেন। ভবানী পাঠক সম্ভবতঃ সত্যানন্দেরই মানস-সন্তান। সত্যানন্দের অন্যান্য সন্তানগণ সেই একই দীক্ষায় দীক্ষিত এবং 'মৃণালিনী'র মাধবানন্দের উন্নততর সংস্করণ। 'সীতারামে'র গঙ্গাধর স্বামী এবং 'রজনী'র নামহীন সন্ন্যাসী ঠাকুর চিকিৎসা-বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। বঙ্কিম-সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ চিকিৎসক—'আনন্দমঠে'র মহাপুরুষকে আমরা সত্যানন্দের সঙ্গে শেষ আলাপ করতে দেখেছি। প্রাচীন ভারতের আধ্যাত্মিক শক্তির উত্তরাধিকারী এই সব মহাপুরুষের অস্তিত্বে এবং এঁদের অলৌকিক শক্তিতে বঙ্কিমের অবিচল বিশ্বাস ছিল। এঁদের দু-একটি কথা ও সামান্য একটুখানি কাজ আখ্যায়িকার মধ্যে যে গতি-বেগ সঞ্চার করেছে, তা অত্যন্ত ফলদায়ক ও দূর-প্রসারী হয়েছে।

বঙ্কিমের ভাষা বাংলা সাহিত্যের রসায়ন। তাঁর পূর্ব যুগে ভাষার অস্থি, পেশী, উপাস্থি গঠিত হয়েছিল; রক্তবহা নালী দিলেন তিনি, স্নায়ুতন্ত্র সুস্থিত করলেন রবীন্দ্রনাথ। বাংলা ভাষাকে সতেজ করে শিক্ষিত ও অর্ধ-শিক্ষিতের উপভোগ্য করে তুলেছেন তিনি। ভাষার সর্ববিধ সম্পদকে "উজ্জ্বলে-মধুরে" মেশালেন তিনি। ইংরেজির ভক্তগণের অবজ্ঞা এবং সংস্কৃত-পণ্ডিত-গণের বঙ্গভাষায় অজ্ঞতা—এই দুই প্রকাণ্ড বাধার দেয়াল ভেঙ্গে ফেলে তিনি সাধু ও চলিত ভাষায় কোলাকুলি করালেন। তাই, কথোপকথনের তারল্য থেকে যখন তাঁর লেখনী পাঠককে উচ্চগ্রামে অজ্ঞাতসারে নিয়ে যায়, তখন বুঝতেই পারি না, কি ভাবে তিনি আমাদের মনকে বিধৃত করে তাকে প্রসারিত করেন। এর দৃষ্টান্ত তাঁর রচনার পঙ্‌ক্তিতে পঙ্‌ক্তিতে পাওয়া যায়।

এখন আর একটি বিষয়ের কিঞ্চিৎ আলোচনা করে এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের উপসংহার করতে চাই। ফ্রয়েড্, য়ুং, এড্লারের সন্ধান বঙ্কিমচন্দ্র পান নি। মনোরাজ্যের খবর তিনি আমাদের দিয়েছেন, কলা-কৌশলে মনস্তত্ত্বের গূঢ় রহস্য তিনি উদ্‌ঘাটন করেছেন, কিন্তু আধুনিকদের বিনিয়ে-তোলা কথার গাঁথুনি তিনি বর্জন করেছেন। শ্যামা-সুন্দরী ও মৃন্ময়ীর আলাপে, সূর্যমুখীর বিলাপে, দেবেন্দ্রের প্রলাপে লেখকের মনোবিশ্লেষণ-কৌশলের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। সাহিত্যে অসৎ তিনি অনেকভাবেই সৃষ্টি করেছেন, কিন্তু তার স্থানকে সাধনা-বলে ক্ষয়িষ্ণু করেছেন। দেবেন্দ্র, তারাচরণ, হীরা, গঙ্গারাম, ভবানন্দ ও গোবিন্দ-লাল—বঙ্কিমের মনোজগৎ থেকে বাস্তব-জগতে দেখা দিয়েছে ; এদেরও সমাজে দরকার আছে ; সমাজের এরাও এক অঙ্গ। কিন্তু এই অঙ্গকে তিনি ব্যবচ্ছেদ দ্বারা বিনষ্ট না করে মানব-স্বভাবের মুক্ত বায়ুতে ছেড়ে দিয়েছেন। সেই জন্যেই বঙ্কিম বাংলার রেনেসাঁসের যুগে পথ-নির্দেশ করতে পেরেছিলেন।

---

# হিমাচল-আশ্রম

ব্রহ্মচারী অভয়চৈতন্য

সবুজ নেশায় দিক ভরেছে, স্নিগ্ধ শীতল নিদাঘকালে
অবুঝ ব্যথার আবেশ জাগে, স্বরগ জ্যোতির দীপ্ত ভালে।
কানন-কূজন বিহগ-শতেক —জাগিয়ে তোলার সুরটি ভাল
শান্ত শিবের ঋদ্ধরূপের মনন-বিভায় আলোয় আলো।
পাইন গাছের তীক্ষ্ণ চূড়ায় দামাল বায়ুর মাতন চলে,
মেঘের সারি ছুটছে খেলায় পাহাড়শ্রেণীর কোলে কোলে।
মহান আকাশ নীলার বরণ, ক্বচিৎ সেথায় বিহগ উড়ে
তুষার কিরীট শৈলশিরে সোনার কিরণ ঠিকরে পড়ে
মনের গতির মুক্ত পাথায়, অসীম সসীম হেথায় মিতা
ধরার ধুলায় ঘৃণ্য যা সব তাদের স্মৃতির জ্বলছে চিতা।
চুপ করে তাই বসতে হবেই, ধ্যানমাখা এই হিমেল গেহে
চাও বা না চাও ভুলতে হবেই, ধরার সকল মঞ্জু মোহে
আত্ম-জ্যোতির দীপজ্বালা এই স্বরগ ভূমির অরূপ কোলে
মায়ের সোহাগ ডাকছে সদাই ক্লান্তিহরা স্নেহাঞ্চলে।

---

# কথা-প্রসঙ্গে

মধ্যভারতের ধূলিবিকীর্ণ একটি শহরের মুসাফিরখানায় তাঁহার সহিত দেখা। শূল উঁচাইয়া চ্যালেঞ্জ—সনাতন ধর্মকে রক্ষা করিবার জন্ম তোমরা করিতেছ কি? 'চুনাও' (নির্বাচন)-এ তোমাদের দাঁড়ানো উচিত ছিল— রাষ্ট্রযন্ত্র দখল করিয়া সনাতন ধর্মকে সেখানে স্থাপিত না করিলে নাস্তিক ধর্মবিদ্বেষীরা ওখানে ঢুকিয়া ভারতের মঠমন্দির ভাঙ্গিয়া দিবে, দেব-সম্পদ্ কাড়িয়া লইবে, 'সন্তসমাজ'কে না খাইতে দিয়া মারিয়া ফেলিবে। অমুক অমুক মঠাধীশরা 'চুনাও'-এ দাঁড়াইয়াছেন—তোমরা পিছাইয়া আছ কেন? সনাতন-ধর্মের জন্ম তোমাদের কি একটুও দরদ নাই?

বলিলাম, ধন্যবাদ, কর্তব্য স্মরণ করাইয়া দিলে—কিন্তু সন্তসমাজের ঘুম এত দেরিতে ভাঙ্গিল দেখিয়া অবাক হইতেছি। বিত্তের থলিতে হাত পড়িয়াছে বলিয়া কি সনাতন-ধর্মের জন্ম দরদ উথলাইয়া উঠিল?

*　*　*

ষাট বৎসর আগে এক জন সন্ন্যাসী সনাতন হিন্দুধর্ম রক্ষণ-প্রসংগে কিছু 'মরমের কথা' বলিয়াছিলেন, কিছু ভবিষ্যদ্বাণীও করিয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু সন্তসমাজ তখন তাঁহার সেই কথায় কান তো দেনই নাই—স্বামী বিবেকানন্দের উদার বাণী ও কর্মপ্রণালী অনেক ক্ষেত্রে উপহসিত হইয়াছিল—কেহ কেহ তাঁহাকে সন্ন্যাসি-সমাজে অপাঙ্‌ক্তেয় বলিতেও ছাড়েন নাই। জগতের পরিবর্তনশীল চিন্তা, কর্ম ও জীবনধারাকে উপেক্ষা করিয়া কোন কিছুই নিশ্চল হইয়া বসিয়া থাকিতে পারে না—সন্তসমাজও নয়। তাই স্বামীজী তাঁহাদিগকে সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী, কূপমণ্ডুকতা ত্যাগ করিয়া হিন্দুধর্মের সার্বজনীন তত্ত্বগুলিতে উদ্বুদ্ধ হইতে এবং শাস্ত্রের চিরন্তন সত্যসমূহ জীবনে উপলব্ধি করিয়া দেশের ও সমাজের সেবায় উহাদিগকে প্রয়োগ করিতে আহ্বান করিয়াছিলেন।

*　*　*

এখনও সন্তসমাজের কর্তব্য উহাই। 'ধর্ম গেল, ধর্ম গেল' করিয়া সোরগোল তুলিলেই সনাতনধর্মকে বাঁচানো যাইবে না। ত্যাগ, তপস্যা, সেবা দ্বারা সনাতনধর্মের কল্যাণময় রূপ ব্যষ্টি ও সমষ্টির জীবনে যদি ফুটাইয়া তুলিতে পারা যায় তবেই সনাতনধর্ম বাঁচিবে। সনাতন ধর্মের নামে যে সকল সংকীর্ণ দৃষ্টি, স্বার্থপর আচরণ এত দিন আঁকড়াইয়া রাখা হইয়াছে, সেগুলিকে নির্মমভাবে ত্যাগ করিবার দিন বহু পূর্বেই আসিয়াছে। আর বিলম্ব করিলে কালের উদ্যত শাসন কিছুতেই ক্ষমা করিবে না। সন্তসমাজ 'স্বধর্মে' অবহিত হউন—সেই স্বধর্মের নবতর রূপ—স্বামী বিবেকানন্দ নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন—'আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ'। এই স্বধর্মকে ঠিক ঠিক অনুসরণ করিতে পারিলে 'চুনাও'-এ দাঁড়াইয়া রাষ্ট্রযন্ত্র দখল করিবার কল্পনা অপেক্ষা সনাতনধর্মের অনেক বেশী বাস্তব উপকার-সাধন সম্ভবপর হইবে।

*　*　*

তথাকথিত নাস্তিক ও ধর্মবিদ্বেষীদের ধর্ম-সম্বন্ধে অসহিষ্ণুতার হয় তো নানা কারণ আছে। কিন্তু অনেকটা দায়িত্ব যে সনাতন-ধর্মের পতাকাবাহীদেরও ইহা অস্বীকার করা

চলে না। ধর্মের নামে বহু কুসংস্কার, অনাচার, অত্যাচার শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া ভারতীয় জনগণকে পীড়িত করিয়াছে—এখনও যে করিতেছে না তাহাও নয়। ধর্মকে রক্ষা করিবার ব্যাকুলতা যাঁহারা জাহির করেন তাঁহাদের সর্বাগ্রে উচিত ধর্মের নামে ধর্মের এই বিকৃতি-গুলি সম্বন্ধে সচেতন হওয়া। যাহা মানুষে মানুষে ভেদ এবং ভোগ-বৈষম্য বাড়াইয়া তুলে, যাহা মানুষকে সঙ্কীর্ণ, দুর্বল, অলস করে তাহা আর যাহাই হউক সনাতনধর্ম নয়। সনাতনধর্মের যাহা সত্যরূপ তাহা জনগণের কল্যাণের সহিত নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত—সেই রূপের পরিচয় না পাইয়াই ধর্মের এত ক্রম-বর্ধমান সমালোচনা—ধর্মের বিরুদ্ধে এত বিদ্রোহ।

* * *

দেখা যাইতেছে অনেক মঠ-মন্দির যাঁহারা এত কাল নিজেদের নিরাপদ গণ্ডীতে নিশ্চিন্ত আরামে শুইয়া 'ধর্মরক্ষা' করিতেছিলেন, আজ জনগণের কুসংস্কারমুক্ত তীক্ষ্ণ জিজ্ঞাসার ভয়ে কিছু কিছু লোকহিতকর কাজে হাত পা নাড়িবার চেষ্টা করিতেছেন। শুভ লক্ষণ। কিন্তু বুকে হাত দিয়া একটি জিনিষ ভাবিয়া দেখিবার আছে। এই লোকসেবার উদ্যম কি মানুষের দুঃখের প্রতি একটি আন্তরিক বেদনা-বোধ হইতে জাগিয়াছে—না নিজেদের সেই প্রাচীন নিন্দিত স্বার্থগুলি হারাইবার ভয়ে?

* * *

চাই হৃদয়ের পরিবর্তন। চাই কালের অব্যর্থ ইঙ্গিতকে নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে উপলব্ধি করা। বিধাতাপুরুষ আজ মানুষের প্রাণে উদ্বুদ্ধ করিয়াছেন বিশ্ববোধ—উহাই রূপ লইতেছে মানুষের প্রত্যেক চিন্তা, আশা, আকাঙ্ক্ষা, কর্মধারায়। সনাতনধর্মের ঝাণ্ডা যাঁহারা ধরিয়া রাখিবার দাবী করেন তাঁহাদিগকে ইহা উপেক্ষা করিলে চলিবে না।

ইহার সহিত সামঞ্জস্য-বিধান করিতে গিয়া অনেক কিছু হয়তো ধসিয়া পড়িবে—অনেকের অনেক কিছু ভোগাধিকার হয়তো হারাইতে হইবে, কিন্তু ইহা নিশ্চিত যে যাহা খাঁটি, যাহা সত্য, 'সর্বতোহিত' তাহা যাইবে না—তাহা উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর রূপে ভারতভূমিতে দীপ্তি পাইবে। যাহা মেকী, যাহা সংকীর্ণ, যাহা মাত্র মুষ্টিমেয়ের পার্থিব সুখ-সুবিধার জন্য—ধর্মের ক্ষেত্র হইতে তাহা যত শীঘ্র ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় ততই তো ভাল।

---

"অপর প্রাণিবর্গকে আত্মতুল্য ভালবাসিলে কেন কল্যাণ হইবে, কেহই তাহার কারণ নির্দেশ করেন নাই। একমাত্র নির্গুণ ব্রহ্মবাদই ইহার কারণ নির্দেশ করিতে সমর্থ। তখনই তুমি ইহা বুঝিবে যখন তুমি সমুদয় ব্রহ্মাণ্ডকে এক অখণ্ডস্বরূপ জানিবে—যখন তুমি জানিবে, অপরকে ভালবাসিলে নিজেকেই ভালবাসা হইল, অপরের ক্ষতি করিলে নিজেরই ক্ষতি করা হইল। তখনই আমরা বুঝি, কেন অপরের অনিষ্ট করা উচিত নয়। সুতরাং এই নির্গুণ ব্রহ্মবাদেই নীতিবিজ্ঞানের মূলতত্ত্বের যুক্তি পাওয়া যায়।"

—স্বামী বিবেকানন্দ

# সাধনায় সঙ্কল্প

## শ্রীশ্রীমা সারদামণি দেবী

## ( ৩ )

শ্রীযোগেশচন্দ্র মিত্র

আরও একটি বিষয় উল্লেখ করা যাইতে পারে যেখানে শ্রীমার সঙ্কল্পের দৃঢ়তা প্রকাশ পায়। স্বামী তাঁহার গভীর অপার্থিব প্রেমের বস্তু হইলেও তাঁহার উপর শ্রীমার অন্যান্য ভক্তদের অপেক্ষা কিছুমাত্র অধিক দাবী নাই এই ভাব তাঁহার বদ্ধমূল হইয়াছিল। এরূপ হওয়া যে কতদূর কঠিন তাহা কেবল অনুমান দ্বারাই বোধগম্য হয়। যখন কোন রমণী শ্রীমার হাত হইতে ঠাকুরের জন্য আহার্যের থালা লইয়া তাঁহাকে আহার করিতে দিয়া স্থানত্যাগ করিলেন, তখন মা নিকটে আসিলে ঠাকুর সেই অন্ন গ্রহণ করিতে চাহিলেন না। তখন মা বলিলেন—"কেহ মা বলিয়া আসিয়া দাঁড়াইলে তাহাকে ফিরাইতে পারি না। তবে এবার হইতে নিজে দিবার চেষ্টা করিব।" ইহাতে মার কি মহানুভবতাই প্রকাশ পায়! যদি কেহ ঠাকুরের সেবা করিয়া উদ্ধার পাইতে চায়, সে পবিত্র হউক বা পতিতই হউক, আমার তাহাতে বাধা দিবার কোনও অধিকার নাই, ইহাই শ্রীমার মনের ভাব। আবার পক্ষান্তরে করুণার রাজ্যে তিনি যে স্বতন্ত্রা, অন্য কাহারও, নিজের স্বামীরও মুখাপেক্ষা করেন না, এই ব্যাপারে ইহাও প্রকাশিত হইল। কি অদ্ভুত চরিত্র! অথচ ইনিই (শ্রীমা) এক শিষ্যাকে বলিয়াছিলেন—"বলতে পারলে না আমি ভগবানকে চাই না, তোমাকেই (অর্থাৎ স্বামীকে) চাই?" চরিত্রে বিচিত্র পরিপন্থী ভাবের কি সুন্দর সমাবেশ! সাধনাবলে মা যে সমত্ববুদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন ইহাতে তাহাও বেশ প্রতিপন্ন হয়। সমোঽহং সর্ব্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ—ব্রহ্মদর্শীর নিকট সকলেই সমান, তাঁহার নিকট পবিত্র পতিত নাই। শ্রীমার ভাবাদ্বৈত, ক্রিয়াদ্বৈত ও দ্রব্যাদ্বৈত তিনই সিদ্ধ হইয়াছিল।

আর একটি ব্যাপার—মার তারকেশ্বরে হত্যা দিতে গিয়া ঠাকুরের জন্য ঔষধ না লইয়াই ফিরিয়া আসা। ইহার পূর্বে মার নির্বিকল্প সমাধি অধিগত হইয়াছিল। এই সমাধির পথে মহত্তত্ত্ব বা অস্মিতা-সমাধিতে উঠিলেই আর কিছু অজানা থাকে না। হত্যা দিবার সময় সূক্ষ্মচিন্তার ফলে তখন হয়ত মার নিকট স্পষ্ট প্রকাশিত হইল যে ঠাকুরের জীবন এবার রক্ষা করা সম্ভব নহে; কুমারের হাঁড়ি-ভাঙ্গার শব্দও তাহার দ্যোতক। তাহা ছাড়া মা হয়ত বুঝিলেন ইচ্ছা করিলে ঠাকুর নিজেই নিজের জীবন রক্ষা করিতে পারেন, মায়ের চেষ্টা আবশ্যক হয় না, এরূপ চেষ্টা ধৃষ্টতামাত্র। তৃতীয়তঃ সমাধিতে মন যখন একাকার হইয়া যায় তখন—

> সর্বভূতস্থমাত্মানং সর্বভূতানি চাত্মনি।
> ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্বত্র সমদর্শনঃ॥ (গীতা)

"তখন কে কার স্বামী, কে কার স্ত্রী!"

এইবার মার সাধনার চতুর্থ বা শেষ পর্ব। ইহাকে মার সাধনার পর্যায় না বলিয়া লীলা বলা

যাইতে পারে। পরমহংসদেবের প্রকট অবস্থায়ই মার সাধনা সমাপ্ত হইয়াছিল, তাই ঠাকুর তাঁহাকে বলিয়াছিলেন যে এখনকার লোকেরা অর্থাৎ সংসারী জীব পোকার মত কেবল ক্লেদে কিলবিল করিতেছে, অতএব তাহাদের ভার শ্রীমাকে লইতে হইবে। মা ব্রহ্মবিৎ হইয়াছিলেন, এবার ব্রহ্মবিদ্বরিষ্ঠ হইতে চলিলেন—

প্রাণো হ্যেষ যঃ সর্বভূতৈর্বিভাতি বিজানন্
বিদ্বান্ ভবতে নাতিবাদী।
আত্মক্রীড় আত্মরতিঃ ক্রিয়াবানেষ ব্রহ্মবিদাং
বরিষ্ঠঃ॥
( মুণ্ডক উপনিষৎ )

অর্থাৎ যিনি সমুদয় ভূতের আত্মরূপে প্রকাশ পাইতেছেন, তিনিই প্রাণস্বরূপ, তাঁহাকে যিনি জানেন সেই বিদ্বান অতিবাদী হন না, অর্থাৎ ব্রহ্মকে অতিক্রম করিয়া কোন কথা কহেন না। তিনি আত্মক্রীড় ও আত্মরতি হন, অর্থাৎ পরমাত্মাতেই ক্রীড়া করেন, পরমাত্মাতেই আনন্দিত হন এবং ( পারমার্থিক ) ক্রিয়াবান অর্থাৎ সৎকার্যশীল হন। ইনিই ব্রহ্মবিদ্‌দিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম।

পরমহংসদেবের দেহরক্ষার পর শ্রীমা যেরূপ জীবনযাপন করিয়াছিলেন ব্রহ্মবিদের এই বর্ণনার সহিত তাহা বর্ণে বর্ণে মিলে। পরমহংসদেবের তিরোভাবের পর তাঁহার স্বীয় দেহ-ধারণের আর ইচ্ছা হইল না; কিন্তু ঠাকুর যে সব কার্যের ভার তাঁহাকে দিয়াছিলেন তাহার কিছুই করা হয় নাই, তাই তিনি দেহত্যাগ করিলেন না। শিষ্য ও ভক্তদের সংখ্যা বাড়িতে লাগিল। কিন্তু তাঁহার মন আর সংসারে নিবিষ্ট হইতে চায় না। তাঁহার সন্তানেরা তাঁহাকে তীর্থভ্রমণে লইয়া গেলেন। কাশীতে এক নেপালী সাধিকা যিনি অনেক শাস্ত্রীয় প্রক্রিয়া জানিতেন তাঁহাকে 'পঞ্চতপা' করিতে বলিলেন। সাধনার চতুর্থ পর্যায়ে ইহাই শ্রীমার সর্বাপেক্ষা প্রধান বাহ্যিক অনুষ্ঠান। নবোঢ়া বধূর মত তাঁহার লজ্জা ছিল; বিশেষ প্রয়োজন না হইলে কাহারও সমক্ষে বাহির হইতেন না, বা কাহারও সহিত কথা কহিতেন না। যে কেহ মন্ত্র লইতে আসিতেন তিনি স্ত্রী বা পুরুষ হউন, মা কাহাকেও বিমুখ করিতেন না। আত্মসংযম-বিষয়ে তাঁহার আদেশ কঠোর ছিল। পুরুষ ভক্তদের বলিতেন—"যদি কাঠের নির্মিত স্ত্রীদেহ হয় তবুও তাহার দিকে তাকাইবে না।" স্ত্রীভক্তদের বলিতেন—"পুরুষদের কখনও বিশ্বাস করিও না, উহাদের দিকে চাহিয়াও দেখিও না।" আবার যদি শুনিতেন কোনও ভক্ত বিপথে গিয়াছেন তবে বলিতেন—"ছেলে কাদা বা ময়লা মাখিলে কি হইবে, মা ধুইয়া মুছাইয়া কোলে লইবেন।" "ঠাকুরের ছেলে, উহার আবার ভয় কি?" মা কাহাকেও নিরুৎসাহ করিতেন না। মুক্তির পথ সকলের জন্য অবারিত। হোঁচট খাইয়া পদস্খলন হইলে দেরি হইতে পারে, কিন্তু তাহার জন্য দরজা বন্ধ কখনও হয় না।

মার জীবন যতই পর্যালোচনা করা যায় ততই প্রতীয়মান হয় যে সমস্ত সংস্কার তিনি ত্যাগ করিয়াছিলেন; তাঁহার জ্বলন্ত আধ্যাত্মিকতার সম্মুখে কোনও সংস্কারের বাধাই টিকিতে পারিত না।

যথৈধাংসি সমিদ্ধোঽগ্নির্ভস্মসাৎ কুরুতেঽর্জুন।
জ্ঞানাগ্নিঃ সর্বকর্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা॥
( গীতা )

অথচ যাহা করিতেন সে সবই তাঁহার শুভ সংস্কারের ফল। বেতালে পা কখনও পড়িত না। কখনও কোন পতিতা তাঁহার শ্রীচরণ দর্শন করিতে আসিলে তিনি পরম স্নেহের সহিত তাহাকে গ্রহণ করিতেন। একবার এই লইয়া কথা উঠিলে তিনি বলিয়াছিলেন—"আমার কাছে

না আসবে ত ওরা কার কাছে যাবে? আমি কাউকেও বাদ দিতে পারব না। ঠাকুর কেবল রসগোল্লা খেতে এখানে আসেন নি।" ঠাকুর তাঁহাকে বলিতেন "ক্ষমারূপা তপস্বিনী"।

এক সময় কোন সম্ভ্রান্ত কুলমহিলা ভ্রান্তিবশতঃ বিপথে গিয়া পড়েন, কিন্তু পূর্বসুকৃতি-বলে কোনও সাধুর কৃপাদৃষ্টি লাভ করিয়া স্বীয় দুষ্কৃতির জন্ত অনুতপ্ত হন। সাধুর পরামর্শে একদিন বাগবাজারে শ্রীমার দর্শনের জন্ত আসিয়া ঠাকুরঘরের বাহিরে দাঁড়াইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে স্বীয় পদস্খলনের কথা মার নিকট বিবৃত করিলেন এবং তিনি যে সেই পবিত্র মন্দিরে আসিয়া মার সম্মুখে দাঁড়াইবার অযোগ্য এই বলিয়া তাঁহার উপায় কি হইবে জিজ্ঞাসা করিলেন। করুণাময়ী মা আর থাকিতে পারিলেন না; তৎক্ষণাৎ মহিলাটির নিকটে আসিয়া তাঁহার সেই পতিতপাবন বাহু দুটি দিয়া তাঁহার গলদেশ বেষ্টন করিয়া সাদরে তাঁহাকে বলিলেন—"এস মা, ঘরে এস। পাপ কি তা বুঝতে পেরেছ, অনুতপ্ত হয়েছ। এস, আমি তোমাকে মন্ত্র দেবো—ঠাকুরের পায়ে সব অর্পণ করে দাও—ভয় কি?" নাগ মহাশয় ঠিকই বলিয়াছিলেন—"বাপের চেয়ে মা দয়াল!" এরূপ পতিতোদ্ধারিণী কি আর আছে? যিশুর পতিতার প্রতি দয়া, শ্রীচৈতন্তের পতিতদের প্রতি অসীম করুণা এই সূত্রে স্মরণ হয়। এ যেন শ্রীরামচন্দ্রের পাষাণী-উদ্ধার! স্রোতোবহা জাহ্নবীর ন্তায় দয়াময়ী যাহাকে স্পর্শ করিয়াছেন সেই পবিত্র হইয়াছে।

নাট্যালয়ের অভিনেত্রীরা সময়ে সময়ে মার দর্শনলাভের জন্ত আসিতেন। মা সমাদরে তাঁহাদের বসাইয়া পরিতোষ-পূর্বক প্রসাদ-ভোজন করাইতেন। একবার বিখ্যাত অভিনেত্রী তিনকড়ি দাসী আসিয়া মার অনুরোধে 'বিল্বমঙ্গলে'র পাগলীর গানটি তাঁহার অনিন্দ্যকণ্ঠে গা হলেন—"আমায় নিয়ে বেড়ায় হাত ধরে"। এই গানটি শুনিয়া মা মোহিত হইয়া সমাধিগতপ্রায়া হইয়াছিলেন। মার পল্লীগ্রামে জন্ম, কতপ্রকার ছোঁয়া ছুঁইর সংস্কার তাঁহার মধ্যে থাকিবার কথা; কিন্তু তিনি এসব যেন মন হইতে মাজিয়া বাহির করিয়া দিয়াছিলেন। মা তাঁহার শ্বেতাঙ্গিনী ভক্তাদের সহিত একত্রে বসিয়া এক দিন আহার করিয়াছিলেন; তাহাতে তাঁহারা কৃতার্থ হইয়াছিলেন। একবার এক শিষ্যাকে বলিয়াছিলেন—"দেখ মা, সকলেই বলে এ দুঃখ ও দুঃখ, ভগবানকে এত ডাকলুম, তবু দুঃখ গেল না। কিন্তু দুঃখই ত ভগবানের দান।" আবার বলিয়াছিলেন—"আমি অশান্তি বলে ত কখনও কিছু দেখলাম না। আর ইষ্টদর্শন, সে তো হাতের মুঠোর ভেতর—একবার বসলেই দেখতে পাই।"

মার সুখ-দুঃখ বলিয়া কিছু জ্ঞান ছিল না। যখন নহবতের সঙ্কীর্ণ ঘরে থাকিতেন তখন শরীরের রীতিমত চালনার অভাবে তাঁহার পায়ে বাত হইয়া গিয়াছিল; এই বাত তাঁহাকে সারাজীবন কষ্ট দিয়াছে। তাঁহার ভক্তারা আসিয়া তখন তাঁহার ঘর দেখিয়া বলিতেন—"আহা, কি ঘরেই আমাদের সীতালক্ষ্মী আছেন গো—যেন বনবাস গো!" ঘণ্টার পর ঘণ্টা দরমার ফুটা দিয়া ঠাকুরের সমাধি, ভাব ও ভক্তদের সহিত আলাপ দেখিতেন। ঠাকুরের ছায়ায় তাঁহার কোনও কষ্টই বোধ হইত না। মার নিজের অভাববোধ কিছু ছিল না, তাই সকলের নিঃস্বার্থভাবে সেবা করিতে পারিতেন। ঠাকুর যেমন তাঁহাকে আত্মাশক্তি-জ্ঞানে পূজা করিয়াছিলেন, শ্রীমাও

তাঁহাকে কালী, ইষ্টদেব-ভাবে দেখিতেন। নিজেকে কখনই প্রচার করিতেন না, সবই যে ঠাকুরের ইহাই জানিতেন এবং শিষ্যভক্তদেরও তাহাই জানিতে ও বিশ্বাস করিতে বলিতেন। শিষ্য ও ভক্তদের উচ্ছিষ্ট নিজের হাতে পরিষ্কার করিতেন। কখনও কোনও দ্বিধা করিতেন না। ঈশ্বরের উপাসনাই মার একমাত্র সংস্কার ছিল, আর সব সংস্কারই তিনি ত্যাগ করিয়াছিলেন। অর্থাৎ এই এক সংস্কারে নিমজ্জিত করিয়াছিলেন। মার সাধনার শেষ পর্বে মধুর লীলার মধ্যে এই সব ভাব প্রকটিত হইয়াছিল। মন্দ জিনিসেও মা সেই ভবসুন্দরকে দেখিতেন। বলিতেন, এই রকম টান মানুষের ভগবানের প্রতি কেন হয় না? মার শ্বেতাঙ্গ ভক্ত, শিষ্যগণের প্রতিও সমান টান ছিল। তাঁদের মন্ত্র দিতেন ও পরম স্নেহে আপ্যায়িত করিতেন। আত্মনিগ্রহে সচেষ্ট অথচ অসমর্থ। শিষ্য-ভক্তেরা অনুযোগ করিলে মা উৎসাহ দিয়া বলিতেন—"সবাই ( অর্থাৎ রিপুগণও ) নিজের দিকে টানে, ভয় কি, সব ঠিক হয়ে যাবে।" আশ্রমে থাকিয়া বিলাসিতা ও কর্মহীনতা আসে, সেই জন্য মা কোনও কোনও সন্ন্যাসী ভক্তকে আশ্রমে বা মঠে থাকিতে নিষেধ করিতেন। যখন কোনও শিষ্য মন্ত্র-জপকেই প্রাধান্য দিতেন তখন শ্রীমা বলিতেন—"ওসব মনের বিশ্বাসের জন্য মাত্র; জপতপের দ্বারা কর্মপাশ কেটে যায়, কিন্তু ভগবানকে প্রেমভক্তি ছাড়া পাওয়া যায় না, তাঁর কৃপাতেই তাঁকে পাওয়া যায়।"

সংসারে স্নেহপ্রবণ লোককে মা বলিতেন—"যার উপর যেমন কর্তব্য করে যাবে, কিন্তু ভাল এক ভগবান ছাড়া আর কাউকে বেসো না। ভালবাসলে অনেক দুঃখ পেতে হয়।" শ্রীমার ভক্তি-প্রেমপূর্ণ বাণী ও উপদেশ কত লোককে অভ্রান্তপথে চালিত করিয়াছে!

শ্রীমার শ্রীচরণ দর্শন করিবার সৌভাগ্য লেখকের হয় নাই। দর্শন করিবার কত সুবিধা ছিল, কিন্তু সময় না হইলে কিছু হয় না। মহাকবি কালিদাস বলিয়াছেন—

যথা গজো সাধু সমক্ষরূপে কস্মিন্নপি ক্রামতি
সংশয়ঃ স্যাৎ।
পদানি দৃষ্ট্বা তু ভবেৎ প্রতীতিস্তথাবিধো মে
মনসো বিকারঃ॥

অর্থাৎ—কোনও একটি হস্তী প্রত্যক্ষরূপে যখন সম্মুখ দিয়া চলিয়া যায় তখন মন বিষয়ান্তরে ব্যাপৃত থাকিলে যেমন তাহাকে দেখিয়াও দেখি না, মনে সংশয় হয় ওটা কি একটা হাতী গেল? আর তার পরে তার পদচিহ্ন দেখিয়া বুঝিতে পারি যে, সেটি হাতীই বটে, সেইরূপ আমার মনের এই বিপর্যয়; অর্থাৎ প্রত্যক্ষ দেখায় অবহেলা করিয়া অনুমানের সাহায্যে বস্তুনির্ধারণ করি।

সেইরূপ শ্রীমা যখন প্রকট ছিলেন তখন তাঁহাকে দর্শন করিবার কথা মনে হয় নাই, তাঁহার অস্তিত্বই অবগত ছিলাম না। এখন বই পড়িয়া ও তাঁহার সন্তানদের মুখে শুনিয়া মনে হইতেছে জীবনে কি সুযোগই হারাইয়াছি। কিন্তু এখন তিনি সর্বত্র বিরাজিত, প্রতি অনুপরমাণুতে অনুস্যূত। তাঁহার আকর্ষণ ও প্রভাব সকলের উপর, কেহ বাদ যায় না। তাঁহার আত্মপর নাই। এই আশায় মুগ্ধ হইয়া মা'র বাউল সন্তানদের কথায় বলি—

( মাগো ) আমি তোমার শূন্যকুম্ভ, পূর্ণকুম্ভ নই,
তাইত মা, তোর জলের খেলায় ( তোমার )
বুকের তলে রই।

মা, তুমি ছাড়া আর কে এই জ্ঞানহীন,

ভক্তিহীন, কর্মহীন, অন্তঃসারশূন্য সন্তানকে বুকে রাখিয়া খেলার ছলে এই দুস্তর ভবজলধি সন্তরণ করে! শূন্যকুম্ভ না হইলে যে তোমার সাঁতার দেওয়া হয় না। তাইত এই ক্ষণভঙ্গুর মৃৎকুম্ভের জন্ম তোমার যত সাবধানতা; তোমার আদর-যত্নের শেষ নাই। তোমাকে চর্মচক্ষে দর্শন না করিলেও তুমি যে নিকটেই আছ তাহা অনুভব করি।

তাই যেমন তোমার এক ভক্ত রাত্রদুপুরে আসিয়া "উঠ গো করুণাময়ি খুলগো কুটির-দ্বার" বলিয়া গীতস্বরে ডাকিলেই তুমি জানালা খুলিয়া তাহাকে দেখা দিতে, আর সে আনন্দের আতিশয্যে রাস্তায় গড়াগড়ি দিয়া পরে সেই রাস্তার ধূলি তুলিয়া মাথায় দিয়া নিজের মনে গাহিতে গাহিতে স্বীয় গৃহপানে চলিয়া যাইত, সেইরূপ তোমার এই অজ্ঞানান্ধ সন্তান তোমাকে স্মরণ করিতে করিতে তাহার শেষ গৃহপানে গমন-সময়ে তোমার স্নেহকরুণ দৃষ্টি পাইবেই এই দৃঢ়বিশ্বাস ও নির্ভরের পাথেয় লইয়া যেন এই জীবন-সায়াহ্নে সংসারের বাকী পথটুকু সেই ভক্ত-প্রবরের গানের এই কলিটি গাহিতে গাহিতে অতিক্রম করিয়া যায়—"যতনে হৃদয়ে রেখ আদরিণী শ্যামা মাকে।"

---

# অনির্বচনীয়

শ্রীদেবল

সতের বুকেতে অসতের আভরণ
কেন এল কেবা জানে,
মরীচিকা-মায়া মরুপ্রাণ-আবরণ
বৃথা বারি-আশা দানে।
অনন্ত-মন সান্ত কিরূপে হয়
প্রকাশিতে নারে ভাষা,
অসীম কিরূপে সসীমের রূপে রয়
বুঝিবার নাহি আশা।
নিষ্ক্রিয় জনে কর্মের অভিমান
উপকথা বলা চলে,
স্বরূপ না ছাড়ি অরূপের রূপে ভান
তবু ঘটে পলে পলে।

---

# প্রাচীন বঙ্গ-পরিচিতি

শ্রীঅশোক চট্টোপাধ্যায় এম্‌-এ

প্রাচীন বঙ্গদেশের ভৌগোলিক বিভাগ ও উহার পরিচয়-সম্বন্ধে পণ্ডিতদের মধ্যে গবেষণার আর অন্ত নাই। বরেন্দ্র, পুণ্ড্রবর্ধন, সমতট, হরিকেল, বজ্জ, সুহ্ম, তাম্রলিপ্তি, চন্দ্রদ্বীপ, গৌড়, বঙ্গ ইত্যাদি প্রাচীন বঙ্গদেশের বিভাগ-সমূহ লইয়া যথেষ্ট আলোচনা হইয়াছে। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের বিভিন্ন পণ্ডিতের গভীর গবেষণামূলক আলোচনার ফলে অধুনা প্রাচীনকালের বঙ্গদেশ-বিভাগের উপর যথেষ্ট আলোকপাত হইয়াছে। সকলেই যে একমত তাহা নহে, বরঞ্চ বিভিন্ন পণ্ডিতের মতের বৈষম্যই দেখা যায়, তবুও কোন কোন বিষয়ে তাঁহারা একমত।

দেশ-বিভাগের পূর্বে উত্তরবঙ্গ বলিতে যাহা বুঝাইত প্রাচীন পুণ্ড্রবর্ধন বলিতে মোটামুটি তাহাই বুঝাইত। চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ্‌ যে পুণ্ড্রবর্ধন দেখিয়া গিয়াছিলেন তাহা পশ্চিমে গঙ্গা ও পূর্বে করতোয়া নদী দ্বারা সীমাবদ্ধ ছিল। পুণ্ড্র ও পৌণ্ড্র যে দুইটি বিভিন্ন জাতি এবং শেষেরটি প্রয়াগের পূর্বে ও মগধের (দক্ষিণ বিহার) পশ্চিমে বাস করিত, তাহার কোন যুক্তি নাই—বিভিন্ন গুপ্তসম্রাটের শিলালিপি হইতেই বুঝা যায় যে দুইটি একই জাতি। খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে পুন্দ্‌ নামটিই পৌণ্ড্র নামে পরিচিত হইয়াছিল। এবিষয়ে যথেষ্ট প্রমাণ রহিয়াছে। বৈগ্রাম, দামোদরপুর-লিপি হইতে জানা যায় যে, ইহা গুপ্তসম্রাটগণের প্রধান ভুক্তি ছিল। বগুড়া, দিনাজপুর, ও রাজসাহী জেলা যে ইহার অন্তর্ভুক্ত ছিল তাহা বেশ জোর করিয়াই বলা যায় এবং ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, উত্তরোত্তর কালে ইহার সীমানা বিস্তার-লাভ করিয়াছে। যেমন, ধর্মপালের খালিমপুর অনুশাসন পাঠ করিলে জানিতে পারা যায় ব্যাঘ্রতটী মণ্ডল (বোধ হয় ব্যাঘ্র-অধ্যুষিত সুন্দরবন অঞ্চল) পুণ্ড্রবর্ধনেরই একটি অংশ-বিশেষ ছিল। সেনরাজগণের সময়ে খড়িমণ্ডল (বর্তমান খড়িপরগনা, ২৪ পরগনা) ইহার অন্তর্ভুক্ত ছিল। ত্রিকাণ্ডশেষের সাক্ষ্য-অনুসারে বা সিলিমপুর ও মাধাইনগর লিপি-অনুযায়ী বরেন্দ্রভূমি পুণ্ড্রবর্ধনেরই অংশমাত্র। খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দী হইতে বারেন্দ্রী-পুণ্ড্রবর্ধনের একটি জেলা বলিয়া পরিগণিত হইত। সন্ধ্যা-কর নন্দীর সাক্ষ্যে বিশ্বাস করিলে বারেন্দ্রীর সীমানা পশ্চিমে গঙ্গা হইতে পূর্বে করতোয়া পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল ইহা ধরিয়া লইতে হয়। ইহা হইতে অনুমান করা বিশেষ কষ্টকর হয় না যে, উত্তর-দক্ষিণে বরেন্দ্রভূমির বিস্তার পুণ্ড্রবর্ধন অপেক্ষা অনেক কম ছিল। তাহা হইলেই ডক্টর রায়চৌধুরীর মত (বরেন্দ্রভূমি= অধুনা রাজসাহী-বিভাগ) গ্রহণযোগ্য বলিয়া মনে করিবার বিশেষ কোনও কারণ নাই। ডক্টর নীহাররঞ্জন রায় মহাশয়ের মতে বর্তমান বগুড়া, দিনাজপুর, রাজসাহী এবং বোধ হয় পাবনা জেলা লইয়াই পুরাতন বরেন্দ্রভূমি গঠিত ছিল। বরেন্দ্রভূমির বিভিন্ন স্থানের মধ্যে কান্তাপুর (বর্তমান দিনাজপুর জেলার কান্তনগর) ও

নাটারি (বর্তমান রাজসাহী জেলার নাটোর) উল্লেখযোগ্য।

মোটামুটি ভাবে বলিতে গেলে ভাগীরথীর দক্ষিণভাগ হইতে আরম্ভ করিয়া অজয়নদের উত্তরভাগ পর্যন্ত যে ভূখণ্ড তাহারই প্রাচীন নাম ছিল বজ্জ। অবশ্য কোন কোন সময়ে ইহার উত্তর সীমানা ভাগীরথীকে অতিক্রম করিয়া কিছুদূর পর্যন্ত বিস্তারলাভ করিয়াছিল। সেন-আমলের পূর্বে ইহা বর্ধমানভুক্তির অন্তর্ভুক্ত ছিল; কিন্তু লক্ষ্মণসেনের সময়ে ইহা কঙ্ক-গ্রামভুক্তির অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়ে। (এপিগ্রাফিয়া ইণ্ডিকা—২১খণ্ড, ২১৮ পৃষ্ঠা) দীক্ষিতের মতে কঙ্কগ্রামটি বর্তমান কাঁকজোল। (এপিগ্রাফিয়া ইণ্ডিকা—২১ খণ্ড, ২১৪ পৃষ্ঠা) লক্ষ্মণসেনের শক্তিপুর-অনুশাসন হইতে জানা যায় যে বর্তমান মুর্শিদাবাদ জেলার পশ্চিম অংশ বা বর্তমান কান্দী মহকুমা ইহার অন্তর্গত ছিল। ইহা ছাড়া যে বীরভূম জেলা, সাঁওতাল পরগনা ও কাটোয়ার উত্তরভাগ বজ্জভূমির অন্তর্গত ছিল, সে বিষয়ে যথেষ্ট প্রমাণ আছে। তামিল-গ্রন্থ শিলপ্পধিকারম্-এ বজ্জের নামোল্লেখ পাওয়া যায়। টীকাকারের মতে শোণনদীর পার্শ্বে বজ্জের অবস্থিতি এবং উহার চারিধারে অগাধ জলরাশি ছিল। বঙ্গদেশের বজ্জভূমির সহিত তামিল-গ্রন্থে উল্লিখিত বজ্জের কোন সম্বন্ধ ছিল বলিয়া মনে হয় না। অশোকের অনুশাসনের বজ্জভূমিকের সহিতও ইহার কোন সম্বন্ধ নাই। বজ্জের সংস্কৃত শব্দ বজ্র; তাহার অর্থ কঠিন বা বীর। সুতরাং বজ্জ-ভূমি বা বজ্রভূমির অর্থ বীরভূমি বা বীরভূম বলিয়া ডক্টর বিনয়চন্দ্র সেন মহাশয় যে মত প্রকাশ করিয়াছেন তাহা খুবই গ্রহণযোগ্য বলিয়া মনে হয়।

বজ্জভূমির দক্ষিণভাগে অবস্থিত প্রদেশের নাম ছিল সুহ্ম। কেহ কেহ মনে করেন যে অজয় নদই দুই প্রদেশের মধ্যবর্তী সীমানা ছিল, কিন্তু ডক্টর রায়চৌধুরী মহাশয় যথাযথভাবে প্রমাণ করিয়াছেন যে অজয় মধ্যবর্তী সীমানা-নির্দেশক ছিল না। খারিই বজ্জ ও সুহ্মের মধ্যবর্তী সীমানাসূচক ছিল (হিষ্টি অব বেঙ্গল—প্রথম খণ্ড, ২২ পৃষ্ঠা)। বিভিন্ন বিভিন্ন শিলা-লিপি আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, ভূরিশ্রেষ্টি (বর্তমান ভুরশুট্), নবগ্রাম (হাওড়া এবং হুগলী জেলায়) এবং দামুন্যা (বর্ধমান জেলায় দামোদরের পশ্চিমে) ইহার অন্তর্গত ছিল, ইহার পশ্চিম সীমানা দামোদর ছাড়াইয়া হুগলী জেলার আরামবাগ মহকুমা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। মহাভারতের সভাপর্বে ভীমের দিগ্বিজয়ের বিবরণ হইতে জানিতে পারা যায় যে, ইহার একপ্রান্ত সমুদ্রের অত্যন্ত নিকটে ছিল; সেই প্রান্তটি নিঃসন্দেহে দক্ষিণ প্রান্ত। লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, মহাভারতের সময়ে তাম্রলিপ্তি সুহ্মভূমির নিকটে ছিল, কিন্তু পরবর্তী কালে দণ্ডীর সময়ে (খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দী) ইহার অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়িয়াছে। এই বিষয়ে দশকুমারচরিতের সাক্ষ্য গ্রহণ করা যাইতে পারে। কপিশা বা কাঁসাই নদী উৎকল ও সুহ্মভূমির মধ্যবর্তী সীমানাসূচক হইলেও হইতে পারে। এই সম্পর্কে জোর করিয়া কিছু বলা যায় না। কালিদাসের সময়েও ইহার দক্ষিণ সীমানা সমুদ্র পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল; তবুও ডক্টর নীহাররঞ্জন রায় মহাশয় কেন যে বলিতেছেন ইহার দক্ষিণ সীমানা রূপনারায়ণ নদ পর্যন্ত, তাহা বিশেষ বুঝা গেল না। কাব্যমীমাংসা, মার্কণ্ডেয়-পুরাণ বা বৃহৎ-সংহিতা এই বিষয়ে নূতন কোন আলোক-সম্পাত করিতেছে না। ইহা ভারতবর্ষের পূর্বদিকে অবস্থিত এইটুকু মাত্র তাহারা

বলিতেছে। তবে ইহাদের মতে তাম্রলিপ্তি সুহ্মের অন্তর্গত ছিল না বোধ হয়; কারণ তাহা হইলে পূর্বদেশের নামোল্লেখের মধ্যে সুহ্ম ও তাম্রলিপ্তি এই দুইটির নাম পৃথক করিয়া উল্লিখিত হইল কেন? প্রসঙ্গক্রমে বলা যাইতে পারে যে, মার্কণ্ডেয়-পুরাণের ব্রহ্মোত্তর পাঠটি ভুল। পার্জিটারের সুহ্মোৎকলা পাঠটি যদি অগ্রাহ্যও করা যায় তাহা হইলেও মৎস্যপুরাণের সুহ্মোত্তরা পাঠটি শুদ্ধ বলিয়া ধরিয়া লইতে দোষ কি? যাহা হউক—উল্লিখিত বিবরণ হইতে জানা যায় যে, বর্তমান হাওড়া, হুগলী, বীরভূম, বর্ধমানের বহুলাংশ ও মেদিনীপুরের উত্তরপূর্বাংশ প্রাচীন সুহ্মভূমির অন্তর্ভুক্ত ছিল।

পরবর্তী কালে (কাহারও মতে দশম শতাব্দীতে, কাহারও মতে দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে) বজ্জভূমি ও সুহ্মভূমি যথাক্রমে উত্তররাঢ় ও দক্ষিণরাঢ় এই নামে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল এবং এই দুইটি মিলিয়াই প্রসিদ্ধ রাঢ়দেশ। মহাভারতের টীকাকার নীলকণ্ঠের মতে রাঢ় ও সুহ্ম সমানদেশ-বোধক, কিন্তু এই মতটি অনায়াসেই অগ্রাহ্য করা যাইতে পারে।

অধুনা পূর্ববঙ্গের একমাত্র উত্তরাংশ ছাড়া প্রায় সমস্তটাই প্রাচীন 'বঙ্গ' এই বিভাগের অন্তর্গত ছিল। এমনকি ইহার পশ্চিম সীমানা মেদিনীপুর জেলার কাঁসাইনদী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। জৈন উপাঙ্গ প্রজ্ঞাপনার মতানুযায়ী তাম্রলিপ্তি বঙ্গেরই একটি নগরী। (ইণ্ডিয়ান্ এণ্টিকোয়ারী, ১৮৯১, ৩৭৫ পৃষ্ঠা) অবশ্য পালরাজাদিগের বা সেন-রাজাদিগের আমলে ইহার পশ্চিম সীমানা আরও সঙ্কুচিত হইয়া পড়িয়াছে; কারণ তাম্রলিপ্তি বা তমলুক তখন বর্ধমানভুক্তির অন্তর্গত। মেদিনীপুর জেলার দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিম অংশ এবং বালেশ্বর জেলার কিছু অংশ লইয়া বর্ধমানভুক্তি গঠিত ছিল। তাম্রলিপ্তি যে বঙ্গের অন্তর্ভুক্ত নহে এই সম্পর্কে মহাভারতও প্রমাণ। ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, রাজশেখর তাঁহার কাব্যমীমাংসায় দেশবিভাগের মধ্যে বঙ্গের নামোল্লেখ করেন নাই। বৃহৎসংহিতার মতে ইহা ভারতের পূর্ব-দক্ষিণ দিকে অবস্থিত। মার্কণ্ডেয়-পুরাণে পূর্বদেশের মধ্যে 'রঙ্গেয়' এই নামটি পঠিত আছে। ইহার পাঠ হইবে 'বঙ্গেয়'। পার্জিটার বলিতেছেন যে, ইহা বর্তমান বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, বর্ধমান ও নদীয়াকে লইয়া গঠিত ছিল; কিন্তু তাঁহার মত সমর্থনযোগ্য নহে। ইদিলপুর-অনুশাসন পাঠ করিলে মনে হয় যে, বিক্রমপুর বঙ্গেরই অন্তর্গত ছিল। ডক্টর বিনয়চন্দ্র সেন মহাশয়ের মতে ইহা ভাগীরথীর পূর্বদিক হইতে আরম্ভ করিয়া ময়মনসিংহ, কুমিল্লা, ত্রিপুরা, নোয়াখালী এবং বোধ হয় চট্টগ্রাম পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। 'বঙ্গা লৌহিত্যাৎ পূর্বেণ' (লৌহিত্য = ব্রহ্মপুত্র নদ) ইহা যদি একেবারে অস্বীকার করা না যায় তাহা হইলে বলিতে হয় যে, ক্রমশঃ মধ্য বাঙ্গলাদেশ ছাড়িয়া পূর্ব বাঙ্গালাদেশের দিকেই বঙ্গের সীমানা বিস্তার-লাভ করিতেছিল এবং এই সময়ে যশোহর, খুলনা ও ইহাদের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের নাম উপবঙ্গ বলিয়া প্রসিদ্ধিলাভ করিতে থাকে।

অনেক পণ্ডিতের মতে সমতট ও বঙ্গ একই ভূখণ্ডের পরিচায়ক। শেষের নামটির বহুদিন পর্যন্ত প্রচলন ছিল এবং প্রথম নামটি বহুকাল পূর্বেই নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে—মাত্র এইটুকু হইল এই দুইটির মধ্যে প্রভেদ। 'সমুদ্রতট-সন্নিকটবর্তী ভূভাগ' ইহাই হইল সমতট-শব্দের অর্থ। হিউয়েন সাঙের বিবরণী পাঠ করিলেও ইহা জানিতে পারা যায়। সমতটের বিস্তার পাঁচশত মাইল পরিমিত ছিল, সুতরাং ইহা যে ২৪ পরগনা, খুলনা হইতে আরম্ভ করিয়া ত্রিপুরার পূর্বপ্রান্ত পর্যন্ত বিস্তারলাভ করিয়াছিল, সে বিষয়ে আর কোনই

সন্দেহ নাই। কেন না হিউয়েন সাঙ্ বলিতেছেন যে, ইহার রাজধানী ছিল কর্মান্ত ( ত্রিপুরা জেলার বড় কাম্‌তা )। ফার্গুসনের মতে সমতটের কেন্দ্র কর্মান্ত নহে—ঢাকা, ওয়াটারের মতে ফরিদপুর। সমুদ্রগুপ্তের এলাহাবাদ-প্রশস্তিতে প্রত্যন্ত দেশের মধ্যে সমতটের নামোল্লেখ আছে বটে, কিন্তু ইহার রাজধানী-সম্পর্কে কোনও উল্লেখ নাই।

গৌড় এই নামটির সহিত বোধ হয় সকলেরই পরিচয় আছে। বিশেষতঃ পঞ্চগৌড় এই শব্দটির সহিত উত্তরবঙ্গের লোকেরা বিশেষভাবে পরিচিত। পাণিনির অষ্টাধ্যায়ীতে ইহার উল্লেখ আছে যদিও এই সম্পর্কে অনেকে সন্দেহ প্রকাশ করিয়া থাকেন। কৌটিল্য এবং পতঞ্জলিও গৌড়ের উল্লেখ করিয়াছেন। সুতরাং পাণিনির কথা বাদ দিলেও কিঞ্চিদধিক খৃষ্টপূর্ব তিন শতাব্দী হইতেই গৌড়ের খ্যাতি যে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল সে বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নাই। এমন কি খৃষ্টীয় দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দীতে গৌড় বলিতে রাঢ় দেশেরও অনেক অংশ বুঝাইত। চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতাব্দীর জৈন লেখকদিগের মতে বর্তমান মালদহের লক্ষ্মণাবতী গৌড়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ( জার্নাল্ অফ্ এশিয়াটিক সোসাইটি অফ্ বেঙ্গল—১৯০৮, ২৮১ পৃষ্ঠা ) অষ্টম শতাব্দীতে গৌড়নৃপতির কর্ণসুবর্ণে ( মুর্শিদাবাদ জেলার কান্‌সোনা ) রাজধানী ছিল ইহা নিঃসন্দেহে বলিতে পারা যায়। এই সব হইতে মনে হয় যে, বর্তমান মুর্শিদাবাদ, মালদহ এবং বীরভূম ও বর্ধমান অঞ্চল গৌড়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

হরিকেলের অবস্থান-সম্পর্কে জোর করিয়া কিছু বলা যাইতে পারে না। ইট্‌সিঙ, রাজশেখর প্রভৃতির মতে ইহা পূর্বভারতের পূর্ব-সীমানায় অবস্থিত। নোয়াখালী চট্টগ্রাম অঞ্চল ইহার অন্তর্গত ছিল বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে। শ্রীপ্রমোদলাল পাল মহাশয় সর্বপ্রথম বলেন যে, বর্তমান শ্রীহট্টই পুরাতন হরিকেল, এই সম্পর্কে তিনি মঞ্জুশ্রীমূলকল্পের দুইটি পাণ্ডু-লিপির প্রতি পণ্ডিতগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। কিন্তু ভোজবর্মণের বেলাব-লিপির সাক্ষ্য-অনুযায়ী হরিকেল শ্রীহট্ট-অঞ্চলে অবস্থিত হইতে পারে না। কাজেই সামঞ্জস্য বজায় রাখিতে গেলে দুইটি হরিকেলের অস্তিত্ব স্বীকার না করা ছাড়া আর উপায় নাই।

চন্দ্রদ্বীপ-ভূভাগ উল্লিখিত সকলের অপেক্ষা অনেক ছোট। এই সম্পর্কে ডক্টর রায়চৌধুরী, ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার ও ননীগোপাল মজুমদার মহাশয় ( শেষের জন তাঁহার ইন্সক্রিপ্‌সন্স অফ্ বেঙ্গল—৩য় খণ্ড ) যথেষ্ট আলোচনা করিয়াছেন। ডক্টর রাধাগোবিন্দ বসাক মহাশয়ের আলোচনাও উল্লেখযোগ্য। এইচ্ বেভেরিজ্ তাঁহার 'ডিষ্ট্রিক্ট অফ বাখরগঞ্জ' নামক পুস্তকে বলিতেছেন যে "Chandradvipa was the name of a small principality in the district of which the capital was at first at Kachua and subsequently removed to Madhavpasa." বিশ্বরূপ সেনের মধ্যপাড়া-অনুশাসনের যে অপূর্ণ অংশটি রহিয়া গিয়াছে তাহা 'চন্দ্রদ্বীপ'রূপেই পূরণ করিতে হইবে।

মোটামুটি প্রাচীনকালের বাঙ্গলাদেশের ভৌগোলিক বিবরণ-সম্পর্কীয় একটি ছবি খাড়া করা গেল; অনুসন্ধিৎসু পাঠকের মন এইদিকে আকৃষ্ট হইলে বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য সার্থক হইবে।

# ভগিনী নিবেদিতা

( ৩ )

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

ভগিনী নিবেদিতা হিন্দুভাবে ভাবুক হইয়া কিরূপভাবে হিন্দুর আচার-ব্যবহার প্রশংসা-সহকারে অধ্যয়ন করিতেন, তাহার দুইটি দৃষ্টান্ত দিতেছি—বন্যা ও দুর্ভিক্ষের সময় তিনি পূর্ববঙ্গে গিয়াছিলেন। তিনি শুনিয়াছিলেন, তথায় কোন নিমন্ত্রক নৌকায় যাইবার সময় কতকগুলি স্ত্রীলোককে গলা জলে দাঁড়াইয়া অপক্ক শস্যশীর্ষ সংগ্রহ করিতে দেখিয়া তাহাদিগকে নৌকায় উঠিতে বলিলে তাহারা বলিয়াছিল—তাহারা নৌকায় যাইতে পারে না—তাহারা বস্ত্রহীনা উলঙ্গ। পূর্ববঙ্গে ধান্যের পরিবর্তে পাটের চাষ-বৃদ্ধিতে লোকের অন্নাভাবে তাঁহার মনে পড়িয়াছিল—দীপালির রাত্রিতে তিনি ( কলিকাতায় ) একটি সঙ্কীর্ণ গলিতে ধূমায়িত খড় দেখিয়া বুঝিয়াছিলেন, তাহা পূজার চিহ্ন; জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়াছিলেন, তাহা অলক্ষ্মীপূজা—ঐ রাত্রিতে কদর্য স্থানে লোক পাটকাঠি প্রভৃতি পুড়াইয়া অলক্ষ্মীর পূজা করে। কত শতাব্দী পূর্বে হিন্দুরা পাটের অপকারিতা বুঝিয়া তাহাকে অলক্ষ্মীর প্রতীক বলিয়া মনে করিয়াছিল ভাবিয়া তিনি বিস্মিত হইয়াছিলেন — "Strange predestination surely! Through these several centuries has Hinduism been worshipping the Uuluck under the symbol of jute sticks!"

দীনেশবাবু লিখিয়াছেন—"শূন্যপুরাণের শিব-সম্বন্ধীয় একটা ছড়া আমি উদ্ধৃত করিয়াছিলাম। তাহাতে লিখা আছে—'শিব, তুমি কেন ভিক্ষা করিয়া খাও? ভিক্ষা বড় হীন বৃত্তি। কোনদিন জোটে, আর কোনদিন রিক্তভাণ্ডে ফিরিয়া আস। তুমি চাষ করিয়া ধান বোন, তা হলেই তোমার এ দুঃখ দূর হইবে। হে প্রভু, তুমি কতদিন উলঙ্গ হইয়া অথবা বাঘের ছাল পরিয়া কাটাইবে? যদি কার্পাস বুনিয়া তুলা তৈরী কর—তবে কাপড় পরিতে পাইয়া কত সুখী হইবে।' এই ভাব-সম্বলিত পয়ারের মধ্যে যে ভারতীয় কোন অপূর্ব প্রেরণা থাকিতে পারে, তাহা তো আমার মনেই হয় নাই। কিন্তু তিনি ঐ স্থানটি পড়িয়া একেবারে লাফাইয়া উঠিলেন, কেবল 'আশ্চর্য! আশ্চর্য!' এই কথাটি বারংবার বলিতে লাগিলেন। আমি বলিলাম, 'ভগিনী, এটাতে এমন কি জিনিস পেয়েছেন যে, দীন-দরিদ্র হঠাৎ রাজ্য পেলে যেরূপ আহ্লাদিত হয়, আপনি সেইরূপ হয়ে পড়েছেন?' নিবেদিতা সেই কবিতাটি হইতে দৃষ্টি না সরাইয়া, এক হাত দিয়া অপর হাত চাপিয়া ধরিয়া, আনন্দোৎফুল্ল চোখে কেবলই বলিতে লাগিলেন, 'ও দীনেশ বাবু, এটা একটা আশ্চর্য জিনিষ!' আমি ভাবিলাম, ক্ষেপা মেয়ের মাথায় কি যেন হয়েছে। সেই সময় সেখানে আর এক জন মেমসাহেব ছিলেন; আমি তাঁহার নাম ভুলিয়া গিয়াছি। পরদিন তাঁহাকে নিরালা পাইয়া আমি জিজ্ঞসা করিলাম, 'নিবেদিতা এই শিবের কবিতায় এমন আশ্চর্য কি পাইয়াছেন,

তাহা ত বুঝিতে পারিলাম না; আপনি কি শুনিয়াছেন?' তিনি বলিলেন, 'শুনেছি। সাধারণ ভক্ত ও উপাসক তাঁহাদের দেবতার নিকট সাহায্য চাহিয়া প্রার্থনা করেন—'ঠাকুর, আমায় ধন দিন, যশ দিন, মান দিন, স্বাস্থ্য দিন।' তাঁহারা কত কি বর-প্রার্থনা করেন। কিন্তু ঐ কবিতায় ভক্ত তাঁর উপাস্যের প্রতি অনুরক্ত হইয়া নিজেকে সম্পূর্ণভাবে ভুলিয়া গিয়াছেন। নিজের দুঃখের কথা তাঁর মনে নাই; ঠাকুরের দুঃখে তাঁর প্রাণ গলিয়া গিয়াছে; ঠাকুরের কষ্ট যাতে নিবারণ হয়, তাই তাঁর ভাবনার লক্ষ্য হইয়াছে।"

কি দৃষ্টিতে তিনি হিন্দুর বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করিতেন, তাহা উপরি-উদ্ধৃত দৃষ্টান্তদ্বয় হইতে আমরা বুঝিতে পারি। এই দৃষ্টির পরিচয় আমরা তাঁহার 'The Web of Indian Life' পুস্তকে পাই।

বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন, "হিন্দুকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া জন্ম সার্থক করিয়াছি।" আমরা যাহারা হিন্দুকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, তাহারা কয় জন ইহা মনে করি? যাহাকে "বাঁশ বনে ডোম কানা" বলে আমরা যে তাহাই হইয়াছি, তাহা নহে। দীর্ঘকাল হিন্দুস্থানের উপর দিয়া বহু বিজয়ের বাত্যা ও বিপ্লবের বন্যা বহিয়া গিয়াছে। আমরা কেবল রাজনীতি-ক্ষেত্রেই বিজিত হই নাই—অর্থনীতির ক্ষেত্রেও নহে—আমাদিগের চরম পরাজয় সংস্কৃতিতে। তাই আমাদিগের মধ্যে এক সম্প্রদায় হিন্দু-সংস্কারমাত্রকেই কুসংস্কার বলিয়া বর্জনযোগ্য মনে করিয়াছেন। কিন্তু ঘড়ির দোলক যেমন একদিকে যতদূর যাইবার যাইয়া অপরদিকে যতদূর যাইতে পারে যায়, তেমনই আবার প্রতিক্রিয়ায় এক সম্প্রদায় ক্রিয়াকাণ্ডের সমর্থনে 'বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার' চেষ্টা করিয়াছেন। অপ্রকৃতের সন্ধানে প্রকৃত আমরা লক্ষ্য করিতে পারি নাই—যাহারা লক্ষ্য করিয়াছেন, তাঁহাদিগের শিক্ষা গ্রহণ করি নাই। কিন্তু ভগিনী নিবেদিতা হিন্দুকুলে জন্মগ্রহণ করেন নাই। তিনি গুরুর উপদেশে আর আপনার নিষ্ঠায় যে অন্তর্দৃষ্টি লাভ করিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি প্রকৃত হিন্দু হইয়াছিলেন—জ্ঞানমার্গ ও কর্মমার্গ যে স্থানে মিলিত, তথায় উপনীত হইয়াছিলেন। তিনি যে হিন্দুকুলে উপনীত হইয়াছিলেন, উপনিষদ, গীতা, রামায়ণ, মহাভারত, কুমারসম্ভব, শকুন্তলা, পাণিনি, কাত্যায়ন, সাংখ্য, বেদান্ত, বৈশেষিক—এ সকলই সেই হিন্দুর কুলের কীর্তি। তিনি সেই হিন্দুকুলে উপনীত হইয়াছিলেন; মনে করিয়াছিলেন—"জন্ম সার্থক করিয়াছি।"

সেই জন্যই তিনি হিন্দুর ভগিনী নিবেদিতা, শক্তিপূজক হিন্দুর সিংহবাহিনী জগজ্জননীর কন্যা নিবেদিতা, দেশমাতৃকার স্নেহের পাত্রী—নিবেদিতা।

নিবেদিতা হিন্দুদর্শন মনোযোগ-সহকারে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন এবং হিন্দুধর্মের স্বরূপ সম্যক্ উপলব্ধি করিয়াছিলেন। সেই জন্যই যখন কয় জন বৌদ্ধ ভারতের বাহির হইতে আসিয়া বুদ্ধগয়ার মন্দিরে অধিকার-প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিয়াছিলেন, তখন তিনি তাহার তীব্র প্রতিবাদ করেন। মনে পড়ে—কলিকাতায় তিনি হিন্দুধর্মে বুদ্ধগয়ার স্থান-সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা দিয়াছিলেন। তাহাতে তিনি বলিয়াছিলেন—

"আমরা যদি ইতিহাসের স্বরূপ উপলব্ধি করি, তবে আমাদিগকে স্বীকার করিতেই হইবে, শঙ্করাচার্য বৌদ্ধনির্যাতকও ছিলেন না, হিন্দু নৃপতিদিগকে বৌদ্ধ-নির্যাতনেও প্রণোদিত করেন নাই। তিনি তার্কিক ছিলেন এবং তাঁহাকে কিরূপ অজ্ঞতার সহিত সংগ্রাম করিতে হইয়াছিল, তাহা তাঁহার বিতর্ক হইতেই

আমরা বুঝিতে পারি। তাঁহার অদ্বৈতবাদ বৌদ্ধ নির্বাণবাদেরই পুনর্গঠন। * * * এশিয়াবাসীরা ইতিহাস-রচনায় প্রবৃত্ত হইলেই বৌদ্ধগণ শঙ্করাচার্যকে তাঁহাদিগের অন্যতম প্রচারক বলিয়া বুঝিতে পারিবেন। নির্বাণ ও মুক্তি একই মুদ্রার দুই দিক—অদ্বৈত উভয়ের মূল।"

তিনি সেই প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন—হিন্দুধর্ম সমন্বয়—সম্প্রদায়ের নহে; তাহা আধ্যাত্মিকতার বিশ্ববিদ্যালয়।

এই বিশ্ববিদ্যালয় এখনও বিদ্যমান—কালের কালিমামুক্ত হইলে তাহার স্বরূপ প্রকাশ পাইবে। সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত কত যুগের কত কোবিদের, কত সাধকের, কত ত্যাগীর, কত সাধুর স্মৃতি বিজড়িত। ভগিনী নিবেদিতা—কেবল হিন্দুকেই নহে—বিশ্ববাসিমাত্রকেই সেই বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করিতে আহ্বান করিয়াছিলেন। তিনি সকলকে হিন্দুধর্মের পাবনী ধারা পান করিয়া আধ্যাত্মিকতার সুধায় সঞ্জীবিত হইতে বলিয়াছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' যখন প্রথম প্রকাশিত হয়, তখন তাহার 'উপক্রমণিকার' শেষাংশে ছিল—যখন অন্ধকার-সমুদ্র আলোড়িত করিয়া তিন বার ধ্বনিত হইল—"আমার মনস্কাম কি সিদ্ধ হইবে না?" তখন উত্তর হইল—"তোমার পণ কি?" প্রত্যুত্তরে যখন বলিল, "পণ আমার জীবনসর্বস্ব"—তখন প্রতিশব্দ হইল, "এ পণে হইবে না।" তখন জিজ্ঞাসা হইল—"আর কি আছে? আর কি দিব?"—উত্তর আসিল—"তোমার প্রিয়জনের প্রাণসর্বস্ব।" কিন্তু পরে বঙ্কিমচন্দ্র সেই অংশ পরিবর্তিত করিয়াছিলেন—

উত্তর হইল—"তোমার পণ কি?"

প্রত্যুত্তরে বলিল—"পণ আমার জীবনসর্বস্ব।"

প্রতিশব্দ হইল, "জীবন তুচ্ছ; সকলেই ত্যাগ করিতে পারে।"

"আর কি আছে? আর কি দিব?"

তখন উত্তর হইল, "ভক্তি"।

ভক্তি লইয়া নিবেদিতা হিন্দুধর্মে দীক্ষালাভ করিয়াছিলেন। যিনি তাঁহাকে দীক্ষা দিয়াছিলেন, সেই স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন—

"যিনি স্বয়ং ভার গ্রহণ করেন, তিনি জগৎকে ধন্য করিয়া নিজ পথে অগ্রসর হন। তিনি যে নিন্দা বা সমালোচনা করেন না, তাহা নিন্দার ও সমালোচনার মত অকল্যাণ নাই বলিয়া নহে—তিনি স্বয়ং সেই অকল্যাণের ভার গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া।"

ভগিনী নিবেদিতা তেমনই যে দেশকে তাঁহার মাতৃভূমি করিয়াছিলেন, সেই হিন্দুস্থানের সকল অকল্যাণের ভার স্বয়ং গ্রহণ করিয়া মহাদেব যেমন বিষ স্বয়ং গ্রহণ করিয়া নীলকণ্ঠ হইয়াছিলেন, তেমনই হিন্দুস্থানকে তাঁহার পুণ্যে পূত করিয়া বিরাজিত ছিলেন। তিনি হিন্দুস্থানের অধিবাসীদিগের কল্যাণই কামনা করিয়াছিলেন, এবং সেজন্য অসাধারণ ত্যাগ সানন্দে ও সাগ্রহে স্বীকার করিয়াছিলেন। তিনি হিন্দুস্থানকে মনে করিতেন—"দেবী আমার, সাধনা আমার, স্বর্গ আমার, আমার দেশ।"

নিবেদিতা আপনাকে সেই দেশের দুহিতা বলিয়া বিশ্বাস করিতেন—

"একদা যাহার বিজয়-সেনানী
হেলায় লঙ্কা করিল জয়,
একদা যাহার অর্ণবপোত ভ্রমিল ভারতসাগরময়;
সন্তান যার তিব্বত-চীন-জাপানে গঠিল উপনিবেশ।"

সেজন্যই তিনি ভারতীয়ের দৌর্বল্য সহ্য করিতে পারিতেন না। দীনেশ বাবু লিখিয়াছেন—

"নিবেদিতা রাজনৈতিক চরমপন্থী ছিলেন, আমার সঙ্গে প্রথম প্রথম আলাপের পর তিনি

রাজনৈতিক প্রসঙ্গ আমার সঙ্গে একেবারেই করিতে চাহিতেন না। আমাকে ভীরু, কাপুরুষ, স্ত্রীলোক হইতেও হীনবল ইত্যাদি বলিয়া গালাগালি দিতেন—রাজনৈতিক কোন কথা বলিলে ক্রোধের সহিত বলিতেন—দীনেশ বাবু, ওটি আপনার ক্ষেত্র নহে—আমি আপনার সঙ্গে ও সম্বন্ধে কথা বলিব না।”

তিনি তাঁহার গুরু স্বামী বিবেকানন্দের মত মনে করিতেন, আধ্যাত্মিকতাই ভারতবাসীর—হিন্দুর বৈশিষ্ট্য; দেশপ্রেমকে আধ্যাত্মিকতার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। দেশমাতৃকা—‘রিপুদলবারিণী’, তাঁহার করে ‘খরকরবাল’, কিন্তু তিনি করুণাময়ী।

নিবেদিতার রচনায় ভারতীয় ভাবের অনুভূতি হয়। তিনি রামপ্রসাদের গানের যে বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা পাঠককে মুগ্ধ করে। তাঁহার রচনা পাঠ করিলে মনে হয় যেন মন্দিরের গর্ভগৃহে—যে স্থানে দেবতা রত্নবেদীর উপর প্রতিষ্ঠিত, তথায় প্রবেশ করিতেছি। ভিখারী গায়কের কণ্ঠে “গিরি, গৌরী আমার এসেছিল”—গান শুনিয়া তিনি অশ্রু-সম্বরণ করিতে পারেন নাই।

তাঁহার রচনা ও তাঁহার কার্য—এ সকল অপেক্ষা তিনি বহু ঊর্ধ্বে ছিলেন। তাঁহার জীবন যেন দৈব-শক্তির প্রেরণা ছিল। তাঁহার পবিত্রতা ও ধর্মনিষ্ঠা অসাধারণ ছিল। হিন্দুস্থানের ও হিন্দুর সৌভাগ্য এই মহীয়সী মহিলা প্রতীচীতে জন্মগ্রহণ করিয়া হিন্দুস্থানের অধিবাসীদিগের সেবায় আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন—তাহাদিগের কল্যাণ আপনার ও জগতের কল্যাণ বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। মহামায়ার কৃপায় ও আশীর্বাদে সর্বপ্রকার শক্তি তাঁহাতে উদ্বুদ্ধ হইয়াছিল। তিনি স্বয়ং নিবেদিতার হৃদয়ে ও বাহুতে অধিষ্ঠিতা হইয়াছিলেন।

আমাদিগের রাজনৈতিক মুক্তির প্রসঙ্গে যেমন, ভ্রান্তি-মুক্তির প্রসঙ্গেও তেমনই—সর্বোপরি আমাদিগের আধ্যাত্মিক মুক্তির প্রসঙ্গেও যেন তেমনই আমরা আমাদিগের এই ভগিনীকে স্মরণ করিয়া শ্রদ্ধা নিবেদন করি—যিনি সাহসে অতুলনীয়, ধর্মে নিষ্ঠাসম্পন্ন, মহত্ত্বে অপরাজেয় এবং আধ্যাত্মিকতায় ওতপ্রোত ছিলেন এবং যাঁহার কার্যে আমরা ধন্য হইয়াছি। তিনি ভারতকে তাঁহার তীর্থ মনে করিয়াছিলেন—ভারতীয় সংস্কৃতিকে মানবের কল্যাণকর বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছিলেন—যে হিন্দুধর্ম ভারতের বিততশতশাখ বটবৃক্ষের মত যুগে যুগে ত্রিতাপতপ্ত মানবকে অবারিত আশ্রয় ও স্নিগ্ধ ছায়া প্রদান করিয়া আসিয়াছে—মানব-সমাজকে তাহার প্রতি আকৃষ্ট করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাকে ভগিনীরূপে লাভ করিয়া আমরা ধন্য হইয়াছি।

---

“স্বামীজীর একটি অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, তাঁহার নিকটে যাঁহারা থাকিতেন সকলকে তিনি বড় করিয়া তুলিতেন। তাঁহার সান্নিধ্যে মানুষ তাহার জীবনের অনভিব্যক্ত মহৎ উদ্দেশ্য যেন স্পষ্টরূপে দেখিতে পাইত, দেখিয়া উহাকে ভালবাসিতে শিখিত। নিজদের দোষত্রুটিগুলির কালিমা যেন অনেকটা মুছিয়া যাইত—মনে হইত জীবনের সম্যক বিকাশের জন্য ইহাদের সংঘটন যেন ঠিকই হইয়াছে। * * * * স্বামীজীর অমূল্য স্মৃতিসঞ্চয়ের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হইতেছে এইটি—তাঁহার মানব-প্রেম। বলিতেন, ‘মানুষ তৈরী’ই তাঁহার নিজের কাজ।”

—ভগিনী নিবেদিতা

# শরণাগতি

শ্রীসুরেন্দ্রমোহন পঞ্চতীর্থ, এম্-এ

লোক-সমাজে প্রচলিত আছে—কোন কোন সময় একটি কথা একবার বললে তাতে ফল হয় না, দু'বার তিনবার বলতে হয়। বিবাদ-কালে, বিস্ময়ের সময়, আনন্দের সময়, পরিতাপ করবার সময়, দীনতা জানাতে কিংবা নিশ্চয়াত্মক বিশ্বাসে দ্বিরুক্তি বা ত্রিরুক্তি পর্যন্ত দূষণীয় নয়—'দ্বিস্ত্রিরুক্তির্ন দুষ্যতি।'

গীতায় যদি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ একই প্রকারের একটি শ্লোক তিন জায়গায় প্রায় একই রকমে বলেন তবে তাতে আমরা কি মনে করবো? ভগবান্ কি মানুষের মতো—সত্য সত্য, তিন সত্য দিয়ে অর্জুনকে উপদেশ দেবেন? উত্তরে বলা যায়—যাঁকে উপদেশ দিচ্ছেন তিনিতো মানুষ, আর যিনি উপদেশ দিচ্ছেন তিনিও অতিমানুষ। নরলীলা করতে এসে নররূপেই সব কাজ করছেন, সব কথা বলছেন।

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি যুক্ত্বৈবমাত্মানং মৎপরায়ণঃ॥

একথা তিনি বললেন নবম অধ্যায়ে (৩৪)। শ্লোকটির পুনরুক্তি দেখতে পাই অষ্টাদশ অধ্যায়ের শেষভাগে (১৮।৬৫)—গীতা যখন প্রায় শেষ হয় হয়। প্রথম ও দ্বিতীয় পাদ হুবহু এক রকম, কিন্তু তৃতীয় ও চতুর্থ পাদে ভগবানের আশ্বাস-বাণীতে বিশেষ জোর ফুটে উঠেছে।

সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে।

হে অর্জুন, আমি তোমার নিকট সত্য বলে প্রতিজ্ঞা করছি, কেন না তুমি যে আমার প্রিয়। প্রিয়জন ভিন্ন, ভক্ত ভিন্ন অপরের নিকট আমি তেমন প্রতিজ্ঞা করি না। মন্মনা ভব—তুমি আমার দিকে মন দাও, অন্য কোন দিকে মন না দিয়ে যা-কিছু কাজ করছ, সব আমার প্রীতির জন্যই করছ এইরূপ মনে করবে। তারপর বললেন—মদ্ভক্তঃ, আমার ভক্ত হও। তাৎপর্য এই—মনটি যখন একাগ্র হয়ে অচঞ্চল হবে, তখন হবে তা বিশুদ্ধ, তখনি আসবে ভক্তি। তারপর বললেন, মদ্যাজী—আমার উদ্দেশে যজ্ঞ কর, জপযজ্ঞ, নামযজ্ঞ প্রভৃতি। শেষে বললেন, মাং নমস্কুরু—আমাকে নমস্কার কর, প্রণতি জানাও, নিজের ক্ষুদ্র অহংকার ঈশ্বরে সমর্পণ কর। তখনই অগতির গতি শ্রীপতি যে আমি, আমাকে পাবে।

একাদশ অধ্যায়ে এই শ্লোকই ভাষা একটু বদলিয়ে বলেছেন—

মৎকর্মকৃৎ মৎপরমো মদ্ভক্তঃ সঙ্গবর্জিতঃ।
নির্বৈরঃ সর্বভূতেষু যঃ স মামেতি পাণ্ডব॥ ১১।৫৫

যে করে আমার তরে কর্ম-সমুদয়।
যাহার আমিই মাত্র পরম আশ্রয়॥
সর্বত্র যে অনাসক্ত ভক্ত যে আমার,
কোন জীবে শত্রুভাব নাহি কভু যার—
এসকল গুণে গুণী সংসারে যে হয়,
সে জন আমাকে পায় হে পাণ্ডুতনয়।

একই কথা তিনবার বললেন—তবু যদি দুর্বলের দেহে বল না আসে, তবু যদি সন্দিগ্ধের মনে সন্দেহ জাগে—আমিতো অত সব পারব না, তখন অষ্টাদশ অধ্যায়ের শ্লোকটির পর ভগবান্ বললেন—

সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥
১৮।৬৬

মাভৈঃ কিছুমাত্র ভয় নেই। যে-সমস্ত বললাম তা যদি না পার তবে এক কাজ কর, সমস্ত ধর্ম-কর্ম বাদ দিয়ে আমার আশ্রয় নাও। যদি মনে কর কাজ করলেই তাতে পাপ-পুণ্য আছে, দুঃখ-ব্যথা আছে, আমি তাতেও বলছি, আমি তোমাকে সর্বপ্রকার পাপ-তাপ হতে মুক্ত করব, "মা শুচঃ"—শোক করো না।

সর্বধর্মান্ কথার অর্থ অনেকে অনেক রকমের করেছেন। আমরা কিন্তু 'প্রকরণ' ধরে ব্যাখ্যা করব—পূর্বের শ্লোকে (১৮।৬৫) যে সমস্ত বিশেষ ধর্ম বলেছি সেই সকল ধর্ম ত্যাগ করে আমার শরণাগত হও। আমার প্রতি যদি মন রাখতে না পার, আমাতে যদি ভক্তি না জন্মে, হরিনাম-কীর্তনে যদি মতি না হয়, দিবারাত্র চব্বিশ ঘণ্টার ভিতর একবারও যদি আমার প্রতি মাথা নত না হয়, তবে—মামেকং শরণং ব্রজ। আমার শরণ নাও, আমার আশ্রয় নাও, তবে আমার চরণে স্থান পাবে।

শরণাগতি-সম্বন্ধে একটি গল্প আছে—এক গর্ভবতী হরিণী বনের মধ্যে বিচরণ করে বেড়াচ্ছে, মনের সুখে দূর্বাদল ভক্ষণ করে করে চলছে—স্বাধীন স্বচ্ছন্দ গতি, মনে কোন আশঙ্কা নেই, আতঙ্ক নেই—কারুর সঙ্গে ঝগড়া নেই, কাজেই তার কোনো শত্রুও নেই। হঠাৎ কিন্তু শত্রু দেখা দিল—সামনে এক বিকটমূর্তি ব্যাধ ধনুর্বাণ নিয়ে উপস্থিত; হরিণ-শিকারের জন্য চুপি চুপি বনের ভেতর ঢুকেছে—যেন সাক্ষাৎ কৃতান্ত। হরিণীর প্রাণ ত্রাহি ত্রাহি। সে তখন বাঁদিকে দৌড়াবে ভাবছে, কিন্তু সেদিকে একটা বিষম ফাঁদ, জাল পেতে রেখেছে ব্যাধ। যেমি ওদিকে যাবে তেমি জালে পড়বে পা, আর নিজে হবে বদ্ধ। কাজেই হরিণী পেছনের দিকে পালাবে মনে করল। সেদিকে শুকনো পাতার আগুন জ্বলছে, দাবানল, সেদিকে গেলে আর নিস্তার নেই। অমনি অগ্নিদাহ হবে, আগুনে শরীর পুড়বে। হরিণী তখন ডানদিকে চায়, কিন্তু হায় হায় ডান দিকে রয়েছে ব্যাধের শিকারী কুকুর। তখন সে যায় কোথায়? সম্মুখে বামে পশ্চাতে দক্ষিণে—সব দিকে শত্রু, সব দিকে মৃত্যু।

এবার হরিণী উপরের দিকে তাকালো, কিন্তু সেদিকে যাওয়ার জো নেই। তবু মনে মনে ভাবে—সে দিকে শত্রু নেই, উপরের দিকে যিনি আছেন তিনি তাকে রক্ষা করবেন। কাজেই হরিণী মনে-প্রাণে ডাকে ভগবানকে—প্রভো, রক্ষা কর, রক্ষা কর। আমার প্রাণ বাঁচাও। আমি মরি তাতে দুঃখ নেই প্রভো, কিন্তু আমার দেহের ভেতরে আছে এক শিশু, আমি মারা গেলে সেও মারা যাবে। সে তো জগতের কারুর অপকার করেনি, কোনো পাপ করেনি। অতএব আমাকে বাঁচালে সে বাঁচবে; রক্ষা কর প্রভো—"কৃষ্ণ কৃষ্ণ পাহি মাম্, কৃষ্ণ কেশব রক্ষ মাম্।"

তারপর ঘটল বড় আশ্চর্য ঘটনা—খুব জোরে আসল ঝড় বৃষ্টি তুফান, যেন কালবৈশাখীর রুদ্র তাণ্ডব। হরিণীর পেছনের আগুন গেল নিবে বৃষ্টির জলে; পড়ল একটা বজ্র, তাতে মারা গেল সেই কুকুর। ঝড়ে ঝঞ্ঝায় তুফানে উড়ে গেল ব্যাধের জাল, আর বাতাসের সঙ্গে ধুলো বালি পাথরের কণা এসে ব্যাধের চক্ষু করল বন্ধ। সে হ'লো তখন অন্ধ, হরিণীকে আর দেখতে পায় না। চারি দিকের চারি শত্রু নিপাত হল। উপরে একমাত্র আছেন শরণাগত-পালক, দীনজন-

রক্ষক, দুঃখদৈন্যনাশক শ্রীমধুসূদন'। রক্ষা করলেন তিনি হরিণীকে। আমরা সকলে বলে থাকি 'রাখে কৃষ্ণ মারে কে? মারে কৃষ্ণ রাখে কে?' সকল শত্রুর মধ্যে পরিবেষ্টিত হরিণী একমাত্র দীনের বন্ধু করুণাসিন্ধুর করুণায় বেঁচে গেল।

কি আশ্চর্য ব্যাপার! সেই মুহূর্তে হরিণী একটি শাবক প্রসব করলো, সেই শাবক মনের আনন্দে দুধপান করছে! ভাবুক কবি তখন বলছেন—

'ধীরে ধীরে চলতি হরিণী, সাধু সাধু বিধাতা।'

শরণাগতির লক্ষণ শ্রীমধুসূদন সরস্বতী যা বলেছেন তা হ'ল এই—

তস্যৈবাহং মমৈবাসৌ স এবাহমিতি ত্রিধা।
ভগবচ্ছরণত্বং স্যাৎ সাধনাভ্যাসপাকতঃ॥

(১) তাঁর আমি অর্থাৎ ভগবানের দাস আমি এরূপভাবে অবস্থিতি, (২) আমার তিনি, একমাত্র তিনি ভিন্ন অপর আর কেউ আমার রক্ষাকর্তা নন এই জ্ঞান, (৩) তিনিই আমি অর্থাৎ তত্ত্বমসি এরূপ তাদাত্ম্য-জ্ঞান—এটি হল তৃতীয়। অভ্যাস দ্বারা যখন সাধনার পরিপক্ক অবস্থা হয়, তখনই ওরূপ শরণাগতি প্রকাশ পায়। এই শ্লোকের বিস্তৃত অর্থ বাহুল্য-ভয়ে পরিত্যক্ত হল। হরিণীর পক্ষে 'মমৈবাসৌ' এই দ্বিতীয় লক্ষণটি খাটছে।

বায়ুপুরাণ ও হরিভক্তি-বিলাসে ছয় প্রকারের শরণাগতি বলা হ'য়েছে—

আনুকূল্যস্য সঙ্কল্পঃ প্রাতিকূল্যবিবর্জনম্।
রক্ষিষ্যতীতি বিশ্বাসো গোপ্তৃত্বে বরণং তথা।
আত্মনিক্ষেপ-কার্পণ্যে ষড়্‌বিধা শরণাগতিঃ॥

(১) আনুকূল্যস্য সঙ্কল্পঃ—ভগবানের অনুকূল কাজ করবার জন্য সঙ্কল্প। ভগবানের প্রীতিজনক কাজ কিরূপ হতে পারে? ভক্তের ভক্তি বা প্রেম, উপাসকের উপাসনা, কর্মীর জনসেবা। 'তস্মিন্ প্রীতিস্তৎপ্রিয়কার্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।' ভগবানের প্রতি প্রেম আর জীবে প্রেম একই কথা। তাঁর প্রিয়কার্যসাধনই হলো নারায়ণ-জ্ঞানে নর-সেবা। উপাসনা যদি কেউ করতে না পারে, তবে ঐ কাজেই উপাসনার কাজ সিদ্ধ হয়।

(২) প্রাতিকূল্যবিবর্জনম্—ভগবানের প্রতিকূল কাজ বা শাস্ত্রের নিষিদ্ধ কাজ বর্জন করা দ্বিতীয় শরণাগতি। এক কানে সুমতি বলছে সুকাজ কর, সুন্দর কাজ কর, শাস্ত্রানুমোদিত কাজ কর; অন্য কানে কুমতি বলছে, কুকাজ কর, নিষিদ্ধ কাজ কর, শাস্ত্রে যা নিষিদ্ধ হয়ে আছে সেই কাজ কর, এরূপ দ্বন্দ্ব উপস্থিত হলে কুমতির কথা পরিত্যাগ করতে হবে।

(৩) রক্ষিষ্যতীতি বিশ্বাসঃ—তিনি আমাকে রক্ষা করবেন এরূপ দৃঢ়বিশ্বাস।

(৪) গোপ্তৃত্বে বরণম্—রক্ষাকর্তারূপে তাঁকেই বরণ করা, আর কাউকে নয়।

'একবার ডাক রে মন তারে
বারে বারে
কোথা দীনবন্ধু হরি।

(৫) আত্মনিক্ষেপ—নিজকে তাঁরই জিম্মায় রক্ষা করা। হোমিওপ্যাথ, এলোপ্যাথ, হাকিম, কবিরাজ সব চিকিৎসক যখন রোগীর আশা ছেড়ে দিয়েছেন, তখন রোগীকে হরির নামে রেখে দেওয়া। কানে হরিনাম, মুখে গঙ্গাজল, ললাটে তুলসীতলার মৃত্তিকার তিলক। এই তার চিকিৎসা, এই তার ঔষধ। একদিন দু'দিন পাঁচদিন, রোগীর তো চোখ খুলল। সাতদিন, দশদিন, পনেরো দিন, পথ্য এখন উদরে যায় এবং কিছু পরিপাক হয়। বিশ দিন, পঁচিশ দিন, একমাস, এখনো রোগী

হরির নামে আছে। রাস্তায় চলা ফেরা করে। হঠাৎ সেই বড় ডাক্তারের সঙ্গে দেখা। ডাক্তার তো অবাক্—কে এ?—"আমি সেই রোগী, যার আশা আপনারা সবাই ছেড়ে দিয়েছিলেন।" রাখে কৃষ্ণ মারে কে?

(৬) কার্পণ্য—দীনতা-প্রকাশ। আমি দীন হীন, আমার যে প্রভো কিছুই জানা নেই। না জানি ভক্তি, না জানি কর্ম, না রাখি জ্ঞানের সন্ধান। আমাকে আশ্রয় দাও হরি। এই হল ষষ্ঠ শরণাগতি।

অনেকে হয়ত প্রশ্ন করবেন—শরণাগতিদ্বারা নিজের সত্তা হারিয়ে ফেললে আমাদের শক্তির বিকাশ হবে কোন্ পথে? পদে পদে ভগবানের আশ্রয় চাইলে স্বপদে দাঁড়াবো কখন? অলসতা এসে পৌরুষকে স্তব্ধ করবে, অদৃষ্টের দোহাই দিতে দিতে পুরুষকার হয়ে যাবে ম্লান! কেন না উপনিষদে আছে—

'নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।'

বলহীন ব্যক্তি আত্মানন্দ বা ব্রহ্মানন্দ লাভ করতে পারে না। গীতায় বলা হ'য়েছে—

ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ—হে পার্থ, ক্লৈব্যের আশ্রয় নিও না, দুর্বলতার অধীন হয়ো না।

কিন্তু কথা এই, জীবের জীবনপথে শরণাগতি ও পুরুষকার দুইই পরম সম্বল। হরিণীও পুরুষকারকে ছাড়েনি; সম্মুখে ব্যাধকে দেখে সে একবার চেষ্টা করেছিল বাঁদিকে পালায়, তারপর পা বাড়িয়েছিল পেছনের দিকে, তারপর ডানদিকে—নিশ্চেষ্ট সে কখনো ছিল না, কিন্তু সব চেষ্টা যখন ব্যর্থ হল, তখন ভগবানের আশ্রয় ভিন্ন গতি কি? চারদিকে যার বিপদের মেঘ ঘনিয়ে আসে, তখন সেই মেঘরাশি তাড়াতে নীরদবরণ দূর্বাদলশ্যাম ঘনশ্যাম ভিন্ন অন্য কেউ ভরসা নেই।

সভামধ্যে দ্রৌপদীর মান রক্ষা করতে কেউ যখন অগ্রসর হলেন না, তখন তাঁর করুণ ক্রন্দনে ভগবান্ সাড়া দিলেন। অদৃষ্টের অদৃশ্য হস্ত দ্রৌপদীকে জোগাল বিপুল বসন। এতো নয় যাদুকরের যাদু, এতো নয় ইন্দ্রজাল। এ হচ্ছে ভগবানের শরণাগত-রক্ষা।

দীর্ঘকালের দুর্বৃত্ত দস্যু অজামিল মৃত্যুর পূর্বে একবার নারায়ণ নারায়ণ বলে ডেকেছিল। পুত্র নারায়ণ সাড়া দিল না, জগৎপিতা নারায়ণের আসন টলল। বিষ্ণুদূত এসে তাঁকে নিল বৈকুণ্ঠ-ধামে। মামেব এষ্যসি—আমার নাম ধরে ডাকলে আমাকেই পাবে।

ভাগবত বলেছেন—

ম্রিয়মাণো হরের্নাম গৃণন্ পুত্রোপচারিতম্।
অজামিলোঽপ্যগাদ্ ধাম কিমুত শ্রদ্ধয়া গৃণন্॥

৬।২।৪২

মৃত্যুকালে পুত্রের নাম নারায়ণ নারায়ণ উচ্চারণ করার বলে অজামিল দস্যু বিষ্ণুলোক প্রাপ্ত হলেন; শ্রদ্ধাপূর্বক যদি কেউ সেই নাম নেয় তার পক্ষে আর কথা কি?

এই নামাভ্যাসের সঙ্গে পূর্বোক্ত আত্মনিক্ষেপ-রূপ পঞ্চম শরণাগতি মিলিয়ে দেখবেন।

---

# নূতন শিক্ষার ভিত্তিভূমি

স্বামী নিরাময়ানন্দ

একথা আজ সর্বজন-স্বীকৃত যে শিশুকে কেন্দ্র করেই শিক্ষা, কোন বিষয় বা কোন ক্লাসকে কেন্দ্র করে নয়। বিদ্যালয়ের মধ্যে সবচেয়ে বড় জিনিষ হল শিশু। সে যেন শিক্ষা-মন্দিরের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। তথাকথিত শিক্ষক মহাশয়েরা তাদের উপাসক। শিক্ষকের কাজ শিশুর অন্তর্নিহিত সেই ঘুমন্ত দেবতাকে জাগিয়ে তোলা—পূর্ণমানবতাকে ধীরে ধীরে ফুটিয়ে তোলা। কে জানে কোন্ শিশুর ভেতর কি সম্ভাবনা লুকিয়ে আছে!

রাষ্ট্র-পরিচালিত শিক্ষা শীঘ্রই শাসক-দলের রঙে ছুপিয়ে যায়। মিশনারিপরিচালিত শিক্ষাও নির্দোষ নয়। প্রকৃত মানুষ মানে শুধু শান্তশিষ্ট মানব বা সুসভ্য নাগরিক নয়, আরো কিছু বেশিও হতে পারে। প্রকৃত শিক্ষা তাকেই বলা চলে, যা প্রকৃত মানুষটিকে ফুটিয়ে তোলায় সহায়তা করে। সকল গাছেই গোলাপ ফুটবে, এ যেন কারো কামনা না হয়। গাঁদা করবী টগর কেয়া—এরাই কি কম সুন্দর, কম সুগন্ধি? অফুরন্ত বৈচিত্র্যই জীবনের লক্ষণ।

সত্যিকারের শিক্ষালয় ফ্যাক্টরি নয় যে শুধু একরকমের তৈরী ছেলেই সমাজে পাঠাবে। এমন সব ছেলে বেরুবে সেখান থেকে—যারা জীবনের যে কোন অবস্থার সঙ্গে যুঝতে পারবে; যুঝে জিনে বাঁচবে, বাড়বে। সর্ববিধ জীবনসংগ্রামে জয়ী হবার শক্তিই শিক্ষার সার্থকতা।

*শিক্ষাপদ্ধতি গড়ার সময় তাই দুটি জিনিষ* চোখের সামনে রাখতে হবে—সামনের জীবন ও আশপাশের জগৎ; আর সর্বোপরি মানুষের যে তিনটি স্বাভাবিক সম্পদ আছে—শরীর মস্তিষ্ক ও হৃদয়—তাদের সামঞ্জস্যপূর্ণ পরিপুষ্টি।

কঠিন নিয়ম-কানুন অপেক্ষা স্বাচ্ছন্দ্য ও স্বাধীনতাই যে সুশিক্ষার আবহাওয়া তৈরী করে—এ কথা এখন অবিসংবাদিত ভাবে গৃহীত। তবে এ ভাব সৃষ্টি করতে হবে একেবারে শৈশব থেকে, মাঝপথ থেকে হলে ফল আশাপ্রদ হবে না। যাঁরা মন্তেসরি স্কুলের কার্যকলাপ লক্ষ্য করেছেন তাঁরাই এর যথার্থতা উপলব্ধি করবেন।

স্কুল যেন শিশুর খেলাঘর—এক দৌড়ে সে ছুটে আসবে তার বাড়ী থেকে। এখানে সে খেলার সাথীদের সঙ্গে, হাতের কাজের সঙ্গে খেলাচ্ছলে শিখবে—জীবনের যা কিছু শেখবার। ভালবাসতে শিখবে কাজকে, জীবনকে, সাথীদের।

আজ আমাদের বইপড়া বড় বড় বিদ্বানের চেয়ে ঢের বেশি প্রয়োজন কাজের লোকের—যাঁরা দেশের ও দশের কল্যাণ শুধু চিন্তা করেই সারাটা জীবন কাটিয়ে দেবেন না, যতটুকু সাধ্য হাতে-নাতেও কিছু করে যাবেন। তাই নতুন শিক্ষার জন্য একান্ত প্রয়োজন—উপযুক্ত পরিবেশ ও উপযোগী পরিকল্পনা এবং এই পরিকল্পনা কাজে পরিণত করার উপযুক্ত কর্মী।

বর্তমান শতাব্দী শিশুর শতাব্দী। যেমন বিগত শতাব্দীর চিন্তা ও কাজ বহু পরিমাণে নিয়োজিত হয়েছিল নারীর মুক্তি ও নারীর উন্নতি-কল্পে, তেমনি তারই অনুসিদ্ধান্তরূপে *বিংশ শতাব্দীর নারীপুরুষের সম্মিলিত মনীষা ও*

কর্মশক্তি শিশুর মুক্তি, শিশুর উন্নতির জন্ম আপ্রাণ চেষ্টিত। ভবিষ্যতের শান্তি ও অগ্রগতি নির্ভর করছে—তাদেরই ওপর। শিশুশিক্ষা-সম্বন্ধে কয়েকটি সুপরীক্ষিত তথ্য এই ভাবে সূত্রাকারে লিপিবদ্ধ করা যেতে পারে—

(১) প্রাকৃতিকের সঙ্গে সাংস্কৃতিক পরিবেশের একটা মিল রেখে শিশুকে লালন করতে হবে। বাড়ীর থেকে স্কুলের আসবাবপত্র ও জীবন এবং পিতা-মাতার থেকে শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীর ব্যবহার ও চালচলন খুব যেন তফাৎ না হয়।

(২) শিশু শেখে ধীরে ধীরে দেখে দেখে, শুনে বই পড়ে বা আচমকা নয়। চক্ষুরিন্দ্রিয়ই বহন করে আনে বারো আনা জ্ঞান; অবশ্য আরো ছোটবেলা স্পর্শেন্দ্রিয়ই বেশি সক্রিয়। যখন সে শুনে শিখতে চায় তখনই তাকে কিছু বলতে হবে।

(৩) প্রথম ক বছরই সব চেয়ে প্রয়োজনীয় —শেষ ক বছরের চেয়ে। সাধারণতঃ স্কুলে ভর্তি হবার আগেই ছেলেরা যা শেখে, বাকী জীবনে অত শেখে কি না সন্দেহ। তিন থেকে ছয়—এই ক বছরই শিক্ষার পক্ষে বড়ই মূল্যবান্। বই পড়া শিক্ষা নয়—খেলা, গান, পরিচ্ছন্নতা, স্বাস্থ্যনীতি, শৃঙ্খলা, সংযোগিতা, সেবা, শিষ্টাচার, ভাবভক্তি, কর্তব্য ও দায়িত্ববোধ সব কিছু শেখার এই হচ্ছে প্রশস্ত সময়।

(৪) শিশুকে সর্বদা সুখী ও ক্রিয়াশীল রাখতে হবে। কখনো অলক্ষ্যে বাধা সরিয়ে দিতে হবে—কখনো সক্রিয় করার জন্ম খেলাচ্ছলে বাধা বসিয়ে দিতে হবে। বাধা জয় করাও একটা খেলা—একটা শিক্ষা।

(৫) শিশুর যখন ইচ্ছা তখন সে শিখবে—প্রশ্ন করে করে সে জেনে নেবে তার যা যা জানা দরকার। সে বড়দের আচরণ অনুকরণ করে অভিনয় করে শিখে নেবে তাকে তখন কি ভাবে কি করতে হবে। বড় হবার ইচ্ছা তার খুব। আধুনিক শিক্ষা-বিজ্ঞান তাই বলে—'মাননীয় শিক্ষক মহাশয়, সরে দাঁড়ান—শিশুর রাস্তা ছেড়ে দিন। সে নিজেই এগিয়ে যাবে, সে নিজেই নিজেকে শেখাবে—আপনার বক্তৃতা বা উপদেশের অপেক্ষায় সে বসে থাকবে না। শিশুকে হুকুম করবেন না—পারেন ত তার হুকুম তামিল করুন।'

(৬) শিশু তার খুসিমত বই বেছে নিক। ছবির বই সে ভালবাসে—তাই তাকে দিন। ছবি বিশ্বজনীন ভাষা। আর শিশু বিশ্বজনীন মানব। শিশু ছবি আঁকে—তাই সে আঁকুক—ওর ভেতর দিয়েই সে লিখতে শিখবে। অক্ষর-পরিচয় ও ভাষাজ্ঞান বা তথাকথিত 'লেখাপড়া' দুদিন দেরি হলেও কোন ক্ষতি হবে না।

(৭) গল্প, গান, ছড়া শিশুমনের অনেক খোরাক জোগায়। দেয়ালে বা কাগজে বা মেঝেয় হিজিবিজি কাটা আত্মপ্রকাশের একটা প্রণালীমাত্র; দৌড়ঝাঁপ, ছোট গাছে চড়া, চীৎকার করা—এও তার শক্তির প্রকাশ। প্রত্যেকটির সুযোগ দিতে হবে—উপযুক্ত স্থানে, উপযুক্ত কালে। শিক্ষক শুধু দূর থেকে দেখবেন—সাহায্যের জন্ম প্রস্তুত থাকবেন। শিশু সময় নষ্ট করে না; সর্বদা ব্যস্ত—তার খেয়ালের খোরাক জুগিয়ে যান, তার খেলার সরঞ্জামে স্কুল ও বাড়ী ভরিয়ে দিন—হতে পারে তা ইঁট, কাঠ, পাথর, বালি, মাটি, ছেঁড়া কাগজ, দড়ি, কুকুর ছানা, বেড়াল।

(৮) বড়রা ছোটদের বই লিখতে জানে না বা পারে না, দু'চার জন ছাড়া। প্রায়ই দেখা যায়—শিশু ছাপা বইএর চেয়ে হাতে লেখা খাতা বই বা পত্রিকা পছন্দ করে—দু'এক বছরের বড় কারু লেখা হলে বেশ মন দিয়ে

পড়ে—কারণ ঐ ভাষা ও ভাব সে সহজে বুঝতে পারে; পড়তে গেলে কথায় কথায় 'এর মানে কি?' জিজ্ঞেস করতে হয় না। শিশুই জানে শিশুমনের চাহিদা। তার প্রয়োজন নেই বড় বড় ঐতিহাসিক ব্যক্তির বা রাজনৈতিক দেশ-প্রেমিকের জীবনী অথবা দুর্বোধ্য নীতিকথার। তার থেকে তার কাছে মনোরম—তার নিজেরই বা তার মত আর কারুর কোন দুষ্টুমির কাহিনী অথবা শেয়ালের বুদ্ধিতে বাঘ কেমন জব্দ হয়েছিল—সেই গল্প। এই দৃষ্টি থেকে দেখলে বুঝতে পারি কেন শিশু ভালবাসে কৃষ্ণের ননী চুরির গল্প শুনতে অথবা হনুমানের লঙ্কা-কাণ্ড বার বার পড়তে। সে ক্রুসোর জন্য কাঁদে, গালিভারের সঙ্গে হাসে, রাক্ষস-খোক্কসের গল্প শুনে ভয় পায়—তবু আবার শুনতে চায়। এই সবই শিশুর খুব প্রিয়—তাই বার বার শুনতে বা বলতে তার ক্লান্তি হয় না!

(৯) শিশুর পরিচয়ের পরিধি ধীরে ধীরে বাড়ুক—আপনা আপনি; মা থেকে বাবা—তা থেকে ভাই বোন্—পরিবার পাড়া গ্রাম—এমনি করে। প্রথমেই তাকে সৌরজগৎ শেখাবার কোন দরকার নেই, 'পৃথিবী গোলাকার, উত্তর দক্ষিণে একটু চাপা কমলালেবুর মত—' একথা শুনলে শিশুমাত্রই বলে ওঠে 'কই কমলালেবু?' শিক্ষক মহাশয় ধমকে উঠলেন, 'আমি কি কমলালেবুর কথা বলছি? বলছি পৃথিবী কমলালেবুর মত।'—শিশু নিরাশ হয়ে তাকিয়ে থাকে!

আবার অঙ্ক শেখাবার সময় নামতার প্যাঁচে বিরাট গুণ ভাগ ও সরলীকরণ ক্রমশঃ জটিল হয়ে ভুলের সমুদ্রে কত শিশুমনের তরণী যে ভরাডুবি করেছে—কে তার হিসাব রাখে? এখানেও তাকে এক অঙ্কর বা দু অঙ্কের যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ শেখানো সহজ হবে—তারই জলখাবার বা খাতাপেন্সিল কেনা-বেচার ভিতর দিয়ে। দৈনন্দিন জীবনে যা কাজে লাগে তার ভেতর দিয়েই শিশুশিক্ষার রাজপথ। বিজ্ঞানে অপরের আবিষ্কৃত জিনিস তাকে দিয়ে মুখস্থ না করিয়ে আবিষ্কারের গল্পটি শিক্ষক বলুন—পরে জিজ্ঞেস করুন, 'আচ্ছা তাইত এবার কি করা যায়?' শিশু ভাবতে শিখবে। আর এই শিক্ষাই হল সব চেয়ে বড় শিক্ষা।

(১০) শিশুরা তাদের নিজেদের সংঘ, সমিতি, লাইব্রেরি, ক্লাব, ব্যায়ামাগার, বিচারালয়, ফার্ষ্ট এইড, পোষ্টাপিস, নিজেদের প্রয়োজনীয় জিনিষের দোকানঘর চালনা করুক, তারা যেমন ভাবে পাবে। শিক্ষক শুধু দূর থেকে তাদের খেলা দেখে যাবেন, বা একটু চুপ করে বসে থাকবেন—সঙ্গীর মত, বুড়ী ( dummy )-র মত অথবা ক্লিনিকের ডাক্তারের মত। প্রয়োজন হলে শিশুই আসবে তাঁর কাছে, তিনি শুধু সমস্যাটার জট একটু খুলে দিয়ে—তাদেরই হাতে সমাধানের ভার ছেড়ে দেবেন।

সমাধানের আনন্দ, সংগ্রামে জয়লাভের শক্তি তাদের জীবনপথে অনেক এগিয়ে নিয়ে যাবে—জীবন গড়ে তুলতে যথার্থ সহায়তা করবে। পরাজয় বা নৈরাশ্য, পরমুখাপেক্ষা বা ভুলের বোঝা জীবনীশক্তিকে অঙ্কুরে বিনষ্ট করে—শিক্ষার আসল উদ্দেশ্যই হয় ব্যর্থ।

* * *

পরিশেষে মনে রাখতে হবে—শিক্ষকতা একটা জীবিকা নয়—এ একটা শিল্প, একটা সৃষ্টি। মাতা শিশুর শরীরের নির্মাতা, শিক্ষক মনের। তাই ত Parent-Teacher Co-operation ( পিতামাতা ও শিক্ষকের সহযোগিতা )-র ভেতর দিয়েই শিক্ষা সম্পূর্ণতা লাভ করতে পারে কি না—সেই পরীক্ষাই চলেছে আজ জগৎ জুড়ে।

বীণাপাণির বীণার তারে সপ্তসুর ঝংকৃত হয়—তার প্রথম ঘাট সা-সুর হল এই শিশুশিক্ষা।

সা-সুর যার ঠিক সাধা হয়েছে তারই প্রবেশাধিকার জন্মেছে সংগীতরাজ্যে; তেমনি শিক্ষারাজ্যেও সপ্তসুরের বিচিত্র লীলা চলেছে—প্রাথমিক, মাধ্যমিক, প্রবেশিকা, বিশ্ববিদ্যালয়—বৃত্তিমূলক ও গবেষণামূলক পর্যন্ত—তার প্রথমধাপ এই শিশুশিক্ষা।

কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয়, আমাদের দেশে শিশুশিক্ষা অত্যন্ত অবহেলিত। যখন পল্লীর শান্ত ছায়ায় এক শ বছর পর্যন্ত মানুষ বাঁচত, তখন হয়ত 'লালয়েৎ পঞ্চবর্ষাণি দশবর্ষাণি তাড়য়েৎ' চলত—এখন তা অচল, এখন মানুষের জীবন ক্ষিপ্রগতিতে চলেছে শহরের যন্ত্রমুখর কর্মচঞ্চল আবহাওয়ায়—যার প্রভাব নিভৃত পল্লীকুটিরেও সঞ্চারিত। বর্তমানের শিক্ষাকেও তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে হবে। সর্বাঙ্গীণ এক নতুন শিক্ষার মাধ্যমেই গড়ে উঠতে পারে নতুন ভারত—তারই সুদৃঢ় ভিত্তিভূমি হল শিশুশিক্ষা।

শিক্ষাবিজ্ঞানে নিত্যনতুন পরীক্ষা চলেছে, সেগুলি আমাদের উন্মুক্ত হৃদয়ে নিতে হবে; বিশেষত: এই শিশুশিক্ষার ব্যাপারে সর্বত্র একটা অপূর্ব উদার আন্তর্জাতিকতা পরিলক্ষিত হয়, যা অন্যত্র দুর্লভ, হয়ত অসম্ভব। শিশু—সকল দেশের সকল কালের শিশু—এক অখণ্ড মানবসমাজের ছোট্ট প্রতিনিধি; যেন একই বিরাট সমুদ্রের বুকে ছোট ছোট ঢেউ! এদেরই উদ্দেশে কবি গেয়েছেন, 'জগৎ-পারাবারের তীরে শিশুর মহামেলা'। এদেরই সরলতা লক্ষ্য করে খৃষ্ট বলেছেন: 'Of such is the kingdom of Heaven.' বিস্ময়বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে শিশুকে দেখেই মাতৃহৃদয়া মারিয়া মন্তেসরি বলে উঠেছেন—'Ecce Homo' (Behold the man) যা একদিন উচ্চারিত হয়েছিল ঈশ্বরাবতারকে লক্ষ্য করে।

---

# সন্ত তুলসীদাস

## স্বামী শুদ্ধসত্ত্বানন্দ

একজন লেখক বলিয়াছেন, "তুলসীদাসজীর সত্য চরিত তাঁহার রামায়ণ।" এই উক্তি অমূলক নয়। মূল রামায়ণ মহাত্মা বাল্মীকি-রচিত হইলেও আমরা যোগবাশিষ্ঠ, অধ্যাত্ম, কৃত্তিবাসী প্রভৃতি বিভিন্ন রামায়ণের সহিত পরিচিত। এক একখানি গ্রন্থের এক একটি বিশেষত্ব আছে। তুলসীদাসজীর রামায়ণের বিশেষত্ব ইহার প্রারম্ভ হইতে শেষ পর্যন্ত নবদূর্বাদলশ্যাম রামচন্দ্রের প্রতি ঐকান্তিকী ভক্তির প্রকাশ। শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি তুলসীদাসের প্রেম ও ভক্তি অতুলনীয়—ইহা তাঁহার সাময়িক উচ্ছ্বাস নয়, ইহা মজ্জাগত। আমরা যেমন 'রামগতপ্রাণ বীর হনুমান' এর কথা শুনিয়া থাকি, তুলসীদাসও তদ্রূপ সর্বতোভাবে রামময়প্রাণ ছিলেন। তাঁহার বোল আনা বিশ্বাস ছিল যে ভবসমুদ্র-পারে যাইতে রামনামই নিঃশঙ্ক ভেলা। এক যায়গায় তিনি বলিতেছেন—

'দণ্ডকবন প্রভু কীন্হ সোহাবন।
জনমন অমিত নাম কিয় পাবন॥
নিসিচর নিকর দলে রঘুনন্দন।
নামু সকল কলিকলুষনিকন্দন॥'

অর্থাৎ রামচন্দ্র এক দণ্ডকবনকেই পবিত্র করেন নাই, রামনাম অগণিত লোকের মনরূপ বনকেও পবিত্র করিয়াছে। রাক্ষসদিগকে রামচন্দ্র নাশ করেন, আবার রামনাম কলির সকল পাপরূপ রাক্ষসকে নাশ করে।

উত্তরপ্রদেশের বান্দা জিলায় যমুনাতীরে রাজাপুর-গ্রামে তুলসীদাসজী ১৫৫৪ সম্বতে (অর্থাৎ ১৪৯৭ খৃষ্টাব্দে) জন্মগ্রহণ করেন। আধুনিক পণ্ডিতবর্গ এই বিষয়ে একমত না হইতে পারিয়া ইহার ৩৫ বৎসর পরে অর্থাৎ ১৫৩২ খৃষ্টাব্দে তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া নির্দেশ করেন। তুলসীদাসের সাধনজীবনের সাথী

বেণীমাধোদাসজীর মতে তিনি ১২৭ বৎসর পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। কেহ কেহ ইহা অতিরঞ্জিত বলিয়া মনে করেন। কিন্তু এখনও খবরের কাগজে মধ্যে মধ্যে দেখা যায়, 'অমুক ১২০ বছর বয়সে দেহত্যাগ করেন।' কাজেই ইহা অসম্ভব নাও হইতে পারে। তুলসীদাসের পিতার নাম ছিল আত্মারাম এবং মাতার নাম হুলসী। ইঁহারা জাতিতে ছিলেন ব্রাহ্মণ। সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়া মাত্রই বাড়ীতে আনন্দের রোল উঠিয়াছিল, কিন্তু পরক্ষণেই উহা বিষাদে পরিণত হইল যখন আত্মারাম শুনিলেন নবজাত পুত্র সাধারণ নিয়ম-অনুযায়ী ভূমিষ্ঠ হওয়ার সাথে সাথে ক্রন্দন না করিয়া 'রাম' 'রাম' শব্দ উচ্চারণ করিয়াছে। শুধু তাহাই নহে, শিশু পূর্ণবয়স্কের ন্যায় ৩২টি দাঁত লইয়াই জন্মগ্রহণ করিয়াছে এবং সদ্যোজাত শিশুকে পাঁচ বছরের বালকের ন্যায় দেখাইতেছে। বয়োবৃদ্ধ আত্মীয়-স্বজন এবং জ্যোতির্বিদ পণ্ডিতগণ বিচার-বিবেচনান্তে এগুলি খুব খারাপ লক্ষণ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিলেন এবং বালকটি তিন দিন অন্ততঃ জীবিত থাকে কি না দেখিবার জন্য আত্মারামকে পরামর্শ দিলেন। বাঁচিয়া থাকিলে চতুর্থ দিবসে উহার ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করিবেন, একথাও বলিলেন। পুত্রের অমঙ্গল আশঙ্কায় স্নেহময়ী জননীর হৃদয় কাতর হইল এবং চতুর্থ দিবসে তিনি অত্যন্ত অসুস্থ হইয়া পড়িলেন। তাঁহার দেহত্যাগ হইলে নবজাত পুত্রকেই সকলে দায়ী করিবে এই আশঙ্কায় তিনি তাঁহাদের দাসী মুনিয়াকে যথেষ্ট অলঙ্কারাদি উপঢৌকন দিয়া ছেলেটিকে তাহার নিজের ছেলের মত দেখিতে অনুরোধ জানাইলেন। মুনিয়াও উহাতে সম্মত হইয়া ছেলে ও অলঙ্কারের পুঁটুলি সহ তাঁহার স্বগ্রাম হরিপুরে চলিয়া গেল। হুলসীর মাতৃহৃদয় অনেকটা আশ্বস্ত হইল এবং তিনি পরদিন প্রাতে শান্তিতে শেষ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন।

জন্মের সঙ্গে 'রাম'-শব্দ উচ্চারণ করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার নাম হইল 'রামবোলা'। তুলসীদাস নিজেও বিনয়পত্রিকার নিম্নলিখিত পঙ্‌ক্তিতে ইহা স্বীকার করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন—

'রাম কো গোলাম নাম রামবোলা রাখিও রাম'

অর্থাৎ আমি রামের গোলাম এবং তিনিই আমার রামবোলা নাম রাখেন। মুনিয়া গ্রামে আসিয়া শিশুটিকে তাহার শ্বশ্রূ চুনীয়ার নিকট রাখিয়া দেয়, চুনীয়াও অপত্যনির্বিশেষে উহাকে পালন করিতে থাকেন। পাঁচ বছর পাঁচ মাস তিনি উহাকে পালন করেন, অতঃপর হঠাৎ একদিন সর্পদংশনে তিনি দেহত্যাগ করেন। গ্রামবাসীরা আত্মারামকে পুত্র লইয়া যাইবার জন্য খবর পাঠাইল, কিন্তু কঠিনহৃদয় পিতা উত্তর দিলেন, "যে পুত্র জন্মিবার সঙ্গে সঙ্গে তাহার মাতা মৃত্যুমুখে পতিতা হন এবং কিছুকাল পরে যে তাহার মাতৃসমা অপর একজনেরও মৃত্যুর কারণ হয়, তাহাকে আশ্রয় দিয়া আরও সর্বনাশ ডাকিয়া আনিতে চাহি না।" সুতরাং প্রায় ৬ বছর বয়সে রামবোলা সম্পূর্ণ একাকী আকাশ-তলে আশ্রয়গ্রহণ করিলেন; ভিক্ষাই তাঁহার জীবন-ধারণের একমাত্র সম্বল হইল। এই সময় তাঁহাকে যে অবর্ণনীয় কষ্ট, অমানুষিক দুঃখ, যন্ত্রণা ও অপমান ভোগ করিতে হইয়াছে তাহা শ্রবণ করিলে পাষাণহৃদয়ও বিগলিত হয়। যাঁহার মধ্যে এত প্রতিভা, এত ভক্তি, এত ক্ষমতা সুপ্ত অবস্থায় ছিল, তাঁহাকে বাল্য বয়সে অনাথ অবস্থায় কী অভিশপ্ত জীবনই না যাপন করিতে হইয়াছে! তিনি নিজেও উহা ভুলিতে পারেন নাই এবং দু এক জায়গায় উহা প্রকাশও করিয়া গিয়াছেন।

বাল্যকালের দুরবস্থার কথা তিনি বলিয়াছেন—"জন্মের সঙ্গে সঙ্গে মাতাপিতা কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া সকলের অবজ্ঞা ও তাড়না সহ্য করিয়া অভিশপ্ত জীবন যাপন করিতে লাগিলাম, ক্ষুধার তাড়নায় কুকুরের মুখের রুটির টুকরাও আমার কাছে পরম লোভনীয় মনে হইত। আমার সম্বল ছিল একখানি শতচ্ছিন্ন তালিদেওয়া কাঁথা এবং একটি মাটির কলসী। দ্বারে দ্বারে কুকুরের মত ভিক্ষা চাহিতাম। অপরের অশ্রাব্য কটূক্তি শুনিতে শুনিতে হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইত। আমার দুরবস্থা দেখিয়া দুঃখ ও লজ্জায় মুখ লুকাইতাম" ইত্যাদি।

পরে তিনিই আবার বলিয়াছেন: "অদৃষ্টের কি পরিহাস! যে তুলসীকে রাম ছাড়া ছিল বলিয়া দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিতে হইয়াছে, আজ রাম সহায় বলিয়া রাজা মহারাজ পর্যন্ত সেই তুলসীর পা পূজা করিবার জন্য লালায়িত।"

এই ভাবে কিছু দিন দুঃসহ কষ্ট ভোগ করিবার

পর তিনি নরহরিদাস নামে এক সাধুর সুনজরে আসেন। সাধুজী রামবোলাকে নিজ আশ্রমে লইয়া যান। বেণীমাধব দাসের মতে দীর্ঘ দুই বৎসর রামবোলাকে ঐরূপ কষ্ট ভোগ করিতে হইয়াছিল। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীরামানুজাচার্য-সম্প্রদায়ের বিখ্যাত সাধু রামানন্দের শিষ্য ছিলেন এই নরহরিদাস।

রামভক্তিপরায়ণ বৈষ্ণবপন্থী সাধুদের বিশেষ সমর্থক ছিলেন সাধু রামানন্দ, সুতরাং শিষ্য-পরম্পরায় রামবোলাও যে ক্রমশঃ শ্রীরামচন্দ্রের অলৌকিক জীবনের প্রতি আকৃষ্ট হইবেন ইহাতে আর বিচিত্র কি! গুরুর প্রতি তাঁহার ভক্তি ছিল অগাধ। গুরু-সম্বন্ধে তিনি নিজেই লিখিয়াছেন—

বন্দ উঁ গুরুপদকঞ্জ কৃপাসিন্ধু নররূপ হরি।
জসু বচন রবিকর নিকর মহামোহ তমপুঞ্জহারী॥

গুরুর প্রেমে তাঁহার হৃদয় সদাই ভরপুর থাকিত এবং গুরুকে সত্যই তিনি নরশরীরে ভগবানরূপে দেখিতেন। গুরুর দেওয়া অমোঘ বীজ তাঁহার অচেতন হৃদয়ে পড়িয়া পরে যে অক্ষয়বটে পরিণত হইয়াছিল তাহার পরিচয় তুলসী সারাজীবন দিয়া গিয়াছেন। নরহরিদাস অত্যন্ত উদারমতাবলম্বী ছিলেন এবং তুলসীও সর্বপ্রকারে এই মহৎ উদার সাধুর সদ্‌গুণাবলীর উপযুক্ত উত্তরাধিকারী ছিলেন। কথিত আছে, একদিন স্বপ্নযোগে নরহরিদাস দৈব আদেশ প্রাপ্ত হন—"এই ছেলেটিকে রামচরিত শিক্ষা দাও।" গ্রামবাসীদের সম্মতি লইয়া তিনি রামবোলাকে অযোধ্যায় লইয়া যান এবং সেখানে তাঁহার উপনয়ন-সংস্কার করেন ও তাঁহাকে রামমন্ত্রে দীক্ষিত করেন। দশ মাস তথায় অবস্থানের পর তিনি তাঁহাকে গোণ্ডা জিলার প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান সরযূনদীর তীরে শূকরক্ষেত্রে লইয়া যান। এখানে গুরুশিষ্য দীর্ঘ পাঁচ বৎসর শাস্ত্রীয় ও আধ্যাত্মিক আলোচনায় অতিবাহিত করেন এবং এখানেই তুলসী তাঁহার ইষ্টদেব শ্রীরামচন্দ্রের মনোমোহকারী অপূর্ব দেবচরিত্র-শ্রবণে ধন্য হন।

কিছুকাল পরে শেষসনাতন নামে এক পরিব্রাজক সাধু নরহরিদাসের আশ্রমে আগমন করেন এবং রামবোলার লক্ষণাদি দেখিয়া তাঁহার প্রতি অত্যন্ত আকৃষ্ট হন। নরহরিদাসের অনুমতি-ক্রমে তিনি রামবোলাকে সঙ্গে লইয়া যান এবং সুদীর্ঘ পনর বৎসরকাল তাঁহাকে নিজ সকাশে রাখিয়া বেদবেদান্ত এবং অন্যান্য ধর্মগ্রন্থ বিশেষভাবে শিক্ষা দেন। ঐরূপে ২৮ বৎসর বয়সে রামবোলা তাঁহার শিক্ষা সমাপন করিয়া জন্মস্থান দর্শন-উদ্দেশ্যে রাজাপুরে আসিয়া দেখেন যে, তাঁহার পিতা স্বর্গারোহণ করিয়াছেন, বাসগৃহ ভূমিসাৎ হইয়াছে এবং আপনার বলিতে তথায় কেহই নাই। অল্প আলাপ-পরিচয়েই গ্রামবাসীরা তাঁহার পাণ্ডিত্য ও ভক্তিভাব দেখিয়া মুগ্ধ হন এবং বাসোপযোগী এক কুটির নির্মাণ করিয়া দেন। তথায় অবস্থানপূর্বক তুলসীদাস প্রত্যহ গ্রামবাসীদের তাঁহার স্বভাবসুলভ পাণ্ডিত্য ও ভক্তিসহকারে রামকথা ব্যাখ্যা করিতে থাকেন। অদ্যাপি রাজাপুরে তুলসীদাসের কুটির এবং তাঁহার স্মৃতির উদ্দেশে নির্মিত এক মন্দির দেখিতে পাওয়া যায়।

একদিন তুলসীদাস রামচরিত ব্যাখ্যা করিতেছেন এমন সময় যমুনার অপর পারের তপিতা গ্রামের এক ব্রাহ্মণ দৈবক্রমে তথায় উপস্থিত হইয়া তুলসীদাসের ব্যাখ্যা-শ্রবণে অত্যন্ত পুলকিত হন। রত্নাবলী নামে তাঁহার বিবাহযোগ্যা এক সুন্দরী কন্যা ছিল—তুলসীর' সহ সহিত তাহার বিবাহসম্বন্ধের তিনি প্রস্তাব করেন। প্রথমে অস্বীকার করিলেও বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের পীড়াপীড়িতে তুলসী শেষ পর্যন্ত সম্মত হন এবং ১৫২৬ খৃষ্টাব্দে রত্নাবলীর সহিত তাঁহার পরিণয় সম্পন্ন হয়।

তুলসীদাস স্ত্রীর অত্যন্ত অনুরক্ত ছিলেন—একদণ্ডও তাঁহাকে না দেখিয়া থাকিতে পারিতেন না, কাজেই স্ত্রীর বাপের বাড়ী যাওয়া ঘটিত না। একদিন কার্যব্যপদেশে যখন তুলসী বাটীর বাহিরে গিয়াছিলেন, তখন স্ত্রীর ভাই আসিয়া উপস্থিত হন এবং রত্নাবলী স্বামীকে কিছু না বলিয়া ভ্রাতার সহিত পিতৃসন্নিধানে গমন করেন। তুলসী বাড়ী আসিয়া প্রতিবেশীর নিকট ইহা জানিতে পারিয়া তৎক্ষণাৎ শ্বশুরালয়ে যাইয়া উপস্থিত হন। রত্নাবলী ইহাতে অত্যন্ত লজ্জা পাইলেন এবং ক্ষোভে ও দুঃখে স্বামীকে তিরস্কার করিয়া যে স্মরণীয় বাক্যাবলী প্রয়োগ করেন তাহাই তুলসীর অন্তর্নিহিত সুপ্ত আধ্যাত্মিকতাকে প্রবুদ্ধ করে এবং তদবধি তাঁহার জীবনের গতি সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হয়। রত্নাবলী তাঁহাকে বলিয়াছিলেন—

লাজ না লগ্‌তা আপকো দৌরে আয়েহু সাথ।
ধিক ধিক এই সে প্রেমকো, কহা কঁহু মঁ্যায় নাথ॥
অস্থিচর্মময় দেহ মম তো মেঁ জৈসী প্রীতি।
তৈসী যোঁ শ্রীরাম মন হোতো ন তৌ ভবভীতি॥

অর্থাৎ হে নাথ, তোমায় আর কি বলিব, আমার পিছু পিছু এইরূপে দৌড়িয়া আসিতে তোমার একটুও লজ্জা হইল না! এইরূপ ভালবাসার প্রতি ধিক! আমার এই অস্থিচর্মময় দেহের প্রতি তোমার যেরূপ প্রীতি, রঘুনাথের প্রতি তোমার এইরূপ প্রীতি হইলে তোমার ভববন্ধন মোচন হইত, বারংবার গতায়াতের আর ভয় থাকিত না।

কথাগুলি তুলসীকে অত্যন্ত আঘাত দেয়, তাঁহার আত্মবিস্মৃতি লুপ্ত হইয়া যায় এবং তিনি তখনই সে স্থান পরিত্যাগ করেন। স্ত্রী রত্নাবলী ও তাঁহার মাতা তুলসীকে ফিরাইবার জন্ত যথেষ্ট অনুনয়-বিনয় করিয়াছিলেন কিন্তু যাঁহার হৃদয়ে বৈরাগ্যের অনল প্রদীপ্ত হইয়াছে, সংসারের ক্ষুদ্র মায়ামোহ তাঁহাকে আর বাঁধিবে কি করিয়া?

শ্বশুরগৃহ পরিত্যাগ করিয়া রামবোলা প্রথমে ত্রিবেণী-সঙ্গমে তীর্থরাজ প্রয়াগে আসেন এবং সম্ভবতঃ এখানেই সন্ন্যাসের সঙ্কল্প ও তুলসীদাস নামগ্রহণ করেন। প্রয়াগ হইতে অযোধ্যায় যাইয়া তথায় চারি মাস কাল বাস করিলেন। অতঃপর তিনি শঙ্করাচার্য-প্রতিষ্ঠিত বিখ্যাত চারিধাম-ভ্রমণে নির্গত হন এবং পদব্রজে প্রথমে পুরী, পরে রামেশ্বর, দ্বারকা ও বদ্রীনাথ দর্শন করেন। যতই এই সব পুণ্যতীর্থ দর্শন করিতেছিলেন ততই তাঁহার দর্শনপিপাসা বর্ধিত হইতেছিল। অবশেষে তিনি দুর্গম তীর্থ কৈলাসদর্শনান্তে বারাণসীধামে ফিরিয়া আসেন। ইহার পর হইতে কাশীধামেই তাঁহার বাসস্থান হয়।

তুলসীদাস প্রথমে কাশীতে হনুমান ফাটকে থাকিতেন, সেখান হইতে পরে গোপাল-মন্দিরে যান। সেখানে এখনও একটি ছোট ঘরের পরিচয় পাওয়া যায়, যেখানে বসিয়া তুলসীদাস বিনয়পত্রিকা লেখেন। প্রহ্লাদঘাটেও তিনি কিছুদিন অবস্থান করিয়াছিলেন। হনুমান-মন্দিরে তুলসীদাস বারটি মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন, উহা এখন সঙ্কটমোচন হনুমান নামে প্রসিদ্ধ। অতঃপর তিনি অসিঘাটেই মহাবীরের মন্দির ও তাঁহার স্থায়ী আবাস নির্মাণ করেন। এখানে থাকাকালীন তিনি প্রত্যহ রামায়ণ-ব্যাখ্যা করিতেন।

প্রতিদিন প্রাতে গঙ্গাস্নানের পর ফিরিবার পথে তুলসীদাস একটি অশ্বত্থবৃক্ষের গোড়ায় জল দিতেন। পূর্বজন্মের দুষ্কৃতির ফলে কোনও ভূতযোনি সেই বৃক্ষে আবদ্ধ ছিলেন। ভক্তশ্রেষ্ঠ পবিত্রহৃদয় তুলসীদাসের জলপ্রদানের ফলে সেই প্রেতযোনি মুক্ত হইয়া যান। বৃক্ষটি পরিত্যাগ করিবার পূর্বে তুলসীদাসের প্রতি কৃতজ্ঞতাস্বরূপ তাঁহাকে যে কোনও বর প্রার্থনা করিতে অনুরোধ করেন। উত্তরে তুলসীদাস বলেন শ্রীরামচন্দ্রের সাক্ষাৎদর্শন ভিন্ন তাঁহার অন্ত কিছু কাম্য নাই। প্রেতযোনি বলেন: "তাহা দেখাইবার যদি শক্তি থাকিত তবে আমাকে আর এই নিকৃষ্টযোনিতে থাকিতে হইল কেন? যাহা হউক আমি আপনাকে একটি উপায় বলিয়া দিতেছি যদ্দ্বারা আপনার অভীষ্টদেবের দর্শন পাইতে পারিবেন। আপনি যখন প্রত্যহ রামায়ণ-ব্যাখ্যা করেন তাহা শুনিবার জন্ত মহাবীর নিয়মিত ছদ্মবেশে আগমন করিয়া পাঠশ্রবণ করেন।" তুলসীদাস জিজ্ঞাসা করিলেন: "কি ভাবে তাঁহাকে চিনিতে সমর্থ হইব?" প্রেতযোনি বলেন: "তিনি দরিদ্র কুষ্ঠরোগীর বেশে ছিন্নবস্ত্রপরিহিত হয়ে সকলের আগে আসেন এবং এক অনাদৃত কোণে বসেন ও সকলের শেষে যান।" এই কথা শ্রবণে ভক্ত তুলসীদাস আনন্দে অধীর হইয়া কখন সেই শুভমুহূর্ত উপনীত হইবে এই আশায় অস্থির চিত্তে রহিলেন। যথাসময়ে তুলসীদাস সেই ছদ্মবেশী মহাবীরজীকে আবিষ্কার করিলেন এবং তাঁহার পদদ্বয় জড়াইয়া ধরিয়া ভগবান রামচন্দ্রের দর্শন করাইবার জন্ত বারংবার আকুল প্রার্থনা জানাইতে লাগিলেন। তুলসীর শ্রদ্ধা ভক্তি ও আন্তরিক ব্যাকুলতা-দর্শনে মহাবীরজী আর আত্মগোপন করিতে পারিলেন না, অতিমাত্রায় প্রীত হইয়া তাঁহাকে বলিলেন, "চিত্রকূটে যাও, সেখানে ভগবান রামচন্দ্রের দর্শন পাইবে।" তৎক্ষণাৎ তিনি চিত্রকূট অভিমুখে যাত্রা করিলেন এবং রামঘাটে অবস্থান করিয়া দৈনন্দিন কার্যসূচী-অনুযায়ী প্রত্যহ রামায়ণ-পাঠ ও আবৃত্তি চালাইতে লাগিলেন। একদিন চিত্রকূট প্রদক্ষিণ-কালে তুলসী দেখিলেন

নবদূর্বাদলকান্তি অপরূপ সুন্দর দুইটি বালক হস্তে ধনুর্বাণ লইয়া একটি মৃগের পিছনে ধাবিত হইতেছে। তাঁহাদের লাবণ্য ও সৌন্দর্যে মুগ্ধ হইলেও তাঁহাদিগকে রাম লক্ষ্মণ বলিয়া চিনিতে পারিলেন না। তিনি মনে করিলেন হয়ত রামলীলার কোনও দৃশ্য স্বপ্নবৎ দেখিতেছেন। ভুল ভাঙ্গিলে তিনি আকুল হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। রাত্রে স্বপ্নে হনুমান তাঁহাকে দর্শন দিয়া বলিলেন—"তুমি যেরূপ স্বচক্ষে ভগবানকে দেখিয়াছ, কলিযুগে এরূপ দর্শন বিরল। দুঃখ করিও না, ভগবানের সেবা কর।"

মন্দাকিনীর তীরে বসিয়া তুলসীদাস একদিন চন্দন ঘষিতেছেন এবং স্নান সমাপনান্তে সাধুরা সেই চন্দন নিজ নিজ ললাটে লেপন করিতেছেন। তুলসীদাসের মন অন্তর্মুখী, রামচিন্তায় বিভোর। হঠাৎ রামচন্দ্র একটি ছেলের রূপ ধরিয়া বলিলেন—"বাবা, আমায় একটু চন্দন দাও।" নিজ কর্তব্যে সমাহিতচিত্ত তুলসীদাস না তাকাইয়াই বালকের হস্তে চন্দন প্রদান করিলেন। আর একটি সুযোগ যাইতেছে দেখিয়া হনুমান টিয়াপাখীর রূপ ধারণ করিয়া তুলসীকে তৎক্ষণাৎ স্মরণ করাইয়া দিলেন। বালকের দিকে দৃষ্টিপাত করিবামাত্র বালক অদৃশ্য হইল এবং তুলসী বাহ্য জগৎ বিস্মৃত হইয়া গভীর সমাধিমগ্ন হইলেন। হনুমান তাঁহার বোধ আনয়ন করিয়া পুনরায় তাঁহাকে আশ্বস্ত করিলেন। এই সম্বন্ধে সুন্দর একটি দোঁহা প্রচলিত আছে:

চিত্রকূট কে ঘাটপর ভাই সন্তো কো ভীড়।
তুলসীদাস চন্দন ঘীসে, তিলক দেতে রঘুবীর॥

অর্থাৎ, চিত্রকূটের ঘাটে সাধুদের ভীড় হইয়াছে, সেখানে তুলসীদাস চন্দন ঘষিতেছেন এবং স্বয়ং রঘুবীর আসিয়া উহার তিলক ধারণ করিতেছেন। পরে হনুমানের কৃপায় একদিন রাম-লক্ষ্মণ-সীতা যেন রামলীলা অভিনয় করিতেছেন এই মূর্তিতে তুলসীকে দেখা দেন। তুলসীর সশরীরে ইষ্টসাক্ষাৎকার হয়—তাঁহার অভীষ্ট পূর্ণ হয়।

অতঃপর তুলসীদাস কাশীতে ফিরিয়া আসেন এবং এই সময় তখনকার দিনের কয়েক জন বিশিষ্ট সাধক-সাধিকার সহিত তুলসীদাসের সাক্ষাৎ হয়। বিখ্যাত ভক্তকবি সুরদাস ১৫৮৯ খৃষ্টাব্দে তুলসীদাসের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসেন এবং তাঁহার সহিত পরমানন্দে সাত দিন অতিবাহিত করেন।

এই মিলনকে উদ্দেশ করিয়া সুরদাস একটি কবিতাতে লিখিয়াছেন—"আমার খুব সৌভাগ্য যে, ভক্তশ্রেষ্ঠ তুলসীদাসের পাদপদ্মে পৌঁছিতে পারিয়াছি।"

ইহার পর 'ভক্তমাল'-প্রণেতা বিখ্যাত কবি নাভাদাস তাঁহাকে কাশীতে দর্শন করিতে আসেন। তুলসীদাস তখন ধ্যানমগ্ন ছিলেন বলিয়া সাক্ষাৎকার হয় নাই, কিন্তু নাভাদাস তাঁহার ভক্তমাল-গ্রন্থে লেখেন—"কলিযুগে দুষ্ট ব্যক্তিদের উদ্ধারের নিমিত্ত স্বয়ং বাল্মীকি তুলসীদাসের রূপ ধরিয়া আবির্ভূত হইয়াছেন এবং অকাতরে কলুষনাশক রামনাম বিলাইতেছেন।"

গিরিধারিলাল-গতপ্রাণা সাধিকা মীরাবাঈও পত্রের মারফৎ তুলসীদাসের সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন। যখন মীরাবাঈ স্বামী ও অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনের অত্যাচারে জর্জরিতা ও দিশাহারা হইয়া কিংকর্তব্যবিমূঢ়া হইয়াছিলেন তখন তিনি উপদেশ ও সাহায্য পাইবার আশায় তুলসীদাসকে লেখেন—"হে দুঃখবিনাশক ও সুখের আকর তুলসীজী, আমি বার বার আপনাকে প্রণাম করি, আমার জীবনের পুঞ্জীভূত বেদনা দূর করুন। পরিবারের সকলেই আমায় কষ্ট দিতেছে—সাধুসঙ্গ ও গিরিধারীর পূজা করাই আমার প্রধান অপরাধ। আপনি আমার পিতামাতা-স্বরূপ, ভগবদ্ভক্তদের আপনি সুখ ও শান্তি বিধান করেন, আমার পক্ষে কোন্ পথ শ্রেয় তাহা নির্দেশ করুন।"

মীরার মানসিক যন্ত্রণা অনুভব করিয়া তুলসীদাস তৎক্ষণাৎ উত্তর দেন—"যাহারা রাম ও সীতাকে ভালবাসে না, যেমন আত্মীয় হইলেও শত্রুকে পরিত্যাগ করিতে হয় তদ্রূপ তাহাদিগকে পরিত্যাগ কর। ভগবানের জন্য প্রহ্লাদ তাঁহার পিতাকে, বিভীষণ তাঁহার ভ্রাতাকে, ভরত তাঁহার মাতাকে, বলী তাঁহার গুরুকে এবং গোপীগণ তাঁহাদের স্বামীকে পর্যন্ত পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁহারা আনন্দই পাইয়াছিলেন। শ্রীরামচন্দ্রের সহিত যাহাদের সম্বন্ধ আছে, তাহাদেরই ভালবাস ও সেবা কর। যে কাজলে চোখ নষ্ট করে সে কাজলে প্রয়োজন কি? বেশী আর কি বলিব? রামপদে যাহাদের শ্রদ্ধা-ভক্তি আছে তাহারাই সম্মানের

যোগ্য, তাহারাই প্রাণাপেক্ষা প্রিয়—ইহাই তুলসীর মত। তোমার প্রতি ইহাই আমার উপদেশ।"

তুলসীদাসের এই চিঠি পড়িয়াই মীরাবাঈ খুব সম্ভব তাঁহার কর্তব্য নির্ধারণ করেন এবং তাঁহার প্রিয়তম গিরিধারিলালের জন্ম নিকটতম আত্মীয়-স্বজনকেও পরিত্যাগ করেন।

তুলসীদাস এই সময়ে আর একজন সাধুর সংস্পর্শে আসেন, ইঁহার নাম নন্দদাস। ইনি বৃন্দাবননিবাসী বিখ্যাত কবি ছিলেন। বেণীমাধো দাস বলেন—ইনি তুলসীদাসের গুরুভাই এবং শেষ সনাতনের শিষ্য ছিলেন। তুলসীদাসের প্রতি ইঁহার প্রগাঢ় অনুরাগ ও শ্রদ্ধা ছিল। ইনি লিখিয়াছেন—"কলিযুগের বাল্মীকি তুলসীদাসের কৃপায় আমি অন্তর্দৃষ্টি লাভ করি এবং আমার মনের পবিত্রতা তাঁহার নিকটই পাইয়াছি।"

একবার পূর্বোল্লিখিত নাভাদাসের সহিত তিনি শ্রীবৃন্দাবনে বিখ্যাত মদনমোহনজীর মন্দির-দর্শনে গমন করেন। ওখানে মূর্তিকে তিনি নিম্নলিখিত ভাবে সম্বোধন করিয়াছিলেন—

কহা কহোঁ ছবি আপকী ভলে বনো হো নাথ।
তুলসী মস্তক জব নবৈ ধনুষবান লো হাথ॥

অর্থাৎ—হে নাথ, তোমার সৌন্দর্য আমি আর কি বর্ণনা করিব, কারণ তুমি সর্বজন-পূজ্য, তবে তুলসীর মস্তক যখন তোমার শ্রীচরণে নত হইবে, তখন যেন হাতে ধনুর্বাণ লইও।

কথিত আছে, ভক্তির আতিশয্যে তুলসীদাস মাথা নত করায় মদনমোহন সঙ্গে সঙ্গে ধনুর্বাণ হস্তে শ্রীরামচন্দ্র-মূর্তি ধারণ করেন। প্রকৃত ভক্তের মনোবাঞ্ছা ভক্তাধীন ভগবান এই ভাবে পূরণ করিয়া থাকেন।

মহাপুরুষদের জীবনের সহিত সাধারণতঃ অলৌকিক ঘটনার সংযোগ থাকিতে দেখা যায়। তুলসীদাসের জীবনেও ইহার ব্যতিক্রম ঘটে নাই।

তুলসীদাস একবার কোনও এক মৃত-ব্যক্তিকে নাকি পুনরুজ্জীবিত করিয়াছিলেন। এই খবর মোগল সম্রাট জাহাঙ্গীরের কর্ণ-গোচর হওয়ায় তিনি দরবারে তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠান এবং কিছু অলৌকিক কার্য দেখাইতে বলেন। তুলসী উত্তর দেন—রামনাম ছাড়া তাঁহার আর কোনও পুঁজি নাই। বাদশাহ তাহা শুনিয়া তুলসীকে কারারুদ্ধ করিয়া দুর্গের ভিতর রাখেন এবং বলেন অলৌকিক কিছু না দেখাইলে তাঁহার মুক্তি নাই। উপায়ান্তর না দেখিয়া তুলসী হনুমানজীর শরণ লইলেন। সঙ্গে সঙ্গে রাজমহল বানরে ভরিয়া যায় এবং রাজপুরী উজাড় করিতে আরম্ভ করে। অনন্যোপায় হইয়া বাদশাহ তখন তুলসীর নিকট ক্ষমা চাহেন। তুলসী বলিলেন—"তুমি অন্যত্র দুর্গনির্মাণ কর। কারণ এস্থান হনুমানজীর হইয়া গিয়াছে।" বাদশাহও গত্যন্তর না দেখিয়া তাঁহার কথামত কার্য করেন।

ক্লিষ্ট ও আর্তের সেবাই তুলসীদাসজীর নিকট ছিল রঘুনাথের সেবা। নিজে বিষয়-বিরাগী হইলেও সংসারে অন্নবস্ত্র-আয়োজনের কষ্ট যে কত তীব্র তাহা তিনি ভাল করিয়াই জানিয়াছিলেন, তাই ব্যথিত হইয়া সংসারে সব চাইতে গুরু দুঃখ কি তাহার স্বাভাবিক উত্তর তিনি হৃদয় হইতে দিয়াছেন। তাঁহার মতে—

'নহিঁ দারিদ্র সম দুখ জগমাহীঁ।'

সংসারে দারিদ্র্যের মত আর দুঃখ নাই। কলিকালের অধর্মই এই দুঃখ সম্ভব করিতে পারিয়াছে। মানুষের ভিতর ধর্মভাব জাগ্রত হইলে, অপরের দুঃখ সত্য সত্য অনুভূত হইলে, সমাজে কোনও প্রকার বিষমতা থাকিতে পারে না। তুলসী এই দুঃখময় অবস্থা দূর করিয়া সুখের অবস্থা আনিতে চাহিয়াছিলেন—উহাই তাঁহার মতে 'রামরাজ্য'। দরিদ্রের প্রতি প্রীতির জন্ম তুলসী তাহাদের সহিত এক হইয়া গিয়াছিলেন। যেখানে সুযোগ পাইয়াছেন ব্যক্তিগত ভাবে দরিদ্রের সেবা করিয়াছেন। এই দরদপূর্ণ সেবাকাহিনীর দুই চারিটি মাত্র লোকে জানিয়াছে। "কাহারও দুঃখ-শোক নাই, কেহ নির্ধন নাই, অকাল মৃত্যু নাই, দাম্ভিক পরশ্রীকাতর কেহ নাই" এই আদর্শ রামরাজ্যের অবস্থা আনিবার জন্ম তুলসী আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছেন। সে আদর্শ-আনয়নের পথ তিনি দেখাইয়া গিয়াছেন।

কলির মল—কলির দোষ হইতে মানস-রোগের উৎপত্তি হয়। সেই রোগমুক্তির ঔষধের তিনি নিম্নোক্ত ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন—

"রাম কৃপা নাসহিঁ সব রোগা।
জৌ এহি ভাঁতি বনই সংজোগা॥
সদ্‌গুরু বৈদ্যবচন বিশ্বাসা।
সংজম যহ ন বিষয় কৈ আসা॥
রঘুপতি ভগতি সজীবন মূরী।
অনুপান শ্রদ্ধা মতিপূরী॥

অর্থাৎ, রামকৃপা সকল রোগ—দারিদ্র্য দম্ভ হিংসা ক্রোধ আদি সব ব্যাধি নাশ করিতে পারে যদি সদ্‌গুরুরূপ চিকিৎসকের কথায় বিশ্বাস আসে, বিষয়-আশা ত্যাগ করিয়া সংযম অভ্যাস করা হয় ও সঞ্জীবনী-স্বরূপ রঘুপতি-ভক্তি শ্রদ্ধারূপ অনুপানের সহিত ঔষধ বলিয়া সেবন করা যায়।

---

# কালিদাস-কাব্যে ভক্তিভাব

অধ্যাপক শ্রীজ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র দত্ত, এম্‌-এ

মহাকবি কালিদাস ব্রাহ্মণ্যধর্মের পুনরভ্যুত্থানের কবি। তাঁহার অনিন্দ্য রচনার সর্বত্রই ব্রাহ্মণ্যধর্মের মহান্‌ আদর্শ ও ঐতিহ্য সুব্যক্ত। মুখ্যতঃ সৌন্দর্যের পূজারী হইলেও যে-সকল আর্যাচার ভারতীয় সংস্কৃতিকে পুণ্যপ্রভায় ভাস্বর করিয়া তুলিয়াছিল, তাহার রূপায়ণে কালিদাসের কৃতিত্ব অতুলনীয়। তাঁহার কাব্যের রসাত্মকতা শ্রেয়কে সমুচিত মর্যাদা দিয়াছে, ইহাতে প্রেয়ের অধিকারও ক্ষুণ্ণ হয় নাই। তাঁহার বিভিন্ন কাব্যের পৌর্বাপর্য-নির্ণয় কতদূর সম্ভব বলা কঠিন, তবে 'ঋতুসংহারে'র অনিয়ন্ত্রিত ভাবালুতা তাঁহার কবিপ্রতিভার চূড়ান্ত পরিণতি নয়। দিলীপ, রঘু, রামচন্দ্র প্রমুখ আদর্শচরিত্র সূর্যবংশীয় রাজগণের মাহাত্ম্য-বর্ণনে, পঞ্চতপা পার্বতীর ইষ্টপ্রাপ্তির জন্য তীব্র আকূতি ও ঐকান্তিকতা-প্রকাশনে, এমন কি পুরুবংশীয় দুষ্মন্তের স্বধর্মনিষ্ঠা-প্রদর্শনেও সনাতন আর্যাদর্শের প্রতিই কবির সুগভীর শ্রদ্ধা সুস্পষ্ট। দেবচরিত্র-চিত্রণে তাঁহার এই ভাব আরও সুন্দরভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

কালিদাসের ধর্মমত ছিল অত্যুদার। মহাদেব-প্রশস্তি কালিদাস-কাব্যের একটি বৈশিষ্ট্য। ইহা হইতে কালিদাস শৈব ছিলেন এইরূপ অনেকেই মতপ্রকাশ করিয়াছেন। শিবভক্তি কবির অন্তরের কথা হইলেও হরি-হরের অভিন্নতা-সম্বন্ধেও তিনি ছিলেন নিঃসন্দেহ। 'রঘুবংশে'র প্রারম্ভে বাক্য ও অর্থের ন্যায় নিত্যসম্বদ্ধ জগতের জনকজননী পার্বতী ও পরমেশ্বরকে বন্দনা করিয়া কালিদাস শুধু শিবভক্তিই প্রকাশ করেন নাই, আপনার মাতৃপ্রাণতাও প্রকট করিয়াছেন। মহাদেব তাঁহার উপাস্য বলিয়া উপমাচ্ছলেও ইষ্টকে স্মরণ করিয়াছেন। কৃষ্ণসারচর্ম, উদুম্বর-দণ্ড, কুশমেখলা এবং মৃগশৃঙ্গ-ধারণ করিয়া মৌনাবলম্বন-পূর্বক যজ্ঞদীক্ষিত দশরথ উপবিষ্ট হইলে মনে হইত যেন যজ্ঞেশ্বর ভগবান্‌ অষ্টমূর্তি মহাদেব দশরথের মূর্তি পরিগ্রহ করিয়া যজ্ঞস্থলে সশরীরে অবতীর্ণ হইয়াছেন। (রঘুবংশ, ৯।২১) হরিপ্রশস্তিতেও তিনি তুলনাহীন। ঋষ্যশৃঙ্গ-প্রমুখ ঋষি সন্তান-কাম রাজা দশরথের পুত্রপ্রাপ্তির জন্য পুত্রেষ্টি যজ্ঞ আরম্ভ করিয়াছেন। ঠিক ঐ সময়েই লঙ্কেশ্বর রাবণ-কর্তৃক বহুধা উদ্বেজিত দেবগণ ক্ষীরোদশায়ী বিষ্ণুর শরণাপন্ন হইলেন। কিরূপ?—নিদাঘার্তাশ্ছায়াবৃক্ষমিবাধ্বগাঃ—গ্রীষ্মের

প্রখর তাপে তাপিত পথিকগণ যেরূপ ছায়া-তরুর আশ্রয় গ্রহণ করে ( র ব, ১০।৫ )। বিষ্ণুর যোগনিদ্রার অবসান হইল। অনন্তনাগের বিস্তৃত ফণার সুকোমল আসনে তিনি শয়ান। তাঁহার পদপ্রান্তে যোগমায়াস্বরূপা লক্ষ্মী উপবিষ্টা। দেবগণ দেখিলেন—

প্রবুদ্ধপুণ্ডরীকাক্ষং বালাতপনিভাংশুকম্।
দিবসং শারদমিব প্রারম্ভসুখদর্শনম্ ॥ ( „ ১০।৯ )

যোগিজনের নেত্রতর্পণ ও সুখদর্শন সেই প্রফুল্ল পুণ্ডরীকাক্ষ নারায়ণের পরিধানে বালারুণবৎ মনোজ্ঞ পীতবসন। শারদপ্রভাতের ন্যায় তাঁহার শোভা কি প্রাণমাতানো! অনন্তর তাঁহারা—তুষ্টুবুঃ স্তুত্যমবাঙ্‌মনসগোচম্ ( „ ১০।১৫ ) —বাক্য ও মনের অগোচর স্তবনীয় নারায়ণের স্তব করিতে লাগিলেন। কত বিচিত্র ভঙ্গীতে এই প্রশস্তি—

রসান্তরাণ্যেকরসং যথা দিব্যং পয়োঽশ্নুতে।
দেশে দেশে গুণেষেবমবস্থাস্ত্বমবিক্রিয়ঃ ॥ ( „ ১০।১৭ )

—যেমন আকাশপতিত দিব্যজল একমাত্র মধুর রসবিশিষ্ট হইলেও দেশভেদে তাহার ভিন্ন ভিন্ন আস্বাদ হইয়া থাকে, সেইরূপ তুমিও অদ্বিতীয় হইয়া সত্ত্বরজস্তমঃ—এই গুণত্রয়-ভেদে ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া থাক।

অমেয়ো মিতলোকস্ত্বমনর্থী প্রার্থনাবহঃ।
অজিতো জিষ্ণুরত্যন্তমব্যক্তো ব্যক্তকারণম্ ॥
( „ ১০।১৮ )

—তুমি স্বয়ং অসীম অথচ সকল সৃষ্টপদার্থের তুমিই সীমানির্দেশ করিতেছ। তোমার নিজের কোনো কামনা নাই, কিন্তু ভক্তের কামনা তুমিই পূর্ণ করিয়া থাক। তুমি স্বয়ং সতত জয়শীল, অথচ তোমার বিজেতা কেহ নাই। তুমি স্বয়ং সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম হইয়াও স্থূল জগতের সৃষ্টিকর্তা।

হৃদয়স্থমনাসন্নমকামং ত্বাং তপস্বিনম্।
দয়ালুমনঘস্পৃষ্টং পুরাণমজরং বিদুঃ॥ ( „ ১০।১৯ )

—তুমি সকলের হৃদয়ে সর্বদা বিরাজ করিতেছ, অথচ কেহই তোমাকে দেখিতে পায় না। তুমি নিষ্কাম হইয়াও তপস্যারত। তুমি সর্বজীবের দুঃখ দূর করিতেছ বটে, কিন্তু সচ্চিদানন্দস্বরূপ তুমি সর্বদা জরামরণাদি-ক্লেশশূন্য। তুমি আদিতম পুরুষ, অথচ নির্বিকার, নির্জর।

সর্বজ্ঞস্ত্বমবিজ্ঞাতঃ সর্বযোনিস্ত্বমাত্মভূঃ।
সর্বপ্রভুরনীশস্ত্বমেকস্ত্বং সর্বরূপভাক্ ॥ ( „ ১০।২০ )

—তুমি আব্রহ্মস্তম্ব পর্যন্ত সকলই জানিতেছ, অথচ তোমাকে এ পর্যন্ত কেহই জানিতে পারে নাই। বিশ্ব তোমা হইতে উদ্ভূত হইয়াছে, কিন্তু তুমি নিজে স্বয়ম্ভূ। সকলের তুমি প্রভু, কিন্তু তোমার কেহ প্রভু নাই। তুমি এক অদ্বিতীয় হইয়াও সর্বদা সর্বপদার্থে বিরাজ করিতেছ।

অভ্যাসনিগৃহীতেন মনসা হৃদয়াশ্রয়ম্।
জ্যোতির্ময়ং বিচিন্বন্তি যোগিনস্ত্বাং বিমুক্তয়ে॥
( „ ১০।২৩ )

—যোগিবৃন্দ মোক্ষলাভার্থ অভ্যাসবলে চিত্তবৃত্তি বহির্বিষয় হইতে নিবর্তিত করিয়া হৃৎকমলাসীন জ্যোতির্ময় পুরুষ তোমাকেই ধ্যান করিয়া থাকেন।

অজস্য গৃহ্নতো জন্ম নিরীহস্য হতদ্বিষঃ।
স্বপতো জাগরূকস্য যাথার্থ্যং বেদ কস্তব ॥
( „ ১৯,২৪ )

—তুমি জন্মমরণাদি-বিবর্জিত হইয়াও মৎস্য-কূর্মাদি অবতাররূপে জন্মগ্রহণ কর, তুমি নিশ্চেষ্ট এবং নিষ্ক্রিয় হইয়াও দুষ্টদিগকে নিধন কর এবং নিত্য প্রবুদ্ধ হইয়াও যোগনিদ্রায় অভিভূত হইয়া থাক। সুতরাং হে গুণাতীত, কে তোমার স্বরূপ বর্ণনা করিতে পারে?

শব্দাদীন্ বিষয়ান্ ভোক্তুং চরিতুং দুশ্চরং তপঃ।
পর্যাপ্তোঽসি প্রজাঃ পাতুমৌদাসীন্যেন বর্তিতুম্ ॥
( „ ১০।২৫ )

—তুমি শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধ প্রভৃতি বিষয়ের উপভোগে, নরনারায়ণাদিরূপে কঠোরতপস্যানুষ্ঠানে এবং দৈত্যাদি-বিমর্দন দ্বারা প্রজা-পরিপালনে সম্পূর্ণভাবে সমর্থ থাকিয়াও স্বয়ং উদাসীন হইয়া কাটাইতেছ। কে তোমার স্বরূপ কীর্তন করিবে?

বহুধাপ্যাগমৈর্ভিন্নাঃ পন্থানঃ সিদ্ধিহেতবঃ।
ত্বয্যেব নিপতন্ত্যোঘা জাহ্নবীয়া ইবার্ণবে ॥
( „ ১০।২৬ )

—জাহ্নবীর প্রবাহ যেমন নানা পথে প্রবাহিত হইয়াও পরিশেষে মহাসাগরে নিপতিত হয়, সেইরূপ ভিন্ন ভিন্ন শাস্ত্রে সিদ্ধির পথ ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে প্রদর্শিত হইলেও সে সমুদয়েরই একমাত্র গন্তব্য তুমি; তোমাতেই সকল মতের, সকল

শাস্ত্রজ্ঞানের পর্যবসান হইয়াছে।—মহাকবির এই বিষ্ণুস্তবের সঙ্গে পুষ্পদন্তকৃত 'শিবমহিম্নঃ স্তোত্রে'র

ত্রয়ী সাংখ্যং যোগঃ পশুপতিমতং বৈষ্ণবমিতি
প্রভিন্নে প্রস্থানে পরমিদমদঃ পথ্যমিতি চ।
রুচীনাং বৈচিত্র্যাদৃজুকুটিলনানাপথজুষাম্
নৃণামেকো গম্যস্ত্বমসি পয়সামর্ণব ইব॥ (৭)

-রূপ শিবপ্রশস্তির কি অদ্ভুত সাদৃশ্য! সমস্ত মত ও পথের পর্যবসান মহেশ্বরেও যেমন বিষ্ণুতেও তেমন। পুষ্পদন্তের ভাষা হইতে তাঁহাকে কালিদাসের পরবর্তীই মনে হয়। অশেষ শাস্ত্রানুশীলনে সংস্কৃতচিত্ত কালিদাসের এই প্রকার উদার ভক্তিভাব প্রকাশ করা খুবই স্বাভাবিক। আবার কি চমৎকারভাবে আপনার ইষ্টনিষ্ঠা প্রকাশ করিতেছেন—

ত্বয্যাবেশিতচিত্তানাং ত্বৎসমর্পিতকর্মণাম্।
গতিস্ত্বং বীতরাগাণামভূয়সন্নিবৃত্তয়ে॥ ( „ ১০।২৭ )

—যাঁহারা তোমাতে চিত্ত এবং কর্মসমূহ-সমর্পণ করিতে পারিয়াছে, সেই সকল সংসার-বিরাগী মুমূর্ষুদিগের সংসারে গতাগতি-নিবারণের পক্ষে তুমিই একমাত্র গতি।—আবার নির্গুণ নির্বিশেষ নিষ্কল ব্রহ্ম সর্বপ্রমাণের অতীত, প্রত্যক্ষ, অনুমান প্রভৃতি অনুমানের তিনি বিষয়ীভূত নন—

প্রত্যক্ষোঽপ্যপরিচ্ছেদ্যো মহ্যাদির্মহিমা তব।
আপ্তবাগনুমানাভ্যাং সাধ্যং ত্বাং প্রতি কা কথা॥
( „ ১০।২৮ )

—তোমার মহিমার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্তস্বরূপ এই ভূমি, জল প্রভৃতি প্রত্যক্ষ পদার্থসমূহও যখন ইয়ত্তা দ্বারা ধারণার অতীত, তখন কেবল বেদাদি শাস্ত্র ও অনুমানাদি দ্বারা নিরূপণযোগ্য তোমার নির্ধারণ বা তদ্বিষয়ক জ্ঞান একেবারেই অসম্ভব।—তবে কি এই অপ্রত্যক্ষ বাক্যমনের অগোচর ব্রহ্ম নিরন্তর পাপাসক্ত প্রাণীর কোন প্রয়োজনেই আসিবেন না? ভক্ত মহাকবি এই বিষয়ে বিন্দুমাত্র নিরাশ হইতে পারিতেছেন না—

কেবলং স্মরণেনৈব পুনাসি পুরুষং যতঃ।
অনেন বৃত্তয়ঃ শেষাঃ নিবেদিতফলাস্ত্বয়ি॥
( „ ১০।৯ )

—তোমাকে কেবল স্মরণ করিলেই তুমি স্মরণকর্তাকে পবিত্র ও নিষ্পাপ করিয়া থাক; সুতরাং ইহার দ্বারাই তোমার দর্শনলাভ প্রভৃতি কার্যসমূহের শুভফল সপ্রমাণ হইতেছে। যাঁহার স্মরণ দ্বারা চিত্তমল বিধৌত হইয়া যায়, তাঁহার দর্শনের ফল অনন্ত, অপরিসীম। 'শিবমহিম্নঃ স্তোত্রে' শ্রীভগবানের মাহাত্ম্যজ্ঞাপক আর একটি উক্তি আছে। ভক্তবর পুষ্পদন্ত বলিতেছেন—

অসিতগিরিসমং স্যাৎ কজ্জলং সিন্ধুপাত্রে
সুরতরুবরশাখা লেখনী পত্রমুর্বী।
লিখতি যদি গৃহীত্বা সারদা সর্বকালম্
তদপি তব গুণানামীশ পারং ন যাতি॥ (৩২)

কালিদাসও নারায়ণের অচিন্ত্য মহিমা বর্ণনা করিতেছেন—

উদধেরিব রত্নানি তেজাংসীব বিবস্বতঃ।
স্তুতিভ্যো ব্যতিরিচ্যন্তে দূরাণি চরিতানি তে॥
( „ ১০।৩০ )

—রত্নাকরের অন্তর্নিহিত অনন্ত রত্নরাশির ন্যায় সহস্রাংশুর অমিত অংশুমালার ন্যায় বাক্যমনের অতীত তোমার অতুলনীয় গুণরাশি অনন্তকাল কীর্তন করিলেও নিঃশেষ হয় না। শ্রীভগবান্ আপ্তকাম, তাঁহার অনধিগত বা অনধিগম্য কিছুই নাই। তবে তিনি জন্মগ্রহণ করেন কেন? লোকানুগ্রহই তাঁহার জন্মপরিগ্রহের একমাত্র কারণ—

অনবাপ্তমবাপ্তব্যং ন তে কিঞ্চন বিদ্যতে।
লোকানুগ্রহ এবৈকো হেতুস্তে জন্মকর্মণোঃ॥
( „ ১০।৩১ )

—হে ভগবন্, তুমি পূর্ণ। বিশ্বে তোমার অপ্রাপ্ত বা প্রাপ্তব্য কিছুই নাই। কেবল লোকের প্রতি অনুগ্রহ-প্রকাশের নিমিত্তই তুমি জন্মগ্রহণ এবং কর্মানুষ্ঠান করিয়া থাক।—শ্রীভগবানও আশ্বাস প্রদান করিয়াছেন:

অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্।
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া॥
( গীতা, ৪।৬ )

নারায়ণের মহিমা কীর্তন করিতে করিতে ভাষা আপনিই ক্ষান্ত হয়। ভগবানের গুণাবলীর ইয়ত্তা করিয়াই যে ক্ষান্ত হয় তাহা নয়, ভাষার বিরতির কারণ তাহার অসামর্থ্য—

মহিমানং যদুৎকীর্ত্য তব সংহ্রিয়তে বচঃ।
শ্রমেণ তদশক্ত্যা বা ন গুণানামিয়ত্তয়া॥
( „ ১০।৩২ )

আমরা হয়ত অবিশ্বাস-বশতঃ মনে করিতে পারি দেবগণ আপনাদের কার্যোদ্ধারের নিমিত্ত অতিশয়োক্তিবহুল বিষ্ণুর স্তুতিবাদ করিয়াছিলেন।

কালিদাস এই সংশয় দূর করিয়া স্তুতির উপসংহার করিয়াছেন। ভগবান্ সর্বপ্রশস্তির ঊর্ধ্বে, সুতরাং অযথা উদ্দেশ্যমূলক স্তুতি দ্বারা তাঁহার সন্তোষ-বিধান সম্পূর্ণ নিরর্থক। তবে দেবগণের স্তুতি—

ভূতার্থব্যাহৃতিঃ সা হি ন স্তুতিঃ পরমেষ্ঠিনঃ।
( „ ১০।৩৩ )

—ইহা ত প্রশংসাগীতি নয়, ইহা অঘটন-ঘটনপটু শ্রীভগবানের স্বরূপকথন-মাত্র।

বর্তমান প্রবন্ধে প্রধানতঃ 'রঘুবংশ'-কাব্যাবলম্বনে মহাকবি-বর্ণিত ভক্তিভাব প্রদর্শিত হইল। অন্যান্য কাব্য এবং নাটকেও তাঁহার অপূর্ব ভক্তিভাব দেখা যায়। তাহা প্রবন্ধান্তরে আলোচিত হইবে।

---

# শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

**বারাণসী শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমের সুবর্ণজয়ন্তী উৎসব**—শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের প্রাচীনতম সেবাকেন্দ্রগুলির অন্যতম আচার্য স্বামী বিবেকানন্দের জীবৎকালে প্রতিষ্ঠিত কাশী সেবাশ্রম তাহার গৌরবময় জীবনের অর্ধ শতাব্দী অতিক্রম করিল। এই উপলক্ষে ৬ই মার্চ হইতে ৯ই মার্চ পর্যন্ত চারদিন বিবিধ অনুষ্ঠান-সংযুক্ত সুবর্ণজয়ন্তী উৎসব সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। ৬ই মার্চ প্রত্যূষে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সহকারী অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী বিশুদ্ধানন্দজী উৎসবের উদ্বোধন করেন। উত্তরপ্রদেশের গভর্নমেণ্টের সৌজন্যে স্বাস্থ্য ও আরোগ্য-সংক্রান্ত একটি বহুশিক্ষাপ্রদ প্রদর্শনী খোলা হইয়াছিল। ৬ই মার্চ বিকালে বারাণসীর মহারাজা শ্রীবিভূতি-নারায়ণ সিংহের সভাপতিত্বে একটি জনসভার আয়োজন হয়। সেবাশ্রমের সম্পাদক প্রতিষ্ঠানের গত পঞ্চাশ বৎসরের কার্য-বিবরণী পাঠ করেন। শ্রীমৎ স্বামী বিশুদ্ধানন্দজী, রাজা প্রিয়ানন্দ সিংহ, স্বামী জ্ঞানাত্মানন্দ এবং স্বামী চিদাত্মানন্দ ত্যাগ ও সেবার আদর্শ-সম্বন্ধে মনোজ্ঞ ভাষণ দেন।

পরে স্বাস্থ্য ও শিক্ষা-বিষয়ক একটি চলচ্চিত্র দেখানো হয়। ৭ই মার্চ বৈকালীন জনসভায় পৌরোহিত্য করেন কেন্দ্রীয় সরকারের ডাকবিভাগের ডিরেক্টর জেনারেল শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ। তিনি একটি সুচিন্তিত সংক্ষিপ্ত ভাষণে সাধারণ সমাজসেবা এবং মিশনের আচরিত সেবাব্রতের পার্থক্য প্রদর্শন করেন। থিয়সফিক্যাল সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক শ্রীরোহিত মেহতা, বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের পণ্ডিত হাজারী-প্রসাদ দ্বিবেদী ও অধ্যাপক শ্রীহরিদাস ভট্টাচার্য হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা করিয়াছিলেন। পরে স্থানীয় কয়েকটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের বিদ্যার্থিগণ চিত্তাকর্ষক নাট্যাভিনয় দ্বারা সমবেত সকলের মনোরঞ্জন করেন। ৮ই মার্চ বিকালে ভারত গভর্নমেণ্টের স্বাস্থ্যবিভাগের ডিরেক্টর ডাঃ কে সি কে ই রাজা কর্তৃক সেবাশ্রমের রঞ্জনরশ্মি-বিভাগের উদ্বোধন হয়। ঐদিনকার জনসভায় এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টর হাফিজ সৈয়দ, বারাণসী বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টর শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার, স্থানীয় সেণ্ট্রাল হিন্দু বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধানশিক্ষয়িত্রী শ্রীমতী কর্তার কাউর পেণ্টেল এবং স্বামী জপানন্দ ভারত ও বিশ্ব-শান্তি-সম্পর্কে আবেগপূর্ণ ভাষণ দেন। স্বামী প্রণবাত্মানন্দের ছায়াচিত্রযোগে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের জীবনী ও শিক্ষা-সম্বন্ধে বক্তৃতা সকলেরই উপভোগ্য হইয়াছিল। বিশিষ্ট গুণি-গণের সঙ্গীত দ্বারা এই দিনের অনুষ্ঠান-সমূহ শেষ হয়। শেষ দিনের (৯ই মার্চ) সম্মিলনে সভাপতি পণ্ডিত হৃদয়নাথ কুঞ্জরু এবং এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টর কে কে ভট্টাচার্য, কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীঅরবিন্দ বসু, স্বামী গম্ভীরানন্দ এবং স্বামী চিদাত্মানন্দ স্বামী বিবেকানন্দ-প্রদর্শিত সেবার আদর্শ-সম্বন্ধে

বিস্তারিত আলোচনা করেন। সভাপতি-কর্তৃক আবৃত্তি, বক্তৃতা এবং রচনা-প্রতিযোগিতার অগ্রণীগণের মধ্যে পারিতোষিক বিতরিত হইবার পর স্বাস্থ্য ও শিক্ষা-বিষয়ক চলচ্চিত্র এবং ব্যায়ামবিদ্ শ্রীভবানী গাঙ্গুলীর শারীরিক কসরৎ প্রদর্শিত হয়। প্রখ্যাত গায়কগণের সঙ্গীতও সম্মিলনের অঙ্গ ছিল। উৎসবের প্রতিদিনই সকাল ৮টা হইতে ১০টা পর্যন্ত ভজনসঙ্গীতের অনুষ্ঠান হইত। সেবাশ্রম-প্রাঙ্গণের একপ্রান্তে শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও স্বামী বিবেকানন্দের জীবনের ঘটনাবলী এবং শ্রীরামকৃষ্ণসঙ্ঘের বিস্তারের ইতিহাস-সম্বলিত চিত্রাবলী ও মডেলসমূহ সাজানো ছিল। সুবর্ণজয়ন্তী উৎসব উপলক্ষে সেবাশ্রম ইংরেজীতে একখানি সচিত্র চিত্তাকর্ষক স্মৃতিগ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন। ইহাতে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এবং বারাণসীস্থ এই সেবা-কেন্দ্রের অর্ধশতাব্দীব্যাপী মনোজ্ঞ বিবরণ ব্যতীত ছয় জন মনীষীর লেখা শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের জীবনালোকদীপ্ত ভারতের ধর্মসংস্কৃতি-সম্বন্ধে ছয়টি তথ্যপূর্ণ সুচিন্তিত প্রবন্ধও আছে।

**রহড়া শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন বালকাশ্রম**—পিতৃমাতৃহীন অসহায় দরিদ্র বালকগণের জন্য স্থাপিত এই আবাসিক শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের ১৯৫০ এবং ১৯৫১ সালের মুদ্রিত কার্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। এই বর্ষদ্বয়ের শেষে ছাত্রসংখ্যা ছিল ২২৯। শিল্পবিভাগে অভিজ্ঞ শিক্ষকগণ দ্বারা বয়ন, খেলনাতৈরী এবং সেলাই-শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। নিয়মিত উপাসনা, জীবনযাত্রায় স্বাবলম্বন, স্বাস্থ্যনীতি, খেলাধূলা এবং সঙ্গীত আশ্রমশিক্ষার অন্যতম অঙ্গ। কতকগুলি ছেলে নিজেদের আগ্রহে সব্জী এবং ফুলবাগানের কাজ গ্রহণ করিয়াছিল। সকল ফণ্ডের মোট আয় (পূর্ববৎসরের উদ্বৃত্তসহ) এই বর্ষদ্বয়ে ছিল যথাক্রমে ১,৮৬,৫১১৷১১ পাই এবং ২,৫১,২০৮ ৮ পাই এবং খরচ যথাক্রমে ১,৬৭,১০৭ ৫৩ পাই এবং ২,৫২,৭১৩ ৵৬ পাই। বর্ষশেষের উদ্বৃত্ত—৭,১২৪৷৵২ পাই। নামপ্রকাশ করিতে অনিচ্ছুক কলিকাতার জনৈক ব্যারিষ্টার বন্ধু ৯ লক্ষ টাকার সম্পত্তি মুক্তভাবে এই প্রতিষ্ঠান এবং মিশনের রাঁচী যক্ষ্মা-হাসপাতালের জন্য দান করিয়াছেন। তাঁহার এই অসামান্য মহানুভবতা বালকাশ্রমের কার্য-প্রসারে সহায়তা করিবে সন্দেহ নাই।

বালকাশ্রমে ১২ই মার্চ হইতে ১৬ই মার্চ পর্যন্ত ৫ দিবস আচার্য স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব বহু অনুষ্ঠানের সহিত সুসম্পন্ন হইয়াছে। প্রথমদিন প্রাতে মঙ্গলারতির পর বালকগণ বেদ ও গীতা সুমধুর স্বরে আবৃত্তি করে। সকাল ৮ ঘটিকায় ডক্টর কালিদাস নাগ মহাশয়ের পৌরোহিত্যে বালকগণ সামরিক কায়দায় পতাকা উত্তোলন ও অভিবাদন করে। ডক্টর নাগ একটি নাতিদীর্ঘ সুচিন্তিত অভিভাষণে বাংলা তথা সমগ্র ভারতের জাতীয় জীবনে স্বামীজীর অবদানের কথা উল্লেখ করেন। আশ্রম-সম্বন্ধে তিনি উচ্চ প্রশংসা করিয়া বলেন—"আমার পাশ্চাত্ত্য বন্ধুদের একটি সুন্দর আবাসিক বিদ্যালয় দেখাইবার মত এই প্রতিষ্ঠানটিকে দেখিয়া আমি পরম প্রীতিলাভ করিয়াছি।" অপরাহ্ণে আনন্দ-বাজার পত্রিকার শ্রীযুত বিমলকুমার ঘোষ (মৌমাছি) একটি ছাত্রসভায় যোগদান করেন। তিনি দুঃখ করিয়া বলেন—"নিজেদের মৌলিকতা নষ্ট হইবে বলিয়া আজ হয়তো অনেকে স্বামীজীর নামোল্লেখ করেন না। কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দের আবির্ভাবের পর আমরা এমন কোন উন্নত চিন্তাধারা লাভ করি নাই যার মধ্যে স্বামীজীর চিন্তার প্রভাব নাই।" সন্ধ্যায় এক সঙ্গীতানুষ্ঠানে কলিকাতা ও শহর-তলীর বিশিষ্ট শিল্পিগণ যোগদান করেন।

দ্বিতীয় দিন প্রাতে সঙ্গীত-প্রতিযোগিতায় আশ্রমের ১৬টি বালক যোগদান করে। অপরাহ্ণে এক ধর্মসভায় পৌরোহিত্য করেন বেলুড় বিদ্যা-মন্দিরের অধ্যক্ষ স্বামী তেজসানন্দ। প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক শ্রীঅমিয়কুমার মজুমদার সারগর্ভ ভাষণ দেন। সন্ধ্যায় কীর্তনাচার্য শ্রীযুত হরিদাস কর তাঁর সুমধুর সঙ্গীতে সকলকে মোহিত করেন।

তৃতীয় দিন প্রাতে আশ্রমের বালকগণ কর্তৃক কালীকীর্তন, অপরাহ্ণে ১১০০ নরনারায়ণের মধ্যে প্রসাদবিতরণ, সন্ধ্যায় হাওড়া সঙ্গীত পরিষদ-কর্তৃক 'রামকৃষ্ণনামামৃত' কীর্তন এবং রাত্রিতে সুখচর ওরিয়েণ্টাল জিমনেসিয়াম্-কর্তৃক শারীরিক ক্রীড়াকৌশল প্রদর্শিত হয়। চতুর্থ দিবস প্রাতে অধ্যাপক শ্রীত্রিপুরারি চক্রবর্তী কর্তৃক পাণ্ডিত্য ও তথ্যপূর্ণ মহাভারত-সম্বন্ধীয় ভাষণ ও অপরাহ্ণে বালকগণের মুষ্টিযুদ্ধ, লাঠিখেলা ও ছোরাখেলা-

প্রদর্শন এবং সন্ধ্যায় নবাগত বালকগণের 'নদের পাগল' অভিনয় হইয়াছিল।

পঞ্চম দিবস অপরাহ্ণে পুরস্কারবিতরণী সভায় পৌরোহিত্য করেন সুপ্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক অধ্যাপক শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু। বালকগণের আবৃত্তি ও ভজনগানের পর অধ্যাপক বসু একটি সুচিন্তিত অভিভাষণে আশ্রমের কার্যের প্রশংসা করেন। রাত্রিতে আশ্রমের বালকগণ কয়েক সহস্র দর্শকের নিকট 'মহাসমর' অভিনয় করে।

**ফরিদপুর শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে শ্রীরামকৃষ্ণ-উৎসব**—গত ১৪ই ফাল্গুন এই উপলক্ষে বিশেষ পূজা, হোম, আরাত্রিক ও চণ্ডীপাঠ এবং সন্ধ্যায় ভজনসঙ্গীত হয়। ঐ দিন প্রায় তিন শতাধিক ভক্ত নরনারীর মধ্যে প্রসাদ বিতরিত হইয়াছিল। ২৯শে ফেব্রুয়ারী সাধারণ উৎসবে প্রায় দুই সহস্রাধিক ভক্ত নরনারী যোগদান করেন। অপরাহ্ণে শ্রীশ্রীপরমহংসদেবের জীবনী ও আদর্শ আলোচনার জন্য প্রবীণ জননেতা রায় বাহাদুর শ্রীতারকচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে একটি সভা আহূত হইয়াছিল। হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের সরকারী কর্মচারী এবং বেসরকারী বহু গণ্যমান্য ভদ্রমহোদয় ও ভদ্রমহিলা উপস্থিত ছিলেন। সিনিয়র ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট জনাব খলিলুর রহমান বিশেষ করিয়া বলেন যে, শ্রীশ্রীপরমহংসদেবের পবিত্র আদর্শ ও রামকৃষ্ণ মিশনের মহান সেবাধর্ম বিভিন্ন জাতি ও সম্প্রদায়ের মধ্যে ভেদবুদ্ধি দূর করিয়া ঐক্য আনয়ন করিবে।

**আনন্দনগর ( ত্রিপুরা-রাজ্য ) শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন কলোনী**—গত ১৪ই ফাল্গুন শ্রীরামকৃষ্ণ-দেবের শুভ জন্মতিথি-উপলক্ষে সমস্ত দিনব্যাপী আনন্দোৎসব হইয়াছে। সূর্যোদয় হইতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত নামকীর্তন, পূজা, পাঠ, শ্রীশ্রীঠাকুরের পূত জীবনী আলোচনা, দুপুরে প্রায় ১২০০ শত নরনারায়ণের মধ্যে প্রসাদবিতরণ প্রভৃতি উৎসবের অঙ্গ ছিল। সন্ধ্যারতির পর নবদ্বীপের বিখ্যাত কীর্তনীয়া শ্রীযুত ব্রজেন্দ্র পাঠক মহাশয় সদলবলে পালাকীর্তন গাহিয়া অনেক রাত্রি পর্যন্ত শত শত শ্রোতাকে আনন্দ দিয়াছিলেন। পরদিনও তাঁহাদের 'জগাই মাধাই উদ্ধার' পালাকীর্তন এবং পরে 'কবির গান' সকলকে মুগ্ধ করিয়াছিল। বিভিন্ন কলোনী, নিকটবর্তী পাহাড়ী পল্লী এবং শহর হইতে বহু নরনারী আসিয়া উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন।

**শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন নিবেদিতা বালিকা-বিদ্যালয়**—গত ১২ই ফেব্রুয়ারী যুগাচার্য স্বামী বিবেকানন্দের বার্ষিক জন্মতিথি-উপলক্ষে উচ্চ শ্রেণীর ছাত্রীদিগের মধ্যে একটি রচনা-প্রতিযোগিতা ও আবৃত্তি-প্রতিযোগিতা হয়। শ্রেষ্ঠ রচনাটি সভায় পঠিত হয় এবং আবৃত্তিতে প্রথম পুরস্কারপ্রাপ্তা ছাত্রী আবৃত্তি করে। সভাপতি কাঁকুড়গাছি যোগোদ্যানের অধ্যক্ষ স্বামী ওঁকারানন্দ বর্তমান ছাত্রসমাজের ও শিক্ষাবিভাগের নানা সমস্যা-সম্বন্ধে আলোচনা করেন এবং স্বামীজীর জীবনাদর্শ গ্রহণ করিবার বিশেষ প্রয়োজনীয়তার কথা অতি সরল ও মর্মস্পর্শী ভাষায় ছাত্রীদিগকে বুঝাইয়া দেন।

**কাঁথি শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে আচার্য স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব**—এই উপলক্ষে ৯ই ও ১০ই ফেব্রুয়ারী বিশেষ পূজা, উপনিষৎপাঠ, বিশিষ্ট গায়কগণের সঙ্গীত, শোভাযাত্রা ও জন-সভার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। মহকুমা-শাসক শ্রীঅমলকৃষ্ণ গুপ্ত সভায় পৌরোহিত্য করেন। স্বামী আদিনাথানন্দ, অধ্যাপক শ্রীবনবিহারী ভট্টাচার্য, অধ্যাপক শ্রীক্ষীরোদমোহন চক্রবর্তী এবং অধ্যাপক শ্রীসন্তোষকুমার মুখোপাধ্যায় ভাষণ দিয়াছিলেন। স্বতন্ত্র একটি মহিলাসভায় স্বামীজীর রচনা হইতে পাঠ আবৃত্তি এবং তাঁহার জীবনী ও বাণী আলোচিত হইয়াছিল।

**বৃন্দাবন শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম**—এই প্রতিষ্ঠানের ৪৫ বার্ষিক কার্যবিবরণী ( ১৯৫১ ) প্রকাশিত হইয়াছে। এই বর্ষে হাসপাতালের অন্তর্বিভাগে ১৫৫৯ এবং বহির্বিভাগে ৩৩,০৪১ নূতন রোগীকে চিকিৎসা করা হইয়াছিল। পুরাতন রোগীর সংখ্যা ছিল ৭৪,৪৫৮। সেবা-শ্রমের নন্দবাবা চক্ষু হাসপাতাল চক্ষুরোগপ্রধান এই অঞ্চলে দরিদ্র জনগণের একটি বিশিষ্ট উপকার সাধন করিতেছে। চক্ষুহাসপাতালের অন্তর্বিভাগে এই বর্ষে রোগীর সংখ্যা ছিল ৮৯৩, বহির্বিভাগে ২৬,৮৫৫। সেবাশ্রমটি বর্তমানে যমুনা নদীর অব্যবহিত তীরদেশে অবস্থিত বলিয়া প্রায় প্রতিবৎসরই বন্যাবিধ্বস্ত হইবার আশঙ্কা থাকে। ১৯৪৭ সালে বন্যার দরুন সমূহ ক্ষতি

হইয়াছিল। তাহা ছাড়া সেবাশ্রমটি শহর ও লোকবসতি হইতে দূরে বলিয়া রোগীদিগকে যাতায়াতে বহু অসুবিধাও ভোগ করিতে হয়। এই সকল কারণে নিরাপত্তর এবং অধিকতর সুবিধাজনক স্থানে এই প্রতিষ্ঠানটিকে স্থানান্তরিত করিবার সিদ্ধান্ত হইয়াছে। উত্তর প্রদেশ গভর্নমেণ্টের আনুকূল্যে মথুরা-বৃন্দাবন রোডের উপর ২২'৭৬ একর জমি মিশনের দখলে আসিয়াছে। হাসপাতালের বাড়ী এবং আনুষঙ্গিক ইমারতাদির নির্মাণকার্য শীঘ্রই আরম্ভ হইবে। এই বাবদ সাড়ে সাতলক্ষ টাকা প্রয়োজন। প্রতিষ্ঠানের তহবিলে ৫৪,০০০৲ টাকা আছে। আমেদাবাদের জনৈক ভদ্রলোকের নিকট ৪০,০০০৲ টাকার প্রতিশ্রুতি পাওয়া গিয়াছে। অতএব এখনও ৬ লক্ষ ৫৬ হাজার টাকা যত শীঘ্র সম্ভব সংগ্রহ করিতে হইবে। সেবাশ্রমের কর্তৃপক্ষ এজন্ত সহৃদয় দেশবাসীর নিকট তাঁহাদের প্রার্থনা জানাইতেছেন।

**লণ্ডন শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্তকেন্দ্র**—৪ঠা মার্চ কিংস্‌ওয়ে হলে শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিবস উদ্‌যাপিত হয়। স্বামী ঘনানন্দ এবং শ্রী ধর্মবীরা যথাক্রমে শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের জীবন ও বাণী-সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়াছিলেন। প্রতি বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় স্বামী ঘনানন্দ ধর্ম, দর্শন ও যোগ-বিষয়ে সর্বসাধারণের জন্য একটি বক্তৃতা দিয়া থাকেন। মার্চ মাসে আলোচ্য ছিল (১) বাস্তব-জীবনে আধ্যাত্মিকতা (২) ধর্মজীবন ও অনুভূতি (৩) সৃষ্টি—বৃহৎজগৎ (৪) সৃষ্টি—ক্ষুদ্রজগৎ। প্রতিমঙ্গলবার সন্ধ্যায় সভ্যদের জন্য ধ্যানশিক্ষা এবং পরে ভগবদ্গীতালোচনার ব্যবস্থা আছে। এই কেন্দ্র হইতে Vedanta for East and West নামক একটি দ্বৈমাসিক পত্র বাহির হয়।

**কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বামী নিখিলানন্দের বক্তৃতা**—কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে নিউইয়র্কের রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী নিখিলানন্দ ভারতীয় চিন্তাধারা ও দর্শন-সম্বন্ধে আটটি বক্তৃতা করেন।

২৯শে মার্চ বক্তৃতার উপসংহারে নিখিলানন্দজী বলেন—"ভারত যদি তাহার পুরাতন ঐতিহ্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া অন্ধভাবে পাশ্চাত্যের জড়-আদর্শের অনুসরণ করে তবে তাহার আধ্যাত্মিক মৃত্যু হইবে। আধ্যাত্মিক আদর্শে অটল ছিল বলিয়াই বিদেশীর শাসনাধীনে থাকিয়াও আত্মসত্তা অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিয়াছে। কৃষ্টির পার্থক্য এখানেই। এক্ষণে আধ্যাত্মিক সত্য এবং বৈজ্ঞানিক সত্যের মধ্যে একটা সাম্যপ্রতিষ্ঠা একান্ত কর্তব্য হইয়া উঠিয়াছে। কেন না মানবজাতির সুষ্ঠু অগ্রগতির পক্ষে এখন বিজ্ঞান অত্যাবশ্যক।

এই বক্তৃতামালার বিজ্ঞাপনে কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ হইতে বলা হইয়াছে—"মানবজাতি আজ সংশয়ে, ভয়ে এবং এবং অনিশ্চয়ে আচ্ছন্ন। এই সময় চিন্তাশীল ব্যক্তিরা ভারতের প্রবীণ দার্শনিক এবং আধ্যাত্মিক নেতাদের নিকট হইতে অনেক কিছু শিখিতে পারেন।"—পি টি আই—রয়টার

## নবপ্রকাশিত পুস্তক

(১) Golden Jubilee Souvenir of the Ramakrishna Mission Home of Service Banaras—মূল্য ৩৷০ টাকা।

(২) Ramakrishna Mission and Ideal of Service—মূল্য ।০ আনা

প্রকাশক—শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম
লাক্সা, বারাণস, ইউ পি

# বিবিধ সংবাদ

**সাংস্কৃতিক সম্মেলনে শ্রীজওহরলাল নেহরুর ভাষণ**—গত ২৪শে মার্চ কলিকাতায় নিখিলভারত কংগ্রেস কমিটির আহূত সাংস্কৃতিক সম্মেলনে শ্রীজওহরলাল নেহরু বলেন, প্রকৃত সংস্কৃতিমান্ লোক সংস্কৃতি লইয়া বাগাড়ম্বর করেন না—সংস্কৃতি মূর্ত হইয়া উঠে তাঁহার জীবনে। সংস্কৃতির কাজ মানুষের দৃষ্টিকে প্রসারিত করিয়া দেওয়া। যাহা কিছু সঙ্কীর্ণ, সীমাবদ্ধ তাহা সংস্কৃতি নামের যোগ্য নয়। * * পার্থিব ঐশ্বর্যই সংস্কৃতির পরিমাপক নয়। সংস্কৃতির দুটি দিক আছে—একটি জাতীয় —অপরটি আন্তর্জাতিক। সংস্কৃতির সর্বশ্রেষ্ঠ বিকাশ কখনও একটি দেশের মধ্যে গণ্ডীবদ্ধ হইয়া থাকিতে পারে না—একটি প্রদেশের মধ্যে তো নয়ই। প্রকৃত শিল্পী হইতেছেন সারা পৃথিবীর। জগতের ইতিহাস মানে মানবমনের ক্রমবিকাশের অর্থাৎ সংস্কৃতির ইতিহাস। * * তবুও সংস্কৃতির জাতীয় দিকও আছে। ভৌগোলিক সংস্থান ও প্রাকৃতিক পরিবেশ যেমন পাহাড়, নদী, মরুভূমি প্রভৃতি জাতীয় সংস্কৃতিকে প্রচুর প্রভাবান্বিত করে। * * ভারতের গৌরবময় ঐতিহ্যে সংস্কৃতির বহু মহান্ অভিব্যক্তি দেখা গিয়াছিল। ভারতীয় জীবনে এখন এক নূতন অধ্যায় আরম্ভ হইয়াছে। আমাদের সৃজনী প্রতিভাকে জাতির সংগঠনের কাজের সহিত সংস্কৃতির উন্নতির জন্যও নিয়োজিত করিতে হইবে। আমরা যেন মনে রাখি—সংস্কৃতি একটি অচল বস্তু নয়—ইহা গতিশীল—ইহাকেও গড়িয়া তুলিতে হয়।

**দক্ষিণ কলিকাতায় শ্রীশ্রীমায়ের জন্মোৎসব**—৮০।১ ল্যান্সডাউন রোডে (শ্রীশ্রীসারদা আশ্রম) গত ৯ই ও ১০ই ফেব্রুয়ারী শ্রীশ্রীমায়ের জন্মতিথি উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। ৯ই শনিবার প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত পূজা, হোম, চণ্ডীপাঠ ও কীর্তনাদি হয়। প্রায় পাঁচশত মহিলা যোগদান করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় দিবস অপরাহ্ণে সুবিখ্যাত শিক্ষাবিদ্ শ্রীযুক্তা সুনীতি গুপ্তার নেতৃত্বে এক মহিলা-সভায় সঙ্গীত, অধ্যাপিকা সান্ত্বনা দাশগুপ্তা-কর্তৃক মায়ের কথা আলোচনা এবং শ্রীশ্রীমায়ের জীবনী-অবলম্বনে প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ হইয়াছিল।

**পরলোকে মহারাজা শ্রীশচন্দ্র নন্দী**—কাশিমবাজারের মহারাজা শ্রীশচন্দ্র নন্দীর মৃত্যুতে (২৯শে ফেব্রুয়ারী) বাংলার শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সমাজজীবনের একজন একনিষ্ঠ সেবকের অভাব হইল। স্বনামধন্য পিতা দানবীর মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্রের ন্যায় শ্রীশচন্দ্রও তাঁহার বহু সদ্গুণের জন্য দেশবাসীর শ্রদ্ধা ও প্রীতি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের কোন কোন প্রতিষ্ঠানের সহিত তাঁহার সহযোগিতার কথা স্বতঃই মনে পড়ে। আমরা এই পুণ্যাত্মার সদ্গতি কামনা করিয়া তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে আন্তরিক সমবেদনা জানাইতেছি।

**পরলোকে রঘুনাথ দত্ত**—বিখ্যাত কাগজব্যবসায়ী ভোলানাথ দত্ত এণ্ড সন্সের অন্যতম স্বত্বাধিকারী এবং রঘুনাথ দত্ত এণ্ড সন্সের প্রতিষ্ঠাতা রঘুনাথ দত্ত গত ২০শে ফাল্গুন ৬৭ বৎসর বয়সে তাঁহার কলিকাতাস্থ বাসভবনে পরলোকগমন করিয়াছেন। তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, সততা ও অসাধারণ উদ্যমের দ্বারা তিনি ও তাঁহার ভ্রাতৃবর্গ ভোলানাথ দত্ত এণ্ড সন্সকে সামান্য কাগজের দোকান হইতে ভারতবর্ষের অন্যতম বৃহৎ কাগজব্যবসাপ্রতিষ্ঠানে পরিণত করিয়াছিলেন। নানা জনহিতকর প্রতিষ্ঠানে তাঁহার ঘনিষ্ঠ সংযোগ ছিল। বহু বৎসর হইতে উদ্বোধন কার্যালয়ের সহিত কাগজের ব্যবসা-সম্পর্কে তিনি সংশ্লিষ্ট ছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণমিশনের কোন কোন সেবাকেন্দ্রে ভোলানাথ দত্ত এণ্ড সন্সের স্বত্বাধিকারিদিগের দানও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

রঘুনাথবাবুর মৃত্যুতে বঙ্গজননী একজন সুসন্তান হারাইলেন।

**কুমিল্লা শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের সাধারণ বার্ষিক উৎসব**—কুমিল্লা শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের সাধারণ বার্ষিক উৎসব শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মতিথি উৎসবের আনুষঙ্গিক হিসাবেই অনুষ্ঠিত হয়। ১৪ই ফাল্গুন, বিশেষ পূজা-হোম, ভোগ-রাগ, পাঠ ও জীবনী-আলোচনা এবং সমাগত ভক্তবৃন্দকে প্রসাদবিতরণ ইত্যাদি সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়াছিল।

২৭শে ফাল্গুন অপরাহ্ণে রামমালা ছাত্রাবাসের অধ্যক্ষ পণ্ডিত শ্রীরাসমোহন চক্রবর্তী শ্রীমদ্ভাগবত এবং ২৮শে ফাল্গুন অপরাহ্ণে অধ্যাপক শ্রীআশুতোষ চক্রবর্তী গীতা ও শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। ২৯শে ফাল্গুন, সাধারণ বার্ষিক সভার অনুষ্ঠান হয়। বেলুড় মঠের স্বামী সত্যানন্দ, স্বামী সত্যকামানন্দ ও স্বামী নিঃস্পৃহানন্দ সভায় বক্তৃতা ও ভজনাদি দ্বারা সকলের উৎসাহ বর্ধন করিয়াছিলেন। অন্যান্য বক্তা ছিলেন—শ্রীমণীন্দ্রকুমার চক্রবর্তী, এম এল এ, শ্রীবিনোদবিহারী চক্রবর্তী, এম এল এ, শ্রীত্রৈলোক্য চক্রবর্তী এবং শ্রীমনোরঞ্জন সেনগুপ্ত। তাঁহাদের প্রত্যেকেই শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবনাদর্শের বৈশিষ্ট্য এবং আত্মিক ও ব্যবহারিক জীবনে উহার কার্যকারিতা বিশ্লেষণ করিয়া তৎপ্রতি সমাগত সকলের চিত্ত আকৃষ্ট করেন এবং রামকৃষ্ণ মিশনের প্রবর্তিত ভাবধারা ও কর্মধারায় অনুপ্রাণিত হইয়া দেশের ও সমাজের কল্যাণ সাধন ব্রতে ব্রতী হইতে উদাত্ত আহ্বান জানান। অনাথ আশ্রমের বালকবৃন্দ আশ্রম-প্রাঙ্গণে 'আহুতি' নাটিকা অভিনয় করে। ১লা চৈত্র শুক্রবার সমস্ত দিনব্যাপী উৎসবানুষ্ঠান চলিতে থাকে। প্রভাতে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের সুসজ্জিত ফটো পুরোভাগে রাখিয়া নগরকীর্তন অনুষ্ঠিত হয়। স্থানীয় কীর্তনীয়াদল দুপুর হইতে রাত্রি ৮ ঘটিকা পর্যন্ত শ্রীশ্রীলীলা-কীর্তন করিয়া সমাগত ভক্তবৃন্দের প্রাণে বিপুল আনন্দ পরিবেশন করেন। বেলা ৩টা হইতে রাত্রি ৯টা পর্যন্ত মহোৎসবের প্রসাদ-বিতরণ হয়। অনুমান চার হাজার লোক তৃপ্তির সহিত প্রসাদ গ্রহণ করেন। পরদিন ২রা চৈত্র রাত্রি ৮ ঘটিকায় অনাথ আশ্রমের বালকেরা 'কর্ণার্জুন' নাটক অভিনয় করিয়া সকলের মনোরঞ্জন করে।

**পাবনায় শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মতিথি-পালন**—গত ১৮ই ফাল্গুন অপরাহ্ণে পাবনা রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম প্রাঙ্গণে যুগাবতার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জন্মতিথি দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে আলোচনামূলক এক জনসভায় পৌরোহিত্য করেন অধ্যাপক শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তী। শ্রীজগদিন্দ্রনাথ মৈত্র শ্রীমদ্ভাগবদ্‌গীতার দ্বাদশ অধ্যায় আবৃত্তি দ্বারা সভার উদ্বোধন করিলে শ্রীরাধাচরণ দাস সাহিত্যরত্ন মহাশয় শ্রীরামকৃষ্ণদেবের উদার ও মহান্ সমন্বয়ী শিক্ষার উপর সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া একটি ভাষণদান করেন। অধ্যাপক শ্রীঅচিন্ত্য রায়, এম-এ মহাশয় স্বামী সারদানন্দ মহারাজের শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ পূর্বার্ধ হইতে কয়েকটি অংশ পাঠ করেন। শ্রীসুধীন্দ্রনাথ দে পরমহংসদেবের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করিয়া একটি সময়োপযোগী কবিতা পাঠ করেন।

**ধুম (চট্টগ্রাম)-এ শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ জয়ন্তী**—গত ৩রা, ৪ঠা ও ৫ই চৈত্র স্থানীয় বিবেকানন্দ সমিতির পরিচালনায় ধুম গ্রামে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব ও স্বামী বিবেকানন্দের বাৎসরিক জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। ৩রা হস্তিপৃষ্ঠে শ্রীশ্রীঠাকুরের খুব বড় একখানা ছবি সুসজ্জিত করিয়া লইয়া গীতবাদ্য সহকারে গ্রামের ভিন্ন ভিন্ন পথ দিয়া পরিভ্রমণ করাইয়া আনা হয়। ১০টা হইতে ৪টার মধ্যে পূজা পাঠ, সমিতির বালিকা-বিদ্যালয়ের বালিকাগণ কর্তৃক সমবেত পূজা ও গীতাপাঠ, ভোগ, আরতি, হোম, প্রসাদ-বিতরণ ইত্যাদি সম্পন্ন হয়।

ঢাকা রামকৃষ্ণ মিশনের স্বামী সত্যকামানন্দের সভাপতিত্বে অপরাহ্ণে একটি জনসভা হয়। স্থানীয় বহু গণ্যমান্য মুসলমানও যোগদান করিয়াছিলেন। জনাব বদিয়ার রহমান সাহেব বক্তৃতায় বলেন—প্রত্যেক মানুষই জন্ম হইতে মৃত্যু পর্যন্ত মূলতঃ এক এবং প্রত্যেক ধর্মই একই সত্যকে উপলব্ধি করিবার ভিন্ন ভিন্ন পথ মাত্র। মানুষে মানুষে যে কোন প্রভেদ নাই তাহা উপলব্ধি করিবার জন্য তিনি সকলকে অনুরোধ করেন। পোষ্ট মাষ্টার মজরুল হক্

সাহেব শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব এবং স্বামীজির জীবনী আলোচনা করেন এবং সকলকে তাঁহাদের আদর্শ গ্রহণ করিবার জন্য অনুরোধ জানান। সন্ধ্যারতির পর রাত্রি ৯টা হইতে ৩টা পর্যন্ত "বেহুলা" নাটক যাত্রাভিনয় হয়।

৪ঠা চৈত্র সোমবার মহিলাসভায় প্রায় ৭।৮ শত মহিলা সমবেত হইয়াছিলেন। ৫ই চৈত্র ভাগবতপাঠ হয়। এই অঞ্চলে এই প্রকার উৎসব আর কখনও হয় নাই। ১০।১২ মাইল দূর হইতে স্ত্রী-পুরুষ আসিয়া উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন।

**নবদ্বীপে শ্রীরামকৃষ্ণ মন্দিরপ্রতিষ্ঠা**—বিগত ২৪শে ফাল্গুন নবদ্বীপ শ্রীরামকৃষ্ণ সেবা সমিতির নবনির্মিত মন্দিরপ্রতিষ্ঠা বেলুড় মঠের স্বামী মুকুন্দানন্দের পৌরোহিত্যে যথা-শাস্ত্র সম্পন্ন হইয়াছে। এতদুপলক্ষে সারাদিন ব্যাপী আনন্দোৎসব, উপনিষদ্, গীতা, চণ্ডী, শ্রীমদ্ভাগবত, চৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীরামকৃষ্ণপুঁথি, কথামৃত-পাঠ; পণ্ডিত-বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণ বিদায়, প্রসাদ-বিতরণ এবং ভজনাদি হইয়াছিল। বেলুড় মঠের আরও কতিপয় সন্ন্যাসী উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন।

**দরং (তেজপুর—আসাম) এ শ্রীরামকৃষ্ণোৎসব**—স্থানীয় রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমের উদ্যোগে ১৪ই ফাল্গুন শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের পুণ্যাবির্ভাবোৎসব সুসমারোহে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। পূর্বাহ্ণে পূজা ও প্রসাদ-বিতরণাদি এবং সায়াহ্নে আরতির পর দরং কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীঅনিলচরণ রায়ের পৌরোহিত্যে জনসভার আয়োজন হয়। সভাপতি মহাশয় বিশেষ ভাবে ছাত্রসমাজকে শ্রীশ্রীঠাকুরের সর্বধর্মসমন্বয় এবং নরনারায়ণ-সেবার আদর্শ ও শিক্ষা অনুসরণ করিয়া চরিত্রগঠন করিতে আহ্বান করেন।

সভায় শ্রীমহাদেব শর্মা, শ্রীসুনীল বসু, শ্রীরমণীন্দ্র বসু, শ্রীপ্রবোধ চক্রবর্তী, শ্রী আর ঘোষ এবং শ্রীদিগিন্দ্রমোহন মজুমদার মনোজ্ঞ বক্তৃতায় এবং সুচিন্তিত প্রবন্ধ ও কবিতা পাঠ করিয়া এবং শ্রীমতী হিরণ বড়া, শ্রীপ্রবোধ চক্রবর্তী, শ্রীঅতীন্দ্র মজুমদার, শ্রীসতীন চৌধুরী এবং শ্রীকিশোরী চক্রবর্তী অতি সুললিত ভাবে শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রশস্তি-সঙ্গীতে উপস্থিত সকলের আনন্দবর্ধন করিয়া ছিলেন।

**আড়িয়াদহে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মতিথি অনুষ্ঠান**—স্থানীয় রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে ২৭শে ফেব্রুয়ারী বিশেষ পূজা, শ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত আলোচনা ও ভজনসঙ্গীত হইয়াছিল। ২রা মার্চ নরনারায়ণ-সেবা, সঙ্গীত ও আবৃত্তি-প্রতিযোগিতা এবং জনসভার আয়োজন হয়। বেলুড়মঠের স্বামী ভবানন্দ তাঁহার মনোজ্ঞ ভাষণ দ্বারা সমবেত সকলের উৎসাহ ও আনন্দ বর্ধন করিয়াছিলেন।

**বাহিরগাছি (নদীয়া) রাধারমণ সাধনাশ্রমে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ উৎসব**—এই উপলক্ষে ২৭শে ফাল্গুন অপরাহ্ণে শঙ্কর-মিশনের শ্রীমৎ শঙ্কর মহাবীর চৈতন্য ব্রহ্মচারীর সভাপতিত্বে একটি ধর্মসভার অনুষ্ঠান হয়। ধুবুলিয়া বাস্তুহারা শিবিরের কর্মসচিব শ্রীজিতেন্দ্রনাথ কুশারী ছিলেন প্রধান অতিথি। বেলুড় মঠের স্বামী সুন্দরানন্দ সভায় বক্তৃতা করেন। পরের দিন মুড়াগাছা বালিকা বিদ্যালয়-প্রাঙ্গণে আর একটি ধর্মসভায় উক্ত স্বামীজী কর্মজীবনে বেদান্ত-সম্বন্ধে ভাষণ দিয়াছিলেন।

**রায়গঞ্জ (পশ্চিম দিনাজপুর) শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম**—স্থানীয় ভক্তমণ্ডলীর উৎসাহে ও চেষ্টায় এই মহকুমা শহরে একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মতিথি-উপলক্ষে দিবসত্রয়ব্যাপী উৎসব উদযাপিত হইয়াছিল। শেষদিন মালদহ শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী পরশিবানন্দ একটি জনসভায় শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবন ও বাণী আলোচনা করেন।

**হোজাই (নওগাঁ, আসাম) এ শ্রীরামকৃষ্ণ উৎসব**—স্থানীয় জনসাধারণ সরকারী হাসপাতাল-প্রাঙ্গণে ৫ই ও ৬ই মার্চ দুই দিন শ্রীরামকৃষ্ণ-দেবের জন্মোৎসব উদ্‌যাপন করিয়াছেন। পূজা, হোম, কীর্তন, শোভাযাত্রা ও প্রসাদবিতরণ উৎসবের অন্যতম অঙ্গ ছিল। বেলুড় মঠের স্বামী অবিনাশানন্দ ও স্বামী চণ্ডিকানন্দ জনসভায় শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনী ও বাণী-সম্বন্ধে ভাষণ দিয়াছিলেন।

## 'আমি'র স্বরূপ

অহো অহং নমো মহ্যং বিনাশো যস্য নাস্তি মে।
ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্যন্তং জগন্নাশেঽপি তিষ্ঠতঃ॥
অহো অহং নমো মহ্যমেকোঽহং দেহবানপি।
ক্বচিন্ন গন্তা নাগন্তা ব্যাপ্য বিশ্বমবস্থিতঃ॥
অহো অহং নমো মহ্যং দক্ষো নাস্তীহ মৎসমঃ।
অসংস্পৃশ্য শরীরেণ যেন বিশ্বং চিরং ধৃতম্॥
অহো অহং নমো মহ্যং যস্য মে নাস্তি কিঞ্চন।
অথবা যস্য মে সর্বং যদ্বাঙ্মনসগোচরম্॥

( অষ্টাবক্র সংহিতা, ২।১১-১৪ )

আশ্চর্য আমি! স্বয়ং সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা হইতে সৃষ্টির নিম্নতম তৃণকণা পর্যন্ত জগতে যাহা কিছু সবই নাশ পায়—আমার কিন্তু মৃত্যু নাই। আমার এই নিত্যবর্তমান স্বরূপকে নমস্কার করি।

কী অদ্ভুত আমি! ক্ষুদ্র সীমাবদ্ধ একটি দেহে অবস্থান করিয়াও স্বরূপতঃ কোথাও আমার গতাগতি নাই—অদ্বিতীয় চৈতন্যসত্তায় সারা বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জুড়িয়া আমি রহিয়াছি। আমায় নমস্কার।

অতুলনীয় আমি! নমস্কার আমায়। অনন্তকাল ব্যাপিয়া শরীর-সংস্পর্শ বিনা অখিল ভুবনকে ধরিয়া রাখিয়াছি। আমার ন্যায় এইরূপ সুকৌশলী আর কে আছে?

অপূর্ব প্রহেলিকা আমি! (একদিক দিয়া দেখিলে) আমার কিছুই নাই—আবার (অন্য এক দৃষ্টিতে) বাক্য ও মনের গোচর যাহা কিছু সবই আমার। আমার এই বিস্ময়কর স্বরূপের উদ্দেশে বার বার বন্দনা জানাই।

---

# নাগমহাশয়ের গৃহে

স্বামী বিরজানন্দ

১৮৯৮ সালের শেষভাগে স্বামীজী প্রকাশানন্দ ও আমাকে ঢাকায় প্রচারকার্যে পাঠাইয়াছিলেন। সেই সময়ে একবার আমরা শ্রীশ্রীঠাকুরের অন্যতম গৃহী ভক্ত নাগমহাশয়কে দর্শন করিতে তাঁহার বাড়ী দেওভোগে গিয়াছিলাম। পূর্বেও তাঁহাকে কয়েকবার মঠে ও কাঁকুড়গাছি যোগোদ্যানে দেখিয়াছিলাম ও তাঁহার অলৌকিক চরিত্রের সাক্ষাৎ নিদর্শন পাইয়া মুগ্ধ হইয়াছিলাম। যাহা হউক এইবার তাঁহার স্বগৃহে ঘনিষ্ঠভাবে যে ভাবে তাঁহাকে পাইয়াছিলাম উহার পুণ্যস্মৃতি অতি মধুর।

আমাদিগকে দেখিয়া তিনি আনন্দে যে কি করিবেন যেন ভাবিয়া পাইতেছিলেন না। আমরা প্রণাম করিবার আগেই তিনি প্রণাম করিয়া মণ্ডপের ভিতর আমাদের জন্য মাদুর সতরঞ্চ বিছাইলেন এবং আমাদিগকে অতি সমাদরে বসাইয়া তাড়াতাড়ি নিজে তামাক সাজিয়া আনিলেন। দাওয়ার দিকে উঠানে বিনীতভাবে দাঁড়াইয়া গদগদস্বরে নিজের মনে বলিতে লাগিলেন, আজ আমার কী ভাগ্য! কী ভাগ্য! মহাপুরুষরা কৃপা করে আমায় পদধূলি দিলেন ইত্যাদি।

গ্রামে খবর পড়িয়া গেল। ভক্তেরা আসিতে আরম্ভ করিলেন; নাগমহাশয়ও তাঁহাদিগকে সঙ্গে লইয়া আমাদের কাছে উপস্থিত করিতে লাগিলেন। তামাক খাইয়া হুঁকা কলিকা রাখিতে না রাখিতেই তিনি পুনরায় তামাক সাজিয়া লইয়া হাজির! যত বারণ করি, আর এখন দরকার নাই—তিনি কিছুতেই শুনিবার পাত্র নন্। শেষে আমার মাথা ঘুরিতে ও শরীর ঝিম্ ঝিম্ করিতে লাগিল। আর টানিতে পারি না—তবুও না খাইলে তিনি মনঃক্ষুণ্ণ হইবেন বলিয়া না টানিয়াও পারি না! কিছুক্ষণ পরে দেখি রাশীকৃত মাছ, দই, দুধ, মিষ্টান্ন ক্রমে ক্রমে হাজির হইতেছে। আমাদের জন্য বিপুল জলযোগের ব্যবস্থা হইল। নাগমহাশয়ের সাধ্বী স্ত্রী সমবেত সকলের জন্য রান্নার কাজে ব্যস্ত রহিলেন। পরে যখন আমাদের মধ্যাহ্ন ভোজনের ডাক পড়িল, তখন গিয়া দেখি যে আমাদের দুজনকে এত নানারকমের ব্যঞ্জনের ও মিষ্টান্নের বাটি ও রেকাবী দেওয়া হইয়াছে যে আধখানা ঘর ভরিয়া গিয়াছে। দেখিয়াই তো আমাদের চক্ষু স্থির! নাগ মহাশয় দরজার বাহিরে দাঁড়াইয়া আমাদের খাওয়া দেখিতে লাগিলেন ও এটা আরও খান, ওটা আর একটু নিন প্রভৃতি বলিয়া পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। ক্রমাগত বলিতে লাগিলেন, তাঁর অদৃষ্ট আমরা খেতে পারছি না, ইত্যাদি। তাঁহার ভাব দেখিয়া আমরা আকণ্ঠ পুরিয়া যতক্ষণ পর্যন্ত না আর গলায় ঢুকে, বমি হইবার উপক্রম হয় ততক্ষণ খাইয়া চলিলাম। সকলের আহারের পর নাগমহাশয় ও তাঁহার স্ত্রী খাইলেন। বিশ্রামের পর বৈকালে আমাদিগকে দেখিবার জন্য অনেক ভদ্রলোক আসিলেন। নাগমহাশয় তাঁহাদের দাওয়ার উপর পৌঁছাইয়া দিয়া বলিতে লাগিলেন, আপনারা আজ এই সন্ন্যাসীদের দর্শন-স্পর্শনে ধন্য হয়ে যান, ধন্য হয়ে যান। তিনি নিজে উঠানের

এক কোণে দূরে প্রবেশের পথের ধারে একটি মালসায় আগুন লইয়া ময়লা-কাপড়-পরিহিত, বসিয়া আছেন এবং কখন আমি তামাক খাইয়া হুঁকা রাখি দেখিতেছেন। তামাক ফুরাইলে আবার তামাক সাজিয়া লইয়া আসিতেছেন। অনেক দূর হইতে এক জন ডিপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট নাগমহাশয়ের নাম শুনিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন। মলিন বসনে দীনভাবে উপবিষ্ট নাগমহাশয়কে তিনি বাড়ীর চাকর মনে করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, এখানে যে মহাপুরুষ থাকেন তিনি কোথায়? নাগমহাশয় অমনি শশব্যস্তে উঠিয়া, 'আসুন, আসুন, মহাপুরুষদের দর্শন করুন' বলিয়া ভদ্রলোককে আমাদের নিকটে আনিয়া বসাইয়া দিলেন এবং আগে যেখানে বসিয়াছিলেন পুনরায় সেখানে গিয়া পূর্ববৎ দীনভাবে বসিয়া রহিলেন। ভদ্রলোকটি আমাদের সহিত কিছুক্ষণ আলাপান্তে আমরা বেলুড় মঠ হইতে আসিয়াছি শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, নাগমহাশয় কোথায়? আমরা ইশারা দ্বারা যখন নির্দেশ করিলাম তখন ভদ্রলোকটি বিস্ময়বিমূঢ় ভাবে 'উনি নাগমহাশয়!' বলিয়া নির্বাক হইয়া তাঁহাকে দেখিতে লাগিলেন। তাঁহার মুখের ভাব দেখিয়া মনে হইল যে নাগমহাশয় সম্বন্ধে অনেক শুনিয়া তাঁহার এ পর্যন্ত যে ধারণা ছিল, এখন চোখে যাহা দেখিতেছেন তাহাতে তাঁহার শ্রদ্ধা শতগুণ বাড়িয়া গিয়াছে—এই অদ্ভুত নিরভিমান যেন মানুষে সম্ভবপর বলিয়া বিশ্বাস হইতেছে না।

সন্ধ্যার সময় সঙ্কীর্তন আরম্ভ হইল। খুব মাতামাতি চলিতেছে—নাগ মহাশয় কিন্তু সমস্ত সময়টা দাওয়ার নীচে উঠানে দাঁড়াইয়া। ভাবে বিভোর হইয়া ধীরে ধীরে গানের সঙ্গে সঙ্গে হাতে তালি দিতেছেন এবং একটু একটু নাচিতেছেন; দাওয়ার উঠিতেছেন না, পাছে তাঁহার পাপ শরীরের হাওয়া ও সংস্পর্শ আমাদের লাগে!

রাত্রে খাইতে গিয়া দেখি দুপুরের মত সেইরূপ বিরাট আয়োজন। আমাদের কান্না পাইতে লাগিল, এই বিপদে কি করিয়া উদ্ধার পাইব! নাগমহাশয় ঘরের বাহিরে দাঁড়াইয়া আমরা বেশী কিছু খাইতে পারিতেছি না দেখিয়া নিজের অদৃষ্টকে ধিক্কার দিতে লাগিলেন, তিনি এমন কি পুণ্য করিয়াছেন যে তাঁহার সেবা আমরা গ্রহণ করিতে পারি। ছলছল দৃষ্টি। সেই ঘরটিতে আমাদের শুইবার ব্যবস্থা হইল, কারণ উহাই বাড়ীতে একমাত্র দরজাকপাট-ওয়ালা ভাল ঘর। রান্নাঘরটি অতি ছোট ও ভাঙ্গাচোরা। যাহাকিছু বিছানাপত্র ছিল সব আমাদের ও ভক্তদের দিয়াছেন। পরে সকাল বেলায় শুনিলাম তাঁহার স্ত্রী রান্না ঘরে শুইয়াছিলেন ও তিনি সকলে শুইবার পর নামমাত্র জলযোগ করিয়া রান্নাঘরের বাহিরের দাওয়ার এক কোণে একটি শতচ্ছিদ্র ময়লা কাঁথা জড়াইয়া সেই শীতকালের রাত্রি যাপন করিয়াছিলেন!

পরদিনও আবার পূর্বদিনের পুনরাবৃত্তি দেখিয়া ভয় পাইয়া প্রকাশানন্দকে বলিলাম, আর নয়, চল পালানো যাক। নাগমহাশয় কিছুতেই যাইতে দিবেন না। অগত্যা আমরা সেদিন খাইয়া বৈকালে ৪টার ট্রেনে যাইব বলিলাম। ঐদিনও সেই রকম নানা রকমের মাছ, ব্যঞ্জন ও মিষ্টান্নাদির আয়োজন। আকণ্ঠ খাইয়া একটু বিশ্রামান্তে ষ্টেশনে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলাম। ভক্তেরাও কয়েক জন সঙ্গে গেলেন। নাগ মহাশয় তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ দীনতার জন্য আমাদের সকলের পিছনে দূরে দূরে আসিতে লাগিলেন। ষ্টেশন প্রায় দুই মাইল দূর বলিয়া আমরা তাঁহাকে কষ্ট করিয়া আসিতে অনেক নিষেধ করিলাম, কিন্তু তিনি কিছুতেই শুনিলেন না।

ষ্টেশনে আসিয়া টিকিট করিয়া গাড়ীতে

উঠিতে গিয়া দেখি, সব গাড়ী ভর্তি। একটি কামরায় জোর করিয়া উঠিতে গিয়া ভিতরের লোকদের ধাক্কা খাইতে হইল, তাহারা কিছুতেই ঢুকিতে দিবে না। নাগমহাশয় আমাদের ধাক্কা খাওয়া দেখিয়া যেন যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া 'হায়, হায়, কি হল, মহাপুরুষদের অপমান হল, মহা অপরাধ হল! হে প্রভু, অজ্ঞানের অপরাধ নিও না, এদের ক্ষমা কর' ইত্যাদি বলিয়া এমন ছটফট করিতে লাগিলেন যে গাড়ীর লোকেরা সে দৃশ্য দেখিয়া ভয়ে ও ক্ষোভে নিজেদের ব্যবহারের জন্য ক্ষমা চাহিয়া আমাদের সাদরে গাড়ীতে আহ্বান করিল ও নিজেরা ঘেঁষাঘেঁষি করিয়া বসিয়া আমাদের জন্য আধখানা কামরা খালি করিয়া দিল! যাহারা গেরুয়াধারী সাধু দেখিয়াও ধাক্কা দিয়া গাড়ীর বাহির করিয়া দিতে গিয়াছিল, তাহারা এই ছিন্নমলিনকাপড়পরিহিত ভিখারীর মত দেখিতে একজনের এই অপূর্ব ভাব দেখিয়া অনুতপ্ত হইয়া আমাদের খাতির করিয়া ডাকিল! যথার্থ মানবপ্রেম ও চরিত্রবলের কী অমোঘ প্রভাব!

গাড়ী ছাড়িয়া দিলেও আমরা দেখিতে লাগিলাম নাগমহাশয় আমাদের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকাইয়া রহিয়াছেন। যথাসময়ে আমরা ঢাকায় ফিরিয়া আসিলাম। নাগ মহাশয়ের কথা মনে হইলে বলিতে ইচ্ছা হয়, তাঁহার সমগ্র জীবনটি—এমন কি দৈনন্দিন জীবনের ছোট ছোট ঘটনাগুলিও যেন ছিল অমানব আধ্যাত্মিক বিস্ময়ে পরিপূর্ণ। সম্পূর্ণ 'অহং' এবং দেহভাব-বর্জিত এই অনাড়ম্বর দীনবেশী গৃহস্থ ভক্তটি নিজেকে শ্রীভগবানের ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র সৃষ্টির চেয়েও অকিঞ্চিৎকর মনে করিয়া সর্বদা ঈশ্বরপ্রেমে মাতোয়ারা হইয়া থাকিতেন। তাঁহার জীবন সত্যই ছিল দিব্যজীবন। পৃথিবীতে এইরূপ আত্মার আবির্ভাব অতি বিরলই ঘটিয়া থাকে।

---

# যাত্রাপথের গান

শ্রীভাস্করানন্দ পাণ্ডা

দিবসের অবশেষ, যদি হয়ে এ'ল শেষ
সূর্যের খরকর নাহিরে,
তবুও দিগন্তরে সন্ধ্যার তারা ফেরে
যাত্রার জয়গান গাহিরে।
নিমেষের ভ্রান্তি সে নিত্য কভু তো নয়,
সত্যের অসি-ঘাতে নিশ্চিত হবে ক্ষয়,
ক্ষণিকের যত ভয়, সংশয় অপচয়
চলো চলো, সম্মুখ পথপানে চাহিরে॥

দুর্যোগ দুর্দিন দুঃসহ বাধাহীন
অনুদিন যদি আসে দুয়ারে,
তন্দ্রিত প্রহরের মন্দ্রিত মেঘ-স্বরে
শঙ্কিত স্বপনের মাঝারে।
জাগ্রত জীবনের উদ্গত গরিমায়
স্বপ্নের মায়াজাল লুপ্ত যে হয় হায়,
সঙ্কোচ তুচ্ছতা উদ্ধত চেতনায়
চলো চলো, অমৃত-পথ-গান গাহিরে॥

---

# কথাপ্রসঙ্গে

শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিয়াছিলেন, 'এখানকার অনুভূতি বেদবেদান্ত ছাড়িয়ে গেছে।' কিন্তু তাঁহার এই উক্তিটির নজিরে যদি শাস্ত্র, সুনীতি এবং চিরপ্রচলিত সাধুসজ্জনের শিক্ষা ও আচরণকে ডিঙাইয়া সুবিধাবাদীর কল্পনাবিলাস ও স্বেচ্ছাচার ধর্মের নামে বৈষয়িকতার আসর জমাইয়া তুলে তাহা হইলে অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়। মানুষের বিবেককে, তাহার বিশ্লেষণী দৃষ্টিকে, তাহার সত্যানুসন্ধিৎসাকে মুখ থাবড়াইয়া দিবার কী অপূর্ব কৌশলই না ওই কথাটির মধ্য হইতে টানিয়া বাহির করা যায়! 'চুপ কর, জিজ্ঞাসা করিও না, তোমরা আর শাস্ত্রের কতটুকু জানো? এসব বেদ-বেদান্তের পারের শাস্ত্র, যাহা শুনিতেছ মানিয়া যাও, যাহা বলি করিয়া যাও'—ভ্রূকুটি সহকারে ধর্মের বেদী হইতে একথা যদি কেহ ঝঙ্কার দিয়া বলেন, তাঁহাকে প্রতিবাদ করিবার মত সাহস খুব কম লোকেরই থাকে। শ্রীরামকৃষ্ণদেব যে ত্যাগ-তপস্যা-পবিত্রতা-বৈরাগ্য ও ঈশ্বরপ্রেমের মাপকাঠি দিয়া মানুষের আধ্যাত্মিকতা বিচার করিতেন সে মাপকাঠির কথা তখন ভুল হইয়া যায়।

* * *

দেশের সাম্প্রতিক ধর্মজীবনে দুইটি পরস্পর-বিরুদ্ধ চিন্তা ও আচরণের ধারা দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। একটি উদ্ধত বিদ্রোহাত্মক—'ভগবান মানিব না, মঠমন্দির সাধু-সন্তের কাছে মাথা নোয়াইব না, ধর্মের গন্ধ যেখানে আছে সাধ্যমত এড়াইয়া চলিব'। অপরটি বিচারহীন অন্ধতামূলক—'ওঃ তাঁহার কী চেহারা, কী ভাব, কী শক্তি—এতলোকে মানিতেছে, আমিও মানিব না কেন? যাহা বলেন তাহাই গ্রহণ করিব, বুঝিতে না পারি তাহা আমারই বুদ্ধির দোষ, কোন রীতি যদি বিসদৃশ ঠেকে তাহা আমারই দেখিবার ভুল'।

এই দুইটি ধারাই জাতির মানসিক স্বাস্থ্যের অস্বাভাবিকতা জ্ঞাপন করে। প্রথম ধারাটির উৎপত্তি প্রধানতঃ দীর্ঘকালের সামাজিক এবং অর্থনৈতিক বৈষম্যের প্রতিক্রিয়া-রূপে। স্বাধীন-ভারতে এখন ঐ অসামঞ্জস্য উত্তরোত্তর যত ক্ষীণ হইয়া আসিবে সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মনের উপর্যুক্ত ধর্মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহাত্মক প্রতিক্রিয়াও হ্রাসপ্রাপ্ত হইবে আশা করা যাইতে পারে। তাই এই ধারা আমাদের ধর্ম-সংস্কৃতিকে স্থায়ী ভাবে তমসাচ্ছন্ন করিতে পারিবে না। রাষ্ট্রনৈতিক উত্তেজনা কাটিয়া গেলে এবং দশটা দেখিয়া শুনিয়া তরুণগণ আর একটু চিন্তা করিতে শিখিলে তাহাদের ধর্মসম্বন্ধে তিক্ত অসহিষ্ণুতা কমিয়া আসিবে।

কিন্তু দ্বিতীয় ধারাটি সম্বন্ধেই ভাবিবার আছে। ধর্মপ্রাণতার নামে অন্ধ মোহ—আধ্যাত্মিকতার আবরণে অযৌক্তিক প্রমাণহীন দৈবশক্তি ও যোগবিভূতিতে বিশ্বাস—গুরুভক্তির নামে বিবেক-বিগর্হিত মিথ্যা ও উচ্ছৃঙ্খলতার প্রশ্রয়—এগুলি সংক্রামক ব্যাধির মত যদি বাড়িয়া চলে তাহা হইলে আমাদের ধর্মসংস্কৃতি সত্যই অন্ধকার ধাপে নামিয়া যাইবে।

* * *

'বেদবেদান্তকে ছাড়িয়ে যাওয়া' অর্থে শ্রীরামকৃষ্ণ এমন কোন অনুভূতি নিশ্চিতই নির্দেশ করেন নাই যাহা বেদবেদান্তের সিদ্ধান্তের সহিত সংঘর্ষ আনে। তিনি তাঁহার বাণী-প্রচারের ভার প্রধানতঃ যাঁহার উপর দিয়াছিলেন সেই স্বামী বিবেকানন্দের কথায়—'শ্রীরামকৃষ্ণদেব

হইতেছেন বেদমূর্তি।' 'বেদাদি শাস্ত্র এতদিন অজ্ঞান অন্ধকারে লুপ্ত ছিল, শ্রীরামকৃষ্ণরূপ প্রদীপ উহাকে পুনঃ প্রকাশিত করিল—নূতন শাস্ত্র অনাবশ্যক—প্রাচীন অনাদি শাস্ত্র হইতে নূতন আলোক আসিতেছে; শ্রীরামকৃষ্ণরূপ অণুবীক্ষণের মধ্য দিয়া এই শাস্ত্রের মর্ম সংগ্রহ করিতে হইবে। * * সনাতন ধর্মের সার্বলৌকিক, সার্বকালিক ও সার্বদৈশিক স্বরূপ স্বীয় জীবনে নিহিত করিয়া, লোকসমক্ষে সনাতনধর্মের জীবন্ত উদাহরণস্বরূপ আপনাকে প্রদর্শন করিতে, লোক-হিতের জন্য শ্রীভগবান রামকৃষ্ণ অবতীর্ণ হইয়াছেন।'

অতএব রামকৃষ্ণদেবের দোহাই দিয়া যাঁহারা 'নূতন শাস্ত্রের' আমদানী করিতেছেন তাঁহাদিগকে একটু যাচাই করিয়া লওয়া ভাল। স্বামীজী আরও বলিয়াছিলেন—'সৎশাস্ত্রবিগর্হিত ও সদাচার-বিরোধী একমাত্র লোকাচারের বশবর্তী হওয়াই আর্যজাতির অধঃপতনের এক প্রধান কারণ।' এই সতর্কবাণীও স্মরণ রাখা উচিত।

* * *

ধর্মের আঙ্গিনায় আসিয়াছি বলিয়া বিবেক ও বিচারশক্তিকে, সত্যনিষ্ঠাকে, কল্যাণবোধকে একেবারে বাক্সবন্দী করিয়া রাখিলে চলিবে কেন? এই প্রবঞ্চনাময় পৃথিবীতে যাহা তাহা আধ্যাত্মিকতা বলিয়া চালান দিবার লোকের অভাব নাই। লম্বা চওড়া কথা, শুধু বাহ্যিক আড়ম্বর দেখিয়া ভুলিয়া গেলে আখেরে পস্তাইতে হইবে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতায় অর্জুনকে বলিতেছেন—তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণং তে কার্যাকার্যব্যবস্থিতৌ (কোনটি করণীয় আর কোনটি নয়, কোন পন্থা অনুসরণ করিব আর কোনটি করিব না এই প্রশ্ন উঠিলে শাস্ত্রই হউক তোমার পথপ্রদর্শক—শাস্ত্রানুমোদিত পথই রাজপথ)। অতএব যাঁহার নিকট ধর্মোপদেশ লইব তাঁহার কথা, চরিত্র, অভিসন্ধি শাস্ত্রের সহিত—সাধু মহাপুরুষদের যুগযুগপ্রচলিত, বহু-পরীক্ষিত আচরণ ও বৃত্তের সহিত মিলাইয়া লইব এই প্রকার মনোবৃত্তিই সুষ্ঠু এবং সঙ্গত। যাহা বিবেককে বাধা দিতে চায়, চিত্তকে দুর্বল হইতে দুর্বলতর করিয়া তুলে, সত্য ও পবিত্রতার সহিত আপস করে তাহা বিষের স্থায় সর্বতোভাবে পরিহরণীয়।

* * *

স্বামীজী যে শ্রীরামকৃষ্ণরূপ অণুবীক্ষণের মধ্য দিয়া বেদাদিশাস্ত্রের মর্মসংগ্রহের কথা বলিয়াছিলেন তাহার তাৎপর্য নূতন নূতন কথার ইন্দ্রজাল এবং কল্পনাব্যূহ রচনা করা বা নূতন নূতন ক্রিয়া ও আচার দ্বারা শাস্ত্রের সাধনপ্রণালীকে কুয়াসাচ্ছন্ন করিয়া তোলা নয়। উহাদের দ্বারা মানুষের মনকে সাময়িক ভাবে মুগ্ধ করা চলে, কিন্তু তত্ত্বের স্ফুরণ হয় না। শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণী মানুষকে আহ্বান করে তত্ত্বের দিকে মনোযোগ দিতে—আন্তরিক চেষ্টা-যত্ন দ্বারা শাস্ত্রের সত্যকে প্রত্যক্ষ অনুভব করিতে। সেই সত্য সুদূর কোন কল্পলোক হইতে নামিয়া আসিবার বস্তু নয়—উহা আমাদের অতি সমীপবর্তী, আমাদের জীবনের সহিত একান্ত ঘনিষ্ঠ ভাবে জড়িত। কিন্তু মানুষের জীবনের দারুণ বিড়ম্বনা এই, সে ঐ সহজ সত্যকে নানা মনগড়া কল্পনা দিয়া জটিল করিয়া তুলে, যাহা নিতান্তই আপন, স্ব-রচিত ব্যবধান খাড়া করিয়া তাহাকে পর করিয়া রাখে। সহজ যেন তাহার সহ্য হয় না—তাই সে আড়ম্বরের পিছনে ছুটে; নিকটের বস্তু যেন তাহার চোখে পড়ে না—তাই দূর দূরান্তরের দ্রষ্টব্য দেখিবার জন্য সে ব্যাকুল হয়। ফলে ঠকে, শুধু ঘুরিয়া মরে, দুপয়সার জিনিষের দুটাকা দাম গুনিয়া দিয়া পরিশেষে হায় হায় করে।

* * *

যিনি বলিয়াছিলেন তাঁহার অনুভূতি বেদবেদান্ত ছাড়াইয়া গিয়াছে তিনিই তাঁহার শিষ্যদের উৎসাহিত করিতেন সাধুকে দিনে দেখিতে, রাত্রে দেখিতে, টাকার স্থায় বাজাইয়া লইতে। অলৌকিক কুজ্ঝটিকার আমদানী করিয়া ধর্ম-জিজ্ঞাসুর বিবেককে ঢাকিয়া ফেলিবার চেষ্টা তিনি কখনও করেন নাই। ধর্মের ছদ্মবেশে যে সকল নিপুণ বৈষয়িকতা, অতীন্দ্রিয় আধ্যাত্মিকতার অজুহাতে যে সব নিন্দনীয় কাম-কাঞ্চনমত্ততা আজ শিক্ষিত লোকের চিত্তকে সম্মোহিত করিতেছে, ধর্মের যাঁহারা যথার্থ দরদী বন্ধু, তাঁহাদিগকে ঐ সকলের বিরুদ্ধে উদ্যত শাসনদণ্ড উত্তোলন করিতে হইবে। সত্যের, শুচিতার, স্বার্থশূন্যতার কষ্টিপাথরে ধর্মোপদেশ ও ধর্মাচরণকে বিচার করিয়া লইতে সঙ্কোচ করিলে চলিবে না।

# "বহির্নিরোধঃ পদবী বিমুক্তেঃ"

শ্রীনিত্যগোপাল বিদ্যাবিনোদ

আচার্যপাদ শঙ্কর—তাঁহার 'বিবেকচূড়ামণি'র ৩৩৭ সংখ্যক শ্লোকে উপদেশ দিয়াছেন—"বাহ্য-বস্তু নিরুদ্ধ হইলে মন বিশুদ্ধ হয়, মন বিশুদ্ধ হইলে পরমাত্মার সাক্ষাৎকার ঘটে এবং পরমাত্মার সাক্ষাৎ-কার ঘটিলে সংসারবন্ধন-মোচন হয়, অতএব বাহ্য-বস্তুর নিরোধই মুক্তির প্রশস্ত পথ।" জীবমাত্রই প্রয়োজনের দাস। জীব যাহা পাইবার বা ত্যাগ করিবার জন্য চেষ্টা করে তাহার নাম প্রয়োজন—"যমর্থমধিকৃত্য প্রবর্ততে তৎ প্রয়োজনম্।" (ন্যায়দর্শন, ১ম আঃ, ২৪) প্রয়োজনের মূল প্রবৃত্তি। বাসনাভেদে প্রবৃত্তি বিবিধ, কিন্তু যাবতীয় প্রবৃত্তির মূল সুখলিপ্সা। প্রতিদিন অনুক্ষণ জীব যে সকল প্রবৃত্তি বা চেষ্টা করে, সাক্ষাৎ কিংবা পরোক্ষভাবে ঐ সকল চেষ্টার মুখ্য উদ্দেশ্য সুখলাভ। অতি ক্ষুদ্র পিপীলিকা হইতে সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা পর্যন্ত সকলেই আজীবন সুখের জন্য লালায়িত। এই অতি সত্য তথ্যটি মহাভারতে শান্তির অফুরন্ত প্রস্রবণ শান্তি-পর্বে মহামতি ভীষ্ম ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে বুঝাইয়াছেন : "প্রিয় যুধিষ্ঠির, জীবমাত্রের চেষ্টার মূলে সুখের আকাঙ্ক্ষা। কিন্তু ধর্মাচরণ ব্যতীত সুখলাভ হয় না, অতএব সতত ধর্মনিষ্ঠ হইবে।" ন্যায়-দর্শনের বিখ্যাত পরিভাষা-গ্রন্থ 'ভাষাপরিচ্ছেদে' উক্ত হইয়াছে—সুখ জগতে সকলেরই কাম্যবস্তু। উহা কেবল ধর্মের দ্বারাই লাভ করা যায়—"সুখন্তু জগতামেব কাম্যম্" ইত্যাদি। শ্রুতি ঘোষণা করিতেছেন : আমার যেন সুখ হয়, দুঃখ যেন না হয়; ইহা জীবের শাশ্বত কামনা—"সুখং মে ভূয়াৎ, দুঃখং মে মা ভূৎ—ইতি জীবানাং নিত্যাশীঃ।" এই সুখ বস্তুটি কি? প্রকৃতি ও রুচিভেদে সুখের নানাবিধ ভেদ হইলেও যতিবর ধর্মরাজাধ্বরীন্দ্র-বিরচিত 'বেদান্তপরিভাষা'-গ্রন্থ হইতে সর্বজনগ্রাহ্য সুখের একটু পরিচয় দিতেছি। সাতিশয় ও নিরতিশয়-ভেদে সুখ দ্বিবিধ। বৈষয়িক সুখ সাতিশয়, অর্থাৎ ক্ষয়িষ্ণু ও তারতম্য-বিশিষ্ট, ব্রহ্মই নিরতিশয় সুখ—"সুখঞ্চ দ্বিবিধং, সাতিশয়ং নিরতিশয়ঞ্চেতি। তত্র সাতিশয়ং সুখং বিষয়ানুসঙ্গজনিতং, নিরতিশয়ং সুখঞ্চ ব্রহ্মৈব। আনন্দো ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ, বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম" ইত্যাদি। এখন সুখই যদি আকীটব্রহ্ম জীবসমুদয়ের মুখ্য কাম্য হয়, তাহা হইলে সকলেই সুখী হয় না কেন? এই প্রশ্নের সহজ ও সংক্ষিপ্ত উত্তর—যে উপায়ে ও যে পথে চলিলে জীব সুখী হইতে পারে, জীব ঠিক সে উপায় ও পথ চিনে না; সুতরাং বিপথে ও কুপথে চলিয়া দুঃখ-ভোগ করে। সুখ-পথের যাঁহারা মহাজন এবং বিচক্ষণ পথিক, তাঁহারা মনের অসংযম যাবতীয় দুঃখের মূল বলিয়াছেন। জীবের ইন্দ্রিয়গুলি বহির্মুখ। এইজন্যই বায়ুবৎ স্বভাব-চঞ্চল মনকে বশীভূত করিয়া দুঃখময় বিষয়-নরক হইতে উদ্ধার-পূর্বক নিত্য সুখের, ব্রহ্মানন্দের পথে সর্বদা পরিচালনা করাই জীবের পরম পুরুষার্থ। পুরুষার্থ-লাভের শাস্ত্রীয় পথ যোগ। যোগ শব্দের অর্থ মিলন। মন বৃত্তিহীন অর্থাৎ বিষয়াকারে পরিণতিবিহীন করিয়া জীবাত্মাকে পরমাত্মায় বিলীন করার নাম মুখ্য যোগ—

বৃত্তিহীনং মনঃ কৃত্বা ক্ষেত্রজ্ঞং পরমাত্মনি।
একীকৃত্য বিমুচ্যেত যোগোঽয়ং মুখ্য উচ্যতে ॥
( যাজ্ঞবল্ক্য )

মনের ঐরূপ বৃত্তিহীনতা বা বৃত্তিনিরোধের প্রধান উপায় দুইটি—ত্যাগ ও বৈরাগ্য। "অভ্যাস-বৈরাগ্যাভ্যাং তন্নিরোধঃ" ( যোগদর্শন, ১।১২ ) অভ্যাস শব্দের অর্থ, বৃত্তিনিরোধ-পূর্বক মনকে স্বরূপে স্থাপন করিবার জন্য দীর্ঘকাল, অনবরত, আন্তরিক শ্রদ্ধার সহিত পুনঃ পুনঃ প্রচেষ্টা। বৈরাগ্য-শব্দের অর্থ প্রপঞ্চ-বিষয়ে আসক্তির অভাব। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতায় অর্জুনকে চঞ্চল, দুর্নিগ্রহ মনের সংযমে মাত্র এই দুইটি উপায়ের নির্দেশ দিয়াছেন—"অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে।" ( গীতা ৬।৩৫ ) যতিপ্রবর পঞ্চদশীকার মনের অবাধ্যতা-বিষয়ে লিখিয়াছেন,—বরং সাগরের সমগ্র জল পান করা যায়, বরং সুমেরু-পর্বত উত্তোলন করা সহজ, এমন কি অগ্নিও গলাধঃকরণ করা যায়, তথাপি মন বশীভূত করা অসম্ভব বলিয়া মনে হয়—"অপ্যব্ধিপানাৎ মহতঃ" ইত্যাদি। আমরা মহর্ষি অগস্ত্যকে সাগরপান করিতে, রাক্ষসরাজ রাবণকে কৈলাসপর্বত উত্তোলন করিতে এবং শ্রীকৃষ্ণকে দাবাগ্নি-ভক্ষণ করিতেও শুনি। কিন্তু মহর্ষি বিশ্বামিত্র, পরাশর প্রমুখ মহাশক্তিশালী তাপসদিগকেও মনঃসংযমে স্খলিতপদ হইতে দেখি, অতএব মনঃসংযমে অসামর্থ্য জীবের চরম ও পরম পুরুষার্থ মোক্ষলাভের বিষম প্রতিবন্ধক। তাহা সহজে অপসারিত হয়না বা হইতে পারে না। এই বিষয়ে যাঁহারা প্রকৃত কৃতকর্মা—তাঁহাদের দুই একজনের অমূল্য উপদেশের সার-সঙ্কলন করিতেছি। ভগবান্ শঙ্করাচার্যের পরমগুরু আচার্য গৌড়পাদ তাঁহার অপূর্ব পাণ্ডিত্য ও দার্শনিকতাপূর্ণ মাণ্ডুক্য-কারিকার অদ্বৈত-প্রকরণে উপদেশ দিয়াছেন: "যে সমস্ত যোগী আত্মসত্য-বোধ-রহিত তাহাদের পক্ষে ভয়নিবৃত্তি, দুঃখধ্বংস, আত্মবোধ ও অক্ষয় শান্তি অর্থাৎ মুক্তি এই সমস্তই মনের নিগ্রহাধীন। কুশের অগ্রভাগ দ্বারা এক এক বিন্দু জল তুলিয়া সমুদ্র-সেচনের ন্যায়, অখিন্ন´চিত্তে উদ্যম-সহকারে মনোনিগ্রহও খুবই দুঃসাধ্য ব্যাপার।" ( ১০৭।১০৮ )

উক্ত গ্রন্থের পরবর্তী কারিকায় মনোনিগ্রহের উপায়-সম্বন্ধে বলা হইয়াছে: "কাম্য ও ভোগ্যবিষয়ে বিক্ষিপ্ত মনকে বক্ষ্যমাণ উপায় দ্বারা নিগৃহীত করিবে এবং যাহাতে সমুদয় বিলীন হয় সেই লয়নামক সুষুপ্তি-অবস্থায় অতিশয় প্রসন্ন নিরুদ্বেগ মনকেও নিগৃহীত করিবে, কারণ কাম যেরূপ অনর্থকর, লয়ও তেমনি অনিষ্টকর। সমস্ত দ্বৈতবস্তুই দুঃখ-মিশ্রিত; প্রতিনিয়ত ইহা স্মরণ করিয়া মনকে নিবিষ্ট করিবে।" সর্বশেষে ফলশ্রুতিতে লেখা হইয়াছে: "ব্রহ্মবিদ্‌গণ এই আত্মবোধ-রূপ পরম সুখকে স্বস্থ—আত্মগত, শান্ত, কৈবল্য-সহচারী, অবর্ণনীয় এবং জ্ঞেয়-স্বরূপ ব্রহ্মরূপে অজ ( নিত্য ) ও সর্বজ্ঞ বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন।" (১০৮—১১০।১১৪) ভগবান্ শঙ্করাচার্য তাঁহার পূজ্যাতিপূজ্য পরমগুরু-প্রদর্শিত সুস্পষ্ট ইঙ্গিত-অনুসারেই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন—"বহির্নিরোধঃ পদবী বিমুক্তেঃ।"

# পল্লীর কবি রবীন্দ্রনাথ

শ্রীমতী বেলা দে

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ কলকাতার মত এক মহাসমৃদ্ধিশালী শহরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু তাঁর রচনায় শহরের প্রভাব অপেক্ষা পল্লীর প্রভাবই বিশেষভাবে দেখা যায়। রবীন্দ্রসাহিত্যে পল্লীর মহিমা যে কত বিচিত্রভঙ্গীতে প্রকাশলাভ করেছে তা ভেবে দেখলে বিস্মিত হতে হয়। পল্লী ও পল্লীবাসীর সুখ-দুঃখে কবির হৃদয় কখনো গভীর বেদনায়, কখনো বা অহেতুক আনন্দে, কখনো শ্যামল স্নিগ্ধতায়, কখনো দূর অতীতের স্বপ্নে ও আরো বিচিত্র কত অনুভূতিতে আলোড়িত হয়ে উঠেছে! পল্লীর শ্যামল স্নিগ্ধতায় ও সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে কবি সর্বদাই অনুভব করতেন, পল্লীর সব কিছুর মধ্যেই তিনি যেন ছিলেন—যে পল্লীর মধ্যে তিনি যুগ যুগ ধরে অবস্থান করছেন তার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে তাঁর মন আনন্দ ও আবেগে গেয়ে উঠেছিল—

নমো নমো নমঃ সুন্দরী মম জননী বঙ্গভূমি,
গঙ্গার তীর স্নিগ্ধ সমীর জীবন জুড়ালে তুমি!
অবারিত মাঠ, গগন ললাট চুমে তব পদধূলি,
ছায়া-সুনিবিড় শান্তির নীড় ছোটো ছোটো গ্রামগুলি।
পল্লবঘন আম্রকানন, রাখালের খেলাগেহ;
স্তব্ধ অতল দীঘি কালো জল, নিশীথশীতল স্নেহ।"

শুধু দৃশ্য নয়—পল্লীর সব কিছুই কবির কাছে মহিমান্বিত, তাই যখন তিনি পল্লীবধূকে জল আনতে দেখেন তখন তাঁর মনে হয়—

"বুকভরা মধু বঙ্গের বধূ জল লয়ে যায় ঘরে,
মা বলিতে প্রাণ করে আন্‌চান্‌ চোখে আসে জল ভরে।"

যে পল্লীবধূকে দেখে কবি এখানে আনন্দে মুখর হয়ে উঠেছেন, সেই পল্লীবধূকে যখন আবার বিচ্ছিন্ন অবস্থায় শহরে দেখেন তখন তাঁর কবি-মন পল্লীবধূর দুঃখে আপ্লুত হয়ে ওঠে। কবি তাঁর সুবিখ্যাত 'বধূ' কবিতায় পল্লীগ্রাম থেকে সদ্য সমাগতা বধূর মনের দুঃখকে অপূর্ব ভাষায় ব্যক্ত করেছেন। বিকেল হয়ে এসেছে—পল্লী-বধূর মনে পড়ছে যেন তার সখীরা সেই তার পূর্বের দিনের মতই ডাকছে—'বেলা যে পড়ে এলো জলকে চল্' কিন্তু আজ আর তার যাবার উপায় নেই—"হায়রে রাজধানী পাষাণকারা"! এই কবিতাটির মাঝে কবি যে শুধু পল্লবধূরই দুঃখ দেখিয়েছেন তা নয়, একদিকে পল্লীপ্রকৃতির মমতা ও অন্যদিকে নাগরিক জীবনের রূঢ়তা দেখিয়েছেন। পল্লী ও নগরের চিত্র পাশাপাশি এঁকে কবি পল্লীর সহজ অনাড়ম্বর প্রাকৃতিক জীবনের শ্রেষ্ঠতা ও নাগরিক জীবনের কৃত্রিমতা ও ব্যর্থতা দেখিয়েছেন।

পল্লীর সব কিছুই কবির কাছে সুন্দর! পল্লী-জননী বিভিন্ন ঋতুতে বিভিন্নরূপ বৈচিত্র্যে কবিকে মুগ্ধ করেছেন! গ্রীষ্মের শুষ্কপ্রখর মধ্যাহ্ন, বর্ষণমুখর শ্রাবণের গভীর রাত্রি, শরতের নির্মেঘ নীল আকাশের প্রসন্নতা, শস্যলক্ষ্মী, হেমন্তের শোভা, কুয়াসাবৃত শীতের প্রভাত, বসন্তের ক্লান্তিহারা মলয়পবন—পল্লী-ঋতুর বিভিন্ন রূপের অপূর্ব বিকাশ দেখি রবীন্দ্রকাব্যে। বাংলার পল্লীর শ্রাবণ-আকাশের ঘনঘটার মহিমা বিচিত্রভাবে প্রকাশ পেয়েছে কবির 'সোনার তরী' কবিতাটিতে। বর্ষণমুখর বাংলার পল্লীগ্রামে যে মনোমোহকর চিত্রখানি কবি সেদিন দেখেছিলেন তারই কিছু এখানে উল্লেখ করলাম—

"গগনে গরজে মেঘ, ঘন বরষা।
কূলে একা বসে আছি, নাহি ভরসা।

রাশি রাশি ভারা ভারা ধান কাটা হলো সারা,
ভরা নদী ক্ষুর-ধারা খরপরশা।
কাটিতে কাটিতে ধান এলো বরষা
একখানি ছোটো ক্ষেত আমি একেলা
চারিদিকে বাঁকা জল করিছে খেলা।
পরপারে দেখি আঁকা তরুছায়া মসীমাখা,
গ্রামখানি মেঘে ঢাকা প্রভাতবেলা।
এ পারেতে ছোটো খেত আমি একেলা।"

অনুরূপভাবে বাংলার পল্লীর শরৎ ঋতুর মহিমাও রবীন্দ্রকাব্যে বিচিত্রভাবে প্রকাশ পেয়েছে—বাংলার পল্লীতে শরৎ আসে একটা প্রশান্ত মাধুর্য নিয়ে—সে আসে আশা-আনন্দের বাণী নিয়ে। শস্যসম্ভারপূর্ণ ক্ষেত্রগুলির দিকে দৃষ্টিপাত করে কৃষকের প্রাণে যেমন আশা-উৎসাহের সঞ্চার হয় কবির মনেও সেরূপ আশা-আনন্দের সঞ্চার হয়। তিনি স্বপ্ন দেখেন শরতের আগমনে পল্লীবাসীর দুঃখ-দৈন্য দূর হয়েছে, কৃষকগণ ভারে ভারে মাঠ থেকে পাকা ধান বাড়ীতে নিয়ে যাচ্ছে, তাদের ঘরে ঘরে নতুন শস্য তোলবার আনন্দ-উৎসব! কবি তাদের সেই আনন্দে শুধু যে নিজেই যোগদান করেন তা নয়, তিনি বিশ্ববাসীকেও তার ভাগ নেবার জন্য আহ্বান জানান—

"জননী তোমার শুভ আহ্বান
গিয়েছে নিখিল ভুবনে—
নূতন ধান্যে হবে নবান্ন
তোমার ভবনে ভবনে।
অবসর আর নাহিকো তোমার
আঁটি আঁটি ধান চলে ভারে ভার,
গ্রাম-পথে-পথে গন্ধ তাহার
ভরিয়া উঠিছে পবনে।
জননী তোমার আহ্বান-লিপি
পাঠায়ে দিয়েছো ভুবনে।"

এ ছাড়া রবীন্দ্রকাব্যে বিশেষ করে রবীন্দ্র-সঙ্গীতে বাংলার পল্লীগীতির এক অপূর্ব প্রভাব দেখা যায়। কবি শহরে জন্মগ্রহণ করলেও তাঁর জীবনের অধিকাংশই কেটেছে পল্লী-অঞ্চলে—তাই তাঁর কাব্যে ও সঙ্গীতে, বিশেষ করে তাঁর সুবিখ্যাত বাউল গানগুলির মধ্যে পল্লীবাসীর সুখদুঃখ, আনন্দবেদনা, অপূর্বভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে! রবীন্দ্রনাথ শুধু পল্লীর শোভা বা পল্লীর সুখ-দুঃখের কথাই তাঁর কাব্যে প্রকাশ করে ক্ষান্ত থাকেন নি, পল্লীসেবা ও কৃষকদের মঙ্গল করা তাঁর বিরাট কর্মময় জীবনের এক মহাব্রত ছিল—যখন যতটা সম্ভব হয়েছে, তখনই সহায়সম্বলহীন চাষীদের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করেছেন। কবি বলছেন—"কেবলি ভাবছি আমাদের দেশজোড়া চাষীদের দুঃখের কথা! আমার যৌবনের আরম্ভকাল থেকেই বাংলা দেশের পল্লীগ্রামের সঙ্গে আমার নিকট পরিচয় হয়েছে। তখন চাষীদের সঙ্গে আমার প্রত্যহ ছিল দেখাশুনা—ওদের সব নালিশ উঠেছে আমার কানে।" পল্লী-অঞ্চলের ও চাষীদের এই দুঃখকষ্ট তাঁর মনকে এত আঘাত দিয়েছিল যে তিনি শহর ছেড়ে পল্লীর মধ্যেই তাঁর কর্মক্ষেত্র বেছে নিয়েছিলেন—পল্লীকে গড়ে তোলার যে আদর্শ তাঁর মনে স্থান পেয়েছিল সেই আদর্শকে কার্যকরী করবার জন্যই তিনি গ্রামের মাঝেই তাঁর শ্রীনিকেতন গড়ে তুলেছিলেন। মহাত্মা গান্ধীর ন্যায় কবিও উপলব্ধি করেছিলেন ভারতবর্ষের প্রাণকেন্দ্র রয়েছে পল্লী-অঞ্চলগুলিতে। সেজন্য কবির একান্ত কামনা ছিল শিক্ষায় দীক্ষায় ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধায় পল্লীবাসীদের দুঃখ-কষ্টের লাঘব করা ও তাদের মনকে নতুন ছাঁচে গড়ে তোলা। আমাদের পরম সৌভাগ্য এ যুগের শ্রেষ্ঠ কবি ও সাহিত্যিককে আমরা পল্লীমানবের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বন্ধু হিসাবেও পেয়েছিলাম।

# শ্রীরামকৃষ্ণের প্রকৃতি-ভাব

শ্রীমাধুর্যময় মিত্র

ভাবমুখে অবস্থানকারী শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন ভাবরাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাট; নরদেহে অনন্ত ভাবরাশির এমন বিপুল সমাবেশ জগৎ ইতঃপূর্বে কখনও প্রত্যক্ষ করে নাই। একের পর এক ভাবের তরঙ্গ যাঁহার হৃদয়সাগরে উত্থিত হইয়া অপূর্ব পূর্ণতায় মণ্ডিত হইয়া উঠিল, তাঁহার ভাবের ইয়ত্তা করিবে কে?

ভাবঘনবিগ্রহ শ্রীরামকৃষ্ণের 'প্রকৃতি-ভাব' বর্তমান প্রবন্ধের একমাত্র আলোচ্য। প্রকৃতি-ভাব-সম্বন্ধে যাহা কিছু লিপিবদ্ধ করিয়াছি, সে সকলই মুখ্যতঃ শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাসহচর ব্রহ্মজ্ঞ মহাপুরুষ স্বামী সারদানন্দ-রচিত "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাপ্রসঙ্গ"-কে ভিত্তি করিয়া। "ত্বং স্ত্রী ত্বং পুমানসি ত্বং কুমার উত বা কুমারী" সগুণ ব্রহ্মের উদ্দেশে শ্বেতাশ্বতর উপনিষদুক্ত এই মন্ত্র শ্রীরামকৃষ্ণ-সম্বন্ধেও সমধিক প্রযোজ্য। একথা অবশ্য স্বীকার্য, পুরুষদেহে প্রকৃতিভাবের আবেশ ইতঃপূর্বে জগৎ অন্ততঃ একবার প্রেমাবতার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যে প্রত্যক্ষ করিয়া ধন্য হইয়াছে।

শ্রীমদ্ভাগবতে দেখা যায়, কৃষ্ণগতপ্রাণা গোপবালিকাগণ শ্রীকৃষ্ণবিরহে তন্ময় হইয়া কৃষ্ণচিন্তা করিতে করিতে তাঁহাদের প্রকৃতি-ভাব এককালে বিস্মৃত হইয়াছেন। তখন তাঁহারা আপনাদিগকে কৃষ্ণ মনে করিয়া কেহ কৃষ্ণবৎ বংশীধ্বনি করিতে লাগিলেন, কেহ বা কালীয়দমনে তৎপর। ভক্ত কবি জয়দেব বিরহিণী শ্রীরাধিকার অনুরূপ একটি অপূর্ব চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন—

"অনুখন মাধব মাধব সোঙারিতে
সুন্দরী ভেলি মাধাই।
ও নিজ ভাব স্বভাব হি বিছুরল
আপন গুণ লুবধাই॥"

অনুক্ষণ শ্রীকৃষ্ণ-চিন্তা ও স্মরণ করিয়া শ্রীরাধা নিজ প্রকৃতি-ভাব বিস্মৃত হইয়াছেন। আপনাকে কৃষ্ণ মনে করিয়া শ্রীরাধিকা স্বয়ং রাধা রাধা বলিয়া ক্রন্দন করিতেছেন। অন্যদিকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য আপনাতে শ্রীরাধার মহাভাব ও প্রেম ধারণ করিয়া কৃষ্ণবিরহে আকুল ক্রন্দনে বাহ্যহারা। এ দুটি চিত্রের অপূর্ব রসমাধুর্য একত্রে উপভোগ করিবার।

কৈশোরে শ্রীরামকৃষ্ণ একাধিক বার পরিহাস-ছলে নারীবেশ ধারণ করিয়াছিলেন; এ সময় প্রকৃতিভাবের স্বাভাবিক প্রেরণা ছিল না সত্য, তথাপি এই কালেও তাঁহার স্ত্রীসুলভ হাবভাব-অনুকরণদক্ষতা অস্বীকার করা যায় না। যৌবনে সাধনকালে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে পরিপূর্ণ প্রকৃতিভাবের বিকাশ দেখা যায়। ইহাতে ছিল অন্তরের সাধনসম্ভূত সহজ ও স্বাভাবিক প্রেরণা। প্রকৃতিভাবে সাধন-বিষয়ে অতঃপর "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ" হইতে উদ্ধৃত হইল—

"সে উজ্জ্বল ভাবঘনতনু ঠাকুরের ভিতর সকলেই নিজ নিজ ভাবের পূর্ণ আদর্শ দেখিতে পাইয়া আপনাদের কৃতার্থ জ্ঞান করিয়াছে। পুরুষ পুরুষত্বের পূর্ণ বিকাশ দেখিয়া নতশির হইয়াছে; স্ত্রী স্ত্রীজন-সুলভ সকল ভাবের বিকাশ তাঁহাতে দেখিতে পাইয়া নিঃসঙ্কোচে তাঁহাকে আপনার হইতেও আপনার জ্ঞান করিয়াছে।"

"ঠাকুরের স্ত্রীপুরুষ উভয় ভাবের এইরূপ

একত্র সমাবেশ তাঁহার প্রত্যেক ভক্তই কিছু না কিছু উপলব্ধি করিয়াছে। শ্রীযুত গিরিশ এইরূপ উপলব্ধি করিয়া একদিন ঠাকুরকে জিজ্ঞাসাই করিয়া ফেলেন—'মশাই, আপনি পুরুষ না প্রকৃতি?' ঠাকুর হাসিয়া উত্তরে বলিলেন, 'জানি না'। ঠাকুর ঐ কথাটি আত্মজ্ঞ পুরুষেরা যেমন বলেন—আমি পুরুষও নহি স্ত্রীও নহি, সেইভাবে বলিলেন, অথবা নিজের ভিতর উভয় ভাবের সমান সমাবেশ দেখিয়া বলিলেন—সে কথা এখন কে মীমাংসা করিবে?"

"অন্তরস্থ প্রকৃতিভাবের প্রেরণায় যৌবনের প্রারম্ভে ঠাকুরের মনে একপ্রকার বাসনার উদয় হইত। ব্রজগোপীগণ স্ত্রীশরীর লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়া প্রেমে সচ্চিদানন্দবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করিয়াছিলেন জানিয়া ঠাকুরের মনে হইত, তিনি যদি স্ত্রীশরীর লইয়া জন্মগ্রহণ করিতেন, তাহা হইলে গোপিকাদিগের ন্যায় শ্রীকৃষ্ণকে ভজনা ও লাভ করিয়া ধন্য হইতেন।"

একথা বলা বাহুল্য, গোপিকাদিগের ন্যায় কৃষ্ণানুরাগিণী হওয়ার জন্য শ্রীরামকৃষ্ণকে নারীদেহ ধারণ করিতে হয় নাই। শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর ন্যায় তিনিও পুংশরীরধারী হইয়াও প্রকৃতিভাবে কৃষ্ণপ্রেমরস আস্বাদন করিয়াছিলেন।

"......ঠাকুর কিছুকালের জন্য আপনাকে শ্রীমতী বলিয়া নিরন্তর উপলব্ধি করিয়াছিলেন। শ্রীমতী রাধারাণীর শ্রীমূর্তি ও চরিত্রের গভীর অনুধ্যানে আপন পৃথগস্তিত্ববোধ এককালে হারাইয়া তাঁহার ঐরূপ অবস্থা উপস্থিত হইয়াছিল।"

"মধুরভাব-সাধনে প্রবৃত্ত হইয়া ঠাকুর স্ত্রীজনোচিত বেশভূষা ধারণের জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন এবং পরম ভক্ত মথুরামোহন তাঁহার ঐরূপ অভিপ্রায় জানিতে পারিয়া কখন বহুমূল্য বারাণসী সাড়ী এবং কখন ঘাগরা, ওড়না, কাঁচুলি প্রভৃতির দ্বারা তাঁহাকে সজ্জিত করিয়া সুখী হইয়াছিলেন। আবার 'বাবার' রমণীবেশ সম্পূর্ণ করিবার জন্য শ্রীযুক্ত মথুর চাঁচর কেশপাশ (পরচুলা) এবং একসুট্ স্বর্ণালঙ্কারেও তাঁহাকে ভূষিত করিয়াছিলেন।" "এবং ঠাকুর ঐরূপ বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া শ্রীহরির প্রেমৈকলোলুপা ব্রজরমণীর ভাবে ক্রমে এতদূর মগ্ন হইয়া গিয়াছিলেন যে তাঁহার আপনাতে পুরুষবোধ এককালে অন্তর্হিত হইয়া প্রতি বাক্য ও চিন্তা রমণীর ন্যায় হইয়া গিয়াছিল। ঠাকুরের নিকট শুনিয়াছি, মধুরভাবে সাধনকালে তিনি ছয়মাস রমণীর বেশ ধারণ-পূর্বক অবস্থান করিয়াছিলেন।"

"ঠাকুর এইসময় কখন কখন রাণী রাসমণির জানবাজারস্থ বাটীতে যাইয়া শ্রীযুত মথুরামোহনের পুরাঙ্গনাদের সহিত বাস করিয়াছিলেন। অন্তঃপুরবাসিনীরা তাঁহার কামগন্ধহীন চরিত্রের সহিত পরিচিত থাকিয়া তাঁহাকে ইতঃপূর্বেই দেবতা-সদৃশ জ্ঞান করিতেন। এখন তাঁহার স্ত্রীসুলভ আচার-ব্যবহারে এবং অকৃত্রিম স্নেহ ও পরিচর্যায় মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে তাঁহারা আপনাদের অন্যতম বলিয়া এতদূর নিশ্চয় করিয়াছিলেন যে, তাঁহার সম্মুখে লজ্জা-সঙ্কোচাদিভাব রক্ষা করিতে সমর্থ হয়েন নাই।

জানবাজার-বাড়ীতে একবার দুর্গাপূজার সময় মথুরবাবুর পত্নীসহ ঠাকুর "ঠাকুরদালানে পৌঁছিবা-মাত্র আরতি আরম্ভ হইল। ঠাকুরও স্ত্রীগণপরিবৃত হইয়া চামরহস্তে প্রতিমাকে বীজন করিতে লাগিলেন। দালানের একদিকে স্ত্রীলোকেরা এবং অপরদিকে মথুরবাবু প্রমুখ পুরুষেরা দাঁড়াইয়া শ্রীশ্রীজগদম্বার আরতি দেখিতে লাগিলেন। সহসা মথুরবাবুর নয়ন স্ত্রীলোকদিগের দিকে পড়িবামাত্র দেখিলেন, তাঁহার পত্নীর পার্শ্বে বিচিত্র বস্ত্রভূষণে অদৃষ্টপূর্ব সৌন্দর্য বিস্তার করিতে করিতে কে দাঁড়াইয়া চামর করিতেছে।

বার বার দেখিয়াও যখন বুঝিতে পারিলেন না তিনি কে, তখন ভাবিলেন, হয়তো তাঁহার পত্নীর পরিচিতা কোনও সঙ্গতিপন্ন লোকের গৃহিণী নিমন্ত্রিতা হইয়া আসিয়াছেন।……কিছুক্ষণ পরে মথুরবাবু কার্যান্তরে অন্দরে গিয়া কথায় কথায় তাঁহার পত্নীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আরতির সময় তোমার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া কে চামর করিতেছিলেন? মথুরবাবুর পত্নী তাহাতে হাসিয়া বলিলেন, তুমি বাবাকে চিনিতে পার নাই? বাবা ভাবাবস্থায় ঐরূপ চামর করিতেছিলেন। তা হইতেই পারে, মেয়েদের মত কাপড়চোপড় পরিলে বাবাকে পুরুষ বলিয়া মনে হয় না।"

জটাধারীপ্রদত্ত বালগোপাল-বিগ্রহ 'রামলালা'র সহিত শ্রীরামকৃষ্ণের বাৎসল্য-ভাবের লীলা প্রকৃত মাতৃত্বের সুষমায় পরিপূর্ণ।

"মাতা শিশুপুত্রকে দেখিয়া যে অপূর্ব প্রীতি ও প্রেমাবর্ষণ অনুভব করিয়া থাকেন, তিনি এখন ঐ শিশুমূর্তির প্রতি সেইরূপ আকর্ষণ অনুভব করিতে লাগিলেন।"

ঠাকুরের শ্রীমুখের উক্তি—"দেখতুম, সত্য সত্য দেখতুম—এই যেমন তোদের সব দেখছি, এই রকম দেখতুম—রামলালা সঙ্গে সঙ্গে কখন আগে কখন পেছনে নাচতে নাচতে আসছে। কখন বা কোলে ওঠার জন্ম আবদার কচ্চে। আবার হয়ত কোলে করে রয়েছি—কিছুতেই কোলে থাকবে না, কোল থেকে নেমে রোদে দৌড়াদৌড়ি করতে যাবে, কাঁটাবনে গিয়ে ফুল তুলবে বা গঙ্গার জলে গিয়ে ঝাঁপাই জুড়বে! যত বারণ করি ওরে অমন করিসনি, গরমে পায়ে ফোস্কা পড়বে! ওরে অত জল ঘাঁটিস নি, ঠাণ্ডা লেগে সর্দি হবে, জ্বর হবে,—সে কি তা শোনে?' যেন কে কাকে বলছে! হয়ত সেই পদ্মপলাশের মত সুন্দর চোখদুটি দিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে ফিক্ ফিক্ করে হাসতে লাগলো আর আরো দুরন্তপনা করতে লাগলো—বা ঠোঁট দুখানি ফুলিয়ে মুখভঙ্গি করে ভ্যাংচাতে লাগলো। সত্য সত্যই রেগে বলতুম,—'তবে রে পাজি, রোস্, আজ তোকে মেরে হাড় গুঁড়ো করে দেবো।'—বলে রোদ থেকে বা জল থেকে জোর করে টেনে নিয়ে আসি; আর এ জিনিসটা ও জিনিসটা দিয়ে ভুলিয়ে ঘরের ভিতর খেলতে বলি। আবার কখন বা কিছুতেই দুষ্টামি থামচে না দেখে চড়টা চাপড়টা বসিয়েই দিতাম। মার খেয়ে সুন্দর ঠোঁট দুখানি ফুলিয়ে সজল নয়নে আমার দিকে দেখতো! তখন আবার মনে কষ্ট হত! কোলে নিয়ে কত আদর করে তাকে ভুলাতাম।"

ঠাকুরের মাতৃত্বরস-মাধুর্যের আর একটি চিত্র আরও অপূর্ব, আরও মধুর। মা যশোদার দুকূলপ্লাবী সন্তানস্নেহ বক্ষে লইয়া একদিকে ঠাকুর—অন্তদিকে দিব্য বালকভাবে ভাবিত ব্রজের রাখাল শ্রীরাখালচন্দ্র—পরবর্তী কালের স্বামী ব্রহ্মানন্দ। এই প্রসঙ্গে ঠাকুরের শ্রীমুখের উক্তি—"তখন তখন রাখালের এমন ভাব ছিল—ঠিক যেন তিন চারি বৎসরের ছেলে। আমাকে ঠিক মাতার স্থায় দেখিত। থাকিত থাকিত, সহসা দৌড়িয়া আসিয়া ক্রোড়ে বসিয়া পড়িত এবং নিঃসঙ্কোচে মনের আনন্দে স্তনপান করিত।"

"আমাকে পাইলে আত্মহারা হইয়া রাখালের ভিতর যে কিরূপ বালক-ভাবের আবেশ হইত, তাহা বলিয়া বুঝাইবার নহে। তখন যে-ই তাহাকে দেখিত, সেই অবাক হইয়া যাইত। আমিই ভাবাবিষ্ট হইয়া তাহাকে ক্ষীর-ননী খাওয়াইতাম, খেলা দিতাম। কত সময় কাঁধেও উঠাইয়াছি। তাহাতেও তাহার মনে বিন্দুমাত্র সঙ্কোচের ভাব আসিত না।"

দক্ষিণেশ্বরের নৈশ নিস্তব্ধতা বিদীর্ণ করিয়া আকুল কণ্ঠে—"ওরে, তোরা কোথায় আছিস আয়" বলিয়া আহ্বান, সে কি বৎসহারা গাভীর ন্যায় মাতৃহৃদয়-মথিত হাহাকার নয়? নরেন্দ্রের ক্ষণিক বিরহে যাঁহার হৃদয় "গামছা নিঙড়াইবার মত মোচড় দিত" সেকি জননীর স্নেহ-বৎসলতার চূড়ান্ত প্রমাণ নয়? শ্রীরামকৃষ্ণের মাতৃহৃদয়ের অপার্থিব অকৃত্রিম ভালবাসার আকর্ষণেই নরেন্দ্র প্রমুখ ত্যাগী যুবকবৃন্দ সংসার-বন্ধন তুচ্ছ করিয়াছিলেন, একথা পরবর্তী কালে সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন। মহাপুরুষ স্বামী শিবানন্দের নিজ স্বীকৃতি হইতে জানা যায়, প্রথম দর্শনের কালে ঠাকুরকে তিনি নিজ গর্ভধারিণী-রূপেই প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন।

রমণীবেশে সজ্জিত ঠাকুরকে রমণী বলিয়াই ভ্রম হইত একথা পূর্বেই আলোচনা করিয়াছি। কিন্তু এই পুংশরীরের অন্তরালে সত্য সত্যই যে প্রকৃতিভাব প্রচ্ছন্ন ছিল, তাহা সাধারণের দৃষ্টির অতীত হইলেও সাধকের নিকট গোপন থাকিতে পারে নাই। বৃন্দাবনের সিদ্ধ প্রেমিকা তপস্বিনী গঙ্গামাতার প্রসঙ্গে উল্লিখিত আছে—"ঠাকুরের শ্রীমুখে শুনিয়াছি, ইনি দর্শন-মাত্রেই ধরিতে পারিয়াছিলেন, ঠাকুরের শরীরে শ্রীমতী রাধিকার ন্যায় মহাভাবের প্রকাশ, এবং সেজন্য ইনি ঠাকুরকে শ্রীমতী রাধিকা স্বয়ং অবতীর্ণা ভাবিয়া 'দুলালি' বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিলেন।"

এইস্থানে উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না—"ঠাকুর কখন কখন নরেন্দ্রের সহিত নিজ স্বভাবের তুলনায় আলোচনা করিয়া আমাদিগকে বলিতেন, ইহার (তাঁহার নিজের) ভিতর যে আছে তাহাতে স্ত্রীলোকের ন্যায় ভাবের ও নরেনের ভিতর যে আছে তাহাতে পুরুষোচিত ভাবের প্রকাশ রহিয়াছে।"

শুনা যায়, শ্রীশ্রীঠাকুর স্থূল শরীরে অপ্রকট হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শ্রীশ্রীমা 'আমার মা কালী কোথায় গেলে?' বলিয়া ক্রন্দন করিয়াছিলেন।

যে ভাবময় তনু আশ্রয় করিয়া পুরুষ ও প্রকৃতি-ভাব এককালে যুগপৎ ব্যক্ত হইয়াছে, যাঁহার দেহতীর্থে শিব ও শিবানী একাকার হইয়া মিশিয়া গিয়া মহাভাবের গঙ্গাসাগর-সঙ্গম সৃজন করিয়াছে সেই মূর্ত অর্ধনারীশ্বর বিগ্রহকে সশ্রদ্ধ চিত্তে আহ্বান করিয়া বলি—

"ত্বমেব মাতা চ পিতা ত্বমেব।"

---

# তোমায় চাওয়া

ডাঃ শচীন সেনগুপ্ত

কল্পনা যদি মিলায় তোমারে
বাস্তবে তবে চাই না।
অরূপ গগনে যদি দেখা দাও,
রূপ নিয়ে খেলা চাই না।

অভাবের মাঝে যদি দেখা পাই
স্বভাব ভুলিতে চাই না।
দূরে থেকে যদি প্রাণে রহ সদা,
নিকট-সঙ্গ চাই না।

---

# গীতার বাণী

শ্রীপুষ্পিতারঞ্জন মুখোপাধ্যায়

বর্তমান জগতে ধর্মের নামে যাহা চলিতেছে তাহা অনেক ক্ষেত্রেই যেন ধর্মের গ্লানি—ধর্ম এখন যেন হইয়াছেন সুবিধাবাদী ধনবানদিগের বিলাস, চতুর দরিদ্র ও অলসদিগের বঞ্চনাময় জীবিকা-পন্থা আর মধ্যবিত্ত লোকের একটা কৃত্রিম ও সাময়িক সান্ত্বনা। সত্যধর্মের সন্ধান খুব কম লোকই করেন। ধর্মের অভ্যুদয় মানবসাধারণকে মুক্তি দিবার জন্য, কিন্তু সেই ধর্মই যদি হইয়া পড়ে মানুষের কঠিনতম বন্ধন তাহা হইলে তদপেক্ষা অধিকতর পরিতাপের বিষয় আর কি আছে? ধর্মের কাজ মানুষকে আশা আলোক শান্তি দেওয়া, কিন্তু এখন মানুষ যেন ধর্মের নিকট পাইতেছে নৈরাশ্য ও ভয়, অবসাদ অন্ধকার, অজ্ঞানতা ও কুসংস্কার।

গীতায় শ্রীভগবান্ যে বাণী উপদেশ করিয়াছেন তাহাতেই সত্যধর্মের কথা আছে। গীতোক্ত ধর্ম সম্যক্ অনুসরণ করিতে পারিলে আমাদের পথভ্রষ্ট হইবার সম্ভাবনা থাকিবে না।

গীতা বলেন—ঈশ্বর বা পরমেশ্বর বা শ্রীভগবান্ সর্বভূতে অবস্থিত; তিনি এই বহুধাবিভক্ত, বিচিত্র ও বিরোধশীল বিশ্বের পরম ঐক্য। সেই পরম ঐক্যের অনুভবাত্মক জ্ঞান লাভ করাই অধ্যাত্মধর্মের লক্ষ্য। পরমাত্মা পরমেশ্বরের সহিত মানবাত্মার এই যোগ, অসীমের সহিত সসীমের এই সম্বন্ধস্থাপন, ইহাই গীতার সার কথা।

এই ঈশ্বর কি ও কোথায়? যাহা কিছু আছে ঈশ্বর তাহাদের প্রত্যেকের প্রাণ বা জীবনের জীবন। মানুষের মন বা চেতনা কখনই বা কিছুতেই পরমেশ্বরের মন বা চেতনা হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে পারে না, পরমেশ্বর হইতে একেবারে বিচ্ছিন্ন হওয়া অসম্ভব। যাহা কিছু আছে ঈশ্বরেই আছে। বিশ্ব প্রাণময়। সর্বব্যাপী মহাপ্রাণের প্রকাশ বা অংশ নহে এমন প্রাণ বা সত্তা একেবারে অসম্ভব। যত প্রাণ সব তাঁহার, যত জ্ঞান সব তাঁহার, যত শক্তি সবই তাঁহার, যত প্রেম সবই তাঁহার—তিনি শ্রীভগবান্।

গীতার নিম্নলিখিত শ্লোকগুলিতেই ইহা পরিস্ফুট—

সর্বভূতস্থমাত্মানং সর্বভূতানি চাত্মনি।
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্বত্র সমদর্শনঃ॥
যো মাং পশ্যতি সর্বত্র সর্বঞ্চ ময়ি পশ্যতি।
তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি॥
সর্বভূতস্থিতং যো মাং ভজত্যেকত্বমাস্থিতঃ।
সর্বথা বর্তমানোঽপি স যোগী ময়ি বর্ততে॥

গীতা, ৬।২৯-৩১

প্রত্যেক মানবের একটি অবস্থা আছে যাহা 'যোগযুক্ত' অবস্থা। এখন মানুষ সেই অবস্থা হইতে ভ্রষ্ট, চ্যুত বা নির্বাসিত হইয়াছে। ইহাই স্বরূপবিস্মৃতি। সেই অবস্থা হইতে ভ্রষ্ট হইলেও মানুষের জ্ঞানে বা চেতনায় সেই অবস্থার একটা ক্ষীণ স্মৃতি রহিয়াছে। সৎশাস্ত্র সাধু ও ভক্তের উপদেশে সেই স্মৃতি উজ্জীবিত হয় এবং মানুষ সেই যোগযুক্ত অবস্থা লাভ করিবার জন্য চেষ্টা করে। চৈতন্য-চরিতামৃতের ভাষায়—

ভ্রমিতে ভ্রমিতে যদি সাধু বৈদ্য পায়।
সেই জন নিস্তারে, মায়া তাহারে ছাড়য়॥

মানুষের এই চেষ্টা স্বাভাবিক, তাহার ইন্দ্রিয়ের, প্রাণের, মনের ও হৃদয়ের ধর্ম। এই চেষ্টা যখন

সুনিয়ন্ত্রিত, সু-উপলব্ধ, সুশৃঙ্খলিত হয় তখনই মানুষের ধর্মজীবন বা অধ্যাত্মসাধনা আরম্ভ হয়।

'যোগযুক্ত' অবস্থাটি কেমন তাহা আমাদিগকে সর্বদা দৃঢ়রূপে চিন্তা করিতে হইবে—সেইজন্যই গীতা বলিতেছেন, "যিনি যোগযুক্তাত্মা তিনি সর্বত্রই সমদর্শন। তিনি আত্মাকে ( নিজেকে এবং পরমেশ্বরকে ) সর্বভূতে দেখেন; আর সমুদায় ভূতকে নিজেতে সুতরাং পরমেশ্বরেতে দেখেন।

"এইরূপ যিনি দেখেন, যিনি আমাকে ( শ্রীকৃষ্ণকে, পরমেশ্বর পরমাত্মাকে ) সর্বত্র এবং সকলকে আমাতে দেখেন, তাঁহা হইতে আমিও কখন দূরে নহি আর তিনিও আমা হইতে কখনও দূরে নহেন। একত্ববুদ্ধি আশ্রয় করিয়া সর্বভূতস্থিত আমাকে যিনি ভজনা করেন সেই যোগী সর্ববিধ ব্যবহার করিয়াও আমাতেই থাকেন।"

আবার সপ্তম অধ্যায়ে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—

আমিই এই জগতের প্রভব ( মূল ) এবং প্রলয় ( অন্ত )। হে ধনঞ্জয়, আমা হইতে পরতর অন্য কিছু নাই, সূত্রে গাঁথা মণিসমূহের ন্যায় সমুদায় আমাতেই গাঁথা আছে। আমিই জলে রসরূপে, চন্দ্রসূর্যে প্রভারূপে, সমুদায় বেদে প্রণবরূপে আছি। মানবসমূহে আমি পৌরুষ, পৃথিবীতে আমি পুণ্যগন্ধ, অগ্নিতে আমি তেজ, সর্বভূতে আমি জীবন, তপস্বিগণে আমি তপস্যা। হে পার্থ, আমি সকল ভূতের সনাতন বীজ, আমি বুদ্ধিমানগণের বুদ্ধি, তেজস্বিগণের তেজ।

আবার নবম অধ্যায়ে বলিতেছেন—আমিই ক্রতু ( শ্রৌত যজ্ঞ ), আমি যজ্ঞ ( স্মার্ত যজ্ঞ ), আমি স্বধা ( শ্রাদ্ধে পিতৃগণকে প্রদত্ত অন্ন ), আমিই ঔষধ ( যজ্ঞের জন্য বনস্পতি হইতে উৎপন্ন অন্ন ), আমি মন্ত্র, আমি ঘৃত, আমি অগ্নি আমিই আহুতি, আমি এই জগতের পিতা মাতা, ধাতা ( আধার ), পিতামহ। যাহা কিছু পবিত্র ও জ্ঞেয় তাহা আমি। আমিই ওঙ্কার, ঋগ্বেদ সামবেদ যজুর্বেদ, আমি সকলের গতি, সকলের পোষক, প্রভু সাক্ষী নিবাস শরণ সখা উৎপত্তি প্রলয় স্থিতি নিধন ও অব্যয় বীজ। আমিই তাপ দিই, আমিই বর্ষণ করি, আমিই অবরোধ করি, আবার আমিই বর্ষণ করি। আমিই অমৃত, আবার আমিই মৃত্যু, আমিই সৎ ও অসৎ।

ভগবান একমাত্র জ্ঞেয়, তাঁহাকে আমরা আমাদের হৃদয়েই দেখিতে পাইব—আমি যদি হৃদয়ে তাঁহাকে দেখিতে না পাই তাহা হইলে বাহিরে কোনও কিছুতে তাঁহাকে কখনই দেখিতে পাইব না। মানুষ ধর্মের নামে বঞ্চিত হইতেছে, তাই তীর্থের তত্ত্ব না বুঝিয়া অকারণে তীর্থে তীর্থে মন্দিরে মন্দিরে ঘুরিয়া মরিতেছে—তাহারা মন্দিরের ও দেবতার তত্ত্ব মোটেই জানে না, পথহারা কেবল আঁধারেই ঘুরিয়া মরিতেছে। প্রত্যেক মানুষ শ্রীভগবানকে দেখিবে ও পাইবে নিজের হৃদয়েই। তাঁহাকে পাইবে ইহাই গীতার বড় আশার বাণী। ইহাই আধ্যাত্মিক স্বাধীনতা—এ বিষয়ে গীতার উপদেশ সুস্পষ্ট—

জ্ঞেয়ং যত্তৎ প্রবক্ষ্যামি যজ্জ্ঞাত্বামৃতমশ্নুতে।
অনাদিমৎ পরং ব্রহ্ম ন সৎ তন্নাসদুচ্যতে॥
সর্বতঃ পাণিপাদন্তৎ সর্বতোঽক্ষিশিরোমুখং।
সর্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি॥

* * *

অবিভক্তঞ্চ ভূতেষু বিভক্তমিব চ স্থিতং।
ভূতভর্তৃ চ তজ্জ্ঞেয়ং গ্রসিষ্ণু প্রভবিষ্ণু চ॥
জ্যোতিষামপি তজ্জ্যোতিস্তমসঃ পরমুচ্যতে।
জ্ঞানং জ্ঞেয়ং জ্ঞানগম্যং হৃদি সর্বস্য বিষ্ঠিতম্॥

১৩।১৩-১৮

"যাঁহাকে জানিলে অমৃত বা মোক্ষলাভ হয় তাহা বলিতেছি। তিনি অনাদি শ্রেষ্ঠব্রহ্ম। তিনি সৎও নহেন অসৎও নহেন। তাঁহার সকলদিকে হস্তপদ,

সকল দিকে চক্ষু, মস্তক ও মুখ, সকল দিকে কর্ণ। তিনিই এই লোকসকলকে ব্যাপ্ত করিয়া আছেন—তাঁহাতে সকল ইন্দ্রিয়ের জ্ঞানের আভাস আছে, কিন্তু তাঁহার কোনও ইন্দ্রিয় নাই।

তিনি স্বরূপে অবিভক্ত হইলেও ভিন্ন ভিন্ন ভূতে ভিন্ন ভিন্ন রূপে বিভক্ত হইয়া রহিয়াছেন। তিনিই তেজের তেজ এবং অন্ধকারের অতীত বলিয়া কথিত। তিনিই জ্ঞান, তিনিই জ্ঞেয় ও জ্ঞানগম্য। **সকলের হৃদয়ে তিনিই অধিষ্ঠিত।** হৃদয়ে তাঁহার অধিষ্ঠান—ইহাই সারকথা।

*   *   *

মানুষ ধর্মানুশীলন করিতেছে, ঈশ্বরলাভের জন্য নানারূপ চেষ্টা করিতেছে—খুবই ভাল কথা, কিন্তু অনেক স্থানেই একটা প্রকাণ্ড ভুল রহিয়া গিয়াছে—মানুষকে ভগবান্ হইতে তফাৎ করিয়া বা ভগবান্‌কে মানুষ হইতে তফাৎ করিয়া সরাইয়া দেখাই এই মূল ভুল। মানুষ ভাবিতেছে, ভগবান কোন একটা জায়গায় আছেন, তবে এখানে নহে, হয়ত বা তিনি সব জায়গায় বা যে-কোন জায়গায় আছেন; কেবল মানুষেই নাই! সেইজন্য জগতে এত অধিকার-ভেদ, স্পৃশ্যাস্পৃশ্য-বিচার, এত ছোট বড় ভেদ। সত্য কি? আছে শুধু এক জীবন, সেই জীবনে সবাই আছে বাঁচিয়া। আমাদের প্রত্যেকের ভিতরে যে জীবন প্রবাহিত হইতেছে তাহা সেই অসীম জীবন-সিন্ধুরই প্রবাহ, সব সময়ে সেই স্থান হইতে আসিয়াছে ও আসিতেছে। ভগবান্ আমাদের প্রাণের প্রাণ, মনের মন, চক্ষুর চক্ষু, কর্ণের কর্ণ। আমাদের প্রত্যেকের সত্তা ও জীবন সেই ঈশ্বরের অসীম জীবনেরই ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশ-মাত্র।

একং রূপং বহুধা যঃ করোতি।

আমার এই স্বতন্ত্র জীবন মোটেই স্বতন্ত্র নহে, ঐশ জীবন হইতে আমার জীবন ভিন্নবৎ প্রকাশিত হইলেও ভিন্ন নহে। আমার জীবন ঐ ঐশ জীবনেরই অন্তর্গত। ঈশ্বরের জীবন মানুষের জীবনে স্বভাবতঃ ও সর্বদা প্রবাহিত হইতেছে ও ক্রীড়া করিতেছে। মানুষের অদ্ভুত শক্তি আছে, অদ্ভুত অধিকার আছে, মানুষ চেষ্টা করিলে নিজের প্রাণের ও অনুভবের এমন প্রবুদ্ধ ও উদ্দীপিত অবস্থা আনিতে পারে, যে সময়ে বা যে অবস্থায় আরও বেশী করিয়া ঐশ জীবন প্রচুরতর পরিমাণে তাহার নিজের ভিতর সংক্রমিত ও প্রবাহিত হইতে পারে। সেই সময়ে অনেক মানুষ ঈশ্বরের সাধর্ম্য লাভ করে, ইহাই যোগস্থ অবস্থা বা ব্রাহ্মী স্থিতি—এই অবস্থায় মানুষ মহামানব হইয়া যায়, তখন তাঁহাকে অবতার বা শক্ত্যাবেশ-অবতারও বলা যায়। প্রত্যেক নরনারীর এই পরমসৌভাগ্য-লাভের সম্ভাবনা আছে বলিয়াই সৃষ্টিতে মানবের স্থান এত উচ্চে। তাই ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ সুস্পষ্ট এবং জীবিত মূর্তি এই মানবতা। এই ঈশ্বর নর-লীলার ঈশ্বর—মানবের অখণ্ডতা অনুভব করিতে হইবে, এই অখণ্ড মানবতায় বা নরলীলায় সেই নিত্যজ্যোতিঃ দর্শন করিতে হইবে। তাই চৈতন্য-চরিতামৃতকার বলিলেন:

"কৃষ্ণের যতেক লীলা   সর্বোত্তম নরলীলা
নরবপু যাহার স্বরূপ।"

*   *   *

---

# সন্ন্যাসী

শ্রীনচিকেতা

সন্ন্যাসী তুমি বিশ্ব-বিজয়ী বীর—
সুখের জোয়ারে মন মাতে না তো দুঃখ-বিপদে ধীর।
শক্তি তোমার ইষ্টমন্ত্র সুন্দর তব জীবনতন্ত্র
সত্যের তরে তুমি নির্ভীক পেতে দাও সদা শির।
সন্ন্যাসী তুমি সর্বহারার মুছাও নয়ননীর।

নিজের মুক্তি তোমার কামনা নহে—
আর্ত নরের অশ্রুসলিল হৃদয়ে সতত বহে।
অসহায় হীন, লাঞ্ছিত যারা দুঃখ ব্যথায় মূক ভাষাহারা
তাহাদের ভার, তাহাদের সেবা লয়েছ যতনে বরি
বন্ধন তব মুক্তির দ্বার, বিশ্বে আপন করি।

হে মহা-পথিক, রক্ত-গেরুয়াধারী—
গৃহ তব নাই তবু আছে ঠাঁই অখিল পৃথিবী জুড়ি।
ঊর্ধ্বে তুলিয়া রক্ত-নিশান ফুকারিয়া চল যুদ্ধবিষাণ
দুর্জয় তুমি গেয়ে যাও গান, মৃত্যুর কানে কানে,
কুশ্রী যা কিছু অশিব মিথ্যা ধিক্কারো তার পানে।

সন্ন্যাসী তুমি প্রেমের বাঁধনে বাঁধা—
মনপ্রাণ তব পৃথিবীর প্রাণে একই সুরে আছে গাঁথা।
দূর স্বর্গের কোন ভগবান—তুমি কর না তো পূজা আর ধ্যান
তব সুন্দর মর্ত্য দেউলে মানুষের প্রাণে মনে
দেবতারে তুমি তাই ত খোঁজ না ঘর ছেড়ে দূর বনে।

---

# শ্রীশ্রীমায়ের কথা

## শ্রীমতী ক্ষীরোদবালা রায়

আমি মফস্বল হইতে কলিকাতায় আসিয়া যেদিন প্রথম শ্রীশ্রীমাকে দর্শন করিতে যাই সেদিন আমার শরীর অসুস্থ ছিল। গাড়ী করিয়া বাগবাজার গিয়াছিলাম। যাওয়ার পথেই আমার অত্যন্ত মাথা ঘুরিতে লাগিল; মনে হইল যেন বমি করিয়া ফেলিব। কোনরূপে বাগবাজার মায়ের বাড়ীতে ঢুকিয়াই সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিতে সিঁড়ির পাশে একটি লম্বা ঘরের দরজায় তাঁহাকে পাইলাম। স্নান করিতে চলিয়াছেন; যেন আমারই অপেক্ষায় দরজায় হাত দিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। আমাকে দেখিয়াই মা একটু হাসিয়া বলিলেন: কোথা থেকে এসেছ বাছা? কেন এসেছ?

বলিলাম, মাকে দর্শন করতে এসেছি। অমনি মা বলিলেন, বাছা, আমিই মা। ঐদিকের ঘরে ঠাকুর আছেন, ঠাকুরকে প্রণাম করে ঐখানে বস, আমি নেয়ে আসি।

এই বলিয়া মা চলিয়া গেলেন। আমি ঠাকুরঘরের দরজায় গিয়া ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া বসিলাম। ঠাকুরের ভোগের জন্য কিছু মিষ্টি লইয়া গিয়াছিলাম, নলিনীদিদি আসিয়া একটু গঙ্গাজলের ছিটা দিয়া আমার হাত হইতে উহা লইয়া রাখিয়া দিলেন। তারই মধ্যে মা খুব তাড়াতাড়ি স্নান করিয়া ফিরিয়া আসিলেন। দেখিলাম, আমি যাওয়ার আগেই ঠাকুরপূজা ও মিষ্টি, ফলের ভোগ হইয়া গিয়াছে। সব সাজানো রহিয়াছে। আমি ভাবিলাম, আমাকে যদি মিষ্টি প্রসাদ খাইতে দেন তাহা হইলে আমার বমি আসিয়া পড়িবে, কারণ তখনও আমার মাথা ঘুরিতেছিল। মা আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ঠাকুরের জন্য কিছু এনেছ?

আমি আমার আনীত মিষ্টি দেখাইয়া বলিলাম: এনেছি, ঐখানে রেখেছেন। মা ঠোঙাসহ ঠাকুরের মুখের কাছে ধরিয়া বলিলেন: ঠাকুর, খাও।

ইহার পর পিতলের একখানা ছোট থালায় কিছু ফল এবং একটু সরবৎ প্রসাদ আমাকে খাইতে দিলেন। বলিলেন, প্রসাদ খাও, বমি হবে না। কমণ্ডলু হইতে একটু গঙ্গাজল আমার মাথায় দিলেন এবং কহিলেন, আমি ঐদিকের ঘরে বসবো, তুমি খেয়ে সেখানে যেও। আশ্চর্যের বিষয় প্রসাদ খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমি সুস্থ হইয়া গেলাম। তাহার পর মাঠাকরুণ যে ঘরে বসিয়াছেন সে ঘরে গেলাম। দেখিলাম, মা আমার রাজরাণীর মত বিশ্বজননীরূপে আসনে উপবিষ্টা; গোলাপ-মা, গৌরী-মা, যোগীন্-মা মাকে ঘেরিয়া বসিয়া আছেন। দেখিয়া আমার মাকে খুব আপন বলিয়াই মনে হইল, কিন্তু অপর যাঁহারা বসিয়া আছেন তাঁহাদিগকে দেখিয়া একটা সঙ্কোচ হইতে লাগিল। আমার প্রাণের আবেদন মাকে জানাইতে পারিব কি না ভাবিতে লাগিলাম। তাঁহাকে বলিলাম, আটবৎসর যাবৎ প্রাণপণ চেষ্টা করেও আপনার দর্শন পাইনি, কলকাতা পর্যন্ত এসেও দর্শন না পেয়ে ঘুরে গিয়েছি। এই বলিতেই গৌরীমা বলিলেন, সময় না

হলে কি মায়ের দর্শন পাওয়া যায়? বলিলাম, এখন বোধ হয় সময় হয়েছে মা, এখন আপনাকে পেয়েছি। আমাকে গ্রহণ করুন। আমি আপনার কাছে দীক্ষা নেওয়ার সঙ্কল্প করে এসেছি। শুনেছি সময় না হলে দীক্ষাও হয় না। আবার কাউকে কাউকে নাকি আপনি এখানকার লোক নয় বলে বিদায়ও দিয়ে থাকেন। কিন্তু আমার বেলায় তা হলে আমি আর বাঁচব না।

মাঠাকরুণ আমার দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন: না, তোমার দীক্ষা হয়ে যাবে। জিজ্ঞাসা করিলেন: বাছা, তুমি একাদশীতে কি খাও? বলিলাম: আগে সাগুই খেতাম, এতে নানারকম ভেজালের কথা জেনে এখন আর খাই না। শুনিয়াই মা বলিলেন: না না, আমি বলছি তুমি সাগু খেও, এতে শরীর ঠাণ্ডা থাকে। তাহার পর অতি দুঃখের সহিত বলিতে লাগিলেন: বাছা, অনেক কঠোর করেছ। আমি বলছি, আর কোরো না। দেহটাকে একেবারে কাঠ করে ফেলেছ। দেহ নষ্ট হলে কি নিয়ে ভজন করবে মা? তেল মাখি কি না জিজ্ঞাসা করিলেন। বলিলাম, আমি বিধবা হয়ে আর তেল মাখি নি। শুনিয়া বলিলেন, তেল মাখলে মাথা ঠাণ্ডা থাকে, তেলটি মেখো। আমি বলিলাম, বহু দিনের অনভ্যাসে তেল যেন ছুঁতেই ঘৃণা বোধ করি, তেল মাখতে পারব না মা। গোলাপ-মা বলিলেন, নিতান্তই ছেলেমানুষ, কঠোর করে করে না খেয়ে দেহটাকে শেষ করে ফেলেছে। গৌরী মা বলিলেন, তুমি মাথার চুল কেটে ফেলে দিয়েছ কেন বাছা? বলিলাম, আমাদের দেশের বিধবাদের চুল রাখে না। তিনি বলিলেন, চুল না থাকলে চোখের জ্যোতি নষ্ট হয়ে যায়। শ্রীকৃষ্ণে অর্পিত দেহ, চুলটি বুঝি শুধু তোমার? তখন যোগীন্-মা বলিলেন, এই দেহটি ভগবানের মন্দির। একে সুন্দর করে রাখাই ভাল। মাঠাকরুণ বলিলেন, বেশ তো করেছে, চুল থাকলে একটু বিলাসিতার ভাব আসে, চুলের যত্ন করতে হয়। যাই হোক মা, কেশের সেতু পার হয়ে তুমি এখানে এসে পৌঁছেচ। যার জন্যে এত কঠোরতা, তোমার সে কাজ হয়ে গেছে। এখন আমি বলছি, আর কঠোরতা কোরো না। আরও বলিলেন, কালকে তোমার দীক্ষা হয়ে যাবে। কালকে আটটার সময় এখানে এসে পৌঁছবে। দীক্ষা নেওয়ার দিন একটু গঙ্গাস্নান ও মা-কালীকে দর্শন করলে ভাল হয়। মনে মনে ভাবিলাম তোমাকে দর্শন করিয়াই আমার কালীদর্শন হইয়া গিয়াছে, তোমার পাদপদ্ম স্পর্শ করিয়া পবিত্র হইয়া গিয়াছি। তৎপর মাকে প্রণাম করিয়া বাসায় চলিয়া আসিলাম।

আমার দেবর ৺সতীশচন্দ্র রায় মায়ের আশ্রিত ছিল। তাহাকে নিয়াই মায়ের কাছে গিয়াছিলাম। বাসায় আসিয়া পরদিন মায়ের বাড়ীতে লইয়া যাইবার জন্য বলিয়া দিলাম। বাগবাজার হইতে বাসায় আসিবার পর হইতে আবার আমার মাথা ঘুরিতে লাগিল। যাহা হউক পরদিন আমি সেখানে যাইবার জন্য তৈরী হইলাম, কিন্তু মা-ঠাকুরুণ যে সময় যাওয়ার কথা বলিয়াছিলেন সেই সময় পার হইয়া গেল, সতীশ আমাকে লইতে আসিল না। ইহাতে আমি অত্যন্ত হতাশ হইয়া বসিয়া পড়িলাম। বেলা বারটায় সতীশ আসিয়া আমাকে বলিল, কাল রাত্রিতে মা-ঠাকুরুণ তাহাকে খবর দিয়াছেন, কাল বৌমার দীক্ষা হবে না, বৌমার শরীর অসুস্থ, পরশু দিন বেলা দশটার পূর্বে বৌমাকে নিয়ে তুমি এসো; সেইজন্য আমি দেরী করিয়া আসিয়াছি। পরদিন সকালে

আমিও বেশ সুস্থ আছি। সেও ঠিক সময়ে আমাকে লইয়া যাইবার জন্ত আসিয়া উপস্থিত হইল। মায়ের আদেশ-অনুসারে কিছু ফল-মিষ্টি, কিছু ফুল-বেলপাতা এবং একখানা সরু লালপেড়ে কাপড় লইয়া উপস্থিত হইলাম। মাকে যাহা দেখিলাম এমনটি আর কখনও দেখি নাই। হলদে রং-এর একখানা কাপড় পরিয়া মা আমার ইষ্টরূপে দরজায় দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। আমাকে দেখিয়াই বলিলেন, পাঁচ মিনিট দেরী হয়ে গিয়েছে, শীগ্‌গির এসো ঠাকুরঘরে। ঠাকুরের সামনে তিনি নিজেই একখানা আসন পাতিয়া দিলেন এবং সেই আসনখানা হাত দিয়া ঘসিয়া মাজিয়া দিলেন। ভাবিলাম এই আসনে কি করিয়া বসিব। সঙ্গে সঙ্গে মা-ঠাকুরুণ তাঁহার দক্ষিণ পা দ্বারা আসনখানা ঠেলিয়া দিয়া বলিলেন—হয়েছে তো? বাবা! মেয়েটি কম নয়! আমি যাওয়ার সময় গাড়োয়ানকে দেওয়ার জন্তে দুটি টাকা আঁচলে বাঁধিয়া লইয়া গিয়াছিলাম, কিন্তু সে সময় আমার সে টাকার কথা মনেও নাই। আমি আসনে বসিতে যাইব তখন মা বলিলেন: বাছা, তুমি কামিনী-কাঞ্চন-ত্যাগী ঠাকুরের আশ্রিত হতে এসেছো, তোমার আঁচলে দুটো টাকা বাঁধা রয়েছে। ওটা খুলে রেখে এসো। অমনি টাকা দুটি খুলিয়া দেয়ালের কাছে রাখিয়া দিলাম এবং আসনে বসিলাম। * * * আমি সেদিন মাকে যাহা দেখিয়াছিলাম ভাবিলাম সেই মা তো এই মা নন, এই ভাবিয়াই আমি সংজ্ঞা হারাইয়া ফেলিলাম। সঙ্গে সঙ্গেই মা-ঠাকুরুণ আমাকে হাত ধরিয়া আসনে বসাইলেন এবং আমার মাথায় হাত দিয়া অতি মধুর কণ্ঠে মাভৈঃ এই আশ্বাসবাণী তিন বার উচ্চারণ করিলেন ও বলিলেন: ভয় নেই, এই তোমার জন্মান্তর হয়ে গেলো। জন্মান্তরে যত কিছু করেছিলে, সব আমি নিয়ে নিলুম। এখন তুমি পবিত্র, কোন পাপ নেই। সঙ্গে সঙ্গে আমারও স্বাভাবিক অবস্থা হইল; মা আমাকে দীক্ষাদান করিলেন। * * * আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, জপ-বিসর্জনের কি মন্ত্র আছে? মা বলিলেন: বিসর্জন বলতে নেই, সমর্পণ বলতে হয়। একটু মিষ্টিপ্রসাদ আমার হাতে দিয়া বলিলেন, দীক্ষা নিয়ে গুরুর কাছে বেশী সময় থাকতে নেই। আজকে চলে যাও, কালকে এসে এখানে প্রসাদ পাবে। আমি মাকে প্রণাম করিয়া চলিয়া আসিলাম এবং পরদিন দুপুর বেলা গিয়া প্রসাদ পাইলাম। খাওয়া-দাওয়ার পর মার কাছে গিয়া বসিলাম। মা আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, লেখা-পড়া জান তো? সর্বদাই গীতাখানা একটু একটু পাঠ করো, ঠাকুরের কথামৃত আর রামকৃষ্ণ-পুঁথিখানা পড়ো, আরও ঠাকুরের কত বই বের হয়েছে, ঐসব পড়বে। এসব পড়লে সব জানতে পারবে।

আমি বলিলাম: মা, সংসারে আমার মন মোটেই বসে না, আমি কতকষ্টে যে সংসারীর মধ্যে বাস করি তা তুমি অবশ্যই জান। আমার এই প্রার্থনা, আমাকে সংসারীর মধ্যে রেখো না। মা বলিলেন, তোমাদের আবার সংসার কি মা? তোমাদের সংসারও যা গাছতলাও তা। সংসার কি তিনি ছাড়া? তিনি সবখানেই আছেন। বিশেষ, মেয়েমানুষ কোথায় যাবে মা? তিনি যেখানে যেভাবে রাখেন সেইখানেই সন্তুষ্ট থেকো। উদ্দেশ্য তাঁকে ডাকা ও তাঁকে পাওয়া। তাঁকে ডাকলে তিনি তোমার হাত ধরে চালিয়ে নেবেন, তাঁতে নির্ভর করতে পারলে আর তোমার কোন ভয় নেই। আর একটি কথা—গুরু-শিষ্যে একত্র বসবাস করা ভাল না; কারণ, একত্র থাকলে গুরুর কার্যকলাপ দেখে অনেক সময়ই গুরুকে মানুষ বলে মনে হয় এবং তাতে শিষ্যের ক্ষতি হয়। নিকটে অন্ত কোথাও

থেকে যদি রোজই কিছু সময় গুরুদর্শন, তাঁর সঙ্গ, উপদেশ পাওয়া যায় তবেই খুব ভাল; কিন্তু সর্বদাই একটু দেখা-সাক্ষাৎ না থাকলে গুরুরও শিষ্যের কথা সব সময় স্মরণে আসে না। রোজই এখানে এসো।

আমার অবশিষ্ট জীবনের অবস্থাটা যে কি আসিবে ইহা মায়ের কথায় বেশ বুঝিলাম। *আমার জন্য যে বন নয়, সংসার রহিয়াছে* ইহা ভাবিয়া খুব কাঁদিলাম। আমার কান্না দেখিয়া মা খুব ব্যস্ত হইয়া আমাকে বুঝাইতে লাগিলেন। বলিলেন, আমিও তো মা সংসারেই চিরদিন কাটালাম, তুমি নিতান্ত ছেলেমানুষ, ধর্মের জন্যে হেথা সেথা যাওয়া আরও বিপদ। আমি বলছি যেখানে যে অবস্থায় যে ভাবে থাক, বাইরের আবিলতা তোমার ক্ষতি করতে পারবে না। ঠাকুর আছেন, তোমার কোন ভয় নেই, ভাবনা নেই। ইহার পরেই আমি প্রণাম করিয়া চলিয়া আসিলাম।

সেইদিন হইতে প্রায় প্রত্যহই বেশীর ভাগ বিকাল বেলার দিকে মায়ের কাছে যাইতাম এবং সন্ধ্যার পূর্বে চলিয়া আসিতাম। সাধন-ভজন যতটুকু দরকার বলিয়া দিয়াছেন এবং মনে কোন খটকা বা প্রশ্ন জাগিলে তাঁহার কাছে জিজ্ঞাসা করিয়া ইহার মীমাংসা করিয়া লইতেও বলিয়া দিয়াছেন, কিন্তু মাকে দেখিয়াই একেবারে ভরপুর হইয়া যাইতাম। মনে হইত সবই হইয়াছে, সবই পাইয়াছি, আর কিছু পাওয়ার বাকী নাই। মা আমার বিশ্বজননী, রাজরাজেশ্বরী, ইষ্টদেবী গুরুরূপে আমার সামনে দণ্ডায়মানা! আমার পাইবার আর কি থাকিতে পারে? ইহা ভাবিয়া অফুরন্ত আনন্দ হইত। আমি মাকে মোটেই প্রশ্ন করিতাম না। মা নিজ হইতে যাহা বলিতেন তাহা শুনিয়াই পরিতৃপ্ত! একদিন তাঁহাকে বলিয়াছিলাম: মা, তুমি অন্তর্যামিনী, তুমি সবই জান; তথাপি জোরের সহিত বলছি, আমি সংসারীর যে সংসার তা অত্যন্ত ঘৃণা করি এবং ভয় করি। আমার সংসার বাড়ী ঘর টাকা পয়সা কিছুই নেই। আমি এসব জিনিষ তোমার কাছে জীবনেও একদিন চাইব না। আমার প্রাণ যা চায় সেটা তুমি জান, সেটা আমাকে দিও এবং সংসারীর কাছ থেকে আমাকে দূরে রেখো। এই বলিয়া অনেক কাঁদিলাম। এসব কথার উত্তর খুব ছোট কথায় নিতান্ত ছেলেমানুষকে মা যেমন সান্ত্বনা দেন, মাতাঠাকুরাণী আমাকে সেই ভাবে দিলেন। আমিও দুঃখ ভুলিয়া আনন্দে ভাসিতে লাগিলাম। মা সময়ে সময়ে বলিতেন, তোমাদের ঠাকুর বলতেন: মায়াসমুদ্রে ঝাঁপ দিওনি, হাঙ্গর-কুমীর খেয়ে ফেলবে। তবে তোমাদের ভয় কি? তোমাদের ঠাকুর আছেন।

শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী অত্যন্ত পর্দানশিন ছিলেন। আমাদিগকেও তিনি সেই ভাবে রাখিয়াছেন। আমরা মেয়েভক্তই দেখিয়াছি, মঠের কোন সাধু-সন্ন্যাসীকে বড় বেশী দেখি নাই। আমরা শুধু মাকে দেখিয়াই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড দেখা হইয়াছে বলিয়া ধারণা করিয়া নিয়াছি। এখন ভাবি, এই রকম মন ছিল বলিয়াই মা-ঠাকরুণ আমাদিগকে গ্রহণ করিয়াছিলেন। মা শুধু বলিতেন, সকল অবস্থায় সন্তুষ্ট থেকে তাঁর নাম কর।

একদিন সুধীরাদি নিবেদিতা ইস্কুলের কয়েকটি মেয়েকে নিয়া মার ওখানে আসিয়াছেন। একটি মেয়ে মাকে বলিল: মা, ক্ষীরোদ দিদিকে আমাদের ওখানে থাকতে দেন না কেন? সে মেয়েও পড়াবে, সেখানে থাকতেও পারবে। আমি কিন্তু ভুলিয়াও তাহাদের কাছে আমার থাকা খাওয়ার কথা আলোচনা করি নাই। তাই একটু অসন্তুষ্ট হইয়াই ভাবিলাম, কেন এসব বলে? মা-ঠাকরুণ বলিলেন, সকলেই সংসারে এক কাজের

জন্ম আসে না। তোমরা মেয়ে পড়াবে ও পড়বে এই তোমাদের কাজ। সে এসব করতে আসে নি। যা করতে এসেছে তা করবে। সে কেন মেয়ে পড়াতে যাবে? পড়াশুনা ভাল কাজ বটে, কিন্তু সকলের জন্ম নয়। মেয়েরা চলিয়া যাইবার পর বলিলেন, মেয়েপড়ানো কি কম কথা? সুধীরার এই করে করে মাথারই দোষ হয়ে গেছে।

আমি মাঝে একবার দেশে আসিয়া পুনরায় কলিকাতা ফিরিবার সময় রাধারাণীর জন্ম একজোড়া শাঁখা নিয়াছিলাম। বাগবাজারে গিয়া রাধিকে শাঁখা পরাইতে গিয়া দেখি শাঁখা খুবই ছোট হইয়া গিয়াছে, মোটেই হাতে উঠে না। উহাতে রাধি একেবারে কাঁদিয়া ফেলিল। আমারও চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল। ভাবিলাম, এত সাধ করিয়া লইয়া আসিলাম, রাধি হাতে দিতে পারিল না। নলিনী দিদি, সরলাদি, রাধি ও আমি চুপি চুপি এই কথাই আলোচনা করিতেছি, এমন সময় মা ঠাকুরঘর হইতে রাধিকে ডাকিয়া বলিলেন: তোমরা সকলে এখানে এসো। আমরা যাওয়ার পর বলিলেন, কি হয়েছে? রাধি তখন কাঁদিয়া বলিল, দিদিমণি আমার জন্ম এমন সুন্দর শাঁখা নিয়ে এয়েচেন, সেই শাঁখা আমার হাতে উঠচে না—ছোট হয়েছে। অমনি মা বলিলেন, তোদের যা কথা! বৌমা শাঁখা এনেচে, সে শাঁখাও লাগবে না? শাঁখা নিয়ে আমার কাছেই আগে আসতে হয়। আয় তো দেখি, কেমন শাঁখা লাগে না। এই বলিয়া পাঁচ মিনিটেই মা রাধির হাতে শাঁখা পরাইয়া দিলেন। আমরা সকলে দেখিয়াই আশ্চর্য হইয়া গেলাম; রাধি চোখের জল নিয়াই হাসিয়া ফেলিল। মা বলিলেন, সুন্দর শাঁখা পরেছ, ঠাকুরকে প্রণাম কর, আমাকে প্রণাম কর ও বৌমাকে প্রণাম কর। তিনি ঐ কথা বলিতেই আমার বুক দুরুদুরু করিতে লাগিল, ভাবিতে লাগিলাম, আমার বাড়ীঘর কোথায়, আমি কোন জাতের মেয়ে এবং আমার কে কে আছেন সে সব কথা মা একদিনও জিজ্ঞাসা করেন নাই। মাকে বলিলাম: মা, আমি যে কায়েতের মেয়ে, আমাকে সে কেন প্রণাম করবে? মা জিভে কামড় দিয়া বলিলেন: ওসব বলতে নেই, তুমি কায়েত কি ব্রাহ্মণ আমি জানি না? তুমি এতদিন ধরে এখানে আছ, এখনও তুমি কায়েতই রইলে? এই কথা বলিয়া রাধিকে বলিলেন—যা, তোর দিদিমণিকে প্রণাম কর। অমনি রাধি ঠাকুর ও মাকে প্রণাম করিয়া আমাকে প্রণাম করিল। আমিও রাধিকে প্রণাম করিলাম। মা খুব হাসিতে লাগিলেন। বলিলেন, প্রণামটা ফিরিয়ে দিলে? আমি কিন্তু ব্যাপারটা বুঝিতে না পারিয়া অবাক হইয়া গেলাম।

একদিন রাধি, নলিনদি প্রভৃতি সকলে আমাকে ব্যস্ত হইয়া ধরিয়াছে—আমার বাড়ী কোথায়, আমি কোন জাতের মেয়ে, আমার কে কে আছে এই সব বলিতে হইবে। কিন্তু আমি কিছুই বলিতে রাজী নহি। সেইদিনও মা ডাকিয়া বলিলেন, তোমরা বৌমাকে কি নিয়ে এত জ্বালাতন করছো? আমার এখানে এসো, আমি সব কথা বলে দেব। সকলে ছুটিয়া আসিল, আমিও সঙ্গে সঙ্গে আসিলাম। ভাবিলাম, মা ওসব কথা একদিনও আমাকে জিজ্ঞাসা করেন নাই; আজ কি বলেন আমি শুনিব। ওরা সকলে বলিতে লাগল, ক্ষীরোদ দিদি এতদিন এখানে আছে, কিন্তু তার বাড়ী কোথায়, সে কোন জাতের মেয়ে, তার কে কে আছে ওসব কিছুই আমাদের বলে না। আজকে আমরা এত করে বল্‌চি, তবুও বলচে না। মা-ঠাকরুণ বলিলেন: আমি সব বলতে পারব, তার জন্মস্থান কমলানেবুর দেশে, শ্বশুরবাড়ী অন্য জেলায়, সে চন্দ্রকান্তের অতি নিকটের লোক; তার কেউ নেই,

মাও নেই, ভাই আছে। এই বলিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ঠিক হয়েচে তো বৌমা? মায়ের কথার সঙ্গে সঙ্গেই আমার জোরে একটা দীর্ঘশ্বাস আসিয়া পড়িল। অন্তর্যামিনী বুঝিলেন, আমার মায়ের কথা বলিতেই আমি দুঃখের সহিত শ্বাস ফেলিয়াছি। অমনি বলিলেন, আহা, তোমার মায়ের কথা বলতেই তোমার দুঃখ হয়েচে, না বৌমা? তোমার গর্ভধারিণী যদি বেঁচেও থাকতেন তবু কি করতে পারতেন? শুধু চেয়ে চেয়ে তোমার দুঃখই দেখতেন। আমার মত মা পেয়েও কি তোমার মায়ের দুঃখ রইল? * * * একথা শুনিয়া আমি আনন্দে কাঁদিতে লাগিলাম। নলিনদিদি প্রভৃতিকে বলিলেন, আর কি জানতে চাও? তাহারা বলিল, ও কোন জাতের মেয়ে? মা বলিলেন, ওসব আমি বলব না—ওরা ভক্ত, এক জাত। আমি মায়ের কথা শুনিয়া আনন্দে অধীর হইয়া গেলাম, মুখে কিছু বলিতে পারিলাম না।

---

# দীপ জ্বালো

প্রণব ঘোষ

দীপ জ্বালো,
প্রার্থনার দীপ জ্বেলে রাখো।
মহামৌন-পারাবার—নিঃসঙ্গ নীলিমা,
ধ্যানমগ্ন ধ্রুবশিখা একা জেগে থাক্,
মুখরিত পৃথিবীর দিগন্তের সীমা,
বাণীহীন স্তব্ধতায় রহুক নির্বাক্।

দীপ জ্বালো,
প্রার্থনার দীপ জ্বেলে রাখো।
বিফল বেদনা-ভরে সাধনা তোমার
কঠোর নিরাশা বহি মৃত্যু আনে যদি,
যদি আনে অন্তহীন কৃষ্ণ অন্ধকার,
তারো মাঝে অন্তর্যামী জাগে নিরবধি।

দীপ জ্বালো,
প্রার্থনার দীপ জ্বেলে রাখো।
জীবনের দুঃখে-সুখে অজস্র সজ্ঘাত,
স্বপ্নে-জাগরণে যদি ঘিরে রাখে প্রাণ,
প্রতীক্ষা ভেঙো না তবু, আবার প্রভাত,
আশীর্বাদী এনে দেবে আলোকের গান।

দীপ জ্বালো,
প্রার্থনার দীপ জ্বেলে রাখো।
হে চিন্ময়, অনির্বাণ, হে চির-জাগ্রত,
এ তমসা সত্য নয়, সত্য শুধু তুমি,
আপনারে চিনে নেবে এই তব ব্রত,
মুছে যাবে অন্ধকার আলোকেরে চুমি।
ছড়াও ভুবন ভরে বিশ্বাসের আলো,
দীপ জ্বালো, প্রার্থনার পুণ্যদীপ জ্বালো।

---

# নিম্বার্ক-সম্প্রদায় ও বেদান্তদর্শন

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

সম্প্রদায়শব্দের অর্থ—বহু-পরম্পরা বা ধারা। স্থূলদৃষ্টিতে ভারতে ধর্ম-সম্প্রদায়গুলিকে ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া মনে হইলেও মূলতঃ তাহারা এক। যেমন একই নদী বহু শাখা বিস্তার করিয়া বিভিন্ন ধারায় প্রবাহিত, তেমনি এক ভগবৎ-শক্তিই বিভিন্ন ধারায় প্রবাহিত।

গুরুশক্তি আর ভগবৎশক্তি অভিন্ন—একই বস্তু। যে-শক্তি শ্রীভগবানের সহিত সংযোগ-সাধন করে, তাহারই নাম গুরুশক্তি। এই গুরুশক্তি পরম্পরাক্রমে জীবের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হয়। পিতা হইতে পুত্র, আবার পুত্র যেমন পিতৃত্ব লাভ করে—অর্থাৎ এক যেমন অন্যের নিকট হইতে সৃষ্টিশক্তি লাভ করিয়া জগদ্বিস্তার করে, তেমনি গুরুশক্তি পরম্পরাক্রমে শিষ্যপ্রশিষ্য-অবলম্বনে অনাদি-কাল হইতে জীবের পরম-পুরুষার্থ মুক্তি-সাধনের জন্য প্রবাহিত হইয়া থাকে।

প্রত্যেক সম্প্রদায়ের আচার্যগণ তাঁহাদের শিষ্য-প্রশিষ্যদিগের আত্মজ্ঞান-শিক্ষা দিবার জন্য ব্রহ্মসূত্র বা বেদান্তদর্শনের ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন। বেদের উপনিষদ্ভাগের সার সঙ্কলন করিয়া ভগবান বেদব্যাস সূত্রাকারে যে গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, তাহারই নাম ব্রহ্মসূত্র। এই ব্রহ্মসূত্রের অন্যান্য নাম—বেদান্তদর্শন, উত্তরমীমাংসা বা শারীরক মীমাংসা। ষড়্-দর্শনের অন্যতম বেদান্তদর্শন অমৃতলাভার্থী মানবের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় বলিয়াই ইহার পঠন-পাঠন অত্যাবশ্যক।

বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের চারিটি ধারার একটির নাম নিম্বার্ক-সম্প্রদায়। এই নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের আদি গুরু হংস ভগবান্। হংস ভগবান্ হইতে ব্রহ্মার মানসপুত্র-চতুষ্টয়—সনক, সনৎকুমার, সনন্দ ও সনাতন ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করেন। 'ছান্দোগ্য'-উপনিষদের ভূমাবিদ্যা-প্রকরণে সপ্তম অধ্যায়ের প্রথমখণ্ডে দেখা যায় যে, ব্রহ্মবিদ্যা-লাভের জন্য নারদ ঋষি শ্রুতির উপদেষ্টা এই সনৎকুমারের নিকট উপনীত। তখন সনৎকুমার নারদ ঋষিকে আত্মতত্ত্বের উপদেশ দেন। এই আত্মতত্ত্বই ছান্দোগ্য-উপনিষদে ভূমা-বিদ্যা নামে খ্যাত। নারদ প্রশ্নের পর প্রশ্ন করিতেছেন, আর ঋষি সনৎকুমার পর পর তাহার উত্তর দিয়া যাইতেছেন। নারদের শেষ প্রশ্ন—সুখ কি? তদুত্তরে ঋষি সনৎকুমার যাহা বলিলেন, তাহাই ব্রহ্মবিদ্যার শেষ কথা—যো বৈ ভূমা তৎ সুখং নাল্পে সুখমস্তি ভূমৈব সুখম্ (ছান্দোগ্য, ৭।২৩।১)। আবার নারদের প্রশ্ন হইল—ভূমার লক্ষণ কি? ঋষি সনৎকুমার বলিলেন—যত্র নান্যৎ পশ্যতি নান্যচ্ছৃণোতি নান্যদ্বিজানাতি স ভূমা (ছান্দোগ্য, ৭।২৪।১)—যিনি নিজ হইতে ভিন্ন কিছু দেখেন না, নিজ হইতে ভিন্ন কিছু শুনেন না, নিজ হইতে ভিন্ন কিছু জানেন না; যাহা কিছু দেখেন, শুনেন, বুঝেন, সবই এক অখণ্ড সত্তার উপলব্ধি—তাহাই ভূমা। তারপরই ঋষি সনৎকুমার পুনঃ বলিলেন—অথ যত্রান্যৎ পশ্যতি অন্যচ্ছৃণোতি অন্যদ্বি-

জানাতি তদল্পং যো বৈ ভূমা তদমৃতম্ অথ যদল্পং তন্মর্ত্যম্" যদি কেহ নিজ হইতে ভিন্ন কিছু দেখে, ভিন্ন কিছু শুনে, ভিন্ন কিছু বুঝে, তাহা অল্প। যাহা ভূমা তাহা অমৃত, যাহা অল্প তাহা মর্ত্য ( মরণধর্মশীল )। অনন্তর এই ভূমার অবস্থিতির কথা বলিতে গিয়া ঋষি সনৎকুমার বলিলেন—তিনি নিম্নে, তিনি উর্ধ্বে, তিনিই পশ্চাতে, তিনিই সম্মুখে, তিনিই দক্ষিণে, তিনিই উত্তরে—তিনিই এই সমস্ত। 'অহম্' আমি-ও ভূমা; কারণ আমি ( জীবাত্মা ) ভূমার সহিত অভিন্ন ভাবে যুক্ত। তাই ঋষি সনৎকুমার আবার বলিলেন —"আমিই অধোভাগে, আমিই উর্ধ্বে, আমি পশ্চাতে, আমি দক্ষিণে, আমিই উত্তরে—আমিই এই সমস্ত।" অতঃপর আত্মার সম্বন্ধে বলিতে গিয়া তিনি বলিলেন—"আত্মা নিম্নে, আত্মা উর্ধ্বে, আত্মা পশ্চাতে, আত্মা সম্মুখে, আত্মা দক্ষিণে, আত্মা উত্তরে—আত্মাই এই সমস্ত।" এইরূপ বর্ণনা করিয়া বাক্যশেষে তিনি বলিলেন—"যিনি এইরূপ দেখেন, এইরূপ শুনেন, এইরূপ মনন করেন, বিশেষভাবে জানেন, তিনিই আত্মরতি, আত্মক্রীড়, আত্ম-মিথুন, আত্মানন্দ হইয়া স্বরাট্ হন। এবং-বিধ পুরুষ রোগ-শোক-মৃত্যু দর্শন করেন না, অর্থাৎ জরা-মৃত্যু-ব্যাধি অতিক্রম করিয়া তিনি অমৃতত্ব লাভ করেন—ন পশ্যো মৃত্যুং পশ্যতি ন রোগং নোত দুঃখতাম্। (৭.২৬.২) নারদ এই ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করিয়া শ্রীগুরু-কৃপায় শোক মোহ জরা ও মৃত্যুর অতীত হইয়াছিলেন। শ্রুতিই বলিয়াছেন—তস্মৈ মৃদিত-কষায়ায় তমসস্পারং দর্শয়তি ভগবান্ সনৎকুমারঃ ( ছান্দোগ্য, ৭।২৬.২ )—রাগাদিদোষ-মুক্ত নারদকে ভগবান্ সনৎকুমার অজ্ঞানান্ধকারের পরপার দর্শন করাইলেন। এই নারদেরই শিষ্য শ্রীনিম্বার্কাচার্য। নিম্বার্কাচার্য যে নারদেরই শিষ্য, তাহা তিনি তৎপ্রণীত বেদান্তভাষ্যে নিজেই উল্লেখ করিয়াছেন—যথা, পরমাচার্যৈঃ শ্রীকুমারৈরস্মদ্‌গুরবে শ্রীমন্নারদায়োপদিষ্টঃ—পরমগুরু শ্রীসনৎকুমার ঋষি আমার গুরুদেব শ্রীমন্নারদ ঋষিকে এইরূপ উপদেশ দিয়াছিলেন, ইত্যাদি। শ্রীনিম্বার্কাচার্য স্বীয় গুরুদেবের নিকট হইতে প্রাপ্ত এই ব্রহ্মবিদ্যা 'বেদান্তপারিজাত সৌরভ'-নামক গ্রন্থে বর্ণনা করিয়াছেন। এই গ্রন্থ বেদান্তদর্শন বা ব্রহ্ম-সূত্রের ভাষ্য।

বেদান্তদর্শনের মূল প্রতিপাদ্য ব্রহ্মের স্বরূপ, জীবতত্ত্ব ও জগৎতত্ত্বের নিরূপণ। আবার জীব ও জগতের সহিত ব্রহ্মের কি সম্বন্ধ, তাহাও ইহাতে নির্ণীত হইয়াছে। এই সম্বন্ধনির্ণয় করিতে গিয়া ভাষ্যকার আচার্যগণের কেহ বলিলেন—'নিরবচ্ছিন্ন অদ্বৈত', কেহ বলিলেন —'দ্বৈত', কেহ বলিলেন—"বিশুদ্ধাদ্বৈত,' কেহ বলিলেন—'বিশিষ্টাদ্বৈত', কেহ বলিলেন—'দ্বৈতাদ্বৈত'। এতন্মধ্যে দ্বৈতাদ্বৈত-সিদ্ধান্তই শ্রীনিম্বার্কাচার্য তাঁহার বেদান্তভাষ্যে শ্রুতি-স্মৃতি-প্রমাণসহ যুক্তিতর্কের সাহায্যে বর্ণনা করিয়াছেন। শ্রীনিম্বার্কাচার্য-মতে পরমাত্মা পরব্রহ্ম একই, কিন্তু জীবজগতের সহিত তাঁহার সম্বন্ধনির্ণয় করিতে গেলে শুধু এক বলিলেই কথাটা পরিষ্কার হয় না। তাই তিনি বলিলেন— "এই সম্বন্ধ নির্ণয়ে 'দ্বৈতাদ্বৈত' বা 'ভেদাভেদ' বলিলেই যথার্থ বলা হয়।" তন্মতে পরমাত্মা এক —অদ্বৈত ঠিকই, কিন্তু জীবও নিত্য বলিয়া ( কারণ জীবরূপেও তিনিই এবং ইহাও শ্রুতিসিদ্ধান্ত ) জীবকে তাঁহার অংশই বলিতে হয়। কিন্তু এই অংশ অর্থ অভিন্ন অংশ; অর্থাৎ পরমাত্মা অংশী, জীব তাঁহার অংশ। এই যে অংশাংশি-সম্বন্ধ, তাহাতে জীবের অণুত্ব ও পরমাত্মার বিভুত্ব প্রমাণিত হয়।

অংশ অংশীর সমানব্যাপ্তিধর্মবিশিষ্ট হইতে পারে না। অংশীর সত্তা অংশকে অতিক্রম করিয়াও বিদ্যমান থাকে—অংশেতেই তাঁহার সমগ্র সত্তা পর্যবসিত হইয়া যায় না। এই যে তদতীতরূপে বিদ্যমানতা, ইহাকে এক অর্থে ভেদ বলা যাইতে পারে, যদিও প্রকৃত প্রস্তাবে ভেদ নহে। কিন্তু জীবের অণুত্ব ও ঈশ্বরের বিভুত্বের দিকে লক্ষ্য করিলে এবং তাহা বুঝাইতে গেলে ভাষা-প্রয়োগে ভেদ-শব্দ অবশ্যই প্রয়োজনীয় হইয়া পড়ে; কারণ জীব ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন হইলেও সম্পূর্ণ সমান নহে—ইহা শ্রুতিসিদ্ধান্ত-সম্মত। 'অণু' আর 'বিভু' সমান হইতে পারে না বটে, তবে অভিন্ন হইতে পারে। অভিন্ন অর্থ এস্থলে ভিন্ন নহে—সংযুক্ত। যেমন সূর্যরশ্মি সূর্যের সহিত অভিন্ন, কিন্তু তাই বলিয়া সূর্যরশ্মিই সূর্য নহে। সূর্যের রশ্মি বলিলেই সূর্যেরই অংশ রশ্মিকে বুঝায়; অথচ এই অংশ পৃথক অংশ নহে—অভিন্ন বা সংযুক্ত অংশ। জীব ও ব্রহ্মের অভিন্নত্ব বা একত্ব এই রূপই বুঝিতে হইবে। যেমন হাত দেহের সহিত সংযুক্ত হইলেও দেহ ও হাত সর্বতোভাবে সমান নহে, তেমনি জীব ব্রহ্মের সহিত সংযুক্ত হইলেও ব্রহ্ম ও জীব সর্বতোভাবে সমান নহে।

শ্রুতি, স্মৃতি ও অন্যান্য শাস্ত্র পরমাত্মা ব্রহ্মকে সগুণ ও নির্গুণ দুই-ই বলিয়াছেন; অতএব তিনি দুইরূপই, একরূপ নহেন। এস্থলে নির্গুণ অর্থ গুণহীন নহে—গুণাতীত। অতীতরূপে গুণ অস্তমিত, কাজেই নির্গুণ। আবার গুণীর সঙ্গে গুণ সর্বদাই যুক্ত—অতএব সগুণ। এই নির্গুণ ও সগুণ যুগপৎ বর্তমান—একের অভাবে অন্যের উদয় নহে। কালব্যবচ্ছেদে যে এই সগুণত্ব বা নির্গুণত্ব, তাহাও নহে—সমকালেই সগুণ ও নির্গুণ ভাব। এই ভাবেই সগুণত্ব এবং নির্গুণত্বের বিরোধের সামঞ্জস্য হয়। শ্রীনিম্বার্কাচার্য এই সিদ্ধান্তেই আসিয়াছেন।

শ্রীনিম্বার্কাচার্য জীব ও জগতের পারমার্থিক সত্তা অনুমোদন করেন; কাজেই বলেন, তন্মতে মানবজীবন দুই দিনের জীবন নহে, জগৎ ও ছায়াবাজীর ছায়ামাত্র নহে। তিনি বলেন, যখন পরমাত্মা জগতের সর্বত্র বর্তমান, তখন জীবের প্রতিকর্ম, গৃহ, সমাজ ও রাষ্ট্র কোনটাই তাঁহাকে বাদ দিয়া হইতে পারে না। বস্তুতঃ যখন 'ভূমৈব সুখং নাল্পে সুখমস্তি' তখন কাহাকেও বাদ দেওয়া চলে না। বাদ দিতে গেলে ভূমার ভূমত্ব থাকে না, সুখও নষ্ট হইয়া যায়। তাই বাদ বা ত্যাগ নহে, গ্রহণ—আপন বলিয়াই গ্রহণ; কারণ জীবরূপেও যে শিবই—অর্থাৎ পরম মঙ্গলময় পরমাত্মাই। ইহাই শ্রীনিম্বার্কাচার্য-মতে বেদান্তের সুস্পষ্ট নির্দেশ।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, বেদান্তের শিক্ষা ভুলিয়াই ভারত আজ দুর্দশার চরম সীমায় উপনীত হইয়াছে। মনে রাখিতে হইবে, ভারতের স্বধর্ম আধ্যাত্মিকতা। এই আধ্যাত্মিকতাকে কেন্দ্র করিয়াই ভারতের গৃহ, সমাজ, রাষ্ট্র এককালে জগতের আদর্শস্থানীয় হইয়াছিল। স্বধর্ম পরিত্যাগ করিয়া পরধর্ম গ্রহণ করিতেছি বলিয়াই আমরা দুর্দশাগ্রস্ত। স্মরণ রাখিতে হইবে, ভগবানের শ্রীমুখের বাণী—'পরধর্মো ভয়াবহঃ'। স্বধর্মনিষ্ঠ ভারত চাহিয়াছিল দৈবী সম্পদ্। এই দৈবী সম্পদের মূলকথা 'প্রেম'—সর্বত্র আত্মানুভূতি। বেদান্তের মতে পর বলিয়া কেহ নাই, দূর বলিয়া কেহ নাই, সকলই আপন, সকলেই আপন জন। বেদান্তের এই শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া ভারতকে আবার অগ্রসর হইতে হইবে, তবেই সে স্বাধীনতার প্রকৃত সুখ ও শান্তিলাভে সমর্থ হইবে।

# শক্তিপীঠ বক্রেশ্বর

শ্রীদেবীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, এম্-এস্সি

বাংলাদেশের মধ্যে যে উষ্ণ প্রস্রবণ আছে তাহা ইতঃপূর্ব্বে জানিতাম না। সম্প্রতি ইহার সংবাদ পাইয়া উক্তস্থান দেখিবার মানসে কয়েক জন বন্ধুর সহিত জাগুয়াত্রীর এক সন্ধ্যায় বাহির হইয়াছিলাম। বীরভূম জেলায় পীঠস্থান বক্রেশ্বর-নামক গ্রামে ইহা অবস্থিত। স্থানটী ই আই রেলওয়ের অণ্ডাল সাঁইথিয়া শাখা লাইনের দুবরাজপুর ষ্টেশনে নামিয়া যাইতে হয়।

দুবরাজপুর ষ্টেশনে পৌছিয়া অনতিদূরবর্ত্তী ডাকবাংলোতে জিনিষপত্র রাখিয়া বাহির হইয়া পড়িলাম। সময় খুব অল্প বলিয়া নিকটবর্ত্তী হোটেলে কিঞ্চিৎ আহার করিয়া বক্রেশ্বর-তীর্থের দিকে অগ্রসর হইলাম। দুবরাজপুর সিউড়ী মহকুমার মধ্যে একটী বাণিজ্যপ্রধান স্থান। এখানে অনেকগুলি চাউলের কল দেখিলাম। এগুলিতে প্রায় সারা বৎসরই কাজ হয়। কিন্তু ইহার অধিকাংশই অবাঙ্গালী দ্বারা পরিচালিত। তাহা ছাড়া হাইস্কুল, দুই মাইল দূরবর্ত্তী হেতমপুর কলেজ, সমবায়-সমিতি, সাধারণ-গ্রন্থাগার কোন কিছুরই অভাব লক্ষিত হয় না।

বক্রেশ্বর যাইবার রাস্তা ষ্টেশনের পাশ দিয়া। প্রথমেই রেলের পুল পার হইলে দেখা যায় রাস্তা সোজা চলিয়াছে। স্থানীয় লোকদের রাস্তা-সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করায় তাহারা কোন অতিরিক্ত তথ্য দিতে না পারায় আমরা বক্রেশ্বর-সম্বন্ধে নিরাশ হইয়া পড়িয়াছিলাম। তখন গাইড-বুকই আমাদের সম্বল। গাইডবুকে বক্রেশ্বর পাঁচ মাইল। আমরা ঠিক সেই রকমেই তৈরী হইয়া গরমের পোষাক না লইয়াই বাহির হইয়া পড়িয়াছিলাম। প্রথমেই পথের ধারে অনেকগুলি ধানকল পড়িল। দুইদিকে মাঠ ধূ ধূ করিতেছে, আর তাহারই মাঝে এক একটা তালবীথিকে কেন্দ্র করিয়া এক একটী গ্রাম গড়িয়া উঠিয়াছে। তালবীথিগুলি বেশ সুন্দর দেখিতে। এক একটী বড়দীঘিকে ঘিরিয়া তালগাছ রহিয়াছে। প্রশস্ত রাস্তা দিয়া প্রায় চার মাইল হাঁটিবার পর আমরা গন্তব্যস্থল-সম্বন্ধে কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না। সেইজন্য চলতি গরুর গাড়ীর যাত্রীদের জিজ্ঞাসা করিলাম। কেহই ঠিক উত্তর দিতে পারিল না। আর কিছু দূর যাইবার পর দূরে পর্ব্বত-শ্রেণী দৃষ্টিগোচর হইল। অনুমানে বুঝিলাম ইহাই দুমকার পর্ব্বতশ্রেণী। মেঘলা দিনে পাহাড় বেশ সুন্দর দেখাইতেছিল। আরও প্রায় ঘণ্টাখানেক হাঁটিবার পর একটা যুবকের সহিত সাক্ষাৎ হইল। যুবক সাইকেলে ঐ দিকেই যাইতেছিল। যুবকটি ঠিক উত্তর দিয়া আমাদের চিন্তা দূর করিল। আরও খানিকক্ষণ হাঁটিবার পর আমরা রাস্তাটীর একটী বাঁকে আসিয়া পৌছিলাম। এখানে একজন প্রৌঢ় আমাদের সদর রাস্তা ছাড়িয়া দিয়া মাঠের মধ্য দিয়া একটী রাস্তা দেখাইয়া দিল। আমরা সেই পথে মাঠের আল দিয়া আঁকিয়া বাঁকিয়া অগ্রসর হইলাম। এইরূপে প্রায় এক ঘণ্টা হাঁটিবার পর দূরে মন্দির এবং শ্মশান হইতে ধূম উথিত হইতে দেখিতে পাইলাম।

বক্রেশ্বর মন্দিরটী একটী মহাশ্মশানের উপর অবস্থিত। প্রধান সড়কের পাশেই মন্দিরটী জরাজীর্ণ অবস্থায় পড়িয়া আছে। আমরা পরিশ্রান্ত হইয়া মন্দির-সংলগ্ন উষ্ণপ্রস্রবণের সোপানশ্রেণীতে উপবেশন করিলাম। প্রস্রবণটীর নাম পাপহরা গঙ্গা। উষ্ণজল মাটি হইতে উত্থিত হইয়া একটী নাতিদীর্ঘ অগভীর পুষ্করিণীর আকার ধারণ করিয়াছে। একটী নির্দ্দিষ্ট উচ্চতা হইতে জলনির্গমের নলদ্বারা বাহির হইয়া যাইতেছে। আমরা সেই জলে অবগাহন করিলাম। জল নাতিশীতোষ্ণ থাকায় স্নান বেশ প্রীতিপ্রদ হইয়াছিল। স্নানান্তে মন্দির-পরিক্রমায় বাহির হইলাম। একজন তীর্থপাণ্ডা আমাদের গাইড হইয়া চলিল। মন্দিরপথে আরও অনেকগুলি কুণ্ড পড়িল। এই কুণ্ডগুলির জলের উষ্ণতা পূর্ব্ববর্ত্তী জলের উষ্ণতা অপেক্ষা বেশী। অনেক ক্ষেত্রে জল মাটি হইতে বুদ্‌বুদাকারে ফুটিতেছে এবং গন্ধকের বাষ্প উত্থিত হইতেছে। কুণ্ডগুলির নাম যথাক্রমে ক্ষারকুণ্ড, ভৈরবকুণ্ড, অগ্নিকুণ্ড, সূর্য্যকুণ্ড। ইহা ছাড়া আরও অনেকগুলি কুণ্ড আছে, ইহাদের জল খুব গরম নয়, নাতিশীতোষ্ণ। কুণ্ডগুলি যথাক্রমে সৌভাগ্যকুণ্ড, শ্বেতগঙ্গা, ব্রহ্মকুণ্ড। ইহা ছাড়া একটী শীতল জলেরও কুণ্ড আছে, ইহার নাম জীবনকুণ্ড।

বক্রেশ্বর-তীর্থ একটী পীঠস্থান। এখানে দেবী মহিষমর্দ্দিনী, ভৈরব বক্রনাথ। বক্রনাথের পার্শ্বেই অষ্টাবক্র-মুনির মূর্ত্তি। বক্রনাথ-তীর্থ-সম্বন্ধে এক কাহিনী আছে। পুরাকালে হিরণ্য-কশিপু দৈত্যকে বধ করায় ভগবান্ নৃসিংহদেবের নখরে দারুণ জ্বালা অনুভূত হওয়ায় মহামুনি অষ্টাবক্র সেই জ্বালা নিজে গ্রহণ করেন। জ্বালাপ্রভাবে কষ্ট অনুভব করায় নৃসিংহদেব তাঁহাকে বক্রনাথ মহাদেবকে স্পর্শ করিতে বলেন। গহ্বর-মধ্যে নামিয়া অষ্টাবক্র-মুনি মহাদেবকে স্পর্শ করায় সর্ব্বতীর্থের জল আসিয়া তাঁহাকে অভিষিক্ত করে এবং তিনি জ্বালামুক্ত হন।

প্রত্যেক কুণ্ড-সম্বন্ধে এইরূপ এক একটী কাহিনী সংযুক্ত আছে। জীবনকুণ্ড-সম্বন্ধে কাহিনীতে প্রকাশ যে, পুরাকালে সর্ব্ব ও চারুমতী নামে এক ধর্ম্মপরায়ণ দম্পতী বাস করিতেছিলেন। একদিন একটা বাঘ আসিয়া সর্ব্বকে মারিয়া ফেলিল। চারুমতী মহাদেবের স্তব করিলেন। মহাদেব তাহার স্বামীর হাড়গুলি একত্র করিয়া এই কুণ্ডের জলদ্বারা সঞ্জীবিত করেন। অন্য কুণ্ডগুলির সম্বন্ধেও এইরূপ কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। মন্দির ছাড়িয়া আরও একটু অগ্রসর হইলে অনেক প্রাচীন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ দৃষ্টিগোচর হয়। গাইড বলিল, ইহাদের সংখ্যা প্রায় পাঁচশত, কিন্তু আমাদের অনুমান হইল ইহা শতাধিক মাত্র। মন্দিরগুলিতে এক সময়ে শিবলিঙ্গ থাকিত। মন্দিরের একদিকে অনেকগুলি সমাধি দেখিতে পাইলাম। গাইড বলিল, ইহা বৈষ্ণবদের সমাধি। কিন্তু এইরূপ শৈবস্থানে বৈষ্ণবদের সমাধি কি প্রকারে হইল তাহা বুঝিতে পারিলাম না।

কুণ্ডগুলির জল বহু খনিজ পদার্থে পরিপূর্ণ। সেইজন্য ইঁহাদের রোগ-আরোগ্য করিবার ক্ষমতা আছে। কালে হয়ত স্থানটি একটী আরোগ্যশালায় পরিণত হইতে পারে। বক্রেশ্বর একটী নগণ্য গ্রামমাত্র। কয়েকখানি ঘর লইয়া গ্রামটী। প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র দুবরাজপুর হাট হইতে লইয়া আসিতে হয়। এখানে আসিবার এক গরুর গাড়ী ছাড়া সহজলভ্য যান নাই। তাই অধিকাংশ লোকই পায়ে হাঁটিয়া যাতায়াত করে। শিবরাত্রির সময়ে এখানে মেলা বসে, সেই সময়ে দুবরাজপুর হইতে মোটরবাস ছাড়ে। বাংলার এত নিকটে কতকগুলি উষ্ণপ্রস্রবণ থাকা সত্ত্বেও ইহার খবর অনেকেই জানেন না। কিন্তু সকলেরই ইহা দেখিয়া আসা উচিত।

# স্বামিজী

ডাঃ প্রশান্তকুমার বসু, বি-এস্‌সি, এম্‌-বি, ডি-ও-এম্‌-এস্

স্বামিজীকে ভাবতে গেলেই মনের মধ্যে একটি পরিপূর্ণ পবিত্র মূর্ত্তি ভেসে ওঠে—যাতে নেই কোন মালিন্য, কোন কৃপণতা, কোন ভীরুতা। তাঁর জীবনের আলোতে আমাদের পথ চিনে নিতে হবে। আজ তাঁকে আমাদের বড় দরকার। নানা মতের, নানা ভাবের অশান্তির ঝড়ে জনসাধারণের দুঃখের তরী আজ সংসার-সাগরে দিশাহারা হ'য়ে পড়েছে। স্বামিজী-প্রদর্শিত পথের ধ্রুবতারাই শুধু পারে এই কালসমুদ্রে তরী কূলে ভেড়াতে।

স্বদেশের জন্য এমন দরদ, বিশ্বমানবের জন্য এমন প্রেম, সত্যের জন্য এমন সহজ ত্যাগ, পরকে কাছে টানবার সেবাময় এমন স্বাভাবিক শক্তি! নইলে কি আর কিছুতে সর্ব্বদেশের সকল মানুষের হৃদয়ে আসন পাতা যায়?

স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন সত্যিকারের মহামানব, আর মানুষ তৈরী করা ছিল তাঁর সাধনা। তিনি বেদান্তের আলোতে মানুষের সত্যিকারের রূপ উপলব্ধি করেছিলেন—তাই আধ্যাত্মিকতার নানান সূক্ষ্ম বিচার, বিভিন্ন ধর্ম্মমতের নানান সমস্যা, পূর্ব্ব ও পশ্চিমের নানান দার্শনিক মতবাদ—তাঁর কাছে অতি সরল হ'য়ে গিয়েছিল। সত্যিকার মনুষ্যত্বের বিকাশে যে সব কিছুর বিভেদ দূর হ'য়ে যায় এবং পার্থিব সহস্র বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের মন্ত্র যে মনুষ্যত্ব-বিকাশের পথেই খুঁজে পাওয়া যায়, ঐকথা তিনি দ্বিধাহীন কণ্ঠে বারবার ঘোষণা করেছেন। তিনি বলেছেন—"এস মানুষ হও, নিজেদের সংকীর্ণ গর্ত্ত থেকে বেরিয়ে এসে বাইরের দিকে দেখ। তোমরা কি মানুষকে ভালবাস? তোমরা কি দেশকে ভালবাস? তাহলে এস—আমরা ভাল হবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করি। মনে রেখো মানুষ হওয়া চাই, পশু নয়।" তাঁর সহচর ও অনুচরদের তিনি ডেকে বলেছেন—"তোমাদের প্রত্যেকের স্মরণ রাখতে হবে, আমাদের উদ্দেশ্য মানুষ প্রস্তুত করা। রমণীসুলভ কোমল হৃদয় অথচ শক্তিমান ও বলীয়ান, সর্ব্বতোমুখী-স্বাধীনতাপ্রিয় অথচ বিনীত, আজ্ঞাবহ—এই তো মানুষের লক্ষণ, পরের দুঃখে অশ্রু বিসর্জ্জন করতে হবে অথচ দৃঢ়চিত্ত হতে হবে।" ভগিনী নিবেদিতা লিখেছেন—"আচার্য্যদেব তাঁহার অন্তরঙ্গ ভক্তগণের হৃদয়ে যে অমূল্য স্মৃতির সম্ভার রাখিয়া গিয়াছেন, তাহার মধ্যে, তাঁহার মনুষ্যজাতির প্রতি প্রেমই যে উজ্জ্বলতম রত্ন, তাহা আমরা অসংকোচে নির্দ্দেশ দিতে পারি।"

এই মানুষ তৈরীর কাজে তাঁকে কি অসাধারণ পরিশ্রমই না করতে হয়েছে। অপূর্ব্ব ছিল তাঁর সৃজনী শক্তি, সংগঠন-শক্তি। একদিকে তিনি প্রাচীন ও বর্ত্তমান ভারতের যোগসূত্র রচনা করেছেন, আবার অন্যদিকে তিনি গঠন করেছেন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মিলনসেতু।

বেদান্তকে তিনি অতি আপনার করে নিয়েছিলেন। এ বেদান্ত নীরস বেদান্ত নয়। এ হ'ল মানবের সর্ব্বদা ব্যবহারের সরস বেদান্ত। বেদান্তের আলোতে যে আমাদের সদা সর্ব্বদার জীবনটাকেও আনন্দে ও অমৃতে উদ্ভাসিত

করা যায় সে কথা তিনিই স্পষ্টভাবে বল্লেন। বেদান্ত যে শুধুমাত্র মুষ্টিমেয় বিশেষ লোকের জন্যই নয়, এ যে আপামর সর্ব্বসাধারণ সবারই জন্য তাও তিনিই প্রথম বল্লেন।

যিনি সত্যদ্রষ্টা, তিনি তো নির্ভীক। তাঁর কথা ও উপদেশাবলীর ভিতর সর্ব্বদা বাজতে থাকে—মা ভৈঃ মন্ত্র। তিনি বলেছেন—"পাপ বলে যদি কিছু থাকে তা হ'ল দুর্ব্বলতা। দুর্ব্বলতাই পাপ এবং দুর্ব্বলতাই মৃত্যু।" উদার কণ্ঠে তিনি ঘোষণা করেছেন—আমাদের দেশে এখন দরকার লোহার মাংসপেশী ও ইস্পাতের তৈরী স্নায়ুমণ্ডলী এবং একটা প্রচণ্ড ইচ্ছাশক্তি —যাকে রোধ করতে পারে না কেউ এবং সে ভেদ করতে পারে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সকল প্রহেলিকা —সে ইচ্ছা যে ভাবেই হউক কার্য্য সমাধান করবে, তাতে যদি যেতে হয় সমুদ্রের অতলে তাও, কিংবা যদি বরণ করতে হয় মৃত্যুকে তাও। যা তোমাকে শরীরের দিক থেকে, জ্ঞানের দিক থেকে এবং আধ্যাত্মিকতার দিক থেকে দুর্ব্বল করে তা বিষবৎ ত্যাগ কর—তাতে নেই কোন জীবন, কখনও হ'তে পারে না তা সত্য।

স্বামিজী চল্‌তি রাজনীতি হ'তে দূরে ছিলেন। কিন্তু দেশের মুক্তির জন্ম কি অসীম আগ্রহ তার ছিল! বাংলার অগ্নিযুগের বিপ্লবী কর্ম্মীরা তার আদর্শে এবং তাঁরই বাণীতে যথেষ্টভাবে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। তিনি বলতেন—"জনসাধারণই ভারতের আশা।" এমন দরদ নিয়ে দেশের জন্ম কে আর কোথায় বলেছেন—"ভারতবাসী আমার ভাই, ভারতের দেবদেবী আমার ঈশ্বর, ভারতের সমাজ আমার শিশুশয্যা, আমার যৌবনের উপবন, আমার বার্দ্ধক্যের বারাণসী।" তিনি ছাড়া আর কে কবে বলেছেন—"ভারতের একটা কুকুর পর্য্যন্ত যতদিন অভুক্ত থাকবে ততদিন আমি মুক্তি চাই না।"

স্বামিজী ভারতীয় সমাজের অধঃপতনের সমস্ত কারণ নির্দ্দেশ করে প্রত্যেকটি সমস্যার আশ্চর্য্যজনক সহজ সমাধান করেছেন। অতীতকে ভুলে যাওয়া, দৃষ্টিভঙ্গীর সংকীর্ণতা এবং নানারকমের কুসংস্কার আমাদের বর্ত্তমান সমাজের এই হীন অবস্থার কারণ। অস্পৃশ্যতা যে কত বড় ক্ষতি করেছে আমাদের জাতীয় জীবনে, তা তিনি বারবার বলেছেন। মূক জনসাধারণের উপর উচ্চশ্রেণীর নানারূপ অত্যাচার এবং নারী-জাতির শোচনীয় অবস্থা তাঁর চোখ এড়িয়ে যায় নি। অর্থাৎ বর্ত্তমানে যত বিষয় নিয়ে দেশে আলোচনা চলছে, স্বামিজী তার প্রত্যেকটার সমাধানের পথ বলে দিয়েছেন। নারীজাতিকে তিনি বলেছেন, "ভুলিও না তোমাদের আদর্শ সীতা সাবিত্রী"; পুরুষকে বলেছেন নারীর ভিতরকার দেবীশক্তিকে উপলব্ধি করতে— "এক পক্ষ নিয়ে কোন পক্ষীই উড়তে পারে না।"

জাতিবর্ণনির্বিশেষে সবলতা-দুর্ব্বলতার বিচার না করে প্রত্যেক নরনারীকে, প্রত্যেক বালক-বালিকাকে শোনাতে ও শেখাতে হবে যে—সবল-দুর্ব্বল, উচ্চ-নীচ সকলের ভিতরই সেই অনন্ত আত্মা আছেন—সুতরাং সবাই মহৎ হ'তে পারে, সবাই সাধু হ'তে পারে।—এই হ'ল স্বামিজীর সমাজসংস্কার-প্রণালী। তিনি বলতেন— "বেদান্তের তত্ত্বসকল কেবল অরণ্যে ও গিরি-গুহায় আবদ্ধ থাকবে না, বিচারালয়ে, ভজনালয়ে, দরিদ্রের কুটীরে, মৎস্যজীবীর গৃহে, ছাত্রের অধ্যয়নাগারে সর্ব্বত্র এই তত্ত্ব আলোচিত ও কার্য্যে পরিণত হবে।"

সমাজকে স্বামিজী অখণ্ড ভাবেই বিচার করতেন। আলাদা আলাদাভাবে সমাজ-সংস্কারের জন্ম ব্যর্থ শক্তিক্ষয় না করে তাঁর পরিকল্পনা ছিল জাতির সমস্ত দেহে স্বাভাবিক স্বাস্থ্য

ফিরিয়ে আনা। তাই তিনি বলেছেন—"আমি সংস্কারে বিশ্বাসী নই, স্বাভাবিক উন্নতিতে বিশ্বাসী।"

শিক্ষা-বিষয়ে স্বামিজীর মত হ'ল— ভারতের গৌরবময় প্রাচীন আদর্শকে হারিয়ে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার অন্ধ অনুকরণে আমরা ডুবে যাচ্ছি। প্রাচীনের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে ভাল জিনিসগুলি বিদেশ থেকে আনতে হবে। আমাদের চাই পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞান এবং বেদান্ত, আমাদের পথপ্রদর্শক হবে ব্রহ্মচর্য্য এবং সঙ্গে থাকবে আত্মনির্ভর এবং নিজেদের উপর শ্রদ্ধা। বংশানুক্রমিক অধিকার তিনি ত্যাগ করতে বলেছেন। একদিকে ব্রাহ্মণ, অপর দিকে চণ্ডাল —চণ্ডালকে ক্রমশঃ ব্রাহ্মণত্বে উন্নয়নই আমাদের কার্য্যপ্রণালী হবে। উচ্চবর্ণের শিক্ষা সদাচার— যা নিয়ে তাদের তেজ ও গৌরব—সে শিক্ষা যেন নিম্নজাতীয়গণ অবাধে লাভ করতে পারে।

মহামানবতার সাগরতীরে দাঁড়িয়ে আজ আমরা শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করি সেই মহাপুরুষকে, আর কণ্ঠে ধ'রি অভয় মন্ত্র—

"উদয়ের পথে শুনি কার বাণী
ভয় নাই ওরে ভয় নাই,
নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান
ক্ষয় নাই তার ক্ষয় নাই।"

---

# পঞ্চকন্যা

শ্রীবিনয়ভূষণ সেনগুপ্ত

শিশুকালে মাতৃসনে শিখেছিনু উচ্চারিতে
পঞ্চকন্যা-নাম,
ভোরে না ডাকিতে পাখী করিয়াছি কতবার
উদ্দেশে প্রণাম।
কেবা এই পাঁচজন পুরাণে দেখিনু যবে,
মানিনু বিস্ময়
এক-পতি-নিষ্ঠ নন্ তবু রহিলেন এঁরা
সবার পূজায়!
ভাবিলাম কোন ঋষি, করেছেন পরিহাস
কৌতুকের ভরে,
সীতা সাবিত্রীর দেশে, মলিনা এ পঞ্চনারী
বন্দিতা সংসারে!
জীবন-সায়াহ্নে আজ কাটিয়াছে ভুল মোর
ঘুচিল সংশয়,
অহল্যা, দ্রৌপদী, তারা, কুন্তী আর মন্দোদরী,
করে মন জয়।
অভ্রান্ত সে ঋষি বাণী, পঞ্চ-কন্যা নহে হীনা,
শুদ্ধ পূতমনা,
দুঃখের অনলে দহি, খাদটুকু গেছে পুড়ি,
আছে খাঁটিসোনা।
পূর্ব কথা স্মরি পাছে, খাঁটি সোনা কোন জন
করে অবহেলা,
দূরদৃষ্টি শাস্ত্রকার, গাঁথিলেন সেই হেমে
নিত্য জপমালা।
অতীত ভারত সদা, যথামত নারীগণে
করেছে সম্মান,
পঞ্চকন্যা-নাম নিতে সেই গর্বে আজি মোর
ভরে ওঠে প্রাণ।

# আচার্য উদয়ন

শ্রীদীননাথ ত্রিপাঠী, কাব্য-ব্যাকরণ-সাংখ্য-তর্ক-বেদান্ততীর্থ

মহর্ষি গৌতম-প্রকাশিত ন্যায়দর্শনের বাৎস্যায়ন ভাষ্য, উদ্দ্যোতকরের বার্তিক, বাচস্পতি মিশ্রের তাৎপর্যটীকা ও উদয়নের তাৎপর্যপরিশুদ্ধি—এই ক্রমে প্রাচীন নৈয়ায়িক-সম্প্রদায়ের রীতি সমাপ্ত হইলে গঙ্গেশোপাধ্যায়াদি-ক্রমে নব্যরীতি আরম্ভ হয়। উদয়ন-কৃত ন্যায়গ্রন্থগুলি যেন মধ্যদীপিকান্যায়ের কার্য করিতেছে। এই অসামান্য প্রতিভাশালী আচার্যের জন্ম বা মৃত্যুর তারিখ জানা যায় না, তবে তাঁহার অবস্থিতিকাল-সম্বন্ধে বিভিন্ন মতের দ্বারা আমরা একটা আনুমানিক সিদ্ধান্তে পৌছিতে পারি। লঘু-ভারত-রচয়িতা বলেন, তীর্থপর্যটন-কালে উদয়ন কুসুমাঞ্জলি গ্রন্থ পাইয়া উহা গৌড়ে প্রচার করেন। ভক্তিমাহাত্ম্যকারের মতে ভগবান জনার্দন মিথিলায় উদয়নাচার্যরূপে আবির্ভূত হন। আবার বারেন্দ্রব্রাহ্মণ-সমাজের মতে ইনিই উদয়নাচার্য ভাদুড়ী, বাংলার লোক। কিন্তু উদয়নাচার্য মিথিলার লোক বলিয়াই সমধিক প্রসিদ্ধ। 'ন্যায়সারবিজয়' গ্রন্থপ্রণেতা ভট্টরাঘব বলেন, উদয়নকৃত গ্রন্থে খৃষ্টীয় দ্বাদশ-শতাব্দীর উল্লেখ আছে। উদয়ন দশম শতাব্দীতে বর্তমান বাচস্পতিপ্রণীত তাৎপর্যটীকার পরিশুদ্ধি-নামক ব্যাখ্যা করিয়াছেন; সুতরাং তিনি যে খৃঃ দশম ও দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যবর্তী লোক, ইহা অনুমান করা যাইতে পারে। নৈষধ-চরিতের টীকাকার ভগীরথ ঠক্কুর "শ্রীহর্ষং কবিরাজরাজিমুকুটালঙ্কারহীরঃ সুতং" ইত্যাদি শ্লোকের ব্যাখ্যায় শ্রীহর্ষের পিতা শ্রীহীরের সহিত উদয়নাচার্যের বিবাদ হইয়াছিল ইহা দেখাইয়াছেন। খণ্ডনখণ্ডখাদ্যগ্রন্থে শ্রীহর্ষ উদয়নের মত খণ্ডন করিয়াছেন। আবার বর্ধমান উপাধ্যায়ের পিতা গঙ্গেশ উপাধ্যায় স্বকৃত 'তত্ত্বচিন্তামণি' গ্রন্থের অনুমানখণ্ডে "ব্যাঘাতো যদি শঙ্কাস্তি" ইত্যাদি উদয়ন-রচিত কুসুমাঞ্জলির কারিকা উদ্ধৃত করিয়া শ্রীহর্ষের মত খণ্ডন করিয়াছেন। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, উদয়ন গঙ্গেশ ও শ্রীহর্ষের পূর্বকালীন, অথচ শ্রীহীরের সমকালীন।

আত্মতত্ত্ববিবেক, ন্যায়কুসুমাঞ্জলি, কিরণাবলী, তাৎপর্যপরিশুদ্ধি ও লক্ষণাবলী—এই সকল গ্রন্থ উদয়ন-রচিত। কাহারও কাহারও মতে 'ন্যায়পরিশিষ্ট' ও তাঁহারই লেখা। আত্মতত্ত্ববিবেক বৌদ্ধমত খণ্ডন করিয়া নিত্য আত্মা সাধন করিয়াছে, এইজন্য এই গ্রন্থের আর এক নাম 'বৌদ্ধাধিকার'। কুসুমাঞ্জলিগ্রন্থে চার্বাক, বৌদ্ধ, সাংখ্য, বেদান্ত, পাশুপত, যোগ প্রভৃতি মত খণ্ডন করিয়া ন্যায়মতের 'ঈশ্বর'সাধন করিয়াছেন। বৈশেষিক-দর্শনের প্রশস্তপাদ-ভাষ্যের উপর বিরোধী মত-সমূহ খণ্ডন করিয়া 'কিরণাবলী'-টীকা রচনা করিয়াছেন। বৈশেষিকদর্শন-অবলম্বনে 'লক্ষণাবলী' রচিত।

উদয়নের রচনার ভঙ্গী, ভাষার সৌষ্ঠব, পদ-বিন্যাসনৈপুণ্য, ভাবগাম্ভীর্য ও পরপক্ষখণ্ডনে যুক্তির সারবত্তা বিদ্বজ্জনের চিত্তাকর্ষক। ফলতঃ ন্যায়শাস্ত্রে উদয়নের আলোকপাত না হইলে আপাত-বুদ্ধিতে উহা শুষ্কতর্ক বলিয়া মনে হইত। যদিও সূত্রকার, ভাষ্যকার প্রভৃতি ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার করেন নাই, পরন্তু ঈশ্বরের উল্লেখ করিয়াছেন, তথাপি ঈশ্বরের সবিশেষ

আলোচনা করেন নাই। ন্যায়মতে জীবাত্মা ও পরমাত্মা বা ঈশ্বর ভিন্ন বলিয়া সমান-বিষয়ক তত্ত্বজ্ঞান সমানবিষয়ক অজ্ঞানের নিবর্তক এই নিয়মানুসারে আত্মতত্ত্ব-বিষয়েই তাঁহারা বিশেষভাবে আলোচনা করিয়াছেন। ঈশ্বর-তত্ত্বজ্ঞান আত্মতত্ত্বজ্ঞানের উপকারক। মনে হয়, দেহেন্দ্রিয়াদিতে আত্মজ্ঞান অত্যন্ত দৃঢ় বলিয়া সহজে আত্মতত্ত্ব স্ফুরিত হয় না। সর্বদোষরহিত ঈশ্বরের উপাসনায় দেহেন্দ্রিয়াদিতে আত্মভাবনা সহজেই অপসৃত হইয়া আত্মতত্ত্ব প্রকাশিত হয়। এই উদ্দেশ্যেও আচার্য যেন অচেতন অদৃষ্টের অধিষ্ঠাতৃরূপে ঈশ্বরসাধনে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। তাঁহার রচিত কুসুমাঞ্জলির কারিকায় ঈশ্বরের প্রতি যেমন তাঁহার অগাধ ভক্তি সূচিত হয়, সেইরূপ খণ্ডনীয় প্রতিপক্ষগণের প্রতি পরম প্রেমও দেখা যায়। এইজন্য তাঁহার আচার্য-নাম সার্থকই হইয়াছে। যেমন কুসুমাঞ্জলির শেষে—

"ইত্যেবং শ্রুতিনীতিসংপ্লবজলৈর্ভূয়োভিরাক্ষালিতে
যেষাং নাস্পদমাদধাতি হৃদয়ে তে শৈলসারাশয়াঃ।
কিন্তু প্রস্তুতবিপ্রতীপবিধয়োঽপ্যুচ্চৈর্ভবচ্চিন্তকাঃ
কালে কারুণিক ত্বয়ৈব কৃপয়া তে তারণীয়াঃ নরাঃ॥"

—এইরূপে (অর্থাৎ কুসুমাঞ্জলি-গ্রন্থে মদুক্ত রীতি-অনুসারে) বহু শ্রুতিও যুক্তিবারি সেচনের দ্বারা ঈশ্বরবিষয়ক অজ্ঞান, সংশয় ও বিপরীত ভাবনা নিরাকরণক্রমে চিত্তমল প্রক্ষালন করিলেও যাহাদের হৃদয়ে ঈশ্বরনিশ্চয় দৃঢ় হয় না, তাহারা পাষাণহৃদয়। হে করুণাময়, তথাপি সেই সকল কুতর্কপরায়ণ ব্যক্তি যখন সংসার-তাপদগ্ধ হইয়া আপনাকে স্মরণ করিবে তখন আপনি কৃপাপূর্বক তাহাদিগকে সংসারসাগর হইতে উত্তারণ করিবেন ইহাই আমার প্রার্থনা।

পরে নিজের উদ্বেল ভক্তিভাব যেন অন্তর্নিরুদ্ধ করিতে না পারিয়া বাক্যে প্রকাশ করিয়াছেন। যথা—

"অস্মাকন্তু নিসর্গসুন্দর চিরাচ্চেতো নিমগ্নং ত্বয়ী-
ত্যদ্ধানন্দনিধৌ তথাপি তরলং নাদ্যাপি সন্তৃপ্যতে।
তন্নাথ ত্বরিতং বিধেহি করুণাং যেন ত্বদেকাগ্রতাং
যাতে চেতসি নাপ্নুবামঃ শতশো যাম্যাঃ পুনর্যাতনাঃ॥"

—হে স্বভাবসুন্দর আনন্দনিধি, আমাদের কিন্তু চিত্ত তোমাতে নিমগ্ন হইলেও অদ্যিও (ঐকান্তিক তন্ময়তার অভাব-বশতঃ) চঞ্চল চিত্ত (তোমার দর্শনাভাব হেতু) পরিতৃপ্ত হয় নাই। হে নাথ, করুণা কর যেন তোমাতেই একনিষ্ঠ হইয়া পুনঃ শত শত যমযন্ত্রণা অনুভব না করি।—ভক্ত সাধক লক্ষ্য করিবেন 'নিসর্গসুন্দর' ও 'আনন্দনিধি' বিশেষণদ্বয় কেমন ভক্তির মাধুর্য প্রকাশ করিয়াছে!

গ্রন্থরচনা যে স্বীয় পাণ্ডিত্যপ্রকাশ বা অন্য কোন স্বার্থবুদ্ধিতে করেন নাই, তাহা তাঁহার সর্বশেষ কুসুমাঞ্জলি-কারিকা হইতে স্পষ্ট বুঝা যায়। যথা—

"ইত্যেষ নীতিকুসুমাঞ্জলিরুজ্জ্বলশ্রী-
র্যদ্বাসয়েদপি চ দক্ষিণবামকৌ দ্বৌ।
নো বা ততঃ কিমমরেশগুরোর্গুরুস্তু
প্রীতোঽস্তুনেন পদপীঠসমর্পণেন॥"

এই উজ্জ্বলশ্রী ন্যায়কুসুমাঞ্জলি-গ্রন্থ সুজন বা দুর্জনকে অনুরঞ্জিত করুক বা নাই করুক তাহাতে আমাদের কোন হানি নাই, কিন্তু দেবরাজগুরুর গুরু পরমেশ্বর ইহাতে পদপীঠ সমর্পণপূর্বক প্রীত হউন।

এইভাবে ভগবদুদ্দেশেই এই গ্রন্থ সমর্পণ করিয়াছেন। এই গ্রন্থের প্রত্যেক স্তবকের শেষভাগে ঈশ্বরের মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে। দ্বিতীয় স্তবকের শেষ হইতে একটি শ্লোক উদ্ধৃত হইল। যথা—

"কার্যং কারমলৌকিকাদ্ভুতময়ং মায়াবশাৎ সংহরন্
হার্যং হারমপীন্দ্রজালমিব যঃ কুর্বন্ জগৎ ক্রীড়তি।
তং দেবং নিরবগ্রহস্ফুরদভিধ্যানানুভাবং ভবং
বিশ্বাসৈকভুবং শিবং প্রতি নমন্ ভূয়াসমন্তেঽপি॥"

যিনি অদৃষ্ট-সহকারে এই অলৌকিক বৈচিত্র্যময় জগৎ ইন্দ্রজালের ন্যায় একবার গড়িতেছেন, একবার ভাঙ্গিতেছেন, ভাঙ্গিয়া আবার গড়িতেছেন, যেন ক্রীড়া করিতেছেন, সেই অব্যাহত-ইচ্ছাশক্তি, বিশ্বাসৈকনিধি, স্বতন্ত্র, জগৎকারণ শিবের প্রতি অন্তকালেও বহুতর নমস্কার। আত্মতত্ত্ববিবেকের মঙ্গলাচরণ-শ্লোকে ঈশ্বরই যে সর্বময় কর্তা ইহা স্পষ্টরূপে দেখাইয়াছেন। যথা—

"স্বাম্যং যস্য নিজং জগৎসু সৃজনিতেঘাদৌ ততঃপালনং
ব্যুৎপত্তেঃ করণং হিতাহিতবিধিব্যাসেধসম্ভাবনং।
ভূতোক্তিঃ সহজা কৃপা নিরুপধির্যত্নস্তদর্থাত্মক-
স্তস্মৈ পূর্বগুরূত্তমায় জগতামীশায় পিত্রে নমঃ॥"

—যিনি সৃষ্টির প্রথমে জগৎ সৃষ্টি করিয়া নিজেই তাহার স্বামিত্ব (কর্তৃত্ব) গ্রহণ, তাহার রক্ষাকার্য, শব্দসঙ্কেতজ্ঞান-বিতরণ ও বিধি-নিষেধ প্রবর্তন করেন; যাঁহার ভ্রমপ্রমাদাদি দোষের অভাব-বশতঃ উক্তি (বেদ) যথার্থ, স্বাভাবিক করুণা ও জগতের জন্যই যাঁহার নিঃস্বার্থ যত্ন, বিশ্বনিয়ন্তা, কপিলাদি পূর্বাচার্য অপেক্ষাও যিনি উত্তম, সেই জগৎপিতাকে নমস্কার।

আচার্য উদয়নরচিত শাস্ত্ররূপ অমূল্য সম্পদ না থাকিলে ন্যায়দর্শন যেন অপূর্ণাঙ্গ হইত। তাঁহার স্বীয় রচনার বহু বৈশিষ্ট্য থাকিলেও পূর্বাচার্যগণের প্রতি তাঁহার কিরূপ শ্রদ্ধা ছিল তাহা একটি শ্লোক হইতে সম্যক্ জ্ঞাত হইয়া যায়। যথা—

"মাতঃ সরস্বতি পুনঃ পুনরেষ নত্বা
বদ্ধাঞ্জলিঃ কিমপি বিজ্ঞাপয়াম্যবেহি।
বাক্‌চেতসোর্মম তথা ভব সাবধানা
বাচস্পতের্বচসি ন স্খলতো যথৈতে॥"

(তাৎপর্যপরিশুদ্ধি)

—মাতঃ সরস্বতি, এই ব্যক্তি (আমি) তোমাকে পুনঃপুনঃ প্রণতি-পূর্বক বদ্ধাঞ্জলি হইয়া একটি বিষয় নিবেদন করিতেছে, তাহা শোন। আমার বাক্ ও চিত্ত-সম্বন্ধে এরূপ অবহিত হও যাহাতে বাচস্পতির বাক্যবিষয়ে আমার বাক্ ও মন স্খলিত না হয়।—নাস্তিকাদি-মতখণ্ডন-পূর্বক লোকের বেদপ্রদর্শিত যথাযথ মার্গে প্রবৃত্তির সাহায্য করাও তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। এই হেতু তিনি 'কিরণাবলী'র একটি প্রতিজ্ঞা-শ্লোকে বলিয়াছেন—

"অর্থানাং প্রবিবেচনায় জগতামন্তস্তমঃশান্তয়ে
সন্মার্গস্য বিলোকনায় গতয়ে লোকস্য যাত্রার্থিনঃ।
তত্ত্বত্তামসভূতভীতয় ইমাং বিদ্যাবতাং প্রীতয়ে
ব্যাতেনে কিরণাবলীমুদয়নঃ সত্তর্কতেজোময়ীম্॥"

—বৈশেষিক-দর্শনোক্ত বিষয়ের বিবেক, লোকের অন্তরের সংশয়াদি তমোনিবৃত্তি, সন্মার্গপ্রদর্শন, সন্মার্গগমনার্থীর অবগতি, কুতার্কিক-নাস্তিক-তামসিকগণের মত-নিরাকরণ এবং বিদ্বদ্‌বৃন্দের প্রীতির নিমিত্ত উদয়ন সৎতর্কতেজোযুক্ত কিরণাবলী রচনা করিতেছেন।

ইহা কিরণাবলী-রচনার প্রয়োজনজ্ঞাপন-মাত্র, আত্মশ্লাঘা নহে। প্রয়োজন-প্রদর্শন প্রাচীন শাস্ত্রকারগণেরও রীতি। নতুবা সেই শাস্ত্র-অধ্যয়নে অন্যের প্রবৃত্তি নাও হইতে পারে। তাই শাস্ত্রে আছে—

"শাস্ত্রার্থং শাস্ত্রসম্বন্ধং শ্রোতুং শ্রোতা প্রবর্ততে।
শাস্ত্রাদৌ তেন বক্তব্যঃ সম্বন্ধঃ সপ্রয়োজনঃ॥"

শ্রোতা শাস্ত্রের বিষয় সম্বন্ধ ও প্রয়োজন শুনিতে ইচ্ছা করে, সেইজন্য শাস্ত্রের আদিতে শাস্ত্রকারের বিষয়, সম্বন্ধ ও প্রয়োজন বর্ণনা করা উচিত।

এই গ্রন্থকারের শাস্ত্রীয় বিষয়ে বহু বৈশিষ্ট্য আছে। তাহা এখানে আলোচনার বিষয় নহে, এইজন্য একটি মাত্র দিক্ সংক্ষেপে আলোচিত হইল। পরিশেষে বক্তব্য এই যে, দার্শনিক হইলেও উদয়ন যথেষ্ট শ্রদ্ধাভক্তিসম্পন্ন ছিলেন। ইহা তাঁহার রচনাবলীই প্রমাণ করিতেছে এবং আত্মসাক্ষাৎকারের প্রতি ভগবদ্ভক্তির বিশেষ আবশ্যকতা ইহাও তাঁহার অভিমত।

ন্যায়শাস্ত্র যে কুতার্কিক শাস্ত্র নহে, ইহাও তাঁহার গ্রন্থ হইতে বিশেষভাবে প্রমাণিত হয়। শঙ্করপ্রমুখ ভাষ্যকারাদি বেদবিরোধী তর্ক-সকলের নিন্দা করিয়াছেন, বেদানুকূল তর্কের নিন্দা তাঁহাদের অভিপ্রেত নহে। উদয়নাচার্য নৈয়ায়িক হইলেও অদ্বৈতমতের উপর গভীর শ্রদ্ধাসম্পন্ন ছিলেন, ইহা তাঁহার একটি উক্তি হইতে পাওয়া যায়। যথা—"ইদং তু কণ্টকাবরণং তত্ত্বং তু বাদরায়ণম্" অর্থাৎ এই ন্যায়শাস্ত্র আত্মতত্ত্ব-বৃক্ষের কণ্টকবেষ্টনী, বেদান্তই যথার্থ তত্ত্বপ্রতিপাদক।

# পুণ্যস্মৃতি

## ( ১ )

### স্বামী শিবানন্দ মহারাজের সকাশে

১৯২৫ সালের ১১ই নভেম্বর। বেলুড় মঠে পূজ্যপাদ স্বামী শিবানন্দজীর ( মহাপুরুষ মহারাজ ) কাছে বসিয়া আছি। জনৈক মহিলা ভক্ত আসিয়া প্রণাম করিয়া কাতরভাবে বলিতেছেন, মহারাজ, আশীর্বাদ করুন, মরবার সময় যেন ঠাকুরের নাম স্মরণ করে মরতে পারি। যদি মুখে নাও পারি অন্ততঃ মনে মনে যেন তাঁর নাম ভুল না হয়। আমার মৃত্যুভয় নেই।

মহাপুরুষজী। কেন তোমাদের ভয় থাকবে? ঠাকুর তোমাদের হাত ধরে নিয়ে যাবেন, ভয় কি? ভক্তদের জন্ম যমদূতফুত নেই। ভক্তেরা ঠিক ভগবানের নিকট চলে যায়। তোমরা কোন ভাবনা করো না। ঠাকুর, মা তোমাদের সর্বদাই দেখছেন—উক্ত ভদ্রমহিলা খুব আশান্বিত হইয়া মহারাজকে প্রণাম করিয়া বিদায়গ্রহণ করিলেন। পূজনীয় মহারাজ এবার গঙ্গার পারে বেড়াইতে চলিলেন। সঙ্গে ২।৩ জন ভক্ত আছেন। সন্ধ্যা হয় হয়, এমন সময় মহাপুরুষজী অস্ফুটস্বরে আচার্য শঙ্করের মোহমুদ্গরের সেই পরিচিত শ্লোকটি আবৃত্তি করিতে আরম্ভ করিলেন, "নলিনী-দলগতজলমতিতরলং তদ্বজ্জীবনম্ অতিশয়চপলম্" ইত্যাদি। উপস্থিত আমাদের বলিলেন, এই সব বৈরাগ্যের গান বড় সুন্দর। আমরা আগে এই সব গান গাইতুম। বাঃ, ওপারে বেশ হরিনাম হচ্ছে। গঙ্গার পাড়, তাতে হরিনাম বড়ই ভাল।

এইবার তিনি গান ধরিলেন—সুরধুনীর তটে কে হরিনাম করে। ভ—মহারাজ বলিলেন, এই গানটি বড়ই সুন্দর। আচ্ছা মহারাজ, ঠাকুরের প্রথম ফটো কে তোলেন?

মহাপুরুষজী। ভবনাথ প্রথম তাঁর এক বন্ধুর দ্বারা তোলান। ঐ ভদ্রলোক বরাহনগরে থাকতেন।

ভ—মহারাজ। ঠাকুরের চেহারা কেমন ছিল?

মহাপুরুষজী। তিনি খুব লম্বা ছিলেন না, চলনসই চেহারা ছিল। বুক খুব প্রশস্ত ছিল।

ভ—মহারাজ। আপনাদের চেহারা তখন বোধ হয় ভালই ছিল।

মহারাজ—হাঁ, কঠোর করে সকলের দেহ গেল। স্বামিজী ৩৯ বৎসরে দেহত্যাগ করলেন। যোগেন মহারাজ তাঁর পূর্বেই দেহ রাখলেন, সবই একে একে চলে গেলেন। হরিনামই সত্য, হরিনামই সত্য। মা, জগতের মঙ্গল কর, সকলকে চৈতন্য দাও।

আমাদের পরিচিত ভক্ত হি—বাবু আসিয়া মহারাজকে প্রণাম করিলেন। তিনি তাঁহার দীক্ষার কথা কাতরভাবে জানাইলেন।

মহাপুরুষজী। দেখ, আমরা অন্য কোন দীক্ষা জানি না, আমরা জানি, ঠাকুর ও তাঁর পতিতপাবন নাম। এই গঙ্গার ধারে দাঁড়িয়ে তোমাকে বলছি, আমরা এই সার জানি। ঠাকুরের নাম করে যাও। এর চেয়ে বড় দীক্ষা আমরা কিছু জানি না। আমরা তো ভট্টাচার্যদের মত দীক্ষা দেই না। "রামকৃষ্ণ-নাম" এই ত দীক্ষা। ঠাকুরঘরে যেয়ে

তোমাকে এই পতিতপাবন নামই বলব। আমাদের কোন secret নেই, দরকারও নেই। তিনি এসেছিলেন যুগাবতার। যে বিশ্বাস করে তাঁকে ডাকবে সেই ধন্য হয়ে মুক্ত হয়ে যাবে, এতে কোন সংশয় নেই।

মহাপুরুষজী ভাবস্থ হইয়া এই কথাগুলি বলিতেছিলেন। তাঁহার চোখে এক অদ্ভুত দীপ্তি। কথাগুলি তড়িৎশক্তির ন্যায় সকলের হৃদয়ে গিয়া স্পর্শ করিল। আমাদের কাহারও সাহস হইল না যে আর কোন কথা বলিয়া তাঁহার ভাবভঙ্গ করি।

শ্রীশ্রীঠাকুরের আরতি দর্শন করিতে চলিলাম। মহারাজও আস্তে আস্তে আপনার শয়নকক্ষের দিকে গেলেন। আরতির পর আবার ক্রমে ক্রমে সকলে শ্রীশ্রীমহাপুরুষ মহারাজের ঘরে আসিয়া বসিলাম।

জনৈক ভক্ত। মহারাজ, কেমন আছেন?

মহারাজ। শরীর ভাল নেই, বাত, সর্দি। তুমিও যেমন—এই বুড়ো শরীর, এখনত এই সব হবেই। ৭০ বৎসর বয়স চলছে।

ভক্ত। আমার সামনে আপনি বুড়ো শরীর বলবেন না, আমার প্রাণে বড়ই লাগে।

মহারাজ। বুড়ো শরীরকে বুড়ো বলব না? এই শরীরের সঙ্গে ত মায়িক সম্বন্ধ। ৭০ বৎসর বয়স কি কম? এই শরীর ২০০ বৎসর বেঁচে থাকলে কি উপকার হবে? যাক সেই কথা, ঠাকুরের যেরূপ ইচ্ছা তাই হবে, আমাদের সেই সব কথায় কাজ কি?

এই সময় জনৈক ভক্ত তাঁহার পুত্রের সহিত আসিয়া মহারাজকে প্রণাম করিলেন ও কথা-প্রসঙ্গে ছেলেটির দীক্ষার কথা বলিলেন। ছেলেটির বয়স ১২।১৩ হইবে।

মহারাজ। তুমি গায়ত্রী পড় ত?

ছেলেটি। রোজ পড়ি না। এই বলিয়া মাথা অবনত করিল।

মহারাজ। এই জন্যই ছোট ছেলেদের দীক্ষা দিই না। মন্ত্র নিলে রোজ জপ করতে হবে, তুমি পারবে ত? গায়ত্রী রোজ পড়বে। মন্ত্র নিলে রোজ সকালে উঠে হাত মুখ ধুয়ে পড়তে বসবার আগে যতটুকু পার মন্ত্র জপ করবে। মন্ত্র জপ না করে কিছু খেতে পারবে না, তুমি স্কুলে পড়, সময় বেশী পাবে না, তাই সকালে পড়বার আগে ৫।৭ মিনিট জপ করে পড়তে বসবে।

ছেলেটি হাঁ, তাই করব বলে প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল। আমাদের আফিসের কে—বাবু আসিয়া মহারাজকে প্রণাম করিলেন। তিনি শ্রীশ্রীরাখাল মহারাজের কৃপা পাইয়া-ছিলেন।

কে—বাবু কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীমহারাজের ভাল-বাসার কথা বলিলেন।

কে—বাবু। মহারাজ, আমরা মহারাজ ও বাবুরাম মহারাজের নিকট কত ভালবাসাই পেয়েছি!

মহাপুরুষজী। হাঁ, মহারাজ ও বাবুরাম মহারাজ তোমাদের খুবই ভালবাসতেন আমরা জানি।

কে—বাবু। শ্রীমহারাজ ও শ্রীবাবুরাম মহারাজই আমাদের সব ছিলেন। আপনাকে কি বলব, এমন আমাদের সব ঘটনা হয়েছে—রাত্রিতে বাড়ীতে শুয়ে আছি, প্রাণ ছটফট করতো মহারাজকে দেখবার জন্য। একদিনের ঘটনা বলি—সেদিন পূর্ণিমার রাত্রি, ১১টা, এমন সময় মন ব্যাকুল হল মহারাজকে দেখবার জন্য। তখনই বাসা হতে রওনা হলুম। কুমারটুলী ঘাটে এসে দেখি, ডাক্তার কাঞ্জিলাল প্রভৃতি আরও ২।৩ জন মহারাজের ভক্ত

ঘাটে দাঁড়িয়ে আছেন। আমি জিজ্ঞাসা করলুম, আপনারা এত রাত্রে এখানে কেন? উত্তর দিলেন, মশাই—মহারাজকে দেখবার জন্ত প্রাণ বড়ই ব্যাকুল হয়েছে। আমি ত শুনেই বুঝে নিলুম, এদের মনের অবস্থাও আমারই মত। তখন একত্রে একখানা নৌকা করে বেলুড় মঠে এলুম। মঠে এসে মহারাজকে দর্শন করতে চললুম মহারাজের ঘরে। তখন অনেক রাত্রি, মঠে সব সাধুরা ঘুমিয়েছেন। আমরা আস্তে আস্তে মহারাজের ঘরে গেলুম। যেয়ে দেখি, মহারাজ যেন কার জন্ত বসে অপেক্ষা করছেন। আমরা যেয়ে প্রণাম করলুম। তিনি আমাদের দেখেই জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা এত রাত্রে কি করে এলে, কোন কষ্ট হয়নি ত? মহারাজ পূজনীয় বাবুরাম মহারাজকে ডাকালেন ও জিজ্ঞাসা করলেন, এদের কিছু প্রসাদ দিতে পার বাবুরামদা? বাবুরাম মহারাজ বললেন, ৪।৫ জনের জন্ত প্রসাদ তৈরীই আছে।—আমরা প্রসাদ পেলুম। মহারাজকে প্রণাম করে অনেক রাত্রিতে রওনা হলুম।

মহাপুরুষজী। অন্ত লোক মহারাজের ভালবাসার কথা বুঝতে পারবে না সত্যই। মহারাজের এমনি টানই ছিল ভক্তদের উপর।

কে—বাবু। মহারাজই আমাদের সব। এমন কি, জপ ধ্যানও বেশী কর্তে পারি না। কেবল তাঁর অহেতুক কৃপার কথাই সর্বদা স্মরণ করে চোখের জলে ভাসি। এমন ভালবাসা আর পাব না।

মহাপুরুষজী। তোমাদের জপ-ধ্যানের দরকার কি? তোমরা তাঁর স্মরণ-মনন করছ, তাঁর অহেতুক কৃপার কথা ভাবছ। আবার কি? তোমাদের আর কিছু কর্তে হবে না। তিনি তোমাদের ভার নিয়েছেন, তিনিই তোমাদের সব দেখছেন। তোমরা সব আনন্দে থাক।

শ্রীঅমূল্যচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

## ( ২ )

## মাতৃস্বরূপ স্বামী সারদানন্দ

একদিন বেলুড় মঠে গিয়াছি। শুনিলাম শরৎ মহারাজ মঠে আসিতেছেন। খুব আনন্দ হইল—তাঁহার দর্শন পাইব।

পাশ্চাত্ত্য দেশ হইতে সন্তপ্রত্যাগত পূজনীয় অভেদানন্দ মহারাজ মঠে রহিয়াছেন, শরৎ মহারাজ মঠে পৌঁছিলেন। দুই গুরুভ্রাতা বহুক্ষণ উপরের তলায় পরস্পর আলাপে নিবিষ্ট রহিলেন। পরে শরৎ মহারাজ নীচে নামিয়া মঠের পশ্চিমের বারান্দায় পশ্চিমাস্য হইয়া বসিয়াছেন —সম্মুখে লম্বা টেবিল। সাধু, ভক্ত ও ব্রহ্মচারিগণ শরৎ মহারাজের সম্মুখে, দক্ষিণে ও বামে মণ্ডলী করিয়া দণ্ডায়মান। 'জুড়াইতে চাই, কোথা জুড়াই—শ্রীশ্রীমা যদি আজ দেহে থাকিতেন, ব্যস্ একবার দেখা হইলেই মনের সব অশান্তি, হাহাকার দূরীভূত হইত'— শরৎ মহারাজের সম্মুখে এবং দণ্ডায়মান সাধুভক্তগণের পশ্চাতে দাঁড়াইয়া এইরূপ ভাবিতেছি। তখন একজন সাধু আমায় ধাক্কা দিয়া বলিলেন, ও মশাই, শরৎ মহারাজ ডাকছেন। আমিও চাহিয়া দেখি, হাতছানি দিয়া মহারাজ আমাকে তাঁহার নিকট যাইতে ইশারা করিতেছেন। নিকটস্থ হওয়া মাত্র আমাকে বাহুদ্বারা বেষ্টন করিয়া স্বীয় অঙ্কে উপবেশন করাইলেন। আমার দেহের ভার মহারাজের পীড়াদায়ক হইবে মনে করিয়া সংকুচিত হইতেছিলাম, কিন্তু অনিচ্ছাসত্ত্বেও অবশ হইয়া তাঁহার ক্রোড়ে বসিয়া থাকিতে বাধ্য হইলাম।

হৃদয়াবেগে এবং চক্ষের জলে আপ্লুত। শত চেষ্টা করিয়াও ভাব বা হৃদয়াবেগ চাপিতে না পারিয়া বিহ্বল। তদুপরি টেবিলের উপরস্থিত পূজনীয় অভেদানন্দ মহারাজের আনীত নানাভাবপ্রকাশক ছবির একখানা বই টানিয়া আমাকে এবং সমুপস্থিত ব্রহ্মচারী ও বালক এবং ভক্তদিগকে কোন্ ছবির কি অর্থ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। নিজ অবস্থা যথাসাধ্য চাপিবার এবং লোকচক্ষু এড়াইবার জন্য যাহা মনে আসিতেছিল ছবির অর্থ তাহাই বলিতেছিলাম—আর সমবেত জনমণ্ডলী হইতে উচ্চ হাস্যধ্বনি হইতেছিল। এইভাবে প্রায় ২০।২৫ মিনিট আমাকে উপবিষ্ট থাকিতে হইয়াছিল। আজ অন্তর্যামী হইয়া যেন শরৎ মহারাজ শ্রীশ্রীমায়ের অভাব পূর্ণ করিয়া দিলেন!

* * *

একদিন তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বলিয়াছিলাম, মহারাজ, আশীর্বাদ করুন। তিনি বলিলেন, মায়ের এত আশীর্বাদ পেয়েছ, আবার কি আশীর্বাদ? তোমরা তাঁর প্রেমে ভেসে যাবে। এই 'ভেসে যাবে', 'ভেসে যাবে' বলিতে বলিতে তিনি মহা উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিলেন। এই গম্ভীর পুরুষকে পূর্বে কখন এইরূপ ভাবোদ্বেল হইতে দেখিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না। সে দিন দেখিলাম যেন "ভেসে যাবে" বলিতে বলিতে গঙ্গার শতধারার ন্যায় তিনি নিজেই নানারূপ আঙ্গিক বিকার সহ ভাসিয়া চলিলেন! কতক্ষণ পর আবার স্থির-গম্ভীর!

* * *

কথিত আছে, ভবনাথকে শ্রীশ্রীঠাকুর বলিয়াছিলেন—শনি-মঙ্গলবারে কিছু খাবার নিয়ে আসিস্, তোর অবিদ্যা খেয়ে ফেলব। কিন্তু ভবনাথ যখন খাবার নিয়া ঠাকুরের নিকট গেলেন তখন ঠাকুর তাহা খাইতে পারেন নাই। খাওয়ার চেষ্টা করিয়াও খাইতে না পারায় সজল নয়নে বলিয়াছিলেন—মা খেতে দিলে না। পূজনীয় শরৎ মহারাজকে একদিন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, সত্যসন্ধ ঠাকুরের পক্ষে এই সত্য রক্ষা করতে না পারাটা বিসদৃশ নয় কি? শরৎ মহারাজ উত্তরে বলিয়াছিলেন, করুণাবিগলিতহৃদয় ঠাকুর ভবনাথের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী হয়ে যা করবো বলেছিলেন স্বস্বরূপে অবস্থিত তিনি তা করলেন না। নিজের আইন নিজেই ভাঙলেন না। নরদেবলীলা—এমনিই!

* * *

সবে মাত্র শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ সম্পূর্ণ হইয়া পুস্তকাকারে বাহির হইয়াছে। আমার নিকট নিতান্ত আহ্লাদ-সহকারে শরৎ মহারাজ বলিলেন, লীলাপ্রসঙ্গ বের হয়েছে—এইবার কিনে নেও, পড়। ইহা পাঠে জীবের অশেষ কল্যাণ, তাই লোকে পড়ুক এই আগ্রহ। লেখক-অভিমান বিন্দুমাত্র তথায় নাই। খাঁটি যন্ত্র। বিন্দুমাত্র লেখক-অভিমান থাকিলে লোকে স্বরচিত বিষয় লইয়া এত আনন্দ প্রকাশ করিতে পারে না।

উদ্বোধনে একদিন শরৎ মহারাজের ঘরে বসিয়া আছি। খ্যাতনামা ২।১ জন লোকও উপস্থিত। তখন হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা না হইলেও কোন ব্যাপার নিয়া মতান্তর এবং মনান্তর উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে চলিতেছিল। একজন প্রশ্ন করিল—মহাশয়, হিন্দু-মুসলমান সমস্যা মিটিবে না কি? এ বিষয়ে আপনার অভিমত জানিতে ইচ্ছা করি। শরৎ মহারাজ বলিলেন, ঠাকুরের দিকে চাহিলেই সমস্যার সমাধান দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি বিবাদভঞ্জন; ধর্ম্মবিবাদ এবং গোঁড়ামি অদূর ভবিষ্যতে লোপ হইবে। প্রত্যেক ধর্মই এক অদ্বিতীয় তত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত। এই সত্যের উপর পৃথিবীর সমুদয় ধর্ম বেদান্তরূপ সনাতন ধর্মের বিভিন্ন সম্প্রদায় বিশেষরূপে পরিগণিত হইবে। একজন বলিলেন, মুসলমান ধর্মও? তিনি বেশ জোরের সহিত বলিয়াছিলেন, হাঁ, মুসলমান ধর্মও।

—শ্রীশ্রীশচন্দ্র ঘটক

# শিক্ষাপ্রসঙ্গে ভগিনী নিবেদিতা

শ্রীতামসরঞ্জন রায়, এম্‌-এস্‌সি, বি-টি

স্বাধীনতা-প্রাপ্তির পর আমাদের দেশে শিক্ষা-সংস্কারের যত আলোচনা, পরিকল্পনা সুরু হইয়াছে, যত ভিন্নমুখী প্রয়াসের সূত্রপাত এই-দিকে হইয়াছে বা হইতেছে, তাহার মধ্যে মনস্বিনী ভগিনী নিবেদিতার শিক্ষাবিষয়ক সুচিন্তিত অভিমত-সমূহ লইয়া বিশেষ সমালোচনার সার্থকতা আছে। কেবল কৃতজ্ঞতা-প্রকাশের দিক দিয়াই নহে, বাস্তব প্রয়োজন এবং কার্যকরী আবশ্যকতার দিক দিয়াও।

ভারতবর্ষের শিক্ষা-সংস্কৃতি, শিল্প-স্থাপত্য, সাহিত্য-দর্শন—এক কথায় ভারতীয় সভ্যতার সর্বাবয়ব উৎকর্ষের জন্ত নিজের দেহ, মন, তপস্তা, শিক্ষা সব কিছু—নিঃশেষে নিবেদন করিয়া, একান্তভাবে উৎসর্গ করিয়া ভগিনী নিবেদিতা নিজ 'নিবেদিতা-নাম সার্থক করিয়াছিলেন। তদীয় মহান গুরুর শিক্ষায় ও নির্দেশে এ-দেশের যুগ-যুগ-সঞ্চিত ভাল-মন্দ যাহা কিছু সংস্কার, যাহা কিছু উৎকর্ষ-অপকর্ষ তাহার সব কিছু লইয়া যে সামগ্রিক রূপটি, তাহাকে একান্ত-ভাবে তিনি ভালবাসিয়াছিলেন, আপনার বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। উহার বাহ্ অপরিচ্ছন্নতার অন্তরালে যে ভাবমন্দাকিনী ফল্গুপ্রবাহে বহিয়া যাইতেছে, উহার ইতস্ততোবিক্ষিপ্ত তীর্থাদিতে, শান্তরসাপ্লুত নিভৃত পল্লীগুলিতে—জাগতিক সম্পদ্‌-রিক্ত, 'সেকেলে' জীবনের জড়তার পশ্চাতে এখনো যে আধ্যাত্মিক চেতনা স্তিমিত ভাবে জাগিয়া আছে, ভগিনা নিবেদিতার শ্রদ্ধাকজ্জলিত দৃষ্টিতে তাহা যেমনভাবে ধরা পড়িয়াছিল আজিকার বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে দাঁড়াইয়াও অনেক ভারতীয় নেতৃবর্গের চক্ষে তাহা ধরা পড়ে নাই।

ফলে, কি শিক্ষাবিষয়ে, কি অন্তবিধ সাংস্কৃতিক বিষয়ে ভারতবর্ষের সকল কর্মপ্রয়াসকে স্বামী বিবেকানন্দের পদানুগ হইয়া তিনি সম্পূর্ণ ভারতীয় চক্ষে পরিবর্তিত ও পরিচালিত করিতে সচেষ্ট হইয়াছিলেন। তদীয় শিক্ষা-সম্পর্কিত রচনাদিতে, বাস্তব কার্যপদ্ধতিতে সর্বদা, সর্বত্র তাহারই প্রভূত পরিচয় পাইয়া আমরা বিস্মিত হই, আত্মসম্বিৎ এবং আত্মচেতনাও যেন লাভ করি।

## শিশুশিক্ষা ও কিণ্ডারগার্টেন

এখন হইতে কিঞ্চিন্ন্যূন অর্ধশতাব্দী পূর্বেকার কালের কথা আমরা বলিতেছি। ইউরোপীয় শিশুশিক্ষার ক্ষেত্রে পেষ্টেলজি ও তৎশিষ্য ফ্রোবেল প্রমুখ বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্‌গণ প্রবর্তিত কিণ্ডারগার্টেন-প্রথা তখন সেদেশে ব্যাপক ঔৎসুক্য ও চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিয়াছিল। শিশুশিক্ষার প্রতিষ্ঠানগুলিকে নানাবিধ ক্রীড়া-উপকরণ দিয়া, মনোবিজ্ঞান-সম্মত চিত্তাকর্ষক প্রণালীতে মনোরম 'শিশু-উত্থানে' পরিণত করিবার প্রয়াসে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষাজগৎ তখন মুখরিত। ফ্রোবেলের চারিদফা উপকরণ (Four Gifts) শিক্ষার সহিত খেলাকে যুক্ত করিয়া পেষ্টেলজির 'Psychologiz ing of education'-রূপ মহৎ কল্পনাকে বাস্তবরূপ দান করিয়া শিশু-শিক্ষার ক্ষেত্রে যুগান্তর আনয়ন করিতেছে। সেইজন্ত ভারতের শিশুশিক্ষার ক্ষেত্রেও সেই

প্রথার সুকৌশল প্রয়োগের প্রয়োজনীয়তা ভগিনী নিবেদিতা বিশেষভাবে উপলব্ধি করিয়াছিলেন। কিন্তু ভারতীয় শিশুর শিক্ষা-ব্যবস্থা কোন অবস্থাতেই বিদেশের অন্ধ, দাসসুলভ অনুকরণের মধ্য দিয়া গ্রথিত হইবে না। পাশ্চাত্ত্য দেশের মৌলিক গবেষণাদির যথাসম্ভব সহায়তা লইয়াও ভারতের মাটি হইতেই ভারতীয় শিশুর শিক্ষা-উপকরণ বা 'গিফ্‌ট' আহরণ করিতে হইবে—ইহাই নিবেদিতা স্থির করিয়াছিলেন।

পল্লীপ্রাণ এই ভারতবর্ষে—নাগরিক জীবনের জটিলতা ও কৃত্রিমতা হইতে দূরে বহুদূরে যে নিভৃত পল্লী—তাহার কামার, কুমার, জোলা, গোয়ালা প্রভৃতি সাধারণ লোকের দৈনন্দিন কর্মধারা লইয়া অনাড়ম্বর, শান্ত জীবন যাপন করিতেছে, যেথায় চাষী চাষ করিতেছে, তাঁতী তাঁত বুনিতেছে, কুলবধূরা চরকা কাটিতেছে—তাহারই বুকে শিশুশিক্ষার মহামূল্য উপকরণাদি প্রভূত পরিমাণে ছড়াইয়া আছে।

"The potter's wheel, the weaver's loom, the plough, the spinning wheel and the anvil are the eternal toys of the race. The child left to play in those streets, dramatising all the life about him, might easily make for himself an ideal Kinder-garten. The village itself is the true child garden."

নিবেদিতা বলিতেন, প্রকৃতি কখনো ভুল করে না—'Nature makes no mistake.' সুতরাং তাহারই অনুগত হইয়া শিক্ষাক্ষেত্রের দুশ্চর তপস্যায় আমাদিগকে অগ্রসর হইতে হইবে। একথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, বিদ্রোহী, নিয়মভঙ্গকারী সন্তানের বিরুদ্ধে তাহার নির্মম শাসক সে যেমন অব্যর্থভাবে প্রয়োগ করিয়া থাকে, তাহার অনুগত সন্তানের উপরও সে তেমনি অজস্রধারায় অকুণ্ঠ আশীর্বাদ বর্ষণ করিয়া থাকে। মাতৃক্রোড় পরিত্যাগ করিবার পর দিনে দিনে শিশু যখন নিসর্গের মুক্ত অঙ্গনে বর্ধিত হইতে থাকে তখন তাহার হস্তপদ-তাড়নায় প্রতিনিয়ত জল, মাটি, ধূলিবালি দিয়া কত কিছু সে গড়িয়া তোলে, ভাঙিয়া ফেলে। কত কীটপতঙ্গ, পশুপক্ষী তাহার রাজত্বে আশ্রয় পায়, বসতি-স্থাপন করে। আকাশ-গাত্রে সে ঘুড়ি উড়ায়, ধরিত্রীর অতলগহ্বরে দুর্লভ রত্নসন্ধানে হস্ত প্রবেশ করাইয়া দেয়। এইরূপে, স্নেহকোমল প্রকৃতি তাহার সমগ্র রত্নভাণ্ডার দিয়া মানবশিশুর অফুরন্ত কৌতূহল ও জিজ্ঞাসাকে নিবৃত্ত করে; তাহার অতুলনীয় শিশু-উদ্যানে প্রতিনিয়ত সে তাহাদিগকে হাত-ছানি দিয়া আহ্বান করে।

শিক্ষাব্রতিগণ কেবলমাত্র যদি সুকৌশলে সে আহ্বানকে কাজে লাগাইতে পারেন, যদি বাস্তব ক্ষেত্রের নীরসতাকে সঙ্গীতে, নৃত্যে, ছন্দে ও ক্রীড়ায় সরস ও সজীব করিয়া তুলিতে পারেন তবেই ভারতবর্ষের পল্লী-অঞ্চলে আদর্শ প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা হইতে পারে। যে-সকল প্রচলিত ও অপ্রচলিত ছড়া আমাদের মা, ঠাকুরমাদের কণ্ঠে কণ্ঠে গীত হইয়া লঘুক্রীড়িত মেঘের মতো হাল্কা ছন্দে বাঙলার নিভৃত পল্লীগুলির আকাশে বাতাসে সুপ্রাচীন কাল ধরিয়া ভাসিয়া বেড়াইতেছে, আজও তাহাদের সহায়তা লইলে বঙ্গশিশুর শৈশব-কল্পনা অতি সহজে প্রবুদ্ধ হইতে পারে, তাহার ভাষা-শিক্ষার প্রথম বুনিয়াদ সুদৃঢ়-ভাবে গ্রথিত হইতে পারে—ইহাই নিবেদিতার মত ছিল। আবার, নিজের আজন্ম-পরিচিত স্বাভাবিক পরিবেশে পরিবারের বা গ্রামের বয়োজ্যেষ্ঠগণ যে-সকল যন্ত্রপাতির সহায়তায়

জীবিকার্জন করিতেছে, নিত্যনূতন বস্তু নির্মাণ করিতেছে তাহাদেরই অনুকৃতিতে খেলাধূলার উপকরণাদি প্রস্তুত করিয়া দিলে—'Always learning by experience, always joy, ...and the hunger for more' এই নীতিতে ভারতবর্ষের কিণ্ডারগার্টেনও ঠিকভাবে গড়িয়া উঠিতে পারে। উহার ফলে, অবাঞ্ছিত বৈদেশিক প্রভাবমুক্ত, কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষালাভের মধ্য দিয়া ভারতীয় শিশু এমন সংযত ও নিষ্ঠাসম্পন্ন হইয়া উঠিবার সুযোগ পাইবে যে, শিক্ষালাভের প্রতি, দুরূহ কর্মের প্রতি, এমন কি অপ্রীতিকর কর্তব্যের প্রতিও কোন বৈরিভাব তাহার মধ্যে মাথা তুলিতে পারিবে না।

ফলকথা, শিশু-শিক্ষার বন্ধুর ক্ষেত্রে আধুনিক যুগের বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীর পূর্ণ প্রয়োগ সর্বথা বাঞ্ছনীয় হইলেও ভারতবর্ষের বালক-বালিকা ভারতবর্ষের জলবায়ুতেই বর্ধিত হইবে, সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া যে বিশেষ ভাবে ও চিন্তায়, যে-বিশেষ ট্র্যাডিশনে ও সংস্কৃতিতে তাহার সমাজব্যবস্থা, জাতীয় চেতনা পুষ্ট ও বর্ধিত হইয়াছে—তাহাদেরই সহায়তায় 'শিশু-উদ্যানের' স্বাভাবিক সৌন্দর্য এবং সরস সজীবতা সর্বথা বজায় রাখিতে হইবে—ইহাই ভগিনী নিবেদিতার মূল কথা ছিল। তিনি বলিতেন, —প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য জীবনধারার মধ্যে যে মৌলিক পার্থক্য শতযুগ-মন্বন্তর ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে, শিক্ষার অপেক্ষাকৃত স্বল্প-পরিসর ক্ষেত্রেও সেই পার্থক্য অনুস্যূত হইয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। দেখা যায় যে, প্রাচ্য মনীষিগণ তাঁহাদের সকল চেষ্টায়, সকল উদ্যমে শিশুর অন্তর-শতদলের পূর্ণবিকাশেই তৎপর। সত্যের সর্বাবয়ব উপলব্ধির জন্য জ্ঞানানুশীলনের কঠোর তপস্যায় আত্মনিয়োগ করিতে হইবে, 'আত্মানং বিদ্ধি'-রূপ চরমলক্ষ্যে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া শিক্ষার সকল পদ্ধতি ও উপকরণ নিয়মিত করিতে হইবে। শৈশব-চাপল্য ও ক্রীড়া-ঔৎসুক্যের মধ্য দিয়া মানসক্ষেত্রের যে পরিচয়টি উদ্‌ঘাটিত হয় তাহারই দিকে লক্ষ্য রাখিয়া শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে—ইহাই এ-দেশের প্রাচীন-যুগের শিক্ষাব্রতীদিগের আদর্শ ও লক্ষ্য ছিল। কিন্তু পাশ্চাত্ত্যদেশের শিক্ষাবিদ্‌গণ জীবনের উদ্দেশ্য এবং আদর্শের ভিন্নতা-হেতু শিশুকে ভিন্নভাবে গড়িয়া তুলিতে সচেষ্ট। অন্তর-জীবনের দিকে দৃষ্টি-নিক্ষেপ তাঁহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য নহে, বহিঃপ্রকৃতির উপর কর্তৃত্ব প্রয়োগ করিয়া তাহাকে স্বকীয় প্রয়োজনে নিয়োজিত করাই তাহাদের মূল লক্ষ্য। জ্ঞান সে যেমন আহরণ করিবে, বহিঃপ্রকৃতিকেও তেমনি সে জয় করিবে। 'How the child might be made to acquire knowledge and gain mastery of the world'—তাহাই শিক্ষাবিদ্‌গণ খুঁজিয়া বাহির করিবেন। আর, এই দুই ভিন্নমুখী দৃষ্টিভঙ্গী এবং চিন্তাধারার সুষ্ঠু ও সুন্দর সংমিশ্রণে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার প্রকৃত মিলনক্ষেত্র কোনদিন প্রস্তুত হইবে, কোনদিন উভয় ভূখণ্ডের বালক-বালিকারা পরস্পরের উত্তম বস্তুগুলি গ্রহণ করিয়া এক মহামানব-গোষ্ঠীর সন্ততিরূপে গড়িয়া উঠিবে—শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের পদাশ্রিত ভগিনী নিবেদিতার এইরূপ আশা ছিল, দূর ভবিষ্যতের কল্পনা ছিল।

## শিক্ষায় বৈষম্য ও স্বাদেশিকতা

ইংরেজশাসিত তৎকালীন ভারতবর্ষে শিক্ষার ব্যবস্থা-বৈষম্যের মধ্য দিয়া যে কাঞ্চন-কৌলীন্য ও বংশগত আভিজাত্যবোধ সঞ্জীবিত রাখা হইত তাহার সুদূরপ্রসারী কুফল-সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন হইয়া এখন হইতে কতকাল পূর্বে

ভগিনী নিবেদিতা শিক্ষাব্যবস্থায় সকল বৈষম্য ও বিভেদের বিরুদ্ধে তীব্র মন্তব্য করিয়াছিলেন। ভারতের শিক্ষাসংস্কারকগণ, রাজনৈতিক নেতাগণ যাহাতে এবিষয়ে যথোচিত সাবধানতা অবলম্বন করেন, তজ্জন্য তাঁহাদিগকে উদ্দেশ করিয়া তিনি বলিয়াছিলেন—

"If one class of the people derive all their mental sustenance from one set of ideas and the bulk of the population from something else—unity (national) cannot be made effective. But if all people talk the same language, learn to express themselves in the same way, to feed their realisation upon the same ideas, if all are trained and equipped to respond in the same way to the same forces, then our unity will stand self-demonstrated, unflinching."

আজ এতবৎসর পরে স্বাধীন ভারতবর্ষের বুকে দাঁড়াইয়া এই অতি মূল্যবান্ কথাগুলি বিশেষভাবে চিন্তা করিয়া দেখিবার দিন যেন আমাদের আসিয়াছে। মনে হইতেছে, স্বাধীন ভারতের বহুবিধ সমস্যা-জটিলতার মধ্যে ভাষাগত জটিলতা যে সঙ্কীর্ণ প্রাদেশিক মনোভাব সৃষ্টি করিয়াছে—শিক্ষার ব্যবস্থাবৈষম্য-হেতু শহর এবং পল্লী-অঞ্চলে আজ যে বিচ্ছিন্নতা ও খণ্ডতা আত্মপ্রকাশ করিয়াছে তাহারই দূর সম্ভাবনা সূক্ষ্ম কল্পনায় অনুভব করিয়াই যেন নিবেদিতা অত বৎসর পূর্বেই ঘোষণা করিয়াছিলেন:

"যদি কৃত্রিম ও মনুষ্যরচিত ভেদরেখা আমাদের মধ্যে মাথা উঁচু করিয়া না দাঁড়ায়, যদি বিচ্ছিন্নতার ধূম্রজালে আমরা পথভ্রষ্ট না হই—তবে বিহার, বাঙলা, উড়িষ্যা প্রভৃতি প্রতিবেশী প্রদেশগুলি অতি সুন্দরভাবে একই ভাষায় কথা কহিয়া, একই হরপে গ্রন্থরচনা করিয়া, একই শাস্ত্রসম্পদ হইতে ভাব আহরণ করিয়া অপূর্ব ঐক্য ও সংহতির মধ্যে গড়িয়া উঠিতে পারে। তজ্জন্য অতি পবিত্র কর্তব্য হিসাবে, সেক্রেড ডিউটি হিসাবে শিক্ষাবিস্তারের কাধে আমাদিগকে অগ্রসর হইতে হইবে। মনে রাখিতে হইবে যে, প্রকৃত শিক্ষাই সর্বব্যাধির মহৌষধি। ইউরোপের বিভিন্ন দেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার পর তিন-চারি বৎসর কালের জন্য যেমন বাধ্যতামূলক সামরিক শিক্ষার ব্যবস্থা আছে—ভারতবর্ষের ব্যাপক নিরক্ষরতা এবং অনৈক্যের ভাব দূরীকরণার্থ তেমনি শিক্ষাব্রতী সেনানীদল বা আর্মি-অব এডুকেশন গঠন করিতে হইবে।"

'Without men's lives no seed of the mind germinates.'—সুতরাং, বিরাট এ-দেশের ব্যাপক নিরক্ষরতা দূর করিতে, মানুষে মানুষে ঐক্য-প্রতিষ্ঠা করিতে শিক্ষিত জনগণের কতকাংশকে অন্ততঃ নিজেদের সুখ-সুবিধা, আরাম-বিলাস, স্বার্থচিন্তা বিসর্জন দিয়া অগ্রসর হইতে হইবে এবং দেশের দূর-দূরান্তরে, সর্বশ্রেণীর নরনারীর দ্বারে দ্বারে বৃহত্তর ও মহত্তর জীবনকথা বহন করিয়া লইয়া যাইতে হইবে। তাঁহার কথাই ছিল সেজন্য—"We must demand from them (our children) sacrifices for India, *bhakti* for India, learning for India.···India for the sake of India. We must teach them about India, in school and at home··· burning love, love without a limit."

কি শিশুশিক্ষায়, কী উচ্চতর শিক্ষায়—সর্বদা, সর্বক্ষেত্রে এই অনন্ত দেশপ্রেম, অনির্বাণ দীপশিখার মত যাহাতে প্রত্যেক ভারতবাসীর অন্তরে দেদীপ্যমান থাকে তেমন ভাবে সকল

শিক্ষা-ব্যবস্থা গ্রথিত করিতে হইবে—এই তাঁহার সুচিন্তিত অভিমত ছিল।

"Geographical ideas must be built up first through the ideas of India".…"The sense of historic sequence must also be trained through India." সাহিত্য, বিজ্ঞান, বহির্জগতের গতি-প্রগতির অভিজ্ঞতা সব কিছুই এই অকৃত্রিম ও সুগভীর দেশপ্রেমের সুদৃঢ় বুনিয়াদের উপর গড়িয়া উঠিবে। সার্বভৌম উদারদৃষ্টি ও বিশুদ্ধজ্ঞান—যাহাকে নিবেদিতা 'Intellectual Mukti' বলিয়া অভিহিত করিয়াছিলেন তাহারও বিকাশ এই অকপট দেশাত্মবোধ হইতেই জাগ্রত হইবে। যাঁহাদের চক্ষে জননী ও জন্মভূমি সত্যই 'স্বর্গাদপি গরীয়সী' বলিয়া প্রতিভাত হইয়াছেন, যাঁহাদের শিক্ষালাভের ক্রমবিকাশের মধ্য দিয়া, শৈশব-স্মৃতির স্নিগ্ধ মাধুর্যের ভিতর দিয়া এই বোধটি অন্তরে জাগ্রত হইয়াছে যে—"the face of God shines brightest and His name sounds sweetest in the village of his birth"…কেবলমাত্র তাহাদেরই দ্বারা দেশ ধন্য হইবে, জননী কৃতার্থ হইবেন—ইহাই নিবেদিতার সিদ্ধান্ত ছিল। অথচ, শিক্ষায় কোন জাতিবিভাগ নাই, শিল্পের সূক্ষ্ম উৎকর্ষে, জ্ঞানসাধনার বিশুদ্ধক্ষেত্রে, সুর-সঙ্গীতের নিঃসীমতায় 'দেশী', 'বিদেশী', 'জাতীয়', 'বিজাতীয়' বলিয়া কোন ভেদাভেদ নাই—ইহাও নিবেদিতা পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করিতেন। তথাপি, জাতীয় ভাবধারা ও সংস্কৃতির মধ্যে, যুগযুগ-প্রচলিত পুরাণ-আখ্যায়িকার গল্প-গুঞ্জনের স্বাভাবিক পরিবেশের মধ্যে সকল শিক্ষার সূত্রপাত ও ক্রমবিকাশ হইবে ইহা তাঁহার সুস্পষ্ট নির্দেশ ছিল। আমেরিকার শিশু যেমন সত্যানুসন্ধানের উজ্জ্বল আদর্শটি জর্জ ওয়াশিংটন অথবা এব্রাহাম লিঙ্কনের নিকট হইতে গ্রহণ করিবে—ভারতীয় শিশুও তেমনি মহামতি ভীষ্মের অথবা শ্রীরামচন্দ্রের জীবনাখ্যায়িকা হইতে সেই আদর্শ আহরণ করিবে। ইংলণ্ডের শিক্ষা-ব্যবস্থায় শেক্সপীয়রের রচনাবলী যেমন বৃহৎ মর্যাদা লাভ করিবে, ভারতীয় শিশুর শিক্ষাব্যবস্থায় রামায়ণ-মহাভারতও তদনুরূপ মর্যাদা লাভ করিবে সন্দেহ নাই। একথা আমাদিগকে সর্বথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, নিছক অনুকরণে জীবন-গঠন হয় না, বলবানের পশ্চাতে দাসজাতি-সুলভ মনোবৃত্তি লইয়া চলিতে চাহিলে বিড়ম্বনা ও গ্লানি ভিন্ন আর কিছু লাভ হয় না। রাস্কিনের উক্তি উদ্ধৃত করিয়া নিবেদিতা তাই বলিতেন—"Imitation is like prayer, done for love it is beautiful, for show horrible."

সেইজন্য শিক্ষার অন্যান্য ক্ষেত্রের তো কথাই নাই, যে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ভারতবর্ষ পাশ্চাত্ত্য জগতের বহু বহু পশ্চাতে পড়িয়া আছে এবং যেখানে পাশ্চাত্ত্যের সহায়তা তাহার অপরিহার্য, সেই বিজ্ঞান-ক্ষেত্রেও ভারতীয় শিক্ষার্থীকে ভিক্ষুকের মত পাশ্চাত্ত্যের দরজায় হাত পাতিতে তিনি পুনঃ পুনঃ নিষেধ করিতেন। বলিতেন, ভারতীয় সন্তানগণ যে-কোন অবস্থায়, যে-কোন উদ্দেশ্য লইয়া পাশ্চাত্ত্য দেশে গমন করুক—ভারতের বৃহত্তর স্বার্থ ও মর্যাদার কথা তাহারা যেন কখনো বিস্মৃত না হয়। শিক্ষালাভের প্রতিটি মুহূর্তে গভীর স্বাজাত্যাভিমানে উদ্বুদ্ধ থাকিয়া তাহারা যেন এই অমূল্য কথাটি স্মরণে জিয়াইয়া রাখে যে—"They are inheriting and working out the greatest ideals of the Indian past."

বিত্তশালী ও প্রভাবশালী ব্যক্তিগণ আজিকার মত সেকালেও উচ্চ সরকারী পদলাভের জন্য

কিংবা অন্য কোন সুযোগ-সুবিধার জন্য অনেক সময় নিজ নিজ সন্তান-সন্ততিদিগকে বিদেশে প্রেরণ করিতেন। জাতীয় স্বার্থের দিক হইতে উহার শোচনীয় ব্যর্থতা ও অপচয় ভগিনী নিবেদিতার মনে গভীর ক্ষোভ জাগাইয়া তুলিত। তীব্র বেদনার ভাবে তাই তিনি বলিতেন—হায়, নিজ দেশ ও জাতির যুগ-যুগসঞ্চিত ভাবসম্পদের সহিত যে পরিচিত হইল না, জন্মভূমির সরস-সজীবতায় জীবনের বুনিয়াদ যে-জন গ্রথিত করে নাই, বিদেশের শত বিরুদ্ধতার মধ্য হইতে সে কোন্ সম্পদ আহরণে সমর্থ হইবে? স্বকীয় সম্পদকে যে-ব্যক্তি ভালবাসে না, নিজ উত্তরাধিকার-বিষয়েই যে অবহিত নয়—তাহাকে তো অন্যে পূর্ণাঙ্গ মানুষ করিয়াই গ্রহণ করিবে না—"He will never be received by any people as anything more than half a man."

কাজেই ঐ শোচনীয় ব্যবস্থার সম্যক পরিবর্তন করিয়া—তৎ-পরিবর্তে ভারতীয় আদর্শে সুপ্রতিষ্ঠিত, ভারতের অগণ্য নরনারীর বৃহত্তর স্বার্থে সম্যক্ অবহিত, সত্যানুসন্ধানী ভারতীয়-গণই কেবল পাশ্চাত্যদেশে গমন করিবে—ইহাই তাঁহার অভিমত ছিল। তিনি বলিতেন, "Two things will contend in him... the passion for truth and the yearning over his own people in their ignorance. The name of science may be foreign; but the life, the energy, the holiness of dedication will be Indian."

## স্ত্রীশিক্ষা

স্ত্রীশিক্ষার ক্ষেত্রেও যে-আদর্শ নিবেদিতা প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিয়াছিলেন এবং যে-পদ্ধতি নিজ বিদ্যালয়ে তিনি অনুসরণ করিতে প্রয়াসী ছিলেন, ভারতবর্ষের প্রাচীন সভ্যতা ও সংস্কৃতির মধ্যেই তাহাদের উৎসমুখ নিহিত ছিল। অতি প্রাচীন কাল হইতে যে-সকল মহীয়সী নারী এদেশের মাটিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, যাঁহাদের চরিত্র-মধুরতা ও বীর্যশক্তি, ব্রীড়া ও নির্ভীকতা নারী-চরিত্রের অতুলনীয় আদর্শ মানবসমাজে স্থাপন করিয়াছিল—কেবলমাত্র পাশ্চাত্য জীবনের চাকচিক্যের মোহে, কেবলমাত্র তথাকথিত প্রগতির মায়ায় তাহাদিগকে 'সেকেলে' বলিয়া দূরে সরাইয়া রাখিবার একান্ত বিরোধী ছিলেন নিবেদিতা। সীতা, সাবিত্রী প্রমুখ প্রাচীন ভারতের মহীয়সী নারীগণের মধ্যে যে কমনীয়তা ও ধৈর্য, যে লজ্জাশীলতা ও সাহস, যে পবিত্রতা ও প্রেম যুগপৎ মূর্ত হইয়াছিল, সে দুর্লভ আদর্শটিকে বিসর্জন দিয়া ভারতবর্ষ পাশ্চাত্য সমাজের নির্লজ্জ বিলাসের পশ্চাতে পল্লবগ্রাহীর বেশে ধাবিত হইবে—এ চিন্তাও যেন নিবেদিতার কাছে অসহনীয় ছিল।

"Have the Hindu women of the past been a source of shame to us that we should hasten to discard their old-time grace and sweetness, their gentleness and piety, their tolerance and child-like depth of love and pity, in favour of the first crude product of western information and social aggressiveness?"—এই তাঁহার প্রশ্ন ছিল।

আধুনিক যুগের দ্রুত পরিবর্তনশীল অবস্থার সহিত সমতা রক্ষা করিয়া বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে সকল ব্যবস্থা ও পদ্ধতি আমরা নিয়মিত করিব সত্য, কিন্তু কোন অবস্থায়ই শিক্ষার জাতীয় আদর্শটিকে আমরা পরিত্যাগ করিব না, মূল

লক্ষ্যটিকে বিস্মৃত হইব না এই তাঁহার অভিমত ছিল। তাঁহার কথাই ছিল সেজন্য :

"Granted that a more arduous range of mental equipment is now required by women, it is nevertheless better to fail in the acquisition of this, than to fail in the more essential demand made by the old type training in character.···All education worth having must first devote itself to the developing and consolidating of character and secondarily concern itself with intellectual accomplishment."······আর কেবল মুখের কথাই নহে, এখন হইতে প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্বে ঐ আদর্শটিকে সম্মুখে রাখিয়াই স্ত্রীশিক্ষার দুরূহ বন্ধুরতার বাস্তবক্ষেত্রে নির্ভীক অন্তরে তিনি প্রবেশ করিয়াছিলেন। কলিকাতার বাগবাজার অঞ্চলে যে বালিকা-বিদ্যালয় অধুনা 'নিবেদিতা বিদ্যালয়'-নামে সর্বজনপরিচিত, তাহার প্রতিষ্ঠাকালে তাই তিনি বলিয়াছিলেন—কলিকাতার উপকণ্ঠে গঙ্গাতীরে চল্লিশটি বিধবা ও অনাথা বালিকার শিক্ষাব্যবস্থার জন্য একটি বিদ্যালয় আমরা প্রতিষ্ঠা করিতেছি। ভারতীয় আদর্শের মূর্তপ্রতিমা শ্রীরামকৃষ্ণলীলাসঙ্গিনী দেবী সারদামণির পূত আশীর্বাদ শিরে লইয়া এই বিদ্যালয় তাহার দুরূহ যাত্রার সূত্রপাত করিবে। কিণ্ডারগার্টেন-প্রণালীতে এখানে প্রাথমিক শিক্ষা দেওয়া হইবে। যে ব্রতকথা, অর্থহীন অথচ শ্রুতিমধুর ছেলেভুলান ছড়া স্মরণাতীত কাল হইতে এ-দেশের ছেলেমেয়েদের সম্মুখে রূপকথার মায়াপুরীর রহস্যদ্বার উন্মুক্ত রাখিয়াছে—তাহাদের সহায়তা ও ব্যবহার এখানকার শিক্ষাব্যবস্থায় অপরিহার্য বলিয়া গৃহীত হইবে। শিশিরস্নাত শরৎকালের স্নিগ্ধ প্রভাতে—অম্লান আকাশের নীচে বাঙলার পল্লীবালিকারা স্মরণাতীত কাল হইতে যে শুচিশুভ্রতায় শিবপূজার অনুষ্ঠান করিয়া আসিতেছে, অতসীফুলের স্তবক সাজাইয়া কালদীঘির জলে ভাসাইতেছে, লক্ষ্মীব্রতের, ষষ্ঠীব্রতের পুণ্য-ব্রতকথা শুনিতেছে—তাহারই অনুরূপ পরিবেশ এই বিদ্যালয়ে ফুটাইয়া তুলিতে সর্বদা সজাগ ও সচেষ্ট থাকিব।

মাতৃভাষা, গণিত, প্রাথমিক বিজ্ঞান ও ইংরেজী ইহারা শিক্ষা করিবে। আর সেই সঙ্গে সঙ্গে যে-সকল শিল্পকার্যের সহিত এদেশের মেয়েরা মোটামুটি ভাবে পরিচিত, সেই সকল শিল্পকার্যও আধুনিক প্রণালীতে তাহারা শিক্ষা করিবে। আত্মোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের জীবিকার্জনের পথও তাহা হইলেই তাহারা খুঁজিয়া পাইবে।

'To give education (not instruction only) to orthodox Hindu girls in a form that is suited to the needs of the country'—ইহাই আমাদের বিদ্যালয়ের মূল লক্ষ্য হইবে। এখান হইতে ক্রমশঃ কেবল যে আদর্শ গৃহিণী হইবার যোগ্যতা লইয়াই বালিকাগণ বাহির হইবে তাহাই নহে—আদর্শ স্ত্রীশিক্ষা-বিস্তারের সুমহান দায়িত্ব স্কন্ধে লইয়া সমগ্র জীবন উৎসর্গ করিবার মতো শক্তিময়ী নারীও এখান হইতেই কালে বাহির হইবে।

* * *

## কারিগরি শিক্ষা

আজ বৃত্তি-কেন্দ্রিক বুনিয়াদী শিক্ষার বহুল-প্রচার ও প্রবর্তনের দিনে কারিগরি শিক্ষা ও পুঁথিগত শিক্ষা কাগজে-কলমে কতকটা সমমর্যাদা লাভ করিয়াছে সত্য, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তাহাদের সমমর্যাদা-লাভের দিন এখনো অনাগত। অথচ,

শিক্ষার সর্বাঙ্গীণ সার্থকতার পথে—উহার একান্ত প্রয়োজনীয়তা শিশুর দেহ ও মনের যুগপৎ উৎকর্ষসাধনের দিক হইতে তাহার অনস্বীকার্য উপযোগিতা—এখন হইতে প্রায় অর্ধশতাব্দী-পূর্বে ভগিনী নিবেদিতা সম্যক্ উপলব্ধি করিয়া তদীয় বিদ্যালয়ের পাঠ্যতালিকায় কারিগরি শিক্ষার স্থান নির্দেশ করিয়াছিলেন। কিন্তু ভারতবর্ষের ব্যাপক দারিদ্র্যের মধ্যে, বিদেশী শাসকবর্গের স্বাভাবিক ঔদাসীন্যের মধ্যে ইউরোপ-আমেরিকার মত বিপুল উপকরণ-সম্ভার সংগ্রহ করা যে এদেশে একান্তই অসম্ভব তাহাও তিনি বুঝিয়াছিলেন। কাজেই, অত্যন্ত সাধারণ-ভাবে—বাহ্যিক আড়ম্বর ও আতিশয্য একেবারে বর্জন করিয়াই এদেশে কারিগরি শিক্ষার প্রবর্তন করিতে তিনি তৎপর হইয়াছিলেন। বস্তুতঃ, কারিগরি শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা এবং সত্যিকার মূল্য নিরূপণ করিতে অগ্রসর হইয়া তখনকার সর্বব্যাপী অনগ্রসরতার যুগেও যেভাবে তিনি চিন্তা করিয়াছিলেন, যে নির্ভীক ও স্বচ্ছ ভবিষ্যদ্‌দৃষ্টির পরিচয় দিয়াছিলেন—পরবর্তী যুগে একমাত্র মহাত্মা গান্ধী ভিন্ন অন্য কোন ভারতীয় মনীষী তাহা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন কি না আমরা জানি না।

নিবেদিতা বলিতেন—মানব-দেহের স্নায়বিক গঠনের সহিত মস্তিষ্কের সম্বন্ধ এত নিবিড় ও ঘনিষ্ঠ যে, একটিকে উপেক্ষা করিলে অন্যটিও তদনুরূপভাবে স্বতঃই উপেক্ষিত হইবে। বিশেষজ্ঞ-গণের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় ইহাই প্রতিপন্ন হইয়াছে যে—'Other things being equal, a boy who has had manual training is in all ways the intellectual superior of him who has not.'

ঐভাবে শিক্ষাপ্রাপ্ত বালক-বালিকাগণের মধ্যে যে আত্মবিশ্বাস, যে পর্যবেক্ষণশক্তি এবং সাহস-সঞ্জীবতা ধীরে ধীরে জাগ্রত হয়, কেবল পুস্তকী বিদ্যার মধ্য দিয়া কোন ছাত্রের মধ্যে কখনো তাহা জাগ্রত হয় না।

'He has daring and originality of purpose. And above all his character is based on the fundamental habit of adding deed to dream, act to thought, proof to inference.'·· ইহা অন্যত্র, অন্যব্যবস্থার মধ্যে লভ্য হইতে পারে না।

সেইজন্য, তাঁহার নিজ বিদ্যালয়ের প্রারম্ভ হইতেই—আমেরিকার তদানীন্তন কারিগরি শিক্ষার পাঠ্যতালিকার অনুকরণে চারি বৎসরের পাঠক্রম প্রবর্তন করিতে তিনি প্রয়াসী হইয়াছিলেন।

এইরূপে, বাঙলার, তথা ভারতবর্ষের, শিক্ষা-সংস্কার-সম্পর্কে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভগিনী নিবেদিতা স্বীয় মতামত যতদূর সম্ভব কার্যকর ভাবে প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং তাহাদের উপযোগিতা ও মূল্য সেদিনকার পরাধীনতার যুগেও যেমন গভীর ছিল, আজ স্বাধীনতা-প্রাপ্তির পরও ঠিক তেমনি রহিয়া গিয়াছে, হয়ত ক্ষেত্রবিশেষে বর্ধিতও হইয়াছে বলিয়া মনে করি।

আমাদের আজিকার শিক্ষাসংস্কার-পরিকল্পনায় ও প্রচেষ্টায় তাঁহার ইচ্ছা ও আকাঙ্ক্ষা যথাসম্ভব বাস্তবে রূপায়িত হউক, আর যাঁহারা আজ দেশের শিক্ষাব্যবস্থা পরিচালিত করিতেছেন, নব নব সংস্কারের মধ্য দিয়া স্বাধীন-ভারতের ভবিষ্যৎ নাগরিক গড়িয়া তুলিবার দায়িত্ব গ্রহণ করিতেছেন, তাঁহাদের দৃষ্টি এইদিকে আকৃষ্ট হউক—ইহাই আমাদের ঐকান্তিক আকাঙ্ক্ষা।

# সমালোচনা

**পাশুপত**—শ্রীঅতুলানন্দ রায়, বিদ্যাবিনোদ, সাহিত্য-সরস্বতী-প্রণীত। প্রকাশক—অরোরা ষ্টোর্স এণ্ড্ এজেন্সিস্, জলপাইগুড়ি এবং ১৪, হেয়ার ষ্ট্রীট্, কলিকাতা—১। পৃষ্ঠা ১২৬; মূল্য তিন টাকা।

অর্জুন পাশুপত অস্ত্র লাভ করিবার জন্য কঠোর তপস্যা করেন। তাঁহার ঐকান্তিক আরাধনায় তুষ্ট হইয়া মহাদেব তাঁহাকে পাশুপত অস্ত্র দান করিলেন। মহাভারতের এই বিষয়বস্তু অবলম্বন করিয়া মহাকবি ভারবি কিরাতার্জুনীয়-কাব্য প্রণয়ন করেন। বর্তমান গ্রন্থকারও ঐ ঘটনাকে বঙ্গভাষায় নাট্যরূপ দান করিয়াছেন। কাব্য-প্রয়োজনে ভারবি মহাভারতের মূল ঘটনাকে সম্পূর্ণ বজায় রাখেন নাই, নাট্যপ্রয়োজনেও কি কালিদাস কি শেক্সপিয়র শকুন্তলা বা জুলিয়াস্ সিজার-প্রণয়নে ইতিহাস বা মূল-গ্রন্থের সম্পূর্ণ অনুবর্তন করেন নাই। বর্তমান লেখক একাধিক নাটক লিখিয়া হাত পাকাইয়া-ছেন; সুতরাং মূলের পরিপ্রেক্ষিতে নাটকীয় অভিনবত্ব-সৃষ্টির অধিকার তিনি যথেষ্টই অর্জন করিয়াছেন। আমরাও তাহাই চাই। প্রাচীনের মহনীয়তা নবপরিবেশকে আপন সৌগন্ধ্যে আমোদিত করুক।

দুর্জয় দানবরাজ নিবাত-কবচ পাশুপত অস্ত্রে নিহত হইলেন—নিহন্তা তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুন। দৈবী সম্পদের নিকট আসুরী সম্পদের চূড়ান্ত পরাভব। নিবাতের দানবীয়-দম্ভ-রূপায়ণ বর্তমান নাটকের সার্থকতায় অনেকটুকু সহায় হইয়াছে। আবার দানবমহিষী ঘৃতাচী-চরিত্র কি অপরূপ সম্ভ্রমহিমায় বিমণ্ডিত! প্রচণ্ড পাপের সহিত বৈপরীত্য-রক্ষার জন্য পুণ্যপ্রভার সহাবস্থান ভারতীয় পুরাণ-সাহিত্যকে যে বিশিষ্টতা দান করিয়াছে, তাহার যথার্থ সাহিত্যিক মূল্য আমরা দিতে পারি নাই। পুরাণকথার নাট্যরূপ যে অতি আধুনিকগণও উপভোগ করিতে পারেন তাহা নাটকখানি আদ্যন্ত পাঠ করিয়া প্রত্যয় হইয়াছে; বিন্দুমাত্র তো নাসিকা-কুঞ্চন করি নাই।

লেখকের দোষ নাই একথা বলি না। সমালোচকের কঠোর কর্তব্যও পালন করিতে হইবে। এই স্বল্পপরিসর বইখানিতে এত ভুল-ভ্রান্তি হওয়া অনুচিত। পাতায় পাতায় বর্ণাশুদ্ধি, প্রসিদ্ধ সংস্কৃত-শ্লোকের বিড়ম্বনা বড়ই পীড়াদায়ক। সাহিত্য-সৃষ্টিতে রসাগ্রহই যথেষ্ট নয়, বস্তুনিষ্ঠাও অনুপেক্ষণীয়। বিমান, নালীক, বৃহন্নালীক প্রভৃতি সম্বন্ধে কি আর বলিব? প্রাচীন ভারতের মনীষার কতটুকুই বা আমাদের গোচরীভূত হইয়াছে? কালো হ্যয়ং নিরবধিবিপুলা চ পৃথ্বী—প্রাচীন ভারতের শক্তিসাধনার নব নব আবিষ্কৃতি অনেক আপাত অসম্ভবকে সম্ভব করিয়া তুলিবে, অনেক অবি-শ্বাস্যকে বিশ্বাস্য করিয়া তুলিবে। নাটকখানি পাঠ করিয়া সত্যই বিমল আনন্দলাভ করিলাম।

**Shrutanjali**—by Indira Devi. Published from Sri Aurobindo Ashram. Pondicherry. Pages—310. Price: Rs 5/-.

পণ্ডিচেরী শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমের আশ্রমিকা শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী যে সকল হিন্দি ভজন রচনা করিয়াছেন তাহাদের সংগ্রহগ্রন্থ এই 'শ্রুতাঞ্জলি'। লেখিকার কতকগুলি ইংরেজী কবিতাও এই সংগ্রহে স্থান পাইয়াছে। শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার রায় হিন্দী কবিতাগুলির বাংলা ও

ইংরেজী অনুবাদ করিয়াছেন। গ্রন্থের মুখবন্ধে বলা হইয়াছে, ভগবদ্‌ভাবাবিষ্টা হইয়া লেখিকা কবিতা প্রণয়ন করেন। লেখিকার আবেগময় ভগবৎ-প্রাণতার সাক্ষ্য দান করিতেছে তাঁহার প্রত্যেক অনবদ্যসুন্দর ভাবাঞ্জলি। কবিতাগুলি পড়িয়া পরমসাধিকা মীরাবাঈ-এর ভজনাবলীর কথা মনে পড়ে। অনুবাদের মাধ্যমেও মূল কবিতার মাধুর্য সুন্দরভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। লেখিকা বলিতেছেন—

চন্দন বনুঁ ন মৈঁ হরি · সাথে তিলক সুহায়ে
মাটী ভলী বাটকী ··· চরনন হিয়ে লগায়ে।

অনুবাদ—

চন্দন হ'য়ে চাই না বন্ধু, রাজিতে শিরোভূষণে।
ধূলি হব আমি পথের—হৃদয়ে ধ'রতে রাঙা চরণে॥

বহুত হুই অব আন সঁভালো,
দুইকা যহ ভেদ মিটালো,
অপনী বিগড়ী আপ্ বনালো
আও হরি, সুখদায়ী।

অনুবাদ—

ক্লান্তের নাথ, শ্রান্তি ঘুচাও,
তুমি-আমি-ভেদ দাও ভেঙে দাও,
ক্ষমি শত দোষ মোরে গড়ে নাও,
মনোবাসী এসো মনে।

ইংরেজী অনুবাদেও শ্রদ্ধেয় অনুবাদকের কৃতিত্ব সুস্পষ্ট।

অধ্যাপক শ্রীজ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র দত্ত, এম্-এ

---

# শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

**বেলুড় মঠে আচার্য শঙ্কর ও ভগবান বুদ্ধদেবের জন্মতিথি-পালন**—গত ১৮ই বৈশাখ (শুক্লা পঞ্চমী) এবং ২৮শে বৈশাখ (বৈশাখী পূর্ণিমা) বেলুড় মঠে যথাক্রমে শ্রীশঙ্করাচার্য এবং ভগবান বুদ্ধদেবের জন্মতিথি প্রতি বৎসরের মত যথারীতি উদ্‌যাপিত হইয়াছে। উভয় দিনই সন্ধ্যায় নাটমন্দিরে সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারিগণ সমবেত হইয়া এই মহান আচার্যদ্বয়ের জীবনী ও শিক্ষা-সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছিলেন।

**পত্রিকা-যুগান্তর উদ্বাস্তু ফণ্ড শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনকে সমর্পণ**—পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুদের সাহায্য-কল্পে অমৃতবাজার পত্রিকা ও যুগান্তর একত্রে ১৯৫০ সালের মার্চ মাসে একটি সাহায্য-ভাণ্ডার খুলেন। এই ফণ্ডে সংগৃহীত মোট ১,৯৭,৫০৪৮৬ পাই উক্ত সাহায্যভাণ্ডার-কমিটির অধ্যক্ষ শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ গত ৮ই এপ্রিল বিকালে পত্রিকা-গৃহে আহূত একটি অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানে রাজ্যপাল ডক্টর হরেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের হাত দিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনকে সমর্পণ করিয়াছেন। মিশনের প্রতিনিধি স্বামী শাশ্বতানন্দ রাজ্যপাল মহোদয়ের নিকট হইতে চেকখানি গ্রহণ করেন। অনেক গণ্যমান্য নাগরিক সভায় উপস্থিত ছিলেন। মিশন এই টাকা তাঁহাদের বেলুড়স্থিত সারদাপীঠ শিল্প-শিক্ষাকেন্দ্রে পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তু ছাত্রদের কারিগরি শিক্ষার জন্য ব্যয় করিবেন।

**শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন সংস্কৃতিভবন, কলিকাতা**—এই প্রতিষ্ঠানের সাংস্কৃতিক কার্যাবলী ভারতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংস্কৃতির উপর

শ্রদ্ধাশীল নরনারীগণকে একটি সমঞ্জস ভাবসমন্বয়ের আদর্শের প্রতি আকৃষ্ট করিতেছে। স্ব স্ব বিষয়ে বিশেষজ্ঞ অথচ উদার সার্বজনীন কল্যাণ-প্রদ ভাবাদর্শে অনুপ্রাণিত বিদ্বদ্‌বর্গ এই সংস্কৃতি-ভবনের বিভিন্ন আলোচনায় সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়া থাকেন।

গত এপ্রিল মাসে শনিবাসরীয় বক্তৃতাগুলির বিষয় ছিল :—

( ১ ) গতানুদর্শনে এমার্সন্ ও ভারত ( Emerson and India in Retrospect )

বক্তা—কুর্ট এফ্ লাইডেকার, এম্-এ, পিএইচ্-ডি

সভাপতি—অধ্যাপক শ্রীসরোজকুমার দাস, এম্-এ, পিএইচ্-ডি

( ২ ) লেনার্দো দা ভিন্‌চি ( Leonardo de Vinci. )

বক্তা—মার্সেলো মোচি ( কলিকাতাস্থ ইটালীয় রাজদূত )

সভাপতি—শ্রীঅবনীচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

( ৩ ) সাংস্কৃতিক মূল্যের পুনর্নির্ধারণ ( Cultural Revaluation )

বক্তা—শ্রীরোহিত মেটা

সভাপতি—অধ্যাপক শ্রীকালিদাস নাগ, এম্-এ, ডি-লিট্

১লা মার্চ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মদিবস-উপলক্ষে আহূত একটি বিশেষ সভায় আলোচনা-প্রসঙ্গে মিসেস সি কে হাণ্ডু, এম্-এ বলেন—

"আভ্যন্তর পবিত্রতা বাহ্য নিয়মানুবর্তিতা হইতে অধিকতর প্রয়োজনীয়; নিছক শাস্ত্রালোচনার কোনই মূল্য নাই। শ্রীরামকৃষ্ণের উক্তি—মাখন প্রস্তুত করিতে হইলে দুগ্ধকে প্রথমে দধিতে পরিণত করিতে হইবে, পরে ঐ দধিকে ভাল করিয়া মন্থন করিলে তবেই মাখন পাওয়া যায়। ভগবানকে যদি সত্যই লাভ করিতে চাও ঐকান্তিকতার সহিত তাঁহার সাধনা করিতে হইবে। এই ভাবে উপনিষদের সত্যরূপ শ্রীরামকৃষ্ণ উন্মোচন করিলেন। উপাসনার সর্বস্তরকে তিনি গ্রহণ করিয়াছেন। প্রাচীনপন্থীরা দেখিলেন, বেদবেদান্তের শিক্ষার সহিত তাঁহার শিক্ষার সম্পূর্ণ মিল; তাঁহার অধ্যাত্মজীবন ছিন্ন করিল অতি-আধুনিকদেরও সংশয়জাল। তাঁহার আচরিত সর্বধর্মসমন্বয় অগণিত অহিন্দু নরনারীকেও তাঁহার দিকে আকৃষ্ট করিল। বর্জন নহে—সর্বভাবের গ্রহণই হিন্দুধর্মের মর্মকথা।" শ্রীরামকৃষ্ণ-শিক্ষাদর্শে নারীত্বের অপরূপ মহিমান্বিত হইবার প্রসঙ্গে বক্ত্রী বলেন—"সকল নারীকে জগদম্বার মূর্ত প্রকাশরূপে জ্ঞান করাই সকল পুরুষের অধ্যাত্মজীবনের অপরিহার্য অঙ্গ—ইহার উপর শ্রীরামকৃষ্ণ বার বার অত্যন্ত জোর দিয়াছেন। নারীকে মাতৃজ্ঞান করিলে স্ত্রীপুরুষের মধ্যে যথার্থ সম্পর্ক স্থাপিত হইবে। স্ত্রীস্বাধীনতার দাবী আজকাল সর্বত্রই ধ্বনিত, কিন্তু আপন চারিত্রিক দৃঢ়তা ও পবিত্রতা দ্বারা নারীজাতি যতই মর্যাদা অর্জন করিবেন, ততই তাঁহাদের স্বাধীনতা সত্য রূপ পরিগ্রহ করিবে।"

বর্তমান যুগাদর্শ গণতান্ত্রিক। কেবলমাত্র রাষ্ট্রক্ষেত্রে নয়, সমাজ শিক্ষা ধর্ম সর্বক্ষেত্রেই গণতন্ত্রের প্রভাব ক্রমশঃই বিস্তার লাভ করিতেছে। এই বিষয়ে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি-কোণ লইয়া আলোচনা করিয়াছেন নৃতত্ত্ববিৎ অধ্যাপক শ্রীনির্মলকুমার বসু। গত ফেব্রুয়ারী ও মার্চমাসে সংস্কৃতিভবনে তিনদিন "গণতন্ত্র ও বর্তমান জগতে সমাজ-পরিবর্তন"-সম্বন্ধে যে আন্তর্জাতিক আলোচনা-সভা হইয়াছিল তাহাতে অধ্যাপক বসু বলেন: "গান্ধীজী বলিয়াছেন,

যতদিন যুদ্ধের আশঙ্কা থাকিবে, যতদিন জনসাধারণকে আত্মরক্ষার জন্য বিভিন্ন মারণাস্ত্রের মালিক থাকিতেই হইবে, ততদিন গণতন্ত্র হইবে যুদ্ধদেবতার সহজ ক্রীড়নক। বর্তমান জগতের তথাকথিত যুদ্ধান্ত শান্তি যদি আর একটি যুদ্ধের প্রস্তুতির অবকাশ-মাত্র হয় তাহা হইলে ক্ষমতাশালী রাষ্ট্র যুদ্ধবিরোধী শান্তিকামী জনসাধারণকে নিষ্পিষ্ট করিবেই। যতদিন পর্যন্ত যুদ্ধের বিকল্প আবিষ্কৃত না হইবে, যতদিন মানুষের বিবাদ-বিসংবাদ মিটাইবার মানবীয় উপায় নির্দিষ্ট না হইবে, ততদিন গণতন্ত্র সত্য সত্যই স্বপ্রভাবে আত্মস্থ হইতে পারে না। এই যুদ্ধবাদী একনায়কত্বের কবল হইতে কেবলমাত্র সত্যাগ্রহই গণতন্ত্রকে রক্ষা করিতে পারে। আত্মিক শিক্ষাপ্রাপ্ত নির্ভীক সত্যাগ্রহী সুকঠোর কণ্ঠে বলিবেন—যুদ্ধবাদীর আদর্শ সম্পূর্ণ ভুল। যাহারা হিংসার পথে প্রধাবিত তাহাদের সঙ্গে সত্যাগ্রহীর অসহযোগ। সত্যাগ্রহী নিগ্রহের নির্মমতাকে আপন স্কন্ধে চাপাইয়া দেন। তাঁহার ধৈর্য, তাঁহার দৃঢ়তা যদি শেষমুহূর্ত পর্যন্ত অনমিত থাকে, যুদ্ধবাদী প্রতিদ্বন্দ্বী সত্যাগ্রহের ন্যায়নিষ্ঠ যুক্তি গ্রহণ করিবেই করিবে। সত্যাগ্রহের নীতি ও উহার যথার্থ প্রয়োগ যখন জনগণের সম্পূর্ণ অধিগত হইবে তখনই জনসাধারণ গণতন্ত্রের কণ্ঠরোধের সর্বপ্রকার আসুরিক প্রচেষ্টাকে বাধা দিবে। গান্ধীজী ভারতবর্ষে সত্যাগ্রহের প্রয়োগ দ্বারা জাতিকে নৈতিক সম্বিৎ দান করিয়াছেন। কি অবস্থার মধ্যে এই সত্যাগ্রহী মনোভাব সর্বাধিক কার্যকর হইতে পারে বর্তমানে তাহাও ভাবিয়া দেখিতে হইবে—সত্যাগ্রহের প্রয়োগপদ্ধতিরও হয়ত স্থানে স্থানে স্থান-কাল-পাত্রভেদে পরিবর্তন-পরিবর্ধন করিতে হইবে।"

**মাদ্রাজ শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ**—২রা মার্চ ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১১৭ তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে আহূত সাধারণ সভায় সভাপতি শ্রীআল্লাড়ি কৃষ্ণস্বামী আয়ার বলেন, আজ মানুষ অত্যন্ত বাস্তব এবং সমষ্টিগত ভয়ে মুহ্যমান হইয়া পড়িয়াছে। এই সঙ্কটাপন্ন সময়ে শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী গভীরভাবে অনুসরণ করা প্রয়োজন। জগতের ঘটনা-পরম্পরা দেখিয়া মনে হয় পৃথিবীতে মহান ধর্মাচার্যগণ যে সকল শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন সবই বোধ করি ব্যর্থ হইয়াছে। খ্রীষ্টান-জগৎ হইয়া পড়িতেছে অখ্রীষ্টান, কেননা খ্রীষ্টধর্মের নামে সেখানে চলিতেছে জাতিতে জাতিতে লড়াই। আণবিক এবং হাইড্রোজেন বোমা তৈরীর যত উদ্যোগ—খ্রীষ্টধর্মের শিক্ষার সহিত উহাদের কোন সঙ্গতি হয় না। পাশ্চাত্যের তুলনায় অধিকতর সহনশীল আমাদের দেশেও পরস্পরের মধ্যে ঘৃণা সৃষ্টি করে বলিয়া ধর্মকে গালাগালি দেওয়া হইতেছে। এই সকল নৈরাশ্যজনক ব্যাপারের মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের বাণীরই একান্ত দরকার হইয়া পড়িয়াছে।

মাদুরা কলেজের সহকারী অধ্যক্ষ শ্রী কে সুব্রহ্মণ্যম্ বলেন, যাঁহারা মনে করেন যে, কোন নির্দিষ্ট একটি আধ্যাত্মিক সাধনপ্রণালী অভ্যাস না করাই শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বিশ্বজনীনতার অনুসরণ, তাঁহাদিগের শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবন ও উপদেশের সহিত সঙ্গতি রাখিয়া এই বিশ্বজনীনতার যথার্থ মর্ম বুঝিতে এখনও বাকী আছে। সার্বজনীনতা মানে একটি ব্যাপক অনির্দিষ্টতা নয়। শ্রীরামকৃষ্ণ যে সার্বজনীনতা অভ্যাস করিয়াছিলেন তাহা একটি শিকড়শূন্য দৃষ্টিভঙ্গী হইতে উদ্ভূত হইতে পারে না। ঐ সার্বজনীনতা হইতেছে হিন্দুধর্মের ভূমিতেই দৃঢ়মূল এবং পরিপুষ্ট ভাববৃক্ষের একটি অভিনব পুষ্প-সমারোহ। * * গভীর ভাবে চিন্তা করিলে দেখা যাইবে যে, শ্রীরামকৃষ্ণ হিন্দুধর্মের

গণ্ডীর বাহিরে যে সকল সাধনা করিয়াছিলেন উহাদের উদ্দীপনা তিনি পাইয়াছিলেন সনাতন ধর্মেরই মূল ধারা হইতে—যে ধারা ধর্মসাধনার ক্ষেত্রে বিশেষ বিশেষ মতবাদকে অস্বীকার না করিয়াও বলে যে, মানুষ যে সত্যে পৌঁছায় উহা মিথ্যা হইতে নয়, মাত্র নিম্নতর সত্য হইতে; আর সত্যের দিকে অগ্রসর হইবার পথও নানা। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বিশ্বজনীনতার আর একটি বৈশিষ্ট্য হইতেছে এই যে, তাঁহাতে সকলপ্রকার বিরোধ যেন গলিয়া এক হইয়া গিয়াছিল।

মাদ্রাজ শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ-পরিচালিত দাতব্য চিকিৎসালয়ের ১৯৫১ সালের কার্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। প্রতিষ্ঠান এই বৎসরে এলোপ্যাথিক এবং হোমিওপ্যাথিক বিভাগে মোট ৮১, ৭৪২ জন রোগীর চিকিৎসা করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে নূতন রোগীর সংখ্যা ছিল ২২, ৬৮০। ভারতীয় রেডক্রস্ সোসাইটির মাদ্রাজ শাখার বদান্যতায় ডিসেম্বর মাসে ৬৮৯ জন রুগ্ন শিশুর মধ্যে নিয়মিত দুধ বিতরণ করা হইয়াছিল।

**বোম্বাইয়ে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বার্ষিক উৎসব**—স্থানীয় শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের উদ্যোগে গত ১লা ও ২রা মার্চ যথাক্রমে শহরের সার কওয়াজী জাহাঙ্গীর হলে এবং খার আশ্রম-প্রাঙ্গণে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। প্রথম দিনের অনুষ্ঠান-সমূহে পৌরোহিত্য করেন বোম্বাই-এর মুখ্যমন্ত্রী শ্রী বি জি খের। ডক্টর রাধাকমল মুখোপাধ্যায়, ডক্টর ডি জি ব্যাস, ডক্টর অ্যান্টনি এলিঞ্জিমিত্তম্, অধ্যাপক মাথরানি এবং স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ বক্তৃতা করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় দিন আশ্রম-প্রাঙ্গণে আহূত সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন রাজ্যপাল শ্রীমহারাজসিং। পুনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্-চ্যান্সেলর ডক্টর এম্ আর জয়াকর সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। মান্তবর রাজ্যপাল মহোদয় তাঁহার ভাষণে বলেন, শ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁহার প্রধান শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ বিশ্বাস করিতেন এমন এক ভগবানে যিনি আমাদের সব কিছুর উর্ধ্বে অথচ আমাদের সকলের মধ্যে ওতপ্রোতভাবে অবস্থিত। জাতিধর্মনির্বিশেষে তাঁহারা তাঁহাদের শ্রেষ্ঠ অবদান মানুষকে বিলাইয়া গিয়াছেন। স্থানীয় আশ্রম বহু বৎসর ধরিয়া বোম্বাইতে যে সুন্দর কাজ করিতেছেন রাজ্যপাল মহোদয় তাহার ভূয়সী প্রশংসা করেন।

**কাঁথিতে শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব**—কাঁথি শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমে গত ২১শে চৈত্র হইতে ২৪শে চৈত্র পর্যন্ত ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব সমারোহের সহিত অনুষ্ঠিত হইয়াছে। বিশেষ পূজা, শোভাযাত্রা, সংগীত-প্রতিযোগিতা, মহিলাসভা, ধর্মসভা, ছায়াচিত্র-যোগে বক্তৃতা, সুভাষ ব্যায়ামাগার কর্তৃক ব্যায়ামকৌশল-প্রদর্শন প্রভৃতি উৎসবের অংগ ছিল। গ্রামাঞ্চল হইতে অনেকগুলি সংকীর্তনের দল উৎসবে যোগদান করে। প্রখ্যাত বেতারসুরশিল্পী শ্রীঅকিঞ্চন দত্ত ও তাঁহার সম্প্রদায় কর্তৃক কণ্ঠ ও যন্ত্রসংগীত সকলের আনন্দ বর্ধন করিয়াছিল। বেলুড় মঠ হইতে আগত স্বামী জপানন্দ, স্বামী পুণ্যানন্দ ও স্বামী প্রণবাত্মানন্দের সময়োপযোগী সারগর্ভ ধর্মবক্তৃতা অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল।

**মালদহে শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব**—মালদহ শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে চারদিন ব্যাপী শ্রীরামকৃষ্ণ-দেবের জন্মবার্ষিকী সুচারুরূপে উদ্‌যাপিত হইয়াছে। ২৯শে চৈত্র প্রত্যূষে প্রভাতী সংকীর্তন এবং অপরাহ্ণে পাটনা শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ স্বামী জ্ঞানাত্মানন্দের সভাপতিত্বে বিদ্যামন্দিরের ছাত্রদের পারিতোষিক-বিতরণী সভায় অনুষ্ঠান হয়। পরদিন অপরাহ্ণ ৫॥ ঘটিকায় স্বামী সিদ্ধাত্মানন্দের সভাপতিত্বে একটি জনসভায় শ্রীরামকৃষ্ণের অপূর্ব অনুভূতি এবং অবদান-সম্বন্ধে

কয়েক জন বক্তা বক্তৃতা প্রদান করেন। ৩১শে চৈত্র, রবিবার প্রাতঃকাল হইতে মঙ্গলারতি, ভজন, পণ্ডিত রামনারায়ণ তর্কতীর্থ কর্তৃক শ্রীমদ্ভাগবত-পাঠ, বিশেষ পূজা, হোম প্রসাদবিতরণ প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। ১লা বৈশাখ অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকা হইতে ছাত্রছাত্রীদের ক্রীড়াপ্রদর্শন ও স্বামী ভবানন্দ কর্তৃক পুরস্কার বিতরিত হয়।

**সারগাছি শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের প্রতিষ্ঠা-উৎসব**—গত ২রা এপ্রিল, শ্রীশ্রীঅন্নপূর্ণা-পূজা-দিবসে স্বামী অখণ্ডানন্দজী-প্রতিষ্ঠিত সারগাছি আশ্রমে স্মৃতিপূজা-উপলক্ষে সমগ্র দিন ব্যাপী আনন্দোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। কলিকাতা প্রভৃতি স্থান, বহরমপুর এবং স্থানীয় গ্রামসমূহ হইতে প্রায় ৮০০ নরনারী সমবেত হন। এই উপলক্ষে শ্রীশ্রীঠাকুরের পূজা, হোম, চণ্ডীপাঠ, শ্রীমদ্ভাগবতপাঠ, ভজনাদি অনুষ্ঠিত হয়। অপরাহ্ণে অধ্যাপক শ্রীভবানীশঙ্কর চৌধুরী, শ্রীনারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য, শ্রীশশাঙ্কশেখর সান্ন্যাল, পণ্ডিত শ্রীরামনারায়ণ তর্কতীর্থ ও বেলুড় মঠের স্বামী বীতশোকানন্দ শ্রীমৎ স্বামী অখণ্ডানন্দজীর তপস্যা ও কর্মময় জীবনের আলোচনা করেন।

**আসানসোল শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের উৎসবানুষ্ঠান**—আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে গত ১০ই এপ্রিল হইতে চতুর্দিবস শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে ১০ই এপ্রিল অপরাহ্ণে এক বিরাট জনসভায় শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনকথা আলোচিত হয়। ডক্টর মুখোপাধ্যায় তাঁহার ভাষণে বলেন যে, স্বয়ং ভগবান এই বাংলাদেশে শ্রীরামকৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, ইহা বাংলা তথা ভারত-বর্ষের পক্ষে শ্লাঘার বিষয়। শ্রীরামকৃষ্ণের উত্তরসাধকেরা যে রামকৃষ্ণ মিশন চালাইতেছেন তাহা জগতের মধ্যে অদ্বিতীয় সেবা-প্রতিষ্ঠান। রামকৃষ্ণ মিশনের আজ অবিরাম প্রচারকার্য দ্বারা জনতার মধ্যে আত্মবিশ্বাস ও তেজের সঞ্চার করিতে হইবে।

অধ্যাপক শ্রীত্রিপুরারি চক্রবর্তী বলেন, শ্রীরাম-কৃষ্ণের মত মহাপুরুষের অনুধ্যানে জাতীয় চরিত্র গঠিত হয়। স্বামী বোধাত্মানন্দ বলেন, শ্রীরাম-কৃষ্ণের আদর্শ-অনুসরণে পৃথিবীতে বিশ্বভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। আরা কলেজের অধ্যাপক শ্রীশিববালক রায় হিন্দীতে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনাদর্শ আলোচনা করেন।

১১ই এপ্রিল শ্রীকুমুদবন্ধু সেনের পৌরোহিত্যে জনসভায় স্বামী গম্ভীরানন্দ, স্বামী বোধাত্মানন্দ, অধ্যাপক শ্রীশিববালক রায় ও সভাপতি মহাশয় শ্রীশ্রীসারদাদেবীর পবিত্র জীবনাদর্শ-অবলম্বনে হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা করেন।

পরদিবস স্বামী বোধাত্মানন্দের পৌরোহিত্যে অনুষ্ঠিত জনসভায় শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী আলোচিত হয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডক্টর অতীন্দ্রনাথ বসু, ডক্টর শশিভূষণ দাশগুপ্ত, ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলায় এবং স্বামী অচিন্ত্যানন্দ হিন্দীতে ও শ্রীঅমর নন্দী ইংরেজীতে বক্তৃতা করেন।

১৩ই এপ্রিলের সম্মিলনে সভাপতি রায়সাহেব শ্রীউপেন্দ্রনাথ মণ্ডল আশ্রমের হাইস্কুলের পারি-তোষিক বিতরণ করেন। অধ্যাপক ডক্টর শ্রীযতীন্দ্রবিমল চৌধুরী ও স্বামী অচিন্ত্যানন্দ শিক্ষার আদর্শ-সম্বন্ধে মনোজ্ঞ বক্তৃতা দেন।

পশ্চিমবঙ্গ প্রচার-বিভাগের সৌজন্যে ১২ই ও ১৩ই এপ্রিল রাত্রে শিক্ষামূলক প্রচারচিত্র প্রদর্শিত হয়।

**বহরমপুরে (মুর্শিদাবাদ) শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব**—গত ৫ই হইতে ৭ই বৈশাখ স্থানীয় শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের উদ্যোগে এবং শহরের সর্বসাধারণের সহযোগিতায় ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের

জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। অপরাহ্ণে আহূত জনসভায় দুই দিন বেলুড়মঠের স্বামী ওঁকারানন্দ ও স্বামী লোকেশ্বরানন্দ বক্তৃতা করেন। যথাক্রমে সভাপতি ছিলেন বহরমপুরের পৌরসভার নায়ক শ্রীমনোরঞ্জন সেন এবং বাংলা-বিধানসভার সভ্য, কংগ্রেস-নেতা শ্রীশ্যামাপদ ভট্টাচার্য।

পণ্ডিত শ্রীরামনারায়ণ তর্কতীর্থ তিন দিন শ্রীমদ্ভাগবতের সুমধুর ব্যাখ্যায় শ্রোতৃবৃন্দের মনোরঞ্জন করেন।

**রেঙ্গুনে শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মবার্ষিকী**—স্থানীয় শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন সোসাইটিতে কয়েকদিন ধরিয়া ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব নানা মনোরম অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়া সুসম্পন্ন হইয়াছে। ২৭শে ফেব্রুয়ারী প্রাতে মঙ্গলারতি, বেদমন্ত্রপাঠ, পূজা ও হোম অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। অপরাহ্ণে স্বামী হিরণ্ময়ানন্দ ও স্বামী অকুণ্ঠানন্দ যথাক্রমে ইংরেজী ও বাংলা ভাষায় শ্রীরামকৃষ্ণের দিব্যজীবন-সম্বন্ধে আলোচনা করেন। ২৯শে ফেব্রুয়ারী এই উপলক্ষে জনসভার অধিবেশন হইয়াছিল। সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন ব্রহ্মদেশের স্বরাষ্ট্রসচিব মাননীয় উ উইন্। উ লু গেল্, শ্রীগৌতম ভরদ্বাজ এবং স্বামী অকুণ্ঠানন্দ ইংরেজীতে এবং শ্রীরামলিঙ্গ থেবার তামিল-ভাষায় শ্রীরামকৃষ্ণজীবন ও তাঁহার শিক্ষা-সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। ২রা মে ছিল মহোৎসব-দিবস। সকাল ৮টা হইতে রাত্রি ৮টা পর্যন্ত বিভিন্ন দল সংকীর্তন করে। জাতি-বর্ণনির্বিশেষে দুই সহস্রাধিক নরনারীকে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। মিসেস্ আউঙ্ সান্, ভারতীয় রাষ্ট্রদূত মাননীয় ডক্টর এম্ এ রউফ্, ব্রহ্মদেশের ভারতীয় কংগ্রেসের সভাপতি ডক্টর আর্ এস্ দুগাল প্রমুখ বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি এই মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।

ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি-প্রদান করিতে যাইয়া মাননীয় উ উইন্ বলেন : বর্তমানে সমগ্র বিশ্ব দুঃখ, দৈন্য, অশান্তি ও অস্বস্তিতে জর্জরিত। বিবদমান বিচিত্র মতবাদ মানুষের দুঃখানুভূতিকে তীব্রতর করিয়া তুলিতেছে। বিরোধের মধ্যে ঐক্যের সুবর্ণসূত্র আমরা হারাইয়া ফেলিয়াছি। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে যদি শ্রীরামকৃষ্ণের অমৃতময় শিক্ষাদর্শ সক্রিয় হইয়া উঠে, তাহা হইলেই এই শক্তিক্ষয়কারী দ্বন্দ্বপ্রসূ চিত্তবিক্ষেপ প্রশমিত হইয়া যাইবে। সকল পথের একমাত্র গন্তব্য ভগবান্, উদ্দেশ্যকেই জীবনে রূপদান করা বড় কথা, উপায় লইয়া অযথা কলহ করা নির্বুদ্ধিতা—ইহাই হইল শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী। উ লু গেল্ শ্রীরামকৃষ্ণজীবনের এক সুন্দর তথ্যবহুল আলোচনা পরিবেশন করেন। শ্রীরামকৃষ্ণ-সাধনায় জীব কিরূপে শিবত্বে উপনীত এবং এই আধ্যাত্মিক অনুভব কিরূপে স্বামী বিবেকানন্দকে নরনারায়ণ-সেবায় ব্রতী করিয়া তুলিল তাহারও তিনি অতি চিত্তাকর্ষকভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ হিন্দুধর্ম, ইসলাম, খৃষ্টধর্ম প্রভৃতি সাধনমার্গকে সম্পূর্ণ গ্রহণ করিয়াছিলেন। আপন সাধন দ্বারা সকল মতের ঐক্যস্থাপন করিয়া যে উদার জীবনাদর্শের ভিত্তি তিনি স্থাপন করিয়াছেন, তাহা জগতের সর্বপ্রকার দ্বন্দ্বনিরসনে সমর্থ। মনে প্রাণে ভাগবত-জীবনকে বরণ করিলেই পথের বিবাদ ঘুচিয়া যাইবে—এইরূপে সুপণ্ডিত বক্তা আপন অননুকরণীয় দৃষ্টিভঙ্গী দ্বারা শ্রীরামকৃষ্ণজীবন ও বাণীর গভীর তাৎপর্য সুব্যক্ত করেন।

**কলম্বো শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ জয়ন্তী**—স্বামীজী এবং শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মতিথি-দিবসে আশ্রমে যথারীতি বিশেষ পূজা, পাঠ, হোম, ভোগরাগ এবং মহাপুরুষদ্বয়ের জীবনালোচনাদি অনুষ্ঠান হইয়াছিল। ১৫ই মার্চ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সাধারণ উৎসব উদ্‌যাপিত হয়। পূজার্চনা এবং ভজনাদি আনুষ্ঠানিক

অন্ত ব্যতীত সন্ধ্যায় সিংহলস্থিত ভারতীয় হাই কমিশনার মাননীয় শ্রীকে পি কেশব মেননের সভাপতিত্বে একটি জনসভা আহূত হয়। সিংহল বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক ডক্টর টি আর ভি মূর্তি, কলম্বো ধর্মদূত পিরিবেন বিদ্যালয়ের মিঃ সিরিল মুর, ত্রিবাঙ্কুর-কোচিন রাজ্যের ভূতপূর্ব বিচারপতি শ্রীকে পি গোপালমেনন এবং শ্রী কে রামচন্দ্র শ্রীরামকৃষ্ণজীবনের বিবিধ দিক লইয়া বক্তৃতা করেন। সভাপতি মহোদয় তাঁহার ভাষণে পৃথিবীর নানাস্থানে পরিব্যাপ্ত শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের প্রশংসা করিয়া বলেন, মিশনের কেন্দ্রগুলি যেন শান্তির নিকেতনস্বরূপ—যেখানে আধ্যাত্মিক এবং নৈতিক পরিশুদ্ধির জন্ত মানুষের যাওয়া উচিত।

১৩ই মার্চ ভারতীয় হাইকমিশনারের আফিসের সৌজন্তে আশ্রমে ভারতের মন্দির গুহা প্রভৃতি সংক্রান্ত তথ্যপূর্ণ ছায়াচিত্র দেখানো হয়। সকলেই উহা প্রচুর উপভোগ করেন। সিংহলের প্রধানমন্ত্রী মহামান্ত ডি এস্ সেনানায়কের অপ্রত্যাশিত শোকাবহ পরলোক-গমনের জন্ত জয়ন্তী-উৎসবের পরবর্তী কার্যক্রমগুলি ৩০শে মার্চ এবং ৫ই এপ্রিল পিছাইয়া দেওয়া হয়। প্রথমোক্ত দিবসে প্রায় এক হাজার দরিদ্রনারায়ণকে পরিতোষপূর্বক খাওয়ানো হইয়াছিল। সন্ধ্যায় মিঃ কে কুমার-কুলসিংহম্ সদলবলে স্বামী বিবেকানন্দ-সম্বন্ধে 'কথাপ্রসঙ্গম্' করিয়াছিলেন। শেষোক্ত দিনে সিংহলের এটর্নি জেনারেল মাননীয় মিঃ এইচ্ এইচ্ বসনায়কের সভাপতিত্বে স্বামী বিবেকানন্দের জীবন ও বাণী-সম্বন্ধে একটি আলোচনাসভার উদ্যোগ করা হয়।

## নবপ্রকাশিত পুস্তকাবলী

**Advaita Vedanta**—The Scientific Religion—By Swami Vivekananda. মূল্য ।।৵০ আনা। স্বামিজীর বিখ্যাত লাহোর-বক্তৃতার পুস্তকাকারে সংগ্রহন। প্রকাশক—অদ্বৈত আশ্রম। ৪, ওয়েলিংটন লেন, কলিকাতা—১৩।

**Thus Spake Sri Ramakrishna**—মূল্য ।৵০ আনা। প্রকাশক—শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, ময়লাপুর, মাদ্রাজ—৪; শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বাণীর নূতন সংকলন।

# বিবিধ সংবাদ

**কলিকাতায় সোবিয়েৎ চারুকলা প্রদর্শনী**—এপ্রিল মাসের প্রথমার্ধে ইণ্ডিয়ান্ ফাইন্ আর্টস্ এণ্ড্ ক্র্যাফ্টস্ সোসাইটির উদ্যোগে কলিকাতার লেডি ব্রাবোর্ণ কলেজে একটি সোবিয়েৎ চারুকলা প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। সজ্জিত তৈলচিত্র, গ্রাফিক আর্ট এবং ভাস্কর্যের নমুনাগুলি হইতে দর্শকগণ সোবিয়েৎ যুক্তরাষ্ট্রে শিল্পকলাকে যে কত উঁচু স্থান দেওয়া হয় এবং জনগণের বাস্তব জীবনের আশা আকাঙ্ক্ষা কর্ম ও আবেগরাশির সহিত উহা কী নিবিড়ভাবে সংযুক্ত তাহার প্রত্যক্ষ পরিচয় পাইয়াছেন।

**ভারতের আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকার-প্রসঙ্গে মিসেস্ রুজভেল্ট**—গত ১৫ই এপ্রিল নিউ ইয়র্কে কম্যুনিটি চার্চে মিসেস্ রুজভেল্ট তাঁহার সাম্প্রতিক ভারত-ভ্রমণের অভিজ্ঞতা-বর্ণন প্রসঙ্গে বলেন, ভারত হইতে আমি এই ধারণা লইয়া ফিরিয়াছি যে, ঐ দেশ হইতে আমাদিগের অনেক কিছু শিখিবার আছে। ভারতবাসীর জাতীয় মর্যাদার বহুলাংশ দাঁড়াইয়া আছে তাহাদের মহান আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকারের উপর—যে উত্তরাধিকার তাহারা লাভ করিয়াছে তাহাদের ধর্ম হইতে। আধ্যাত্মিক সত্যের জন্ত জাগতিক বিষয়কে ত্যাগ করিবার শক্তিতেই ভারতীয় জাতির মহত্ত্ব। তাহাদের পার্থিব উন্নতির প্রচেষ্টার মধ্যেও আধ্যাত্মিক মূল্য তাহারা সংরক্ষণ করিয়া চলে।

**লোকান্তরে নবদ্বীপচন্দ্র ব্রজবাসী**—বর্তমান বাঙলার সঙ্গীত-সংস্কৃতিতে কীর্তন যে উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছে তাহার মূলে নবদ্বীপ-চন্দ্র ব্রজবাসীর অকুণ্ঠিত সাধনা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কীর্তন ও খোল-বাদনে তাঁহার মনীষা সত্যই ছিল অদ্ভুত। ব্রজবাসীর অনাড়ম্বর ভক্তিময় জীবন এবং বৈষ্ণবোচিত দীনতা সকলের হৃদয়কে স্পর্শ করিত। এই বহুমান্য

দীর্ঘজীবী কীর্তনবিদের মৃত্যুতে বঙ্গমাতা ধর্ম ও সঙ্গীতের ক্ষেত্রে একজন সুসন্তান হারাইলেন।

**বর্ধমান শহরে শ্রীরামকৃষ্ণজয়ন্তী**—গত ৩০শে চৈত্র মহারাজকুমার শ্রীঅভয়চাঁদ মহাতবের সভাপতিত্বে একটি জনসভায় রাজ-কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সান্যাল, শ্রীবলাই দেবশর্মা এবং অন্যান্য কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনী আলোচনা করেন। ১লা বৈশাখ আর একটি সম্মিলনে শ্রীদেবপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়ের পৌরোহিত্যে উদ্বোধন-পত্রিকার ভূতপূর্ব সম্পাদক স্বামী সুন্দরানন্দ ও বেলুড়মঠের স্বামী প্রশান্তানন্দ শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবন ও শিক্ষা-সম্বন্ধে মনোজ্ঞ ভাষণ দিয়াছিলেন।

**যশোহরে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব**—স্থানীয় শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের উদ্যোগে গত ২২শে চৈত্র (৪ঠা এপ্রিল) যশোহরে যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব বেশ সমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে।

প্রাতে বিশেষ পূজা ও ভজনসঙ্গীত হয়। বেলা দ্বিপ্রহর হইতে রাত্রি ১০টা পর্যন্ত বহু নরনারীকে পরিতোষ-পূর্বক প্রসাদ দেওয়া হইয়াছিল। বৈকালে দৌলতপুর কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীভুবনমোহন মজুমদারের পৌরোহিত্যে একটি আলোচনা-সভার অধিবেশন হয়। যশোহর এথ্‌লেটিক্ ক্লাবের সভ্যবৃন্দ শারীরিক শক্তি, বহু প্রকার ব্যায়ামকৌশল ও আসন ইত্যাদি দেখাইয়া উপস্থিত দর্শকদিগকে চমৎকৃত করেন। সন্ধ্যারতি ও ভজন-গানের পর রামায়ণ-গান হয়।

**পল্লী-বঙ্গে উৎসব**—বাংলার নিম্নোক্ত পল্লী-গ্রামে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১১৭তম জন্মতিথি উপলক্ষে উৎসবের সংবাদ আমরা পাইয়াছি। পূজার্চনা, ভজন, সংকীর্তন, প্রসাদ-বিতরণ এবং ঠাকুরের জীবনী ও শিক্ষা-সম্বন্ধে পাঠ ও আলোচনা এই উৎসবগুলির অঙ্গ ছিল। **চৌধুরীহাট** (কুচবিহার): জনসভায় পৌরোহিত্য করেন উদ্বোধন-পত্রিকার ভূতপূর্ব সম্পাদক স্বামী সুন্দরানন্দ। শ্রীরমণীকুমার দত্তগুপ্ত অন্যতম বক্তা ছিলেন। **পূর্বসাতগাছিয়া** (বর্ধমান): আলোচনা-সভা অনুষ্ঠিত হয় শ্রীঅনিলকুমার মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে। প্রধান অতিথি ছিলেন শ্রীঅসীমকৃষ্ণ দত্ত, এম-পি। কালনা ও নবদ্বীপ হইতে অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। **মল্লিক কাশিমহাট** (হুগলী): চুঁচুড়া স্বরাজ-সংঘ ও প্রবুদ্ধভারত-সংঘ কর্তৃক আয়োজিত এখানকার উৎসবে কলিকাতা জয়পুরিয়া কলেজের অধ্যাপক শ্রীবিনয়-কুমার সেনগুপ্ত ও ইটাচুনা কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীগোপালচন্দ্র মজুমদার ঠাকুরের জীবনী ও উপদেশ আলোচনা করেন। সভাপতি ছিলেন বেলুড় মঠের স্বামী লোকেশ্বরানন্দ। **রাগপুর** (হুগলী): আরামবাগ থানার রাগপুর, বাইপুর, শিয়াড়া প্রভৃতি দশখানি গ্রামের অধিবাসিবৃন্দ সমবেত ভাবে এই উৎসবের আয়োজন করেন। **ইছাপুর নবাবগঞ্জ** (২৪ পরগণা): স্থানীয় রামকৃষ্ণ সাধন সমিতি এই উৎসবের আয়োজন করিয়াছিলেন। ধর্মসভায় পৌরোহিত্য করেন বেলুড় মঠের স্বামী পুণ্যানন্দ। স্বামী অচিন্ত্যানন্দ ছিলেন অন্যতম বক্তা। কলিকাতার পটলডাঙ্গা রিক্রিয়েশন ক্লাব কর্তৃক শ্রীরামকৃষ্ণ লীলাকীর্তন অনুষ্ঠিত হয়। **গোপীনাথপুর** (মেদিনীপুর): আলোচনা-সভার পরিচালনা করেন মেদিনীপুর শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের স্বামী বিশ্বদেবানন্দ। **নোতুক** (মেদিনীপুর): স্থানীয় বিবেকানন্দ হাইস্কুলে আচার্য স্বামী বিবেকানন্দের স্মরণে এই উৎসবের আয়োজন হয়। বেলুড় মঠের স্বামী প্রশান্তানন্দ, স্বামী সুন্দরানন্দ ও স্বামী বিশ্বদেবানন্দ জনসভায় স্বামীজীর জীবনী ও শিক্ষার বিভিন্ন দিক্-সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়াছিলেন। **ছোট সরষা** (হুগলী): স্থানীয় প্রবুদ্ধভারতসংঘ এই উৎসবের উদ্যোক্তা। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক ডক্টর সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, হিন্দুস্থান ষ্টাণ্ডার্ড পত্রিকার সহ-সম্পাদক শ্রীঅমর নন্দী এবং বেলুড় মঠের স্বামী বীতশোকানন্দ জনসভায় শ্রীরামকৃষ্ণ-দেবের সাধনা, উপলব্ধি ও শিক্ষার বিভিন্ন দিক্ লইয়া বিশদ আলোচনা করেন। **পাতিপুকুর** (দক্ষিণ দমদম্): স্থানীয় শ্রীরামকৃষ্ণ আবির্ভাব-উৎসব কমিটি এই অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তা। এই উপলক্ষে অধ্যাপক শ্রীবিনয়কুমার সেনগুপ্ত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। জনসভায় বেলুড় মঠের স্বামী সুন্দরানন্দ, স্বামী লোকেশ্বরানন্দ ও স্বামী দেবানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনের মর্মকথার চিত্তাকর্ষক আলোচনা করেন।

# কৃতার্থতা

( ১ )

মৌনে মৌনী গুণিনি গুণবান্ পণ্ডিতে পণ্ডিতশ্চ
দীনে দীনঃ সুখিনি সুখবান্ ভোগিনি প্রাপ্তভোগঃ।
মূর্খে মূর্খো যুবতিষু যুবা বাগ্মিনি প্রৌঢ়বাগ্মী
ধন্যঃ কোঽপি ত্রিভুবনজয়ী যোঽবধূতেঽবধূতঃ॥

শ্রীশঙ্করাচার্য—জীবন্মুক্তানন্দলহরী

( ২ )

সম্পূর্ণং জগদেব নন্দনবনং সর্বেঽপি কল্পদ্রুমাঃ
গাঙ্গং বারি সমস্তবারিনিবহঃ পুণ্যাঃ সমস্তাঃ ক্রিয়াঃ।
বাচঃ প্রাকৃতসংস্কৃতাঃ শ্রুতিগিরো বারাণসী মেদিনী
সর্বাবস্থিতিরস্য বস্তুবিষয়া দৃষ্টে পরে ব্রহ্মণি॥

শ্রীশঙ্করাচার্য—ধন্যাষ্টকম্

আত্ম-সত্য লাভ করিয়া যিনি কৃতার্থ হইয়াছেন সমস্ত জগৎসংসারের সহিত স্বাভাবিক ঐক্যবোধে তিনি থাকেন ভরপুর। তিনিই তো বাস্তবিক ত্রিভুবনজয়ী। মৌনীর কাছে তিনি হন মৌনী, গুণীর কাছে শ্রেষ্ঠ গুণ-রসজ্ঞ, পণ্ডিতের কাছে পণ্ডিত। আর্তের দুঃখ-বেদনা তাঁহার হৃদয়কে করে পীড়িত, আবার সুখীর সুখ দেখিয়া তাঁহার উচ্ছ্বাসের যেন আর সীমা থাকে না। ভোগীর নিকট তিনি প্রতীয়মান হন ভোগিরূপে এবং মূর্খের নিকট মূর্খরূপে। যুবতি-গণের কাছে তাঁহাকে মনে হয় যুবা, বাক্‌পটু ব্যক্তির কাছে মহাবাগ্মী আর সন্ন্যাসীর কাছে সর্বৈষণামুক্ত, ত্রিলোকত্যাগী অবধূত।

আত্মসত্য-লাভে যিনি ধন্য হইয়াছেন তাঁহার কাছে অখিল বিশ্ব যেন মনে হয় নন্দনবন—সকল বৃক্ষই যেন হইয়া যায় কল্পতরু। সমস্ত জলকেই তিনি দেখেন গঙ্গাবারির মত পবিত্র, যাহা কিছু কাজ সবই যেন মনে হয় পুণ্যকর্ম। প্রাকৃত এবং সংস্কৃত সব বাক্যই তাঁহার নিকট পায় বেদবাণীর মর্যাদা—সমস্ত পৃথিবী তাঁহার শুদ্ধ দৃষ্টিতে জলজল করে বারাণসী তীর্থের মহিমায়। যখন যে অবস্থাতেই থাকুন না কেন, পরম-সত্যের সহিত তাঁহার নিবিড়তম সংযোগের কখনও বিচ্যুতি হয় না।

# মানুষ তুমি কে?

তোমার সহিত লুকোচুরি খেলায় হারিয়া গিয়াছি। পর্বতে-প্রান্তরে, অরণ্যে-জনপদে তোমার সঙ্গে দৌড়াইয়াছি—সম্পদে-বিপদে, আনন্দে-বেদনায় তোমার সহিত হাসিয়াছি, কাঁদিয়াছি—সভ্যতায়-বর্বরতায়, ঐশ্বর্যে-রিক্ততায়, কর্মে আবার উদাসীনতায় তোমার কাছে কাছে ফিরিয়াছি—কিন্তু কিছুতেই তোমাকে ধরিতে পারিলাম না, মানুষ। কী রহস্যময় তুমি!

অন্যান্য জীব হইতে বিশিষ্ট অবয়বসন্নিবেশ এবং মস্তিষ্কের তারতম্য লইয়া প্রাণিসঙ্ঘের রঙ্গমঞ্চে যেদিন তুমি প্রথম দেখা দিয়াছিলে, সেইদিনই তো বুঝিতে বাকী ছিল না যে, অদ্ভুত-অশ্রুত-অচিন্তিতপূর্ব সম্ভাবনাসমূহকে বাস্তব করিয়া করিয়া, ভবিষ্যতের দূর দূরতর সীমান্তরেখা ধরিয়া ধরিয়া, ঋজু কুটিল বহুবিচিত্র পথে তোমার জীবনগতি অগ্রসর হইয়া চলিবে। সে চলার আজিও শেষ হয় নাই। তুমি বুঝি চির-পথিক। চলাই তোমার ধর্ম, চলাতেই তোমার আনন্দ।

কতই না চলিলে—কত উঠিলে, কত পড়িলে। কত বাধা অতিক্রম করিয়া, কত তমস্বিনী রাত্রিকে আলোকিত করিয়া, কত সংগ্রামকে আয়ত্ত করিয়া তুমি তোমার বিজয়ের ইতিহাস রচনা করিয়া আসিলে। কতই না তোমার বিস্ময়কর পরিচয় পাইলাম—কিন্তু তোমার ইতি পাইলাম না, মানুষ। এখনও তুমি বিস্ময়ের বিস্ময়—অনির্দেশ্য প্রহেলিকা।

সহস্র সহস্র বৎসর পশ্চাতের সেই দূর প্রভাতটির কথা ভুলিতে পারি না। উদ্বেল প্রাণ-প্রবাহ তোমার সুদৃঢ় রক্ত-মাংসের দেহপিণ্ডে অজস্র ধারায় ছুটাছুটি করিতেছে, যেমন উহা করে তোমার পূর্বগ আরও অসংখ্য প্রাণিনিচয়ের দেহে—বিশেষ কোন পার্থক্য নাই। কিন্তু অকস্মাৎ আশ্চর্য ব্যাপার ঘটিল—তোমার মুখে ফুটিয়া উঠিল হাসি—মানুষের প্রথম হাসি—প্রাণ-প্রয়োজনবিমুক্ত তাহার প্রথম আবেগসম্বিৎ। সৃষ্টির আদি হইতে যে সূর্য চন্দ্র তারকা নীহারিকা তাহাদের অপরিমিত আলোকসম্ভার প্রসব করিয়া আসিতেছে, এত-দিনে উহা যেন প্রথম সার্থকতা লাভ করিল মানুষের হাসিতে। হাসি ঘোষণা করিল—চন্দ্র-সূর্যাদি জ্যোতির্গোলকের অপেক্ষা মানুষ, তোমার দ্যুতি অনেক বেশী শক্তিমান। উহাদের আলোক অন্ধ—তোমার আলো সচেতন।

আরও আশ্চর্য সম্ভাবনা রূপ নিল। নিছক প্রাণ-প্রয়োজনে এতদিন বাহিরের চর ও অচরের, ত্যাজ্য ও গ্রাহ্যের একটা অস্পষ্ট রেখা তোমার কুয়াসাচ্ছন্ন অনুভূতির পটে আঁকিয়া যাইত—উহাকে 'চিন্তা' সংজ্ঞা দেওয়া যায় না। মন যেন তোমার ঘুমাইয়াই ছিল। অকস্মাৎ এখন উহার ঘুম ভাঙিয়া গেল। তুমি ভাবিতে শিখিলে—হইলে 'মন'স্বী—তোমাতে জাগিল জিজ্ঞাসা, বিস্ময়। চাহিলে ঊর্ধ্বে অগণিত গ্রহতারাখচিত গগনমণ্ডলে—দেখিলে তথায় পৌর্ণমাসী-অমাবস্যার আবর্তন—তাকাইলে প্রভাতসূর্যের পানে, অস্তগামী দিবারশ্মির শেষ রক্তিমছটার দিকে—লক্ষ্য করিলে মেঘের বর্ষণ, বিদ্যুতের চমৎকার, ধরিত্রীবক্ষে তৃণলতা বনস্পতি পুষ্প ফলের সমারোহ। খুঁজিতে লাগিলে প্রকৃতির এই বিবিধ ঘটনা ও বস্তুপরম্পরার পারস্পরিক সম্বন্ধ, অর্থ। জিজ্ঞাসা

বাড়িয়া চলিল, মনন প্রখরতর হইতে লাগিল, সত্য আবিষ্কৃত হইতে লাগিল। সেদিনকার সেই প্রথম বিস্ময় ক্রমে এই বিশাল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের দূর দূরান্তরে, ক্ষুদ্র ও বৃহতে, প্রত্যেক স্তরে, প্রত্যেক আবেষ্টনে আঘাত করিতে লাগিল। রহস্যের পর রহস্যের অবগুণ্ঠন উন্মোচন করিয়া চলিলে। কত না জ্ঞান, কত না পরিচিতি, কত না বিজ্ঞান, কৃতিত্ব সঞ্চয় করিলে মানুষ, যুগ যুগান্তর ধরিয়া।

তোমার হাসি, তোমার বিস্ময়, তোমার কাছে উন্মুক্ত করিয়াছিল দুটি রত্নভাণ্ডার, যাহাদের অধিকারে মানুষ, তুমি মনুষ্যত্বের স্বতন্ত্র আলোকে উত্তরোত্তর দীপ্তিমান হইতে পারিয়াছিলে। হাসি ছিল অগ্রদূত তোমার আবেগ-সঞ্চয়ের—তোমার প্রীতির, তোমার সৌন্দর্য-বোধের, তোমার আনন্দের, মাধুর্যের। বিস্ময় টানিয়া আনিয়াছিল তোমার মনের ঐশ্বর্যনিচয়—তোমার বিবিধ বিদ্যা, বিজ্ঞান, শিল্প। তুমি যে প্রেমিক, রসবেত্তা—তুমি যে আবিষ্কারক, স্রষ্টা—নিজের এই পরিচয়ের বলেই বিশ্বপ্রকৃতির বিশালতার মধ্যে তুমি হইতে পারিয়াছিলে নির্ভীক—তোমার সাড়ে-তিন-হাত-পরিমিত মর্ত্য দেহের নগণ্যতাকে উপেক্ষা করিয়া দেহাতীত কোন অদৃশ্য মহিমার রাজসিংহাসনে বসিতে তুমি কুণ্ঠিত হও নাই। কিন্তু সংসারের বিচিত্র নিয়মে আলোকের পশ্চাতে আসিল ছায়া—তোমার গতিবেগকে পিছন হইতে কিসে যেন টানিয়া মন্থর করিয়া দিল—বিকাশমান মানব-মহিমা উঠিতে উঠিতে পড়িয়া ধূলায় লুটাইতে লাগিল। বোধ করি তোমারই ভুলে, মানুষ! তুমি তোমার নিজের পরিচয়কে উপেক্ষা করিয়া বাহিরের পরিচয়ে দৃষ্টি বেশী নিবদ্ধ করিয়াছিলে।

অনাদিকালের আশ্চর্য সৃষ্টিপ্রবাহ যে অন্তহীন রেখাটি ধরিয়া তাহার বহু-লীলায়িত ভঙ্গিমা অনবরত প্রকাশ করিয়া যায় সেই রেখারই সমান্তরালে আর একটি রেখাও যে সীমাশূন্য কাল হইতে অশেষ বিশ্ব-প্রকাশের অভিমুখে সর্বদাই প্রসারিত রহিয়াছে তাহা তুমি লক্ষ্য কর নাই। প্রথম রেখা হইতে তাহা হয়তো সূক্ষ্মতর, গোপনতর, অস্ফুটতর—কিন্তু উহা এত অস্পষ্ট নয় যে দৃষ্টিপথ এড়াইয়া যাইবে। ঐ রেখাটি মাড়াইয়া মাড়াইয়া যে ছন্দ চলিতেছে তাহা তো কিছুতেই উপেক্ষণীয় নয়—উহাই যে রাখিতেছে সৃষ্টি-নৃত্যের তাল। ঐ ছন্দ, মানুষ, তোমার নিজের ছন্দ। তুমি প্রথম রেখার নর্তনবিলাস দেখিয়া ভুলিয়া গেলে। তোমার আপন পদ-স্থিতি—দ্বিতীয় রেখার ছন্দের দিকে মনোযোগ দিলে না। তাকাইলে নিজের বহির্দেশে—নিজকে দেখিলে না। এই ভুলই হইল তোমার বৃহত্তম সঙ্কট।

ক্ষণে ক্ষণে সংশয় তোমার দৃষ্টিকে করিয়াছিল তমসাচ্ছন্ন—মোহ তোমার প্রেমকে করিয়াছিল আবিল—ভয়ে তোমার শক্তি হইয়াছিল খর্ব—জড়তা, অবসাদ আসিয়া তোমার ভিতরকার স্রষ্টাকে, আনন্দচারীকে করিয়াছিল অচেতন। নিজেকে হারাইয়া তুমি আপন দীনতায় ম্রিয়মাণ হইয়াছিলে।

আলোকের পশ্চাতে কেন ছায়া? জ্ঞানের সংলগ্ন হইয়া কেন না-জানার কুটিল ভ্রূকুঞ্চন? ভালবাসার পাশাপাশি কেন ঘৃণা, মহত্ত্বের অব্যবহিত সাহচর্যে নিন্দিত স্বার্থমত্ততা? ধীরে ধীরে এইরূপ কত না প্রশ্ন তোমার মোহাচ্ছন্ন বুদ্ধিকে আকুল করিতে লাগিল। কিন্তু যে আদিম ভ্রান্তিতে তোমার সঙ্কট উপস্থিত হইয়াছিল সেই ভ্রান্তিই দ্বিগুণিত হইয়া মীমাংসা তো দূরের কথা সমস্যাকেই জটিলতর করিয়া তুলিল। তুমি সমাধান খুঁজিতে গেলে প্রথম রেখায়—সৃষ্টিবিলাসে; দ্বিতীয় রেখায়—তোমার আপনার ভিতরে দৃক্‌পাত করিলে না।

সৃষ্টির সহিত স্রষ্টাকে, দৃষ্টির সহিত দ্রষ্টাকে, মননের সহিত মন্তাকে এক সঙ্গে বরণ না করিলে সঙ্গীতের তাল কাটিয়া যায়—গান যায় জড়াইয়া। তুমি সৃষ্টিকে বরণ করিলে—স্রষ্টার কথা ভাব নাই; অখিল দৃশ্য দেখিয়া মুগ্ধ হইলে—কে পিছনে দাঁড়াইয়া দেখে তাহা বিচার কর নাই; মনের নির্মুক্ত গতিবেগে উর্ধ্ব হইতে উর্ধ্বতর প্রদেশে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইলে—কে মনের গতি নিয়ন্ত্রিত করিতেছে তাকাইয়া দেখ নাই। তাই তো ছুটি রেখার নৃত্যচ্ছন্দ গুলাইয়া গেল—আলোকে আঁধারে মিশিয়া গোলযোগ সৃষ্টি করিল—সত্যমিথ্যার যুগপৎ প্রভাবে বিবেক তমসাচ্ছন্ন হইল। তুমি হইয়া পড়িলে কতকগুলি দ্বন্দ্ব ও পরস্পরবিরুদ্ধ ভাব ও আচরণের পুঁটুলি। তোমাকে কি বলিয়া যে ডাকিব তাহা নির্ণয় করা কঠিন হইয়া উঠিল। প্রেমিক বলিয়া ডাকিতে না ডাকিতেই দেখিলাম তুমি অতি নির্দয় হিংসক, তোমায় সত্যান্বেষী মনে করিবার পরক্ষণেই বুঝিলাম মিথ্যায় তুমি সহজেই মাতিয়া উঠ—তুমি স্রষ্টা এই ধারণা দৃঢ় হইতে না হইতেই দেখিলাম ধ্বংস-প্রবৃত্তি তোমার প্রকৃতিতে সর্পের ক্রূরদৃষ্টি হানিতেছে। হাজার হাজার বৎসরের ইতিহাস তোমায় যে উত্তুঙ্গ শিখরে লইয়া আসিয়াছে মুহূর্তে তুমি সেখান হইতে পড়িয়া যাও; যুগপৎ তুমি দীপ্তি ও তমিস্রা, উত্থান ও পতন, পরিপূর্ণ ও রিক্ত। হতাশায়, বেদনায় ফুকরাইয়া উঠিলাম—মানুষ তুমি কে?

এই অন্ধকার, এই জটিলতা, এই দ্বন্দ্বাবস্থা যদি কাটাইয়া উঠিতে হয় তাহা হইলে কর্তব্য শুধু এক—বিশ্বপ্রকাশে তোমার নিজের স্থানের দিকে দৃষ্টিপাত করা—তোমার আপন পরিচয়কে আবিষ্কার করা—উহাকে সর্বতোভাবে স্বীকার করা। উহা তো তুমি শুরু করিয়াছিলেই—নিজকে রসবেত্তা, 'মন'-স্বী বলিয়া জানিয়াছিলেই—কিন্তু নিজের পরিচয়-লাভ সম্পূর্ণ করিলে না। নিজকে স্বল্পমাত্র আবিষ্কার করিবার ফলে যে শক্তির উন্মেষ হইল সেই শক্তি দ্বারা বাহিরের বিশ্বের বিজয় হইতে বিজয়ান্তরে বিচরণ করিয়া তোমার বুদ্ধির বিভ্রম ঘটিল। শক্তির বহিঃপ্রকাশই তোমার সারা মনোযোগ টানিয়া রাখিল—উহার উৎসের দিকে লক্ষ্য করিবার প্রয়োজন অনুভব করিলে না। কেন্দ্রচ্যুত গ্রহের মত উদ্দেশ্যহীন পরিভ্রমণে দিবারাত্র শ্রান্ত, বিড়ম্বিত হইতে লাগিলে।

* * *

ফিরিয়া চল, মানুষ। আত্মবিস্মৃতির গহন কুজ্ঝটিকা ভেদ করিয়া তোমার জ্যোতিষ্মান মুখ বাহির হইয়া আসুক। তোমার প্রথম হাসি, প্রথম বিস্ময় হইতে যে মানবতার অরুণোদয় হইয়াছিল উহাকে পূর্ণ হইতে পূর্ণতর করিয়া চল। তুমি প্রেমিক, তুমি শিল্পী, তুমি আবিষ্কারক, তুমি স্রষ্টা। পর পর কত না পরিচয় তোমার, কত না সার্থকতা তোমার। চল চল আরও চল। আবরণের পর আবরণ মুক্ত করিয়া চল। তোমার অন্তরতম, সত্যতম পরিচয় যতদিন না লাভ করিতেছ ততদিন বিশ্রাম খুঁজিও না।

সেই অন্তিম পরিচয়ে তুমি জন্ম-বিনাশ-অপচয়-আবিলতা-মুক্ত চিরভাস্বর চেতনসত্তা। নিখিল সৃষ্টির যত স্পন্দন, যত উৎস্ফূর্তি তোমারই সেই সনাতন সত্তো বিধৃত হইয়া আছে, নিত্য উৎসারিত হইতেছে। এই বিশ্বের যত না জ্ঞান, যত না অন্বেষণ, যত না আনন্দ তোমারই সেই আপন প্রকৃতিকে কেন্দ্র করিয়া। সেই কেন্দ্রে যদি তুমি দাঁড়াইতে পার তোমার চরিত্রের সকল দ্বন্দ্ব, সকল বিরুদ্ধতার অবসান হইবে। তখনই তুমি উপলব্ধি করিবে, মানুষ তুমি কে।

# ঠাকুর ও গান্ধীজী

বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

গান্ধীজীর লেখা আর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত পড়বার সময়ে বারে বারে মনে হয়েছে—দুজনের চিন্তাধারার মধ্যে অদ্ভুত মিল আছে। ভারতীয় সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য দু'জনেরই আচরণে, দু'জনেরই বাণীতে। এই সংস্কৃতি আমাদিগকে বলেছে 'মানদ' হতে। 'মানদ' কথাটির ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার লিখেছেন: 'জীবে সম্মান দিবে জানি কৃষ্ণ-অধিষ্ঠান।'

জীবমাত্রেরই মধ্যে যখন ঈশ্বর রয়েছেন তখন মানুষমাত্রেরই জীবনের এমন একটি মর্যাদা আছে যাতে কোনক্রমেই আঘাত দেওয়া চলে না। ভারতবর্ষের সংস্কৃতি ভেদবুদ্ধিকে কখনও প্রশ্রয় দেয়নি, মূল্য দিয়েছে ঐক্যবুদ্ধিকে। উপনিষদে ভগবানকে বলা হয়েছে 'সর্বভূতান্তরাত্মা'। God is the inner soul of all alike. সর্বভূতান্তরাত্মা কথাটির উপরে মন্তব্য করতে গিয়ে অধ্যাপক রাধাকৃষ্ণন্ লিখেছেন:

The whole philosophy of the Upanishads tends towards the softening of the divisions and the undermining of class hatreds and antipathies.

'উপনিষদ্‌গুলির মধ্যে যে-তত্ত্ব রয়েছে তার গতি হচ্ছে ভেদবুদ্ধিকে কমানোর এবং শ্রেণী-বিদ্বেষ ও হিংসার ভাবকে ধ্বংস করার দিকে।'

কথামৃতের দ্বিতীয় ভাগে ঠাকুর বলেছেন:

"সকলকে ভালোবাসতে হয়। কেউ পর নয়। সর্বভূতে সেই হরিই আছেন।"

এখানে ঠাকুরের কণ্ঠে ধ্বনিত হয়ে উঠেছে উপনিষদেরই মৃত্যুহীন বাণী। ভারতীয় দর্শনে যা-কিছু গভীরতম সত্য উপমাসংযোগে তাদেরই সহজতম অভিব্যক্তি ঠাকুরের কথামৃতে।

সমস্ত তিমির<br>ভেদ করি দেখিতে হইবে উচ্চশির<br>এক পূর্ণ জ্যোতির্ময়ে অনন্ত ভুবনে।

রবীন্দ্রনাথের এই কবিতাতেও উপনিষদেরই ঐক্যের সুর। 'নৈবেদ্য' উপনিষদের ছন্দোময় ভাষ্য।

গণতন্ত্রের কবি ওয়াল্ট্ হুইট্‌ম্যান্ (Walt Whitman) তাঁর Leaves of Grass-এ যে-সাম্যের বাণী প্রচার করেছেন, তার সঙ্গে উপনিষদের সুরের প্রচুর মিল আছে। হুইট্‌ম্যানের Song of Myself কবিতার এক জায়গায় আছে:

I will not have a single person<br>slighted or left away,<br>The kept woman, sponger, thief,<br>are hereby invited,<br>The heavy-lipp'd slave is invited,<br>the venerealee is invited;<br>There shall be no difference betwen<br>them and the rest.

'এক জন মানুষকেও আমি উপেক্ষা অথবা বর্জন করবো না; রক্ষিতা, পরগাছা, তস্কর—সবাইকে জানাই আমার নিমন্ত্রণ, আমন্ত্রণ জানাই ঠোঁট-পুরু ক্রীতদাসকে, আহ্বান করি যৌন ব্যাধিতে আক্রান্ত যে তাকেও; তাদের এবং অবশিষ্টদের মধ্যে আমি কোন ব্যবধানকে স্বীকার করবো না।'

বিবেকানন্দের আমেরিকা পৌঁছানোর অনেক আগেই বেদান্তের ঐক্যের বাণী সেখানে হুইটম্যানের কবিতায় জলদমন্দ্রে ঘোষিত হয়েছে। এমার্সনের Over-soul আর উপনিষদের পরমাত্মাও এক। পার্থক্য কেবল ভাষায়। আমেরিকার চিত্তভূমিকে প্রস্তুত করে রেখেছিল হুইট্‌ম্যানের চিন্তাধারা। সেই ভূমিতে পড়্‌লো বিবেকানন্দের বেদান্তবাদের বীজ। সে বীজ এত সহজে তাই পরিণত হোলো মহীরুহে।

ঈশ্বর সর্বভূতান্তরাত্মা—এই উপলব্ধি যাঁর চেতনায় সত্য হয়ে উঠেছে তিনিই শুধু ভেদবুদ্ধিকে অতিক্রম করতে পেরেছেন। ঠাকুর ঈশ্বরকে দেখেছিলেন তাঁর সমস্ত চৈতন্য দিয়ে। তাই সামান্ত বিড়ালকে পর্যন্ত তিনি উপেক্ষা করতে পারেননি। কথামৃতের চতুর্থ খণ্ডে আছে :

"তাঁকে দর্শন হলে তখন বোঝা যায় যে তিনিই জীব জগৎ হয়েছেন। তাইতো বিড়ালকে ভোগের লুচি খাইয়েছিলাম। দেখলাম মা-ই সব হয়েছেন—বিড়াল পর্যন্ত।"

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ এবং গান্ধীজী এঁরা দুজনেই মানুষকে কখনো ছোট করে দেখেন নি। জীবনের পথে চলতে চলতে এঁরা সবাইকে দিয়েছেন কোল, সবাইকে দিয়েছেন মর্যাদা। প্রতিবেশীর ধর্মবিশ্বাসকে গৌরব দান করেছেন অকুণ্ঠচিত্তে। গান্ধী লিখেছেন :

It takes a man all his time to become a good Hindu, a good Christian, or a good Musulman. It takes me all my time to be a good Hindu, and I have none left over for evangelising the animist; I cannot really believe that he is my inferior.

'একজন খাঁটি হিন্দু, খাঁটি খ্রীষ্টান অথবা খাঁটি মুসলমান হতে গেলে সারাক্ষণের সাধনা চাই। খাঁটি হিন্দু হওয়ার জন্য আমাকে সবটুকু সময় ব্যয় করতে হয়। পৌত্তলিককে ধর্মান্তরিত করবার আমার অবকাশ কোথায়? আমি সত্যই ভাবতে পারিনে—সে আমার চেয়ে কোন অংশে ছোট।'

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতেরও চতুর্থ ভাগে আছে :

"আমি সব রকম করেছি—সব পথই মানি। শাক্তদেরও মানি, বৈষ্ণবদেরও মানি, আবার বেদান্তবাদীদেরও মানি। এখানে তাই সব মতের লোক আসে।"

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত শ্রদ্ধার সঙ্গে যে পাঠ করেছে সে কখনও ভেদবুদ্ধিকে প্রশ্রয় দেবে না; গান্ধীজীর চিন্তাধারাও সর্বপ্রকারের ভেদবুদ্ধির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে। প্রতিবেশীর ধর্ম-বিশ্বাসকে শ্রদ্ধা করবার এই যে উদার মনোভাব—এই ঔদার্য শ্রীরামকৃষ্ণ এবং গান্ধীজী—উভয়েরই ভাবধারার বৈশিষ্ট্য। রোমাঁ রোলাঁ (Romain Rolland) ঠিকই লিখেছেন : In my opinion Gandhi, when he stated it so frankly, showed himself to be the heir of Ramakrishna. স্বেচ্ছায় ধর্মান্তর-গ্রহণের মধ্যেও গান্ধীজী খুসী হবার কোন কারণ দেখেননি। তিনি বলতেন, কেউ কেউ যদি মনে করেন ধর্ম বদলানোই তাঁদের কর্তব্য তবে তাঁদের সে স্বাধীনতা নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু কাউকে ধর্মান্তর গ্রহণ করতে দেখলে আমি দুঃখই অনুভব করি। এই দিক থেকেই রোমাঁ রোলাঁ গান্ধীজীকে বলেছেন রামকৃষ্ণের উত্তরসাধক।

ঠাকুর এবং গান্ধীজী—দুজনেই অহিংসা ও সত্যকে বিশেষ মূল্য দিয়েছেন। গান্ধীজীর কাছে Truth is God. কথামৃতের প্রথম ভাগে আছে :

"শিবনাথকে দেখলে আমার আনন্দ হয়, যেন

ভক্তিরসে ডুবে আছে আর যাকে অনেকে গণে মানে তাতে নিশ্চয়ই ঈশ্বরের কিছু শক্তি আছে। তবে শিবনাথের একটা ভারি দোষ আছে—কথার ঠিক নাই। আমাকে বলেছিল যে, একবার ওখানে ( দক্ষিণেশ্বরের কালীবাটীতে ) যাবে, কিন্তু যায় নাই, আর কোন খবরও পাঠায় নাই; ওটা ভালো নয়। এই রকম আছে যে, সত্য কথাই কলির তপস্যা। সত্যকে আঁট করে ধরে থাকলে ভগবান লাভ হয়। সত্যে আঁট না থাকলে ক্রমে ক্রমে সব নষ্ট হয়। আমি এই ভেবে, যদিও কখনও বলে ফেলি যে বাহ্যে যাবো, যদি বাহ্যে নাও পায় তবুও একবার গাড়ুটা সঙ্গে করে ঝাউতলার দিকে যাই। ভয় এই—পাছে সত্যের আঁট যায়। আমার এই অবস্থার পর মাকে ফুল হাতে করে বলেছিলাম, মা! এই নাও তোমার জ্ঞান, এই নাও তোমার অজ্ঞান, আমায় শুদ্ধা ভক্তি দাও। মা, এই নাও তোমার শুচি, এই নাও তোমার অশুচি, আমায় শুদ্ধা ভক্তি দাও মা; এই নাও তোমার ভালো, এই নাও তোমার মন্দ, আমায় শুদ্ধা ভক্তি দাও মা; এই নাও তোমার পুণ্য, এই নাও তোমার পাপ আমায় শুদ্ধা ভক্তি দাও। যখন এই সব বলেছিলুম, তখন একথা বলিতে পারি নাই, মা, এই নাও তোমার সত্য, এই নাও তোমার অসত্য। সব মাকে দিতে পারলুম, 'সত্য' মাকে দিতে পারলুম না।"

ঠাকুর মনে করতেন, সত্যনিষ্ঠা সাধনমার্গের অপরিহার্য পাথেয়; সত্যে অনুরাগ না থাকলে ঈশ্বরের উপলব্ধি অসম্ভব। কেউ মিথ্যা কথা বললে ঠাকুর তার উপর খুবই বিরক্ত হতেন। শিবনাথ কথা দিয়ে কথা রাখেন নি এই ব্যাপারে ঠাকুর যেমন বিরক্ত হয়েছিলেন নিরঞ্জনের আচরণেও ঠাকুর তেমনি বিরক্ত হয়েছিলেন। নিরঞ্জন সম্পর্কে ঠাকুর একবার মণিমল্লিককে বলেছিলেন: "দেখ, ছোকরাটি ভারি সরল। তবে আজ কাল একটু আধটু মিথ্যা কথা কয় এই যা দোষ। সে দিন বলে গেল যে আসবে, কিন্তু আর এলো না।"

যদু মল্লিক ঠাকুরের কাছে অঙ্গীকার করেছিলেন বাটীতে চণ্ডীর গান দিবেন। অনেকদিন অতীত হয়ে গেছে—যদুর প্রতিশ্রুতি-পালনের কোন লক্ষণ দেখা গেল না। ঠাকুর জিজ্ঞাসা করলেন: 'কৈ গো চণ্ডীর গান?' যদু উত্তর দিলেন: 'নানান্ কাজ ছিল, তাই এতদিন হয় নাই।' ঠাকুর বিরক্ত হয়ে বলেছিলেন, 'সে কি! পুরুষ-মানুষের এক কথা। পুরুষকী বাত, হাতীকী দাঁত।' সত্য দিয়ে সেই সত্যকে না রাখার দুর্বলতাকে ঠাকুর কখনও প্রশ্রয় দিতেন না।

আর একবার ঠাকুর কোথায় নিমন্ত্রণ খেতে গিয়ে বলেছিলেন লুচি খাবো না। শেষ পর্যন্ত মিষ্টি দিয়ে পেট ভরিয়েছিলেন। লুচি খাবেন না যখন বলে ফেলেছিলেন তখন মিষ্টি দিয়ে পেট ভরানো ছাড়া উপায়ান্তর ছিল না।

ভারতবর্ষীয় সংস্কৃতিতে ঈশ্বরলাভই জীবনের উদ্দেশ্য। ঠাকুর এবং গান্ধীজী ঈশ্বরলাভকেই জীবনের পরম লক্ষ্য বলে ঘোষণা করেছেন। ভারতীয় সংস্কৃতি বলেছে—ঈশ্বরলাভ করতে হলে চিত্তের স্থৈর্যের প্রয়োজন আছে, আর সত্য অহিংসা ব্রহ্মচর্য অস্তেয় এবং অপরিগ্রহ ছাড়া ঈশ্বরে মনকে যুক্ত রাখা সম্ভব নয়। গান্ধীজী এবং ঠাকুর দুজনেই তাই ভোগবাদকে কোন মূল্যই দেন নি। আত্মসংযমের আদর্শ দুজনেরই জীবনে এবং বাণীতে পূজা পেয়েছে। স্থিতপ্রজ্ঞ হবার আদর্শকে দুজনেই সমান মর্যাদা দিয়েছেন। দুজনেরই জীবন ভগবদ্গীতার জীবন্ত ভাষ্য। অনাসক্তির জয়ধ্বজাকে দুজনেই উড্ডীন রেখেছেন। যম ও নিয়মকে দুজনেই ধর্মসাধনার অপরিহার্য অঙ্গ বলে ঘোষণা করেছেন।

যেমন সত্য-সম্পর্কে, তেমনি অহিংসাসম্পর্কেও গান্ধীজী এবং ঠাকুর একমত। ভারতের সাধনা ভয়ের মতো ক্রোধকেও জয় করবার উপরে বারংবার জোর দিয়েছে। দক্ষিণ আফ্রিকায় থাকতে এক পাঠান গান্ধীজীর মাথায় একবার লাঠি মেরেছিল। তাকে ক্ষমা করেছিলেন তিনি। সেই পাঠান শেষে গান্ধীজীর পরম ভক্ত হয়ে উঠেছিল। ঠাকুরও এসেছিলেন কেবল ঈশ্বরের অস্তিত্ব-সম্পর্কে আমাদিগকে নিঃসংশয় করবার জন্য নয়, ঈশ্বরকে পেতে হলে কি রকম করে ক্রোধ বশীভূত করতে হয় তাও শেখানোর জন্য। ঠাকুরকে একবার এক জন দুষ্ট লোক বুটজুতার গোঁজা মেরেছিল। ঠাকুর কি রকম করে ক্রোধকে বশ করেছিলেন তার অপরূপ কাহিনী শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃতে আছে। ঠাকুর নিজের মুখে তার বর্ণনাপ্রসঙ্গে বলেছেন :

"সে কালীঘাটের চন্দ্র হালদার। সেজো বাবুর কাছে প্রায়ই আসতো। আমি ঈশ্বরের আবেশে মাটিতে অন্ধকারে পড়ে আছি। চন্দ্র হালদার ভাবতো, আমি ঢং করে ঐরকম হয়ে থাকি বাবুর প্রিয়পাত্র হব বলে। সে অন্ধকারে এসে বুট জুতার গোঁজা দিতে লাগলো। গায়ে দাগ হয়েছিল। সবাই বল্লে, সেজো বাবুকে বলে দেওয়া যাক। আমি বারণ করলুম।"

'আপনি আচরি ধর্ম পরেরে শিখাও'—এই আদর্শের জীবন্ত দৃষ্টান্ত গান্ধীজী ও ঠাকুর। ঠাকুর যে যুগাবতার এতে কোন সন্দেহ নেই। ভারতবর্ষের বর্তমান জীবনধারাকে শাসন করছেন ঠাকুর এবং বিবেকানন্দ। রোলাঁ (Romain Rolland) ঠিকই লিখেছেন : The twin star of the Paramahamsa and the hero who translated his thought into action, dominates and guides her present destinies.

'পরমহংস এবং যে বীর তাঁর চিন্তাধারাকে কার্যে পরিণত করেছিলেন—এই দুই যুগ্ম তারকা ভারতের ভবিতব্যকে পরিচালিত করছে।' অরবিন্দ, রবীন্দ্রনাথ এবং গান্ধীজী—এঁদের প্রতিভা রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের ভাবধারায় পরিপুষ্ট। রোলাঁ ঠিকই বলেছেন :

The present leaders of India : the king of thinkers, the king of poets and the Mahatma—Aurobindo Ghosh, Tagore and Gandhi—have grown, flowered and borne fruit under the double constellation of the Swan and the Eagle—a fact publicly acknowledged by Aurobindo and Gandhi.

ঠাকুর এবং গান্ধীজী দুজনেই অহিংসা ও সত্যকে আদর্শ হিসাবে বর্তমান ভারতের কাছে বরণীয় করে ধরেছেন। গান্ধীজীর বৈশিষ্ট্য অহিংসা ও সত্যকে একটা বিরাট জাতির রাজনৈতিক জীবনে রূপ দেবার সাধনায়। যা মোক্ষকামী ব্যক্তিবিশেষের সাধনার বস্তু ছিল তাকে তিনি স্বাধীনতা-আন্দোলনে জনগণের অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করেছেন।

---

**জীবন ক্ষণস্থায়ী, কিন্তু আত্মা অবিনাশী ও অনন্ত ; অতএব যখন মৃত্যুই নিশ্চয়, তখন এস, একটি মহান্ আদর্শ লইয়া উহাতেই সমগ্র জীবন নিয়োজিত করি।**

**স্বামী বিবেকানন্দ**

# শ্রীশ্রীমায়ের কথা

শ্রীমতী ক্ষীরোদবালা রায়

কালীপূজার দিন সন্ধ্যাবেলায় আমি শ্রীশ্রীমাকে দর্শন করিতে গিয়াছি। সেদিন মায়ের বাড়ীতে অত্যন্ত ভীড়। যাওয়ার পথে আট আনা দিয়া পাঁচটি চাঁপাফুল কিনিয়া লইয়া গিয়াছিলাম। অতিকষ্টে সেই ফুল কয়টি মায়ের পাদপদ্মে দিলাম। তখনি মা বলিলেন, আজকে বড় ভীড়। এখানে থেকে কোন কাজ নেই। তুমি সুধীরার সঙ্গে দেখা করে গৌরদাসীর ওখানে যাও, তার সঙ্গে কথাবার্তা বলে বাসায় চলে যেয়ো। এই কথা শুনিয়া একেবারে অবাক হইয়া গেলাম। মায়ের এরূপ আদেশ তো কখনও পাই নাই। সারদেশ্বরী আশ্রম কিংবা নিবেদিতা স্কুলে আমি কখনও যাই নাই। বলিলাম, গাড়ী করে যাব, না পায়ে হেঁটে যাব? সঙ্গে কেউ যাবে কি, না আমি একাই যাব? মা বলিলেন, পায়ে হেঁটে যাবে, একাই যাবে। চিরদিনই কি তুমি ছেলেমানুষ থাকবে? যাও—এসো গে।

অমনি মায়ের নাম লইয়া, কোন বিষয়ের বিচার না করিয়া বাহির হইয়া পড়িলাম। রাস্তার লোককে জিজ্ঞাসা করিয়া করিয়া খুব সহজেই সুধীরাদির ইস্কুল বাড়ীতে পৌঁছিলাম। সুধীরাদি আমাকে দেখিয়া একেবারে অবাক হইয়া গেলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, রাত্রিবেলা তুমি কি করে এলে আবার? কেন এসেছ?

বলিলাম, জানি না কেন এসেছি; মা এখানে আসতে বল্লেন তাই এলাম। ইহা শুনিয়া সুধীরাদি তাঁহার স্কুলের মেয়েদের ডাকিয়া দিলেন, তোমরা পড়াশুনা বন্ধ করে এখানে এসো। ক্ষীরোদদিদি মার কাছ থেকে এসেছে, তাকে এসে দেখো।

সব মেয়েরা আসিয়া আমাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। 'মায়ের আদেশে এক্ষুনি আমাকে সারদেশ্বরী আশ্রমে যেতে হবে'—এই বলিয়া আমি রওনা হইতে চাহিলাম। সুধীরাদি বলিলেন, একাই যাবে? আমি বলিলাম, একা যাওয়ারই আদেশ। রওনা হইয়াছি। আমার সঙ্গে সঙ্গে ঐ বোর্ডিং-এর বাহিরের ঘর হইতে এক ভদ্রলোক আমার পিছনে পিছনে চলিলেন। তাঁহার সঙ্গে আমার কোন পরিচয় নাই, অথচ তিনি আমার সঙ্গে চলিয়াছেন দেখিয়া আমার বুকটা দুরদুর্ করিতে লাগিল। গৌরীমা যেরূপ কড়া লোক ছিলেন তাহাতে এই লোককে আমার সঙ্গে দেখিয়া হয়তো আমাকে বকুনি দিবেন। আমি ঐ ভদ্রলোকের সঙ্গে কোন কথাবার্তা বলি নাই। সারদেশ্বরী আশ্রমের দরজায় উপস্থিত হইয়া দরওয়ানকে বলিলাম, মাজীকে ডাক। বল, বাগবাজার মায়ের ওখান থেকে একজন মেয়ে আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন।

একটু পরেই গৌরীমা একহাতে ঘৃতের প্রদীপ ও একহাতে ধুনুচিতে ধূপ জ্বালাইয়া নীচে নামিলেন। আমি প্রণাম করিতে গেলে বলিলেন, আজকে কি আমি তোর প্রণাম নিতে পারি? কিছুতেই প্রণাম নিলেন না। গৌরীমা অনেকক্ষণ ধরিয়া আমার মুখের কাছে আরতির মত করিতে লাগিলেন। আমি অবাক হইয়া গেলাম। ইহা করার পরই পূর্বোক্ত ভদ্রলোকটি তাঁহাকে প্রণাম করিতে গেলেন। তৎক্ষণাৎ গৌরীমার চেহারা

বদলাইয়া গেল। ঐ ভদ্রলোককে বলিলেন, কোত্থেকে এসেছ? তোমার বাড়ী কোথায়? এখানে কেন এসেছ? তিনি বলিলেন (আমাকে দেখাইয়া), উনি সুধীরা বসুর কাছে গিয়েছিলেন এবং তাঁর নিকট এখানে আসবেন বলে বললেন; ভাবলাম আমি তো আপনাকে দেখিনি, ওঁর সঙ্গে এলে আপনাকে দেখতে পাব, তাই এসেছি।

গৌরীমা জিজ্ঞাসা করিলেন—তোমার কি নাম? বলিলেন, কর্ণাটকুমার চৌধুরী। তিনি এই কথা বলিতেই আমি তাঁহাকে চিনিয়া ফেলিলাম। তাঁহার নাম শুনিয়াছি বটে। গৌরীমা বলিলেন, চিনেছি। তোমার বাড়ী সিলেটে, ব্রাহ্মণডোরা গ্রামে। তা গৌরীমা তো পর্দানশীন নন যে তাঁকে দেখতে হলে এখানে আসতে হবে। সাধু দেখতে হলে বেলুড়ে যেয়ো; মেয়েমানুষ সাধু কি দেখবে?

ঐ ভদ্রলোক বলিলেন, রবিবারে এলে বোধ-হয় আপনার সঙ্গে কথাবার্তা বলতে পারব?

গৌরীমা বলিলেন, না না—এখানে আমার মেয়েরা সব রয়েছে; এখানে দেখা হবে না।

এই বলিতেই ভদ্রলোকটি প্রণাম করিয়া চলিয়া গেলেন। তখন গৌরীমা আমার দিকে ফিরিয়া বলিতে লাগিলেন—শ্রীশ্রীমাকে তুমি কি মনে কর? মা যে শুধুই কৈলাসেশ্বরী। তাঁকে মানুষ ভাবা চলে না। মা জগদ্‌গুরু, বিশ্বজননী, তাঁকে গুরুত্বে বরণ করেছ। আর ভাবনা কি আছে? তাহার পর প্রায় দুইঘণ্টা কাল মায়ের এবং ঠাকুরের কথা বলিতে লাগিলেন। আমি দরজায় যেভাবে দাঁড়াইয়াছিলাম, সেই ভাবেই দাঁড়াইয়া রহিলাম। গৌরীমাও দাঁড়াইয়াই কথা কহিতে লাগিলেন। হঠাৎ গৌরীমা আমাকে ধরিয়া বলিলেন, চল মাকে পূজা করতে যাব। আমি বলিলাম, বাগবাজারে পুনরায় যাওয়ার আদেশ আমার নেই। বিশেষ রাত হয়ে গেছে, পরে আমি কি করে যাব? গৌরীমা বলিলেন, চল আমি মাকে বলব। আমি গৌরীমার সঙ্গে চলিলাম। ছোট দুইটি মেয়েকেও তিনি সাথে লইলেন। একটির হাতে ফুলবেল-পাতা ও অপরটির হাতে ফল-মিষ্টি। গৌরীমার হাতে একটি কমণ্ডলু ছিল। রাস্তা তিনি একেবারে গুলজার করিয়া চলিলেন। দুই পাশের লোক অবাক হইয়া চাহিয়া রহিল। মায়ের বাড়ীর দরজায় যাইয়াই শুনিলাম, মা বলিতেছেন, এই গৌরদাসী এসেছে রাস্তা গুলজার করে। সেখানে যাইয়া বুঝিলাম গৌরীমার পূজাই মায়ের আজিকার শেষ পূজা। আর সকলেই পূজা করিয়া ফেলিয়াছেন। গৌরীমা ৺কালীপূজার মতই অনেক সময়ব্যাপী পূজা করিলেন। সেই পূজা একটি দেখিবার জিনিষ বটে। পরে সকলেই প্রসাদ পাইলেন। গৌরীমা বলিলেন, ক্ষীরোদকে আবার এখানে নিয়ে এলাম। সে বলেছিল, তোমার আদেশ নেই। আমি বললুম, মাকে বলব।

মা বলিলেন, বেশ করেছ।

সেদিন মায়ের বাড়ীতেই থাকা গেল। সে রাত্রিটা যে কি আনন্দে কাটিয়াছিল, তাহা জীবনে ভুলিব না।

আমার বিধবা হওয়ার এক বৎসর পূর্বেই একদিন আমি অনেকগুলি পেঁপে কাটিয়া তরকারী রান্না করিয়াছিলাম। সেই পেঁপের কষ্ হাতে লাগিয়া হাত চুলকাইয়া ভীষণ ভাবে আঙ্গুল-গুলি ফুলিয়া কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ফাটিয়া গেল এবং এমন ভীষণ ভাবে হাতে ঘা হইল যে, বহু চিকিৎসাতেও আর ভাল হইল না। সেই ঘা ১২ বৎসর থাকে। চামচ দ্বারা ভাত খাইতে হইত। সময় সময় একটু কম থাকিত। যখন বেশী হইত, তখন হাতে জল ঢালিলে মাংস পর্যন্ত পচিয়া উঠিত। শ্রীশ্রীমায়ের কাছে আজ একবৎসর যাবৎ

আছি, কিন্তু একদিনও মাকে হাতখানা দেখাই নাই। আমার অনিত্য দেহের কথা মাকে বলিব না, এবং এই উৎকট ব্যাধি মা দেখিলে যদি তাঁহার দেহের কোন ক্ষতি হয় সেজন্ত তাঁহার নিকট অতি গোপনে রাখিয়াছি। বেশী বাড়িলে মার ওখানে যাইতাম না। একদিন বেশী ঘা নিয়াই চলিয়া গেলাম। সেখানে যাইয়া মাকে প্রণাম করিলাম না, পাছে প্রণাম করিলে পায়ের ধূলা লইবার সময় মা ধরিয়া ফেলেন। এই চিন্তায় একেবারে অস্থির হইয়া পড়িয়াছি। এমন সময় দেখি একটি বিধবা মেয়ে মাকে প্রণাম করিয়া হাতে কাপড় জড়াইয়া পায়ের ধূলা লইলেন। ইহা দেখিয়া মনে খুব আনন্দ হইল। আমিও মাকে প্রণাম করিয়া হাতে কাপড় জড়াইয়া পায়ের ধূলা লইলাম। প্রণামের সঙ্গে সঙ্গে মা অতি আশ্চর্য হইয়া বলিলেন, বৌমা, হাতে কাপড় জড়িয়ে ধূলা নিলে কেন? তোমার হাতে কি কোন অসুখ আছে?

তখন মহা বিপদে পড়িলাম, বুক কাঁপিতে লাগিল। ভাবিলাম ঐ মেয়েটিকে ত বলিতে পারিতেন। তাহাকে না বলিয়া আমাকে বলিলেন, 'এই ভাবে কেন ধূলা নিলে?' বলিলাম, হাতে অসুখ আছে। আবার বলিলেন —দেখি। হাত দেখিয়া এমন ভাবেই দুঃখ করিতে লাগিলেন যে, শুনিয়া অবাক হইয়া গেলাম। বলিলেন, আহা বাছা, তুমি এতদিন এখানে আছ, আর তোমার হাতে এরূপ ব্যাধি— আমি তোমাদের মা, আমি জানি না। বাছা, আমার এত কষ্ট হচ্ছে। কতদিন ধরে এই রোগ হয়েছে এবং কি করে হল—জিজ্ঞাসা করায় আমি সব কথা বলিলাম। মা বলিলেন— বাছা, আমি এখন এমনই হয়েছি আমাতেই আমি ডুবে থাকি। তোমাদের দিকে বড় তাকাই না। এই হাত দিয়ে ঠাকুরপুজো কর, এতেই রোগ ধরে রয়েছে! যাক্, আমার সঙ্গে এস। ঠাকুরপুজোর নির্মাল্য ও চরণামৃত গঙ্গায় ফেলিবার জন্ত এখনই নিয়ে যাবে। তাড়াতাড়ি এস। মায়ের সঙ্গে অন্ত ঘরে গেলাম। মা বলিলেন, ঐ দেখ কমণ্ডলুতে ঐ সব রয়েছে; সবটা হাত এতে ডুবিয়ে দাও। তাহাই করিলাম। বলিলেন, আর হাতে অসুখ থাকবে না। তবে মাছ মাংস রশুন পেঁয়াজে হাত না দিয়ে যতদূর পার থেকো। ওসব একেবারে না ধরেও ত পারবে না। এসব ঘাঁটাঘাঁটি করলেই একটু ফুটতে পারে। ঠাকুরপুজো ত রোজই করবে। একটু ফুটলেই ঠাকুরের চরণামৃত দিও। তবেই সেরে যাবে। যেদিন পেঁপে কেটেছিলে সেদিন কি ক্ষৌরী করেছিলে? বলিলাম, মনে নেই। মা বলিলেন, ক্ষৌরীও করেছিলে এবং পেঁপের কষ্ও লেগেছে। দুটোতে মিলেই ঐ সব হয়েছে। বিকাল বেলা অন্যান্ত মেয়েদের কাছে বলিলেন, ওগো, তোমরা সকলকেই বলছি তোমাদের স্বামী পুত্র এবং তোমরা নিজেরাও নাপিতের নরুন দিয়ে ক্ষৌরকার্য করো না। এতে অনেক খারাপ রোগ হতে পারে। এইত বৌমার হাতে এরূপ হয়েছে। অবশ্য ঠাকুরের ইচ্ছায় এ থাকবে না। সেদিন একসঙ্গে বসে খাওয়া, এক বিছানায় দুজন শোওয়া, একজনের কাপড়-গামছা অপরের ব্যবহার করার কত দোষ, কি ভাবে একজনের দেহের ভাল বা মন্দ অন্যের দেহে যায় এইসব বলিলেন। আশ্চর্যের বিষয় আমার জীবন-যাপন কি ভাবে হইতেছে, যেখানে থাকি সেখানে বাধ্য হইয়া মাছ-মাংসও রান্না করিতে হয়। কিন্তু আমি এই সব কথা মাকে ভুলেও বলি নাই। কিন্তু মা বলিলেন, ও সব না করে পারবে না, করলেই

হাত ফুটবে, ঠাকুরের চরণামৃত দিলেই সেরে যাবে। আশ্চর্যের বিষয়, যেদিন চরণামৃতে হাত ডুবাইলাম, তাহার পরদিন হইতে জীবনের জন্ম ভাল হইয়া গেলাম, কিন্তু মাছ মাংস প্রভৃতিতে হাত দিলেই হাতে গুটি গুটি বাহির হইত এবং ঠাকুরের চরণামৃত দিলেই ঘণ্টা কাল পরেই দেখি যে কিছুই নাই। আমি কিন্তু ঐ ব্যাধি সারিবার পরই মাকে বলিয়াছি—মা, দেহের ব্যাধি সারাবার জন্ম তোমার কাছে আসি নি। তুমি এই পর্যন্ত দিয়েই আমাকে বিদায় করতে পারবে না। মা হাসিয়া বলিলেন, তোমাদের দেহ যে মা, আমার দেহ। তোমাদের দেহ ভাল না থাকলে আমি যে মা, কষ্ট পাই। দৈহিক বা আর্থিক কিংবা অন্ত কোন বিষয় মুখে কেন মনে মনেও চাহিব না, ইহা আমার সংকল্প। আমার ভয়, কি জানি মা ঐ সব দিয়াই বিদায় দেন। ভজনে কিছু হইতেছে কি না বুঝিতেছি না বলিলে বলিতেন, আমি গুরু, হয় কি না হয় আমি জানি, তুমি কি করে বুঝবে? সব হবে, সব হবে—ভজনের অন্তরায় বাইরে বেশী থাকে না, ভিতরেই থাকে। ওসব ঠাকুরের নাম করতে করতে এবং ধ্যান-ধারণা করলে একটা একটা করে পড়ে যাবে। কাজ করে যাও, রইল কি গেল, সে দিকে তাকিও না। বলিতেন, নারকেল গাছের বাল্‌তো যেমন সময়ে আপনা হতেই পড়ে যায়, সময় না হলে সেটা ফেলতে অনেক জোর দিতে হয়, সেই রকম। সময় হলে সব যাবে। তাঁর জপে ও ধ্যানে ডুবিয়া থাকার অবস্থা কেন আসে না জিজ্ঞাসা করিলে বলিতেন, সবই ত করছ সবই হচ্ছে। যে বয়সে বিধবা হয়ে যে ভাবে এখানে এসে পৌঁছেছ, মা, তাই যথেষ্ট। তোমার বেশী কিছু করতে হবে না, দিনান্তে ঠাকুরকে ছুটো প্রণাম দিলেই হবে। মানুষের একটি জিনিষ যদি ঠিক থাকে, তবে আর কিছুই লাগে না। আপনা আপনি সব তোমার হয়ে যাবে।

দশ বৎসরে আমার বিবাহ হয়; ১৫ বৎসরে বিধবা হইয়াছি। যখন বুঝিলাম আমাকে আমি রক্ষা করিতে পারিব না, তখনই মায়ের কাছে যাই। মায়ের পাদপদ্মে আশ্রয় নিয়া বলিলাম—মা, আমাকে তোমার পাদপদ্মে দিলাম, তুমি আমাকে রক্ষা করো। মা বলিলেন, কোন ভয় নেই। ঠাকুর তোমাকে হাত ধরে নিয়ে যাবেন। বাস্তবিক, আমার মায়ের বাক্য এত শুদ্ধ যে তাঁহার মুখ দিয়া যাহাই বাহির হইয়াছে তাহার একটি কথাও অযথা হয় নাই। এখন আমার বয়স ৬০ এর কাছাকাছি, মায়ের পদ্মহস্ত আমার মাথায় পড়িয়াছে, আমার হাত মাথা মায়ের পায়ে ঠেকাইয়াছি, আমি ধন্ত হইয়া গিয়াছি, পবিত্র হইয়া গিয়াছি এবং মায়ের শ্রীমুখের বাক্য 'কোন ভয় নেই, ঠাকুর হাত ধরে নিয়ে যাবেন'—ইহাতেই এত দীর্ঘ জীবন যাপন করিলাম একদিনও ভোগ-বাসনা বুঝিলাম না। শুধুই আনন্দ, শুধুই আনন্দ! দীক্ষার দিন ছাড়া আর একদিনও বলেন নাই আমি কি করিব; বলিতেন সবই ঠাকুর করিবেন। আমাদের বুঝিতে ভুল হইতে পারে, কিন্তু তাঁর বাক্য সত্য। সব সময় তাঁহাকে না ডাকিলেও তাঁহার আশ্রিত সন্তানকে আপদে বিপদে তিনি রক্ষা করিয়া থাকেন। তাঁহার কৃপা ভিন্ন কেহই বাহাদুরী করিয়া সংসার-বন্ধন জয় করিতে পারিবে না। ইহা বেশ বুঝিয়াছি।

'শুধু হাতে ঠাকুর-দেবতা দর্শন করতে নেই, ইহা মায়েরই বাক্য; সেই জন্ম রোজই একটু কিছু লইয়া মায়ের কাছে যাই। একদিন মা বলিলেন, তোমার পয়লা-

কড়ি নেই, তুমি রোজই এসব নিয়ে আস কেন মা? একটা হরীতকী হাতে করে নিয়ে এসো। এতেই হবে, আমি তোমাদের মুখ দিয়ে যে খাই মা! তোমরা খেলেই আমার খাওয়া হয়। ঠাকুরের রাজ্যে এসে কতই খেয়েছি। তোমার শরীর ভাল না, তুমি ওসব খাও।

আমার মেজদার গুরুতর অসুখ হইয়াছে; চিকিৎসার জন্য তিনি কলিকাতা গিয়াছেন। ডাক্তার সর্বাধিকারী অপারেশন করিবেন। আমাদের পরিবারের সকলেই কলিকাতা আসিয়াছেন। শুনিলাম, এই অপারেশনে রোগী বাঁচিবে কি মরিবে ডাক্তারই বলিতে পারেন না। আমি মায়ের কাছে মেজদাকে লইয়া গেলাম। সেদিন রবিবার। বিকালে ছেলেরা প্রণাম করিতে আসেন, যাওয়ার পথে মেজদা একছড়া ফুলের মালা মায়ের পায়ে দিবার জন্য নিয়া গিয়াছেন। সে মালা আমি দেখি নাই। সেখানে যাইয়া ভাবিতে লাগিলাম, এত লোকের সঙ্গে মাকে প্রণাম করিবেন, আমি কাছেও থাকিতে পারিব না। মা কি তাঁহাকে লক্ষ্য করিবেন? যাহাই হউক, যখন প্রণামের সময় হইল আমরা এক ঘরে বন্ধ হইয়া গেলাম। প্রণাম শেষ হইয়া গেলে মা রাধুকে ও আমাদের ডাকিলেন। অনেকগুলি ফুল ও মালা সরাইয়া রজনীগন্ধার একটি মাথা রাধুর হাতে দিয়া বলিলেন, ইহা বৌমার ভাই আমাকে দিয়েছে। বলিলেন, আমি তোমার ভাইকে দেখেছি। আমি অবাক হইয়া গেলাম। আর কোন দিন মেজদা এখানে আসেন নাই; ভাবিতে লাগিলাম, রজনীগন্ধার মালাই তিনি আনিয়াছিলেন কি না। অনেক মালার মধ্যে একটিমাত্র রজনীগন্ধার মালাই দেখিলাম। মাকে বলিলাম—মা, এঁরই জন্যে সংসারে থাকতে ইচ্ছা নেই। এঁদের কাছ থেকে দূরে থাকবার জন্য তোমার কাছে এত কেঁদেছিলাম। যদি তিনি মরে যান তা'হলে ওসব আমাকেই ভুগতে হবে। মা, সংসারীদের মধ্যে রয়েছি বলেই ত তোমার পদতলে থেকেও আর বাঁচতে পারি না। এখন কি হবে, কি করব বল? মা বলিলেন, তোমার ভাই এই অপারেশনে যদি নাও মরে, একদিন ত মরবে? আর বেঁচে থাকলেই বা তোমার কি উপকার হবে—সেজন্য এত ভাববে কেন? ভাবিলাম, বুঝি এবার মেজদা রক্ষা পাবেনই না। তখনই মা বলিলেন—ভয় নেই, ঠাকুর আছেন, যে ঘরে অপারেশন হবে সে ঘরে ঠাকুরের একখানা ফটো রেখে দিও, তিনি রক্ষা করবেন। ইহা শুনিয়াই বাসায় ভাসিয়া সকলের নিকট বলিলাম। সকলেই বলিতে লাগিলেন, আর ভয় নেই, জীবন্ত কালী ছুঁয়ে এসেছে, ভয়ের কোনই কারণ নেই। সেই অপারেশন একটা বিরাট ব্যাপার—যথা সময়ে হইয়া গেল। ঠাকুরের ফটোও রাখা হইল, মায়ের কৃপায় মেজদা সুস্থ হইয়া দেশে আসিলেন। আমার কাকা, বড়দা ইঁহারা কালীদর্শনের কথা বলায় এইরূপ মতপ্রকাশ করেন, যে কালী শ্রীশ্রীঠাকুর নিজে পূজা করিয়াছিলেন সেই কালী, সেই পা আমরা দর্শন করেছি, স্পর্শ করেছি, আর কোথাও যেতে হবে না। আমিই মায়ের কাছে প্রথম গিয়াছিলাম। এখন মায়ের কৃপায় এই পরিবারের প্রায় সকলেই শ্রীশ্রীঠাকুরের পাদপদ্মে শরণ নিয়াছে।

একদিন বিকাল বেলা আমি মার ওখানে আছি, এমন সময় একটি বিধবা মেয়ে মাকে দর্শন করিতে আসিয়াছে; গলায় তুলসীমালা, গায়ে নামাবলী। ওর আসিবার পূর্বেই মাতাঠাকুরাণী গম্ভীর ভাব ধারণ করিয়াছেন। মেয়েটি এসেই মাকে প্রণাম করিতে গিয়াছে। মা বলিলেন, পায়ে হাত দিও না, মাটিতে প্রণাম

কর। কিন্তু সে তাহা শুনিল না, পা ছুঁইয়াই প্রণাম করিল। ঠাকুরের ফটো প্রভৃতি দেখিয়া একেবারে অবাক হইয়া আমাকে বলিল—দেখেছ কেমন সুন্দর! মা বলিলেন, ওকে কি দেখাবে? তুমি যাকে দেখাচ্ছ সে তাঁর পূজোই করে। আমাকে দেখাইয়া মেয়েটি বলিল, এটি কি আপনার মেয়ে? মা উত্তর দিলেন, হ্যাঁ বাছা। মেয়েটি আবার জিজ্ঞাসা করিল, আপনার কয়টি ছেলেমেয়ে? মা বলিলেন, ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে সকলেই আমার সন্তান। মেয়েটি বলিল, আপনার গর্ভজাত সন্তান ক'জন? মা উত্তর দিলেন, উনি ত্যাগী ছিলেন। এই কথা বুঝিতে না পারিয়া মেয়েটি মাকে একেবারে অস্থির করিয়া তুলিল। আমি নিজেও আর ধৈর্য রাখিতে পারিলাম না। মা আমাকে বলিলেন—তুমি ওকে বুঝাও, আমি আর পারি না। আমি তখন ওকে বলিতে লাগিলাম, তুমি দেখছি মা-সম্বন্ধে কিছুই জান না। তবে কি ভেবে মাকে দেখতে এসেছ? মাকে যারা দর্শন করতে আসে, তারা শুধু দর্শন ও প্রণাম-মাত্রই করে না। মার সম্বন্ধে জানবার অনেক আছে। কত বই-পুস্তকে মায়ের কথা রয়েছে, কত ভক্ত রয়েছেন, এদের কাছেই সব জানা যায়। মার সম্বন্ধে যদি তুমি বিন্দুমাত্রও জানতে তাহলে মাকে এত প্রশ্ন করার সাহস তোমার হত না। যা বলতে হয় আমাকে বল, মার সঙ্গে কথা বলো না। তবু সে মাকে বলিল, আমার মেয়ে এখানে আসে। খুব বড় মূলো নিয়ে সেদিন এসেছিল। মা উত্তর দিলেন, কত লোক কত কিছু দেয়, সে সবের কি আমি খবর রাখি? তোমার মেয়েকে আমি জানি না। ইহার পর সে চলিয়া গেল। মা আমাকে বলিলেন—বৌমা, একটু জল এনে আমার পা ধুইয়ে দাও এবং একটু বাতাস কর। আমি তাই করিলাম। গোলাপমা প্রভৃতি প্রায়ই কাজে ব্যস্ত থাকিতেন। আমি বিকাল বেলাই বেশী যাইতাম এবং তখনই অনেক লোক আসিত। আমি যতক্ষণ থাকিতাম ততক্ষণ মায়ের কাছেই থাকিতাম, এবং ঐ সব কথাবার্তা শুনিতাম। শ্রীশ্রীমা-বিষয়ক বই-এ অনেক কথা আছে যাহা আমি কানে শুনিয়াছি। পুনরুক্তি হইবে বলিয়া আর লিখিলাম না।

---

# বিচিত্র

শ্রীসুরথনাথ সরকার, এম্‌এস্‌-সি

ক্ষণেক্ষণে জেগে-ওঠা কামনার ফাঁদে
নিত্যনব বেদনায় হিয়া শুধু কাঁদে।
বুভুক্ষু অন্তরে দৈন্য, তীব্র হা-হুতাশ
লুপ্ত করে অনন্তের প্রশান্ত আভাস।
মুখরিত হয়ে ওঠে না-পাওয়ার গ্লানি
বড়ো হ'য়ে দেয় দেখা তুচ্ছ অর্থখানি।

মিথ্যার বিপুল দ্বন্দ্ব যবে হয় শেষ
মূঢ়, শ্রান্ত মন করে আপন উদ্দেশ।
ক্লান্তপক্ষ বিহঙ্গম ফিরে যেন নীড়ে—
তোমার মাভৈঃ বাণী আশ্বাস বিতরে।
চিত্ত ভরে ক্ষয়হীন আনন্দের রসে
সকল অভাব গ্লানি মিটে তো নিমেষে।

# অদ্বৈতবাদের উৎপত্তি, বিকাশ ও পরিণতি

শ্রীহরিপদ ঘোষাল, এম্-এ, বি-এল্

বৈদিক যুগে দেবদেবীর ধারণা আর্যদের মনে উদিত হয়েছিল। প্রাকৃতিক বস্তুনিচয়ের ঔজ্জ্বল্য ও শক্তি, দীপ্তি ও প্রভা, কঠোরতা ও নির্মমতা, সৌন্দর্য ও রমণীয়তা তাঁদের চক্ষু আকৃষ্ট করেছিল। এজন্য তাঁরা অগ্নি ইন্দ্র বরুণ প্রভৃতি দেবতাদের কল্পনা করেছিলেন, মানস-নয়নে তাঁদের রূপদর্শন করে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে অমৃতোপম ভাষায় মধুর ছন্দে তাঁদের রূপগুণ বর্ণনা করে তাঁদের কবিজনসুলভ ভাবে ব্যক্ত করেছিলেন। কিন্তু বিভিন্ন দেবতার পৃথক সত্তার পেছনে যে এক অব্যক্ত সত্তা বর্তমান সে তত্ত্বও তাঁরা বিস্মৃত হননি।

দেহাতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্ব-সম্বন্ধে বৈদিক ঋষির কোন সন্দেহ ছিল না। অম্ভৃণ ঋষির কন্যা নিজের আত্মায় সকল দেবতা ও চরাচর নিখিল বিশ্বের অন্তর্ভাব অনুভব করেছিলেন—অন্তরেও আমি, বাইরেও আমি, আমিময় ত্রিভুবন। আত্মার এই সর্বাত্মভাব বিরাট রূপ তাঁর জ্ঞাননেত্রে উদ্ভাসিত হয়েছিল। এজন্য ঋষিকন্যা তাঁর বিশ্বরূপ প্রত্যক্ষ করে বলেছিলেন—

আমিই রুদ্র ও বসুদের সঙ্গে বিচরণ করি। আমিই আদিত্যদের, এমন কি নিখিল দেবতার সঙ্গে অবস্থান করি। আমি মিত্র বরুণ ইন্দ্র অগ্নি এবং অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে ধারণ করে আছি। অখিল বিশ্বে সর্বত্র আমিই অধিষ্ঠিত। আমিই জীবাত্মা হয়ে সকল প্রাণীর মধ্যে আবিষ্ট, দ্যুলোক ভূলোক ও অন্তরিক্ষ লোকের অন্তরালে অধিষ্ঠিত কিন্তু এতে আমি নিঃশেষ হয়ে যাইনি, এদের অতিক্রম করেও বিরাজ করছি।

ঋষি বামদেব ও অন্যান্য ঋষিদের উক্তিতেও সার্বভৌম আত্মজ্ঞানবাদের পরিচয় পাওয়া যায় এবং এই সার্বভৌম আত্মজ্ঞানই বেদোক্ত জ্ঞানের পরাকাষ্ঠা।

সুতরাং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, ঋগ্বেদের যুগে একেশ্বরবাদ স্পষ্ট ঘোষিত হয়েছে। একং সন্তং বহুধা কল্পয়ন্তি, একং সদ্ বিপ্রা বহুধা বদন্তি ইত্যাদি বাক্যে একত্বের মহিমার কথা বলা হয়েছে। তিনিই রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব—তিনি এক হয়েও নানা রূপে প্রকাশিত হয়েছেন। কিন্তু এই সৎ বস্তু সৃষ্টির পূর্বেও বর্তমান ছিলেন, তিনি ছাড়া আর কেউ ছিল না। তবে তিনি থাকলেও অবাঙ্‌মনসগোচর ছিলেন। এজন্য তিনি সৎও নন, অসৎও নন, সকলই অব্যক্ত ও অনির্বচনীয় ছিল। রাত্রির অন্ধকারে যেমন সকল পদার্থ আবৃত থাকে, তেমনি অজ্ঞানের অন্ধকারে স্বধা বা মায়া ছিল তাঁর একমাত্র সহচরী। অসতঃ সদজায়ত কিন্তু অসৎ থেকে সতের উৎপত্তি অসম্ভব, যার অস্তিত্ব নেই সে কখনও কোন বস্তুর জন্ম দিতে পারে না। এখানে অসৎ শূন্য নয়। নির্গুণ নিরাকার ব্রহ্মই অসৎ এবং এর তুলনায় স্থূল জগৎ সৎ।

ঋগ্বেদে যে সৃষ্টিতত্ত্ব, ব্রহ্মবাদ ও আত্মবাদ প্রপঞ্চিত হয়েছে, তাই পরবর্তী যুগের দার্শনিকরা গ্রহণ করে বিশদভাবে আলোচনা করেছিলেন। যে মায়াবাদ শংকর-দর্শনের প্রধান স্তম্ভ, তারও উল্লেখ ঋগ্বেদে আছে। ঋগ্বেদই অদ্বৈতবাদের জন্মস্থান। বহু দেবতা প্রজাপতি বিশ্বকর্মা হিরণ্যগর্ভ প্রভৃতি নামে একত্বে পর্যবসিত হয়েছে, একদেবতাবাদ পুরুষবাদে এবং

পুরুষবাদ আত্মবাদ বা ব্রহ্মবাদে পরিণতি লাভ করেছে।

ঋগ্বেদের ব্রহ্মবাদ উপনিষদে পূর্ণতা লাভ করেছে। প্রাচীনতম উপনিষৎসকল খৃষ্টপূর্ব ২০০০—২৫০০ বৎসর পূর্বে রচিত হয়েছিল। সুতরাং খৃষ্টপূর্ব তিন হাজার বৎসর থেকে খৃষ্টীয় তিন বা চার শত বৎসরের ভিতর বৈদিক ব্রহ্মবাদ উপনিষদে পরিপূর্ণ আকারে দেখা দিয়েছে।

ব্রহ্মের স্বরূপ-সম্বন্ধে উপনিষদের ঋষি বলেছেন যে তাঁর কর ও চরণ সর্বত্র প্রসারিত, সর্বত্র তাঁর চক্ষু, সর্বত্র তাঁর মুখ, সর্বত্র তাঁর মস্তক—সর্বতঃ পাণিপাদং তৎ সর্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্। ব্রহ্ম নির্গুণ। তিনি 'এইরূপ' বলে প্রকাশ করা যায় না—তিনি 'ইহা নন' বলে প্রকাশ করা যায়, তিনি দ্বৈতও নন, অদ্বৈতও নন—তিনি সকল দ্বৈতাদ্বৈতের অবসান, তিনি দেশ কাল ও নিমিত্তের অতীত, পরঃ ত্রিকালাৎ, তিনি বিষয়ীও নন, বিষয়ও নন, তিনি জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের উপরে। নির্বিশেষ ব্রহ্মকে উপনিষদ্ সচ্চিদানন্দস্বরূপ বলেছেন। তিনি আবার 'সত্যস্য সত্যম্' অর্থাৎ পরমার্থ সত্য, আপেক্ষিক সত্য নন। আত্মাই ব্রহ্ম, আত্মাই ভূমা—যিনি ভূমা তিনিই অমৃত। ভূমাব্রহ্মে দ্বৈতের কোন স্থান নেই। তিনি সৎ অর্থাৎ মিথ্যা নন, তিনি চিৎ অর্থাৎ জড় নন, তিনি আনন্দ অর্থাৎ দুঃখরূপ নন। তিনি নিরতিশয় সুখ, নিরতিশয় আনন্দ। মায়াই তাঁর যবনিকা। তিনি অনাদি মায়াজালে নিজেকে আবৃত করে সগুণ ও সবিশেষ হন। তিনি তজ্জলান্—ব্রহ্ম থেকেই জগৎ জাত, তাঁতেই লীন এবং তাঁতেই অবস্থিত।

উপনিষদের ব্রহ্ম বিশ্বরূপী ভূমা—দেশকালের অতীত, বাক্যমনের অতীত। তাঁর স্বরূপ সৎ চিৎ ও আনন্দ—তিনি সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের নিদান। সমস্তই ব্রহ্মময়—ঈশাবাস্যমিদং সর্বম্, আত্মৈবেদং সর্বম্, ব্রহ্মৈবেদং সর্বম্। ব্রহ্মই জগদাকারে বিবর্তিত। তাঁর মায়াই সৃষ্টির কারণ—তিনি মায়াধীশ, মায়ার বশ নন।

যখন সদ্গুরুর সঙ্গ লাভ হয় এবং তিনি বুঝিয়ে দেন যে তুমি ব্রহ্ম, তোমার আত্মাই ব্রহ্ম—অয়মাত্মা ব্রহ্ম, তত্ত্বমসি, তখন আমরা বুঝতে পারি অহং ব্রহ্মাস্মি, সচ্চিদানন্দরূপোঽহম্ নিত্যমুক্তস্বভাববান্। তখন জীব ও ব্রহ্মের ভেদ থাকে না, ঘটাকাশ মহাকাশে লীন হয়, প্রতিবিম্ব বিম্বে মিলিত হয়।

জীবের জীবভাবের মূল কর্ম ও অবিদ্যা। জীব নিজের স্বভাব-অনুসারে কর্ম করে, কর্ম শুভ হলে জীব শুভফল ভোগ করে এবং অশুভ কর্মের ফলে অশুভ ফল ভোগ করে। জীব জন্মে ও মরে, মরে ও জন্মে, এইভাবে জন্মমৃত্যুর আবর্তে ঘুরে। পরলোকে যাওয়ার দুটি পথ আছে, যারা রমণীয়চরণ, যারা কল্যাণকর্ম অনুষ্ঠান করে তারা পরহিতৈষী, মৃত্যুর পর পিতৃযান-মার্গে পরলোকে গমন করে। যাঁরা জ্ঞানী, যাঁরা শ্রদ্ধার সঙ্গে সত্যস্বরূপ ব্রহ্মের উপাসনা করেন তাঁরা দেহাবসানে দেবযান-মার্গে ব্রহ্মলোকে যান এবং সেখানে বাস করেন। কামনার দাস হয়ে কর্মানুষ্ঠান করলে বন্ধনসৃষ্টি হয়। যারা অবিদ্যার উপাসনা করে তারা অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি, তাদের কোন দিনই মুক্তি হয় না। যারা নিষ্কাম কর্ম করে তাদের চিত্ত নির্মল হয়, প্রশান্ত হয়। ঐরূপ চিত্তে স্বতই ব্রহ্মজ্ঞান প্রতিফলিত হয়, তখন কর্ম জ্ঞানেই পর্যবসিত হয়—সর্বং কর্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে। কর্মফলত্যাগী সাধকের মুক্তি অবশ্যম্ভাবী।

কর্ম দ্বারা মুক্তি অর্জিত হয় না। মুক্তি নিত্য, কর্ম অনিত্য। অনিত্য বস্তু নিত্য বস্তুর জনক হয় না। জীবের শিবভাবই, ব্রহ্মভাবই মুক্তি। মুক্তি কর্মসাধ্য হলে তা নিত্য নয়।

কর্ম অনিত্য বলে কর্মলভ্য মুক্তিও অনিত্য হয়ে পড়ে। ন হ্যধ্রুবৈঃ প্রাপ্যতে হি ধ্রুবং তৎ। প্লবা হ্যেতে অদৃঢ়া যজ্ঞরূপাঃ। অবিদ্যার উচ্ছেদ হয় একমাত্র জ্ঞানে। জ্ঞান বা বিদ্যা মুক্তির একমাত্র সাধন—বিদ্যয়ামৃতমশ্নুতে। সত্যেন লভ্যস্তপসা হ্যেষ আত্মা সম্যগ্ জ্ঞানেন ব্রহ্মচর্যেণ নিত্যম্।

সন্ন্যাস বা বৈরাগ্য ছাড়া জ্ঞানলাভ করা যায় না। সন্ন্যাসী জ্ঞানের দ্বারা আত্মার মনন ও ধ্যান করে ব্রহ্মে তন্ময় হন। এই রকম ব্রহ্মদর্শী একমাত্র ব্রহ্মই দেখেন, তাঁর কাছে একমাত্র ব্রহ্মই সত্য, জগৎ মিথ্যা হয়ে দাঁড়ায়। ব্রহ্মে দ্বৈতভাব নেই। তত্ত্বজ্ঞানের ফলে সমস্ত জীব জগৎ যখন ব্রহ্মময় তখন কেন কং পশ্যেৎ কেন কং বিজানীয়াৎ, তখন জীব ও জগদ্‌বোধ মিথ্যা, তখন নেহ নানাস্তি কিঞ্চন—তখন নানাত্ব বিদূরিত হয়। উপনিষদের মতে দ্বৈতজগৎ মিথ্যা এবং জীবাত্মা পরমাত্মার ঔপাধিক অভিব্যক্তি। উপাধির বিলয়ে জীবচৈতন্য ব্রহ্মচৈতন্যে বিলীন হয়ে যায়। সুতরাং জীবাত্মা ও পরমাত্মা ভিন্ন নন।

জীবের জাগ্রৎ স্বপ্ন ও সুষুপ্তি অবস্থা পরীক্ষা করে দেখলে জীবপুরুষ অবস্থাত্রয়ের অতীত বোঝা যায়। জাগরিত অবস্থায় জীব শরীর ও মনের সাহায্যে স্থূল বিষয় অনুভব করে, তখন জীব শরীর মন ও ইন্দ্রিয়ের বন্ধনে আবদ্ধ। স্বপ্ন অবস্থায় মন ক্রিয়াশীল, আত্মা তখন মনের আবদ্ধ। সুষুপ্তি অবস্থায় মনের বন্ধন লোপ পায়। আত্মা তখন আনন্দময়, কিন্তু এই আনন্দ সাময়িক, তখনও অজ্ঞানের বীজ ধ্বংস হয় না। সুষুপ্তি ভঙ্গ হলে জীব বিষয়রাজ্যে ফিরে আসে এবং সংসারী সাজে। জ্ঞানের অগ্নি যখন অজ্ঞান-বীজ ভস্মসাৎ করে তখনই জীব সকল বন্ধন থেকে চিরমুক্তি লাভ করে।

পুরুষই এই বিশ্ব, বিশ্বই এই ব্রহ্ম—পুরুষ এবেদং বিশ্বম্, ব্রহ্মৈবেদং বিশ্বম, নিখিল বিশ্বই ব্রহ্মময়। ব্রহ্মকে জানলেই সকল জানার শেষ হয়, সর্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতি।

উপনিষদে পূর্ণ অদ্বৈতবাদ প্রপঞ্চিত হয়েছে। এখানে ব্রহ্মের সগুণ ও নির্গুণ ভাব কথিত হয়েছে সত্য কিন্তু তাঁর সগুণ ভাব কল্পিত, মিথ্যা। নির্গুণ ব্রহ্মই মায়া উপাধি গ্রহণ করে সগুণ হন, জগতের সৃষ্টি স্থিতি লয় করেন। এই ভাব মায়িক এবং যে বস্তু মায়িক তা কখনও পরমার্থ সত্য নয়। একমাত্র অদ্বয় নির্গুণ ব্রহ্মই সত্য। উপনিষদের গূঢ় রহস্য এই।

সুতরাং আমরা দেখছি যে, যে অদ্বৈতবাদ ৬০০০ পূঃ খৃষ্টাব্দ থেকে ৪০০০ পূঃ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত বীজাকারে ঋগ্বেদে বর্তমান ছিল সেই অদ্বৈতবাদ ২০০০ পূঃ খৃষ্টাব্দ থেকে ২৫০০ পূঃ খৃষ্টাব্দের মধ্যে বৃহদারণ্যক, তৈত্তিরীয় প্রভৃতি প্রাচীনতম উপনিষদের ভিতর পূর্ণমাত্রায় বিকশিত ও পল্লবিত হয়ে ব্রহ্মবাদে পরিণতি লাভ করেছিল।

তার আরও পরে মহাভারত-প্রণেতা বেদব্যাস ব্রহ্মসূত্র রচনা করে উপনিষৎ-প্রতিপাদিত ব্রহ্মবাদকে বিচারের ভিত্তির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। ব্রহ্মসূত্রেই বেদান্ত-মত দার্শনিকরূপ পরিগ্রহ করেছে। বেদান্ত-বিরোধী পরমত খণ্ডন করে বেদব্যাস অদ্বৈতবাদের বিজয়-বৈজয়ন্তী স্থাপন করেন। ব্রহ্মনিরূপণই ব্রহ্মসূত্রের প্রধান ও চরম লক্ষ্য। উপনিষদে ব্রহ্ম একমাত্র তত্ত্ব, ব্রহ্ম নিত্য সত্য ও ভূমা। ব্রহ্মসূত্র বিচার দ্বারা ব্রহ্ম-সম্বন্ধে নানা প্রশ্নের মীমাংসা করেছেন। ব্রহ্মসূত্রকে ভিত্তি করে দ্বৈতবাদ বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ প্রভৃতি নানা মতবাদের জন্ম হলেও অদ্বৈতবাদই সূত্রকারের বেদান্ত-মত। বেদান্ত-দর্শনে সাংখ্য বৈশেষিক জৈন বৌদ্ধ ও ভাগবত-মত খণ্ডিত হয়েছে। সুতরাং এক অদ্বৈতবাদ ছাড়া যে অন্য কোন মতবাদ সূত্রকারের অভিপ্রেত নয়

একথা আমরা স্বতঃসিদ্ধের মত গ্রহণ করতে পারি।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় 'ব্রহ্মসূত্রপদৈঃ' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। পাণিনির অষ্টাধ্যায়ী-সূত্রে পারাশর্য-ভিক্ষুসূত্রের উল্লেখ আছে। পারাশর্য অর্থ পরাশরের পুত্র অর্থাৎ বেদব্যাস। বেদান্ত-সূত্র সন্ন্যাসীদের পাঠ্য। সুতরাং পাণিনির পারাশর্য-ভিক্ষুসূত্র ও ব্রহ্মসূত্র অভিন্ন সন্দেহ নেই। পাণিনির বহুপূর্বে বেদান্তদর্শন রচিত ও সাধারণের মধ্যে প্রচারিত হয়েছিল।

ব্রহ্মসূত্র বেদান্তদর্শনের মূল গ্রন্থ। যুক্তিতর্কের সাহায্যে ব্রহ্মসূত্র অদ্বৈতবাদই প্রতিষ্ঠা করেছেন। ব্রহ্মসূত্র রচনার পূর্বে বিভিন্ন মতবাদ সূত্রের আকারে প্রচলিত ছিল এবং ব্রহ্মসূত্রকার প্রাচীন সূত্রগুলির আদর্শে উপনিষদের ভিত্তিতে একটি পূর্ণাবয়ব গ্রন্থ বিরচিত করেছিলেন।

এপর্যন্ত আমরা দেখেছি অদ্বৈতবাদের উৎপত্তি ঋগ্বেদে। এর বিকাশ উপনিষদে, দার্শনিক মতবাদরূপে এর প্রতিষ্ঠা ব্রহ্মসূত্রে। তারপর আমরা দেখবো এর পূর্ণ পরিণতি আচার্য শংকরের মনীষায় হয়েছে।

ব্রহ্মসূত্র-রচনার সময় থেকে অদ্বৈত-বেদান্তের সর্বপ্রাচীন আচার্য গৌড়পাদের সময় ( খৃষ্টীয় ৭ম শতক ) পর্যন্ত প্রায় দু' হাজার বৎসর অতি-বাহিত হয়েছিল। এই সুদীর্ঘ কালের ভিতর গৌতম বুদ্ধ এবং তাঁর পরে অশ্বঘোষ, নাগার্জুন, বসুবন্ধু প্রমুখ বহু দার্শনিক আবির্ভূত হয়েছিলেন। সুতরাং এই সকল ধুরন্ধর দার্শনিকের প্রভাব গৌড়পাদের মতবাদের উপর পড়েছিল। আচার্য গৌড়পাদ মাণ্ডুক্য-কারিকা ও উত্তর-গীতাভাষ্যে অদ্বৈত-বেদান্তের মতবাদকে দৃঢ়ভিত্তির উপর স্থাপন করেছিলেন।

গৌড়পাদের মতের সংগে বৌদ্ধমতের কোন কোন অংশে সাদৃশ্য আছে। এজন্য কেউ কেউ গৌড়পাদকে বৌদ্ধাচার্য বলেছেন। বেদান্ত নিত্য পরমার্থ সৎ বিজ্ঞান স্বীকার করেন, বৌদ্ধবাদ এ কথা স্বীকার করেন না। এখানেই এই দুটি মতবাদের মধ্যে প্রভেদ সুস্পষ্ট।

অদ্বৈত-মতবাদ পার্বত্য নির্ঝরিণীর মতো ঋগ্বেদের অত্যুচ্চ গুহায় উৎসারিত হয়ে যুগ-যুগান্ত ধরে ভারতীয় মানসক্ষেত্রের উপর প্রবাহিত হয়েছে এবং অবশেষে শংকরের মহামনীষায় পূর্ণমাত্রায় প্রকাশিত হয়েছে। খৃষ্টীয় সপ্তম শতকের শেষভাগে ( ৭৮৮ ) শঙ্করের আবির্ভাব ঘটে। তিনিই বেদান্ত-ভাব-গংগা-আনয়নের ভগীরথ। অদ্বৈতবেদান্তের নাম করলে আমরা শংকরাচার্যের কথা মনে করি। তিনি ছিলেন অদ্বৈতবেদান্তের চিন্তারাজ্যের প্রতিদ্বন্দ্বিহীন সম্রাট। তিনি বলেছেন আত্মা সচ্চিদানন্দস্বরূপ। এইরূপ আত্মজ্ঞানই প্রকৃত জ্ঞান, তা ছাড়া সমস্তই অজ্ঞান। অহং-শব্দে আত্মা এবং ইদং-শব্দে অনাত্মা বা জড়বস্তু। অহং ও ইদম্, আত্মা ও অনাত্মা আলোক-অন্ধকারের মত পরস্পর-বিরুদ্ধ। অবিদ্যা বা অধ্যাসের ফলে আত্মা ও অনাত্মার মধ্যে যে সম্বন্ধ দৃষ্ট হয় তা কল্পিত। সত্য ও মিথ্যার মিলনে জীবের সংসারজীবন চলে এবং তাকে সত্য বলে মনে হয়। অজ্ঞানই সকল অনর্থের কারণ এবং অজ্ঞানের সমূলে নিবৃত্তি হলে বিশ্বময় এক অদ্বিতীয় অথবা ব্রহ্ম-বিজ্ঞানের উদয় হয়।

মায়া উপাধিযোগে নির্বিশেষ ব্রহ্ম সবিশেষ, নির্গুণ সগুণ হন। নির্গুণও সগুণ-ব্রহ্মভিন্ন বস্তু নয়। সগুণ-ভাবে তাঁর লীলামাত্র। কিন্তু এই সগুণ লীলা তাঁর শুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাব ব্যাহত করে না। নির্গুণ ও সগুণ-ভেদ কল্পিত ও মিথ্যা। পরব্রহ্মের সগুণভাবের নাম ঈশ্বর। তাঁর ঈশ্বরভাব যেমন মায়িক, তাঁর জীবভাবও তেমনি মায়িক। মহাকাশ পরব্রহ্ম,

ঘটাকাশ জীব। উপাধিরূপ ঘট নষ্ট হলে তার ভিতরের প্রতীয়মান ক্ষুদ্র আকাশ মহাকাশ হয়ে যায়।

জীবের তিনটি অবস্থা—জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তি। জাগরিত অবস্থায় উপাধি স্থূল দেহ, স্বপ্নাবস্থায় উপাধি মন, সুষুপ্তি-অবস্থায় উপাধি অবিদ্যা; কিন্তু এই তিন অবস্থায় অহংভাব বিদ্যমান থাকে, তার ব্যত্যয় ঘটে না, সুতরাং অহংজ্ঞানই একমাত্র সত্য। উপাধি বিশেষণ নয়। বিশেষণটি বিশেষ্যের ভিতর প্রবেশ করে তাকে অন্য সকল বস্তু থেকে পৃথক করে বুঝায়। উপাধি ব্যাবর্তক হয় বটে, কিন্তু বিশেষ্যের স্বরূপের ভিতর প্রবেশ করে না। উপাধি আগন্তুক ধর্ম, বিশেষণ বিশেষ্যের স্বভাবের ভিতর মধ্যে প্রবিষ্ট ধর্ম। সুতরাং দেহ মন ও অবিদ্যা সাময়িক, চিরস্থায়ী নয়, কিন্তু অহংজ্ঞান বাধরহিত, চির ও শাশ্বত, অতএব সত্য, কারণ বাধ-রাহিত্যই সত্যত্ব।

জগৎ মায়াময়, মনের ক্রিয়া। আত্মবিচারের ফলে মন যখন অমন হয়ে যায়, মনের বিলয় হয়, তখন দ্বৈতজগতের বিলয় হয়, তখনই জগৎ মিথ্যা হয়ে যায় কিন্তু যতক্ষণ না মন অমন হয় ততক্ষণ জগতের সত্যতা অবশ্য স্বীকার করতে হয়।

জগৎ ব্রহ্মের প্রকাশ। ব্রহ্ম কারণ, জগৎ কার্য। কার্য ও কারণ এক, ব্রহ্মসত্তায় কার্য জগৎ অবস্থিত। তিনি যেমন জগতের নিমিত্ত কারণ, তেমনি উপাদান কারণও তিনি। সুতরাং একবিজ্ঞানে সকল বস্তুই জানা যায়। বিশ্বসৃষ্টির পূর্বে এক বৈ দ্বিতীয় ছিল না। এজন্য সেই একই বিশ্বসৃষ্টির নিমিত্ত ও উপাদান। ভ্রান্তদৃষ্টিতে আমরা জগতের নানাত্ব, নাম-রূপ দর্শন করি, পরব্রহ্ম আমাদের কাছে প্রতিভাত হন না। এই অবিদ্যার ফলে নামরূপাত্মক বিকাশগুলি আমাদের দৃষ্টিতে সত্য বলে মনে হয়। তত্ত্বজ্ঞানের উদয়ে জীবের অবিদ্যা বিনষ্ট হলে মিথ্যাসৃষ্টি তিরোহিত হয়, তখন অধ্যাস থাকে না, তখন নামরূপাত্মক জগতের অন্তরালে ব্রহ্মচৈতন্য পরিস্ফুট হন। তখন সর্বত্র ব্রহ্মদৃষ্টির উদয় হয়। এরই নাম প্রকৃত জ্ঞান। প্রকৃত জ্ঞানের উদয়ে সমস্তই ব্রহ্মময় হয়ে যায়। তখন জীবন মধুময়, জগৎ মধুময়, সকলই মধুময় হয়ে ওঠে। বেদান্তসেবার চরম ফল এই।

ঋগ্‌বেদে বলা হয়েছে যে সৃষ্টির উপর একমাত্র প্রজাপতি বিদ্যমান ছিলেন, তিনিই নিখিল প্রাণীর এক অদ্বিতীয় অধীশ্বর—ভূতস্য জাতঃ পতিরেক আসীৎ। দেবতাবর্গ একেরই বিভিন্ন বিকাশ, তিনিই পরম দেবতা—তদেকং, একং সৎ, একং সন্তং বহুধা কল্পয়ন্তি। এই একের মায়িক অভিব্যক্তি নানাত্ব—ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে। আবার সার্বভৌম আত্ম-জ্ঞান-বাদ এই ঋগ্‌বেদেই পরিস্ফুট—অহং রুদ্রেভির্বসুভিশ্চরামি অহমাদিত্যৈরুত বিশ্বদেবৈঃ। ব্রহ্মই নিমিত্ত ও উপাদান কারণ, এই তত্ত্বও ঋগ্‌বেদে উল্লিখিত হয়েছে—ব্রহ্ম বনং ব্রহ্ম স বৃক্ষ আসীৎ। সুতরাং আদিতে নির্গুণ এক অদ্বিতীয় ব্রহ্ম বিদ্যমান ছিলেন, মায়াবলে তিনি জগৎ ও জীব সৃষ্টি করেছিলেন এবং তিনিই নিমিত্ত ও উপাদান কারণ এবং ব্রহ্ম-ব্যতিরিক্ত আর কিছুই নাই—অদ্বৈতবেদান্তের এই তত্ত্ব বীজাকারে ঋগ্‌বেদে উপন্যস্ত হয়েছিল। এই তত্ত্বই নানাভাবে গল্প-উপাখ্যানের ভিতর দিয়েই উপনিষদে সুবিন্যস্ত ও ব্যক্ত হয়েছিল। আরও পরে ইহাই সূত্রাকারে ব্রহ্মসূত্র নামক দার্শনিক গ্রন্থে পর্যায়ক্রমে স্থানলাভ করেছে। তার বহু শতাব্দী পরে গৌড়পাদ শংকরাচার্য প্রমুখ দার্শনিকের কারিকা ও

ভাষ্যে বিস্তৃতভাবে আলোচিত ও পরিস্ফুট হয়েছে। অদ্বৈতবাদ অন্ততঃ পাঁচ হাজার বৎসর ধরে ভারতীয় মানসের উপর প্রভাব বিস্তার করেছে। এজন্য ভারতীয় চিন্তায়, ভারতীয় অস্থিমজ্জায়, ভারতীয় রক্তে, ভারতীয়দের প্রতি কর্মে অনুষ্ঠানে মন্ত্রে উপাসনায় পূজায় এই তত্ত্ব মিশ্রিত, ওতপ্রোত ভাবে জড়িত হয়েছে।

অদ্বৈত-বেদান্ত শংকরাচার্যের মনীষায় পূর্ণ বিকশিত হয়েছিল—ইনি এই মতবাদকে পূর্ণাংগ করে তুলেছিলেন। নির্গুণ ব্রহ্মবাদ, মায়াবাদ, জীব ও ব্রহ্মের একত্ববাদ প্রভৃতি অদ্বৈতবেদান্তের চরমতত্ত্বগুলির উপর তিনি আলোকপাত করে সকলের বোধগম্য করে দিয়েছেন। তাঁর আবির্ভাবের অব্যবহিত পরেই খৃষ্টীয় অষ্টম ও নবম শতাব্দী অদ্বৈতবাদের সুবর্ণযুগ। এই সময়ে আচার্য পদ্মপাদ মণ্ডমমিশ্র সুরেশ্বরাচার্য সর্বজ্ঞাত্মমুনি ও বাচস্পতি মিশ্র আবির্ভূত হয়ে শাংকর দর্শনের পূর্ণতা-সাধন করেছিলেন। শংকর অদ্বৈতবেদান্তের মহিমা ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করে ব্রহ্মবাদকে বিচারের সুদৃঢ়ভিত্তির উপর স্থাপন করেছিলেন। চিন্তার গভীরতায়, বিচারশক্তির তীক্ষ্ণতায়, বিশ্লেষণী প্রতিভার নিপুণতায় তাঁর প্রতিভা উজ্জ্বল ও ভাস্বর হয়ে উঠেছে। তাঁরই পদাংক অনুসরণ করে পরবর্তী কালের অদ্বৈতাচার্যগণ অদ্বৈত-ভাবধারার পরিপুষ্টি-সাধন করেছেন। শংকরের এবং শংকরপরবর্তী যুগ অদ্বৈতবেদান্তের শ্রেষ্ঠতম যুগ। দশম ও একাদশ শতকে অদ্বৈতবেদান্তের ক্ষেত্র অনুর্বর হলেও অন্যান্য দার্শনিক চিন্তার অভ্যুদয় হয়েছিল। এই সময় ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনের চিন্তাধারা পরিপুষ্ট হয়েছিল। একাদশ শতকে রামানুজ বিশিষ্টা-দ্বৈতবাদের পূর্ণতা সাধন করেছিলেন। তিনি তর্কশরজালে অদ্বৈতবাদের ব্যূহভেদ করেছিলেন। রামানুজ ছাড়া শ্রীকণ্ঠ, অভিনবগুপ্ত নিম্বার্ক শ্রীনিবাস যাদবপ্রকাশ পার্থসারথি মিশ্র প্রভৃতি বহু সব্যসাচীর আক্রমণে অদ্বৈতবাদ সাময়িক-ভাবে বিধ্বস্ত হয়েছিল। ভাস্করাচার্য শান্তরক্ষিত বিদ্যানন্দ মাণিক্যনন্দী প্রভৃতি দার্শনিকের তীব্র আক্রমণ প্রতিহত করে বাচস্পতি মিশ্র সর্বজ্ঞাত্মমুনি প্রমুখ অদ্বৈতাচার্য পুনরায় অদ্বৈতবাদের মহিমা সুপ্রতিষ্ঠিত করেন।

---

# আকাঙ্ক্ষা

**শ্রীমতী গিরিবালা দেবী**

(আমার) সকল ক্লান্তি মুছে দাও তব
শান্ত অমিয় পরশে।
সুপ্ত জীবন জাগুক অতুল
দিব্য মধুর হরষে।

মুছে যাক গ্লানি কালিমা অপার
তুলে নাও এই বিষাদের ভার
দূর কর তাপ সকলি আমার
করুণার ধারা বরষে।

(মোর) নয়নের জলে চরণ তোমার
সিক্ত করিয়া নাও হে,
নিভৃত প্রাণের অর্ঘ্য বরিয়া
তৃপ্ত করিয়া দাও হে।

'তুমি কোথা' 'তুমি কোথা' বলে হায়
ফিরি নাকো যেন পথের ধূলায়
মরমের মাঝে মম রাজরাজে
পাই যেন চির দরশে।

# মানুষ বিবেকানন্দ

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

বক্তা বিবেকানন্দ, সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ, বৈদান্তিক বিবেকানন্দ—বা সমাধিমান্ বিবেকানন্দের চেয়ে আমি মানুষ বিবেকানন্দকেই বেশী ভালবাসি। শ্রীরামকৃষ্ণের অঙ্গস্পর্শে সমাধিমগ্ন বিবেকানন্দ সাধারণের জ্ঞানসীমার বাহিরে। শ্রীরামকৃষ্ণ আমাদেরই মত মানুষ না দেবতা, ভগবান আছেন কি না ও তাঁকে সত্যই দেখা যায় কি না পুনঃপুনঃ এইরূপ সংশয়াকুল নরেন্দ্রনাথকে আমরা বেশ বুঝতে পারি—আমাদেরই মত ইংরেজীপড়া, সুদৃশ্য, শহুরে যুবকটিকে আমাদেরই একজন বলে মনে হয়। নরেন্দ্রনাথের যদি শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে সাক্ষাৎ না হত তা হলে এই সুশ্রী সুগায়ক যুবকটিকে হয়তো সন্ন্যাসী হতে হত না—আমরা স্বামী বিবেকানন্দকে হারাতাম বটে, কিন্তু মানুষ বিবেকানন্দকে অর্থাৎ নরেন্দ্রনাথকে হয়তো আরো কাছে পেতাম।

কিন্তু কি সৌভাগ্যবশে ঠাকুর তাঁকে অনন্তের সন্ধান দিয়েও চাবিকাঠিটি হাতে রেখেছিলেন। তাই স্বামী বিবেকানন্দের মধ্যে মানুষ বিবেকানন্দের সম্পূর্ণ অন্তর্ধান হল না।

প্রথমেই এই মানুষটির মনুষ্যত্বের আভাস পাই—যখন দেখি নিজে ঠাকুরের সংস্পর্শে এসেও কিঞ্চিৎ অমৃতের আস্বাদ পেয়েও মা ও ভাই-বোনদের খাওয়া-পরার সংস্থানের জন্য কি তাঁর মানসিক উদ্বেগ, দ্বারে দ্বারে চাকরীর কি প্রচেষ্টা এবং তাঁদের কষ্ট দেখে ভগবানের করুণাময়ত্বে, এমন কি তাঁর অস্তিত্বে পর্যন্ত—সন্দেহ।

এ সময়ে তাঁর মানসিক উদ্বেগ যে কতখানি ছিল তা তাঁর শিষ্যদের প্রতি উক্তিতেই বেশ বোঝা যায়—

"Gird up your loins my boys. I have been dragged through a whole life of crosses and tortures. I have seen the nearest and dearest die, almost of starvation. I have been ridiculed, distrusted and have suffered for my sympathy for the very men who scoff and scorn. Well my boys, this is the school of misery, which is also the school for great souls and prophets for the cultivation of sympathy, of patience and above all of an indomitable iron will which quakes not even if the universe is pulverised at our feet."

এই দারিদ্র্য ও দুঃখকষ্টের মধ্য দিয়ে গরীব দুঃখীর কষ্ট উপলব্ধির ক্ষমতালাভ কঠোর বৈদান্তিকের উক্তি নয়—যার কাছে ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা।

এই মানবতা তিনি পেয়েছিলেন তাঁর গুরুর কাছে। এত বড় বৈদান্তিক, কিন্তু তোতাপুরীর মত কঠোর নন। নির্বিকল্প সমাধির অধিকারী এই মহামানব বৈদ্যনাথধামে মথুরবাবুর সঙ্গে তীর্থ-ভ্রমণে এক অদ্ভুত কাজ করে বসলেন। শহরের কাছাকাছি এক গাঁয়ের মধ্যে যাবার সময় তিনি দেখতে পেলেন—রোগা, শুকনো, সাঁওতাল

ছেলেমেয়েদের দল ঘুরে বেড়াচ্ছে - গাঁয়ের লোকেদের চরম দারিদ্র্য।

"মথুর, তুমি এদের এক মাথা করে তেল আর একখানা করে কাপড় দাও—আর পেটটা ভরিয়ে একদিন খাইয়ে দাও।"

পথে অর্থের অনটন ঘটতে পারে এই চিন্তা করে মথুরবাবু কিছু ইতস্ততঃ করতেই বালকের মত গোঁ ভরে বললেন—

"দূর শালা, তোর কাশী আর আমি যাব না। এদের কাছেই থাকবো।"

তাই আবার বলি। এঁরা গুরু-শিষ্য অদ্ভুত বেদান্তবাদী। এঁদের বেদান্তের পাঠ আলাদা—এঁরা আগে মানুষ তার পর দেবতা।

আবার নরেন্দ্রে দেখি, ঠাকুরের দেহাবসানের পর গুরুভাইদের প্রতি সে কি মমতা। বাইরে যত কঠোরই দেখাক না কেন হৃদয়টা ছিল তাঁর নবনীতের মত কোমল। একই সঙ্গে সংসারের প্রতি তীব্র অনাসক্তি আর মানুষের উপর সুগভীর প্রেম।

এই দ্বন্দ্ব তাঁর মধ্যে প্রবল ভাবেই চলেছিল বেশ বোঝা যায়। দুটি ভাবই তাঁকে অধিকারে আনতে প্রবল চেষ্টা করছিল—কিন্তু শেষে জয় হল কার? বৈরাগীর না মানুষের?

পরিব্রাজক অবস্থার আগে অদ্বৈততত্ত্বেরই বিকাশভূমি বলে যে ভারতবর্ষের গৌরবমূর্তি কল্পনায় দেখে তিনি উল্লসিত হয়ে উঠেছিলেন সেই ভারতের আধুনিক বাস্তব দারিদ্র্যের মূর্তি দেখে তাঁর সে স্বপ্ন ভেঙ্গে গিয়েছিল।

বরাহনগর মঠে থাকার সময়েও সেবাব্রতের ভাব তাঁর মধ্যে জাগেনি। পরিব্রাজক-জীবনের কঠোরতার মধ্য দিয়ে যে দিন তাঁর মনের সঙ্গে ভারতবর্ষের পঙ্গু, নির্বীর্য, নিপীড়িত নর-নারীর পরিচয় ঘটলো সেদিন নিমেষে মিলিয়ে গেল তাঁর সাধনার চরম সিদ্ধির স্বপ্ন। মানুষের পরমবান্ধব নিজেকে আর সংবরণ করে রাখতে পারেন নি—তাঁর হৃদয়বীণার তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে বেজে উঠেছিল নূতন রাগিণী—মনুষ্যত্বের জয়গানে যা ভরপুর। দূরের দেবতাকে পাবার আশায় তিনি কাছের মানুষকে ত্যাগ করতে পারেন নি। মানুষের বুকেই তিনি স্বর্গের দেবতার সন্ধান পেলেন।

এমনটি তো কই আগে আর দেখেছি বলে মনে হয় না। সপ্তশতশ্লোক-সমন্বিতা গীতার মধ্যে অনাসক্ত কর্ম, জ্ঞান, ভক্তি, সন্ন্যাস, সমতা, যোগ অনেক কথাই পাই কিন্তু পীড়িতের প্রতি করুণা, আর্তের জন্য জীবনোৎসর্গ পাই না। গীতার সুর সুখদুঃখে নিঃস্পৃহতা। সুর অতি উচ্চ, কিন্তু আমাদের মত সাধারণ মানুষের নাগালের যেন কিছু বাহিরে।

শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের আর্তসেবার জন্য সর্বস্বত্যাগ, এমন কি আত্মমুক্তির প্রতিও উপেক্ষা—সত্যই অপূর্ব।

তা বলে এদের আগে কি দেশে কেউই গরীবের দিকে তাকাতো না? তাহলে রাণী রাসমণি নিত্য অন্নকূটের ব্যবস্থা করেছিলেন কেন? তখনও তো তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের সন্ধান পান নি। বিদ্যাসাগরই বা দয়ার সাগর হলেন কিরূপে?

তা নয়। কথা এই যে এঁরা সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী ছিলেন না। গৃহী তো ভারতে আদিকাল হতেই অতিথিসেবা, আর্তসেবা জীবনের ও ধর্মের এক প্রধান অঙ্গ বলেই গ্রহণ করে এসেছে। একথা এ দেশের পক্ষে নূতন কিছু নয়। নূতন কথা হল, যে সাধকের সমাধি করতলগত তাঁর পক্ষে, সর্বত্যাগী বিরাগীর পক্ষে, অদ্বৈতবাদী জ্ঞানী বৈদান্তিকের পক্ষে দুঃস্থ নরনারীর দুঃখদারিদ্র্য দূর করে সুখশান্তি-বিধানের প্রাণপণ প্রচেষ্টা।

অবশ্য বিদ্যাসাগরের বিদ্যার অভাব ছিল না কিন্তু

তাঁর অপূর্ব মহাপ্রাণতায়, তাঁর অন্তঃকরণের মাতৃস্নেহের আবেগে, তাঁর পাহাড়প্রমাণ বিদ্যা শুষ্কতৃণের মত লঘু হয়ে উড়ে গিয়েছিল। সত্যই দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর ইতিহাসের এক মহা বিস্ময়।

কিন্তু এই পূর্ণজ্ঞানী গুরুশিষ্যের তো সে কথা নয়—তাঁদের সেবাব্রত হৃদয়াবেগমাত্র নয়। এ এক নূতন দর্শনের প্রতিষ্ঠা।

সৌভাগ্যক্রমে সুভাষচন্দ্র বিবেকানন্দের বাণীর সন্ধান পেয়েছিলেন—

One day by sheer accident I stumbled upon what turned only to be my greatest help in the crisis. I came across the work of Swami Vivekananda. I had hardly turned over a few pages when I realised that here was something which I had been longing for. I borrowed the books, brought them home, and devoured them. I was thrilled to the marrow of my bones. Vivekananda gave me the ideal to which I could give my whole being. আত্মনো মোক্ষার্থম্ জগদ্ধিতায় চ—that was to be my life's goal.

তাই আবার বলি স্বামীজীর সেবাব্রত কেবল ভাবাবেশ নয়—একটি সুচিন্তিত ও পরিপূর্ণ দর্শন; কেবল অবিদ্যাগ্রস্ত সংসারীর জন্য নয়—আত্মজ্ঞানলাভেচ্ছু সন্ন্যাসীরও উপযোগী।

নবদীক্ষিত সন্ন্যাসীদের দেওয়া তাঁর আশীর্বাণীতেই দেখতে পাই—

You have decided to take up the highest vow of human life. Blessed is your birth, blessed is the one who gave you birth, blessed is your ancestry.

Remember for the salvation of one's own soul and for the good and happiness of the many, the sannyasin is born in this world. To sacrifice his own life for others, to alleviate the misery of millions rending the air with their cries, to wipe away the tears from the eyes of the widow, to console the heart of the bereaved mother, to provide the ignorant and the depressed masses with the ways and means for the struggle for existence and make them stand on their own feet.

Remember, it is for the consummation of this purpose in life that we have taken our birth and shall lay down our lives for it.

এর চেয়ে বড় মানবতার বাণী আর কি আছে? সন্ন্যাসীর এই নবদীক্ষা তাঁর শ্রেষ্ঠ দান। তাই মানুষ বিবেকানন্দই আমার প্রিয়।

---

# প্রাথমিক শিক্ষা-প্রসঙ্গে

স্বামী নিরাময়ানন্দ

আধুনিক স্কুল একটা আকর্ষণের কেন্দ্র। লেখাপড়া শেখা সেখানে খেলাধূলা মজা। জ্ঞান সেখানে ছাত্রেরা শুষে নেয় উৎসাহী শিক্ষকদের সান্নিধ্যে সাহচর্যে নির্দেশে। কিন্তু লক্ষ লক্ষ ছেলেমেয়ে আজও পড়ছে বা তাদের পড়তে হচ্ছে সেই সেকেলে ছেলে-ঠেঙানো স্কুলে—যার সঙ্গে জেলখানারই খুব সাদৃশ্য আছে—শাস্তি ও শাসনের দিক্ থেকে। ছেলেদের সেখানে চুপ চাপ বসে থাকতে হবে লক্ষ্মীছেলের মত, আর অন্যমনস্কভাবে শুনতে হবে সহপাঠীর বিষণ্ণসুরে পড়া 'একদা······এক······বাঘের···গলায়······'। কল্পনাহীন শিক্ষক শ্যেনচক্ষু দিয়ে দেখবেন ঠিক পড়া হচ্ছে কি না, একটু বেঠিক হলেই ধমকে উঠবেন; হয়ত দ্বিপ্রহরের বিশ্রামসুখটুকু ঐখানেই সেরে নেবেন, আর ছাত্রেরা চিমটিকাটা থেকে সুরু করে যতদূর অগ্রসর হতে পারে এগিয়ে যাবে দুষ্টুমির দিকে। নিদ্রাভঙ্গে শিক্ষক মহাশয় দেখবেন ক্লাসে কেউ নেই—দূর থেকে অশরীরী চাপা হাসি ভেসে আসছে!

অভিভাবক—পিতামাতা এ বিষয়ে সমালোচনা করতে ইতস্ততঃ করেন, তাঁদের কোন মাপকাঠি নেই স্কুল ঠিক চলছে কি না বোঝবার; সেই অঞ্চলে হয়ত ঐ একটিমাত্র স্কুল—যেমনি চলুক ঐখানেই ছেলেমেয়েদের দেওয়া ছাড়া আর উপায় কি? তবু শিক্ষাব্যাপারে দেশের সকলেরই দায়িত্ব আছে এবং বর্তমানে শিক্ষা-বিজ্ঞানীদের গভীর গবেষণার ফলে যে সব পদ্ধতি দেশে বিদেশে সুফলপ্রসূ হয়ে ব্যবহৃত হচ্ছে তারই কিছু এইখানে পরিবেশিত হল যাতে আমরা একটা মাপকাঠি পেতে পারি—বুঝতে পারি শিক্ষার গতিপথে আমরা কোথায়।

আধুনিক স্কুলের ক্লাসে ছেলেদের মুখোমুখি শিক্ষকের একটি আসন (চেয়ার টেবিল বা ডেস্ক) কিছু দরকার নেই; কারণ সেখানে সামনে পেছনে বলে কিছু নেই। নতুন ধরনের স্কুলে কাঠের ফ্রেমে স্ক্রু-আঁটা সিট্ বলেও কিছু নেই। লম্বা নিচু খান কয়েক টেবিল থাকতে পারে, আর ছেলেদের প্রত্যেকের আলাদা চেয়ার বা আসন। বেঞ্চি উঠে যাচ্ছে—অথবা তার পেছনে হেলান দেবার ব্যবস্থা হচ্ছে।

যখন ছোট ছোট গ্রুপ করার দরকার তখন ছেলেদের ব্যক্তিগত ডেস্ক ব্যবহৃত হয়। কখন বা গভীর আলোচনা বা গল্পশোনার সময় তারা শিক্ষককে ঘিরে অর্ধচন্দ্রাকারে বসে ঘরের ভেতরে বা বাইরে, গাছতলায়।

চুপ করে 'শান্ত শিষ্ট' হয়েই তাদের বসে থাকতে হবে না, তারা সাধারণ গল্প হাসি যেমন করে তেমনি করে যাবে—কোন বাধা নেই। ক্লাস ত জেলখানা নয় বরং কারখানা; সেখানে ছেলেরা গড়ছে তাদের ভবিষ্যৎজীবন প্রতিমুহূর্তের ঘাত-প্রতিঘাতে।

শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্রী-সম্বন্ধে সব চেয়ে আগে দেখতে হবে তিনি ছোট ছেলেমেয়েদের সাহচর্য ভালবাসেন কি না, তাদের প্রত্যেকটির সম্বন্ধে তাঁর একটা সহানুভূতিশীল অনুরাগ আছে কি না। যদি না থাকে তবে তিনি শোচনীয় ভাবে এ কাজের অযোগ্য—বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা-

দীক্ষা তাঁর যাই থাকুক না কেন। সরকারী চাপরাস বা আজকালকার নানারকম তালিমের তাবিজ-তকমাও কোন কাজে লাগবে না যদি না তাঁর ঐ দুটি গুণ থাকে।

শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্রীর গলার স্বর হবে প্রীতিপূর্ণ, সাজপোষাক সাদাসিদে, কিন্তু আকর্ষক হওয়া চাই। ছেলেরা দেখে শিক্ষক চাল-চলনে কথাবার্তায় সেকেলে, না একালের সঙ্গে পা মিলিয়ে চলেছেন, আরও দেখে তাঁর ভাব ও ভাষা। বেশির ভাগ শিক্ষকই পুরানো একঘেয়ে হয়ে যান, কারণ যখন তাঁরা কুড়ি বছরের অভিজ্ঞতার কথা বলেন সেটা আসলে একই বছরের অভিজ্ঞতার কুড়িবার! শিক্ষকের কথাবার্তায়, ভাব ও ভাষায় নূতনত্ব না থাকলে তিনি কি করে জীবনপথের নতুন পথিকদের সঙ্গে পথ চলবেন? এখন প্রশ্ন হল—শিক্ষা দেওয়া হবে কি ভাবে? পদ্ধতির নানা পরিবর্তন হচ্ছে ও হবে। এক সময় ছিল সামরিক অনুকরণে ড্রিলপদ্ধতি; সকলকে একসঙ্গে একটা কাজ করতে হবে—মুখস্থ, নামতা প্রভৃতি স্মৃতি-অনুশীলনের জিনিসগুলি সমস্বরে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলা হত। মনের নাকি মাংসপেশী আছে, তাই এই নিত্য ব্যায়াম প্রয়োজন তার শক্তি ও পুষ্টির জন্য। কারো বা ধারণা ছিল—'আবৃত্তিঃ সর্বশাস্ত্রাণাং বোধাদপি গরীয়সী'—'এখন ত না বুঝে মুখস্থ কর, বড় হলে বুঝবে।' এতে নাকি মনে একাগ্রতা বাড়বে! দুঃখের বিষয় অনেক স্কুলে এবং পাঠশালায় এখনও এই সব পদ্ধতি অনুসৃত হয়।

মন মাংসপেশী নয়, বরং একটা পরিপাক-যন্ত্র —যেখানে সব অভিজ্ঞতা এসে অর্ধপক্ক অবস্থায় জমা হয়—তারপর ধীরে ধীরে খাদ্য যেমন জারকরসে জীর্ণ হয়ে রক্তে পরিণত হয়ে শরীর গঠন করে, তেমনি অভিজ্ঞতাও আমাদের সত্তায় মিলে গিয়ে আমাদের ব্যক্তিত্ব বিকশিত করে। আমরা সব চেয়ে বেশি শিখি জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে—যেটা আনন্দ ও বিস্ময়ের পথ দিয়ে আসে—কতকটা যেন আবিষ্কারের মতো।

যে শিক্ষক এই রহস্যটি জানেন, তিনি শিক্ষা 'দান' করেন না, ছাত্রকে শিক্ষার পথে চালিত করেন মাত্র; তার শেখার আগ্রহ জাগিয়ে দেন—তাকে উৎসাহিত করেন যাতে সে নিজেকে খুঁজে পায়, চিনতে পারে। তাই পারদর্শী শিক্ষকের সাহচর্যে শিশু লেখা পড়া ও অঙ্ক (3 R's) শিখে ফেলবে, কিন্তু সে জানতেও পারবে না যে তাকে কিছু শেখানো হচ্ছে! এ যেন অনেকটা পাহাড় চড়াইএর মতো, প্রথমটা বোঝাই যায় না উঠছি কি না, অনেকটা উঠে দূরের দৃশ্য দেখে অনুভব হয় কতটা উঠে এসেছি!

এই প্রাথমিক শিক্ষা শিশুকে মুখস্থ করে শিখতে হল না। অক্ষর-পরিচয় এবং সংখ্যা-গণনা সে শিখল প্রয়োজনের তাগিদে, অথবা আশপাশের জগৎ ও জীবন আবিষ্কার করার খেলার ছলে। নিরর্থক একটা জিনিষ হাতুড়ি মেরে মাথায় ঢোকাবার চেষ্টা করলে শিক্ষা ও শিক্ষকের প্রতি অনুরাগ না এসে বিরাগ আসাই স্বাভাবিক। তাই 'ভাললাগা'র পথেই শিক্ষার রথ এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। শিক্ষককে খুঁজে বার করতে হবে—কোন্ ছাত্রের কি ভাল লাগে, সেই পথ দিয়ে তাঁকে তার হৃদয়ে প্রবেশ করতে হবে, তবেই তিনি তার শিক্ষক, জীবনের চালক হবার উপযুক্ত।

আমাদের জ্ঞানের পরিধি বাড়াবার আজকাল নানা আয়োজন হয়েছে রেডিও সিনেমা প্রভৃতি দিয়ে, তবুও পড়ে জ্ঞান-সংগ্রহ করাই চিরপ্রশস্ত পথ। পড়তে শিখতেই হবে,

কিন্তু পুরানো পাঠ্যবইগুলি ছোটদের জন্য নয়, কথার মানে জানতেই অর্ধেকের বেশি শক্তি ক্ষয়ে যায়—বিষয়-প্রবেশ পর্যন্ত আর কিছু অবশিষ্ট থাকে না। তাই নতুন ধরনের বইও চাই যেগুলি যাদের জন্য লেখা তাদের যেন ভাল লাগে, যেগুলির ভাব ও ভাষা তাদের জানা শোনার মধ্যে অথচ ধীরে ধীরে বিষয় গভীর থেকে গভীরতর হয়ে উঠবে, উন্নত থেকে উন্নততর।

আধুনিক শিক্ষক প্রাথমিক অবস্থায় বই বিশেষ ব্যবহার করেন না। ছাত্রদের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়েই তিনি তাদের এগিয়ে নিয়ে যান। 'The ram' 'ঐ ভেড়া' মুখস্থ না করিয়ে তিনি ক্লাসে গল্প শুরু করলেন—'আজ স্কুলে আসার পথে আমি এই এই দেখেছি···তোমরা কে কি দেখেছ? ক্লাসে একটা চঞ্চল উন্মাদনা জেগে উঠল। সমীর লাফিয়ে উঠে বললে 'আমি একটা ব্যাঙ দেখেছি', সুবীর বীরের মতো বললে—'আমি ষাঁড় দেখেছি'—অধীর আর স্থির থাকতে পারল না, বললে 'আমি দেখেছি একটা রোলার'। যার যা চোখে পড়েছে বলে গেল—শিক্ষক সেগুলি বোর্ডে লিখে গেলেন—এমনি করে একটি পিরিয়ড কেটে গেল। ২০।২৫টি জিনিষের নাম, বানান, চিত্ররূপ প্রয়োজন হলে অন্য ভাষায় প্রতিশব্দও শেখা হয়ে গেল। এর পর কিছু দিন ধরে সেই শব্দগুলি নিয়ে ছোট ছোট বাক্য রচনার খেলা চলতে পারে, সঙ্গে সঙ্গে শেখা হয়ে গেল শব্দরূপ, ক্রিয়ারূপ। ছেলেমেয়েরা নিজেদেরই রচনা নিজের নিজের খাতায় টুকে নিল। ছাপানো পাঠ্যপুস্তক করে যা না দুমাসে শিখত এ ভাবে তা দুসপ্তাহে শেখা হয়ে গেল।

অবশ্য ছাপা বই তাদের চোখের সামনে তুলে ধরতে হবে। একখানি পাঠ্যপুস্তক নয়—ছবিপূর্ণ অনেক বই সাজানো থাকবে টেবিলের ওপর—ছোটদের রিডিং রুমে; অবসর সময়ে তারা সেগুলি নাড়বে—অজানা জিনিষ দেখে পরস্পর জিজ্ঞেস্ করবে 'এটা কি?'—তারা নিজেরা না পারলে শিক্ষকের কাছে আসবে। আর এক কথা। প্রাথমিক অবস্থায় যেখানে 3 R's শেখানো হয়, সেখানে একঘণ্টা ক্লাসের পর একঘণ্টা অবসর গল্প বা খেলা প্রয়োজন। একটানা ক্লাস শুধু বিরক্তিকর নয়, ক্ষতিকরও।

শব্দ-পরিচয়ের পর রিডিং পড়া শুরু হবে, ক্লাসে নয়, ব্যক্তিগত ভাবে। এতে দুটো লাভ—এক লজ্জাবশতঃ কোন ছাত্র সকলের সামনে নিজের ভুল হতে পারে ভেবে পড়তে সঙ্কোচ করবে, তাতে ক্লাসের অনেক সময় নষ্ট; ভুল হলে সব ক্লাস ভুল শিখল—আর যার ভুল হল সে ত মরমে মরে গেল। আত্মগ্লানির পঙ্ক থেকে শিশুকে তোলা কারু সাধ্য নয়। দ্বিতীয়, ব্যক্তিগত ভাবে রিডিং পড়লে সহানুভূতিশীল শিক্ষক অতি সহজেই ভুল শুধরে দিতে পারেন এবং ছাত্রের অগ্রগতি হচ্ছে কি-না তাও ধরতে পারেন। এ বিষয়ে খুব তাড়াহুড়া করে লাভ নেই, দেখা গেছে তাড়াতাড়ি করার দরুন অনেকেরই খুব দেরি হয়ে যায়; তা ছাড়া চোখের স্নায়ু ও মাংসপেশী নিকট দৃষ্টির জন্য তৈরী হবার আগেই বই পড়তে দিলে অল্পবয়সেই চশমার প্রয়োজন হয়—চোখের ডাক্তারদের এই সিদ্ধান্ত। সাত বছরের পর বড় হরফের বই দিয়ে টানা-পড়া শুরু হতে পারে।

নিজের আগ্রহে পড়তে না চাইলে জোর করে বালককে পড়তে বসালে আর একটা বিপদের আশঙ্কা—সে কখনও উৎসাহী ছাত্র হবে না, ফাঁকি দিতে শিখবে এবং শীঘ্রই তার ছাত্র-জীবনে কমা সেমিকোলনের পর পূর্ণচ্ছেদ পড়বে।

অনেক ছাত্রকেই দেখা যায়—স্কুলে ভর্তি হবার প্রথম দু'তিন বছর পড়াশুনায় কোন মন নেই, কিছুই পড়া পারে না, পাসও করতে পারে না, বাপ-মা অত্যন্ত চিন্তিত দুঃখিত, কিন্তু অভিজ্ঞ শিক্ষক চুপ করে দেখে যান এবং ছেলেটির সাধারণ বুদ্ধি দেখে তাকে প্রমোশনও দিয়ে যান। তার পর চতুর্থ বছরে তার ভেতর কি এক জাগরণের জোয়ার এল যে, সে দেড়বছরে চার বছরের সব পড়া শেষ করে ফেলল এবং ক্লাশের প্রথম দশ জনের মধ্যে এগিয়ে এল। অবশ্য শিক্ষকের বিশ্বাস ও সহানুভূতি এখানে অলক্ষ্যে খুব কাজ করেছে। আবার বিপরীত ক্রমে এও দেখা যায়—নীচু ক্লাসে যারা প্রথম দ্বিতীয় হত তারা ক্রমশঃ পিছু হঠতে হঠতে শেষের দিকে অদৃশ্য হয়ে গেল! প্রমোশন-ব্যাপারে শিক্ষক-অভিভাবকের পরামর্শও অনেক ক্ষেত্রে দরকার।

শিশুর লেখা শিখতেও দেরি হয়; তার কারণ লেখা-ব্যাপারে শরীর ও মন দুটিই বিশেষভাবে জড়িত। চোখের সঙ্গে হাত মিললে তবে ত লেখা সম্ভব। এই চোখ-হাতের মিলন ( Eye-hand co-ordination ) অত সহজ নয়! বর্ণমালা আগে ছিল শ্রুতিমূলক, এখন তা চিত্রমূলক। অতএব ছবি আঁকার ভেতর দিয়েই লিখতে শেখাবার সহজ রাস্তা। তারপর শিশু ছাপার অক্ষর অনুকরণ করুক যতদিন তার ভাল লাগে। এখানেও টানা লেখা শেখাবার কিছু তাড়াতাড়ি নেই, দরকারও নেই। অনেক সময় শিক্ষকরা নিয়ম করে দুপৃষ্ঠা, আবার শাস্তিস্বরূপ তার ডবল পৃষ্ঠা লিখতে দেন। শিশুকে বেশি লেখার কাজ দেওয়া নিষ্ঠুরতা; তার মাংসপেশী স্থুত লেখার উপযুক্ত হয় নি। পুরাতন একটি প্রবচন একটু বদলে নিয়ে বলা যায় 'চোখ হাত মন, লিখে তিন জন'। ছোট ছেলের লিখতে কি পরিশ্রম বড়রা তা কি করে বুঝবেন? ছেলেবেলার কথা কি তাঁদের মনে আছে? একজন প্রাপ্তবয়স্ক লোকের এক বালতি জল তুলতে যা কষ্ট হয় বা শক্তি খরচ হয়, একজন শিশুর হয়ত এক গ্লাস জল তুলতে তত কষ্ট হয়, অনুরূপ শক্তি খরচ হয়।

'পড়া' ও 'লেখা'র পর অঙ্ক কষা। এ না হলে ত 'লেখাপড়া' অসম্পূর্ণ। অঙ্ক শেখারও প্রথম অবস্থা অঙ্কন। তারপর দৈনন্দিন জীবনে সংখ্যার ব্যবহার—এইসূত্রে সংখ্যাশিক্ষা। ব্যবহারের বাইরের সংখ্যা দ্বারা শিশুমন ভারাক্রান্ত করা বৃথা শক্তিক্ষয়। কোটি অর্বুদ নির্বুদ শুধু ব্যবহার কেন, কল্পনারও বাইরে! তার চেয়ে সংখ্যা নিয়ে নানা খেলাচ্ছলে যোগ-বিয়োগ-নামতা অতি সহজেই শেখানো যায়।

বুদ্ধির অঙ্ক বলতে যা বোঝায় সেগুলি যেন আকাশ থেকে পেড়ে আনা না হয়, সেগুলি যেন ইহ জগতের হয়, অর্থাৎ ছাত্রের পরিচিত জগতের। আর একটা কথা মনে রাখতে হবে। যত বোকা ছেলেই হোক তার নিজের একটা যুক্তি আছে, যার সাহায্যে সে একটা প্রশ্ন একভাবে বুঝেছে ও সমাধান করেছে—হতে পারে তা ভুল কিন্তু ভুলটা না বোঝা পর্যন্ত এইটাই তার কাছে ঠিক। সত্যঘটনা থেকে একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি—একটা পেন্সিলের দাম যদি দু'পয়সা হয়, দুটো পেন্সিলের দাম কত? তৎপর উত্তর 'তিন পয়সা'!

কেন?

কারণ একটা পেন্সিলের দাম দুপয়সা, তার মানে যটা পেন্সিল, দাম তার থেকে এক পয়সা বেশি; অতএব দুটো পেন্সিলের দাম তিন পয়সা! ছেলেটির যোগের ধারণা হয়েছে, গুণের ধারণা হয়নি। এখানে মার বকুনি-ঝাঁকানিতে কি ভুল ভাঙবে? দুটো পেন্সিল ও চারটি পয়সা নিয়ে তার সঙ্গে সত্যিকারের

কেনাবেচা করলেই এক মিনিটে সে বুঝে ফেলবে। বেশ একটা খেলাও হবে।

এই হ'ল নতুন শিক্ষার পদ্ধতি। শুধু কেমন করে শেখানো হবে এইটাই বদলেছে তা নয়, কি শেখানো হবে তাও বদলেছে; আরও বদলাচ্ছে। কতকগুলো ধরাবাঁধা প্রশ্ন উত্তর মুখস্থ করে জ্ঞানসংগ্রহ নয়, জ্ঞান অর্জন করাই আজকাল শিক্ষার উদ্দেশ্য। একটা প্রশ্নের বা সমস্যার ভেতরে ঢুকে যেতে হবে—চারিদিক থেকে তাকে দেখতে হবে—তথ্য সংগ্রহ করে মেলাতে হবে তার সমাধান।

কোন গ্রামের স্কুলে শিক্ষক একদিন ক্লাসে এসে চুপ করে চিন্তান্বিত হয়ে বসে রইলেন। ছেলেরা প্রশ্ন করছে, কি হয়েছে—কি ভাবছেন বলুন। খানিক পরে শিক্ষক এক ভীষণ সমস্যা ছেলেদের দিলেন—আমাদের খাদ্য আসচে কোথা থেকে? কোথায় তৈরি হয়? কি ভাবে হয়? এই নিয়ে শুরু করে শিক্ষক সেই অঞ্চলের রাস্তাঘাট, চাষবাস, কুটিরশিল্প প্রভৃতি সম্বন্ধে অনেক কিছুই শিখিয়ে ফেলতে পারেন। এক একটি বিষয়ের জ্ঞাতব্য তথ্য সংগ্রহের ভার এক একটি গ্রুপকে দিলেন—৩।৪ দিনের মধ্যে তারা বাড়ীতে বা দোকানে জিজ্ঞেস্ করে সব জোগাড় করল—তারপর ক্লাসে সেগুলি সব আলোচনা হল—সবাই জেনে গেল। এর দ্বারা শিক্ষায় আর একটা বড় উদ্দেশ্য সাধিত হল, ৩,৪ জন ছেলে একই লক্ষ্যে একজোট কাজ করতে শিখল, পরস্পর নির্ভরশীলতা—সাহায্য-সহযোগিতা শিখল। সমস্যাসমাধান করার আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে বাস্তবজীবনে শিক্ষার কার্যকারিতা উপলব্ধি করে শিক্ষার পথে দ্রুত এগিয়ে চলল—বই মুখস্থ করা পরীক্ষায় পাস ফেল করা পদ্ধতিতে যা অসম্ভব। এই রকম বাস্তব জীবন থেকে প্রশ্ন তুলে উপযুক্ত শিক্ষক ছোটছেলেদেরও সমাজ-বিজ্ঞান স্বাস্থ্যনীতি-সম্বন্ধে মোটামুটি কথা মুখে মুখে শিখিয়ে ফেলতে পারেন। এর জন্যে কোন বই দরকার হবে না। গ্রামে ম্যালেরিয়া হয়, শহরে কলেরায় মড়ক লাগে। কেন এই সব হয়, কিভাবে প্রতিকার করা যায়, প্রতিষেধক কি? এগুলি অনেক সময় ম্যাজিক লণ্ঠন বা ছায়া-চিত্রযোগে দেখালেও ছোটদের মনে খুব ছাপ পড়ে যায়।

ভূগোল-শিক্ষা আমাদের অত্যন্ত ত্রুটিপূর্ণ। যেহেতু 'ভূগোল' অতএব 'পৃথিবী গোল' বলে আরম্ভ করা হয়—তারপর বলা হয় চ্যাপ্টা, আর অমনি ছেলেদের মাথাও গোল হয়ে যায়, কোন ধারণাই হয় না! এর থেকে ভূপরিচয় বা ভূবিজ্ঞান নাম বরং ভাল। শিশুর পরিচিত পরিবেশ স্কুল বা গ্রাম থেকে শুরু করে ক্রমশঃ পরিধি বাড়িয়ে যাওয়া উচিত। সংজ্ঞা মুখস্থ করা আরেকটি মারাত্মক জিনিষ। আসল জিনিষ দেখানো সম্ভব না হলে ছবি বা মডেল দেখিয়ে তারপর বলা উচিত এটিকে এই বলে। নতুবা যারা সংজ্ঞা মুখস্থ করে তারা প্রায়ই যোজককে প্রণালীতে, আর হ্রদকে দ্বীপে পরিণত করে। উপসাগর বা উপদ্বীপের যা অবস্থা হয়, তা আরও মজার। নানাপ্রকার স্থিরচিত্র ও চলচ্চিত্র-সহায়ে দেশ-বিদেশের পরিচয় দেওয়া সহজ ও আনন্দদায়ক, শিক্ষাবিষয়ক ফিল্ম্-পরিবেশনের ভার সরকারী শিক্ষাবিভাগের হাতে থাকলেই এ বিষয়ে সর্ববিধ সুবিধা হয়।

আজকালকার শিক্ষাপদ্ধতির আর একটি বিশেষ দিক হচ্ছে ছেলেদের সহযোগী ও সামাজিক মনোভাব গড়ে তোলা। ছাত্রেরা পরস্পর কি রকম মেলামেশা করে, কোন্ কোন্ ছেলে সকলের প্রিয়, কারা নেতৃত্ব চায়, কারা আবার সৈনিকের মত বাধ্য, কারা নেতার কথা মেনে চলতে চায় না, শিক্ষক সব কিছু দেখবেন, এবং যার যে গুণটি অনুশীলন করলে ভাবী জীবন সব দিক থেকে ভাল হবে তার চেষ্টা করবেন।

আধুনিক শিক্ষাদানের সব চেয়ে সহজ উপায় হচ্ছে শিক্ষার্থীর জানবার আগ্রহটা ঠিকপথে চালিয়ে নিয়ে যাওয়া। প্রত্যেকটি বালকের জানবার কৌতূহল অপরিসীম। সে যা জানতে চায় তাই তাকে দিতে হবে, যা এখন চায় না—তা পরে দিলেও চলবে। একটা বিষয়ে একবার ঝোঁক লেগে গেলে তাকে আর ধরে রাখা যায় না, সে ঊর্ধ্বশ্বাসে এগিয়ে যায়। আজকালকার ছেলেমেয়েরা তাদের পিতামাতার চেয়ে বেশি শিখছে। নতুন পদ্ধতির শিক্ষা দেখে অনেক বাপমাকেই বলাবলি করতে শোনা গেছে—আবার নতুন করে লেখাপড়া শিখতে ইচ্ছে হয়।

# শবরী

শ্রীশশাঙ্কশেখর চক্রবর্তী

দীর্ঘ বরষ-মাস কেটে যায়—শবরী নীরবে থাকে,
মনের বাসনা মনেতে ভরিয়া রাখে!
নব-ঘন-শ্যাম নয়নাভিরাম,
শ্যামল-কিশোর রঘুমণি রাম,
যত দূরে থাক্ তবু সে আসিবে তাহারি আকুল ডাকে।

ভক্তের সে যে ভক্তির ধন, প্রেমিক সে প্রিয়তম,
ত্রিভুবন মাঝে কে আছে তাহার সম?
পতিতে অধমে উদ্ধার-তরে,
জন্ম নেছে সে অবনীর পরে,
বেদনার ব্যথী, দুখের দুখী সে দয়ার্দ্র অনুপম।

জানে নিশ্চিত আসিবে শ্রীরাম তাহারি কুটির-মাঝে,
দীনের বন্ধু, প্রাণের বন্ধু সাজে!
গভীর আশায় আপনা ভুলিয়া,
থাকে একাকিনী যামিনী জাগিয়া,
শোনে কোন্ দূরে বুঝি সমধুরে চরণের ধ্বনি বাজে।

বামন হইয়া পেতে চায় চাঁদ—চাওয়া তার নহে ভুল,
এই জীবনেই পাবে সে অকূলে কূল!
মনে মনে ভাবে এই বুঝি আসে,
প্রতীক্ষা করে দুয়ারের পাশে,
পাছে ফিরে যায় দেবতা তাহার—তাই সে সততাকুল।

যৌবন-বান উথলিয়া উঠে তার সারা তনু-মনে,
পীন-উন্নত বুক কাঁপে ক্ষণে ক্ষণে!
ভ্রূক্ষেপ নাহি, যেন উদাসিনী,
ব্যাকুলা বিভোলা দিবস-যামিনী,
কতদিন পরে আসিবে শ্রীরাম শুধায় সে জনে জনে।

নব বসন্ত আসে যবে বনে, সাড়া জাগে দিকে দিকে,
ব্যগ্র-নয়নে চেয়ে রয় অনিমিখে।
ফুলে ফুলে দেখে সেই রূপ-শোভা,
দেখে মধু-হাসি প্রাণ-মনোলোভা,
দেখে সুগভীর প্রেমের পরশ ভরে দেছে ধরণীকে!

কাননে কাননে বায়ুর বীজনে জাগে ধ্বনি মর্মর,
বিহগ-কণ্ঠে ঝরে সুর-নির্ঝর।
ভেঙে যায় তার স্বপ্ন-আবেশ,
চমকিয়া দেখে—এল কি প্রাণেশ,
শূন্য-পথের পানে খুঁজে ফিরে—এল কি সে রঘুবর!

আঁচল ভরিয়া আনে বন-ফুল, আনে নির্মল বারি,
আসন বিছায় মেলি পল্লব সারি,
বনের কুসুমে ভরে রাখে ডালা,
নিরালায় বসি গাঁথে কত মালা,
রাতুল চরণ পূজিবার লাগি উন্মুখ হিয়া তারি।

দিনে দিনে হল শবরী বৃদ্ধা, লোল হল তনু-লতা,
রামের চরণে তবু সে শরণাগতা!
পলে পলে কাটে দীর্ঘ সময়,
নদী-বুকে যেন স্রোত-ধারা বয়,
ইষ্ট-মিলন-লগন লাগিয়া বাড়ে তার আকুলতা।

নীচ জাতি সে যে, সমাজে ঘৃণ্য, অবহেলা করে সবে,
তবু বেঁচে রয় শ্রীরামের গৌরবে!
আপন বলিতে কেহ নাই যার,
আছে তার রাম কৃপা-পারাবার,
কাঙাল-হৃদয় ভরিয়া দিবে সে অনুরাগ-বৈভবে!

একদিন এল পরম-লগ্ন তরুণ উষার ক্ষণে,
স্বর্ণ-সুষমা ছড়াইল বনে বনে।
এল সুন্দর শ্যামল কিশোর,
আয়ত-নয়নে সদা প্রেম-ঘোর,
এল ভক্তের আশ্রয় রাম শবরীর অঙ্গনে!

কোটি কোটি চাঁদ ঝলকিত যেন সহাস-শ্রীমুখ পরে,
স্থির-বিদ্যুৎ জাগিল দিগন্তরে!
'এসেছি শবরি, তোমার লাগিয়া,
দেখ মোরে চেয়ে নয়ন মেলিয়া'
পরম দয়াল রাম রঘুমণি—কহিল মধুর স্বরে।

বাহ্য-নয়নে বৃদ্ধা শবরী কিছু না দেখিতে পায়,
তবু রূপে রূপে হৃদয় ভরিয়া যায়!
দেখে, অপরূপ কমল-লোচন,
দাঁড়ায়েছে এসে দিতে দরশন,
কাঁদিয়া অঝোরে পড়িল লুটায়ে রামের রাতুল পায়!

লোল-দেহ তার ক্ষণেকের তরে পুলকে উঠিল দুলি,
বাহিরের জ্ঞান নিমেষে যাইল ভুলি!
স্নেহভরে রাম তুলিলেন তাকে
তাকান বরদ প্রসন্ন-মুখে,
ভগবান সনে মিলিল ভক্ত—বন্ধন গেল খুলি!

---

# রামরাজ্য

## শ্রীমনকুমার সেন

গান্ধীজীর আজীবন কর্ম-পরিক্রমার অভীষ্ট আদর্শ ছিল রামরাজ্য-প্রতিষ্ঠা। পুণ্যশ্লোক রাজা রামচন্দ্র যেমন সত্যরক্ষার্থ সকল ভোগসুখ পরিহারপূর্বক সুদীর্ঘকালের জন্য বনে গমন করিয়াছিলেন, তেমন সত্য ও অহিংসার জ্যোতিকে অবলম্বন করিয়া ভারতবর্ষে তথা সারা-বিশ্বের রাষ্ট্রগুলি প্রজা-কল্যাণের আদর্শকে অচলপ্রতিষ্ঠ করুক, ইহাই ছিল গান্ধীজীর অন্তরের আকুল প্রার্থনা, গান্ধী-কর্মবিধির অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য। অন্যদিকেও দেখি প্রজানুরঞ্জন শ্রীরাম প্রজাকুলের প্রীত্যর্থে প্রাণাধিকা পত্নীকেও বনবাসে প্রেরণ করিতে ইতস্ততঃ করেন নাই; আজিকার রাষ্ট্রগুলি যদি প্রকৃতই নিজদিগকে 'জনকল্যাণ রাষ্ট্র' বা গণতন্ত্ররূপে পরিচিত করিতে চাহে, তবে রাষ্ট্রনিয়ামকগণকেও প্রজাহিতের জন্য সর্বস্বার্থ ও আত্মসুখ অকাতরে বিসর্জন দিতে হইবে। গান্ধীবাদী গঠনকর্ম-পদ্ধতিতে রহিয়াছে এই ত্যাগস্বীকারের ও ভোগসুখ-নিবৃত্তিরই আহ্বান। আত্ম-বিনোদনের সুলভ জীবনকে দূরে ঠেলিয়া ফেলিয়া আত্ম-বিসর্জনের কণ্টকিত সাধনপথকে যাঁহারা বাছিয়া লইতে প্রস্তুত, গান্ধীজীর সমাজ-গঠনপরিকল্পনা শুধু তাঁহাদেরই জন্য।

ভারতের সুপ্রাচীন ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির সূত্রধররূপে বঞ্চিত শোষিত লোকসাধারণের মর্মজ্ঞ মুক্তিদূতরূপে মহাত্মা গান্ধীর আবির্ভাব। তাই, তাঁহার 'রামরাজ্য'-পরিকল্পনায় বস্তুতঃ নিখুঁত লোকরাষ্ট্রের আদর্শটিকেই তিনি বিশ্বের সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন: রামরাজ্য একদিন ছিল বলিয়াই আমার বিশ্বাস। এক্ষেত্রে 'রাম'-অর্থে পঞ্চায়েত। পঞ্চায়েত লোকমতের প্রতিনিধি, তাই পঞ্চায়েতের মধ্যে ভগবান বিরাজ করেন। স্বাধীন ও স্বাভাবিক লোকমত সত্যাশ্রয়ী হয়। লোকমতের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রই সেই অঞ্চলের রামরাজ্য। সুতরাং গান্ধীজীর রামরাজ্যকে ভাষান্তরে লোকায়ত্ত রাষ্ট্ররূপে অভিহিত করা যায়। কিন্তু গান্ধীজীর উক্তিটির মধ্যেও যে কথাটির গুরুত্ব ও অর্থ-গভীরতা অসামান্য, তাহা হইতেছে—'স্বাধীন ও স্বাভাবিক লোকমত সত্যাশ্রয়ী হয়। অর্থাৎ, পঞ্চায়েত-শাসনব্যবস্থাটিও অত্যন্ত সহজ, সরল, স্বতঃস্ফূর্ত প্রয়াসের মধ্য দিয়া গঠিত হইবে এবং এইরূপ যদি হয়, তবে সেই শাসনব্যবস্থা স্বাভাবিক রূপেই সত্যে বিধৃত থাকিবে।

আধুনিক জগতে 'গণতন্ত্র' কথাটিই সমধিক ব্যবহৃত; তাৎপর্যের দিক হইতে বিচার করিলে গান্ধীজী-কথিত 'রামরাজ্য' এবং 'গণতন্ত্র' বা 'লোকরাষ্ট্রে'র মধ্যে কোন প্রভেদ নাই। কিন্তু কার্যতঃ আধুনিক গণতন্ত্রসমূহ গান্ধীজীর গণতন্ত্র বা কৃষ্টিমূলক সত্যাশ্রয়ী লোকরাষ্ট্র হইতে সহস্র-লক্ষ যোজন দূরে অবস্থান করিতেছে—আদর্শ এবং আচরণ-পদ্ধতি উভয় দিকেই।

যে কোন রাষ্ট্রের মুষ্টিমেয় নগর ও তাহাদের অধিবাসীর কথা বাদ দিলে সাধারণভাবে লোক-সাধারণ পল্লী-অঞ্চলেই বসবাস করিত এবং এখনও করে। নগর-সভ্যতার এবং যন্ত্রবিজ্ঞানের

এত ব্যাপক আধিপত্য সত্ত্বেও আজ পর্যন্ত কোন রাষ্ট্রের ঊর্ধ্বপক্ষে অর্ধেক লোকসংখ্যাও পল্লী ছাড়িয়া নগরে, শহরে বসতি স্থানান্তরিত করিয়াছে কি না সন্দেহ। সুতরাং সমগ্র রাষ্ট্রকে শহরে রূপান্তরিত করিবার বাতুলতা যদি না থাকে, রাষ্ট্রের ভিত প্রশস্ত করিয়া পত্তন করিতে হইবে পল্লীরই উন্মুক্ত পটভূমিতে। এই সাধারণ ও একান্ত স্বাভাবিক নীতির বিরুদ্ধাচরণ করিয়া আধুনিক গণতন্ত্রের চাবিকাঠি পল্লী হইতে মুষ্টিমেয় শহরে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে; ফলে 'গণতন্ত্র' আখ্যাধারণ করিলেও বস্তুতঃ আধুনিক রাষ্ট্রগুলি সম্পূর্ণরূপ গণসংযোগে বঞ্চিত। 'স্বাধীন ও স্বাভাবিক লোকমতে'র উপর ভিত্তি করিয়া ইহাদের গঠন হয় নাই। লোকমতানুগামী রাষ্ট্র লোকসাধারণের নিত্যকার জীবনচর্যার সঙ্গেই সম্পৃক্ত থাকিবে, উহা হইতে রস গ্রহণ করিয়া শ্রীবৃদ্ধি লাভ করিবে—দূরে থাকিয়া নহে।

জনজীবনের প্রশস্ত পটভূমি পরিত্যাগ করিয়া শাসনব্যবস্থা স্থানবিশেষে বা মুষ্টিমেয় ব্যক্তির হস্তে কেন্দ্রীভূত করা ভারতীয় ঐতিহ্যেরও সম্পূর্ণ বিরোধী। বিকেন্দ্রিক আদর্শে পঞ্চায়েত শাসনের সংস্কৃতি বিশ্বের ইতিহাসে ভারতই সর্বপ্রথম প্রদর্শন করিয়াছে এবং সর্বাধিককাল ধরিয়া উহাকে রক্ষা করিয়াছে। কত সাম্রাজ্যের উত্থান-পতন ঘটিয়াছে, ইতিহাসের ঘাত-প্রতিঘাত কতভাবে সমাজের মূলে নির্মম আঘাত দিয়াছে, তথাপি ভারত তথা প্রাচ্যের বিকেন্দ্রিক সমাজ-দর্শন, সমদৃষ্টি ও সুবিচারের ভিত্তিতে স্থাপিত স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন একেবারে লোপ পায় নাই। প্রকৃতই 'লোকমত' ছিল ইহার পশ্চাতে, তাই সত্যানুরাগ ছিল এইরূপ ব্যবস্থায় স্বাভাবিক ধর্ম। আর সত্যের অনির্বাণ জ্যোতিই ইহাকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে সুদীর্ঘকাল।

ইউরোপের শিল্প-বিপ্লব মানব-সভ্যতার ইতিহাসে একটি যুগান্তকারী অধ্যায়। কিন্তু এই বিপ্লবের ফলে মানুষের জীবন ও জীবিকা আজ এমনভাবে লক্ষ্যভ্রষ্ট ও নীতিবিচ্যুত হইয়াছে যে, উহাকে মানব-প্রতিভার একটি দুঃসহ সৃষ্টিরূপে মনে করা বিচিত্র নহে। অবশ্য মানুষ যন্ত্রবিজ্ঞানের এই অভাবিত গতির সহিত নিজের মনের সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে না পারিয়াই যে উহার সর্বনাশা প্রকৃতির উপর আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই।

পাশ্চাত্ত্যের উৎপাদন-পদ্ধতিতে এই বিপুল পরিবর্তন অনিবার্যরূপে পাশ্চাত্ত্য সমাজ ও রাষ্ট্ররূপ এবং পাশ্চাত্ত্যবাসীর জীবিকার ব্যাপক পরিবর্তনের সূচনা করিল। পল্লীর ছোট-খাট শিল্প-ব্যবসায়ের গুরুত্ব দ্রুত হ্রাস পাইতে থাকিল, যন্ত্রবিজ্ঞানাবলম্বী বৃহৎ কল-কারখানায় উৎপন্ন রকমারী ও বহুল-পরিমিত দ্রব্য-সামগ্রী বাজার ছাইয়া ফেলিতে লাগিল। ভারত হইতে তখন এইসমস্ত কারখানার উপযোগী কাঁচাপণ্য ভারতের গ্রামাঞ্চল উজাড় করিয়া পুরাদস্তুর ব্রিটেনে রপ্তানী হইয়া চলিয়াছে।

পাশ্চাত্ত্যের অর্থনীতি এমনি করিয়াই সম্পূর্ণ মোড় ঘুরিয়াছে, উৎপাদন শতসহস্র গ্রামের আওতা হইতে মুষ্টিমেয় শহরে বা কারখানার কবলিত হইয়াছে। আবার এই নবসৃষ্ট 'শহরগুলি'তেই আসিয়াছে রাজনৈতিক আলোড়ন, ঘটিয়াছে শ্রমিক-চেতনার উন্মেষ—উহাদের এক একটি উল্লেখযোগ্য নির্বাচনক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে। রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থা বা শাসন-পরিচালক গভর্নমেণ্টও ইহার অনুবর্তী হইয়া শহরের আয়েসী জীবনকে ক্রমে ক্রমে আশ্রয় করিয়াছে।

ব্রিটেনের এই অভিনব নূতন সভ্যতার জোয়ার ( কিংবা ভাঁটা বলিব ? ) দ্রুত ভারতবর্ষ

তথা প্রাচ্যভূখণ্ডকেও গ্রাস করিয়াছে। রাজনীতি আর অর্থনীতির যে নূতন পাঠ এবার ভারতবর্ষে আমদানী হইল তাহাতে গ্রাম-ভারতে ফাটল-সৃষ্টি হইতে বিলম্ব হইল না, যদিও ব্রিটিশ রাজত্বের শুরু হইতেই ফাটল ধরিয়াছে জাতির জীবনমূলে। ব্রিটিশমার্কা সুশাসন-পদ্ধতি এদেশেও কায়েম হইল, যুগ-যুগাগত স্থানীয় পঞ্চায়েত-শাসনের ধারাটি উৎখাত হইয়া গেল। এই সুশাসনের ইতিহাস-রচয়িতা সুপ্রসিদ্ধ অর্থনীতিজ্ঞ ৺রমেশচন্দ্র দত্ত লিখিয়াছেন, "পৃথিবীর রাষ্ট্রগুলির মধ্যে ভারতবর্ষ সর্বপ্রথম যে গ্রামীণ স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তিত করিয়াছিল এবং দীর্ঘতম সময় উহাকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিল, তাহার অবলুপ্তি ভারতে ব্রিটিশ শাসনের শোচনীয় কুফলগুলির অন্যতম।"

শহর আর কারখানার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে ভারতের গভর্নমেণ্টও স্থানান্তরিত হইয়াছে শহরে, কোটিকোটির প্রাত্যহিক জীবনচর্যা হইতে উহা অতি দূরে শহরের নিশ্চিন্ত কোণে আশ্রয় লইয়াছে। রাষ্ট্রনীতির রূপ আজ এমনভাবে পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে যে, গভর্নমেণ্ট বলিতে লোকসাধারণ একটা অলীক, নিঃসম্পর্কীয়, নীরস ও জনস্বার্থ হইতে পৃথক কোন বস্তু বা ব্যক্তিকেই ধারণা করিয়া লয়। শুধু গভর্নমেণ্টের সঙ্গেই নহে, দেশের অর্থনীতির সঙ্গেও সাধারণ মানুষের সংস্রব অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। সাধারণের নিত্যপ্রয়োজনীয় এবং সর্বদেশে রপ্তানীযোগ্য লোভনীয় বস্তুসামগ্রীর সমস্তই এখানে প্রস্তুত হইত, ভারতের সাতলক্ষ পল্লীর কোণে কোণে, আনাচে-কানাচে। ছোটখাট যন্ত্রপাতি, সামান্য মূলধন অবলম্বন করিয়া স্বকীয় প্রেরণা আর উদ্‌যোগের বলেই গ্রামের শিল্পিকুল শিল্প-ব্যবসায়ে প্রতিষ্ঠা অর্জন করিয়াছিল। যন্ত্রবিজ্ঞান আর কারখানা-শিল্পের প্রতিযোগিতার মুখে তাহারা টিকিয়া থাকিতে পারিবে কেন? তাই পার্লা-মেণ্টারী রাজনীতির মত পুঁজিবাদী বা কেন্দ্রীভূত অর্থনীতিও রাষ্ট্রের লোকমত বা লোকসংযোগ হইতে বহু দূরে চলিয়া গিয়াছে। ফলে, শহরে রাজনীতি আর অর্থনীতির যত পাণ্ডিত্য, গবেষণা আর আড়ম্বরই থাকুক, পল্লীর শতকরা ৯০।৯৫ জন মানুষের জীবনে তাহা কোন প্রেরণাই সৃষ্টি করিতে সমর্থ হয় না। পঞ্চায়েত-শাসনে জীবন-যাত্রা ছিল সহজ, সরল, খোলাখুলি—দোষ, ত্রুটি, গলদ যেমন সহজে ধরা পড়িত তেমনই সহজেই তাহার সংশোধনের পথ ছিল। আজ সর্বক্ষেত্রেই কূটনীতি আর কৌশল; কারখানার শোষণের প্রক্রিয়াটিও অতিসূক্ষ্ম—সাধারণ বুদ্ধির অগোচর। গ্রামের ধান শহরের চাউলকলে যাইতেছে, গ্রামের তৈলবীজ শহরের তৈলকলে যাইতেছে, গ্রামের ইক্ষু শহরের চিনিকলে যাইতেছে, গ্রামের তূলা শহরের কাপড়ের কলে স্তূপীকৃত হইতেছে। আর জাতির জীবনকেন্দ্র শতকরা ৯০ জনের বাসভূমি পল্লী-ভারত অস্বাস্থ্য অশিক্ষা আর আর্থিক বিপর্যয়ের মুখে লোপ পাইয়া চলিয়াছে। উহা যে পরোক্ষে জাতীয় রাজনীতি এবং অর্থনীতির ভবিষ্যৎকেই বিপন্ন করিয়া তুলিতেছে তাহা আমরা ভাবিতেছি কই, ভাবিলেও এই সর্বগ্রাসী অসত্য আর শোষণকে স্তব্ধ করিবার মত শক্তির পরিচয় দিতেছি কই? গান্ধীজী বলিয়াছেন, 'আমার ধ্যানের স্বরাজ গরীবেরই স্বরাজ'—শহরকেন্দ্রিক রাষ্ট্রনীতি আর অর্থব্যবস্থায় সেই স্বরাজ আসিবে না—বরং উহা সেই স্বরাজের সম্পূর্ণ পরিপন্থী।

যন্ত্রসভ্যতার অহংকার মানুষকে অন্ধ করিয়া তুলিয়াছে, কী তাহার আদর্শ, সভ্যতার নিদর্শনই বা কী তাহা আজিকার মানুষ ভুলিতে বসিয়াছে। এই সভ্যতার আশীর্বাদে সাধারণ মানুষের অবস্থা দাঁড়াইয়াছে ম্যাক্সিম গোর্কীর বর্ণিত অভিজ্ঞতার মত: একদা গোর্কী একটি জনতার সম্মুখে

আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান ও অভিনব যান্ত্রিক আবিষ্কারের মহিমা ব্যাখ্যা করিয়া সবে আসন গ্রহণ করিতে যাইতেছেন, এমনি সময়ে শ্রোতৃবৃন্দের মধ্য হইতে একজন কৃষক বলিল, "হাঁ, ঠিক কথা—পাখীর মত আমরা আকাশে উড়িতে পারিতেছি, মাছের মত সাঁতার কাটিতে পারিতেছি জলে, কিন্তু মাটির উপর কী করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে হয় তাহাই আমরা জানি না।"

স্বৈরতন্ত্র হইতে মুক্তিলাভের জন্যই মানুষ আকাঙ্ক্ষা করিয়াছিল গণতন্ত্র। জীবনাদর্শ হইতে বিচ্যুত, লোকমত হইতে বঞ্চিত আধুনিক গণতন্ত্র সেই আকাঙ্ক্ষাকে ধূলিসাৎ করিয়া দিয়া জনতার কণ্ঠে ফাঁস হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ক্ষুব্ধ ও বেদনাহত কণ্ঠে এই অবস্থাকে লক্ষ্য করিয়াই ডক্টর রাধাকৃষ্ণন্ বলিয়াছেন: "Modern civilization is in the stage of economic barbarism"—আধুনিক সভ্যতা অর্থনৈতিক বর্বরতার পর্যায়ে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।'

বিকেন্দ্রিক আদর্শে শাসনব্যবস্থা ও অর্থব্যবস্থাকে মানবজীবনের শাশ্বত সত্যের উপর পুনর্বিন্যাস করিতে না পারিলে এই বর্বরতার অবসান ঘটিবে না—অধঃপতিত মানুষের আর উঠিয়া দাঁড়াইবার শক্তি হইবে না। যে সত্যোপলব্ধি হইতে গান্ধীজীর সমাজ-পরিকল্পনার উদ্ভব, তাহাকে অন্তর দিয়া বুঝিতে না পারিলে বাহ্যিক আচরণেও কিছুই হইবে না। মানুষের জন্যই রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি; সুতরাং মানুষের সনাতন জীবনাদর্শ হইতে উহাদিগকে পৃথক করিয়া রাখা বা পৃথকভাবে উহাদের বিকাশের চিন্তা করা শুধু মূর্খতাই নহে, মারাত্মকও। সমতা, সুবিচার, তিতিক্ষা ঐগুলি যেমন ব্যক্তি-জীবন বা ব্যক্তির সমবায়ে গঠিত সমাজ-জীবনের উপকরণ, যে নীতির দ্বারা ইহাদের আমরা প্রতিষ্ঠা দিতে চাই তাহাকে ভিন্নপথে ও স্বতন্ত্ররূপে প্রবাহিত করার কোন অর্থ নাই, সার্থকতাও নাই। সত্যকে যদি আমরা ধর্ম বলিয়া স্বীকার করি, অহিংসাকে যদি আমরা সভ্যতারই নিরিখরূপে গণ্য করি, তবে রাষ্ট্রজীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তাহাদের স্বীকার করিয়া লইতে হইবে। পঞ্চায়েতের আদর্শে আমাদের রাষ্ট্র-পরিচালন এবং উৎপাদন ও বণ্টন-ব্যবস্থাকে পুনরায় গ্রামমুখীন করিয়া তুলিতে পারিলে তাহাই হইবে এইরূপ স্বীকৃতির পরিচায়ক এবং শুধু তখনই আমরা মহাত্মার পরিকল্পিত লোকমতাবলম্বী, স্বাধীন, স্বাভাবিক সত্যাশ্রয়ী রামরাজ্য-প্রতিষ্ঠার গৌরবে গৌরবান্বিত হইতে পারিব।

---

# সন্ধান

শ্রীঅমলেন্দু দত্ত

আমরা ভুলেছি স্বামীজীর বাণী—নর-নারায়ণ-সেবা,
অন্ধ যেহেতু তাই ভাবিয়াছি—এ-ভার লইবে কেবা ?
আজ হেরি তাই দিকে দিকে শুধু জমিছে দীর্ঘশ্বাস
শোষণে শাসনে হাজারো মানুষ মরে হায় বারোমাস !
ঈশ্বর কোথা খুঁজে খুঁজে যারা নিজেরে করিছ লয়,
বলি আর বার : মানুষেরি মাঝে সেরা তার পরিচয় !
দুঃস্থ-পীড়িত-কল্যাণে শোনো স্বামিজীর আহ্বান ;
বাহিরেতে নয়—আমাদেরি মাঝে আমাদের ভগবান !

# জীব শিব

শ্রীঅন্নদাচরণ সেনগুপ্ত

ভক্তসঙ্গে বসিয়া শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ হইতেছিল, শ্রীরামকৃষ্ণদেব শুনিতেছিলেন। যখন পড়া হইল 'জীবে দয়া নামে রুচি' ইত্যাদি তখন শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিলেন, জীবে দয়া কিরে? জীবসেবা, শিবজ্ঞানে জীবের সেবা। এই পাঠের আসরে স্বামী বিবেকানন্দ (তখন নরেন্দ্রনাথ) উপস্থিত ছিলেন। পাঠশেষে ঘরের বাহিরে গিয়া নরেন্দ্রনাথ তাঁহার অপর গুরুভ্রাতা ও ভক্তগণকে বলিয়াছিলেন, আজ একটি নূতন আলোকের সন্ধান পাইলাম। বাঁচিয়া থাকিলে উহা কার্যে পরিণত করিতে প্রয়াস পাইব। নরেন্দ্রনাথ তাঁহার স্বপ্ন সফল করিয়া গিয়াছেন—সেবাধর্মের একটি উজ্জ্বল আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন ভবিষ্যৎকালের কর্মিবৃন্দের জন্য।

তাঁহারই বাণীতে পাই যে, যিনি সেবার ভার গ্রহণ করেন তিনিই উপকৃত হন বেশী। 'ঘটে ঘটে রাম', 'সর্বভূতে নারায়ণ', 'যত্র জীবস্তত্র শিবঃ', 'বাসুদেবঃ সর্বম্'—এই কথাগুলি শুধু পুঁথির বিষয় না হইয়া যদি উপলব্ধির বিষয় হয় তাহা হইলে আমরা বুঝিতে পারিব, জীবের সেবা করিয়া আমরা ভগবানেরই পূজা করিতেছি।

বুভুক্ষু কাতর কণ্ঠে অন্ন প্রার্থনা করিতেছে, আমরা তখন যদি তাহার প্রার্থনা পূরণ করি, তবে শিবপূজা হইল। ভিক্ষুক কাতর কণ্ঠে গৃহস্থের দ্বারে বারংবার মা মা বলিয়া চীৎকার করিতেছে, আমরা রুদ্ধ দুয়ারের অন্তরালে বসিয়া পাথরের শিবের মাথায় বিল্বদল দিয়া 'নমঃ শিবায়' করিতেছি। বাহিরের শিব শুধু চীৎকার করিয়াই ফিরিয়া গেলেন, ভিতরের শিবের মস্তকে জল-বিল্বদল অর্পিত হইল। ভিতরের পূজার শিব পূজা গ্রহণ করিলেন কি না সে শুধু শিবই জানেন।

পূজার ভানে শুধু নিজেকেই প্রতারণা করা হইতেছে। আতুর সাহায্য প্রার্থনা করিল, কিন্তু প্রাণে উহাতে কোন সাড়া জাগিল না। 'সর্বভূতে নারায়ণ' পড়া বৃথা হইয়া গেল। কথায় ও কাজে যদি কোন মিল না রহিল, তবে বড় বড় কথা শুধু পড়িয়া আত্মপ্রবঞ্চনাই হইল। তিলক-মালার সহিত পরিচিত হইলাম, মুখে 'ঘটে ঘটে রাম' উচ্চারণ করিলাম, দুয়ার হইতে বুভুক্ষু ফিরিয়া গেল! নিরাশ্রয়ের কাতর আর্তনাদ এ অসাড় হৃদয়ে চেতনা আনিতে পারিল না!

স্বামী বিবেকানন্দই এই 'ঘটে ঘটে রাম' আত্মস্থ করিয়াছিলেন। জীবের দুঃখে তিনিই প্রকৃত শিবের পূজা করিয়া গিয়াছেন। আমাদের জন্য রাখিয়া গিয়াছেন একটি জ্বলন্ত আদর্শ। তাঁহার প্রাণপাত সাধনার ফল আমরা দেখি কাশী সেবাশ্রমে—কনখল বৃন্দাবন সেবাশ্রম প্রভৃতিতে। সময় অসময় দুর্ভিক্ষ অথবা প্লাবনের কালে তাঁহারই প্রতিষ্ঠিত মিশনের ত্যাগী সেবকবৃন্দ যখন নিজেদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ভুলিয়া শিবের পূজায় আত্মনিয়োগ করিতে ঝাঁপাইয়া পড়েন, তখনই বুঝি—শিবপূজার মূল মন্ত্র কি!

আমরা বাহিরের কতকগুলি আড়ম্বর-অনুষ্ঠানের মোহে আচ্ছন্ন হইয়া প্রকৃত পূজা ভুলিয়া গিয়াছি। জীবনের ইতিহাস খুঁজিলে শুধু দেখিতে পাই, নিজেকে বঞ্চনা করিয়াছি, অপরকে ঠকাইয়াছি। পুষ্প-আহরণ, পূজার উপকরণ আহরণ অশুদ্ধ মনেই হইয়া যাইতেছে। হৃদয়ের প্রসার যদি না হইল, জীবন যদি সম্মুখের

দিকে একটুও না হইল, তাহা হইলে শেষের দিনে শুধুই দেখিব—

বৃথাই তুলেছি পূজার প্রসূন
বৃথাই ঘসেছি চন্দন।

সেবা তখনই মধুময় হইয়া উঠে, যখন আমরা উহার প্রকৃত আস্বাদনে তৃপ্ত হই। জীবসেবাই শিবসেবা, একথা মুখে বলা যত সহজ, কার্যের অনুষ্ঠান তত সহজ নহে। কর্মের প্রেরণা যখন আসে, উচ্ছ্বাসের আতিশয্যে তখন আমরা উহার মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়ি। পরে উহার ভিতর নানা প্রকার দৈহিক ক্লেশ অনুভব করিয়া কর্ম হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইতে চেষ্টা করি।

ইহা স্বাভাবিক, সেবাকর্ম দ্বারা আমরাই উপকৃত হইতেছি এই বোধ যখন আমাদের মধ্যে হইতে থাকে, তখনই আমরা ঐ কর্মকে ধরিয়া বসিতে প্রয়াস পাই। একজন বুভুক্ষুকে অন্নদান করিয়া আমাদের মনে করা উচিত যে, আমার ভিতর যে সদ্‌বৃত্তি লুকায়িত আছে, তাহার পরিশীলন করিবার সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে এবং এই সুযোগ দিয়াছে ঐ বুভুক্ষু। সুতরাং আমারই কৃতজ্ঞ থাকা উচিত ঐ বুভুক্ষুর নিকট যে, তাহার সেবা করিয়া আমার ভিতরের সৎপ্রকৃতির পরিচালনা করিবার সুবিধা ও সুযোগ ঘটিয়াছে। এইরূপ প্রতি সেবাকার্যেরই অনুরূপ ব্যাখ্যা। স্বামী বিবেকানন্দ তাই বলিয়াছেন—"Let the giver kneel down and give thanks, let the receiver stand up and permit."

স্বামিজী এই জন্যই বলিয়া গিয়াছেন, কোন কর্মই ছোট নহে। নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে সকলেই প্রধান। হাকিম হিসাবে হাকিম শ্রেষ্ঠ, পেয়াদা হিসাবে পেয়াদা শ্রেষ্ঠ। নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে নিষ্ঠার সহিত কর্ম করিয়া গেলে কে ছোট কে বড় এ মীমাংসার প্রশ্নই উঠিতেই পারে না। হাকিমের কাজ পেয়াদার দ্বারা চলে না—পেয়াদার কাজও হাকিমের দ্বারা চলে না। তাই কে বড়, কে ছোট তার সমাধান কে করিবে?

বর্তমানে দেশে ব্যাপকভাবে বিবিধ প্রকারের সেবা-প্রতিষ্ঠান হইয়াছে ও হইতেছে। এই আদর্শের প্রথম পথপ্রদর্শক স্বামী বিবেকানন্দ। হেঁটমুণ্ড, উর্ধ্বপদ হইয়া তপস্যা করিবার দিন এখন আর নাই, বিবিধ প্রকারের শাস্ত্রীয় যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবার সামর্থ্যও লুপ্ত হইয়াছে। জনহিতকর কার্যের মধ্য দিয়া যে ভগবৎসেবা তাহার নূতন পন্থা দেখাইয়া গিয়াছেন স্বামিজী। ক্ষীণশক্তি ও অল্পায়ু আমাদের জন্য স্বামিজী এই পরিকল্পনার—শুধু পরিকল্পনার নহে—কার্যের অনুষ্ঠানের দ্বারা যে আদর্শ দেখাইয়া গিয়াছেন তাহাই আমাদের অবলম্বনীয়। ধ্যান ধারণা তপস্যা কর্মের ভিতর, শিববোধে জীবসেবা সকলকেই করিবার নির্দেশ দিয়া গিয়াছেন।

কিন্তু আমরা কি করিতেছি? ঐ মহান আদর্শের বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিতে পারিয়াছি কি? শ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপদেশ, স্বামিজীর শিবজ্ঞানে জীবসেবার আদর্শ যদি আমরা ঠিক ঠিক বুঝিতে না পারিয়া থাকি তাহা হইলে সে আমাদের পরম দুর্ভাগ্য। মুখে শুধু মহাপুরুষদের নাম উচ্চারণে কোনই ফল হইবে না, হইতেছে না। নিষ্ঠাহীন জীবনে আদর্শ অনুসরণ না করিয়া আমরা শুধু মন্দিরের মধ্যে ধূপদীপের বৃথা আয়োজন করিতেছি। মনের প্রসার হইল না, জীবন অগ্রসর হইল না—আনন্দের স্বাদ দূরেই রহিয়া গেল! শেষের দিনে শুধু দেখিব—

কত চন্দন ক্ষয় হল হায়,
কত ধূপ পুড়িল বৃথায়।

# কথাপ্রসঙ্গে

কয়েকমাস পূর্বে চীন-গভর্নমেণ্ট কর্তৃক প্রেরিত একটি সাংস্কৃতিক মিশন এদেশে প্রচুর অভ্যর্থনা লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহারা ভারতীয় জনগণের জীবনধারার কিছুটা পরিচয় আহরণ করিয়া গিয়াছেন সন্দেহ নাই। এপ্রিল মাসের শেষে ভারত সরকারও শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিতের নেতৃত্বে চীনে একটি অনুরূপ সাংস্কৃতিক প্রতিনিধিদল পাঠাইয়াছেন। আশা করা যায় ইঁহাদের প্রচার ও কার্যকলাপ ভারত এবং চীনের মৈত্রী ও পারস্পরিক ভাব-বিনিময়ের সেতু দৃঢ়তর করিতে সাহায্য করিবে। এই উভয় দেশের মধ্যে সখ্য এবং সংস্কৃতির আদান-প্রদানের ইতিহাস বহু প্রাচীন। খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দী হইতে দশম শতাব্দী পর্যন্ত প্রধানতঃ ভগবান বুদ্ধদেবের ধর্মকে অবলম্বন করিয়াই ভারত ও চীনের মধ্যে ভাব-বিনিময় অব্যাহত গতিতে চলিয়াছিল। দুর্গম পর্বত, মরুভূমি এবং অরণ্য অতিক্রম করিয়া বৎসরের পর বৎসর শত শত চীনা পরিব্রাজক ভগবান তথাগতের আবির্ভাব-স্থান এই পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে আসিয়া বসবাস এবং শিক্ষাদীক্ষা গ্রহণ করিয়া যাইতেন। ঠিক তেমনি অসংখ্য ভারতীয় পণ্ডিত ও প্রচারক স্থল এবং সমুদ্রপথে চীন মহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে সত্য, শান্তি এবং উচ্চচিন্তার বার্তা বহন করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। ধর্ম ও দর্শনই যে শুধু ভাব-বিনিময়ের বিষয় ছিল তাহা নয়—চিত্রকলা, সঙ্গীত প্রভৃতি ক্ষেত্রেও উভয় দেশের যে ঘনিষ্ঠ আদান-প্রদান ছিল, তাহার প্রচুর প্রমাণ পাওয়া যায়। উভয়দেশেরই রাজশক্তি এই পারস্পারিক সংযোগকে প্রভূত সহায়তা করিয়াছিল। তাহার পর ভারতে বৌদ্ধধর্ম যত স্তিমিত হইয়া আসিতে লাগিল ভারত ও চীনের সাংস্কৃতিক যোগাযোগও তত ক্ষীণ হইয়া আসিল। অবশ্য চীন ভারতকে বা ভারতও চীনকে ভুলে নাই। কিন্তু ভাব, আদর্শ এবং আচরণের সাম্যে পূর্বে দুই জাতির মধ্যে যে প্রাণের নিবিড় আকর্ষণ ছিল উহা পরবর্তী শতাব্দী-সমূহে আর লক্ষিত হয় নাই। আজ বহু শতাব্দী পরে ভারতবর্ষ ও মহাচীন রাজনৈতিক স্বাধিকার লাভ করিয়া এশিয়ার দুই মহাশক্তি-রূপে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে। জাতীয় জীবনের এই নব জাগরণের অবসরে উভয়ে উভয়ের বিস্মৃত প্রাচীন সাংস্কৃতিক সম্বন্ধ পুনঃস্থাপিত করিলে উভয় জাতিরই কল্যাণ সন্দেহ নাই।

*　　*　　*

এই সম্বন্ধ ও যোগাযোগের রূপ আজ এক হাজার বৎসর পরে কি আকার ধারণ করিবে তাহা এখনই বলা কঠিন। এই নূতন সংযোগের মধ্যে রাষ্ট্রনীতি, সমাজনীতি, শিক্ষা, শিল্প, সঙ্গীত ও বিজ্ঞান স্থান অধিকার করিবে সন্দেহ নাই। ধর্মও করিবে কি? ধর্মের কথা উত্থাপন করিতে আজকাল অনেকেই কুণ্ঠা বোধ করেন—বিশেষতঃ যাঁহারা গভর্নমেণ্টের প্রতিনিধিত্ব করেন। তাঁহারা বলেন ধর্ম সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত ব্যাপার—আন্তর্জাতিক আচরণে উহার প্রসঙ্গ উঠিতে পারে না। একথা মানিয়া লইতে আমরা কিন্তু ইতস্ততঃ বোধ করি। মানব-সংস্কৃতির মহত্তম অভিব্যক্তি ধর্মকে সাংস্কৃতিক লেনদেনের ক্ষেত্রে অপাঙ্‌ক্তেয় করিয়া রাখার কোন সঙ্গত কারণ খুঁজিয়া পাই না। ধর্মের গণ্ডীবদ্ধ ক্রিয়াকলাপ এবং বিশ্বাসসমূহকে বাদ দিয়া উহার যাহা সার্বভৌমিক তত্ত্ব, তাহা বিভিন্ন

দেশে কি ধারায় অভিব্যক্তি ও বিস্তার লাভ করিয়াছে, সে বিষয়ে গবেষণা এবং আলোচনা সাংস্কৃতিক সংযোগের অন্যতম লক্ষ্য হওয়া উচিত। চীন একদা ভারতের বৌদ্ধধর্ম দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হইয়াছিল—তাহার জাতীয় মনীষা এবং প্রকৃতিকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়া বৌদ্ধধর্মকে আপনার করিয়া লইয়াছিল। ভারতের বেদান্ত—যাহা মানব-জীবনের মূল সত্যের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ এবং পরিণতি—যাহা এই বিজ্ঞান এবং সাম্যবাদের যুগে মানুষের যুক্তিবিচার ও সমীক্ষণের আঘাত অনায়াসে সহ্য করিতে পারে—উহাও কি চীনকে আকৃষ্ট করিবে? বেদান্ত কোন আনুষ্ঠানিক ধর্মমত নয়—উহা সকল ধর্মের সঞ্জীবনী সত্য। বহুতর ঘাত-প্রতিঘাত-অত্যাচার-বিপ্লবে মানুষের মন যখন বিদ্রোহী হইয়া উঠে—গতানুগতিক বিশ্বাস, কল্পনা ও মতবাদসমূহের ভিত্তি যখন শিথিল হইয়া পড়ে, তখনই মানুষের চিত্তে জাগে সত্যানুসন্ধিৎসা। তাহার প্রাণ চায় এমন একটা কিছু যাহা শুধু ঐতিহ্য এবং লোকাচারের দোহাইতে মানিয়া লইতে হইবে না—যাহা বিচার-বুদ্ধি, বিবেক এবং কল্যাণের সহিত বিরোধ সৃষ্টি করিবে না—যাহা সর্বপ্রকার হেঁয়ালিমুক্ত, সুস্পষ্ট এবং বীর্য ও উৎসাহপ্রদ। চীনের সাম্প্রতিক মানস-পটভূমিতে ঐরূপ চাহিদা আসা বোধ করি অস্বাভাবিক নয়। আর বেদান্তই বোধ করি ঐ চাহিদা মিটাইতে পারিবে। অতএব চীনের সহিত ভারতের সাংস্কৃতিক সংযোগের আলোচনায় এই দূর বা অদূরের সম্ভাবনাটির কথা স্বতঃই মনে পড়িতেছে।

* * *

বেদান্ত গ্রহণ করা আর হিন্দু হইয়া যাওয়া এক কথা নয়। বেদান্ত মানব-প্রকৃতিতে ধর্মাভিব্যক্তির চরম বিশ্লেষণ। ইহা একটি বৈজ্ঞানিক তথ্য। অতএব প্রথম হইতেই যদি দৃষ্টিকে আমরা সংকীর্ণ না করিয়া ফেলি, তাহা হইলে সহজেই বুঝিতে পারিব সকল ধর্মের লোকেরই বেদান্তে প্রয়োজন আছে—যেমন শরীর-বিজ্ঞানে, অর্থনীতিতে, কাব্যে, সাহিত্যে, শিল্পে, প্রয়োজন আছে। এই প্রয়োজন যেমন ভারতে আছে, আমেরিকায়-ইউরোপে আছে—চীনদেশেও আছে। ভারত হইতে বর্তমানে যে সাংস্কৃতিক মিশন চীনে গেলেন তাঁহাদের কার্য-পরিধির মধ্যে নিশ্চিতই এই তাগিদ অন্তর্ভুক্ত হয় নাই—কিন্তু ভবিষ্যৎ ভারতের সংস্কৃতি-বাহকগণ যখন তাঁহাদের প্রচার-তালিকা প্রস্তুত করিবেন তখন বোধ করি উহাকে চাপিয়া রাখিতে পারিবেন না।

* * *

চৈনিক সংস্কৃতি অতি-প্রখর ভাবে ইহলৌকিক—কিন্তু তাই বলিয়া ভোগসর্বস্ব নয়। এই পৃথিবীর আকাশবাতাস-মাটি-জলকে, ইহার নর-নারী-পরিবারসমাজকে চীনা নিবিড়ভাবে ভালবাসে, কিন্তু ইহাদের দ্বারা সে আচ্ছন্ন হয় না। এই সকলের নশ্বরতা সে মর্মে মর্মে উপলব্ধি করে। কিন্তু সেই জন্য পৃথিবীর কর্তব্য সংপ্রাপ্তির প্রতি উদাসীন হইয়া সে পরকালের দিকে তাকাইয়া থাকে না। তাহার চরিত্রে সে সমভাবে অনুশীলন করে কর্মোদ্যম, স্বাবলম্বন—আবার সন্তোষ, অনাসক্তি। চৈনিক সংস্কৃতি মানবতন্ত্র। ধর্ম তাহার মানবতাকে কখনও ছাপাইয়া যায় নাই। এই জন্যই বোধ করি কনফুসীয়, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান, মুসলমান হইয়াও চীনারা তাহাদের জাতীয় একত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিয়াছে। ধর্ম তাহাদের একতার মাপকাঠি নয়। (রাজনৈতিক কারণে পারস্পরিক বিভেদের কথা বলিতেছি না) চৈনিক সংস্কৃতির এই দিকটি ভারতের বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করা উচিত। ঋষি কনফুসীয়াসের শিক্ষাই সম্ভবতঃ চৈনিক সভ্যতাকে এই মানবতার ভিত্তিতে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল।

ভারতের ধর্ম-সংস্কৃতিতে বহু শতাব্দী ধরিয়া একটি নিশ্চেষ্ট ইহকাল-বিমুখতা ঢুকিয়া গিয়াছে, যদিও বৈদিক ধর্মের শিক্ষা তাহা নয়। ধর্মের নামে স্বার্থান্বেষীরা যুগ যুগ ধরিয়া মনুষ্যত্বকে লাঞ্ছিত ও নিষ্পেষিত করিয়াছে। মানুষ মানুষকে চাপিয়া, ডিঙ্গাইয়া 'দেবতা'কে ধরিতে গিয়াছে, মান দিয়াছে। সভ্যতার ইহা এক শোচনীয় প্রহসন। আজ বিংশ শতাব্দীতে এই অবস্থার পরিবর্তন আসিতেছে। ধর্মের বিকৃতিগুলি আমরা ধরিতে পারিতেছি। চৈনিক ধর্ম ও নীতির মানবতন্ত্রতা হইতে আমরা এই আত্মবিশুদ্ধির প্রভূত প্রেরণা ও সহায়তা পাইতে পারি।

---

# সন্তোদ্যানে পুষ্পচয়ন

স্বামী বাসুদেবানন্দ

মঠের পুরাণো গেটের পাশে একটা ছোট পুকুর ছিল, শ্রীশ্রীমহারাজ মাঝে মাঝে ছিপ নিয়ে বসতেন। বলতেন, "এতে ধ্যান-অভ্যাস হয়, চিত্ত-সরোবরে ভাবরূপ ফাতনাটা লক্ষ্য করে বসে থাকতে হয়, কখন ফাতনা নড়ে।" আমাদের ভোরে উঠতে দেরি হলে, বিছানার পাশে এসে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলতেন, "হর হর মহাদেব।" মঙ্গলারাত্রিকের পর শ্রীশ্রীমহারাজ মঠে না থাকলে আমরা পুরাতন ঠাকুরঘরের পেছনের ঘরে ধ্যান করতুম, শ্রীশ্রীবাবুরাম মহারাজ সেখানে বসতেন। সেটা ধ্যানঘর বলে পরিচিত ছিল। কিন্তু তিনি মঠে থাকলে তাঁর ঘরে বসেই তাঁর সঙ্গে ধ্যান করতে হোত। তাঁর যখন ধ্যান ভাঙত, তখন প্রথম স্তোত্রপাঠ ও পরে ভজন-গান হোত। কোন কোন দিন শীতকালে বেলতলায় ধুনি জেলে ধ্যান করা হত, মহারাজ গিয়ে মাঝে মাঝে দেখে আসতেন। আবার পূজ্যপাদ মহাপুরুষ মহারাজকেও প্রায়ই পাঠিয়ে দিতেন। তিনি বসে গভীর ধ্যানে মগ্ন হতেন। তাঁর ধ্যান ভাঙলে সেখানে মাঝে মাঝে ভজনও হোত। একবার শিবরাত্রির সময় তিনি সারারাত ধরে ঐ বেলতলায় বসে পূজাদি দর্শন করেন এবং ভজনের সঙ্গে পাখোওয়াজ বাজান। তাঁরা এইগুলোর ওপর খুব বেশী জোর দিতেন।

আবার মহারাজের ঘরে ধ্যানাদির পর তিনি অনেক সাধন-রহস্য প্রকাশ করতেন। একদিন বল্লেন, "নির্বিকল্প সমাধি হলে আসল ধর্ম-রাজ্যের আরম্ভ হলো, তার পূর্বে সবই কল্পনা। মন নির্বিকল্প হলে তবে শুদ্ধ জ্ঞানের বোধে বোধ হয়; সে বোধটা কিন্তু মহানন্দময়। সেই সচ্চিদানন্দে যার যা ভাব তার অনুপাতী সেখানে চিন্ময় মূর্তির দর্শন হয়। যেমন ঠাকুর বলতেন, 'জল আর বরফ'। মন নির্বিকল্প না হলে ঈশ্বরের স্বরূপ প্রকাশ হয় না, তার পূর্ব পর্যন্ত দর্শনাদি সবই বুদ্ধির কল্পনা। বুদ্ধি যখন নিজের সর্ববিধ কল্পনা (উপাধি) ত্যাগ করে, তখন তাকে আর বিশুদ্ধচৈতন্য থেকে তফাৎ করা চলে না। বুদ্ধির বাঁধ (উপাধি) ভাঙলেই অমনি সেখানে সচ্চিদানন্দ পরিপূর্ণ হয়ে উঠেন। ঠাকুর বলতেন আল ভাঙলেই জল আপনি সেখানে গিয়ে ঢোকে।"

* * *

বাঁকুড়া দুর্ভিক্ষের কাজের সময় শ্রীশ্রীবাবু-রাম মহারাজ একখানি যে পত্র লেখেন তার একটা অংশ পূর্বে লেখা হয়েছে, তার আর একটি অংশ এখানে প্রকাশ করা হচ্ছে—"প্রভুর সেবায় খাটুনী খুব, কিন্তু জীবন-সংগ্রামে মূর্চ্ছা হলো দীর্ঘকাল জড়তা; ক্লান্তি-বশতঃ নিদ্রা ও স্বপ্ন হলো বহু জীবনের অধোগতি তা একেবারে স্থাবরত্ব পর্যন্ত; আর ক্লান্তি হেতু বিশ্রাম হলো দৈনন্দিন সুখভোগে ডুবে মরা।...তিনি যাকে দিয়ে যা করাবেন তাকে তাই করতে হবে, তা ভালই হোক বা মন্দই, বড় কাজই হোক বা ছোট কাজই হোক। তাৎপর্য বোঝবার শক্তি জীবের নেই। নারদের মোহ হলো, নিজের ইষ্টদেবতাকেই শাপ দিলে, নইলে রাবণবধ হয় না।

"যখনই অজ্ঞানতা বা জড়তার সহিত যুদ্ধ, তখনই নব নব সত্যরাজ্য-লাভ। অবিবেকের সহিত সংগ্রাম ছাড়া জীব কখন আধ্যাত্মিক উচ্চ ভূমিতে স্থির থাকতে পারে না—স্বর্গও একঘেঁয়ে হয়ে পড়ে। সাধন-সংগ্রামে বিশ্রান্তি মানে প্রবৃত্তিকে শাসন করে প্রভুর দিকে জ্ঞানরাজ্যে আর বেশী এগুতে পারছে না। এই বিশ্রাম-কালেই জীব প্রবৃত্তির স্রোতে গা ভাসিয়ে দেয়। এ ক্লান্তি আসাটা কিছু অস্বাভাবিক নয়।

"নর-নারায়ণের সেবা করে কৃতার্থ হবে, না মঠে এসে ঠাকুরঘরে জপের মালা ধরে ঝিমুবে? মুক্তি দিতে এসে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা কেন? ঠাকুরের সেবায় নয় অহংটা একেবারে বিলিয়েই দিলে।"

রিলিফ থেকে ফিরে এসে পত্রখানি একবার পূজ্যপাদ হরি মহারাজকে শুনাই। এ সম্বন্ধে তাঁর সঙ্গে যে আলাপ হয় এবং তিনি যে উপদেশ করেন তার সার কথা এই—"জীবনের সব স্তরেই, এমন কি বৃক্ষাদি স্তরেও এইরূপ একটা ঘুমন্ত অবস্থা আসে। তখন তারা বাইরের সর্ববিধ আঘাত সহ্য করেও বেঁচে থাকে, কিন্তু প্রাণ-প্রগতির কোন চিহ্নই দেখা যায় না, যেমন ভারতের হয়েছিল। এক শ্রেণীর সাধুজীবনেও দেখা যায়, খানিক দূর অগ্রসর হয়ে একটা গাঁটুলি পাকিয়ে বসে থাকে—চিন্তাজগতে কোন উন্নতি নেই, কচ্ছপের মত এমন হাত পা গুটিয়ে পড়ে থাকে যে তার উপর কোন বাহ্য প্রতিক্রিয়া বা সমালোচনার কোন অবসরই তারা দেয় না—কারণ বাহ্য আবেষ্টনীর সঙ্গে তাদের কোন বিরোধই নেই, যেটা কর্মযোগীদের অবশ্যম্ভাবী। কাজে কাজেই প্রযত্ন ও প্রগতি তাদের বুদ্ধিহৃদে কোনও আঘাতই করে না। প্রগতি সরল রেখার গতিতে কখনও চলে না, লাফ দেবার আগে মানুষকে একটু পিছুতে হবেই। ভুলের ভেতর দিয়েই মানুষ অভিজ্ঞান ও উন্নতির রাজ্যে গমন করে। রুটিন করা নির্ভুল যান্ত্রিক জীবনে 'এগিয়ে যাওয়া' বলে কোন কিছু নেই। গতানুগতিক জীবনের ধারাই হলো সমালোচনা ও সংঘর্ষকে বাঁচিয়ে চলা। স্বামিজী নিবেদিতাকে বলেন, 'বীজের পচন ভাবটা অস্বীকার করলে তার ভেতর সবুজের আবির্ভাব অসম্ভব হয়ে পড়ে।' আমাদের দেশ পিছিয়ে পড়লো কেন?—কারণ, তার আদর্শ হয়ে দাঁড়িয়েছিল একটা শান্তশিষ্ট জীবন অর্থাৎ একটা 'সুবোধ বালকের' যান্ত্রিক নির্ভুল জীবনযাত্রানির্বাহ।"

* * *

আর একদিন বাবুরাম মহারাজ বলেছিলেন, 'স্বামিজী একবার দক্ষিণ দেশে ঘুরতে ঘুরতে এক লাইব্রেরীতে দেখেন একখানা হাতীর পায়ের এনাটমী। তার পর যখন ইউরোপ-ভ্রমণ করছেন, তখন এক লাইব্রেরীতে গিয়ে দেখলেন সেই বইখানা সেখানে পৌঁছেচে। ওদের জ্ঞানলাভের উৎসাহ কত! কিন্তু নকল বা ধার করতে গিয়ে ওরা নিজেদের জাতীয়তা বা বাপ-ঠাকুরদার অনুশীলন হারিয়ে ফেলে না, নিজেদের মেরুদণ্ড ঠিক সোজা রাখে। স্বামিজী বার বার বলতেন, 'কেবল ওদের শিষ্য হলে চলবে না, গুরুগিরিও করতে হবে।' ওদের কাছ থেকে তোদের ব্যবহারিক বিদ্যে অনেক শিখতে হবে, তখন তোরা হবি ওদের ছাত্র; আবার তার পরিবর্তে তোরা শেখাবি ওদের পারমার্থিক জ্ঞান, তখন তোরা ওদের হবি গুরু। ওরা হবে লাখে লাখে তোদের চেলা।' কিন্তু গুরুগিরি করতে হলে হতে হবে প্রাক্‌টিক্যাল,] অর্থাৎ কাজে করে দেখাতে হবে, নইলে কেবল গীতা উপনিষৎ তোতাপাখীর মত

আওড়ালে আর কি হবে, গীতার অনুযায়ী জীবন না দেখাতে পারলে 'লোকে নিবেক কেন'—ঠাকুর বলতেন।

"স্বামীজী বলতেন, 'বড় বড় কাজ করতে হবে, ব্যক্তিত্ব বা অহমিকাটা একেবারে বিসর্জন দিতে হবে'—এরই নাম তিনি 'প্র্যাকটিক্যাল বেদান্ত' দিয়েছিলেন। নিজ দেহের সুখদুঃখ, মানযশ, কর্তামির বোধ যতক্ষণ থাকবে ততক্ষণ 'রামকৃষ্ণের চেলা কেবল প্রসাদ পাবার বেলা'। 'ওর পদবীটে বড় হোল', 'আমি ওর চাইতে কম কিসে', দল বেঁধে লোকের পিছনে লাগা, ভদ্রতা, বিনয়, নিরহংকারিতার দিকে জোর না দিয়ে কর্তামির আনন্দে মাতোয়ারা হওয়া, সর্বদা লাভ-লোকসান খতান —এ সবের অধীন যতদিন আমরা থাকব ততদিন আমরা বিবেকানন্দের 'কর্মী' বলে নিজেদের কেমন করে পরিচয় দিতে পারি? বিবেকানন্দের কর্মী এবং শ্রীরামকৃষ্ণের সেবক হতে গেলে ঠাকুরের প্রতি চাই অগাধ ভালবাসা, চাই মহাবীর হনুমানের আনুগত্য—সরলতা ও আন্তরিকতা হবে নিখুঁত, বিশ্বাস হবে জলন্ত, সেবার সময় মনে করতে হবে যেন সাক্ষাৎ ভগবদ্-বিগ্রহের সেবা করছি, কাজটা যেন শ্রদ্ধা-ভালবাসায় পূর্ণ থাকে—তার কম হলে হবে না। আদর্শ ছোট করব কেন? পারি আর না পারি। তিনি বলতেন, চালাকির দ্বারা কখন কোন মহৎ কার্য হয় নি। এখন ফাঁকিটাকেই বলে, যোগঃ কর্মসু কৌশলম্, সহজং কর্ম কৌন্তেয়।

আমরা সকলে হাসতে লাগলুম।

আবার বলতে লাগলেন, "আহা, আমরা আর ঠাকুরকে কৈ বা ভালবাসলুম—ভালবাসা ছিল গোপীদের, শ্রীভগবানের পায় কুশাংকুর ফুটলে তাদের মনে হোত তাদের বক্ষে শেল বিঁধছে। কৃষ্ণের সুখের জন্য তারা কুল, শীল, মান, লজ্জা, ভয়, ঘৃণা, নিন্দা সব উপেক্ষা করেছিল, কৃষ্ণসেবার জন্য সর্বদা তারা প্রাণ দিতে প্রস্তুত থাকত, কৃষ্ণের কুশলের জন্য তারা নরকভয়ও করত না।

"একবার শ্রীকৃষ্ণের অসুখ করল। বল্লেন, ভক্ত-পদধূলি অঙ্গে মাখা ভিন্ন এ ব্যাধি যাবে না। নারদ পদধূলি সংগ্রহ করবার জন্য ত্রিভুবন ঘুরলেন, কিন্তু কেউ এরূপ গর্হিত কাযে রাজি হলো না। শেষে বৃন্দাবনে গিয়ে এই কথা পাড়লেন। গোপীরা বল্লে, আমরা তাঁরই একান্ত শরণাগতা দাসী, তাঁকে ভিন্ন আমরা অন্য কিছু জানি না, তাঁর লীলা ভিন্ন আমরা অন্য ভজন করি না, তিনি ভিন্ন আমাদের অন্য কিছুতে অনুরক্তিও নেই, এক কৃষ্ণসুখাস্বাদে আর সব সুখ আমাদের অরুচি হয়ে গেছে। আমাদের কোন পুণ্যে যদি তাঁর শ্রীপাদপদ্মে কিছু ভক্তি থাকে, তাহলে আমাদের পদধূলিতেই তিনি আরোগ্য লাভ করবেন; এতে আমাদের নরক হয় হোক। এই বলে, তারা পায় ধুলো মেখে এসে পদধূলি দিল।"

# সন্ধ্যা ও নমাজ

শ্রীরবীন্দ্রকুমার সিদ্ধান্তশাস্ত্রী, কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ, বি-এ

হিন্দুগণ যেমন সন্ধ্যা-পূজাদিতে প্রবৃত্ত হইতে হইলে প্রথমে স্নান ও আচমন করিয়া কার্য আরম্ভ করেন, মুসলমানগণও তেমনি নমাজ, কোরানপাঠ ইত্যাদির প্রাক্কালে ওজু করিয়া থাকেন। মরুপ্রধান আরবদেশের অধিবাসিগণের পক্ষে প্রত্যহ অনেকবার স্নান করা সম্ভব নহে বলিয়াই সম্ভবতঃ হজরত মোহাম্মদ মুসলমানদিগের জন্য অবশ্যকর্তব্যরূপে স্নানের বিধান দেন নাই।

আচমন প্রভৃতি কার্যের জন্য হিন্দুগণ যেমন পবিত্র তাম্রপাত্রাদিতে বিশুদ্ধ জল গ্রহণ করিয়া উহাদ্বারা আচমন ইত্যাদি কার্য করিয়া থাকেন, মুসলমানগণও তেমনি ওজু করিবার জন্য একটি পবিত্র পাত্রে বিশুদ্ধ জল লইয়া ওজু আরম্ভ করেন। হিন্দুগণ যেমন পূর্ব অথবা উত্তরমুখ হইয়া সন্ধ্যা-পূজাদি করেন, মুসলমানগণও তেমনি মক্কার দিকে মুখ করিয়া ওজু প্রভৃতি যাবতীয় কার্য করিয়া থাকেন।

বাংলার মুসলিম-লিগ-গভর্নমেণ্ট কর্তৃক অনুমোদিত মাদ্রাসার পাঠ্যপুস্তক 'আরবী-কায়দা ও সরল দীনিয়াত'-এ লিখিত আছে—

"কুর-আন্-শরীফ ছুঁইবার বা পড়িবার জন্য বা নমাজ আদায় করিবার জন্য ওজু করা দরকার। ওজু করিবার সময় একটি পাত্রে পাকপানি লইয়া একটু উঁচু জায়গায় বসিবে যেন ওজুর ছিটাপানি শরীরে বা ওজু করিবার পানিতে না পড়ে। কিব্‌লার দিকে মুখ করিয়া বসিলে ভাল হয়" (প্রথম ভাগ, ২৭ পৃষ্ঠা)।

আচমন এবং ওজুর ক্রমের মধ্যেও যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। হিন্দু-স্মৃতিশাস্ত্রে আচমনের বিধান যথা—

প্রক্ষাল্য পাণী পাদৌ চ ত্রিঃ পিবেদম্বু বীক্ষিতম্।
সংবৃত্যাঙ্গুষ্ঠমূলেন দ্বিঃ প্রমৃজ্যাত্ততো মুখম্॥
অঙ্গুষ্ঠেন প্রদেশিন্যা ঘ্রাণং পশ্চাদনন্তরম্।
অঙ্গুষ্ঠানামিকাভ্যাস্তু চক্ষুঃশ্রোত্রে পুনঃ পুনঃ॥
নাভিং কনিষ্ঠাঙ্গুষ্ঠেন হৃদয়ন্তু তলেন বৈ।
সর্বাভিস্তু শিরঃ পশ্চাদ্ বাহূ চাগ্রেণ সংস্পৃশেৎ॥

বঙ্গার্থ—হস্তদ্বয় ও পদদ্বয় প্রক্ষালন করিয়া হস্তস্থিত (মাষকলাই-পরিমিত) জল উত্তমরূপে দেখিয়া তিন বার পান করিবে। তৎপর ঋজুভাবে উপবিষ্ট হইয়া অঙ্গুষ্ঠমূলদ্বারা দুই বার মুখমার্জন করিবে। অতঃপর অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জনী-দ্বারা নাসিকা স্পর্শ করিবার পর অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকার অগ্রভাগ মিলিত করিয়া পুনঃ পুনঃ চক্ষুর্দ্বয় ও কর্ণদ্বয় স্পর্শ করিবে। অনন্তর কনিষ্ঠা ও অঙ্গুষ্ঠের অগ্রভাগ একত্র করিয়া নাভি স্পর্শ পূর্বক হস্ততলদ্বারা হৃদয়, সমুদয় অঙ্গুলিদ্বারা মস্তক এবং অঙ্গুলির অগ্রভাগ-দ্বারা বাহুদ্বয় স্পর্শ করিবে।

পূর্বোক্ত গভর্নমেণ্ট-কর্তৃক অনুমোদিত মাদ্রাসার পাঠ্যগ্রন্থে ওজুর ক্রম যথা—

"দুই হাত কব্‌জি পর্যন্ত তিনবার ভালরূপে ধুইবে।... ইহার পর ডান হাত দ্বারা মুখে পানি দিয়া তিনবার কুলি করিবে।...

ইহার পর ডান হাতদ্বারা নাকে তিনবার পানি দিবে এবং বাম হাতের বুড়া ও শাহাদত অঙ্গুলিদ্বারা নাক ধুইবে ও ঝাড়িয়া ফেলিবে। ইহার পর ডান হাতে পানি লইয়া মাথার চুলের গোড়া হইতে থুতনি পর্যন্ত এবং ডান কান হইতে বাম কান পর্যন্ত মুখমণ্ডল তিনবার উত্তমরূপে ধুইবে। তারপর প্রথমে ডান হাত বাম হাত দ্বারা তিনবার, পরে বাম হাত ডান দ্বারা তিনবার ভালরূপে ধুইবে; তারপর শাহাদত অঙ্গুলির অগ্রভাগদ্বারা দুই কানের ভিতর দিয়া বৃদ্ধাঙ্গুলির অগ্রভাগদ্বারা দুই কানের বাহির দিক বেশ করিয়া মুছিবে। পরে দুই হাতের তালুর উল্টা পিঠ দিয়া ঘাড়ের দুই দিক মুছিবে।"

পাঠকগণ লক্ষ্য করিবেন, হিন্দুদিগের আচমনে যেমন নির্দিষ্ট বার নির্দিষ্ট স্থান স্পর্শ করিবার বা মুছিবার বিধান আছে, ওজুর বিধানও প্রায় তদ্রূপ।

হিন্দুদিগের আচমন যেমন 'ওঁ'-মন্ত্র উচ্চারণ সহকারে করিতে হয়, মুসলমানদের ওজুতেও তেমনি 'বিছ্‌মিল্লাহির্‌ রহ্‌মানির্‌ রহিম্‌' মন্ত্র-উচ্চারণের বিধান রহিয়াছে।

হিন্দুগণ যেমন সন্ধ্যা-বন্দনাদি কার্যে প্রবৃত্ত হইবার সময় সঙ্কল্পবাক্য উচ্চারণ-পূর্বক কার্য আরম্ভ করেন, মুসলমানদিগের নমাজেও তেমনি সঙ্কল্পবাক্য বা নিয়ত্‌ পাঠ করিতে হয়। হিন্দুগণের জন্ম যেমন স্নানের সময় সঙ্কল্প ও মন্ত্র উচ্চারণ করার বিধান আছে, মুসলমানদের ওজুতেও তেমনি সঙ্কল্প বা মন্ত্র-উচ্চারণের বিধান দৃষ্ট হয়।

হিন্দুগণ সন্ধ্যোপাসনার সময় গায়ত্রীমন্ত্র জপ করিয়া থাকেন; মুসলমানগণও নমাজের সময় রুকু ও সিজ্‌দা প্রভৃতি নিমিত্তক মন্ত্র বিশেষের জপ বা তাস্‌বীহ করেন।

হিন্দুগণের প্রাণায়ামকালে পূরক, কুম্ভক ও রেচকের প্রত্যেকটিতে সপ্তব্যাহৃতি-যুক্ত গায়ত্রীমন্ত্রের অন্ততঃ তিন বার করিয়া জপ করিতে হয়; মুসলমানদের তাস্‌বীহ্‌ বা জপ ও রুকু সিজ্‌দা প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে অন্ততঃ তিন বার করিতে হয়।

পূর্বোক্ত দীনিয়াতে লিখিত আছে—"রুকুতে যে দু'আটি তিন, পাঁচ বা সাতবার পড়িতে হয়, তাহাকে রুকুর তাস্‌বীহ বলে।"

"সিজ্‌দাতে যাইয়া যে দু'আ পড়িতে হয়, তাহাকে সিজ্‌দার তাস্‌বীহ বলে।"

হিন্দুগণ সন্ধ্যা করিবার সময় 'ওঁ ঋতঞ্চ সত্যঞ্চ...' ইত্যাদি মন্ত্রে সৃষ্টিকর্তা পরমেশ্বরের মাহাত্ম্য কীর্তন ও স্মরণ করিতে করিতে আচমন করিয়া থাকেন; মুসলমানগণও নমাজের সময় 'ইন্নিওয়াজ্‌জাহ্‌তু ...' ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা সৃষ্টিকর্তার মাহাত্ম্য কীর্তন করেন।

হিন্দুগণ যেমন জ্ঞানাজ্ঞানকৃত সমুদয় পাপ ক্ষালনের জন্ম প্রাতঃকালে 'সূর্যশ্চ মা মন্যুশ্চ' ইত্যাদি, মধ্যাহ্নে 'আপঃ পুনন্তু' ইত্যাদি এবং সায়ংকালে 'অগ্নিশ্চ মা মন্যুশ্চ' ইত্যাদি মন্ত্রদ্বারা আচমন করেন, মুসলমানগণও তেমনি নমাজে 'আল্লাহুম্মা ইন্নি ...' ইত্যাদি মন্ত্র পাপক্ষালনের জন্ম উচ্চারণ করিয়া থাকেন।

হিন্দুধর্মশাস্ত্র বলেন—

শুচিঃ সুবস্ত্রধৃক্‌ প্রাজ্ঞো মৌনী ধ্যানপরায়ণঃ।
গতকামভয়দ্বন্দ্বো রজো-মাৎসর্য-বর্জিতঃ।
আত্মানং পূজয়িত্বা তু সুগন্ধি-সিত-বাসসা॥
(সন্ধ্যাবন্দনাদিকং কুর্যাৎ)।

অর্থাৎ সন্ধ্যা-বন্দনাদি কার্যে প্রবৃত্ত হইবার জন্য শুদ্ধচিত্তে বিশুদ্ধ বস্ত্র পরিধান করিয়া মৌনাবলম্বন পূর্বক ধ্যানপরায়ণ হইয়া কাম-ক্রোধাদি রিপু, আত্মপরজ্ঞান এবং রজোগুণ ও মাৎসর্য হইতে নিজেকে মুক্ত করিয়া জ্ঞানী ব্যক্তি সুগন্ধ শ্বেত বস্ত্রদ্বারা নিজেকে ভূষিত করিবেন।

মুসলমানদিগের ধর্মশাস্ত্রও শুক্রবারে এবং নমাজের পূর্বে বিশুদ্ধ বস্ত্রাদি পরিধান এবং সুগন্ধি দ্রব্য ব্যবহারের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন।

হিন্দু-ধর্মশাস্ত্রে যেমন ব্রাহ্মমুহূর্তে প্রাতঃসন্ধ্যা করা বিহিত আছে, মুসলমান-ধর্মশাস্ত্রেও তেমনি ঐ সময়ে ফজরের নমাজ পড়া বিহিত হইয়াছে। প্রাতঃসন্ধ্যার কালসম্বন্ধে হিন্দুধর্মশাস্ত্র বলেন—

উত্তমা সহনক্ষত্রা মধ্যমা লুপ্ততারকা।
অধমা উদিতে ভানৌ প্রাতঃসন্ধ্যা ত্রিধা মতা॥

অর্থাৎ আকাশে নক্ষত্র থাকিতে প্রাতঃসন্ধ্যা করা উত্তম, তারকাগণ অদৃশ্য হইলে উহা করা মধ্যম এবং সূর্যোদয়ের পর করা অধম।

মাদ্রাসার পাঠ্য—'সরল দীনিয়াত' তৃতীয় ভাগে মৌলানা আলী আকবর লিখিয়াছেন—

"ফজর—এই ওয়াকতের নমাজ অন্ধকার থাকিতে না পড়িয়া পুরুষের জন্য কিছু দেরী করিয়া পড়া মুস্তাহাব।"

উক্ত নমাজের সময়-সম্বন্ধে উল্লিখিত গ্রন্থে লিখিত আছে—

"ফজর—সুব্‌হে সাদেক হইতে (অর্থাৎ ভোরে পূর্ব দিকের আকাশ সাফ্‌ হইতে শুরু হওয়ার পর) সূর্য উঠার পূর্ব পর্যন্ত।"

হিন্দুদের মধ্যাহ্ন-সন্ধ্যা এবং মুসলমানদের জুহর নমাজের আরম্ভসময় ও ঠিক একই। দিবাভাগ ১৫টি মুহূর্তে বিভক্ত। তন্মধ্যে ৮ম মুহূর্ত হইতে আরম্ভ করিয়া মধ্যাহ্ন-সন্ধ্যা করিতে হয়। শাস্ত্র বলেন—

'মধ্যাহ্ন-সন্ধ্যা কর্তব্যা মুহূর্তে সপ্তমোপরি।'

জুহর নমাজের সময়-সম্বন্ধে পূর্বোক্ত দীনিয়াতে লিখিত আছে—"ঠিক দুপুর অতীত হইয়া সূর্য মাথার উপর হইতে পশ্চিমদিকে ঢলিয়া পড়িলে জুহর নমাজের ওয়াকত আরম্ভ হয় এবং কোন জিনিষের আসলী ছায়া ব্যতীত ইহার ছায়া দ্বিগুণ হওয়া পর্যন্ত এই নমাজের সময় থাকে।"

সায়ংসন্ধ্যা এবং মাগ্‌রিবের নমাজের সময়ও প্রায় সমান। সায়ংসন্ধ্যার কাল সূর্যাস্তের এক দণ্ড পূর্ব হইতে আরম্ভ করিয়া এক দণ্ড পর পর্যন্ত; আর মাগ্‌রিব নমাজের কাল সূর্য ডুবিয়া যাওয়ার পর হইতে পশ্চিম আকাশের কিনারায় লাল রং থাকা পর্যন্ত; এই মাত্র বিশেষ।

যদিও কোরানে জুহর ও মাগ্‌রিব নমাজের মধ্যবর্তী সময়ে আছরের নমাজ এবং মাগ্‌রিব ও ফজরের নমাজের মধ্যবর্তী সময়ে ঈশা নামক আর একটি নমাজ বিহিত হইয়াছে, তথাপি ঐ নমাজ দুইটির উপর তেমন গুরুত্ব দেওয়া হয় নাই।

প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন এবং সায়ংকালে সন্ধ্যোপাসনা করা যেমন হিন্দুদিগের অবশ্য কর্তব্য বলিয়া অভিহিত আছে, তেমনি উক্ত তিন সময়ে সুন্নাত নমাজ পড়াও মুসলমানদের অবশ্য কর্তব্যরূপে উল্লিখিত হইয়াছে। উক্ত তিন সময়ে সন্ধ্যোপাসনা না করিলে যেমন হিন্দুদিগকে প্রত্যবায়ী হইতে হয়, তেমনি ঐ তিন সময়ে সুন্নাত নমাজ না পড়িলে মুসলমানগণও প্রত্যবায়ী হইয়া থাকেন। আরবী ভাষায় উক্ত তিন সময়ের নাম যথাক্রমে ফজর, জুহর এবং মাগরিব। যদিও আছর (মধ্যাহ্ন ও সায়ংকালের মধ্যবর্তী) এবং ঈশা (সায়ংকালের পর হইতে প্রাতঃকালের পূর্ব পর্যন্ত) সময়ে নমাজ পড়াও মুসলমানদের জন্য বিহিত আছে, তথাপি উক্ত দুই সময়ের সুন্নাত নমাজ না পড়িলেও তাঁহাদিগকে প্রত্যবায়ী হইতে হয় না। এই সম্বন্ধে 'সরল দীনিয়াত'-নামক গ্রন্থের দ্বিতীয়-ভাগে (২৩২৪ পৃষ্ঠায়) লিখিত আছে—

"যাহা হজরত মুহম্মদ মুস্তাফা (দঃ) ইবাদত সূত্রে সর্বদাই করিতেন, মাত্র দুই একবার ওজর বশতঃ ত্যাগ করিয়াছেন, কিংবা যাহা করিবার জন্য বিশেষ তাগিদ দিয়াছেন, তাহা সুন্নাত-ই-মু-আক্কাদাহ; যথা—ফজর, জুহর ও

যাগ্‌রিবের সুন্নাত নমাজ ইত্যাদি। যাহা হজরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (দঃ) কখনও করিয়াছেন, আবার কখনও করেন নাই এবং যাহা করিবার জন্য বিশেষ কোন তাগিদ নাই, তাহাকে সুন্নাত-ই গায়ের-মু-আক্কাদাহ্‌ বা সুন্নাত-ই জায়েদা বলে। ইহা করিলে ছাওয়াব হয়, না করিলে গুণাহ্‌ হয় না; যেমন—আছর ও ঈশার চার-রাক্‌আত সুন্নাত নমাজ।"

কোরানে তিন বারের নমাজের উপরই বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে। ১১শ ছুরার ১১৪ তম আয়তে লিখিত আছে—"দিবসের দুই ভাগে এবং রাত্রির প্রথম যামে প্রার্থনা করিবে।"

দিবসের দুই ভাগ বলিতে যে প্রাতঃ ও সায়ংকালকে বুঝাইতেছে, ছুরা 'টে-হে'র (২০শ ছুরা) ১৩০ তম আয়তে ইহা স্পষ্টই লিখা আছে। যথা—

"সূর্যোদয়ের প্রাক্কালে, সূর্যাস্তের পূর্বে এবং রাত্রির (বিহিত) ঘটিকাসমূহের মধ্যে প্রশংসা দ্বারা তোমার প্রভুকে মহিমা-মণ্ডিত কর।"

সন্ধ্যা করিবার সময় যেমন বেদের বিভিন্ন মন্ত্র পাঠ করিতে হয়, ঠিক তেমনি নমাজ পড়িবার সময়ও কোরানের বিভিন্ন আয়ত পঠনীয়।

সন্ধ্যা ও নমাজের মধ্যে যে সকল বিষয়ে সাদৃশ্য আছে, কেবলমাত্র তাহাই এই প্রবন্ধে আলোচিত হইল।

---

# কাল ও মহাকাল

শ্রীদুর্গাদাস গোস্বামী, এম্‌-এ, কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

অসীম আকাশ ব্যাপি চলিয়াছে কাল-চক্র-রথ
আবর্তিয়া ষড়ঋতু, মুখরিয়া চন্দ্র-সূর্য-তারকার পথ—
অশ্রান্ত নিষ্ঠুর নেমি-তলে
দণ্ডে দণ্ডে পলে পলে—
কত ব্যক্তি-পরিবার-জাতি-রাষ্ট্র-সাম্রাজ্য গুঁড়ায়ে,
নিত্য নব সৃজনের জয়োদ্ধত কেতন উড়ায়ে।

নাভি-কেন্দ্রে তার—
বসেছেন স্থির নির্বিকার
সুন্দর ভয়াল
চক্ষু মুদি জপে মহাকাল।

দীর্ঘ অক্ষ-মালিকায় তাঁর
গাঁথা পড়ে ধীরে বার বার
পুরাতন পৃথিবীর এক এক পুরাণ বৎসর
অজস্র রহস্যভরা নূতনের পানে অগ্রসর,
সঙ্গে লয়ে তাহাদের লাভ-ক্ষতি-ক্ষয়—
হাসি-কান্না, প্রীতি-দ্বেষ, বিশ্বাস-সংশয়,
পুষ্করের বীজসম।

সমাসীন মহাকাল উদাসী নির্মম
সকল চঞ্চল কল-কোলাহল পরে,
গহন একক শুদ্ধ স্বাতন্ত্র্যের উত্তুঙ্গ শিখরে।
সেথা তাঁর ধ্যানের গভীরে—
পৌঁছিতে অক্ষম হয়ে বারে বারে আসে ফিরে ফিরে
দিন-রাত্রি, মাস-ঋতু, অয়ন-বৎসর—
দীর্ঘ-যুগ, কল্প-কল্পান্তর!
লক্ষ-ভাঙ্গা-গড়া-সাক্ষী মানবের জীর্ণ ইতিহাস
সে অচল স্তব্ধতার মাঝে নাহি ফেলে দীর্ঘশ্বাস।
সেথা তাঁর প্রশান্ত সমাধি
স্পর্শ না করিতে পারে ভৈরব-নিনাদী
লক্ষ কোটি আণবিক বিস্ফোরণ-শিখা,
লক্ষ কোটি ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-গীতিকা।

# কালিদাসের উপাস্য

অধ্যাপক শ্রীজ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র দত্ত, এম্-এ

মহাকবি কালিদাসের কাব্য ও নাটক পাঠ করিলে স্পষ্টই মনে হয় উমানাথ শঙ্করই তাঁহার প্রাণের দেবতা। রঘুবংশের নবম সর্গে ক্ষীরোদশায়ী বিষ্ণুর প্রশস্তি কবির সুগভীর ভক্তি-প্রাণতার দ্যোতক সন্দেহ নাই, তাহাতে তাঁহার উদার ধর্মভাবও প্রকাশ পাইয়াছে সমধিক, কিন্তু কবির মনের আকর্ষণ অন্যদিকে। 'রামগতপ্রাণ বীর হনুমানে'র মত তিনিও হয়ত বলিতে পারিতেন, হে শঙ্কর, ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর সকলেই তত্ত্বতঃ একই, তবুও আমার অন্তরের কথা হইল—তুমিই আমার সর্বস্ব। শাকুন্তল-নাটকের প্রথমেই মহাকবি অষ্টমূর্তি মহাদেবকে স্মরণ করিতেছেন—

যা সৃষ্টিঃ স্রষ্টুরাদ্যা বহতি বিধিহুতং
যা হবির্যা চ হোত্রী
যে দ্বে কালং বিধত্তঃ শ্রুতিবিষয়গুণা
যা স্থিতা ব্যাপ্য বিশ্বম্।
যামাহুঃ সর্ববীজপ্রকৃতিরিতি যয়া প্রাণিনঃ প্রাণবন্তঃ
প্রত্যক্ষাভিঃ প্রপন্নস্তনুভিরবতু বস্তাভিরষ্টাভিরীশঃ॥
( ১।১ )

—সৃষ্টিকর্তার প্রথম সৃষ্টি অপ্, যথাবিধি যজ্ঞে আহুতিরূপে প্রদত্ত ঘৃতের বহনকারী অগ্নি, হোমকর্তা যজমান, কালনিয়ামক সূর্য ও চন্দ্র, বিশ্বব্যাপী শব্দগুণবিশিষ্ট আকাশ, সর্ববীজের মূলস্বরূপা পৃথ্বী, জীবসমূহের প্রাণধারণের হেতুভূত বায়ু—ইহারা সকলেই পার্বতীশ পরমেশের এক একটি তনু; আমি প্রার্থনা করি এই অষ্টমূর্তি ভগবান্ শঙ্কর আপনাদিকে রক্ষা করুন প্রত্যেক নাটকের আরম্ভেই শিবানুস্মরণ। মালবিকাগ্নিমিত্র-নাটকের প্রারম্ভিক আশীর্বাণীতে কালিদাস বলিতেছেন—

একৈশ্বর্যে স্থিতোঽপি প্রণতবহুফলে
যঃ স্বয়ং কৃত্তিবাসাঃ
কান্তাসংমিশ্রদেহোঽপ্যবিষয়মনসাং
যঃ পরস্তাদ্ যতীনাম্।
অষ্টাভির্যস্য কৃৎস্নং জগদপি তনুভির্বিভ্রতো নাভিমানঃ
সন্মার্গালোকনায় ব্যপনয়তু স বস্তামসীং বৃত্তিমীশঃ॥
( ১।১ )

—যে পরমেশ্বর উমানাথ শঙ্কর ভক্তিবিনম্র ভক্তগণের স্বর্গাপবর্গাদি নানাফলদায়ক অদ্বিতীয় ঐশ্বর্যবান্ হইয়াও স্বয়ং ব্যাঘ্রচর্মমাত্র পরিধান করেন, যিনি অবিরত আপন প্রিয়তমা কান্তা পার্বতীর দেহের সহিত সম্পূর্ণ মিশ্রিত থাকিয়াও —অর্ধনারীশ্বরমূর্তি হইয়াও—স্বয়ং জিতেন্দ্রিয়তম এবং সর্বাসক্তিবিনির্মুক্ত যতিগণেরও শীর্ষস্থানীয়, ক্ষিতি-অপ্-তেজঃ-মরুৎ-ব্যোম-চন্দ্র-সূর্য-যজমান এই অষ্টবিধ মূর্তি দ্বারা বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ধারণ করিলেও অভিমানের লেশমাত্র যাঁহাতে নাই, সেই মঙ্গলময় মহাদেব পদার্থের সদ্গুণ-আলোকনের নিমিত্ত আপনাদের তামসী বৃত্তি—চিত্তের অজ্ঞান—দূর করুন। বিক্রমোর্বশীয়-নাটকেও এই একই শুভেচ্ছা মন্ত্রিত—স স্থাণুঃ স্থিরভক্তিযোগসুলভো নিঃশ্রেয়সায়াস্তু বঃ (১।১)—অবিচলিত ভক্তিযোগের নিকট যিনি সহজেই ধরা দেন সেই স্থাণু আপনাদের ভবপাশনির্মুক্তিরূপ নিঃশ্রেয়সের কারণ হউন। কবি শাকুন্তল-নাটকের সর্বশেষে

ভরতবাক্যে কেবলমাত্র প্রজাবর্গের কল্যাণকামনাই করেন নাই, নিজের মনের আকুতিও অলক্ষিতে প্রকাশ করিয়া ফেলিয়াছেন—

প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ
সরস্বতী শ্রুতিমহতাং মহীয়তাম্।
মমাপি চ ক্ষপয়তু নীললোহিতঃ
পুনর্ভবং পরিগতশক্তিরাত্মভূঃ॥

—রাজা আপনার প্রজাবর্গের মঙ্গলসাধনে প্রবৃত্ত হউন, বেদজ্ঞান দ্বারা যাঁহারা মহত্ত্ব অর্জন করিয়াছেন—বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হইয়াছেন, তাঁহাদের সুপবিত্র বাণী জনসমাজে সমাদৃত হউক; আর আমারও একটি নিবেদন আছে—নীলকণ্ঠ লোহিতকেশ সর্বতোব্যাপী শক্তির আধারভূত আত্মভূ ভগবান্ দেবাদিদেব তত্ত্বজ্ঞান প্রদান করিয়া আমার পুনর্জন্ম রোধ করুন। মুমুক্ষু কালিদাস আপন একান্ত উপাস্যের নিকটই মোক্ষপ্রার্থনা করিতেছেন।

কুমারসম্ভব-কাব্যে কালিদাসের উপাস্য-রূপায়ণ সর্বাধিক প্রকট এবং প্রাণস্পর্শী হইয়াছে। কাব্যের বিষয়বস্তু সংক্ষেপে এই—তারক-নামক দুর্দান্ত অসুর পিতামহ ব্রহ্মার বরগর্বে গর্বিত। অজেয় সেই দানব দেবগণকে স্ব স্ব অধিকার হইতে বিচ্যুত করিয়া স্বর্গরাজ্য অধিকার করিয়া বসিল। দেবগণ ব্রহ্মার শরণাপন্ন হইলেন। তিনি বলিলেন, আমি ত আর তারকাসুরকে সংহার করিতে পারি না—বিষবৃক্ষোঽপি সংবর্ধ্য স্বয়ং ছেত্তুমসাম্প্রতম্ (২।৫৫)—নিজে যাহাকে সৃষ্টি করিয়াছি, সংবর্ধন করিয়াছি, তাহাকে নিজের হাতে কি করিয়া নিধন করি? স্বয়ং জলসেকাদি দ্বারা সংবর্ধিত বিষবৃক্ষকেও ত নিজে ছেদন করা যায় না। অবশ্য আপনারা নিরাশ হইবেন না—পার্বতী-পরমেশ্বরের যে বিক্রান্ত পুত্র জাত হইবেন তিনিই আপনাদের সৈনাপত্য-পদ গ্রহণ করিয়া তারকাসুরের প্রাণসংহার করিবেন। দেবগণ তখন উদ্‌যোগী হইয়া হরপার্বতীর পরিণয়-সম্পাদনার্থ কন্দর্পকে নিযুক্ত করিলেন। কন্দর্প সমাধিমগ্ন বিরূপাক্ষের ধ্যানভঙ্গে উদ্যত হইলেন, কিন্তু রুদ্রের রোষোদ্দীপ্ত ললাটনেত্র হইতে অগ্নিশিখা নির্গত হইয়া তাঁহাকে ভস্মীভূত করে। পরে পঞ্চতপা পার্বতীর কঠোর তপস্যায় মহাদেব প্রসন্ন হন, হরগৌরীর পরিণয় সম্পাদিত হইল।

পার্বতী মহাদেবকে পতিরূপে লাভ করিবার জন্য তপস্যায় চলিলেন। তাঁহার 'মুনিগণেরও মাননীয়া' মাতা মেনকাদেবী কন্যাকে বারণ করিলেন—উ—ওগো আমার পার্বতী, মা—তপস্যায় যাইও না; এত কঠোরতা, এত কৃচ্ছ্রসাধন কি তোমার সামর্থ্যে কুলাইবে? উ—মা বলিয়া মাতা মেনকাদেবী বারণ করিয়াছিলেন বলিয়া হিমালয়াত্মজা পার্বতী পরবর্তী কালে উমা এই নামে খ্যাত হন—উমেতি মাত্রা তপসো নিষিদ্ধা পশ্চাদুমাখ্যাং সুমুখী জগাম (১।২৬)। পার্বতী তপস্যায় যাইবেনই; পিনাকী কন্দর্পকে যখন ভস্মীভূত করেন তখন পার্বতী মর্মে মর্মে বুঝিতে পারিলেন বাহ্যরূপের মূল্য কত তুচ্ছ, দৈহিক লাবণ্য কত অকিঞ্চিৎকর। তিনি মনে মনে নিজের দেহসুষমাকে ধিক্কার দিতে লাগিলেন। কেন? প্রিয়তমের অনুগ্রহই ত রূপের আসল কষ্টিপাথর। সেই কষ্টিপাথরে পার্বতীর বাহ্যসৌন্দর্য যখন নিতান্ত হেয় বলিয়া প্রতিপন্ন হইল তখন রূপ দিয়া আর কি হইবে?

নিনিন্দ রূপং হৃদয়েন পার্বতী
প্রিয়েষু সৌভাগ্যফলা হি চারুতা। (৫।১)

পার্বতী স্থিরসংকল্পা। তাঁহার মা কত বুঝাইলেন—তপঃ ক বৎসে ক চ তাবকং বপুঃ (৫।৪)—এই কুসুমপেলব শরীর দ্বারা কি তোমার তপস্যা মানায়? কিন্তু পার্বতীকে রুদ্ধ করিবে কে? নিম্নগামী জলবেগকে কি কেহ আটকাইতে পারে? যাঁহার চিত্ত একবার অভীপ্সিত বিষয়ে বদ্ধপরিকর

হইয়াছে তাহাকে কি কেহ কখনো ফিরাইতে পারে ?

ক ঈপ্সিতার্থস্থিরনিশ্চয়ং মনঃ
পয়শ্চ নিম্নাভিমুখং প্রতীপয়েৎ। (৫।৫)

পিতা হিমালয় সানন্দে কন্যাকে তপস্যার অনুমতি দিলেন; গৌরীও হিংস্রজন্তুবিহীন ময়ূরাদিনিষেবিত হিমালয়শৃঙ্গে চলিয়া গেলেন। তিনি ঐ শিখরদেশে তপস্যায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন বলিয়া পরে উহা 'গৌরীশিখর'-আখ্যায় আখ্যাত হইল।

পার্বতী বেশভূষা একেবারে পরিত্যাগ করিলেন। তপস্যারতা গিরিজা বল্কল ধারণ করিয়াছেন, মস্তকে তাঁহার জটাভার। নিয়মক্ষামা এই তাপসী মুঞ্জতৃণের মেখলা ধারণ করিলেন। তাঁহার মৃণালকোমল হস্ত আজ 'অক্ষসূত্রপ্রণয়ী' (৫।১১)—দিবারাত্র হস্তে তাঁহার রুদ্রাক্ষের জপমালা। রাজার দুলালীর কি অভাবনীয় তপশ্চর্যা, কৃচ্ছ্রসাধন! স্বীয় কবরীবিচ্যুত কোমল পুষ্পাঘাতেও যিনি কত ব্যথিত হইতেন, তিনি কি না আজ—অশেত সা বাহুলতোপধায়িনী নিষেদুষী স্থণ্ডিল এব কেবলে (৫।১২)—নিজের ভুজলতায় মস্তক স্থাপন করিয়া ভূমিশয্যায়ই শয়ন করিয়া থাকেন! তাঁহার দুশ্চর তপস্যা দেখিয়া ঋষিরাও অবাক হইয়া গেলেন। তাঁহারাও এই অপূর্ব দেবীমূর্তি দর্শন করিতে আসিতেন। পার্বতী নিতান্ত বালিকা হইলেও বয়োবৃদ্ধ ঋষিগণ তাঁহার অদ্ভুত তপোনিষ্ঠা দেখিয়া বিস্মিত হইতেন। ধর্মাচরণে যিনি প্রবীণ, তাঁহার বয়সে কিছু যায় আসে না। বয়োবৃদ্ধ না হইলেও তিনি ধর্মবৃদ্ধ, আর ধর্মপ্রবীণতায়ই তিনি সকলের পূজনীয় হইয়া পড়েন—ন ধর্মবৃদ্ধেষু বয়ঃ সমীক্ষ্যতে (৫।১৬)। তবুও ত তাঁহার বাঞ্ছিত বস্তু লাভ করতে পারিলেন না! তবুও ত ভগবান্ চন্দ্রশেখর তাঁহার নয়নের গোচর হইলেন না! সুতরাং তাঁহার সঙ্কল্প যেন হইল নৈবাসনাৎ কায়মত্তশ্চলিষ্যতে—ইষ্টকে করামলকবৎ পাইতেই হইবে। দেহের মৃদুতা তাঁহার নিকট আরও উপেক্ষণীয় হইয়া দাঁড়াইল। কুসুমাদপি মৃদু শরীরের ভিতর মনটা যেন বজ্রাদপি কঠোর হইয়া উঠিল। তাঁহার শরীরখানি নিশ্চয়ই সোনার পদ্মে তৈরী। বোধ হয় পদ্মের স্বভাবে তাঁহার প্রকৃতি এত মধুর ও কোমল এবং কঠিন সোনার স্বভাবে তাঁহার মন এত দৃঢ়! চারিদিকে চারিপ্রকারের অগ্নি প্রজ্বালিত করিয়া স্থির নেত্রে ও ঊর্ধ্বমুখে পার্বতী ললাটন্তপ সূর্যের দিকে চাহিয়া থাকিতেন। সূর্যকরে তাঁহার চক্ষু ঝলসিয়া যাইত, বিন্দুমাত্রও তাঁহার ভ্রূক্ষেপ নাই! এই ভাবে চলিত তাঁহার পঞ্চাগ্নিসাধ্য তপস্যা। তাঁহার আহার্য ছিল কি? যদৃচ্ছাপতিত মেঘবারি আর চন্দ্রমার স্নিগ্ধ জ্যোৎস্না এই ছিল পার্বতীর আহার। বৃক্ষবল্লরীও ত ইহা ছাড়া অন্য কিছু আহার করিতে পায় না। উপবাসিনী উমা ও তরুলতা উভয়েরই পারণার বস্তু ছিল এক। এমনই প্রাণপাতিনী তাঁহার তপস্যা! প্রবল শৈত্যের মধ্যেও পার্বতী অনাবৃত স্থানে আসীনা, অনিকেতবাসিনী। রজনী তাহার বিদ্যুদ্দৃষ্টি দ্বারা তাঁহার তপস্যার সাক্ষী হইয়াছে। যে সকল বৃক্ষপত্র স্বতশ্চ্যুত তাহাদের রসপান করিয়া জীবনধারণই শ্রেষ্ঠ তপস্যা, ইহা হইতে কঠোরতর তপশ্চর্যা নাই; কিন্তু পার্বতী তাহাও গ্রহণ করিতেন না, এই জন্যই ত উমাকে পুরাণজ্ঞ পণ্ডিতগণ 'অপর্ণা' (পর্ণপর্যন্ত পরিত্যাগিনী) বলিয়া অভিহিত করেন—

স্বয়ং বিশীর্ণদ্রুমপর্ণবৃত্তিতা
পরা হি কাষ্ঠা তপসস্তয়া পুনঃ।
তদপ্যপাকীর্ণমতঃ প্রিয়ংবদাং
বদন্ত্যপর্ণেতি চ তাং পুরাবিদঃ॥ (৫।২৮)

এইভাবে যখন পার্বতীর দিনের পর দিন যাইতেছিল, সুতীব্র বিরহসন্তাপ সত্ত্বেও যখন তাঁহার ইষ্টপ্রাপ্তির সঙ্কল্প ক্রমশই অনমনীয় দৃঢ়তা লাভ করিতেছিল, তখন 'জ্বলন্নিব ব্রহ্মময়েন তেজসা' একজন জটিল যুবা ব্রহ্মচারী তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন। দেখিয়া মনে হইল প্রথমাশ্রম অর্থাৎ ব্রহ্মচর্যাশ্রম যেন তাঁহার দেহাশ্রিত—শরীরবদ্ধঃ প্রথমাশ্রমো যথা (৫।৩০)। নবীন তপস্বী বলিলেন, অয়ি তপোনিরতে, এত বড় কঠোর তপশ্চর্যায় আপনি ব্রতী হইয়াছেন, আপনার কোন ক্লেশ হইতেছে না ত? দেখুন শরীরকে বাঁচান সর্বাগ্রে দরকার, কেন না—শরীরমাদ্যং খলু ধর্মসাধনম্ (৫।৩৩)। আর তপস্যাই বা আপনি করিবেন কেন? কোন ঐশ্বর্যই ত আপনার নিকট অপ্রাপ্য নয়, আপনার 'নবং বয়ঃ কান্তমিদং বপুশ্চ'—আপনি যাহা লাভ করিয়াছেন সকলই ত তপস্যার ফল। আবার আপনি তপস্যায় ব্রতী হইয়াছেন কোন দুঃখে? অয়ি তপস্বিনি, আপনি সরলভাবে আমাকে খুলিয়া বলুন কোন্ মনস্তাপে আপনি নবযৌবনের অনুরূপ বেশভূষা পরিত্যাগ করিয়া বার্ধক্যের পরিচ্ছদ বল্কল পরিধান করিয়াছেন। উপযুক্ত পতিলাভ করিবার জন্যই কি আপনি তপস্যা করিতেছেন? কিন্তু আমার মনে হয় ইহা আপনার পণ্ডশ্রম। রত্নকেই লোক অনুসন্ধান করিয়া থাকে, রত্ন স্বয়ং কাহাকেও অন্বেষণ করে না—ন রত্নমন্বিষ্যতি মৃগ্যতে হি তৎ (৫।৪৫)। আপনি রত্নস্বরূপা। আপনার উপযুক্ত বর ত স্বপ্রয়োজনেই আপনার সন্ধান লইবেন। যাহাই হউক, সেই ভাগ্যবান্ ব্যক্তিটি কে? তাঁহার নাম কি যাঁহার জন্য আপনি অশেষ ক্লেশ বরণ করিয়াছেন? আপন সখী ব্রীড়াবনতা উমার ইঙ্গিত-ক্রমে উত্তর দিলেন—হে সাধো, কন্দর্পকে ভস্মীভূত করিয়া যিনি প্রমাণ করিলেন বাহ্য সৌন্দর্যে তাঁহার হৃদয় বিচলিত হইবার নহে সেই 'অরূপহার্য' পিনাকপাণি মহেশ্বরকে পতিরূপে পাইবার জন্যই পার্বতীর এই কঠোর তপস্যা। ব্রহ্মচারী পার্বতীকে কৌতুকভরে জিজ্ঞাসা করিলেন, অয়ি উমে, এই কথা কি সত্য, না আমাকে পরিহাস করা হইতেছে? পার্বতী উত্তর করিলেন, হে বেদবিদ্বন্, আপনি যাহা শুনিলেন সবই সত্য। অসম্ভবই হউক আর সম্ভবই হউক, এই আমার অন্তর্গত অভিলাষ।

উমার কথা শুনিয়া ব্রহ্মচারী মহেশ্বরের নিন্দা করিতে লাগিলেন। শিব ত নানা প্রকার কুক্রিয়াসক্ত। তাঁহার হস্তে কালসর্প বিজড়িত, শিবের পরিধানে গজচর্ম, তাহা হইতে আবার রক্তবিন্দু ক্ষরিত হইতেছে। আপনি কি জানেন না শিব শ্মশানচারী? বিরূপাক্ষ মহেশ যে দিবারাত্র চিতাভস্ম গায়ে মাখিয়া ইতস্ততঃ বিচরণ করেন! যাঁহার জন্মের স্থিরতা নাই, যিনি দিগম্বর, নরকপাল যাঁহার পানপাত্র, নরকঙ্কাল যাঁহার মাল্য, বলীবর্দ যাঁহার বাহন সেই দীনহীন মহেশের মধ্যে আপনি কি দেখিতে পাইলেন আমি বুঝিতে পারিতেছি না। আমি এখনও বলিতেছি আপনি এই অপদার্থ মহেশ হইতে আপনার চিত্তকে ব্যাবৃত্ত করুন। ক্রোধে পার্বতীর অধরোষ্ঠ কাঁপিতে লাগিল, তিনি অত্যন্ত বিরক্তির সহিত ব্রহ্মচারীকে বলিলেন, দেখুন, আপনি মহেশ-সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। যাহারা মন্দ ব্যক্তি তাহারাই অলোকসামান্য মহানুভব ব্যক্তিদের চরিত্রে কলঙ্ক আরোপ করিয়া থাকে—অলোকসামান্যমচিন্ত্যহেতুকং দ্বিষন্তি মন্দাশ্চরিতং মহাত্মনাম্। (৫।৭৫)। যাহারা বিপদকে ভয় করে, বিপন্মুক্ত হইবার জন্য সর্বদা যাহারা ব্যাকুল, যাহারা তুচ্ছ

ঐহিক সুখের জন্য উদ্‌গ্রীব, তাহারাই কেবল মঙ্গলের সন্ধানে ছুটে। যিনি জগদাশ্রয়, আকাঙ্ক্ষণীয় বস্তু যাঁহার কিছুই নাই—যিনি নিরাশীঃ—তৃষ্ণাকলুষিত বিষয়রাজি দ্বারা তাঁহার কি হইবে? সর্পই বলুন, পুষ্পমালাই বলুন, সবই তাঁহার নিকট সমান—

বিপৎপ্রতীকারপরেণ মঙ্গলং
নিষেব্যতে ভূতিসমুৎসুকেন বা।
জগচ্ছরণ্যস্য নিরাশিষঃ সতঃ
কিমেভিরাশোপহতাত্মবৃত্তিভিঃ॥ (৫।৭৬)

দেবাদিদেব যত অকিঞ্চন হউন না কেন, তিনি অনন্ত ঐশ্বর্যের কারণ, তিনি শ্মশানচারী হইলেও ত্রিলোকের একমাত্র অধীশ্বর। তিনি যতই ভীষণাকৃতি হউন না কেন তিনি শিব, পরম মঙ্গলময় শিব। পিনাকীর প্রকৃত স্বরূপ কাহারাই বা জানে?—

অকিঞ্চনঃ সন্ প্রভবঃ স সম্পদাং
ত্রিলোকনাথঃ পিতৃসদ্মগোচরঃ।
স ভীমরূপঃ শিব ইত্যুদীর্যতে
ন সন্তি যাথার্থ্যবিদঃ পিনাকিনঃ॥ (৫।৭৭)

মহাদেব ভূষণদ্বারাই উদ্ভাসিত হউন বা সর্পমাল্যই পরিধান করুন, তাঁহার পরিধেয় ক্ষৌম-বসনই হউক বা গজচর্মই হউক, তাঁহার নরকপালই থাকুক বা মস্তকে চন্দ্রমা শোভিত হউক—সর্বাবস্থায়ই ত তিনি বিশ্বরূপ, সেই বিশ্বমূর্তি রূপাতীতের স্বরূপ কে নির্ণয় করিতে পারে?

বিভূষণোদ্ভাসি পিনদ্ধভোগি বা
গজাজিনালম্বি দুকূলধারি বা।
কপালি বা স্যাদথ বেন্দুশেখরং
ন বিশ্বমূর্তেরবধার্যতে বপুঃ॥ (৫।৭৮)

সেই পরমেশ্বরের শরীর স্পর্শ করিয়া চিতাভস্মও যে কত পবিত্র বলিয়া বিবেচিত হয় তাহা কি আপনি জানেন না? সেই নটরাজ যখন তাণ্ডবনৃত্যে আত্মহারা হন তখন তাঁহার দেহবিচ্যুত এই চিতাভস্মরাজিই দেবতারা মস্তকে লেপন করিয়া থাকেন—

তদঙ্গসংসর্গমবাপ্য কল্পতে
ধ্রুবং চিতাভস্মরজো বিশুদ্ধয়ে।
তথা হি নৃত্যাভিনয়ক্রিয়াচ্যুতং
বিলিপ্যতে মৌলিভিরম্বরৌকসাম্॥ (৫।৭৯)

দেবাদিদেবকে আপনি যতই দরিদ্র বলুন না কেন তিনি যখন বৃষভারূঢ় হইয়া বিচরণ করেন তখন মদস্রাবী দিগ্‌গজারূঢ় ইন্দ্র তাঁহাকে দেখিবা মাত্র নামিয়া আসিয়া তাঁহার চরণে মস্তক স্থাপন করিয়া কৃতার্থ হন। আর সেই দেবরাজের মস্তকস্থিত মন্দারপুষ্পের পরাগে শম্ভুর চরণদ্বয়ের অঙ্গুলিগুলি রঞ্জিত—

অসম্পদস্তস্য বৃষেণ গচ্ছতঃ
প্রভিন্নদিগ্‌বারণবাহনো বৃষা।
করোতি পাদাবুপগম্য মৌলিনা
বিনিদ্রমন্দাররজোঽরুণাঙ্গুলী॥ (৫।৮০)

আপনি সেই অদ্বিতীয় পরাৎপরের দোষাবিষ্কার করিতে গিয়া একটি সত্য কথা বলিয়া ফেলিয়াছেন। যাঁহাকে আত্মভূ ব্রহ্মারও উৎপত্তির কারণ বলা হইয়া থাকে, তাঁহার জন্মবৃত্তান্ত সাধারণ্যে কিরূপে পরিজ্ঞাত হইবে?—

বিবক্ষতা দোষমপি চ্যুতাত্মনা
ত্বয়ৈকমীশং প্রতি সাধু ভাষিতম্।
যমামনন্ত্যাত্মভুবোঽপি কারণং
কথং স লক্ষ্যপ্রভবো ভবিষ্যতি॥ (৫।৮১)

বাদানুবাদেই বা প্রয়োজন কি? আপনার মতে তিনি যতই খারাপ, যতই নিন্দনীয় হউন না কেন, আমি তাঁহাতে সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করিয়াছি। আমি আমার ইচ্ছানুসারেই চলিব। যে ব্যক্তি আপন ইচ্ছার অনুবর্তন করে সে নিন্দাস্তুতিকে গ্রাহ্যই করে না—

অলং বিবাদেন যথা শ্রুতস্ত্বয়া
তথাবিধস্তাবদশেষমস্তু সঃ।

মমাত্র ভাবৈকরসং মনঃ স্থিতং
ন কামবৃত্তির্বচনীয়মীক্ষতে ॥ ( ৫।৮২ )

উমার এইরূপ গভীর ভাবদ্যোতক মহেশ্বর-মাহাত্ম্য বিজ্ঞাপনের পরও যেন সেই প্রগল্ভবাক্ ব্রহ্মচারী আরও কি বলিতে যাইতেছিলেন। উমা আর সহ্য করিতে পারিলেন না। তিনি তাঁহার সখীকে নির্দেশ দিলেন—এই ব্রাহ্মণকে তুমি নিরস্ত কর, আমার কথার প্রত্যুত্তর দিবার জন্য ইঁহার ওষ্ঠ আবার স্ফুরিত হইতেছে। আমি আর এই ব্রাহ্মণের কথা শুনিতে চাই না। মহানুভব ব্যক্তির যে নিন্দা করে সে শুধু পাপাচরণ করে তাহা নহে, তাহা হইতে যে নিন্দাবাদ নীরবে শ্রবণ করে সেও পাপী—

নিবার্যতামালি কিমপ্যয়ং বটুঃ
পুনর্বিবক্ষুঃ স্ফুরিতোত্তরাধরঃ।
ন কেবলং যো মহতোঽপভাষতে
শৃণোতি তস্মাদপি যঃ স পাপভাক্ ॥ ( ৫।৮৩ )

পার্বতীমুখে মহেশ্বরের এই যে ভক্তিরসাপ্লুত অপূর্ব বর্ণনা ইহা ভক্তি-সাহিত্যের একটি সম্মাননীয় সামগ্রী। আপন ইষ্টের স্বরূপব্যাখ্যানে কবি যেন মাতিয়া উঠিয়াছেন। এই অনবদ্য বর্ণনায় কবির মনের মাধুরী যেন মিশিত হইয়াছে।

কুমারসম্ভব সপ্তদশসর্গে সম্পূর্ণ। ইহাদের মধ্যে সাতটি সর্গই অনুশীলিত হইতেছে। অষ্টমসর্গে হরগৌরীর নিতান্ত প্রাকৃত বিহার-বর্ণনা ভক্তচিত্তকে বড়ই পীড়িত করে। পার্বতী-পরমেশ্বরের একান্ত অনুগত উপাসক কবি কি করিয়া অষ্টমসর্গ হইতে অনিয়ন্ত্রিত শৃঙ্গাররসের অবতারণা করিলেন তাহা সত্যই দুর্বোধ্য। হয়ত বা কালিদাস সপ্তম অধ্যায়ের পর আর লেখনীধারণ করেন নাই। হয়ত বা অন্য কোন চপলমতি কবি কালিদাসের নামের সুযোগ নিয়া দশটি সর্গ রচনা করেন। মল্লিনাথ ত এই দশটি-সর্গের ব্যাখ্যা করেন নাই। তিনিও হয়ত জানিতেন সর্গগুলি কালিদাসকৃত নয়। আলঙ্কারিক-গণও হরগৌরীর বিহারবর্ণনাকে নিন্দা করিয়াছেন। সাধারণ আলঙ্কারিক নির্দেশ নিশ্চয়ই কালিদাসের অজ্ঞাত ছিল না। সর্বোপরি জগৎপিতা ও জগন্মাতাসংক্রান্ত অশোভন বর্ণনা ভক্ত হইয়া, সন্তান হইয়া কালিদাস করিতে যাইবেন কেন? এই প্রশ্ন কি চির-অমীমাংসিত থাকিয়া যাইবে?

---

# সমালোচনা

**মেঘদূতম্** ( কালিদাসকৃতম্ )—অধ্যক্ষ ডক্টর শ্রীযতীন্দ্রবিমল চৌধুরী-সম্পাদিত। প্রাচ্যবাণী মন্দির (৩, ফেডারেশন ষ্ট্রীট, কলিকাতা) হইতে ডক্টর কৈলাসনাথ কাটজু সিরিজে প্রকাশিত। মূল্য আট টাকা।

ডক্টর শ্রীযতীন্দ্রবিমল চৌধুরী এই সর্বপ্রথম মেঘদূত-কাব্য উহার অপূর্বসুন্দর ভরতমল্লিককৃত সুবোধা টীকা এবং কল্যাণমিশ্র, রামনাথ তর্কালঙ্কার, হরগোবিন্দ বাচস্পতি, সনাতন গোস্বামী, কৃষ্ণদাস বিদ্যাবাগীশ, কবিরত্ন প্রমুখ বাঙ্গালী এবং চরিত্রবর্ধন, শাশ্বত প্রমুখ অবাঙ্গালী ১৩ জন টীকাকারের অপ্রকাশিত টীকা হইতে নবতথ্যসংবলিত মতাবলী বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে পাঠোদ্ধার করিয়া প্রকাশিত করিয়াছেন এবং সংস্কৃতরসপিপাসু সুধীমাত্রেরই কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। একটি গ্রন্থের মধ্যে শত শত বৎসরের সমাহৃত ঈদৃশ জ্ঞানসম্ভার কদাচিৎ কোনও সংস্করণে দৃষ্ট হয়। মেঘদূত-সম্বন্ধে ভৌগোলিক, ব্যাকরণ-বিষয়ক এবং অন্যান্য পাণ্ডিত্যপূর্ণ টিপ্পনীও এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত হইয়াছে। ইংরেজী ও বাংলা

অনুবাদও ইহার সৌষ্ঠব ও উপযোগিতা বর্ধিত করিয়াছে। সকল দিক হইতে অতি পাণ্ডিত্যপূর্ণ মেঘদূতের বর্তমান সংস্করণটির জন্ম বিদ্বৎসমাজ ডক্টর চৌধুরীর নিকট চিরকৃতজ্ঞ থাকিবেন।

অধ্যাপক শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শাস্ত্রী, পঞ্চতীর্থ

**গীতাপাঠের ভূমিকা**—শ্রীধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, এম-এ প্রণীত। প্রকাশক—রথীন্দ্র গীতাপ্রচার প্রতিষ্ঠান। ১নং রথীন ব্যানার্জি লেন, কলিকাতা—৩১। ৯৬ পৃষ্ঠা, মূল্য দুই টাকা চারি আনা।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীবিধুশেখর শাস্ত্রী এই গ্রন্থের মুখবন্ধ লিখিয়া দিয়াছেন। গীতার সার্বজনীন ধর্মাদর্শ ও সাধন-সম্বন্ধে বিভিন্ন মাসিকপত্রে প্রকাশিত লেখকের আটটি প্রবন্ধ বইখানিতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। প্রবন্ধগুলির মৌলিক, তেজস্বী এবং পরিষ্কার চিন্তাধারা হৃদয়কে স্পর্শ করে। ভাষা প্রাঞ্জল ও মিষ্ট। গীতানুরাগী পাঠক-পাঠিকার নিকট পুস্তকখানি সমাদৃত হইবে, আমাদের বিশ্বাস।

**শ্রীশ্রীনৃপেন্দ্রনাথের আত্ম-চরিত**—প্রকাশক—ডাঃ সন্তোষকুমার দে ও শ্রীচন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। ১২।১, কালিদাস পতিতুণ্ডি লেন, কলিকাতা—২৬ ; ২৪১ পৃষ্ঠা। মূল্য—সাড়ে তিন টাকা।

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ দে সংসারের পরিবেষ্টনীর মধ্যে থাকিয়াও আন্তরিক ব্যাকুলতা এবং সাধন-উদ্যম দ্বারা ধর্মজীবনের সত্যসমূহ উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন। বিভিন্ন স্থানে বহু শান্তিকামী নরনারীকে তিনি ভগবদ্বিশ্বাস ও আরাধনার পথে সাহায্য এবং প্রেরণা দিয়াছেন। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব নৃপেন্দ্রনাথের সাধন-জীবনে প্রভূত প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন। সুদীর্ঘজীবনে বহুতর ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়া কি ভাবে তিনি অজস্র ভগবৎকৃপা লাভ করিয়াছেন এই পুস্তকে প্রাঞ্জল ভাষায় বর্ণিত তাঁহার নিজের বর্ণনাগুলি পড়িয়া অনেকে আনন্দ ও উদ্দীপনা পাইবেন। বইখানিতে বহু অলৌকিক ঘটনার কথা আছে—উহাদের মূল্য নিরূপণ করিবার শক্তি ( এবং রুচিও ) আমাদের নাই।

**ছেলেদের বিবেকানন্দ**—( ৫ম সংস্করণ ) শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার। প্রকাশক—আনন্দ হিন্দুস্থান প্রকাশনী। ৫, চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা—৯। ৯০ পৃষ্ঠা। মূল্য—পাঁচ সিকা।

স্বামী বিবেকানন্দের আশ্চর্য জীবন এবং বহুমুখী প্রতিভার যে দিকগুলি তরুণদের চিত্তে গভীর রেখাপাত করিবে উহাদিগকে অতি সরস ভাবে কৃতী গ্রন্থকার এই বইখানিতে চিত্রিত করিয়াছেন। স্বামিজীর ব্যক্তিত্ব এবং আদর্শের প্রতি বাংলার তরুণরা যত বেশী আকৃষ্ট হইবে ততই মঙ্গল। তাঁহার বড় জীবনী লিখিয়া সত্যেনবাবু বাঙ্গালী জাতির কৃতজ্ঞতা অর্জন করিয়াছেন। কিশোরদের জন্ম লিখিত এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানির জন্মও তিনি জাতির ধন্যবাদার্হ।

**জাতীয় সমস্যায় স্বামী বিবেকানন্দ**—স্বামী সুন্দরানন্দ প্রণীত। প্রকাশক বিবেকানন্দ সোসাইটি, ২১, বৃন্দাবন বসুর লেন, কলিকাতা—৬ ; ২০১ পৃষ্ঠা ; মূল্য আড়াই টাকা।

যুগাচার্য স্বামী বিবেকানন্দ ভারতীয় জাতির বিবিধ সমস্যার সমাধানে কি অপূর্ব আলোক সম্পাত করিয়া গিয়াছেন, চিন্তাশীল প্রবীণ গ্রন্থকার তাহা এই পুস্তকের বারোটি অধ্যায়ে নিপুণভাবে বিশ্লেষণ করিয়াছেন। বইখানিকে স্বামীজীর বাণীর একটি প্রাঞ্জল ভাষ্য বলিতে পারা যায়। প্রত্যেক শিক্ষিত ব্যক্তি এবং দেশকর্মীকে পুস্তকটি পড়িয়া দেখিতে অনুরোধ করি।

**Autobiography of a Yogi**—By Paramahansa Yogananda. Published by Philosophical Library, Inc 15 East 40th Street, New York—16 N. Y. U. S. A. ৫০১ পৃষ্ঠা, মূল্য—সাড়ে তিন ডলার।

রাঁচি ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতারূপে ( সম্প্রতি পরলোকগত ) স্বামী যোগানন্দের নাম দেশে সুপরিচিত। ১৯২০ সালে তিনি আমেরিকা যান এবং বহুবৎসর ঐ দেশে 'ক্রিয়াযোগ'এর প্রচার এবং শিক্ষাদান করেন। ধর্মজীবনের সুদীর্ঘ যাত্রাপথে দেশে এবং বিদেশে তিনি যে সকল উন্নত ব্যক্তি এবং আশ্চর্য অভিজ্ঞতার সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন তাহাদের চিত্তাকর্ষক বর্ণনা পুস্তকখানিতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। পাশ্চাত্ত্য পাঠকগণের বইটি ভাল লাগিবে, মনে হয়।

# শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

## স্বামী জিতাত্মানন্দের দেহত্যাগ

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অন্যতম সেবক স্বামী জিতাত্মানন্দ ( বিনয় মহারাজ নামে সুপরিচিত ) গত ৩রা জ্যৈষ্ঠ ( ১৭ই মে, ১৯৫১ ) কাশীপুর শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে ( কাশীপুর উদ্যান-বাটি ) হৃদ্‌রোগের আকস্মিক আক্রমণে অপ্রত্যাশিতভাবে দেহত্যাগ করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৫৫ বৎসর হইয়াছিল। এই পূতচরিত্র, অমায়িক ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন নিরলস কর্মকৌশলী সন্ন্যাসীর অকালপ্রয়াণে মঠ ও মিশনের সমূহ ক্ষতি হইল।

বিনয় প্রাক্-সন্ন্যাস জীবনেই শ্রীশ্রীমায়ের নিকট মন্ত্রদীক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং শ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতকার শ্রীমহেন্দ্রনাথ গুপ্ত ( শ্রীম ) মহাশয়ের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আসিয়াছিলেন। ঈশ্বরানুরাগ ও বৈরাগ্যের প্রবল প্রেরণায় গৃহত্যাগ করিয়া ১৯২৮ সালে তিনি বেলুড় মঠে যোগ দেন। পূজ্যপাদ স্বামী শিবানন্দ মহারাজ তাঁহাকে ১৯৩১ সালে সন্ন্যাসব্রতে দীক্ষিত এবং জিতাত্মানন্দ নামে অভিহিত করেন। বেলুড়-মঠের নানা ব্যাপৃতিতে এবং মিশনের বেলুড়-স্থিত শিল্প-বিদ্যালয়ের পরিচালনায় জিতাত্মানন্দ দীর্ঘকাল নিয়োজিত থাকিয়া তাঁহার অকুণ্ঠ সেবাপরায়ণতা ও প্রখর কর্ম-মনীষার পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অন্তিমলীলা ও মহাপ্রয়াণের স্থান কাশীপুর উদ্যানবাটী বেলুড় মঠের অধিকারে আসিলে উহার সংরক্ষণ ও পরিবিস্তৃতির ভার জিতাত্মানন্দের উপর ন্যস্ত হয় এবং তিনিও কয়েক বৎসর যাবৎ বিশেষ দক্ষতার সহিত এই কার্য সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করিতেছিলেন। তাঁহার সুমিষ্ট ব্যবহার এবং উদার সহানুভূতি সকলেরই হৃদয় জয় করিত। সাধু এবং ভক্তগণের সেবায় বিনয় মহারাজের ছিল অদম্য উৎসাহ। গুরুতর পরিশ্রমের ফলে কিছুকাল হইতে তিনি হৃদ্‌যন্ত্রের দুর্বলতা বোধ করিতেছিলেন, কিন্তু স্বভাবতই দেহের স্বাচ্ছন্দ্যে উদাসীন তিনি উহা গ্রাহ্য না করিয়া দিবারাত্র পরিন্যস্ত কর্মভারটিকে সুসম্পন্ন করিতে ব্রতী থাকিতেন। গত ১লা জ্যৈষ্ঠ সকালে, বেলুড় মঠে অনুষ্ঠিত শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের একটি সাম্প্রতিক সম্মিলনে তিনি যোগদান করিতে আসিয়া সকলের সহিত দেখাশুনা করিয়া গিয়াছিলেন। কাশীপুর আশ্রমে ফিরিবার পর ঐ রাত্রেই তাঁহার হৃদ্‌যন্ত্র সঙ্কটাপন্নভাবে আক্রান্ত হয়। মাত্র দেড়দিন রোগযন্ত্রণা ভোগ করিতে হইয়াছিল। ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দেহসৎকার-স্থান কাশীপুর-শ্মশানেই বহু সাধু ও ভক্তের উপস্থিতিতে তাঁহার পাঞ্চভৌতিক শরীর চিতার্পিত হয়।

তাঁহার পবিত্র আত্মা শ্রীরামকৃষ্ণ-পাদপদ্মে শাশ্বত শান্তি লাভ করিয়াছে। গত ১৫ই জ্যৈষ্ঠ বেলুড়মঠে তাঁহার স্মৃতিতে শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ পূজা-হোমাদি অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

---

**শিলচরে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব**—স্থানীয় শ্রীরামকৃষ্ণমিশন সেবাশ্রমের উদ্যোগে পূজার্চনা, কীর্তন, আলোচনা, প্রসাদ-বিতরণ প্রভৃতি সহ দুইদিনব্যাপী এই উৎসবের অনুষ্ঠান হয়। জনসভায় পৌরোহিত্য করেন সরকারী উকিল শ্রীনগেন্দ্রচন্দ্র শ্যাম। বেলুড় মঠের স্বামী অবিনাশানন্দ, শিলং আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী সৌম্যানন্দ, অধ্যাপক শ্রীযতীন্দ্ররঞ্জন দে প্রভৃতি ছিলেন বক্তা। শ্রীমতী জ্যোৎস্না চন্দ ভারতীয় নারীজাতির আদর্শে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অবদান-বিষয়ে সুন্দর ভাষণ দেন। স্থানীয় কলেজে, গভর্নমেণ্ট হাই স্কুলে এবং বালিকাবিদ্যালয়ে ছাত্র

ও ছাত্রীদের জন্য পৃথক সভার আয়োজন করা হইয়াছিল। শহরের দশ মাইল দূরে সোনাই গ্রামেও আলাদা একটি উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

**জয়রামবাটী শ্রীশ্রীমাতৃমন্দির-প্রতিষ্ঠার ত্রিংশবার্ষিকী**—শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর পবিত্র জন্মভূমিতে এবারকার অক্ষয়তৃতীয়ার উৎসব বিশেষ পূজা, পাঠ, হোম, আলোচনা, প্রসাদ-বিতরণ এবং রাত্রে যাত্রাভিনয়সহ সমারোহের সহিত সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। নানাস্থান হইতে বহু সাধু এবং ভক্ত নরনারীর সমাগম হইয়াছিল। স্বামী জপানন্দের সভাপতিত্বে মন্দির-প্রাঙ্গণে আহূত জনসভায় উদ্বোধনের ভূতপূর্ব সম্পাদক স্বামী সুন্দরানন্দ এবং স্বামী বীতশোকানন্দ হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা দিয়াছিলেন।

**শেলায় (খাসিয়া পাহাড়) শ্রীরামকৃষ্ণ-জয়ন্তী**—স্থানীয় শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে অনুষ্ঠিত এবারকার শ্রীরামকৃষ্ণ-জয়ন্তীতে জনগণের উৎসাহ ও আনন্দ সমধিক বর্ধিত হইয়াছিল রাজ্যপাল শ্রীজয়রামদাস দৌলতরামের উপস্থিতিতে। তিনি আশ্রমের মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের নূতন গৃহের দ্বারোদ্‌ঘাটন করেন এবং বক্তৃতাপ্রসঙ্গে খাসিয়াদের পরিশ্রম ও কর্মদক্ষতার প্রশংসা করিয়া প্রকৃত শিক্ষার ভিতর দিয়া স্বাধীনভারত-গঠনে অগ্রসর হইতে বলেন।

**পাটনা শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে শ্রীরামকৃষ্ণোৎসব**—এই উপলক্ষে অনুষ্ঠিত জনসভায় নেতৃত্ব করেন বিহারের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীশ্রীকৃষ্ণ সিংহ। তিনি বলেন, জগৎ আজ যে মহাসমস্যার সম্মুখীন হইতে চলিয়াছে উহার সমাধানের জন্য আমরা নানারূপ চেষ্টা করিলেও যতদিন না আমরা আমাদের জীবনকে সম্পূর্ণ বদলাইয়া ফেলিতে পারিতেছি ততদিন অন্য কিছুতেই উহা সম্ভবপর নয়। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবন ও বাণী এই বিষয়ে আমাদিগকে সর্বপ্রকার সাহায্য করিতে পারে বলিয়া আমি বিশ্বাস করি। বিচারপতি শ্রীএস্ কে দাস, শ্রীনাগেশ্বরী প্রসাদ, শ্রীঅওধ বিহারী শরণ, শ্রীঈশ্বরীপ্রসাদ এবং আশ্রমাধ্যক্ষ স্বামী জ্ঞানাত্মানন্দও শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনের বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন।

## নব-প্রকাশিত পুস্তক

**শ্রীরামকৃষ্ণভক্তমালিকা**—(প্রথম ভাগ) স্বামী গম্ভীরানন্দ প্রণীত। উদ্বোধন কার্যালয় হইতে প্রকাশিত। মূল্য পাঁচ টাকা।

স্বামী বিবেকানন্দ, ব্রহ্মানন্দ, যোগানন্দ, প্রেমানন্দ, নিরঞ্জনানন্দ, শিবানন্দ, সারদানন্দ, রামকৃষ্ণানন্দ, অভেদানন্দ, অদ্ভুতানন্দ, তুরীয়ানন্দ এবং স্বামী অদ্বৈতানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের এই বারোজন অন্তরঙ্গ সন্ন্যাসী পার্ষদের জীবন-পরিচয়।

# বিবিধ সংবাদ

**নিখিল ভারত সংস্কৃত সম্মেলন**—চন্দননগর প্রবর্তকসঙ্ঘের উদ্যোগে ১৬ই বৈশাখ তারিখে আহূত এই সম্মেলনের সভাপতিত্ব করেন ডক্টর শ্রীযতীন্দ্রবিমল চৌধুরী। বক্তৃতাপ্রসঙ্গে তিনি বলেন, সংস্কৃতই ভারতের মাতৃমূর্তির প্রকৃত আলেখ্য। এর মধ্যে মায়ের রূপ অনবদ্যরূপে পড়েছে ধরা। এ ছাড়া আমাদের সনাতনী জননীর রূপমাধুরী নিরীক্ষণের দ্বিতীয় উপায় নাই। জ্ঞানের আকররূপেও সংস্কৃতের তুলনা নাই। হিন্দুদর্শনের, হিন্দুবিজ্ঞানের, হিন্দু ললিতকলার অথবা হিন্দু-শিল্পশাস্ত্রের সংস্কৃত-নিবদ্ধ যে কোন বিশিষ্ট গ্রন্থমাত্রই জগতের আধুনিক তত্ত্ব-গ্রন্থ থেকে শ্রেষ্ঠ। সংস্কৃত নিখিল ভারতের ভাষাসমূহের জননী।

সংস্কৃতের জ্ঞান ব্যতীত ভারতের যে কোন ভাষায় শতকরা আশীটী শব্দের উদ্ভব ও পরিপূর্তি বিষয়ের কোনো জ্ঞান লাভ হয় না। * * *

এই ভাষা চির-অমর, চির-জাগ্রত। মৃত ভাষা নিত্য প্রসব করতে পারে না, আবহমান কাল ধরে এ ভাষা নিত্য স্বর্ণপ্রসূ। এমন কি, মুসলমান, চীন, হুণ, পারসিকদের বা অন্য বৈদেশিকদের বিরচিত সংস্কৃত গ্রন্থ অশেষ জ্ঞানের আকর। উদাহরণক্রমে বলা যেতে পারে যে, মহম্মদসাহ-বিরচিত সঙ্গীতগ্রন্থ সঙ্গীতমালিকা, দরাফ খাঁ-বিরচিত গঙ্গাস্তুতি, খানখানান-বিরচিত জ্যোতিষগ্রন্থ বা দারাশুকোহ্-বিরচিত সমুদ্র-সঙ্গম গ্রন্থ, শিল্পশাস্ত্র, সাহিত্য, জ্যোতিষ, দর্শন প্রভৃতি শাস্ত্রের মুকুটমণি স্বরূপ। সংস্কৃত নিখিল বিশ্বকে, হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ খৃষ্টান প্রভৃতি জাতি-নির্বিশেষে সকলকে, নারী ও পুরুষকে, সমভাবে প্রোদ্বুদ্ধ করেছে। বৈদিক সময় থেকে আরম্ভ- করে বর্তমান সময় পর্যন্ত কত কত মহীয়সী নারী অনবদ্য দানে সংস্কৃত শাস্ত্রকে সমৃদ্ধতর করেছেন। জগতে এমন কোন ভাষা বা সাহিত্য নাই যার মণিমঞ্জুষায় নারীবিরচিত এত মণি-মাণিক্য বিরাজমান রয়েছে। * * *

ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করে যারা সংস্কৃতভাষী হতে পারে না তাদের জন্ম বৃথা, তাদের ভারতীয়ত্ব কথার কথা মাত্র, ভারতবাসিরূপে জন্মগ্রহণ করলেও তারা ভারতের ভাড়াটিয়া মাত্র। ফলতঃ, সংস্কৃতই একমাত্র জাতীয় ভাষা এবং সংস্কৃতকে নিখিল ভারতের জাতীয় ভাষারূপে বরণ করে নিলেই ভারতের অক্ষয্য ক্ষেম অবশ্যম্ভাবী।

**পরলোকে ডক্টর মণ্টেসরী**—৮১ বৎসর বয়সে বিখ্যাত ইটালীয় শিক্ষাবিৎ ডক্টর মেরিয়া মণ্টেসরীর মৃত্যুতে আন্তর্জাতিক শিক্ষাজগতের একজন মৌলিক গবেষক ও মহামনীষীর অভাব হইল। পৃথিবীর বহুদেশে এবং ভারতেও ডক্টর মণ্টেসরীর অভিনব শিশুশিক্ষাপদ্ধতি প্রভূত সমাদর লাভ করিয়াছে। শিক্ষাব্রতের গবেষণায় তাঁহার জীবনব্যাপী অক্লান্ত সাধনা ও চিন্তাধারা সত্যই অদ্ভুত ছিল।

**কলমা ( ঢাকা )য় উৎসব**—কলমা রামকৃষ্ণ সেবাসমিতির একোনচত্বারিংশত্তম বার্ষিক শ্রীরাম-কৃষ্ণ উৎসব গত ২৪শে বৈশাখ হইতে ২৭শে বৈশাখ পর্যন্ত চারিদিন ব্যাপিয়া সম্পন্ন হইয়াছে।

২৪শে হইতে ২৬শে পর্যন্ত প্রত্যহ প্রাতে ভজন ও কথামৃত পাঠ হয়। ২৪শে অপরাহ্ণে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনী আলোচিত হয়। ২৫শে অপরাহ্ণে চাঁদপুরের ডাক্তার শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র বসু মহাশয়ের সভাপতিত্বে একটি জনসভায় স্বামী সত্যকামানন্দ ধর্ম-সমন্বয় ও শ্রীরামকৃষ্ণ-সম্বন্ধে একটি সুন্দর বক্তৃতা প্রদান করেন।

২৬শে তারিখে বুদ্ধপূর্ণিমা তিথিতে নারায়ণ-গঞ্জের স্বামী নিঃস্পৃহানন্দ শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ পূজা, হোম প্রভৃতি সম্পন্ন করেন। সায়াহ্নে স্বামী সত্যকামানন্দজীর সভাপতিত্বে সেবাসমিতির বাৎসরিক সভা হয়।

২৭শে বৈশাখ পূর্বাহ্নে সমাগত ভক্তবৃন্দ শ্রীশ্রীঠাকুরের একখানি সুসজ্জিত পট বহন করিয়া কীর্তন করিতে করিতে গ্রাম পরিক্রমা করেন। অপরাহ্ণে বিবেকানন্দ কিশোরসমিতির উদ্যোগে একটি মনোজ্ঞ প্রীতি-সম্মিলনের অনুষ্ঠান হয়।

---

# রামকৃষ্ণ মিশন নিবেদিতা বিদ্যালয়ের সুবর্ণ-জয়ন্তী

## আবেদন

যুগাচার্য স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শে অনু-প্রাণিতা হইয়া গুরুগতপ্রাণা ভগিনী নিবেদিতা ভারতের নারীজাতির মধ্যে শিক্ষা-বিস্তারের জন্য এই বিদ্যালয়ের পরিকল্পনা করেন। ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে পরমারাধ্যা শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী সারদামণি দেবী স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী ব্রহ্মানন্দ প্রমুখ সন্ন্যাসী সন্তানগণের উপস্থিতিতে এই নারীশিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠা করেন। অতঃপর ১৯০২ খৃষ্টাব্দে স্বামিজীর ভক্তিপ্রাণা মার্কিন্ শিষ্যা ভগিনী খৃষ্টিন এই বিদ্যালয়ের ভার গ্রহণ করেন। ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে উক্ত প্রতিষ্ঠানের পরিচালনার ভার রামকৃষ্ণ মিশনের উপর অর্পিত হয়। ভগিনী নিবেদিতার পূত জীবনের

ত্যাগ ও তপস্যার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এই শিক্ষা-মন্দিরে বিগত অর্ধ শতাব্দীর অধিককাল যাবৎ বহুসংখ্যক বালিকা বিনা বেতনে ভারতীয় নারীর উপযোগী শিক্ষালাভ করিয়া আসিয়াছে। ১৯৪৭ সাল হইতে মাত্র মাধ্যমিক বিভাগে বেতন নির্দিষ্ট হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত বহু অন্তঃপুরচারিণী মহিলাও এই বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করিয়াছেন। এই প্রতিষ্ঠানের অন্তর্গত শিল্পমন্দিরেও বহু দরিদ্র মহিলা শিল্পশিক্ষা দ্বারা জীবিকা অর্জন করিতে সমর্থা হইয়াছেন। স্বেচ্ছায় দারিদ্র্যব্রত অবলম্বন করিয়া ভগিনী নিবেদিতা নারীজাতির উন্নতিকল্পে আত্মোৎসর্গ করিয়াছিলেন। ভারতের সর্বপ্রকার কল্যাণকার্যে এবং স্বাধীনতা-লাভের প্রচেষ্টায় তাঁহার দান এবং অনুপ্রেরণা কম নহে। ভারতবর্ষকে তিনি আপনার মাতৃভূমি বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তাহার সেবায় নিজের জীবন দান করিয়া গিয়াছেন।

ভগিনী-প্রতিষ্ঠিত এই বিদ্যালয়ের অর্ধশতাব্দী পূর্ণ হওয়া উপলক্ষে ইহার সুবর্ণ জয়ন্তী-উৎসব অনুষ্ঠান করিয়া বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ স্থাপয়িত্রীর প্রতি তাঁহাদের অন্তরের কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধা নিবেদন করিতে মনস্থ করিয়াছেন। এই জয়ন্তী উপলক্ষে নিম্নলিখিত পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইয়াছে :

১। ১৯৫২ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে সপ্তাহব্যাপী জয়ন্তী-উৎসব অনুষ্ঠিত হইবে।

২। বাংলা ও ইংরেজী ভাষায় ভগিনী নিবেদিতার প্রামাণিক ও বিস্তৃত জীবনী প্রকাশ করা হইবে।

৩। বিদ্যালয়ের একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস প্রকাশ করা হইবে।

৪। প্রাচীন ভারতে নারীশিক্ষার ইতিহাস প্রণয়ন করা।

৫। ছাত্রীদের জন্য ভগিনী নিবেদিতার জীবনী-সম্বন্ধে রচনা-প্রতিযোগিতা।

৬। শিল্পপ্রদর্শনী।

৭। ভগিনী নিবেদিতার জীবনী আলোচনার্থে সাধারণ সভা।

৮। বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্রীসম্মেলন।

৯। বালিকাগণ কর্তৃক অভিনয়, ক্রীড়া, জলযোগ প্রভৃতি।

১০। প্রাথমিক বিভাগের ছাত্রীদিগকে এই উপলক্ষে বিদ্যালয়ের পক্ষ হইতে একই রকমের পোষাক উপহার।

১১। নিবেদিতার সুবর্ণ-জয়ন্তী বৃত্তি।

১২। বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁহার স্মৃতিরক্ষার্থ প্রতিবৎসরের সুযোগ্যা ছাত্রীকে একটি স্বর্ণপদক প্রদান করা।

১৩। শিল্পবিভাগের প্রসারের জন্য একখণ্ড জমি ক্রয় করিয়া গৃহনির্মাণ। এজন্য আনুমানিক ২৫০০০৲ টাকার প্রয়োজন হইবে।

উপর্যুক্ত পরিকল্পনাগুলি কার্যে পরিণত করিতে অন্ততঃ ১০০,০০০৲ টাকার প্রয়োজন হইবে। আমরা সহৃদয় দেশবাসীর নিকট এই জন্য আবেদন জানাইতেছি। যথাশক্তি দান করিয়া তাঁহারা উৎসব সাফল্যমণ্ডিত করুন।

নিম্নোক্ত ঠিকানায় অর্থ প্রেরণ করিতে হইবে :—

১। নিবেদিতা সুবর্ণ-জয়ন্তী ফণ্ড,
রামকৃষ্ণ মিশন নিবেদিতা বিদ্যালয়,
৫নং নিবেদিতা লেন, বাগবাজার, কলিকাতা—৩

২। সাধারণ সম্পাদক,
রামকৃষ্ণ মিশন, বেলুড় মঠ, জেলা হাওড়া।

রামকৃষ্ণ মিশন নিবেদিতা বিদ্যালয় রেণুকা বসু
সম্পাদিকা

## সর্বব্যাপী রুদ্রের প্রতি

নমঃ পার্যায় চাবার্যায় চ, নমঃ প্রতরণায় চোত্তরণায় চ।
নমস্তীর্থ্যায় চ কুল্যায় চ, নমঃ শষ্প্যায় চ ফেন্যায় চ ॥
নমঃ সিকত্যায় চ প্রবাহ্যায় চ, নমঃ কিংশিলায় চ ক্ষয়ণায় চ।
নমঃ কপর্দিনে চ পুলস্তয়ে চ, নম ইরিণ্যায় চ প্রপথ্যায় চ ॥

শুক্লযজুর্বেদসংহিতা—১৬।৪২, ৪৩

পারাবারহীন মহাসাগরের ওই প্রান্তে তুমি, তোমাকে নমস্কার; এই প্রান্তেও সেই তোমারই সত্তা, তোমাকে নমস্কার। ঐ অসীম জলরাশির বক্ষে যে বৃহৎ অর্ণবপোতটি নির্ভয়ে পার হইয়া যাইতেছে সে তুমি, তোমাকে নমস্কার; আবার উত্তাল তরঙ্গ-বিক্ষোভের মধ্যে ঐ যে ক্ষুদ্র তরণীটি হেলিয়া দুলিয়া আপনাকে রক্ষা করিয়া চলিতেছে উহাও তুমি, হে রুদ্র—তোমাকে নমস্কার। অতলস্পর্শ সমুদ্রের গভীরে তুমি আছ, আবার বেলাভূমিতে সেই তুমিই; তোমাকে নমস্কার। তটদেশে যে তৃণ-শষ্প-গুল্ম আকীর্ণ রহিয়াছে সেখানে তুমি, আবার সমুদ্রের মধ্যদেশে ঐ যে ভয়াল ফেনিল ঊর্মিমালা সেখানেও তোমারই প্রকাশ; হে রুদ্র—তোমাকে নমস্কার।

দূর-প্রসারিত সৈকতের বিস্তীর্ণতার মধ্যে তোমার মূর্তি দেখিতে পাইয়াছি, নমস্কার তোমায়; নদী যেখানে সাগরে আসিয়া পড়িয়াছে সেখানকার স্রোতঃকল্লোলে তোমারই আনন্দোল্লাস আবিষ্কার করিয়াছি, প্রণতি তোমায়। সমুদ্রের তীরে অসংখ্য বিচিত্র শিলা-শুক্তিকার ঝিকিমিকিতে তুমিই যেন উঁকি মারিতেছ, আবার ঐ যে অচলপ্রতিষ্ঠ বারিধির গম্ভীর প্রশান্তি—সেও তোমারই শুদ্ধ রূপ, হে রুদ্র—নমস্কার তোমায়। হে জটাজুটধারী কপর্দী রুদ্র, তোমার সর্বান্তর্যামী স্বরূপকে নমস্কার। প্রাণচিহ্নবিহীন ঊষর মরুভূমিতেও তুমি, আবার জীবন-প্রাচুর্য-মুখর লোকালয়ের পথে পথে তোমারই পদচিহ্ন অঙ্কিত দেখিতে পাইয়াছি, তোমায় বন্দনা করি।

# দেবজন্ম

মানুষ যে সভ্যতার উষাকাল হইতে দেবতার সন্ধান করিয়া আসিয়াছে উহার রূপ এবং প্রণালী যুগ যুগ ধরিয়া কতই না পরিবর্তিত হইল। প্রকৃতির দুর্দান্ত শক্তিনিচয়—খরতাপ, প্লাবন, ঝঞ্ঝা, বজ্রপাত প্রভৃতি হইতে আত্মরক্ষার জন্য সূর্য-বরুণ-বায়ু-ইন্দ্রাদিকে প্রসন্ন করিবার প্রয়াস—নিছক জৈবিক-প্রয়োজনে প্রযুক্ত মানুষের এই প্রথম দেবতা-অন্বেষণের সাংস্কৃতিক মূল্য বোধ করি খুব বেশী ছিল না। মানুষ তখন মানবতার মাত্র আদিম সোপানে—রক্তমাংসের দেহেই তাহার দৃষ্টি সীমাবদ্ধ—পার্থিব জীবনের স্থূল তৃপ্তিই তাহার লক্ষ্য। ক্রমে মানুষের বুদ্ধি বাড়িল—কল্পনা, সৃজনপ্রতিভা, কর্মশক্তির বিস্তার হইল—নিজের খাদ্য, বাসস্থান এবং জীবনযাত্রার অপর সামগ্রীনিচয় নিজেরই পুরুষকারে সে সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করিতে শিখিল—এ সকলের জন্য দেবতার মুখ চাহিবার প্রয়োজন তাহার কমিয়া আসিতে লাগিল। তবুও কিন্তু দেবতাকে সে ছাড়িল না—দেবতার প্রতি দৃষ্টিভঙ্গী বদলাইয়া লইল। সাধারণ জৈবিক প্রয়োজনের জন্য দেবতার অনুকম্পার প্রয়োজন না থাকিলেও তাহার জীবনকে শক্তিসামর্থ্যে, মেধাবীর্যে সমৃদ্ধ করিবার জন্য দেবতার সহিত উন্নততর সংস্পর্শ রাখিয়া চলিল। নিজের বুদ্ধি এবং প্রযত্নে আয়ত্তীভূত বহুতর স্বাচ্ছন্দ্য, নিরাপত্তা সত্ত্বেও জীবনে অনেক বিপদ, অপচয়, অসম্পূর্ণতা রহিয়া গিয়াছে—এ-পর্যন্ত-জানা যত কিছু কৌশল, কৃতিত্ব দ্বারা যাহাদিগকে দূর করা যায় না। মানুষের চেয়ে সম্পন্নতর, বলবত্তর, ঊর্ধ্বলোকবাসী যাঁহারা—দেবতা—তাঁহাদিগকে পূজা-স্তুতি দ্বারা প্রসন্ন করিয়া জীবনের ঐ সকল ক্ষতি পুরাইয়া লওয়ার সম্ভাবনাকে মানুষ অবিশ্বাস করিতে পারিল না।

বিস্তৃততর জীব-জীবনের জন্য দেবতাকে স্বীকার এবং দেবতার সহিত লেনদেন নূতন নূতন পথে প্রসারিত হইতে লাগিল। আসিল পরলোকের ধারণা। পূর্ণতার লক্ষ্য শুধু এই জীবনেই গণ্ডীবদ্ধ নয়—এ পৃথিবীর পরেও 'লোক' আছে—পিতৃলোক, স্বর্গলোক, মহর্লোক, তপোলোক, ব্রহ্মলোক প্রভৃতি—যেখানে সুন্দরতর, তেজোবত্তর শরীর লাভ করিয়া জীবনকে দীর্ঘদিন ধরিয়া অতি প্রখর ভাবে উপভোগ করা যায়। পৃথিবীর জীবনের তুলনায় উহা অনেক নির্বাধ, নিরাপদ—বহুগুণ সুখকর। সে সুখ কিন্তু পৃথিবীরই সুখের মত—শব্দস্পর্শরূপরসগন্ধেরই সংস্পর্শ-জনিত ইন্দ্রিয়পরিতৃপ্তি—শুধু তীক্ষ্ণতর, ব্যাপকতর, দীর্ঘতর।

দেবতানুসরণের পরবর্তী কোন ধাপে মানুষ এক আশ্চর্য আবিষ্কারের সম্মুখীন হইল। বহু বিচিত্র শক্তির প্রতিমূর্তি পৃথক পৃথক দেবতাগণের পরিচালক সর্বব্যাপী, সর্বগামী, সর্বশক্তিমান্ সর্বান্তর্যামী এক পরমেশ্বর রহিয়াছেন—দেবতার দেবতা তিনি—তাঁহারই ভয়ে সূর্য-অগ্নি তাপ দিতেছেন—ইন্দ্র মাতরিশ্বা নিজ নিজ কাজ করিতেছেন—যম সংহারক্রিয়া চালাইয়া যাইতেছেন। **ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি ভয়াত্তপতি সূর্যঃ। ভয়াদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ॥** তাঁহাকে কেহ অতিক্রম করিতে পারে না—**তদু নাত্যেতি কশ্চন।** এই

পরমেশ্বরকেও নানাভাবে চিন্তা করা যায়—কখনও তিনি অখিল সৃষ্টির জনক প্রজাপতি ব্রহ্মা—কখনও বিশ্বধারক বিষ্ণু—কখনও প্রলয়ঙ্কর ভীষণ রুদ্র।

অনেক দেবতা হইতে এক দেবতাতে চিত্ত সমাধান মানুষকে সত্যের পথে বহুতর আগাইয়া লইয়া গিয়াছিল, সন্দেহ নাই। কিন্তু যে উদ্দেশ্যে সে পূর্বে বহু দেবতার সহিত সম্পর্ক রাখিয়াছিল—আরাধনার বেদীতে এখন এই এক পরমদেবতাকে স্থাপন করিয়াও তাহার প্রাক্তন লক্ষ্যের অনেককাল পর্যন্ত বিশেষ পরিবর্তন দেখা গেল না। তাঁহার নিকট সে লাউ-কুমড়াই চাহিয়া চলিল—স্বাস্থ্য, সম্পদ, সন্ততি, পারিবারিক শান্তি, সুখ—ইহকালে ও পরকালে। আমাদের নিজেদের ঐহিক এবং পারত্রিক স্বার্থ ব্যতীতও পরমদেবতার সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিবার যে একটা মহত্তর লক্ষ্য আছে, মানুষ ধীরে ধীরে এই তথ্য উপলব্ধি করিল। তিনি শুধুই বিশ্বসংসারের, জীবনিবহের স্রষ্টা পাতা সংহর্তা নন, তিনি আমাদের স্নেহময় পিতাও—তাঁহাকে নিঃস্বার্থভাবে ভালবাসা যায়, অনুরাগভরে হৃদয়ে ধ্যান করা যায়। শক্তির ঈশ্বর এই ভাবে পরিণত হইলেন প্রেমের ঈশ্বরে। কিন্তু এখনও তিনি মানুষ হইতে দূরে—মানুষের অত্যন্ত বাহিরে। মানুষের সহিত তাঁহার ব্যবধান বিশাল।

পর্যবেক্ষণ বাড়িয়া চলিয়াছে- ধাপে ধাপে আঘাত খাইয়া খাইয়া অভিজ্ঞতা সত্যাভিমুখী হইতেছে—জীবনের যাত্রাপথে মানুষের দৃষ্টি বাহির হইতে মোড় ফিরিয়া তাহার নিজ অন্তরের ঐশ্বর্যের দিকে নিবদ্ধ হইতেছে। স্থূল জগতের আবরণের অন্তরালে মানুষ সূক্ষ্ম জগতকে আবিষ্কার করিয়াছে। তাহার আশা, আকাঙ্ক্ষা, লক্ষ্যের পরিবর্তন হইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে দেবতারও রূপ বদলাইয়াছে। দেবতাকে প্রকৃতির ভীষণ দুর্বার বহিঃশক্তিগুলির প্রতীক রূপে কিংবা মানুষ হইতে অত্যন্ত দূরে ষড়ৈশ্বর্যশালী কোন বিশ্ব-সম্রাটরূপে ভাবিয়া মানুষ তৃপ্ত হইতে পারিতেছে না। দেবতা এখন তাহার আন্তর সম্পৎসমূহের—সত্য, প্রেম, শুচিতা, ক্ষমা, সংযম, জ্ঞান, বিবেক, বৈরাগ্য প্রভৃতির প্রতিমূর্তি। মানুষের নিকট এখন দেহের জীবন —(তাহা এই পৃথিবীতেই হউক বা ইহার ঊর্ধ্বে স্বর্গাদিলোকেই হউক) তাহার মানস-জীবন, আত্মিক জীবনের তুলনায় অত্যন্ত ক্ষুদ্র। মানুষ বুঝিয়াছে যে সে যত চেষ্টাই করুক দেহের জীবনের ক্ষয়িষ্ণুতা, সীমাবদ্ধতা, ভয়, মৃত্যু হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যাইবে না। অমরত্ব, অসীমত্ব, চির-নির্ভয় লাভ করিতে পারে সে শুধু মানস-জীবনে, আত্মিক জীবনে।

মানুষের সহজাত দুর্মদ স্বাধীনতাস্পৃহা একদিন তাহাকে সংগ্রামে লিপ্ত করিয়াছিল—প্রকৃতির যে সকল শক্তি প্রতিনিয়ত তাহার ইন্দ্রিয়বিষয়সমূহের লাভে বাধা দেয় তাহাদের সহিত। আজ সেই স্বাধীনতা-স্পৃহা তাহাকে কিন্তু ডাক দিল ভিন্ন সমরাঙ্গনে—তাহার অন্তঃপ্রকৃতির প্রবল রিপুগুলিকে জয় করিতে। আজ দেবতার আবাহন হৃদয়ের অতি-নিন্দিত অসুর-নিবহের ধ্বংসের জন্য। এই যুদ্ধে, এই জয়লিপ্সায় মানুষের যে উত্তম অভিব্যক্ত হইল তাহা অতি বিস্ময়কর। এতকাল ধরিয়া মানুষ যাহা চাহিয়াছে—পাইবার জন্য ছুটাছুটি করিয়াছে সে সবই যেন অতি অকিঞ্চিৎকর। ভাষা দিয়া সম্যক বুঝানো যায় না এমন এক গহন গভীর সংপ্রাপ্তির নেশায় আজ তাহার সমগ্র চেতনা যেন উন্মুখ হইয়া উঠিয়াছে।

দেবজন্ম!—স্বাভাবিক যে অজ্ঞান, মোহ, স্বার্থপরতা, আসক্তি, ভয়, বাসনা-কামনা

মানুষের জীবনে ছাইয়া থাকে উহাদিগকে দূর করিয়া দিয়া সুস্থির জ্ঞান, তৃপ্তি, প্রেম, পবিত্রতা, আনন্দের সত্যে প্রতিষ্ঠা-লাভ! এই অভিনব জন্ম লাভ করিবার জন্যই তো সে মানুষ হইয়া জন্মিয়াছে। এই দেবজন্মে তাহার জন্মগত অধিকার—তাহার সম্মুখগতির শেষ পরিণতি। দেবজন্মই মানুষের জীবনের বৃহত্তম সার্থকতা। মৃত্যুর পরে নয়—এই পৃথিবীতেই। দেহকে দূর করিয়া দিয়া নয়—সাড়ে-তিন-হাত-পরিমিত এই রক্তমাংসের দেহে বসিয়াই।

ঋষিদের প্রার্থনা শুনিলাম:—কর্ণে যেন আমাদের কল্যাণময়ী বাণী প্রবেশ করে, নয়নে যেন আমরা দেখিতে পাই শুচি-শুভ্র মঙ্গলপ্রসূ দৃশ্য—সমস্ত ইন্দ্রিয়, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ জৈবিক জীবনের চাঞ্চল্য হইতে যেন মুক্ত হয়—উচ্চতর সত্যানুসন্ধানে মনঃপ্রাণ যেন নিয়োজিত হয়—দেবজন্ম লাভ করিয়া যেন আমরা ধন্য হই।

উপনিষদে রূপকচ্ছলে* দেবজন্মের কল্পনা দেখি:— স্বার্থপরতা, দ্বেষ, নীচতা রূপ মহামৃত্যুকে পরাভব করিয়া আমরা যখন অমরত্ব লাভ করিব তখন আমাদের চক্ষুতে বসিবেন স্বয়ং-ভাস্বর সূর্য। আসক্তি এবং বিরাগবর্জিত দৃষ্টিতে আমরা বিশ্বজগতের সব কিছু উদার সাম্যে প্রতিষ্ঠিত দেখিতে পাইব।

আমাদের সীমাবদ্ধ বাগিন্দ্রিয়ে তখন ঘটিবে অগ্নি-দেবতার আবির্ভাব। আমাদের বাক্যে থাকিবে না মিথ্যা, সংশয়, দুর্বলতা, ক্রূরতা। যাহা বলিব তাহা সত্যের শক্তিতে মর্ম স্পর্শ করিবে—তেজস্বিতায়, স্পষ্টতায়, সরলতায় শ্রোতার মনে অমোঘ প্রভাব বিস্তার করিবে।

আমাদের ঘ্রাণ-শক্তি ঘ্রাণেন্দ্রিয়ে অধিষ্ঠিত হইবেন অমিত-বল বায়ুদেবতা। বিশ্বের যত কিছু পবিত্রতা, স্নিগ্ধতা সেই সর্বসঞ্চারী মাতরিশ্বা আমাদের জন্য আহরণ করিয়া লইয়া আসিবেন। সমস্ত সত্তা হইবে দিব্যগন্ধে আমোদিত।

আমাদের সসীম শ্রবণেন্দ্রিয় তখন রূপান্তরিত হইবে সীমাবন্ধহীন দিগ্-দেবতায়। অতিসূক্ষ্ম অতি-গহন, সত্যাবগাহী বিষয়সমূহ শুনিতে, শুনিয়া হৃদয়ঙ্গম করিতে আমরা সমর্থ হইব। আমাদের বাসনা-চঞ্চল রজস্তমোমলিন মন পরিবর্তিত হইবে সদা-নির্মল চন্দ্রমায়। সমস্ত সঙ্কল্প হইবে শুদ্ধ, সমস্ত আকাঙ্ক্ষা শাশ্বত-ধর্মী, সমস্ত আবেগ প্রশান্ত, গম্ভীর।

মানুষ তাহার অভ্যুদয়ের প্রথম হইতে তাহার নিজেরই স্বার্থে নিজের যে অতিরিক্তকে চাহিয়া আসিয়াছে—যাহা যুগে যুগে নানা দেবতার রূপ লইয়া পরে স্রষ্টা-পাতা-সংহর্তা ঈশ্বরের ধারণায় সুপ্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল—সেই অতিরিক্ত যখন পরিশেষে মানুষের নিজেরই কেন্দ্রে ফিরিয়া আসিয়া সুস্পষ্টভাবে আপনাকে ধরা দিল তখন মানুষ যে বিস্ময়ে আত্মহারা হইয়া পড়িবে তাহা তো স্বাভাবিকই। মানুষ বলিয়া উঠিয়াছিল—

শতং মা পুর আয়সীররক্ষন্নধঃ শ্যেনো জবসা নিরদীয়ম্ ।[১]

আপনাকে যখন জানি নাই, তখন শত শত জন্মে আমার দেহ হইয়াছিল লৌহ-কারাগার। আজ নিজকে আবিষ্কার করিয়াছি—আপনার অমরজন্মে অটলস্থিতি লাভ করিয়া শ্যেনপক্ষী যেমন পিঞ্জর কাটিয়া নির্গত হয় তেমনি শরীরে তাদাত্ম্যবন্ধন দূর করিয়া মুক্তির নির্বাধ আনন্দে বাহির হইয়া আসিলাম।

* বৃহদারণ্যক উপনিষৎ, ১।৩

১ ঐতরেয় উপনিষৎ, ৪।৫

অণুঃ পন্থা বিততঃ পুরাণো
মাং স্পৃষ্টোঽনুবিত্তো ময়ৈব।
তেন ধীরা অপিযন্তি ব্রহ্মবিদঃ
স্বর্গং লোকমিত উর্ধ্বং বিমুক্তাঃ॥[২]

অহো আশ্চর্য—এতদিন কোথায় লুকাইয়াছিল অগ্রগতির এই প্রাচীন প্রশস্ত রাজপথ! আজ চকিতে আসিয়া আমাকে স্পর্শ করিল—প্রাণে প্রাণে উহাকে বরণ করিয়া লইলাম। সত্যদ্রষ্টা পুরুষগণ এই পথে চলিয়াই পরম লক্ষ্যে গিয়া পৌছান—জীবনের যত তমিস্রা, যত অক্ষমতা, যত অন্তরায় সব তখন নিমেষে টুটিয়া যায়।

মানুষ অনুভব করিল :— সোঽহমস্মীতি·····
সর্বান্ পাপ্মন ঔষৎ তস্মাৎ পুরুষঃ······
অহং বাব সৃষ্টিরস্মি······অহং মনুরভবং সূর্যশ্চেতি।[৩]

বিশাল বিচিত্র সৃষ্টির কেন্দ্র খুঁজিয়া পাইয়াছি। সে কেন্দ্র ভূলোকে নয়, দ্যুলোকে নয়, ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরের লোকাতীত মহিমায় নয়—সে কেন্দ্র আমি—আমারই নিত্যবর্তমান চৈতন্যস্বরূপ। সেই স্বরূপে দাঁড়াইয়া সমস্ত মলিনতাকে আজ দূর করিয়া দিয়াছি—সেইজন্যই আমার নাম পুরুষ। কী অদ্ভুত! অখিল সৃষ্টি আমারই প্রকাশ। আমিই একদা প্রজাপতি মনু হইয়াছিলাম—আমিই নিখিল জগতের আলোক এবং প্রাণবিবর্ধক সূর্য।

শ্যামাচ্ছবলং প্রপদ্যে শবলাচ্ছ্যামং প্রপদ্যে।[৪]

একবার হৃদয়ের অভ্যন্তরে শ্যাম-গভীর গহন সত্যে মিশিয়া যাইতেছি—আবার তথা হইতে উঠিয়া বাহিরে অনন্ত বিশ্ব-প্রকাশের মধ্যে নিজকে অনুভব করিতেছি। যাহা অন্তরে তাহাই বাহিরে।

যুগ যুগ ধরিয়া যাহা এত দূরে ছিল, যাহার পরিচয়-সম্বন্ধে কত না সংশয়, কত না জল্পনা চিত্তকে অহরহ পীড়িত করিত, আজ তাহাকে যথাযথরূপে এত কাছে পাইয়া, নিজের সহিত তাহার ঘনিষ্ঠতম সম্পর্ক জানিয়া মানুষের আনন্দপ্রকাশের ভাষা কখনও কখনও ফুরাইয়া গিয়াছিল। তখন—

এতৎ সাম গায়ন্নাস্তে। হা—বু, হা—বু, হা—বু।[৫]

সমরস সত্য-জ্ঞান-আনন্দের অনুভূতি মানুষ পরিষ্কার বাণীতে প্রকাশ করিতে পারিতেছে না। তাহার সমগ্র সত্তা যেন বিকল হইয়া পড়িয়াছে। আপন নেশায় বিভোর হইয়া সে নৃত্য করিতেছে—শুধু হা—বু, হা—বু, হা—বু—তাহার মুখের অপরিস্ফুট এই কতকগুলি শব্দ ব্যক্ত করিতেছে তাহার অন্তরের গভীর আনন্দ।

মানুষ যে দেবজন্ম এই পৃথিবীতেই লাভ করিতে পারে, ইহাই মানুষের মস্ত বড় আশার কথা। সে তাহার পৌরুষ, মেধা, ধৈর্য, সাহস প্রযত্ন, অধ্যবসায় দ্বারা মনুষ্যত্বকে সোপান হইতে সোপানান্তরে উন্নীত করিয়াছে, তাহার সমাজ-রাষ্ট্র-শিক্ষা-সাহিত্য-বিজ্ঞান-কলা-শিল্প-দর্শন প্রভৃতির বহুবিধ কৃতিত্বে। এখানেই তাহার অভিযান ক্ষান্ত হইবার নয়—হয়ও নাই। সে তাহার আপন অন্তরের দেবত্বকেও আবিষ্কার করিয়াছে। জন্মাদি ষড়্-বিকারশীল মর্ত্য দেহের মধ্যে অবিকারী অমর দেবতার সন্ধান পাইয়া ধন্য হইয়াছে। মানবাত্মাই এই অমর দেবতা। মানবাত্মার সত্যে বিশ্বাস ও স্থিতিই দেবজন্ম। মনুষ্যত্বের ইহাই চরম সোপান। মানুষ ইহাকে তুচ্ছ করিতে পারে না—করিলে তাহার যাত্রা অর্ধপথে অসম্পূর্ণ রহিয়া যায়। যে উৎসাহ এবং ধৈর্য লইয়া সে আর দশটা দিকে গৌরব লাভ করিয়াছে সেই উৎসাহ লইয়াই তাহাকে তাহার জীবনের চরম সংপ্রাপ্তির জন্য খাটিতে হইবে। ইহাই তাহার লক্ষ্য।

এই লক্ষ্যে দুর্বলতা নাই—ইহা হইতে ভয় পাইবারও কিছু নাই। এই লক্ষ্য মানুষকে, তাহার সমাজকে নিস্তেজ ও অলস করে না—করে তেজস্বী, মহিমান্বিত। দেবজন্ম লাভ করিয়া মানুষ হয় উদার, প্রেমিক, সত্যসন্ধ, নির্ভীক। যে সমাজে মানুষ যতটা দেবতা হইতে পারে সে সমাজ দশদিকে ততটা কল্যাণ বিকিরণ করে।

২ বৃহদারণ্যক উপনিষৎ, ৪।৪।৮
৩ বৃহদারণ্যক উপনিষৎ—১।৪।১,৫,১০
৪ ছান্দোগ্য উপনিষৎ, ৮।১৩।১
৫ তৈত্তিরীয় উপনিষৎ, ৩।১০।৫

# শ্রীশ্রীমায়ের শেষ জগদ্ধাত্রী পূজা

স্বামী পরমেশ্বরানন্দ

১৩২৬ সনের কার্তিক মাস। পরমারাধ্যা শ্রীশ্রীমা জয়রামবাটীতে ম্যালেরিয়াজ্বরে ভুগিতেছেন—শরীর খুব দুর্বল ও শীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু তবুও জগদ্ধাত্রী-পূজা আগতপ্রায় বলিয়া পূজার আয়োজন করিবার উৎসাহ কমে নাই। বিশেষ শ্রদ্ধার সহিত দেবীর পূজার প্রদীপের সলিতাটি পর্যন্ত প্রস্তুত করিয়া রাখিতেছেন। আমি জয়রামবাটীতে আছি। আমাকে প্রত্যেকটি বিষয় দেখাইতেছেন। পূর্ব পূর্ব বার অপেক্ষা এবার যেন বিশেষ করিয়া সব দেখাইয়া ও বুঝাইয়া দিতেছেন। যেন সুচির ভবিষ্যতের জন্ম সব ব্যবস্থা করিতেছেন। তাঁহার অশেষ কৃপা-করুণায় তাঁহার শ্রীচরণদর্শন ভাগ্যে ঘটিয়া উঠিবার পর হইতে এবং তাঁহার সামান্য সেবার অধিকার পাওয়া অবধি দেখিতেছি সংসারের খুঁটিনাটি কাজ হইতে সবকিছুই যেন তিনি নিজেই করিবার জন্ম প্রস্তুত। রাঁধুনির আসিতে বিলম্ব হইলে নিজেই রান্না আরম্ভ করিতেন। যথাসময়ে ঝি না আসিলে নিজেই তাহার কাজ করিবার জন্ম অগ্রসর হইতেন। ঝি অন্ম কাজে ব্যস্ত থাকিলে নিজেই গোয়াল পরিষ্কার করিয়া ঘুঁটে দিতে আরম্ভ করিতেন ইত্যাদি। কেহ কোন কাজ করিয়া দিবে এইরূপ আশায় অপেক্ষা করিয়া থাকিতে তাঁহাকে প্রায়ই দেখা যাইত না। এবার শরীর দুর্বল থাকা সত্ত্বেও এইরূপ ভাবেই কাজ করিতেছেন। যাহা হউক, শ্রীশ্রীমাকে যাহাতে কোনও কাজ করিতে না হয় এবিষয়ে সকলেই দৃষ্টি রাখিতেছেন।

জগদ্ধাত্রী-পূজার দিন উপস্থিত হইয়াছে, আয়োজনও প্রায় সম্পূর্ণ। নূতন বাড়ীতেই প্রতিমায় পূজা হইতেছে। অনেকেই যোগদান করিয়াছেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, মা, দেবীমণ্ডপে আলপনা দেবে কে? মামিমাদের কাউকে ডাকব কি? শ্রীশ্রীমা বিরক্ত হইয়া বলিলেন, ওদের ডাকতে হবে না, তোমরাই আমার ব্যাটাছেলে, তোমরাই আমার মেয়েছেলে। তুমিই আলপনা দাও। আমি আলপনা দেওয়ায় শ্রীশ্রীমা সন্তুষ্ট হইয়া সবাইকে ডাকিয়া বলিলেন, দেখে যা, দেখে যা, মেয়েছেলের মত কেমন আলপনা দিয়েছে।

বাঁড়ুয্যেপুকুর হইতে ঘট তুলিয়া আনা হইল। স্বস্তিবচন পাঠ করিবার পর সঙ্কল্প ও বরণের জন্ম মা দেবীমণ্ডপে উপস্থিত হইলেন। গললগ্ন বস্ত্রে দেবীর উদ্দেশে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া বরণবাক্য পাঠ করিলেন। পূজা আরম্ভ হইল। আমাকে নৈবেদ্য ও ভোগের সম্বন্ধে বিহিত ব্যবস্থা সব বলিয়া দিলেন। বলিলেন, এইরূপ নৈবেদ্য হবে, এই এই পাত্রে নৈবেদ্য এবং এই সব জায়গায় ভোগ দেবে। ভোগ ও ব্যঞ্জন দিবার একখানা পাথর দেখাইয়া বলিলেন, এই পাথরে ভোগ ও এই বাটিতে সরবত দেওয়া হয়। পূজার সময় সন্ধ্যা-আরাত্রিকের পর এই পাত্রে শীতল দেওয়া হয়, ইত্যাদি। এইসব দেখাইতেছেন বটে, কিন্তু দেখিতেছি তাঁহার মন যেন সর্বদাই অন্তর্মুখ। সকল বিষয়েই যেন এবার পূর্ব পূর্ব বারের চেয়ে আল্‌গা আল্‌গা ভাব। এত কর্মকোলাহলের মধ্যেও শ্রীশ্রীমার এইরূপ নির্লিপ্ত

ভাব দেখিয়া আমি মনে মনে নৈরাশ্য এবং উদ্বেগ বোধ করিলাম এবং ভাবিলাম, তিনি যেন পৃথিবী হইতে বিদায় লইবার জন্য এই সকল ব্যবস্থা করিতেছেন। অন্যান্য বৎসরের মত যথাবিহিত দেবীর পূজা ও হোমের পর শ্রীশ্রীমা শান্তিবারি গ্রহণ করিলেন। পরে ব্রাহ্মণ-ভোজন ইত্যাদি হইল। পূজারি দিনের নৈবেদ্য কে কি পায়, কাহার কি সম্মান ইত্যাদিও শ্রীশ্রীমা আমাকে জানাইয়া দিলেন।

পরের দিন দেবীর পূজা দশোপচারে সম্পন্ন হইল। ঐ দিনের করণীয় বিষয়গুলিও বলিয়া দিলেন। সেদিনও পূজা, ভোগারতি, সন্ধ্যায় আরাত্রিক, শীতল ও রাত্রে ভোগ হইয়া গেল। তৃতীয় দিনে নিরঞ্জনের সময় সকালের পূজা, দধি-কড়ম্ব ও সিদ্ধি নিবেদনের পর আরতির সময় শ্রীশ্রীমা পূজামণ্ডপে উপস্থিত হইয়া দেবীকে ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিলেন এবং জোড়হস্তে কি যেন বলিলেন। সর্বদাই ধীর প্রশান্ত ভাব; সময় সময় মনে হইতেছে তাঁহার মন যেন অন্যত্র অবস্থান করিতেছে। নিরঞ্জনের মন্ত্র পাঠ হইয়া গেল। শ্রীশ্রীমা নির্মাল্য-পুষ্প গ্রহণ করিলেন। বাটীর ভিতরে আসিয়া ভক্তসন্তান এবং উপস্থিত অন্যান্য সকলকে দধি-কড়ম্ব প্রসাদ দেওয়াইলেন। সন্ধ্যার পর প্রতিমা বিসর্জনের পূর্বে দেবীকে বরণ করা হইলে প্রতিমার কানের একটি অলঙ্কার খুলিয়া লইয়া দেবীর কানের নিকট আস্তে আস্তে বলিলেন, মা আবার এসো। শ্রীশ্রীমায়ের শরীর সুস্থ নয় বলিয়া পূজা উপলক্ষে যাঁহারা আসিয়াছিলেন তাঁহারা সকলেই তাড়াতাড়ি চলিয়া গেলেন।

আমি প্রতিবৎসর শ্রীশ্রীজগদ্ধাত্রী-পূজার পূর্বে কলিকাতায় যাইয়া পূজার জন্য জিনিষ-পত্রাদি আনিয়া থাকি। এবারও শ্রীশ্রীমায়ের আদেশে এবং পূজনীয় শরৎমহারাজের নির্দেশে কলিকাতায় জিনিষ-পত্রাদি আনিতে গেলে শরৎ মহারাজ বলিয়াছিলেন, শ্রীশ্রীমায়ের শরীর অসুস্থ, ম্যালেরিয়া জ্বর হচ্ছে; তাঁকে কলকাতা আসবার জন্য বিশেষ করে বলবে। এইজন্য তদনুসারে শ্রীশ্রীজগদ্ধাত্রী-পূজা শেষ হইবার পরেই শ্রীশ্রীমাকে বলিলাম, মা, আপনার শরীর ক্রমেই খারাপ হচ্ছে, শরৎ মহারাজ বলেছেন আপনাকে কলকাতা যাওয়ার জন্য। আমাদেরও ইচ্ছা আপনি কলকাতা গিয়ে সুস্থ হয়ে আসেন। শ্রীশ্রীমা বলিলেন, হাঁ বাবা, এবার কলকাতা যেতে হবে। শরীরও ভাল যাচ্ছে না। এদের (রাধু প্রভৃতি) নয়ে যত সব ঝঞ্ঝাট। শরৎকে লিখে গোছগাছ করে কলকাতা যাব।

শ্রীযুক্ত নারায়ণ আয়েঙ্গার (পরে স্বামী শ্রীবাসানন্দ) আমাদের মারফতে পূর্বে শ্রীশ্রীমাকে একবার বলিয়াছিলেন, বর্ষার সময় জয়রাম-বাটীতে অত্যন্ত কাদার দরুন শ্রীশ্রীমায়ের খুব কষ্ট হয়। বাড়ীটা ইঁট-সিমেন্ট দিয়া বাঁধাইয়া দিলে ভাল হইবে, এত কষ্ট থাকিবে না। ইহাতে শ্রীশ্রীমা বলিয়াছিলেন, না বাবা, বাড়ীঘর ইঁট-সিমেন্ট দিয়ে বাঁধাবার দরকার নেই, লোকে বলবে, এদের অনেক টাকা হয়েছে। এই কারণে তখন আর চেষ্টা করা হয় নাই। এবারও কয়েকদিন পূর্বে শ্রীযুক্ত নারায়ণ আয়েঙ্গার পুনরায় ঐ প্রস্তাব করিয়াছেন এবং ইহার সকল খরচ বহন করিতে সম্মত হইয়াছেন। শ্রীশ্রীমাকে ঐ কথা জানাইলে তিনি বলিলেন, হাঁ বাবা, বাড়ীটি এবার বাঁধিয়ে দাও, বড় কাদা হয়। নারায়ণেরও ইচ্ছা বাড়ীটি বাঁধিয়ে দেয়। পূজনীয় শরৎ মহারাজকে এই সংবাদ জানাইলে শ্রীযুক্ত নারায়ণ আয়েঙ্গার অবগত হইয়া খরচের টাকা মহারাজের নিকট জমা দিলেন। এদিকে শ্রীশ্রীমার আদেশ লইয়া ইঁট তৈরী করাইবার ব্যবস্থা হইল।

এই সময় একদিন শ্রীশ্রীমা আমাকে বলিলেন, শরৎকে লিখে আমার জন্মস্থানের জায়গাটি কিনে একটা বাড়ী কর। ছেলেরা সব কোথায় থাকবে? তোমরা সব কোথায় থাকবে? আমি বলিলাম, মামারা জায়গা দেবে কেন মা? একবার আপনার জন্মস্থানটুকু পাথর দিয়ে চিহ্নিত করে রাখবার জন্ম রাঁচির ভক্তগণ চেষ্টা করেছিলেন, তাতে কালী মামা বলেছিলেন, যতটুকু জায়গায় পাথর দিয়ে বাঁধাবে ততটুকু জায়গা (মূল্য-স্বরূপ) টাকা বিছিয়ে দিতে হবে। ওখানে ওদের খামার (গাছ-ধান তুলে রাখবার জায়গা), ওরা জায়গা দেবে কেন? ইহা শুনিয়া শ্রীশ্রীমা বলিলেন, কালীকে ডাক, আমি বুঝিয়ে বলছি। কালী মামাকে ডাকা হইলে শ্রীশ্রীমা তাঁহাকে বলিলেন, দ্যাখ্, কালী, তিন জনে ৩০০৲ টাকা নিয়ে আমার জন্মস্থানের জায়গাটি দিয়ে দে। আমার যে সব ছেলেরা আছে, ঐ জায়গা একদিন অমনিই কেড়ে নেবে। তার চেয়ে আমি থাকতে থাকতে তিন জনে ৩০০৲ টাকা নিয়ে জায়গাটি ছেড়ে দিগে যা। কালী মামা বলিলেন, দিদি, তোমার জন্মস্থানের জায়গার উপর বাড়ী হবে, আর জায়গা ছেড়ে দেব না? নিশ্চয় দেব। তবে আমাকে আলাদা ১০০৲ টাকা দিতে হবে। আমার অভাব তুমি ত জান। শ্রীশ্রীমা আমাকে বলিলেন, বাবা, শরৎকে লিখে একে আলাদা করে ১০০৲ টাকা দিয়ে দাও। পূজনীয় শরৎ মহারাজকে সকল সংবাদ জানান হইলে তিনি সন্তুষ্ট হইয়া নির্ধারিত টাকা দিতে রাজী হইলেন। বরদা মামাকে ডাকিয়া শ্রীশ্রীমা বলিলেন, বরদা, আমার জন্মস্থানের জায়গাটি তোরা তিন জনে ৩০০৲ টাকা নিয়ে ছেড়ে দে। আমার যে সব ছেলেরা আছে একদিন অমনিই নিয়ে নেবে; তার চেয়ে আমি থাকতে থাকতে দিয়ে দেওয়াই ভাল। বরদা মামা বলিলেন, দিদি, তোমার জন্মস্থানে বাড়ী হবে আর আমি জায়গা ছেড়ে দেব না? সকলে যদি দেয় আমার কোনও অমত নেই। প্রসন্ন মামা তখন কলিকাতায় ছিলেন। তাঁহাকে সংবাদ দেওয়া হইল। তিনিও মত দিলেন এবং বলিলেন, যদি সবাই জায়গা ছেড়ে দেয় আমার অমত নেই।

আমি কলিকাতায় পূজনীয় শরৎ মহারাজকে লিখিলাম, যত শীঘ্র সম্ভব প্রসন্ন মামার অংশের জায়গা বরদা মামার নামে বিক্রয়-কোবালার একটি আম্মোক্তার-নামা করিয়া এখানে পাঠাইয়া দিতে। পূজনীয় শরৎ মহারাজ শ্রীললিতচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (শ্রীশ্রীমার দীক্ষিত সন্তান) এবং শ্রীযুক্ত প্রসন্ন মামাকে উদ্বোধনে শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিলেন এবং সমস্ত বিষয় অবগত করাইলেন। ললিত বাবু প্রসন্নমামাকে জলপান খাইবার জন্ম পকেটে দশটি টাকা দিলেন এবং বরদা মামার নামে একটি বিক্রয়-কোবালার আম্মোক্তার-নামা রেজেষ্ট্রী করিয়া জয়রামবাটী পাঠাইয়া দিলেন।

এদিকে শ্রীশ্রীমায়ের শরীর ক্রমেই খারাপ হইতে লাগিল। অসুস্থ শরীরেই সকলের তত্ত্বাবধান, মামাদের বাটীর সকলের আবদার পূরণ এবং অন্যান্য ঝঞ্ঝাট সমভাবেই চলিতে লাগিল। এখন তাঁহার মানসিক অবস্থারও যেন পরিবর্তন হইতেছে। সময়ে সময়ে দেখিতাম অন্তের ভিতর শ্রীশ্রীঠাকুরকে দেখিয়া সন্তানের মতন স্নেহ করিতেছেন। যথা—পূর্বে এক সময়ে তিনি জয়রাম-বাটীর একটি তের চৌদ্দ বৎসরের বালকের অত্যন্ত লোভদৃষ্টির জন্ম প্রস্তুত নৈবেদ্য শ্রীশ্রীঠাকুরকে নিবেদন করেন নাই। এখন একদিন দেখিলাম পূজার পূর্বেই নৈবেদ্যের কিয়দংশ

লইয়া ঐ ছেলেটিকে খাইতে দিতেছেন। আমি তাড়াতাড়ি উপস্থিত হইয়া শ্রীশ্রীমাকে বলিলাম, ঐ নৈবেদ্য এখনও নিবেদন করা হয় নি, ওকে খেতে দিলেন যে? মা বলিলেন, বাবা, ওর ভিতর ঠাকুর আছেন। আহা খাক্। একদিন দেখিলাম তাঁহার জনৈকা সেবিকার রাত্রে বিছানার বালিসের অভাব হওয়ায় নিজের বালিসটি লইয়া তাহার বিছানায় মাথা দিবার জন্ম দিলেন। কার্যবশতঃ তথায় উপস্থিত হইয়া আমি ও ঐ সেবিকাটি নিষেধ করিলে মা বলিলেন, তোমাদের ভিতরেই ঠাকুর আছেন। ও মাথায় দিক। আমাকে একদিন শ্রীশ্রীঠাকুরের ভোগের বাটির দুধ নিবেদন করিবার পূর্বেই খাবার জন্ম দিলেন। আমি অত্যন্ত ভীত ও ত্রস্ত হইয়া বলিলাম, মা, একি করছেন? দুধ এখন নিবেদন করা হয় নি, আর ঠাকুরের বাটিতে আমায় দুধ দিচ্ছেন—আমি খেতে পারব না। তখন শ্রীশ্রীমা বলিলেন, বাবা, খাও, তোমার ভিতরই ঠাকুর রয়েছেন? অনেক পূর্ব হইতে একটি টিয়াপাখী শ্রীশ্রীমায়ের বারান্দায় লোহার খাঁচার ভিতর থাকিত। মা তাহাকে যত্ন করিতেন ও ভালবাসিতেন এবং গঙ্গারাম বলিয়া ডাকিতেন। টিয়াপাখিটি অন্ত কিছু কথা শিখাইলেও শিখিত না, কেবল মা মা বলিয়া চীৎকার করিত। কেহ কোন দেবতার নাম শুনাইতে যাইলে নানা-প্রকার শব্দ করিত। শ্রীশ্রীমা তাহাকে লোহার খাঁচার ভিতরের ফাঁক দিয়া প্রসাদী নৈবেদ্য ফলমিষ্টান্নাদি নিজের হাতে করিয়া খাওয়াইতেন। পাখিটি মায়ের হাত হইতে তুলিয়া লইয়া খাইত। সময়ে সময়ে আনন্দ-সূচক ধ্বনি করিত ও মা মা বলিয়া ডাকিত। অনেক সময় শ্রীশ্রীমা আহারের পর পান খাইয়া খাঁচার নিকট জিভ্ বাড়াইলে পাখিটি খাঁচার ফাঁক দিয়া ঠোঁট বাড়াইয়া তাঁহার জিহ্বা হইতে অবশিষ্ট পান লইয়া খাইত। একদিন দেখিলাম, পূজার পূর্বেই নৈবেদ্য হইতে হালুয়া লইয়া 'গঙ্গারাম, খাও বাবা' বলিয়া খাওয়াইতেছেন। আমি তাড়াতাড়ি বলিলাম, মা, এখন পূজা হয় নি, গঙ্গারামকে হালুয়া দিলেন যে? শ্রীশ্রীমা বলিলেন, বাবা, ওর ভিতরই ঠাকুর রয়েছেন।

---

# মীরাতর্পণ

শ্রীদিলীপকুমার রায়

ওগো পারহীনা! এ-হৃদয়বীণা কী সুরে বাঁধিব সুরের পারে?
তোমার ছন্দ বাণী চিনিতে যে আমাদের বোধ মানস হারে!
শিশুকাল হ'তে শুনেছি তোমার অলোক-প্রেমের লোক-কাহিনী,
অচিন্ত্য নীলকান্তের শুধু ঝঙ্কারিল যে মধুরাগিণী!
কোন্ সে অধরা অমরা হ'তে মা, নেমেছিলে তুমি ধরণীতলে—
ভাবি' বিস্ময়ে গিয়েছি হারায়ে কতবার!—কোন্ মন্ত্রবলে
রাজার ঘরণী হ'লে ভিখারিণী কোন্ নীলিমার অভয় লভি'?
জীবন যাহার রূপকথা-সার মনে হয়—গায় যখন কবি!

অবিশ্বাসের এ-অন্ধকারে হে একান্তিকা, তোমার প্রভা
তারা সম ভায় সংশয়াকাশে—বিমুগ্ধ হ'য়ে দেখি সে-শোভা !
কহিলে মা তুমি বাণীময়ী, হেসে : "নহি আধুনিকা আমি শ্রীমতী।
যাহা স্রোতে এসে স্রোতে যায় ভেসে—সেথায় আমার নাহি বসতি ।
কালের বিশাল রঙ্গমঞ্চে প্রমোদ-প্রদীপ জ্বলিয়া নিভে :
হেন চঞ্চল ঝিকিমিকি,বুকে কে কোথায় কবে দেখেছে শিবে ?
ক্ষণপ্রভা তো নহে অমরণ সত্যতপন কালের নভে :
কালপারে রাজে কালাতীত—সেই চিরন্তনেই বরিতে হবে ।
বিধবা বসুধা বিহনে যাঁহার, মিলনে যাঁহার—সীমন্তিনী,
সনাতন তথা পুনর্নব : এ-দুই রূপে লও তাঁহারে চিনি' ।
অতি-আধুনিক ক্ষণতরঙ্গফেনে যারা হয় উধাও সাথে
তাহাদের সেই নির্দিশা ঢেউয়ে কেবল অধীর অবোধে মাতে ।
তব বরণীয় ওগো শাশ্বত-পূজারী, কৃষ্ণবরণ-আশা :
তব ধ্যানে—ধ্যেয়, সঙ্গীতে—সুর তাল, সাহিত্যে—ছন্দ ভাষা ।
যে-বৃন্দাবন চিরমধুবন যেথা সে বাজায় বঁধু মুরলী,
ডাকে—"আয় আয়" যুগে যুগে, শুনে যে-উদাস সুর সমুচ্ছলি'
ত্যজিয়া স্বজন যশ মান ধন হয় উন্মন অশ্রুরাণী
ধ্রুবসুখ যত দলিয়া হেলায়—তুমি চেয়ো হ'তে সে-ব্রজবাসী ।
ভুলিও না আধুনিকতার মোহে—জলে-আল্পনা, মেঘের তনু,
মায়াবী যাহার ক্ষণিক বিহার—পল-পরমায়ু ইন্দ্রধনু !
অতি-আধুনিক মালাকর গাঁথে কথার মালিকা উর্ণাডোরে :
ব্যথার একটি ফুৎকারে হয় ছিন্ন সে, যায় কুসুম ঝ'রে ।
তুমি চেয়েছিলে কৃষ্ণেরে শুধু, তাই আমি আজ আদেশে তাঁরি
এসেছি তোমা দেখি' ব্যাকুলতা দিতে দিশা—কোথা চিরদিশারি ।
অতি-আধুনিক বলে : 'কৃষ্ণ সে অচল মোহর সচল যুগে,
যে জরাজীর্ণ তারে ত্যজি' ধরো নবতনের শ্রীচরণ বুকে ।'
শুনিয়া কৃষ্ণ হাসে : যায় যাক যে যেথায় চায় করিতে পূজা :
বিশ্বমানব, কলা, বিজ্ঞান, জাতীয়তা-দেবী লক্ষভুজা ।
কৃষ্ণ তো নয় কারো প্রতিযোগী—সহযোগী সে যে নিখিল প্রাণে,
প্রতি কবি ঋষি অবতারের সে পথে ধরে বাতি নিরভিমানে ।
হেন সম্রাট সর্বনাথীর আশিস-পাথেয় তোমারে দিতে
এসেছি—তোমারে কথামায়া হ'তে উপলব্ধিতে উত্তরিতে ।
কথার সহজ পথ ছেড়ে চলো দুর্গম পথে—যেথা শ্রীহরি,
অকূলপাথার হ'তে হবে পার চরণতরণী তাঁহার বরি' ।"
ভিখারিণী রাণী ! তোমার এ-বাণী শুনেছি শ্রবণে, তাই তো জানি :
অযাচিত কৃপা পেল যে তব—সে অকূলপাথারে পাবে পারানি ।
তোমার ভাষণ, গান ও জীবন, ব্যথা-অভিসার, তন্ময়তা
দিয়েছে কৃষ্ণপূজার প্রেরণা যারে—সে স্মরিয়া তোমার কথা
প্রার্থে : "তোমার আলোঝঙ্কার যেন ছায় কালো হৃদিগগনে
কলঙ্ক হায় হয় বয়ে যায়—নিয়ে চলো তার চিরচরণে ।"

---